জ্ঞান ও বিজ্ঞান

প্রতিষ্ঠাতা: আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু

লেখকদের প্রতি নিবেদন

1. বিজ্ঞান পরিষদের আদর্শ অনুযায়ী জনসাধারণকে আকৃষ্ট করার মত সমাজের কল্যাণমূলক বিষয়বস্তু সহজবোধ্য ভাষায় সুলিখিত হওয়া প্রয়োজন।
2. মূল প্রতিপাদ্য বিষয় এবং পূর্ণ ঠিকানাসহ লেখকের পরিচিতি পৃথক কাগজে অবশ্যই লিখে দিতে হবে।
3. চলিত ভাষা এবং চলন্তিকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট বানান ও পরিভাষা ব্যবহৃত হবে। উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে আন্তর্জাতিক শব্দটি বাংলা হরফে লিখে ব্র্যাকেটে ইংরাজী শব্দটিও দিতে হবে। আন্তর্জাতিক সংখ্যা এবং মেট্রিক পদ্ধতি ব্যবহৃত হবে।
4. মোটামুটি 3000 শব্দের মধ্যে রচনা সীমাবদ্ধ থাকা বাঞ্ছনীয়।
5. বিভিন্ন ফীচার, সমকালীন বিজ্ঞান গবেষণা ও প্রযুক্তিবিদ্যার সংবাদ এবং বিজ্ঞান বিষয়ক সুন্দর আকর্ষণীয় ফটোগ্রাফীও গ্রহণীয়।
6. রচনার সঙ্গে চিত্র থাকলে আর্ট পেপারে চাইনিজ কালিতে সুঅঙ্কিত হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন।
7. প্রত্যেক চিত্র প্রস্থে 8 সে. মি. কিংবা এর গুনিতকের (16 সে. মি. 24 সে. মি.) মাপে অঙ্কিত হওয়া প্রয়োজন।
8. অমনোনীত রচনা ফেরং পাঠানো হয় না। প্রবন্ধের মৌলিকত্ব বজায় রেখে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জনে সম্পাদক মন্ডলীর অধিকার থাকবে।
9. প্রত্যেক প্রবন্ধ ফীচার-এর শেষে গ্রন্থপঞ্জী থাকা বাঞ্ছনীয়।
10. জ্ঞান ও বিজ্ঞানে পুস্তক সমালোচনার জন্য দুই কপি পুস্তক পাঠাতে হবে।
11. ফুলস্ক্যাপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় যথেষ্ট মার্জিন এবং প্রতি লাইনের পর বেশ কিছুটা ফাঁক রেখে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে প্রবন্ধ লিখতে হবে।
12. প্রতি প্রবন্ধের শুরুতে পৃথকভাবে প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসার দেওয়া আবশ্যিক।

সম্পাদনা সচিব

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের অনুশীলন করে বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ ও সমাজকে বিজ্ঞান-সচেতন করা এবং সমাজের কল্যাণকল্পে বিজ্ঞানের প্রয়োগ করা পরিষদের উদ্দেশ্য।

বিভিন্ন লেখকদের স্বাধীন মতামত বা মৌলিক সিদ্ধান্ত সমূহ পরিষদের সম্পাদকমণ্ডলীর চিন্তার প্রতিফলন হিসাবে সাধারণতঃ বিবেচ্য নয়।

বিষয় সূচী

কিশোর বিজ্ঞানীর আসর

প্রচ্ছদ পরিচিতি ঃ অশীতিতমবর্ষে সত্যেন্দ্রনাথ

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ঃ 30·00

মূল্য ঃ 2·50

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

কর্মসচিব

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট,

কলিকাতা-700006

ফোন ঃ 55-0660

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

অষ্টাত্রিংশত্তম বর্ষ জানুয়ারী, 1985 প্রথম সংখ্যা

নববর্ষ উপলক্ষে

জয়ন্ত বসু

বর্তমান সংখ্যা প্রকাশের মধ্য দিয়ে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা নতুন বছরে পদার্পণ করলো। পত্রিকার বয়সও সেই সঙ্গে বাড়লো এক বছর। কারণ এর জন্মমাস: জানুয়ারী, 1948 খ্রীস্টাব্দে। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান সাহিত্যকে গত 37 বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে সেবা করে আসছে এই পত্রিকা। শুধু বাংলা ভাষায় নয়, ভারতীয় যে কোন ভাষার ক্ষেত্রেই এটি একটি নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত। এই দৃষ্টান্ত স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে যাঁদের অনুপ্রেরণায়, উৎসাহ ও উদ্যোগে, সহযোগিতা ও শুভেচ্ছায়, তাঁদের মধ্যে অনেকে আজ আর ইহলোকে নেই—নববর্ষের সূচনায় তাঁদের স্মৃতির প্রতি জানাই আমাদের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা; আর যাঁরা আমাদের মধ্যে রয়েছেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে জানাচ্ছি আমাদের আন্তরিক সাধুবাদ।

1947 খৃস্টাব্দে যখন এ দেশ স্বাধীন হল, তখন এখানে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার একান্ত অভাব, এদেশের জনমানসে বিজ্ঞানচেতনা অত্যন্ত ক্ষীণ। সেই সন্ধিক্ষণে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য কয়েক জন বিজ্ঞানী ও চিন্তাশীল ব্যক্তি উপলব্ধি করলেন যে দেশের উন্নতিকল্পে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসারের অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে এবং এই কাজ সার্থক ভাবে হতে পারে একমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমে। তাঁদের এই উপলব্ধি থেকে জন্ম নিল বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, যার মুখপত্র হিসাবে প্রকাশিত হল 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা। বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচয়ের অভাবে এদেশের জনগণ মনে যে পুঞ্জীভূত অন্ধকার ছিল, তার মধ্যে একটি আলোক-বর্তিকা রূপে দেখা দিল এই পত্রিকা। এর তেজ হয়তো খুব বেশি ছিল না কিন্তু পরিবেশের মধ্যে তা অবশ্যই একটি গুণগত পরিবর্তন নিয়ে এল। তারই জের হিসাবে কালক্রমে আরো অনেক বাতি জ্বলে উঠেছে কয়েকটি বাংলা বিজ্ঞান পত্রিকা জন্মলাভ করেছে, বিভিন্ন সংবাদপত্র ও পত্রি গ এবং আকাশবাণী ও দূরদর্শন বিজ্ঞান প্রচারে বেশ কিছুটা সক্রিয় হয়েছে।

তবে একথা স্বীকার করতে হবে যে কোন-রকম আত্মতুষ্টির অবস্থা এখনো ঘটে নি। বিজ্ঞানের সঙ্গে আমাদের সমাজের একাত্মতা আজো গড়ে ওঠে নি বিজ্ঞানের শিকড় প্রবেশ করে নি সমাজের অন্তস্তলে। ফলে বৈজ্ঞানিক মানসিকতার স্বাভাবিক স্ফুরণের উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে ওঠা সম্ভব হয় নি। এই পরিস্থিতিতে বিজ্ঞানের নতুন নতুন তত্ত্ব ও তথ্যাদি প্রচার করাই কেবল বিজ্ঞান পত্রপত্রিকার দায়িত্ব নয়, তাদের অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসার ঘটানো যে দৃষ্টিভঙ্গী ব্যক্তিনিরপেক্ষ, যুক্তিনির্ভর ও সত্য-অভিলাষী; যে দৃষ্টি-ভঙ্গীর সাহায্যে আমাদের চারপাশের জগতের ও সমাজের বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ সম্ভব হতে পারে, যে দৃষ্টিভঙ্গী মনষ্য সভ্যতার সার্বিক অগ্রগতির সঠিক নির্দেশ দিতে পারে। আমরা সেজন্যে এই পত্রিকার লেখকদের কাছে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ ছাড়াও বিজ্ঞানের দর্শন, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, বিজ্ঞান ও সমাজের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে প্রবন্ধাদি সাদরে আহ্বান করছি। এ ধরনের প্রবন্ধ পত্রিকায় আগেও প্রকাশিত হয়েছে তবে এই দিকটিতে আরো বেশি গুরুত্ব দেওয়া দরকার

বলে আমরা মনে করি।

বিজ্ঞানের প্রচার ও বিজ্ঞানচিন্তার প্রসারের ক্ষেত্রে উল্লিখিত ভূমিকা ছাড়াও 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিজ্ঞানলেখকদের রচনাই শুধু নয়, বহু নবীন বিজ্ঞানলেখকদের রচনাও পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে—ফলে নতুন লেখকরা উৎসাহিত হয়েছেন, অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন এবং আনন্দের কথা তাঁদের মধ্যে অনেকে পরবর্তী কালে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন বিজ্ঞানলেখক হিসাবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, নবীনদের রচনা যে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রকাশের, যোগ্যতা অর্জন করে না, সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নিম্নলিখিত মন্তব্যগুলি করা যেতে পারে ঃ—

1) বিষয়বস্তুর নির্বাচনে যত্নশীল হওয়া দরকার—সাধারণ পাঠকের মনে আগ্রহের সৃষ্টি করবে, এমন বিষয়বস্তু নির্বাচন করা বাঞ্ছনীয়।

2) পরিবেশিত তত্ত্ব ও তথ্যগুলি নির্ভুল হতে হবে। সর্বাধুনিক ধ্যান-ধারণা ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি যথাসম্ভব অন্তর্ভুক্ত থাকলে ভাল হয়।

3) আলোচ্য বিষয়গুলিকে বোধগম্য ও যথাসাধ্য আকর্ষণীয় ভাবে পরিবেশন করতে হবে। তাছাড়া উপস্থাপনার মধ্যে সঙ্গতি থাকা দরকার। বাক্যবিন্যাস শব্দের ব্যবহার, বানান ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

4) প্রয়োজন অনুযায়ী চিত্রের ব্যবহার বাঞ্ছনীয়। চিত্রের ব্যাখ্যা যথাযথ ও প্রাঞ্জল হওয়া দরকার।

5) পাণ্ডুলিপি রচনা সমাপ্ত হলে সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে প্রয়োজনীয় সংশোধনাদি করা উচিত। সবচেয়ে ভাল হয়, পাণ্ডুলিপি কয়েক দিন রেখে দিয়ে তারপর তার সংশোধনের কাজে হাত দিলে; তাতে অনেকখানি খোলা মন নিয়ে সংশোধন করা সম্ভব হয়।

বস্তুতঃ লোকরঞ্জক বিজ্ঞান রচনায় আগ্রহ থাকলে এবং নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে সেই কাজে নিযুক্ত হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সফল বিজ্ঞানলেখক হওয়া সম্ভব। সুপরিচিত বিজ্ঞান-লেখকদের সঙ্গে সঙ্গে নবীনদেরও আমরা সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি পত্রিকায় প্রকাশের জন্য তাঁদের প্রবন্ধাদি পরিষদ-দপ্তরে পাঠিয়ে দিতে।

আমাদের দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র মতন পত্রিকার প্রয়োজনীনতা যে অত্যন্ত ব্যাপক, তা আগে আলোচনা করা হয়েছে। এই প্রয়োজন যদি ঠিক ভাবে মেটাতে হয়, তাহলে পত্রিকাটির মান আরো উন্নত করতে হবে, একে আরো জনপ্রিয় করে তুলতে হবে। এই কাজে প্রধান অন্তরায় হচ্ছে আর্থিক অনটন। আধুনিক যুগে এ সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হতে পারে একমাত্র সরকারী আনুকূল্যে। পত্রিকার প্রকাশনা খাতে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে আমরা অর্থসাহায্য পেয়ে থাকি এবং সেজন্য আমরা তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। তবে ঐ অর্থসাহায্য প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়—বিশেষতঃ ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে। আমরা আশা করি, সমাজের পক্ষে এই পত্রিকার কল্যাণকর ভূমিকা ও তার সুদূরপ্রসারী ফলের কথা মনে রেখে এবং পত্রিকাটির ঐতিহ্য ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে উভয় সরকারই তাঁদের সাহায্যের পরিমাণ অদূর ভবিষ্যতে উল্লেখযোগ্য ভাবে প্রসারিত করবেন। আমরা অবশ্যই আশা রাখি যে, সরকার ও জনসাধারণের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতায় এই পত্রিকা তার দায়িত্ব পালনে আরো সার্থক ও সফল ভূমিকা গ্রহণ করতে পারবে।

সত্যেন্দ্র জয়ন্তী

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য

জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথের স্বজন-পরিজন, বন্ধু-বর্গ, ছাত্রবৃন্দ ও স্বদেশবাসী একত্রিত হয়েছেন তাঁর 70 বছর পূরণে তাকে সম্বর্ধনা জানাতে। আমার কাছে এটি যারপর নাই আনন্দের দিন—কেন না, আমি তার বন্ধুবর্গের প্রাচীনতমদের একজন। পঞ্চান্ন বছর আগে, 1908 অব্দে তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্বপ্রণয়ে আবদ্ধ হই। তখন তিনি ছিলেন হিন্দু স্কুলের প্রথম শ্রেণীর ছাত্র, আমি দ্বিতীয় শ্রেণীর। ভিন্ন শ্রেণীর দুর্লঙ্ঘ্য বেড়া টপকে আলাপ জমালেন তিনিই। বন্ধের মুখে স্কুলে ছিল 'মার্চেণ্ট অফ ভেনিস' ও 'রাণা প্রতাপ' থেকে বাছাই করা গর্ভাঙ্কের অভিনয়ের আয়োজন। আমি অংশ গ্রহণ করেছিলাম উভয়েতেই। অভিনয় হয়ে গেলে কাছে এসে বললেন, খুব ভাল হয়েছে আমার অংশগুলি। অপরিচিত দুটি বালক হৃদয়ের মিলন হলো ও অচিরে তা অচ্ছেদ্য বন্ধুত্বে হলো পরিণত। বোসসমষ্টিসূত্র বিশ্বে সুবিদিত। স্বয়ং আইনস্টাইন বিজ্ঞান জগতে ঘোষিত করেছিলেন তাঁকে। আজ চল্লিশ বছর ধরে কণিকাসমষ্টির সমাবেশ ও আচরণে প্রযুক্ত হয়ে সে সূত্র হয়েছে সিদ্ধ, দৃঢ়প্রতিষ্ঠ। লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটি ফেলো নির্বাচিত করে তাঁকে সম্মানিত করেছে ও ভারত সরকার তাঁকে উপাধি-ভূষিত করে গৌরব মণ্ডিত করেছেন। দুটি বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্প্রদান করেছে সম্মানিত ডক্টরেট ডিগ্রী। বিশ্বব্যাপী যশ তাঁকে ঠাই দিয়েছে এই সব উপাধি ও ডিগ্রীর অনেক উপরে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ উৎসর্গীকৃত করেছেন তাঁর রচিত বই। বিজ্ঞানের পথ ধরে জগতে যে বিস্ময়কর অগ্রগতি ও উন্নতি সাধিত হয়েছে, সে পথে চলতে হলে চাই ভারতের স্ব স্ব প্রাদেশিক ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা ও বিজ্ঞানের পরিবেশন, প্লাবন—এই উদ্দেশ্যে সত্যেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছেন "জ্ঞান ও বিজ্ঞান" পত্রিকা ও বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ। গিরিশৃঙ্গের মতো তাঁর এসব কীর্তি চিরদিন মাথা তুলে থাকবে দেশবাসীর কাছে গণিত, পদার্থবিদ্যা রসায়ন, শারীরবিদ্যা প্রভৃতিতে সমান বুৎপত্তি তাঁর। সাহিত্য ইতিহাস ও রাগরাগিণীতেও অভাবনীয় তাঁর, অনুরাগ এবং শিক্ষকতাপ্রীতি আবাল্য। কিন্তু এসব পরিচয় ছাড়াও অন্তরঙ্গ এক পরিচয় আছে তাঁর। নিবিড় সংস্রবে এসেছেন যাঁরা, তাঁরা পেয়েছেন সে পরিচয়। সে হলো তাঁর হৃদয়ের পরিচয়—দরদী পরোপকারী, বন্ধুবৎসল, সর্বগুণগ্রাহী, স্বদেশপ্রেমিক হৃদয়। এই অভ্রান্ত স্বাক্ষর বহন করে বলেই আমার সঙ্গে সত্যেন্দ্রের প্রথম আলাপের বিবরণটি দিয়েছি। ইদানিং কিছুকাল তিনি হয়ে পড়েছেন বেশী চলাফেরায় অশক্ত, কিন্তু স্কুল-কলেজে পড়বার সময় তিনি বিনা দ্বিধায় 8-10 মাইল পথ হেঁটে যেতেন আসতেন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে। বন্ধুত্ব সংস্থাপনেও ছিলেন সমান তৎপর। সর্বদা খোঁজ ছিল গুণীলোক কে আছে সমবয়সীদলের। লেখাপড়া, গান-বাজনা, ছবি আঁকা, গল্প করা, অভিনয় করা—যে গুণই হোক না। অথচ তিনি নিরহঙ্কার, সুখ-সম্পদ-বিলাসে সম্পূর্ণ উদাসীন দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনা সুখেষু বিগতস্পৃহঃ। বস্তুতঃ তাঁর মধ্যে অপূর্ব মিলন ঘটেছে বিপুল প্রতিভার সঙ্গে এক বিশাল হৃদয়ের।

স্কুল-কলেজে পড়বার সময় থেকেই সত্যেন্দ্রের প্রতিভার উন্মেষ হয়েছিল। সেই সময় থেকেই ছাত্র ও শিক্ষকমহলে ছড়িয়ে পড়েছিল তাঁর খ্যাতি। দু-একটা গল্প বলি। হিন্দু স্কুলে গণিত পড়াতেন উপেন্দ্র বক্সী। প্রগাঢ় দখল ছিল তাঁর গণিতে, বিজ্ঞান ছিল তাঁর জপমালা। সত্যেন্দ্রের অসামান্য মেধা তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। একদিন আমাদের ক্লাসে পড়াবার সময় বললেন—জান উপরের ক্লাসে একজন ছাত্র আছে, নাম সত্যেন্দ্র, তাকে পরীক্ষায় 100-এর মধ্যে 110 দিয়েছি। 11টি অঙ্কের মধ্যে দশটি কষবার কথা, কিন্তু সে এগারটিই নির্ভুল কষেছে, তার মধ্যে কয়েকটি কষে দেখিয়েছে দু'তিন উপায়ে। ভবিষ্যতে সে হবে একজন জগন্মান্য গণিতবিদ, যেমন—কচি, লাপ্লাস, লাইবনিজ। বক্সী মহাশয়ের ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হয় নি। এণ্ট্রান্স পাশ করে কলেজে ভর্তি হলেন, আর্টস্ না নিয়ে বিজ্ঞান শ্রেণীতে এর পশ্চাতে বক্সী মহাশয়ের প্রেরণা ছিল যথেষ্ট।

তখনও আমরা উভয়েই স্কুলের ছাত্র। সত্যেন্দ্র একদিন বললেন, কোল গ্যাস বানাতে হবে। ব্যবস্থা হলো আমাদের বাড়ীর ছাতায়। একটা মাটির ভাঁড়ে পাথুরে কয়লা রেখে একটা খুরি চাপা দিয়ে ময়দার আঠা করে চারদিকে এঁটে দেওয়া হলো। খুরির মাঝখানটা ছেঁদা করে দেওয়া হয়েছিল, তাতে যোগান হলো পেঁপের ডালের নল। ভাঁড়টাকে ইটের উনোন পেতে চাপিয়ে জ্বাল দেওয়া হলো। পেঁপের ডালের মুখে বেরিয়ে এল খানিকটা তরল পদার্থ, তারপর দিব্যি বেরোতে লাগলো গ্যাস। দেশলাই দিয়ে তাকে ধরানো গেল। এসবের বুদ্ধিদাতা ছিলেন সত্যেন্দ্র। তাঁরই বুদ্ধিতে বানানো হলো একটা দশ-বারো গুণ বিবর্ধনের টেলিস্কোপ। আর একদিন নিশাদল, দস্তা, কাঠকয়লা ইত্যাদি মশলা যোগাড় করে মাটির খোল তৈরী করে পুড়িয়ে করা গেল এক ব্যাটারী। একটা পুরনো পকেট বাতি যোগাড় করে যখন এই ব্যাটারি যোগে তাকে জ্বালানো গেল, তখন সে কি আনন্দ! আজকাল অনেকেই ছেলেবেলা এসব অনায়াসে করে থাকেন— 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র প্রতি সংখ্যার একাংশে এসবের সহজ উপায় বিবৃত থাকে। কিন্তু আমি বলছি পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা, যখন স্কুলে পড়া ছাত্রের পক্ষে এসব সাধন ছিল দুরূহ।

পড়াশুনায় সত্যেন্দ্র থাকতেন অনেক এগিয়ে। স্কুলে পড়বার কালে ফরাসী ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত পড়া হয়ে গিয়েছিল। ভবভূতিও বাদ যায় নি। টেনিসনের 'In Memorium' মুখস্থ ছিল। আমায় পড়তে দিয়েছিলেন ম্যাট্‌সিনি, গ্যারিবল্‌ডি, গিবনের 'Decline & fall of the Roman Empire'। পাঠ্যবস্তুর বিরাট এলাকায় করতেন আনাগোনা। বঙ্কিম, রবীন্দ্রের রচনাবলী বহুবার পঠিত হয়েছিল। স্কুলে পড়তেই ইণ্টারের পাঠ্য গণিতের বিষয়গুলি, রসায়ন, পদার্থ-বিদ্যা শেষ করেছিলেন। আমার মত নীচের ক্লাসের ও নিজ শ্রেণীর ছাত্রদের তো পড়াতেনই, উপরের ক্লাসের কোন কোন ছাত্রকেও পড়া দেখিয়ে ও অঙ্ক শিখিয়ে দিতেন। এণ্ট্রান্স পরীক্ষার পরে ভর্তি হবার আগেই শেষ করলেন ক্যালকুলাস, অ্যানালিটিক্যাল জিওমেট্রি, মেণ্ডেলেফের রসায়ন। যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হলেন, তখন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর ক্লাসে সত্যেন্দ্রকে বেঞ্চে বসতে না দিয়ে নিজের পাশে টুলে বসবার ব্যবস্থা করলেন। তাঁর মতে, সত্যেন্দ্রের নতুন করে শেখবার দরকার ছিল না, অন্য ছাত্রদের সমগোত্রীর হয়ে—তাদের সঙ্গে বসলে অনাবশ্যক প্রশ্নবাণে বিব্রত করবে। স্কুলে-কলেজে পড়বার সময় ও রকম বিব্রত করা অভ্যাস ছিল তাঁর—আনন্দে শিক্ষকেরা তা সহ্য করতেন। দূর-দূরান্তে বন্ধুদের বাড়ী গিয়ে সারাদিনব্যাপী আড্ডা দেওয়া, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে ক্যারাম খেলা, তারপর রাত জেগে পড়া ছিল নৈমিত্তিক। সকালে আমাদের বাড়ী এসে গান ও গল্পগুজবে কাটিয়ে রাত্রি একটার পর বাড়ী ফিরেছেন কতদিন। দাদা—পশুপতি বাবু গান করতেন। হারিৎকৃষ্ণ, ধূর্জটিপ্রসাদও গানে যোগ দিতেন। নীরেন এবং যামনীদারও (আমাদের বিখ্যাত চিত্রকর যামিনী রায়) সমানতালে যোগ দিতেন। সত্যেন্দ্রকে কেন্দ্র করে সবচেয়ে জোরালো আড্ডা ছিল হেদোয় (হেদুয়া)। গল্পের চেয়ে গানই ছিল সে আড্ডায় সেরা খোরাক। এখানে খোলামেলায় খালি গলায় গান করতেন হারিৎকৃষ্ণ, প্রফুল্ল চক্রবর্তী—রবীন্দ্র সঙ্গীত। "দাঁড়াও আমার আঁখির আগে", "তোমার অসীমে মন প্রাণ লয়ে"—এসব গানের সুরের পর্দা হেদুয়ার ধরাতল থেকে আকাশের অসীমে ওঠানামা করতো। এই সময়ে সত্যেন্দ্রের সখ হলো এস্রাজ বাজানো শেখবার। আমার দাদার খুড়শ্বশুরের এস্রাজের হাত ছিল ভাল। তিনি তাঁর নিজের ভাল আওয়াজী এস্রাজ একটি দিলেন সত্যেন্দ্রকে। আজও সেটি তিনি সযত্নে রেখেছেন নিজের ঘরে। অবসর মত বাজান নিজের খেয়ালখুসীতে। বন্ধুদের বা আত্মীয়-স্বজনের বাড়ী গেলে দীর্ঘ সময় সেখানে কাটানো আজও তাঁর অব্যাহত।

যখন তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়েন, সত্যেন্দ্রের সম্পাদনায় তখন একটি হাতে লেখা মাসিক পত্র করা হলো আমাদের বাড়ী থেকে। গানে যেমন, লেখাতেও ছিল তেমনি ঝোঁক, আমার দাদা পশুপতির। তিনি এখন একজন বিখ্যাত লেখক ও রবীন্দ্রনাথের প্রিয়পাত্রদের অন্যতম। তাঁর রচনা দাদা সত্যেন্দ্রকে পড়ে শোনাতেন। বাংলায় হাতে লেখা মাসিক পত্র বের করায় এইটেই হয়েছিল একটা প্রাথমিক প্রেরণা। আমাদের বাড়ী থাকতেন একজন আত্মীয় ভূপালভূষণ। ভূপালদা লিখতেন কবিতা। সে কবিতাও প্রেরণা যুগিয়েছিল সত্যেন্দ্রকে পত্রিকাটি বের করতে। তিনি পত্রিকাটির নাম দিয়েছিলেন "মণীষা"। প্রথম সংখ্যায় ভূপালদার কবিতা বের হলো—

> স্নিগ্ধ রম্য কক্ষে,
> শায়িত কুমার জগৎ সিংহ
> রক্তাপ্লুত বক্ষে।
> পাশেতে বসিয়া আয়েষা তরুণী—
> নবরবিকর ফুল্ল নলিনী,
> শান্তোজ্জ্বল মধুর চাহনি
> পলকবিহীন চক্ষে॥

আর যাঁরা 'মণীষায়' লিখেছিলেন, তাঁরা হলেন প্রমথ মিত্র (কবিতা), পূর্ণ সেন (কবিতা), তারক দাস, রজনী পালিত, হরিপদ মাইতি ও অন্যান্য অনেকে। সত্যেন্দ্র লিখেছেলন তাঁর ছেলেবেলায় আসাম বাসের কাহিনী। "জ্ঞান ও বিজ্ঞান" প্রতিষ্ঠা করবার বহুদিন আগে বাংলা সরস্বতীর কমল বনে ফুল ফোটানোর সত্যেন্দ্রের এই প্রথম প্রয়াস। দুঃখের কথা—'মণীষা' তিন বা চার সংখ্যা বের হবার পর বন্ধ হয়ে যায়। হাতেলেখা সংখ্যাগুলি আজ নিশ্চিহ্ন।

আগেই বলেছি, স্কুল-কলেজে পড়বার সময় থেকেই সত্যেন্দ্রের প্রতিভার কথা ছাত্র ও শিক্ষক মহলে যুগপৎ ছড়িয়ে পড়েছিল। সবে যখন এম, এস-সি পাশ করেছেন, দেখেছি প্রোফেসার রামনকে তাঁর বাড়ীতে আসতে। তিনি তখন ছিলেন ডেপুটি অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেলের পদে নিযুক্ত, বৌবাজার সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন মন্দিরে গবেষণা করতেন বেহালার তারের কম্পন সম্বন্ধে। পাশ করবার পর সার্টিফিকেট আনতে গেলে অধ্যাপক ডি, এন. মল্লিক লিখেছিলেন—তিনি ধন্য হয়েছেন সত্যেন্দ্রের মত ছাত্রের শিক্ষকতার সুযোগ লাভে। সার আশুতোষ ছিলেন তাঁর দু'একটি বিষয়ের পরীক্ষক। পরীক্ষার ফল বের হবার পর তিনি ডেকে পাঠান সত্যেন্দ্রকে ও সরাসরি নিয়োগ করেন সদ্যগঠিত সায়েন্স কলেজে।

সত্যেন্দ্রের সহপাঠী, সমপাঠী ও সমসামন্ত্রিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—মেঘনাদ সাহা, জ্ঞান ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্র মুখার্জী, ধূর্জটিপ্রসাদ, যোগীশ সিংহ, গৌরীপতি, সার ধীরেন মিত্র, প্রোফেঃ প্রশান্ত মহলানবিশ। এঁরা যেন সে সময়ের এক নক্ষত্রমণ্ডল।

যতদূর জানি, সত্যেন্দ্রের প্রথম স্বাধীন গবেষণার কাজ হলো লেবরেটরিতে বর্ণের শোষণ ক্রিয়া সম্পাদন, যা আছে সূর্যলোকের বর্ণালীতে। নিজের বুদ্ধি ও চেষ্টায় এটি তিনি সম্পন্ন করেছিলেন প্রেসিডেন্সী কলেজের বেকার লেবরেটরিতে, কলেজ থেকে পাশ করে বের হবার অব্যবহিত পরেই। কৌতুহলী পাঠকের জন্যে জানাচ্ছি, এর জন্যে ব্যবহার করেছিলেন নার্ণস্ট বাতি (Nernst Lamp)। সেই অপরূপ ক্রিয়া দেখিয়েছিলেন আমাকে। তাঁর দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য কাজ, মূল জার্মান থেকে আইনস্টাইনের সার্বিক আপেক্ষিকতা তত্ত্বের ইংরেজীতে অনুবাদ। মেঘনাদ সাহা অনুবাদ করেছিলেন ঐ সঙ্গে বিশিস্ট আপেক্ষিকতাবাদের। এই দুটি একত্র করে প্রশান্ত মহলানবিশ কৃত এক বিস্তৃত ভূমিকা সম্বলিত হয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক একটি বই-এর আকারে প্রকাশিত হয় 1921 অব্দে। যতদূর জানা আছে, আপেক্ষিতা তত্ত্বের ইংরেজীতে নানা ব্যাখ্যা ও বিবরণ প্রকাশিত হলেও ইতিপূর্বে মূলের অনুবাদ ইংরেজীতে প্রকাশিত হয় নি। এই সময়ে সত্যেন্দ্র রীডারের পদ পেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন।

কলেজ-জীবন থেকে বিদায় নেবার আগে তাঁর আর দুটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগের কথা উল্লেখযোগ্য। একটি হলো তাঁর অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যোগ, আর একটি হলো শ্রমজীবী শিক্ষা-পরিষদের সঙ্গে যোগ। অনুশীলন সমিতির কথা নিশ্চয়ই অনেকে জানেন। এই সমিতি ছিল স্বদেশী ও বোমার যুগে। সমিতির উদ্দেশ্যে ছিল স্বাধীনতা লাভ। বহু শাখা ছিল সমিতির পাড়ায়, পাড়ায়, গ্রামে গ্রামে। এসব জায়গায় শেখানো হতো ব্যায়াম, লাঠি খেলা, ছোরা খেলা, তলোয়ার খেলা ও গোপনে পিস্তল ছোড়া। শ্রমজীবী শিক্ষা পরিষদ ভার নিয়েছিল শ্রমজীবীদের মধ্যে বিনা বেতনে শিক্ষা পরিবেশনের, নৈশ বিদ্যালয়ের মাধ্যমে। দিনমানে যারা মজুরী করে খায়, তাদের রাত্রে পড়াবার জন্যে এই আয়োজন। এই উভয় অনুষ্ঠানেই সত্যেন্দ্র আমাকে ও অন্যান্য বন্ধুদের ডেকে নিয়েছিলেন। হরিশ সিংহ, নীরেন রায় যোগ দিয়েছিলেন নৈশ বিদ্যালয়ে। মানিকতলা স্ট্রীটে ছিল কেশব অ্যাকাডেমি স্কুল। রাত্রে সেখানে গিয়ে আমরা শ্রমজীবীদের বিনা বেতনে পড়াতাম, সত্যেন্দ্রের প্রেরণায়।

ঢাকায় থাকতে তাঁর বিখ্যাত গবেষণা বোসসমষ্টি সূত্র উদ্ভাবিত হয়। স্বয়ং আইনস্টাইন কর্তৃক অনুমোদিত হয়ে গবেষণাটি প্রচারিত হয় Zeitscrift fur Physik-এর মাধ্যমে 1924 অব্দে। সত্যেন্দ্র গবেষণাটি পাঠান লণ্ডনের Phil. Mag-এ; রচনাটি তাতে ছাপানো হয় নি। সেই সঙ্গে রচনাটি সত্যেন্দ্র আইনস্টাইনের কাছেও পাঠিয়েছিলেন সাহস করে। অবিলম্বে তিনি তাঁকে অভিনন্দিত করে জানান যে, সত্যেন্দ্রের অবলম্বিত পদ্ধতি ও তাঁর প্রদত্ত সূত্র বিজ্ঞানে এক অগ্রগতি সাধিত করেছে।

যেদিন বোস-সামষ্টিসূত্রের সংবাদ আমি পেলাম, সে দিনের কথা উজ্জ্বল হয়ে মুদ্রিত আছে আমার মনে। 1925 অব্দের ফেব্রুয়ারী মাস। প্রচণ্ড শীতে শেষরাত্রি থেকে বরফ পড়া সুরু হয়েছে প্যারিসে। নিয়তির নির্দেশে সত্যেন্দ্রের সঙ্গে একত্রিত হয়েছি সেখানে, উঠেছি একই হোটেলে। ঢাকা থেকে বৃত্তি নিয়ে তিনি আসেন প্যারিসে। কিছুকাল কাটিয়ে সেখান থেকে যাবেন বার্লিনে, দেখা হবে আইনস্টাইনের সঙ্গে। আমি এসেছি আগেই, সাবান ও সুগন্ধী তৈরী দেখতে ও শিখতে। দেশে থাকতে পরস্পরের কেউই জানতাম না অপরের আসবার কথা—প্যারিসে একেবারে অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ।

বন্ধুবর প্রবোধ বাগচীর আনুকূল্যে স্থান পেয়েছিলাম একই হোটেলে। সে হলো 1924-এর শেষের দিক। তারপর কেটে গেছে কয়েক মাস। সত্যেন্দ্র মাদাম কুরীর সঙ্গে দেখা করে তাঁর লেবরেটরিতে যাতায়াত ও কাজ করছেন। সাবান ও সুগন্ধী তৈরী শেখবার চেষ্টায় আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি মার্সেই, লিয়ঁ, নিস, ক্যান প্রভৃতি শহরে। ফিরে এসে আবার আশ্রয় নিয়েছি একই হোটেলে। সে দিন সকালে উঠে মুখ ধুয়ে জানালা দিয়ে দেখি কাগজের কুচি বা পেঁজা তুলার মত নরম হাল্কা বরফ পড়ছে, আকাশ থেকে। গাছের ডালপালা, বাড়ীর ছাদ, জানালার আলসে, রাস্তা ছেয়ে গেছে তুলার মত বরফে। এলাম সত্যেন্দ্রের কামরায়। দেখি—তন্ময় হয়ে খাস, ইটালী ভাষায় লেখা দান্তের 'ডিভিনিয়া কমিডিয়া' পড়ছেন। বললেন — রাত্রি 3টা থেকে উঠে পড়ছেন, আমাকে বললেন—'শোকোলা' ফরমাস করতে। শোকোলা খাওয়া হলে টেবিল থেকে একটা পুস্তিকার বাণ্ডিল খুলে একখণ্ড দিলেন আমায়। সেটি তাঁর Zeit-f. Phy-এ প্রকাশিত আইনস্টাইনের মন্তব্যসমন্বিত। বোস-সমষ্টি সূত্রের পুনর্মুদ্রণ। জার্মান ভাষায় রচনা বলে আমাকে বুঝিয়ে দিতে হলো, মোটামুটি বস্তুটি কি। বিষয়টি সমষ্টিতত্ত্ব, বোস প্রদত্ত সূত্র ও বিষয়টি ঘিরে যে জটিলতা ছিল তার সমাধান। এসব চিন্তায় ও আইনস্টাইনের অভিনন্দনে আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে রইলাম। আমার তন্ময় ভাবে ভ্রূক্ষেপ না করে সত্যেন্দ্র দান্তে পাঠে নিমগ্ন হলেন। প্রায় একটার কাছাকাছি বই শেষ করে বললেন—চল বাইরে কোথাও খেয়ে আসি। বরফে ঢাকা পথে চলতে চলতে জিজ্ঞাসা করে জানলাম, আর কাউকে তাঁর এই গবেষণার কথা বলেন নি এর আগে—বন্ধুমহলে বা জানাশোনাদের কাছে। পুস্তিকাগুলি আগের দিন এসে পড়ায় ও আমি সেদিন তার ঘরে আসায় আমায় বলেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার ভিন্ন আমিই প্রথম তাঁর স্বমুখে শুনলাম বোস-সূত্রের বার্তা এবং প্যারিসে বসে। 1932 অব্দে 'পরিচয়ের' দ্বিতীয় সংখ্যায় 'বোস-সমষ্টি গণিত' নামে বাংলায় প্রবন্ধ লিখি, বিষয়টিকে সহজবোধ্য করার উদ্দেশ্যে বাংলাভাষায় বিষয়টি ব্যাখ্যা করবার এটি প্রথম চেষ্টা। ফোটন বা আলোক কণিকা ও তাপ কণিকার সমষ্টিগত ব্যবহারের সুপ্রতিষ্ঠিত সূত্র নিরূপণের প্রয়াসে বোসকৃত সূত্রের উদ্ভব। এর মূলে আছে এই কথাটি যে, ব্যষ্টির ব্যবহার যোগ বা জড়ো করে সমষ্টির ব্যবহার নির্ভুলভাবে বা সমস্তটুকু নির্ণয় করা যায় না। অথচ প্রকৃতি একদিকে ব্যষ্টি অপর দিকে সমষ্টিগতভাবে নিজেকে প্রকাশ করে। পদে পদে এই দুয়ের পার্থক্য আমাদের চোখে মারে। দু'চারটি কড়িং এক, ঝাঁকবাঁধা পঙ্গপাল আর এক। ইতস্ততঃ পথিক এক, সমবেত জনতা আর এক। কয়েকটি জলবিন্দু এক আকাশের মেঘ আর এক। কয়েকটি জলবিন্দু এক, আকাশের মেঘ আর এক। বাড়ীতে বা টোলে কয়েকটি ছাত্রের পড়বার ব্যবস্থা এক, কিন্তু সারা শহরের ছেলেমেয়েদের জন্যে স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় আর এক। গণিতে ব্যষ্টির স্থিতি ও গতির সূত্র উদ্ভাবন করেন গ্যালিলিও, নিউটন। সজোরে নিক্ষিপ্ত বা ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত, ঢিল, বন্দুক-কামানোর গুলিগোলা, বিলিয়ার্ডের বল, সূর্যের চারদিকে প্রদক্ষিণরত গ্রহ, ধূমকেতু প্রভৃতির গতিবিধি নিউটনের সূত্র প্রয়োগে নির্ধারণ করা যায়। কিন্তু গ্যাসের বেলায় প্রত্যেকটি গ্যাসবিন্দুর হিসাবনিকাশ করা ও তাদের যোগফল নির্ণয় করা সম্ভব নয়। এছাড়া একটা গ্যাসমণ্ডলীর এমন ব্যবহার আছে যা গ্যাস-অণুর ব্যবহারের অপেক্ষা রাখে না। গ্যাসের উত্তাপ ও চাপ আছে। উত্তাপ ও চাপ প্রত্যেকে একটা সামষ্টিক অভিজ্ঞান, ব্যষ্টিতে যা অর্থহীন। আর এক সামষ্টিক হিসাব হলো বেগের বণ্টন। খোলা গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে গাড়ী চালিয়ে যাওয়া যায় 60 মাইল বেগে, কিন্তু কলকাতায় চৌরঙ্গী রাস্তা দিয়ে গাড়ী চালাতে হলে গাড়ীর ভিড়ে একটা অস্পষ্ট চাপ চারদিক থেকে এসে বাধ্য করে বেগকে একটা সীমার মধ্যে রাখতে। গাড়ীগুলির মধ্যে আবার বেগের ক্রমানুযায়ী বণ্টন এসে পড়ে। চলন্ত গাড়ীর সমাবেশকে মনে করা যেতে পারে যেন গাড়ী-গ্যাস। গ্যাসের সমষ্টি গণিত পত্তন করেন ক্লসিয়াস ও ম্যাক্সওয়েল। এই গণিত প্রয়োগে গ্যাসের বেগ-বণ্টন ও অন্যান্য লক্ষণ অভ্রান্তভাবে নিরূপিত হলো। তেজঘটিত (Radiation) বণ্টন নির্ণয়ে সামষ্টিক সূত্র প্রণয়ন করেন লর্ড রেলে, বোলজ্‌ম্যান প্রমুখ বিজ্ঞানী। সেগুলির মধ্যে ত্রুটিবিচ্যুতি রয়ে গেল। বোস যে পদ্ধতিতে তাঁর সূত্র প্রণয়ন করলেন, তা হলো অভিনব ও ত্রুটিহীন।

বোলজ্‌ম্যানের সূত্রের অনুধাবনে প্লাঙ্ক এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হন যে, তেজোময় উত্তাপ হলো তেজ কণিকা বা তেজমাত্রার সমষ্টি, নাম দিলেন তার কোয়াণ্টাম। এই সিদ্ধান্ত তাঁর এমন বিসদৃশ বোধ হয়েছিল যে, প্লাঙ্ক তাকে পরিত্যাগ করতে দ্বিধা করেন নি। কিন্তু পরে আইনস্টাইন সেটি পুনরুদ্ধার করে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি দেখালেন আলোক ও তেজ উভয়ের গড়ন মাত্রিক। তরঙ্গরূপ ও মাত্রারূপ উভয়ের দুই রূপই আছে। আলোক মাত্রা বা আলোক কণিকার নাম হলো ফোটন।

এমন সময় বোস অবতারণা করলেন তাঁর সমষ্টি সূত্রের, যখন বিজ্ঞান অপেক্ষা করছিল সূত্রটির জন্যে।

ফোটন, ভেজাণু, ইলেকট্রন, প্রোটন প্রভৃতি কণিকাসমূহ সমবেত বিজ্ঞান প্রাঙ্গণে। তাদের পরিচালনার জন্যে চাই নিয়মের নিগড়, শৃঙ্খলার সামষ্টিক বিবিধ সূত্র। বোস-সমষ্টি সূত্রকে আইনস্টাইন সাদরে সম্ভাষণ করলেন ও স্বয়ং তাকে ইলেকট্রন গ্যাসে প্রয়োগ করে দেখালেন সূত্রটির ব্যাপকতা।

প্রখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক দ্য-ব্রগ্লি এই সকলের আখ্যা দিয়েছেন—বিজ্ঞানের বিপ্লব। তিনি নিজে দেখালেন আলোক যেমন তরঙ্গ ও কণিকা দুই রূপেই প্রকটিত হয়, ইলেকট্রনও তেমনি কণিকা ও তরঙ্গ দুই রূপেই প্রকটিত হতে পারে। জয়ধ্বজা ওড়ালো বোস-সমষ্টি সূত্র এই বিপ্লবে। এর পর ফের্মি ও ডিরাক আর এক সমষ্টি সূত্র প্রস্তাবিত করলেন, বোস-সূত্রের প্রদর্শিত পথে। ফলে বিজ্ঞানের কণিকাগুলি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত দেখা গেল। যারা বোস-সমষ্টি সূত্রের অধীন তাদের নাম হলো বোসন; আর যারা ফের্মি-ডিরাক সূত্রের অধীন, তাদের নাম হলো ফের্মিয়ন। যাদবপুর সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনের এক বক্তৃতায় ডিরাক বোস-সমষ্টি বিধির একটা বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছিলেন—মনে করা যাক, দুটি সমভূজ ছক আছে, যার মধ্যে তিনটি ঘুঁটিকে বসাতে হবে। বীজগণিতের হিসাব মতে আট রকম উপায়ে ঘুঁটিগুলি রাখা যায়, যদি তারা হয় রকমারি। যদি তারা একই রকমের অভিন্ন হয়, তবে রাখা যায় মাত্র চার উপায়ে। এই সামান্য ও সহজ সঙ্কেত থেকে অবশ্য বোস-সমষ্টিতত্ত্ব পরিস্ফুট হয় না। এটুকু বলা যথেষ্ট যে, এই রকম একটা স্বাধীন প্রাথমিক হিসেবের ভিত্তিকে অবলম্বন করে বোস-সমষ্টি সূত্রটি গঠিত হয়েছে।

ফ্রান্স ও জার্মেনীতে দু-বছর কাটিয়ে ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ফিরে এসে তিনি পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। ঢাকায় থাকাকালীন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁকে আমন্ত্রণ পাঠান বোলপুরে। স্বয়ং আইনস্টাইনের কাছে কবিবর শুনেছিলেন বোস-সমষ্টি সূত্রের কাহিনী। কবিগুরু পরে তাঁর রচিত "বিশ্বপরিচয়" উৎসর্গ করেন সত্যেন্দ্রকে। আমার মহাভাগ্য যে, বন্ধুবরকে উৎসর্গীকৃত বই কবিগুরু আমাকে পাঠিয়েছিলেন 'পরিচয়' সমালোচনার জন্যে। ইতিপূর্বে 'পরিচয়ের' পৃষ্ঠায় তিনি আমার 'বসু-সমষ্টি গণিত' পড়ে খুসী হয়ে তা আমাকে জানিয়েছিলেন যথাসময়ে 'পরিচয়ে' আমার লেখা 'বিশ্বপরিচয়ের' সমালোচনা প্রকাশিত হয়। পরে সত্যেন্দ্র শান্তি-নিকেতনের উপাচার্যের পদ অলঙ্কৃত করেন।

বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন ও তৈরী করে নিতে সত্যেন্দ্রের আগ্রহ বরাবরই ছিল সমধিক। বাল্যকালের কথা গোড়াতেই বলা হয়েছে। ঢাকায় থাকতে তাঁর পছন্দমত মেসিন প্রভৃতি [illegible] নিয়ে দিয়েছি যন্ত্র তৈরীর কারখানার জন্যে। কলকাতায় সায়েন্স কলেজে যোগ দিলে একটি এক্স-রে ক্যামেরা তৈরী করতে সাহায্য করেছি। আরও কত কি যন্ত্র ও ডিজাইন তৈরী করেছেন, তাঁর ছাত্রেরা তার বিবরণ দিতে পারবেন।

প্রজ্ঞাবান মানুষ বহু সাধ্যলব্ধ জাগতিক পরিচয় ও অভিজ্ঞতাকে সূত্রবদ্ধ করে। যাঁরা সূত্রদান করেন তাঁরা জগদ্বরেণ্য। গ্যালিলিও, নিউটন, ডালটন, লাপ্লাস, ম্যাক্সওয়েল, মেণ্ডেলেফ, আইনস্টাইন, কুরী, রাদারফোর্ড, বোর, দ্য-ব্রলি, ফের্মি, জলিও কুরী, ডিরাক, রামন, পলিং প্রভৃতি সূত্রকার। সত্যেন্দ্রও স্বল্পপরিসর একটি সূত্রদান করেছেন; তিনিও তাঁদেরই মধ্যে। গত চল্লিশ বছর সে সূত্র বিজ্ঞানের সাধনাকে সাহায্য করেছে বিজ্ঞানের অগ্রগতি সাধিত করেছে। আইনস্টাইন তাঁর সার্বিক আপেক্ষিকতা সম্প্রসারিত করে মহাকর্ষ বিদ্যুৎধর্ম চৌম্বকত্ব, ইলেকট্রন, প্রোটন, কোয়ান্টাম ও অন্যান্য কণিকা প্রভৃতি প্রকৃতির যাবতীয় সত্তাকে একটি মাত্র সার্বভৌমিক তত্ত্ব ও সূত্রে গাঁথতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রস্তাবিত সূত্রগুলি সংশয়প্রবণ ও অসম্পূর্ণ রয়ে গিয়েছিল। অদম্য সাহসিকতায় সত্যেন্দ্র এই সংশয় ও অসম্পূর্ণতা দূরীকরণের জন্যে কয়েকটি সমীকরণ অঙ্ক কষে পাঠান আইনস্টাইনকে। তিনি কিন্তু নিজের বা সত্যেন্দ্রের চেষ্টার ফল সম্বন্ধে নিঃসংশয় হতে পারেন নি। সত্যেন্দ্রের সমীকরণ ও প্রস্তাবগুলি আইনস্টাইনের তিরোধানের পর প্রকাশিত হয়েছে। ভবিষ্যতের গর্ভে রয়েছে তাদের সফলতার সমাধান। আমি অন্তরতঃ সর্বান্তকরণে আশা করি সত্যেন্দ্রর চেষ্টা জয়যুক্ত হবে।

জয়তু সত্যেন্দ্র, জীবতু শারদঃ শতং

[1964 খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী সংখ্যা 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' থেকে পুনর্মুদ্রিত]

বিজ্ঞান প্রবন্ধ

মহাবিশ্বের কেন্দ্র ও পৃথিবী

জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য *

ছেলেবেলায় গল্প শুনতাম যে সন্ধ্যা হলে ভগবান তারার চুমকি দেওয়া কালো পর্দা দিয়ে আকাশটাকে ঢেকে দেন। শিশুমনে ব্যাপারটা বিশ্বাসযোগ্য লাগত; এ যেন সুজনী দিয়ে সকালের বিছানাটি ঢেকে দেওয়া। অনন্ত অসীম মহাকাশের কল্পনা করা শক্ত ছিল; রাতের কালো আকাশকে পর্দার মত ভাবা অনেক সহজ লাগত।

মাত্র দু শ বছর আগেও প্রায় সব মানুষের বিশ্বাসই এই রকমই ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে উইলিয়াম হার্শেল (William Herschel) যখন শনিগ্রহের চেয়েও দূরের নতুন গ্রহ ইউরেনাস আবিষ্কার করেছিলেন, তখনকার একটি ছবিতে সাধারণ মানুষের কাছে তাঁর আবিষ্কারের রূপটি দেখানো হয়েছিল। বিরাট একটা গম্বুজের ভিতরকার দেয়ালে গ্রহ-তারা আঁকা রয়েছে। আর একটি মানুষ তার এক কোণের পর্দা সরিয়ে বাইরের আকাশ দেখছে।

চিত্র—1
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকের একটি ছবি। ইউরেনাসের আবিষ্কার।

রাতের কালো আকাশটা যে একটা পর্দার মতন নয় এ সন্দেহটা অনেক দিন থেকেই বিজ্ঞানীদের মনে ছিল। গ্রহগুলি যে অনেক কাছের জিনিষ, একথাটা তাঁর আগেই পরিষ্কার বুঝেছিলেন নিকোলাস কোপার্নিকাস, আর তাঁর পরের কয়েকজন জ্যোতির্বিদ, কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ায় ব্যাপারটাকে জনসাধারণের কাছে বোঝাতে গিয়ে গ্যালিলিও বেশ বিপদে পড়েছিলেন। গ্যালিলিওর বৈজ্ঞানিক দূরদৃষ্টি ছিল, কিন্তু তাঁর দুরদৃষ্ট হচ্ছে যে তিনি জন্মেছিলেন জনসাধারণের বৈজ্ঞানিক সত্য মেনে নেওয়ার মত জন্য প্রস্তুতির কিছু আগে। গ্যালিলিও মারা গিয়েছিলেন 1642 খ্রীস্টাব্দে, ঠিক যে বছর আইজাক নিউটন জন্মগ্রহণ করেন। নিউটন যখন প্রমাণ করে দিলেন যে তারাগুলি গ্রহগুলির চেয়েও অনেক অনেক দূরে। তখন কোনও বিপরীত জনমতের সম্মুখীন হতে হয় নি তাঁকে।

তবু তারাগুলি যে মহাশূন্যে কোনও বিশেষ আয়তনের মধ্যে আবদ্ধ রয়েছে, সে প্রশ্নটি বিজ্ঞানীদের মনে আসতে আরও এক-শ বছর লেগেছিল। প্রশ্নটি তুলে তার উত্তর খুঁজেছিলেন উইলিয়াম হার্শেল। হার্শেল ইংল্যাণ্ডে এসেছিলেন রাজা দ্বিতীয় জর্জের সেনাবাহিনীর বাদক হিসাবে, তাঁর পূর্বপুরুষের দেশ হ্যানোভার থেকে। কিন্তু তাঁর অদম্য কৌতূহল ছিল আকাশ নিয়ে, যার জন্য নিজের হাতে টেলিস্কোপ গড়ে তাঁর বাড়ীর পিছনের বাগানে রাতের পর রাত গ্রহ-তারাগুলির স্বরূপ বোঝবার চেষ্টা করতেন। তাঁর ইউরেনাস আবিষ্কারের মূলে ছিল আকাশ সম্বন্ধে তাঁর গভীর জ্ঞান। কারণ জ্যোতিবিদ্যার ইতিহাসের পাতা উল্টে দেখা যায় যে এই নতুন গ্রহটি হার্শেলের আবিষ্কারের আগে অন্ততঃ বার পাঁচেক দেখা গিয়েছিল। কিন্তু প্রতিবারই এটিকে একটি নক্ষত্র বলে ভুল করা হয়েছিল। উইলিয়াম হার্শেল কিন্তু সে ভুল করেন নি, তিনি নিশ্চিত জানতেন যে সেইখানকার তারা

* ইণ্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব অ্যাস্ট্রোফিজিক্স, ব্যাঙ্গালোর—560034

মণ্ডলে এই রকম কোনও তারা নেই।

হার্শেল বহু তারার পর্যবেক্ষণের পরে সিদ্ধান্ত করলেন যে আকাশের তারাগুলি সর্বব্যাপী মহাশূন্যে একটা চাক্তির মত জায়গায় আবদ্ধ রয়েছে। সূর্য তাদের মধ্যে একটি; কিন্তু তাঁর ধারণা হয়েছিল যে সূর্যের অবস্থান চাক্তিটির কেন্দ্রস্থলে। তাঁর ধারণার কারণ ছিল এই যে আমরা দেখতে পাই, যে ছায়াপথের তারার ভীড় সারা আকাশকে বেষ্টন করে রেখেছে। টেলিস্কোপের মধ্য দিয়ে ক্ষীণ তারাগুলি
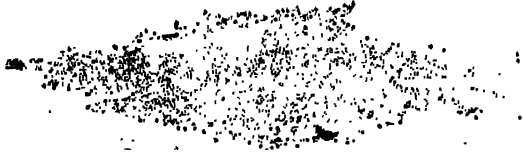
চিত্র—2
উইলিয়াম হার্শেলের কাল্পনিক বিশ্বজগৎ।

গুণলে ছায়াপথের সব দিকেই সমান ভীড় দেখা যায়। ছায়াপথ ছেড়ে ছায়ামেরুর (Galactic Pole) দিকে গেলে তারার ভীড় আস্তে আস্তে কমে যায়; উত্তরে বা দক্ষিণে কমার ধারা একই রকম। কিন্তু ছায়াপথের বেষ্টনীর যে দিকেই দেখি না কেন সব দিকেই প্রতি বর্গ ডিগ্রীতে ক্ষীণ তারার সংখ্যা প্রায় সমান। এ ব্যাপার সম্ভব যদি সূর্য এবং তার চারিদিকে আবর্তমান সৌরজগতের অবস্থান চাক্তিটির ঠিক মাঝখানে হয়।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে মানুষের ধারণা ছিল পৃথিবীই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র; সূর্য, তারা, গ্রহ সবই এর চারপাশে ঘুরছে। এই বিশ্বাসের মূলে সবচেয়ে বড় আঘাত প্রথমে দিয়েছিলেন কোপার্নিকাস; তাঁর মতবাদ মেনে নিতে অনেক সময় লেগেছিল পৃথিবীর মানুষের। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র তাদের গ্রহ থেকে সরে চলে গিয়েছিল সূর্যে, তবুও সূর্য আমাদেরই একান্ত আপন। দুনিয়ার সব কিছুই যদি সূর্যকে ঘিরে চলে, তবে বুঝতে হয় বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে সূর্য আর তাকে ঘিরে সৌর জগতের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। হার্শেলের সিদ্ধান্তটি বিশ্বাসটিকে আরও দৃঢ় করেছিল; শুধু গ্রহগুলি নয়, লক্ষ লক্ষ তারাও সূর্যকে ঘিরে রয়েছে।

কিন্তু গণ্ডগোল শুরু হল ঊনবিংশ শতাব্দীর দিকে। জ্যোতির্বিজ্ঞানে ফোটোগ্রাফির প্রচলনের সঙ্গে। এর আগে জ্যোতির্বিদরা চোখে দেখতেন। আর জ্যোতিষ্কগুলির ছবি এঁকে রাখতেন। বড় টেলিস্কোপের মধ্য দিয়ে ক্ষীণ জ্যোতিষ্কগুলি আবছাভাবে তাঁদের নজরে পড়ত। চোখের দৃষ্টি যতই তীক্ষ্ণ হোক না কেন, দৃষ্টিপটে তৈরী ছবিটি এক সেকেণ্ডের দশভাগের মধ্যেই মিলিয়ে যায়। না হলে অবশ্য বেশ মুস্কিল হত, সিনেমা টেলিভিসন কিছুই চলত না, এমন কি আমাদের চোখে দেখে চলাফেরাও বেশ কঠিন হত। অন্যদিকে ফোটোগ্রাফিক প্লেটে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ক্ষীণ জ্যোতিষ্কগুলির আলোকে জড়ো করে রাখা যায়। এর ফলে ফোটোগ্রাফিতে এমন অনেক জিনিষ ধরা পড়তে লাগল যা আগে নজরে আসে নি। ছায়াপথের বেষ্টনীর উত্তরে দক্ষিণে নজরে এল হাজার হাজার নতুন আকারের ক্ষীণ জ্যোতিষ্ক। তারাদের মত সূক্ষ্ম আলোক বিন্দু এরা নয়, ছড়ানো আলোর মেঘের টুকরো, তাদের মধ্যে ছোট্ট আলোর ঘূর্ণীর মত মেঘের সংখ্যা অগণ্য। আবার এই আকৃতির বড় বড় কয়েকটি নীহারিকার অস্তিত্বও ধরা পড়ল। ফোটো-গ্রাফিক প্লেটের মধ্যে বহুদিনের পরিচিত অ্যান্ড্রোমিডা নীহারিকার চেহারায় দেখা গেল এটির আকৃতিও একটি সর্পিল ঘূর্ণাবর্তের (Spiral vortex) মত। সমস্তগুলি যেন এক নতুন শ্রেণীর জ্যোতিষ্ক; তখন বোঝা যায় নি
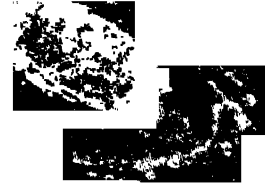
চিত্র—3
একটি সর্পিল তারাজগৎ।

যে এগুলি প্রত্যেকটিই আমাদের ছায়াপথ নীহারিকার মত এক একটি তারা জগৎ। বহু বহু দূরে থাকার জন্য এত ছোট দেখায়।

ততদিনে মাউণ্ট উইলসনের এক-শ' ইঞ্চি টেলিস্কোপটি কাজ চালু করেছে। এই যন্ত্রের সাহায্যে কয়েকজন বিজ্ঞানীর সম্মিলিত চেষ্টায় আমাদের ছায়াপথ তারা-জগতের বাইরে মহাবিশ্বের রূপ প্রকাশ পেল। কিন্তু তখনও আমাদের ছায়াপথের জগৎটিকে আমরা ভাল করে চিনতে পারি নি। আমরা আমাদের সূর্যকে ভেবেছিলাম বিশ্বের কেন্দ্র বলে। সে বিশ্বাসে ভাঙ্গন

ধরার এক তরুণ অ্যামেরিকান বিজ্ঞানী—হার্লো শ্যাপ্লি (Harlow Shapley)। কাল 1920 খৃষ্টাব্দ।

শ্যাপ্লি বুঝতে পেরেছিলেন যে ছায়াপথের বেষ্টনীর মধ্যে ক্ষীণ তারা গুণে আমাদের অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভব নয়, কারণ ছায়াপথের সমতলে অসংখ্য তারার মাঝে মাঝে রয়েছে ধূলির রাশি আর বায়বীয় পদার্থের মেঘ। এরা আমাদের দৃষ্টিকে বেশীদূর এগোতে দেয় না। আমরা ছায়াপথের বেষ্টনীতে যে তারাগুলি দেখছি, সেগুলি খুব বেশী দূরের নয়; এমন জিনিষ খুঁজতে হবে যা বহুদূর থেকে দেখা যায়।

জ্যোতিবিজ্ঞানে তখন দ্রুত অগ্রগতির যুগ। হল্যাণ্ডের এব্নার হার্জস্প্রুং (Ebner Hertzsprung) এবং অ্যামেরিকার হেনরি নরিস রাসেল (Henry Norris Russel) আকাশের তারাগুলিকে তাঁদের উদ্ভাবিত ছকে ফেলে দেখিয়ে দিয়েছেন, যে ছোট বড় সব তারাই প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম মেনে চলে। তারাগুলির আলোর বর্ণলিপিতে রয়েছে এদের মধ্যেকার পঞ্চভূতের খবর—উপাদানের বৈশিষ্ট্য, গতি, তাপমাত্রা চৌম্বক ক্ষেত্র ইত্যাদির বহু তথ্য, যা থেকে পদার্থবিদ্যার নিয়মানুসারে এদের
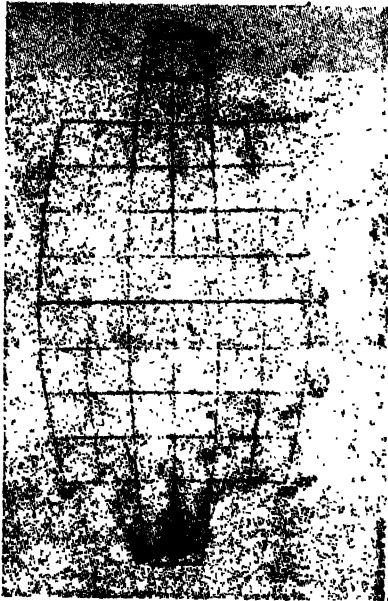
চিত্র 4

আকাশের তারাজগৎগুলির অবস্থান।

ছায়াপথের বেষ্টনীতে কোনও দূরের তারাজগৎ দেখা যায় না।

আয়তন, ঔজ্জ্বল্য বা বয়স নির্ণয় করা যায়, এবং এই সব থেকে এদের প্রকৃত দূরত্ব জানা যায়। শুধু প্রয়োজন হবে এক বিশেষ শ্রেণীর উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের সন্ধান করে তাদের বর্ণলিপির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করা, যা থেকে এদের দূরত্ব নির্ণয় করে ছায়াপথ তারা জগতের মধ্যে এগুলির অবস্থান স্থির করা সম্ভব হবে। যদি সূর্য এই তারাজগতের কেন্দ্রে থাকে তো সব দিকেই এদের সংখ্যা সমান হবে; না হলে এদের বিন্যাসে অসমতা দেখা যাবে।

এই পরীক্ষার জন্য শ্যাপ্লি বেছে নিয়েছিলেন আকাশের এক বিশেষ শ্রেণীর জ্যোতিষ্কগুলিকে, যাদের আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক নাম Globular Cluster, বাংলায় বর্তুলপুঞ্জ বা বর্তুল তারাপুঞ্জ বললে নামটি মানানসই হবে। এগুলি দশ বিশ হাজার তারার এক-একটি জমাট সমষ্টি, প্রায় নিখুঁত বর্তুলাকৃতি। কতকগুলি বড় বর্তুলপুঞ্জে লক্ষাধিক তারা আছে অনুমান করা হয়। এগুলির ঔজ্জ্বল্য স্বভাবতই সাধারণ তারাদের চাইতে কয়েক সহস্রাধিক গুণ বেশী, এবং অনেক বেশী দূর থেকে দেখা সম্ভব। তাছাড়া অন্য তারাদের মত এগুলি ছায়াপথের সমতলের মধ্যেই আবদ্ধ নয়, বরং সারা ছায়াপথ তারাজগৎটিকে ঘিরে যে বিস্তীর্ণ মণ্ডল (halo) রয়েছে তার মধ্যে সুসমভাবে ছড়ানো। এগুলিকে দেখতে গেলে তাই ছায়াপথের সমতলের ধোঁয়াটে মেঘের মধ্য দিয়ে দেখতে হয় না। উচ্চ অক্ষাংশের অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছ অঞ্চলের মধ্য দিয়ে বহুদূর পর্যন্ত আমাদের দৃষ্টি প্রসারিত থাকে।

চিত্র—5

বর্তুল পুঞ্জ।
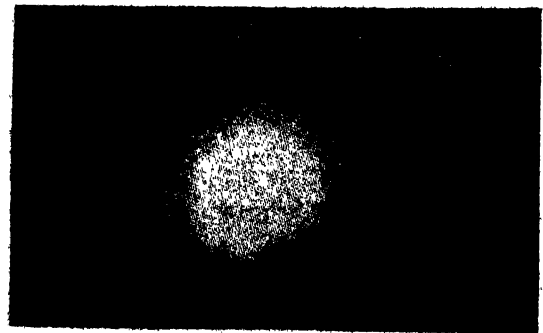
শতাধিক বর্তুলপুঞ্জের দূরত্ব মেপে শ্যাপ্লি দেখালেন যে ছায়াপথে যে অংশটিকে খালি চোখে সবচেয়ে ঘন লাগে, সেইদিকে এগুলির ভীড় বেশী। আর যদি এগুলির দূরত্ব ও দিক যথাযথ বিচার করে দশদিক ব্যাপী

মহাশূন্যে সাজানো হয়, তখন দেখা যায় যে এগুলি ছায়াপথ তারাজগতের মূল চাকতিটিকে ঘিরে রয়েছে। আমাদের পৃথিবী সমেত সূর্য রয়েছে বেশ এক কোণে। অর্থাৎ সূর্য ছায়াপথ তারাজগতের মধ্যমণি ত নয়ই, বরং কেন্দ্র থেকে এর ব্যাসার্ধের দুই-তৃতীয়াংশ দূরে লক্ষ লক্ষ তারার ভিড়ের মধ্যে নগণ্য অতি সাধারণ একটি তারা।

চিত্র—6
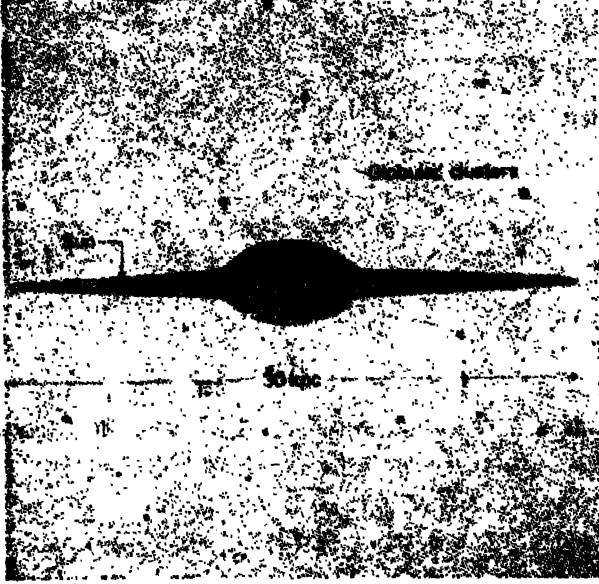
শ্যাপ্লির পরীক্ষার পর ছায়াপথ তারা জগতের আকৃতি

বিশ্বজগতের কেন্দ্র তাই আবার আমাদের পৃথিবী থেকে আরও দূরে সরে গেল; আমাদের কাছাকাছি তারা জগতের কেন্দ্র এখন দাঁড়াল ছায়াপথের মধ্যিখানে। আমাদের পৃথিবী বা সূর্যের থেকে প্রায় পঁচিশ হাজার আলোক বৎসরেরও বেশী দূরে। পৃথিবীর মানুষের মনে যে অহংকারের ফানুস ছিল, যে তাদের ঘিরেই বিশ্বসৃষ্টি হয়েছে, সেটুকু চুপসে গেল। ছায়া জগতের তারার সমাজে সূর্যের মাপ বেশ কমই, ঔজ্জ্বল্যের মানও নীচু, আর অবস্থানও বাইরের পংক্তিতে।

তবুও শেষ আশা মানুষের। এতদিনে বড় বড় টেলিস্কোপে আরও অসংখ্য বাইরের তারা জগতের অস্তিত্ব ধরা পড়েছে; এমন কি হতে পারে না যে আমাদের ছায়াপথ তারাজগৎ এই মহাবিশ্বের ঠিক মধ্যিখানে রয়েছে? ছায়াপথের বেষ্টনী ছাড়া যে দিকেই দেখা যায়, তাদের সমান ভীড়; তাছাড়া দেখা গেছে সবগুলিই আমাদের থেকে প্রচণ্ড গতিতে দূরে সরে যাচ্ছে। যে কোনও দিকেই দেখি না কেন, এর ব্যতিক্রম দেখা যায় না বললেই চলে। বিশ্ব সৃষ্টির আদিম মহাবিস্ফোরণের মতবাদ (Big Bang Theory) যদি মেনে নেওয়া হয়, তাহলে কি আমরা মনে করতে পারি না যে আমাদের ছায়াপথ তারাজগৎ সব কিছুর মাঝখানে রয়েছে, এবং অন্যান্য তারাজগৎগুলি ক্রমশঃ আরও দূরে সরে যাচ্ছে?

বারবার ভুল করে বিজ্ঞানীরা এবার সাবধান হয়ে গেছেন। মহাবিশ্বের পৃথিবী, সূর্য বা ছায়াপথ তারাজগৎ কোনও বিশিষ্ট অবস্থানে আছে কিনা তার উত্তর দেওয়ার আগে একটি মৌলিক প্রশ্নের বিচারের বিশেষ প্রয়োজন। প্রশ্নটি হল বিশ্ব সৃষ্টির পরিকল্পনার মধ্যে আমাদের অর্থাৎ পৃথিবীর মানুষের আদৌ কোনও গুরুত্ব আছে কিনা? পক্ষপাতিত্বহীন ভাবে বিচার করতে গেলে এরকম বিশ্বাসের কোনও যুক্তি নেই। আমাদের অনুভূতিতে যে আপাত মাপগুলি কাছের জ্যোতিষ্কগুলিকে বড় এবং উজ্জ্বল প্রতীত করে—মনোরথে মহাবিশ্বে অন্য কোনও প্রান্ত থেকে দেখলে সেগুলি আরও লক্ষ লক্ষ জ্যোতিষ্কপুঞ্জের মতই ক্ষীণ লাগবে; এমন কি পদার্থবিদ্যার মৌলিক মাপ-গুলিরও আপাত পরিবর্তন ঘটবে। জ্যোতির্বিদ্যার যে বিভাগে এই সব প্রশ্ন গুলির আলোচনা করা হয়ে থাকে সেটি হল মহাবিশ্ব বিজ্ঞান (Cosmology), যার পট-ভূমিকায় আমাদের নিত্যকার অনভূতি ঠিক সরাসরি প্রযোজ্য হয় না। আইনস্টাইন তাঁর সাধারণ আপেক্ষিকতা বাদের (General Theory of Relativity) সূত্রগুলিতে এগুলির বিচার শুরু করেছিলেন। তার পর বহু মনীষী প্রশ্নগুলির গভীর পর্যালোচনা করেছেন। বিচারগুলি মূলতঃ গাণিতিক; হিসাব করা তথ্যগুলি আমাদের সাধারণ অনুভূতি ও বিচারের সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না, তাই মেনে নিতে একটু দ্বিধা আসে। যেমন সাধারণ ভাবে আমরা যে অবস্থানকে মহাবিশ্বের কেন্দ্র বলছি, সেরকম কোনও অবস্থানের আদৌ অস্তিত্ব আছে কিনা তাই নিয়ে সংশয় এসে যায়। কিন্তু বিজ্ঞানের বহু পরীক্ষার ফলের ব্যাখ্যা করতে গেলে এ ছাড়া কোনও উপায়ও আজ পর্যন্ত জানা যায় নি।

যাই হোক, মহাবিশ্ব বিজ্ঞানের গভীর প্রশ্নগুলি ছেড়ে দিলেও আমাদের ছায়াপথ তারাজগৎ যে মহাবিশ্বের কেন্দ্রে রয়েছে, এরকম বিশ্বাসের কোনও ভিত্তি নেই। আমাদের পর্যবেক্ষণের যে দুটি ফলের উপর নির্ভর করে এই বিশ্বাসের দাবী করা যেতে পারে, তাদের অন্য ব্যাখ্যা সম্ভব। চারপাশে বাইরের তারাজগৎদের সমান ভীড় এবং তাদের প্রচণ্ড বহির্গতি মহাবিশ্বের যে কোনও স্থান থেকে পর্যবেক্ষণ করলেই পাওয়া যাবে। তার জন্য আমাদের মহাবিশ্বের কেন্দ্রে থাকার কোনও প্রয়োজন নেই।

তাই সংক্ষেপে বলতে গেলে, পৃথিবী, সূর্য বা আমাদের ছায়াপথ তারাজগৎ কেউই মহাবিশ্বের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত নয়। অনন্ত মহাবিশ্বের অসংখ্য বস্তুপিণ্ডগুলির ভীড়ের মধ্যে আমাদের অবস্থানের কোনও বৈশিষ্ট্যই নেই। মহাবিশ্বের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের এই গভীর সত্যটি আধুনিক দার্শনিক চিন্তাধারাকে বিশেষ প্রভাবিত করেছে। আমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মেষের জন্য মানুষের অহমিকার উপর এই আঘাতটুকুর বিশেষ প্রয়োজন ছিল বলে আমার মনে হয়।

সালোকসংশ্লেষ

চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

[সালোক সংশ্লেষ জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলির অন্যতম প্রধান বিক্রিয়া। সৌরশক্তি কিভাবে শোষিত হয় তা' আজও অনাবিষ্কৃত, তা নিয়ে গবেষণারও শেষ নই। বর্তমান প্রবন্ধে প্রাথমিক ধ্যান-ধারনার সঙ্গে সঙ্গেই জীবপদার্থ-বিদদের নূতনতম ধারণাগুলি বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। যেখানে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার প্রয়োগ একটি উল্লেখ্য দিক]

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভান হালমন্ট (Van Halmant) উদ্ভিদের খাদ্যগ্রহণ সম্পর্কে প্রথম পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত করেন যে গাছ জল ও মাটি থেকে পুষ্টিলাভ করে। পরবর্তীকালে স্টিফেন হেলস্ (Stephen Hales) পরীক্ষা করে বলেন যে সবুজ উদ্ভিদ পাতার সাহায্যে খাদ্যগ্রহণ করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে প্রিস্টলে (Priestley) ইনজেনহজ্ (Ingenhousz) মেয়ার (Mayer) প্রমুখ বিভিন্ন বিজ্ঞানীর অনলস পরিশ্রম থেকে জানা যায় উদ্ভিদ কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জলের বিক্রিয়ায় সূর্যশক্তির উপস্থিতিতে খাদ্য তৈরি করে। বস্তুত আলোক শক্তি রাসায়নিক শক্তিতে উদ্ভিদ-দেহে সঞ্চিত হওয়ায় এই পদ্ধতিকে তখন থেকেই সালোকসংশ্লেষ বা ফটোসিনথেসিস [Photo-আলো Synthesis—সংশ্লেষ] বলা হয়। 1887 খৃস্টাব্দে স্যাক (Sach) ও অন্যান্য বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় প্রমাণিত হয় পাতার মেসোফিল কলার অন্তর্গত ক্লোরোপ্লাস্টই সালোকসংশ্লেষ পদ্ধতির কেন্দ্রস্থল।

সালোকসংশ্লেষ হচ্ছে জীবনের মূল প্রক্রিয়াগুলির অন্যতম প্রধান জীবরাসায়নিক বিক্রিয়া। কারণ,

ক) সৌরশক্তি উদ্ভিদ দেহে এই পদ্ধতির মাধ্যমেই সঞ্চিত থাকে।

খ) অজৈব পদার্থ থেকে জৈব পদার্থ তৈরি হয়।

গ) বায়ুর CO_2 ও O_2-এর ভারসাম্য রক্ষিত হয়।

এই পদ্ধতিটি হচ্ছে একটি জটিল জৈব রাসায়নিক । আলোর উপস্থিতিতে ক্লোরোফিল প্রথমে সক্রিয় ক্লোরোফিলে পরিণত হয় এবং সক্রিয় ক্লোরোফিল জলকে বিশ্লিষ্ট করে কার্বোহাইড্রেট জাতীয় উপাদানের প্রয়োজনীয় হাইড্রোজেন সরবরাহ করে। এই জাতীয় উপাদানের অক্সিজেন ও কার্বন বায়ুর কার্বন ডাই-অক্সাইড থেকে সংগৃহীত হয়। জলের অক্সিজেন বাইরে বেরিয়ে আসে। প্রয়োজনীয় রাসায়নিক বিক্রিয়াটি নীচের মত

$$6CO_2+12H_2O=C_6H_{12}O_6+6H_2O+6O_2+ \text{শক্তি}$$
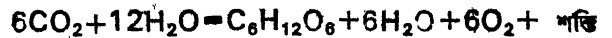
[আলো+ক্লোরোফিল]

সালোকসংশ্লেষ পদ্ধতিতে আলোক শক্তি 10^{-15} সেকেণ্ড থেকে 10^{-9} সেকেণ্ডের মধ্যে গাছের পাতায় শোষিত হয় এবং বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ হিসাবে সবুজ উদ্ভিদে সঞ্চিত হয়। মূল পদ্ধতির বিশদ বিবরণে না গিয়ে বর্তমান প্রবন্ধে কয়েকটি নূতন ধারণার কথা আলোচনা করব। ক্লোরোফিলের গঠন সম্পর্কে প্রথম ধারণা দেন রিচার্ড উইলস্টাটার (Richard Willstatter) ও হান্স ফিসার (Hans Fisher) নামক দুই জার্মান রসায়নবিদ এবং হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রবার্ট উডওয়ার্ড (Robert B. Woodword)। এই গঠন বিজ্ঞানীমহলে সুবিদিত ও স্বীকৃত।

পাতার ক্লোরোফিল মূলত তিন ধরনের রঙীন কণার দ্বারা গঠিত। ক্লোরোফিল-a সালোকসংশ্লেষে সক্ষম। ব্যাক্টেরিয়া বাদে সকল ধরনের সবজ উদ্ভিদে পাওয়া

* পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান

যায়। মূলত ক্লোরোফিল-a-এর সাহায্যেই সালোক সংশ্লেষ পদ্ধতি সংঘটিত হয়। এছাড়া কিছু ভিন্ন জাতীয় ক্লোরোফিল হচ্ছে ক্লোরোফিল-b সেগুলো উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদ এবং সবুজ শৈবালে পাওয়া যায়। ক্লোরোফিল-c ডায়াটম (diatom) নামক উদ্ভিদে ও বাদামী শৈবালে এবং ক্লোরোফিল-d পাওয়া যায় লাল শৈবালে।

চিত্র-1-এ ক্লোরোফিল-a ও b-এর গঠন দেখানো হয়েছে যা মূলত পরফাইরিন (Porphyrin) গঠন যুক্ত। এখানে চারটি পাইরল (Pyrrole) শৃঙ্খল CH বন্ধনী দ্বারা যুক্ত এবং মধ্যে রয়েছে ম্যাগনেসিয়াম। এছাড়া রয়েছে কার্বনের একটি লম্বা শৃঙ্খল যার নাম ফাইটল (Phytol) শৃঙ্খল। মূল পরফিন গঠনের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় যে ক্লোরোফিল-a এর ক্ষেত্রে পাইরল (Pyrrole) শৃঙ্খলটি অনুপস্থিত (চিত্রে iv চিহ্নিত) এছাড়া v চিহ্নিত শৃঙ্খলটির সঙ্গে কার্বনিল শ্রেণী যুক্ত এটিও লক্ষণীয়। বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে এই অংশটিই আলোকসচেতক।

ক্লোরোফিল গঠনে মূল ভূমিকা কেন্দ্রস্থিত ম্যাগনেসিয়াম ধাতুর। হিমোগ্লোবিনের ক্ষেত্রে ঐ স্থানটি আয়রন দ্বারা অধিকৃত এবং আমরা জানি আয়রন ফেরিক (Fe^{3+}) এবং ফেরাস (Fe^{2+}) এই দুই জারণ অবস্থায় (Oxidation State) থাকতে পারে। এই দুই অবস্থায়

চিত্র—1

ক্লোরোফিল-a গঠন। CH^3 অংশটি ক্লোরোফিল-b-এর ক্ষেত্রে CHO দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে।

অনুঘটন ক্রিয়া সম্বন্ধে তথ্যাদি বিজ্ঞানীদের জানা কিন্তু ম্যাগনেসিয়ামে এধরনের ধর্ম নাই। পরীক্ষায় এও জানা গেছে ম্যাগনেসিয়ামের অনুপস্থিতিতে সবুজ উদ্ভিদের বৃদ্ধি হয় না ও উদ্ভিদ মারা যায় অর্থাৎ ম্যাগনেসিয়ামই ক্লোরোফিল গঠনে মুখ্য কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

এখন প্রশ্ন হল এই পদ্ধতিতে ম্যাগনেসিয়ামের ভূমিকা কি? ম্যাগনেসিয়ামের জারণ বিক্রিয়া $Mg \rightarrow Mg^{++} + 2e$ দ্বারা প্রকাশ করা যায়। Mg-এর ইলেকট্রন বিন্যাস $1S^2$ $2S^2$ $2p^6$ $3S^2$ এবং গ্রাউণ্ড স্টেট (ground state) ^1s আবার Mg^{++} এর ইলেকট্রন বিন্যাস $1S^2$ $2S^2$ $2p^6$ এক্ষেত্রেও গ্রাউণ্ড স্টেট ^1s যেখানে গ্রাউণ্ড স্টেটকে সহজ কথায় বলা যায় যে ইলেকট্রন বিন্যাস থেকে প্রাপ্ত ন্যূনতম শক্তির স্তর যা হুণ্ডের নিয়ম (Hund's rule) প্রয়োগ করে সহজেই নির্ধারণ করা যায়। এইসব আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে Mg ও Mg^{++} তিরশ্চৌম্বক (diamagnetic) ধর্মযুক্ত। কিন্তু পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে ক্লোরোফিল গঠনে Mg-তে একটি অযুগ্ম ইলেকট্রন আছে অর্থাৎ ম্যাগনেসিয়াম Mg^{+} হিসাবে অবস্থান করে যার অর্থ ক্লোরোফিল গঠনে Mg পরাচুম্বক ধর্ম (Paramagnetic) দেখায়। এই আলো-

চলার এটাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক। পর্যায় সারণীতে সোডিয়াম ম্যাগনেসিয়ামের ঠিক পূর্ববর্তী ধাতু এবং $Mg^{+} \equiv Na$ রূপে কল্পনা করা যেতে পারে। সোডিয়াম জলের সঙ্গে তীব্র ভাবে বিক্রিয়া করে হাইড্রোজেন তৈরি করে $2Na+2H_2O=2NaOH+H_2$ +শক্তি।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন ম্যাগনেসিয়ামও এই জাতীয় বিক্রিয়ায় জলকে বিশ্লিষ্ট করে ও প্রয়োজনীয় হাইড্রোজেন সরবরাহ করে। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে ম্যাগনেসিয়াম কিভাবে Mg^{+}এ পরিণত হয়। কারণ যেখানে Mg-এর আয়নন বিভব (ionisation potential) 7·644 ইলেকট্রন ভোল্ট কিন্তু সৌরশক্তি মাত্র 1.8 ইলেকট্রন ভোল্ট বিভব সরবরাহ করে। এই প্রসঙ্গে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার সাহায্য প্রয়োজন।

a, b, c, d চারটি পরমাণুর কথা ধরা যাক যাদের শক্তি যথাক্রমে E_a, E_b, E_c, E_d, এবং যারা মিলে একটি আণবিক সংস্থা (অর্থাৎ অণু) তৈরি করেছে যার শক্তি E_0. কোয়ান্টাম বলবিদ্যার মূল তত্ত্ব থেকে সহজেই বলা যায় প্রতিটি পরমাণুর শক্তি অপেক্ষা আণবিক সংস্থার শক্তি কম হবে অন্যথায় অণুর গঠন সম্ভব হবে না। এখন প্রতি পরমাণুর শক্তি আণবিক সংস্থার শক্তি অপেক্ষা কত বড় হবে তা নির্ভর করবে ঐ পরমাণুগুলির পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও তাদের শক্তি পার্থক্যের উপর এবং এই বাড়তি শক্তিই অণু গঠনের সম্ভাবনা নির্ধারণ করবে। এই বাড়তি শক্তিই বিজ্ঞানীদের ভাষায় অণুনাদী শক্তি (Resonant energy), ক্লোরোফিলের ক্ষেত্রে চারটি পাইরল (Pyrrole) শৃঙ্খল এই অণুনাদী শক্তির উৎস যা আয়নন বিভব 7·6 ইলেকট্রন ভোল্ট বা তারও বেশী ক্লোরোফিলে সরবরাহ করে ও ম্যাগনেসিয়ামকে সক্রিয় করে।

ম্যাগনেসিয়ামের এই ভূমিকা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে সৌর বিকিরণের লোহিত অংশ Mg-এর 3s অযুগ্ম ইলেকট্রনকে উদ্দীপিত করে ত্রিপদী (triplet) অবস্থায় নিয়ে যায়, এই উদ্দীপিত ইলেকট্রন যখন আবার গ্রাউণ্ড স্টেটে (ground state) ফিরে আসে তখন প্রচুর পরিমাণ শক্তি বেরিয়ে আসে আর এই শক্তি জলকে বিশ্লিষ্ট করে ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের সঙ্গে হাইড্রোজেনকে যুক্ত করে কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করে।

সম্পূর্ণ অজৈব পদার্থ থেকে সবুজ উদ্ভিদ যে পদ্ধতিতে জৈব পদার্থ তৈরি করে চলেছে এবং সূর্যালোক শোষণ করে সমগ্র জীবজগতকে বাঁচিয়ে রেখেছে তার কলাকৌশল এখনো নিশ্চিত পরীক্ষিত ও প্রমাণিত হয় নি। বিজ্ঞানীরা মনে করেন সৃষ্টির আদিতে এই রকম কোন পদার্থিক প্রক্রিয়ায় জৈব ও অজৈব পদার্থ থেকেই জীবনের সৃষ্টি। সালোকসংশ্লেষ পদ্ধতি নিশ্চিত ভাবে আবিষ্কৃত হলে জীবজগতের সৃষ্টি রহস্যের সমাধান হবে আর সেই সঙ্গে পৃথিবীতে শক্তির অভাবও থাকবে না।

গ্রন্থপঞ্জী :

1. Rabino Witch and Irovindjee....Photosynthesis, Wiley Eastern Pvt. Ltd, New Delhi-1973.
2. Condon & Shortley....Theory of Atomic Spectra....Cambridge University press-1957.
3. B. N. Figgis Introduction to Zigand fields, Wiley Eastern Ltd-1966.
4. Eyring, Walter and Kimball....Quantum Chemistry, John Wiley-1944.
5. Rabino Witch E.....Photosynthesis & Related Processes Vol. I & II, Wiley Inter Science N Y-1955
6. On the mechanism of Photosynthesis A. S. Chakravorty, Speculations in Science & Technology Vol-5 No-1
7. Rosenberg B. & Camincoli....Journal of Chemical physics, Vol-35 p-982-991. 1961.

দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল ও পরিবেশ দূষণ

বিশ্বনাথ ঘোষ ও গোপাল চন্দ্র ভৌমিক *

● আজ থেকে ত্রিশ বছর আগে দুর্গাপুরের চারপাশে ছিল শাল-পিয়াল-অর্জুনের নিবিড় অরণ্য। এক দুর্গম বনবাংলার মধ্যে নব বাংলার রূপকার তদানীন্তন মুখ্য মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় একদিন স্বপ্ন দেখেছিলেন দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের। যেখানে শোনা যেত বাঘ, ভাল্লুক ও শেয়ালের ডাক, সেখানে এখন শোনা যাচ্ছে বিভিন্ন মেশিনের বিকট শব্দ। একদিন যেখানে ছিল জনবিরল গ্রামাঞ্চল, এখন সেখানে গড়ে উঠেছে জনবহুল শিল্প-নগরী। দুর্গাপুর স্টীল প্ল্যান্ট, অ্যালয় স্টীলস্ প্ল্যান্ট, হিন্দুস্থান সার কারখানা, এম, এ, এম সি, থেকে আরম্ভ করে প্রায় 130টি ছোট-বড় কলকারখানা গড়ে উঠেছে প্রয়োজনের বিভিন্ন তাগিদে। স্বভাবতই রুজি-রোজগারের উদ্দেশ্যে হাজার হাজার লোক এখানে এসে ভিড় করেছে। তাই বন কেটে বসতি করতে গিয়ে এখানকার বিরাট অরণ্য বিনষ্ট হয়েছে। নির্মল বাতাস আজ আর নেই, বাতাসে ধোঁয়া, ধুলোবালি ও বিষাক্ত গ্যাসের মাত্রা ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। এমনকি দামোদর নদের সুমিষ্ট জলও কলকারখানার পরিত্যক্ত ক্ষতিকারক জৈব ও অজৈব পদার্থ এবং ভারী ধাতুতে আজ পরিপূর্ণ। সব মিলে দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল এখন দূষণের কবলে। দুর্গাপুরের দূষণকে গুণাগুণ বিচারের মাপকাঠিতে মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :—(1) বায়ুদূষণ (2), জলদূষণ এবং (3) শব্দদূষণ। এছাড়া মৃত্তিকাদূষণ, তেজষ্ক্রিয়দূষণ এবং তাপজনিত দূষণও এখানে একেবারে বিরল নয়। দুর্গাপুরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান প্রধান দূষণ প্রক্রিয়াগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

(1) বায়ুদূষণ—পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের স্বাভাবিক অবস্থা, অর্থাৎ যে অবস্থায় জীবজগতের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা নির্বাহিত হয়, তা মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্মের ফলে ক্রমাগত পরিবর্তিত হচ্ছে। বায়ুমণ্ডলের এই পরিবর্তন ঘটছে তার উপাদানগুলির পরিমাণের হেরফেরের ফলে এবং এতে কলকারখানার চিমনি ও যানবাহন থেকে নির্গত নানারকম বিষাক্ত গ্যাস ও ধোঁয়ায় আকাশে বিভিন্ন কঠিন ও তরল পদার্থের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণার মিশ্রণের মাধ্যমে। বায়ুদূষণের প্রধান প্রধান উৎস হ'ল বাড়ীর বিভিন্ন কাজে জ্বালানি হিসাবে পোড়ানো কয়লা, পেট্রোলিয়ামজাত বিভিন্ন পদার্থ ও কাঠ; যানবাহন এবং কলকারখানার চিমনি থেকে অবিরত নির্গত ধুলোবালি ও বিষাক্ত গ্যাসীয় পদার্থ। এখন দেখা যাক দুর্গাপুরে কলকারখানাগুলি কি ধরনের দূষিত পদার্থ বায়ুতে ছড়াচ্ছে (1নং তালিকা)।

1 নং তালিকা

কারখানা	দূষিত পদার্থের প্রকৃতি
1. দুর্গাপুর স্টীল প্ল্যান্ট (ডি. এস. পি)	পার্টিকুলেট ম্যাটার (ধুলোবালি), সালফার ডাই-অক্সাইড ও সালফার ট্রাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেনের বিভিন্ন অক্সাইড (NO, NO_2), কার্বন মনোক্সাইড (CO), অ্যামোনিয়া (NH_3), হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S), সিলিকা (SiO_2), বেঞ্জিন ইত্যাদি।
2. অ্যালয় স্টীল প্ল্যান্ট (এ. এস. পি)	পার্টিকুলেট ম্যাটার, নাইট্রিক অক্সাইড, নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, সিলিকা ইত্যাদি।

* রসায়ন বিভাগ, আর. ই. কলেজ, দুর্গাপুর, পিন—713209

কলকারখানা	দূষিত পদার্থের প্রকৃতি
3. ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড (এফ. সি. আই)	পার্টিকুলেট ম্যাটার, ক্লোরিন, নাইট্রিক অক্সাইড (NO), নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড (NO_2) অ্যামোনিয়া (NH_3) প্রভৃতি।
4. দর্গাপুর প্রোজেক্ট লিমিটেড (ডি. পি. এল)	ছাই, কার্বন মনোক্সাইড, নাইট্রোজেনের বিভিন্ন অক্সাইড (NO, NO_2), বেঞ্জিন প্রভৃতি।
5. দুর্গাপুর কেমিকেলস্ লিমিটেড	ক্লোরিন।
6. এম. এ. এম. সি.	NO, NO_2, SiO_2 ও পার্টিকুলেট ম্যাটার।
7. দুর্গাপুর সিমেন্ট ওয়ার্কস্	সিমেন্ট ডাস্ট, লাইম ডাস্ট ও সিলিকা প্রভৃতি।
8 ফিলিপ্স্ কার্বন ব্লাক লিমিটেড	কার্বন কণা।
9. গ্রাফাইট ইণ্ডিয়া লিমিটেড	গ্রাফাইট ডাস্ট
10. ডি. এ. পি. এস.	ছাই (fly ash)

বিভিন্ন কলকারখানা থেকে নির্গত দুষিত পদার্থের প্রকৃত মাত্রা জানা না থাকলেও এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে ঐ সমস্ত পদার্থ নির্দিষ্ট মাত্রাকে (বৈজ্ঞানিক ভাষায় যাকে বলে Threshold Limit value বা সহ্যসীমা) ছাড়িয়ে গেছে এবং নানা রোগের সৃষ্টি ও বৃদ্ধি ঘটাচ্ছে।

সিলিকা ও কার্বনযুক্ত পার্টিকুলেট ম্যাটার যথাক্রমে "সিলিকোশিস" ও "অ্যানথ্রাকোশিস', রোগের সৃষ্টি করতে পারে। পার্টিকুলেট ম্যাটার আবার কারখানা থেকে নির্গত বিভিন্ন বিষাক্ত গ্যাস যেমন 'সালফার ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড ও ক্লোরিনের সঙ্গে মিশনে সাধারণ সর্দি কাশি, মাথাধরা, চোখজ্বালা, অ্যাজ্মা থেকে ক্যানসার পর্যন্ত বহু রোগের উৎপত্তির কারণ হিসাবে মনে করা হয়। এই প্রসঙ্গে কলকাতা ট্রপিক্যাল স্কুল অব্ মেডিসিনের ডাঃ এইচ. চ্যাটার্জী ও ডাঃ টি. সেনের একটি সমীক্ষা থেকে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে দুর্গাপুর অঞ্চলের বায়ুদূষণ জনগণের স্বাস্থ্যের পক্ষে (বিশেষ করে বাচ্চা ও বৃদ্ধদের) কী নিদারুন ক্ষতিসাধন করে চলেছে। এই সমীক্ষকদলটি দুর্গাপুর ও ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে সমীক্ষা চালান 1. 4. 79 থেকে 31. 3. 80 অবধি। উষ্ণতা (8-45° সেঃ) বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (961—1091 মিমি), বাতাসের আর্দ্রতা (53·7—61·1), অক্ষাংশ (latitude-28°30′) দ্রাঘিমাংশ (Longitude....87°20′) প্রভৃতি বিভিন্ন বিচারে দুর্গাপুর ও ঝাড়গ্রামের প্রাকৃতিক অবস্থান মোটামুটি একই রকমের। শুধু মৌলিক পার্থক্য দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল বায়ুদূষণে দূষিত আর ঝাড়গ্রাম গ্রামাঞ্চল এখনও বায়ুদূষণ থেকে মুক্ত। সমীক্ষার তুলনামূলক ফলাফল নিম্নে প্রদত্ত। সমীক্ষার ফল থেকে দেখা

সমীক্ষার স্থান	পরীক্ষা করা রোগীর মোট সংখ্যা	মোট শ্বাস জনিত অসুখ বা Respiratory illness	ক্রনিক অবস্ট্রাক্টিভ ব্রঙ্কাইটিস ও ব্রঙ্কিয়েল অ্যাজমা	রিকারেন্ট ফ্যারেনজাইটিস্	রিকারেন্ট অ্যালারজিক রাইনাইটিস	রিকারেন্ট টনসিলাইটিস	ক্রনিক সিনোসাইটিস
দুর্গাপুর স্টীল মেন হাসপাতাল A_1, A_2, A_3, B_1, B_2, DPL	2853	188	61	57	25	10	5
ঝাড়গ্রাম state subdivisional Hospital	2023	46	10	2	0	0	0

যার বায়ুদূষণ থেকে যে সমস্ত অসুখ হয় যেমন ক্রনিক সিনোসাইটিস, রিকারেন্ট টনসিলাইটিস, রিকারেন্ট অ্যালার্জিক রাইনাইটিস, ব্রঙ্কিয়েল অ্যাজ্‌মা প্রভৃতি ঝাড়গ্রামের তুলনায় দুর্গাপুরে অনেক বেশী।

বায়ুদূষণের হাত থেকে দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলকে বাঁচানোর উপায় ঃ—

ক) প্লান্ট ও সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুতকারকদের সহযোগিতায় কারিগরী উপদেষ্টা সংস্থাগুলি এমন পদ্ধতি ও প্রযুক্তিবিদ্যার উদ্ভব ও সুপারিশ করতে পারেন, যা অচিরেই একদিকে সর্বোচ্চ পরিমাণে উৎপাদন বৃদ্ধি ও অন্যদিকে দূষণ প্রতিরোধের সহায়ক হবে। কর্তৃপক্ষকে এ ব্যাপারে বিশেষ প্রয়াসী হতে হবে।

খ) শিল্পাঞ্চলকে বায়ুদূষণের হাত থেকে বাঁচানোর আর একটি সহজ উপায় হল হাজার হাজার গাছ লাগানো। বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখেছেন যে এক একটি গাছ তার জীবৎকালে যে পরিমাণ অক্সিজেন তৈরি করে বা কার্বনডাই-অক্সাইড ও অন্যান্য গ্যাস হজম করে তার আর্থিক মূল্য হল 15 লক্ষ 70 হাজার টাকা।

2) **জল-দূষণ** ঃ— দামোদরের জল দূষিত হয়ে গেছে। পরিবেশ বিজ্ঞানীদের মত এই জল এত দূষিত যে মানুষের সহন ক্ষমতার বাইরে। বিহার পশ্চিমবঙ্গের কারখানা থেকে নির্গত রাসায়নিক ও অন্যান্য দূষিত পদার্থ এসে জলে পরাড় দামোদরের আজ এই অবস্থা। দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে কলকারখানা প্রসূত বেশীর ভাগ জলই দামোদর নদে এসে পড়ে সিঙ্গরন নালা ও টামলা নালার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। নিম্নে কয়েকটি কারখানার নাম ও বর্জিত দ্রব্যের উল্লেখ করা হল যেগুলি দামোদর নদের জল দূষণে অনেকখানি সহায়তা করেছে (3নং তালিকা)।

3 নং তালিকা

শিল্প সংস্থার নাম	বর্জিত দ্রব্যের প্রকৃতি
1) দুর্গাপুর স্টীল প্ল্যান্ট	জলের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়লার কণা, ফেনল, সায়ানাইড, অ্যামোনিয়া, তেল ও গ্রিজ।
2) অ্যালয় স্টীল প্ল্যান্ট	অ্যাসিড (Pickling liqurors), তেল ও গ্রীজ।
3) এম, এ, এম, সি,	তেল ও গ্রীজ।
4) দুর্গাপুর প্রজেক্ট লিমিটেড	অ্যামোনিয়া, ফেনল, সায়ানাইড ইত্যাদি।
5) দুগাপুর কেমিকেলস লিমিটেড	মার্কারি, ক্লোরিন, অ্যালকালি, কস্টিক, থ্যালিক অ্যানিড ইত্যাদি।
6) ফার্টিলাইজার করপোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড	অ্যামোনিয়া, আরসেনিক, ক্রোমিয়াম, নাইট্রেট, নাইট্রাইট।
7) ফিলিপস কার্বন ব্লাক লিমিটেড	জলের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় সূক্ষ্ম কার্বন কণা।

বিশ্বভারতীর রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক অনিল কুমার দে কয়েকজন সহকর্মীর সঙ্গে দামোদর নদের জল দূষণের প্রকৃতি নির্ধারণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণের সহজ ও স্থায়ী পন্থা নির্ণয়ের ব্যাপারে 1978 খৃস্টাব্দ থেকে গবেষণার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি দেখিয়েছেন দামোদর নদের জলে দূষণের মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে এবং আশঙ্কা করছেন দূষণ

নিয়ন্ত্রণের জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা না নেওয়া হলে অদূর ভবিষ্যতে এর কুফল জনজীবনে চরম বিপদ ঘটাবে।

দূষিত দ্রব্যের নাম ও উপস্থিতির মাত্রা (4নং তালিকা) নিম্নে দেওয়া হ'ল।

4 নং তালিকা

দূষিত পদার্থের নাম ও টি, এল, ভি	দুর্গাপুর ব্যারেজের উপরদিককার জলে (upper stream river water)	দুর্গাপুর ব্যারেজের নীচেরদিককার জলে (down stream river water)
i) ফেনল 0.0 ppm	0.03-0.12 ppm 0.18-1.26 ppm ডি. এস. পি থেকে 5.5 কিমি দূরে	0.08 ppm
ii) নাইট্রেট ও নাইট্রাইট একত্রে 0.1 ppm	10.0-18.0 ppm 0.0-85.0 ppm ডি. এস. পি. থেকে 5.5 কিমি দূরে	20.0-21.0 ppm
iii) সালফাইড	অল্প পরিমাণ	0.2-10 ppm
iv) দ্রবীভূত অক্সিজেন 8 ppm	2.24-8.2 ppm	2-6 ppm
v) অ্যামোনিয়া	1.0-6.0 ppm	10-20 ppm
vi) ক্রোমিয়াম	—	0-025 ppm (পানাগড়ে)
vii) আরসেনিক	—	0-05-ppm (,,)
viii) জিঙ্ক	—	0.2-0.63 ppm (কৃষ্ণনগরে) 2150 ppm (নদের উভয় পার্শ্বের মাটিতে)
ix) লেড	—	0.33-1·75 ppm (কৃষ্ণনগরে) 1029 ppm (নদের উভয় পার্শ্বের মাটিতে)
x) পারদ	—	0.01-0.02 ppm (কৃষ্ণনগরে) 5.8-8.2 ppm (নদের উভয় পার্শ্বের মাটিতে)

উল্লিখিত তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে টামলা নালা ও সিঙ্গরন নালা দিয়ে প্রবাহিত কলকারখানার পরিত্যক্ত জল দামোদর নদের জলকে সালফাইড, নাইট্রাইট, অ্যামোনিয়া, ফেনল, মারকারি, জিঙ্ক, লেড, আরসেনিক, ক্রোমিয়াম প্রভৃতি দূষিত পদার্থ দ্বারা ভীষণভাবে দূষিত করছে। সবচেয়ে মারাত্মক আকার নিয়েছে মারকারি ও ফেনলের দূষণ। প্রাকৃতিক জলে পারদের 'পারমিসিবল লিমিট' 0·002 ppm., কিন্তু দামোদর নদের জলে পারদের উপস্থিতি ঐ পরিমাণের 10 গুণ এবং নদের উভয় পার্শ্বের মাটিতে ঐ মাত্রার 4000 গুণ। সুতরাং

দামোদর নদের জল আজ মারাত্মকভাবে পারদের দ্বারা দূষিত। ব্যবহৃত জলে পারদ বেশী থাকলে ব্যবহারকারীর দেহে এর জো পয়জিনিং-এর কাজ শুরু হয়। মানবদেহের নার্ভের উপরে এই বিষ ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। দীর্ঘদিন ধরে এই জল ব্যবহার করলে মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন সামঞ্জস্যহীন (ইনকোহারেন্ট) হয়ে পড়ে। তারপরে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গাঁটগুলি কঠিন (স্টিফ) হয়ে পড়ে সঞ্চালন করা যায় না। এমন কি পারদ সংক্রামিত জল বেশী দিন পান করলে শিশু বিকলাঙ্গও হতে পারে। কেন্দ্রীয় পলিউশন বোর্ডও দামোদরের জল পরীক্ষা করে জলের মধ্যে মারকারী ও ফেনলের মাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশী পেয়েছেন। এই সমীক্ষায় জানা গেছে দামোদরের প্রতি লিটার জলে এক হাজার থেকে পনেরো-শ মিলিগ্রাম ফেনল আছে। জলদূষণ বিশেষজ্ঞদের মতে প্রতি লিটার জলে 0·01 মিগ্রা ফেনল মানুষ সহ্য করতে পারে। ফেনল আবার জলে ক্লোরিনের সঙ্গে মিশলে ক্লোরোফেনল নামক একটি ক্যানসার উৎপাদক পদার্থ উৎপন্ন করে। এই দূষিত জল জনসাধারণের স্বাস্থ্যের পক্ষে একান্ত হানিকর, চাষ-আবাদের ক্ষতিসাধনকারী, শিল্পসংস্থার ব্যবহারের পক্ষে অধিক ব্যয়বহুল, জলজ প্রাণীর পক্ষে বিপজ্জনক, জলক্রীড়ার প্রতিবন্ধক ও সৌন্দর্যবৃদ্ধির পরিপন্থী। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে সবচেয়ে বেশীরভাগ লোক ভোগে দূষিত জলজনিত বিভিন্ন রোগে যেমন জনডিস্, কোষ্ঠ-কাঠিন্য, অজীর্ণ, এনটেরিক ফিবার, টাইফয়েড, প্যারা-টাইফয়েড, আমাশয়, উদরাময় ও অ্যাসিডিটিতে। তবে একটা শুভলক্ষণ কেন্দ্রীয় সরকার শুধুমাত্র দামোদর নদের দূষণ প্রতিরোধকল্পে 500 কোটি টাকা মঞ্জুর করেছেন।

দূষিত জলের প্রকোপ থেকে দামোদর নদ ও দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলকে রক্ষা করার উপায়ঃ—

ক) কলকারখানাপ্রসুত জল বিভিন্ন দূষিত পদার্থ মুক্ত করার পর দামোদর অথবা অন্য জল ধারায় ফেলতে হবে। এ ব্যাপারে বিভিন্ন সরকারী ও বে-সরকারী শিল্প-সংস্থাগুলিকে সাধ্যমত প্রয়াসী হতে হবে।

খ) দামোদর থেকে টাউনসিপে জল সরবরাহ করার আগে বিভিন্ন রাসায়নিক ও ব্যাক্টেরিওলজিক্যাল পরীক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

গ) আজকাল বিভিন্ন শিল্প সংস্থা কলকারখানাপ্রসুত দূষিত জল শোধন করার জন্য পরিশোধন কক্ষে কচুরিপানা চাষ করছেন। কচুরিপানা দূষিত জলের বিভিন্ন ধাতব আয়ন গ্রহণ করে জল দূষণ প্রতিরোধে সাহায্য করে।

শব্দদূষণঃ—কলকারখানায় কর্মরত বেশীর ভাগ লোকই আজ অল্প-বিস্তর বধির। এই বধিরতার কারণ হিসাবে বলা যায় কলকারখানায় ব্যবহৃত বিভিন্ন বেলায়ার, টারবাইন, ভেন্টিলেসন ফ্যান, লোকো সাইরেন ও মোটর থেকে নির্গত বিকট শব্দ। আই. এস আই-এর চার্ট অনুসারে কারখানায় প্রতিদিন আট ঘণ্টা কাজ করার সময় শব্দ মাত্রা হওয়া উচিত 85 ডেসিবেলের (ডেসিবেল শব্দ মাপার একক) মধ্যে। কিন্তু এ-অঞ্চলের বেশীর ভাগ কারখানাতেই এই মাত্রা 90 থেকে 105-এর মধ্যে। বিভিন্ন সমীক্ষার ফল থেকে জানা যায় ত্রিশ বছরের মধ্যে বধিরতা আসতে বাধ্য যদি

ক) 90 ডেসিবেল শব্দ প্রতিদিন 8 ঘণ্টা ধরে কানে প্রবেশ করে অথবা

খ) 97 ডেসিবেল শব্দ প্রতিদিন 4 ঘণ্টা ধরে কানে প্রবেশ করে অথবা

গ) 100 ডেসিবেল শব্দ প্রতিদিন 2 ঘণ্টা ধরে কানে প্রবেশ করে অথবা

ঘ) 135 ডেসিবেল শব্দ দিনে মাত্র 1 সেকেণ্ড ধরে কানে প্রবেশ করে।

শব্দদূষণ শুধুমাত্র বধিরতা বাড়ায় না সৃষ্টি করে নানা রকম অসুখ-বিসুখের। উচ্চ রক্তচাপ, পেপ্‌টিক আল্‌সার, কান ভোঁ ভোঁ, মাথাধরা, সাইকোশিস, নিউরোশিস, ইনস্যানিটি থেকে আরম্ভ করে কাজকর্মে অধিক ভুলভ্রান্তি, বেশীমাত্রায় দুর্ঘটনা, অধিক অনুপস্থিতির হার, কাজকর্মে উপযুক্ত মনোযোগের অভাবের জন্য শব্দদূষণ বিশেষভাবে দায়ী। এমন ঘটনাও আমরা শুনেছি কারখানায় কাজ করতে করতে কান খারাপ হয়েছে এমন একটি লোককে ইনটারভিউ বোর্ডে প্রমোশনের জন্য ডাকা হলে তিনি বলেন, "স্যার আমার প্রমোশনের দরকার নেই। আপনারা যদি দয়া করে আমার চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করে কানে শোনার ব্যবস্থা করে দেন তাহলে সেটাই হবে আমার কাছে সবচেয়ে বড় প্রমোশন। কানে শুনতে পাই না বলে বাড়ীতে আমার কথার কোন মূল্য নেই।"

শব্দদূষণের উর্ধ্বগতি রোধ করার উপায়গুলি নিম্নরূপঃ—

ক) উৎসগুলি থেকে নির্গত শব্দ কমাতে হবে অর্থাৎ বিভিন্ন কলকারখানায় আরও আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হবে যেগুলি থেকে শব্দ বের হয় অপেক্ষাকৃত অনেক কম।

খ) উৎস থেকে শব্দ কানে আসার যে পথ, সেখানে কয়েকটি 'মাফার' বা Silencer বসাতে হবে যাতে

পুরোপুরি শব্দ কানে এসে না পৌঁছায়।

গ) এছাড়া কারখানার প্রত্যেকটি কর্মীকে যেখানে শব্দের মাত্রা 85 ডেসিবেলের বেশী ইয়ার প্ল্যাগ/ইয়ার মাফ/ইয়ার ভালব সরবরাহ করতে হবে এবং ব্যবহারে বিশেষ যত্নবান হতে হবে।

ঘ) বৈদ্যুতিক হর্ন বাজানো সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করতে হবে।

উপসংহার

আপাততঃ দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের দূষণ কলকাতা, বোম্বাই, প্রভৃতি শহরের চেয়ে কম হলেও একেবারে নগণ্য নয়। এই কারণে এখন থেকে দূষণ প্রতিরোধকল্পে সঠিক ব্যবস্থা না নিলে অদূর ভবিষ্যতে এ সমস্যার মোকাবিলা করা অসম্ভব হয়ে উঠবে। দূষণ রোধ করতে হলে সরকার, শিল্পপতি থেকে আরম্ভ করে সাধারণ জনগণ—সকলকে এ ব্যাপারে সচেষ্ট হতে হবে, তবেই এ সমস্যার সমাধান সম্ভব। সরকার শুধু আইন তৈরি করেই ভাবেন দূষণ রোধ করা যাবে, তাহলে খুবই ভুল করবেন। সরকারকে কড়া নজর রাখতে হবে যাতে পরিবেশ সংক্রান্ত সরকারী নিয়মকানুন যথাযথ ভাবে পালিত হয়। জনজীবনে সুদূরপ্রসারী ফলের কথা চিন্তা করেই অধুনা সিটি সেন্টারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ একটি আঞ্চলিক শাখার উদ্বোধন করেছেন। এটি একটি সুলক্ষণ, সন্দেহ নেই।

শিল্পপতিরাও দূষণের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাঁদের সব সময় দূষণের কথা তথা দেশ ও দশের কথা মনে রেখে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা (target) ঠিক করতে হবে যাতে উৎপাদন বৃদ্ধি দূষণবৃদ্ধির সহায়ক না হয়। সম্প্রতি দুর্গাপুর স্টীল প্লান্ট, অ্যালয় স্টীলস প্ল্যান্ট, হিন্দুস্থান সার কারখানা, দুর্গাপুর কেমিকেলস প্রভৃতি শিল্পে দূষণ প্রতিরোধকল্পে শোনা যাচ্ছে বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। দুর্গাপুর স্টীল প্ল্যান্ট দূষণের মাত্রা ও প্রকৃতি নির্ধারণ উদ্দেশ্যে একটি আধুনিক পরীক্ষাগার স্থাপন করা হচ্ছে এবং দূষণ রোধ করার জন্য বিভিন্ন কারিগরী উপদেষ্টা সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে।

দূষণ প্রতিরোধে জনগণের দায়দায়িত্বও কম নয়। অপ্রয়োজনীয় এমন কাজ কোন সময়েই তাঁরা করবেন না যেটা দূষণ বৃদ্ধির কারণ হতে পারে। তাহলে দেখা যাবে পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণে রাখা অসম্ভব কিছু নয়।

নির্দেশিকা

1) Environmental & Industrial Health Hazards.
(A Practical guide) R. A. Trevethick
(Page 132 181)
2) Donald Hunter : The Diseases of Occupation.
(Page 1007, 944, 988, 945)
3) Industrial Hygiene & Toxicology Vol. 1 & Vol. II —F. A. Patty
4) পরিবেশ দূষণ ও দামোদর নদ—সাগর মোদক, সঞ্চালক, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা (অক্টোবর 1983)
5) দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল ও পরিবেশ দূষণ—বিশ্বনাথ ঘোষ, Cultural & Literary Tidings October (sharad) 1982, Hospital Recreation Club, Durgapur Steel Plant Hospital.
6) দূষণমুক্ত বায়ুর প্রয়োজন মানুষের বাঁচার জন্য —সুদীপ্ত বসু,
(ডেভেলপমেণ্ট কনসালটেণ্টস প্রাইভেট লিমিটেড —আনন্দবাজার পত্রিকা, 5ই জুন, 1981)
7) শিল্প বিকাশ এবং পরিবেশ, আনন্দবাজার পত্রিকা, 1/9/83

'বিজ্ঞানের সঙ্কট' ও সত্যেন বসু

যুগলকান্তি রায় *

1338 বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসের 'পরিচয়' পত্রিকায় সত্যেন্দ্রনাথ বসুর একটি বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ বেরিয়েছিল। নিবন্ধটির নাম 'বিজ্ঞানের সঙ্কট'। বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ হিসাবে এটাই অধ্যাপক বসুর প্রথম বাংলা রচনা কিনা জানি না ; তবে, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সত্যেন্দ্রনাথ বসুর 'রচনা সঙ্কলন'-এ এবং অন্যত্রও তাঁর যে সমস্ত লেখা প্রকাশিত হয়েছে তাতে ঐ নিবন্ধটিই এখনও পর্যন্ত প্রকাশকালের বিচারে অগ্রাধিকার পেয়েছে। সে যাই হক, এই লেখাটি তাঁর ভাল রচনাগুলির মধ্যে একটি—এ ব্যাপারে মনে হয় কোন পাঠক দ্বিমত হবেন না। এটি এমনই একটি লেখা যা শুধু বিজ্ঞানের দার্শনিক দ্বন্দ্বেরই ইঙ্গিত দিচ্ছে না, তা তাঁর চিন্তন, মনন ও সর্বোপরি তাঁর সেই বৈজ্ঞানিক মেজাজ যা বিদ্যুতের মত ঝিলিক দিয়ে নিজেকে মেঘের আড়ালে রেখে দেয় তাকেও পাঠকের কাছে স্ফটিকের মত স্বচ্ছ করে তুলেছে। বলতে দ্বিধা নেই, এ ধরনের লেখা তাঁর খুবই কম, হাতে গোনা যায়।

প্রবন্ধের শুরুতেই তিনি বলছেন, 'বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই পদার্থবিজ্ঞানের একটি নতুন যুগ আরম্ভ হয়েছে। এ যুগের বিশেষত্ব কি, তা আলোচনা করবার আগে বিজ্ঞানের কৃমিক পরিণতির কথা বলা আবশ্যক। অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ শুধু বিশ্ববিজ্ঞানীই নন, বাঙ্গালীর শিক্ষা-সংস্কৃতির জগতেও এক আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। তাই তিনি যখন বাংলা ভাষায় 'বিজ্ঞানের কৃমিক পরিণতি'-র কথা বলতে চান তখন তা বিদগ্ধ বাঙ্গালী পাঠককে অবশ্যই আকৃষ্ট করবে। আমার মনে হয়, বাঙ্গালী পাঠক যিনি শুধু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নন, বিজ্ঞানের দার্শনিক পরিমণ্ডলেও কিছুটা বিচরণ করবেন তিনি এই নিবন্ধের সহজ-সরল-সুন্দর সূচনায় আকৃষ্ট হয়ে একবার ভিতরে ঢুকলে তা শেষ না করে আর বেরোতে চাইবেন না। নিবন্ধটি 54 বছর আগের লেখা। ইংরেজী হিসেবে সেটা 1931 খৃস্টাব্দ। পদার্থবিজ্ঞানীদের মতে বিংশ শতাব্দীর ঐ প্রথম 30/31 বছরের মধ্যেই বিশ্বপ্রকৃতির স্বরূপ নির্ণয়ে পদার্থ বিজ্ঞানের ভাবগত দিকে ও তার সামগ্রিক কর্মধারায় যে বিরাট রকমের ওলট-পালট হয়ে গেছে তেমনটি তার পরে আর হয় নি। কোয়ান্টাম তত্ত্ব, আপেক্ষিকতাবাদ, কণা-তরঙ্গ বাদ, কোয়ান্টাম সংখ্যায়ন নব্য পদার্থবিজ্ঞানে যে গতি সঞ্চার করেছে তা এখনও অব্যাহতই আছে, তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক কোন ক্ষেত্রেই অনতিক্রমণীয় সংশয়, বাধা বা পিছু টান এখনও পড়ে নি, পদার্থবিজ্ঞানে ঐ চারটি তত্ত্বেরই উদ্ভব হয়েছে বিংশ শতাব্দীর প্রথম 24 বছরের মধ্যেই। সনাতনী পোষাক ছেড়ে জন্ম নিয়েছে নব্যপদার্থবিদ্যা।

নতুনের এই আবির্ভাব সহজে হয় নি, সহজে হয়ও না, অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের পথ তাকে অতিক্রম করতে হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে চতুর্থভাগে যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দিয়ে, সনাতনী পদার্থবিজ্ঞানের সুস্থির কাঠামোয় তাত্ত্বিক ফাটল সৃষ্টি হয়েছিল তা কোয়ান্টাম তত্ত্বের হাত ধরে নব্যপদার্থবিজ্ঞানের বৈপ্লবিক যাত্রা শুরু করে ঠিক 1900 খৃস্টাব্দে। তাই বিংশ শতাব্দীর শুরু মানেই নব্যপদার্থবিজ্ঞানের শুরু। একটি কালের ও একটি ভাবজগতের এমন সমন্বয় বোধ হয় মানব-সভ্যতার আর কখনও ঘটে নি।

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর নিবন্ধে বিজ্ঞানের সেই ক্রান্তিকালের কথাই তুলে ধরতে চেয়েছেন। অল্প পরিসরে (রচনা সঙ্কলনের 9 পৃষ্ঠায়) প্রাক-নিউটনীয় ও নিউটনোত্তর যুগের আভাস কলমের এক একটি আঁচড়ে দিয়ে গেছেন। বিজ্ঞানে সাহিত্য কী তা জানি না তবে যখন পড়ি "নিউটন থেকেই আধুনিক বিজ্ঞানের অভ্যুদয়, এ বললে অত্যুক্তি হবে না। তার আগেও আমরা বস্তু জগতের বিষয়ে অনেক জিনিস খণ্ড ও বিচ্ছিন্নভাবে জানতাম। যে জ্ঞান আমাদের জীবনে কাজে আসে, শিল্পে-বাণিজ্যে যে জ্ঞান মানুষের সুবিধা ও সম্পদ বৃদ্ধির জন্য কার্যকরী হতে পারে এমন অনেক জ্ঞান প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের জানা ছিল। কিন্তু তখন শুদ্ধ বিজ্ঞানের নিদর্শন স্বরূপ ছিল এক-মাত্র গণিত শাস্ত্র। বিশেষ করে জ্যামিতি ছিল বৈজ্ঞানিকদের প্রিয় বিদ্যা। এর অনুশীলনে গ্রীক ও তাঁদের পরবর্তী বৈজ্ঞানিকেরা যে নিয়ম ও সত্যসন্ধানের যে রীতি অনুসরণ করেছিলেন, পরের যুগের বৈজ্ঞানি-কেরা জড় ও জগতের অন্যান্য বিষয়গুলিকে নিজেদের

আয়ত্তে আনবার চেষ্টায় সেই রীতি ও নিয়ম সমূহই বরণ করেছিলেন। ইউক্লিড তাই এখনও পর্যন্ত সকল দেশেই পূজা ও সম্মান পাচ্ছেন। গণিতশাস্ত্রের নিয়মকানুন যে জড় পদার্থের গতিবিধিতে লাগানো যেতে পারে, তা নিউটনই প্রথম দেখালেন। চোখের সামনে যে বিভিন্ন জড় পদার্থের সমাবেশ দেখছি, তাদের পরস্পরের ব্যবধান এবং তাদের গতির পরিমাণ ও লক্ষ্য জানা থাকলে ভবিষ্যতে আবার তাদের কি রকম অবস্থায় ও কোথায় পাওয়া যাবে তা আগে থেকে নির্দেশ করা যায় কিনা, এইটেই হল গতিবিজ্ঞানের অনুসন্ধান"। তখন এই অংশটি পড়াকালে একজন পাঠক হিসেবে এর সঙ্গে একাত্ম না হয়ে পারি না। গুটি কয়েক শব্দ ব্যবহার করে প্রাক-নিউটনীয় ও নিউটনীয় বিজ্ঞানের স্বরূপ সত্যেন্দ্রনাথ যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তা নিঃসন্দেহে তাঁর মুন্সিয়ানারই পরিচয় দেয়। তাঁর এই প্রকাশভঙ্গী বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্যে একটি নবতর সংযোজন যা বিষয়কে ছাপিয়ে অহেতুক কলেবর বৃদ্ধি করে না এবং অকারণ শব্দের মোড়কে দার্শনিকের ধূম্রজাল বিস্তার করে মূল বিজ্ঞানকেই নির্বাসন দিয়ে বসে না।

নিউটনীয় বিজ্ঞানের সুদীর্ঘ বিস্তৃতির পর ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে কিভাবে তা সঙ্কটের মধ্যে পড়ল তা বোঝাতে গিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যেই নিউটনের অনুসরণ করে গণিতকারেরা গতিবিজ্ঞানের চূড়ান্ত সত্যগুলিকে উপনীত হয়েছিলেন, এবং জ্যোতিঃশাস্ত্রের সমস্যাগুলিকেও প্রায় সবই ঐ গতিবিজ্ঞানের সাহায্যে নিরাকরণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ফলে তাঁদের মনে এই ধারণা জন্মেছিল যে, বৈজ্ঞানিক নিয়মগুলি নিউটনের গতিবিজ্ঞানের অনুরূপ কিংবা অনুযায়ী হওয়া উচিত। তখন নিউটনের নিয়মের যে ব্যতিক্রম হতে পারে তা তাঁরা ভাবতেই পারতেন না। ক্রমশ যখন পরমাণুবাদ ও ইলেকট্রনবাদের উদ্ভব হল, যখন উত্তাপবিজ্ঞানের নিয়মসমূহ আগেকার নিয়মকানুন থেকে একটু ভিন্ন পর্যায়ের বলে তাঁরা দেখতে পেলেন তখন এই নিয়মগুলি যথার্থ কি, সে বিষয়ে চিন্তা করতে শুরু করলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে, বিশেষ করে, এইসব কথাগুলি আলোচনা করবার দরকার হল। আলোক বিজ্ঞানের চর্চা করতে করতে বৈজ্ঞানিকেরা তখন উভয় সঙ্কটে এসে পড়লেন। এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, নিউটনের গতিবিজ্ঞান অনুসারে আলোক তরঙ্গের সঙ্গে পরমাণুদের ঘাত-প্রতিঘাতের ফল, অঙ্ক কষে তাঁরা যা ঠিক করে ছিলেন পরীক্ষায় তার বিপরীত দেখা গেল। ফলে 1900 সালে প্লাঙ্ক তাঁর বিখ্যাত Quantum Theory বা শক্তি কণাবাদের অবতারণা করলেন।" কণা ও তরঙ্গ—আলোকের এই দ্বৈত রূপ সত্যেন্দ্রনাথের ভাষায় প্রকাশ পেল এভাবে—"আলোকের পথে বহমান শক্তির প্রবাহকে কেবল তরঙ্গবাদের দ্বারাই সমগ্র ও নিঃসংশয়ভাবে বোঝা গেলেও, পরমাণু ও আলোক-রশ্মির মধ্যে যখন শক্তির আদান-প্রদান ঘটে তখনকার সমস্যার সদুত্তর আর তরঙ্গবাদে পাওয়া যায় না। সেই সময়ে বরং আলোক শক্তি কণার সমষ্টি এইভাবের একটি কল্পনার দরকার হয়।'

এই নিবন্ধে পদার্থবিজ্ঞানের জটিল বিষয়গুলির ভাবগত দিকগুলি তিনি যেভাবে অল্পকথায় ভাষার ফোয়ারা না ছুটিয়ে পাঠকের অন্তরে পৌঁছে দিয়েছেন তার সঙ্গে তিনি যদি কিছু কিছু উপমার সাহায্য নিতেন তাহলে এটি আরও হৃদয়গ্রাহী হত সন্দেহ নেই। সত্যেন্দ্রনাথ কথিত বিজ্ঞানের এই সঙ্কটকালের সম্বন্ধে যাঁদের কিছুটা ধারণা আছে এ নিবন্ধ মনে হয় তাঁদের জন্যই লেখা। সাধারণের উপযোগী বা জনপ্রিয় বিজ্ঞান প্রবন্ধ বলতে যা বোঝায় তা এটি নয়। বাঙালীর বৌদ্ধিক জগতে 'পরিচয়' পত্রিকা যে ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠিত করেছে এই নিবন্ধটি হয়ত তারই একটি বলিষ্ঠ পরিচয়। একাধারে মননশীলতা ও শব্দ বিন্যাসের এমন সমাহার বাঙালী পাঠক সত্যেন্দ্রনাথের কাছ থেকে বেশি পায় নি। পেলে সত্যেন্দ্রনাথ সম্পর্কে বহুজনের আক্ষেপ 'তিনি তেমন কিছু লিখে গেলেন না, বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্যে কোন মডেল রেখে গেলেন না' মিটত কি না জানি না, তবে বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্য যে আরও সমৃদ্ধ হত তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

এই নিবন্ধটি লেখার পিছনে কোন প্রেরণা সত্যেন্দ্রনাথে কাজ করেছে জানি না তবে, তিনি যে বিজ্ঞানের এই সংকট মুক্তির এক স্মরণীয় নায়ক তা আজ কারও অজানা নয়। বহু কথিত তারই নির্ধারিত বিখ্যাত 'বোস-সংখ্যায়ন' বা 'বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়ন' শুধু পদার্থবিজ্ঞানের একটি নতুন সূত্র নয়, বিজ্ঞানের সেই ক্রান্তিকালের এক নতুন পথের দিশারী।

1880 খৃস্টাব্দ কি তারও আগে থেকে বিজ্ঞানীরা আদর্শ কৃষ্ণ বস্তুর বিকিরণজনিত একটি সমস্যা নিয়ে খুব ভেবে পড়েছিলেন। একটা তিনকোণা কাচকে চোখের সামনে রাখলে আমরা যেমন নানা রঙের বর্ণালী দেখি, উত্তপ্ত কৃষ্ণ বস্তুর বিকিরণও বর্ণালী বীক্ষণে এরকম বর্ণালীর সৃষ্টি করে। এই বর্ণালীর এক একটি রঙের ঔজ্জ্বল্য সেই রঙের আলোর কম্পনের উপর নির্ভর করে বিজ্ঞানীরা চাইলেন এমন একটি সূত্র বের করতে যার

সাহায্যে ঐ বর্ণালীর বিভিন্ন রঙের ঔজ্জ্বল্য অঙ্ক কষে পাওয়া যায়। অর্থাৎ গাণিতিক ভাষায় তাঁরা বর্ণালীর মধ্যে শক্তিবন্টনের সাধারণ নিয়মটুকু জানতে চাইলেন।

ভীন নামে এক বিজ্ঞানী যে সূত্র বের করেছিলেন তা বর্ণালীর অর্ধেক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও বাকি অর্ধেকের ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হয়। বিজ্ঞানীদ্বয় র‍্যালে ও জিন্‌সের সূত্র ঐ অর্ধেকের ব্যাখ্যা করলেও আশ্চর্যজনকভাবে বাকি অর্ধেকের ক্ষেত্রে খাটলো না। অথচ, ভীন বা র‍্যালে-জিন্‌স কারুরই পদ্ধতিতে কোন ত্রুটি ছিল না। বিজ্ঞানীরা বেশ ভেবে পড়লেন। এভাবে বেশ কয়েক বছর কেটে যাওয়ার পর উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষাশেষি জিনস্ বললেন, আমাদের পদ্ধতিতে যখন কোন ত্রুটি নেই, তখন পদার্থবিজ্ঞানের যে ধারণার সাহায্য নিয়ে আমরা সূত্র বের করার চেষ্টা করেছি তাতেই হয়ত কোথাও গণ্ডগোল আছে। অর্থাৎ, তাঁর বক্তব্য হল, তৎকালীন পদার্থবিদ্যার ধারণার সাহায্যে ঐ সমস্যার সমাধান করা যাবে না, ধারণা কিছু বদলাতে হবে। কিন্তু, কোথায় বদলাতে হবে তা তিনি বলতে পারলেন না। এ কাজটি করলেন জার্মান বিজ্ঞানী ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক। তিনি বললেন, 'আলোকে এতদিন যে নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ বলে ভাবা হত তা ঠিক নয়, বিচ্ছিন্ন শক্তিগুচ্ছ, হিসেবে তা শোষিত ও বিকিরিত হয়। এই এক একটি শক্তি-কণার তিনি নাম দিলেন 'কোয়ান্টাম' এবং তাঁর প্রকল্পটির নাম হল কোয়ান্টাম প্রকল্প। 1900 খ্রীস্টাব্দে তিনি এই প্রকল্পের সাহায্যে কৃষ্ণ বস্তুর বিকিরণের যে সাধারণ সূত্র দিলেন তাতে বর্ণালীর সমস্ত অংশেরই ব্যাখ্যা পাওয়া গেল, এবং এতদিনকার সমস্যার সমাধানও হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সনাতনী পদার্থবিদ্যার বিদায় ঘোষণা করে নব্যপদার্থবিজ্ঞানের জন্ম হল।

কিন্তু নব্যপদার্থবিজ্ঞান জন্মলগ্নেই এক বিরাট সঙ্কটের মধ্যে পড়লো। কিছুদিনের মধ্যেই জানা গেল প্ল্যাঙ্ক যে পদ্ধতিতে তাঁর বিখ্যাত সূত্রটি রচনা করেছিলেন সেই পদ্ধতিতেই একটা বিরাট গোঁজামিল রয়েছে। প্ল্যাঙ্ক তাঁর সূত্র প্রণয়নে একদিকে সনাতনী তড়িৎ গতিবিদ্যা অপরদিকে তাঁর কোয়ান্টাম প্রকল্পের সাহায্যে নিয়েছেন। এই পরস্পর বিরোধী ভাবনায় সৃষ্ট সূত্র কখনও শুদ্ধ হতে পারে না। অথচ, প্ল্যাঙ্কের সূত্র যে ঠিক তার প্রমাণ পাওয়া গেল আইনস্টাইনের কাজেও। আইনস্টাইন এর সাহায্যেই আলোক তড়িৎক্রিয়ার ব্যাখ্যা দিতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং তা পরীক্ষাগারে প্রমাণিতও হয়েছিল। নীলস বোরও কোয়ান্টাম তত্ত্বের সাহায্যে তাঁর পারমাণবিক মডেল দাঁড় করিয়েছিলেন। তাহলে গলদটা কোথায়? এ যেন সেই অঙ্কের উত্তরটা ঠিক, কিন্তু পদ্ধতিতে গণ্ডগোলের মত।

বিজ্ঞানীদের এই ব্যর্থতায় কোয়ান্টাম তত্ত্ব পদার্থ-বিজ্ঞানে নানা ঘটনার ব্যাখ্যায় ও প্রয়োগক্ষেত্রে দারুণভাবে সফল হলেও বিজ্ঞানীরা তাঁকে যেন ঠিক নিতে পারছিলেন না; তাকে ঘিরে সন্দেহ-অবিশ্বাস যেন আরও দানা বেঁধে উঠছিল। এমন কি, পদার্থ বিজ্ঞানের নবযুগের অন্যতম উদ্গাতা স্বয়ং প্ল্যাঙ্কও শেষ পর্যন্ত ভাবতে শুরু করেছিলেন তাহলে কি তিনি কিছু ভুল করেছেন অর্থাৎ ঘড়ির কাঁটাকে আবার যেন পিছন দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও কারুর কারুর মনে এল।

ডিবাই, আইনস্টাইন ভিন্ন পথে প্ল্যাঙ্ক সূত্র প্রণয়নে চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাঁদের পদ্ধতিও নিঁখুত হল না, সেই একই ধরনের পরস্পর বিরোধিতা। এভাবে 24টি বছর কেটে গেল। শেষে 1924 খ্রীস্টাব্দে সত্যেন্দ্র নাথ বসু পদার্থবিজ্ঞানকে এই দারুন সঙ্কট থেকে রক্ষা করলেন। তাঁর পদ্ধতিতে আইনস্টাইন মুগ্ধ হয়ে নিজে সেটিকে জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। এসব ইতিহাস আজ সকলেরই জানা।

সত্যেন বসুর এই কাজে কোয়ান্টাম তত্ত্ব তার গাণিতিক ভিত্তি মজবুত করে নিজেকে শুধু প্রতিষ্ঠিতই করল না, পদার্থ বিজ্ঞানের এক নতুন শাখা কোয়ান্টাম সংখ্যায়নেরও জন্ম দিল। এই নতুন যুগের উদ্বোধন করতে গিয়ে অধ্যাপক বসু সনাতনী সংখ্যায়ন ও আলোক কণিকা সম্পর্কে প্রচলিত কিছু ধারণার মূলত পরিবর্তনও করেছিলেন। সেই ধারণার উপরই জন্ম নিয়েছে কোয়ান্টাম সংখ্যায়ন। বহু বিজ্ঞানীর মতে, আধুনিক বিজ্ঞানে এখনও পর্যন্ত এটিই হল ভারতের সর্বোত্তম অবদান (দ্রঃ Satyendra Nath Bose : J. Patel Pablished by Lok Vidnyan Sanghatana, Maharashtra)। বিজ্ঞানের সঙ্কটের লেখক সত্যেন্দ্রনাথ হয়ত সঙ্কটের অন্যতম নিরসনকারী বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ সম্পর্কে লিখতে অনিচ্ছুক ছিলেন বলেই তাঁর নিবন্ধটিকে এক অর্থে অসম্পূর্ণ রেখে গেছেন। কেননা যে সংকটের কথা তিনি নিবন্ধে বলেছেন তার নিরসন ত 1900 খ্রীস্টাব্দে কোয়ান্টাম প্রকল্পের মধ্য দিয়েই হয় নি, আর 24টা বছর লেগেছিল এবং তা সত্যেন্দ্রনাথের মধ্য দিয়েই শেষ হল। যে নবতর ধারণার মধ্যে দিয়ে আধুনিক পদার্থবিদ্যার উন্মেষ হয়েছে প্ল্যাঙ্কের মাধ্যমে, তার সুস্থির পরিপূর্ণ রূপ লাভ করে সত্যেন্দ্রনাথের মধ্যে।

বিজ্ঞানের সঙ্কটের লেখক সত্যেন্দ্রনাথ ও কোয়ান্টাম সংখ্যায়নের প্রবর্তক সত্যেন্দ্রনাথের মধ্যেও স্বাভাবিক-ভাবেই যেন একটা মিল খুঁজে পাই। বিজ্ঞানের অন্যান্য লেখার মধ্যে মাঝে মাঝে যেমন আমরা বিজ্ঞানের সঙ্কটের লেখককে খুঁজে পেয়েছি, কোয়ান্টাম সংখ্যায়নের প্রবর্তক সত্যেন্দ্রনাথের দীপ্তিও যেন কখনও কখনও ইউনিফায়েড ফিল্ড থিয়োরী ও আরও কয়েকটি কাজে প্রতিভাত হয়েছে। যাঁরা এই প্রতিভার নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহকে খুঁজে পেতে চেয়েছেন তাঁরা হতাশ হয়েছেন। এই হতাশার জন্য দায়ী সত্যেন্দ্রনাথ নন, দায়ী, আমাদের মানসিকতা। সৃষ্টিশীল কাজ পৃথিবীতে অল্পই এবং সত্যেন্দ্র নাথের মত মানুষেরা হিসেব-নিকশ করে জীবনে চলেন না—এটা আমাদের বোঝা দরকার।

লগারিদম ঃ গণনার মুক্তি

নন্দলাল মাইতি *

গণনা-র (Calculation) মধ্যে বুদ্ধি ও মেধার ভূমিকা নেই বললেই চলে, আছে কেবল শ্রম ও ধৈর্য। বড় বড় গুন-ভাগের ক্ষেত্রে একথা যেমন প্রযোজ্য, তেমনি তার চেয়ে কিছু জটিল ক্ষেত্রেও। দেখা যায়, অনেক সময় স্বল্প বুদ্ধিসম্পন্ন ছাত্র নিপুণ ভাবে গুন-ভাগ করছে, কিন্তু বুদ্ধিমান ছাত্রের ভুল হচ্ছে। এর কারণ সম্ভবত বুদ্ধিমান ছাত্ররা ওই যান্ত্রিক পদ্ধতিতে স্বস্তি পায় না, মনঃযোগ দিতে তেমন আগ্রহ দেখায় না। তবে এক সময় জটিল গুণ-ভাগ করার হাত থেকে পরিত্রাণের কোন উপায় ছিল না। কিন্তু এই নিরুপায় অবস্থায় থাকা তো মানুষের স্বভাব নয়—সে সব বাধা বিঘ্ন জয় করতে চায়। তাই একদিন এর উপায় আবিষ্কার হলো। লগারিদম আবিষ্কার করে জন নেপিয়ার গণনার জটিলতা মুক্ত করলেন। কেবল তাই নয়, গণিতে নতুন ধারণার সৃষ্টিও হলো।

অনেকের জানা, গৌরবময় গ্রীক-যুগের সর্বশেষ প্রতিনিধি ডায়োফ্যান্টাস। প্যাপাসকে সৃজনশীল গণিতজ্ঞ বলা যায় না, তবে গণিতে তাঁর প্রভূত ব্যুৎপত্তি ছিল সন্দেহ নেই। গ্রীক যুগের পর ইউরোপে অন্ধকার যুগ ঘনিয়ে এলো। গণিতচর্চা অবহেলিত ও উপেক্ষিত হলো। ফলে রেনেশাঁর প্রেরণায় যখন ব্যবসা-বাণিজ্য, নৌবিদ্যা, জ্যোতিবিজ্ঞানে নব নব দিক উন্মোচিত হতে থাকল, তখন গণিত বিশেষত গণনা পাল্লা দিয়ে উঠতে পারল না। দেখা দিল নানা জটিলতা—দুরূহতা। এই জটিলতা সাধারণ গুণ-ভাগের ক্ষেত্রেই নয়, চক্রবৃদ্ধির সমস্যায় আরো বেশী করে অনুভূত হতে থাকল। গণিতজ্ঞ উইট্‌চ ও ক্লেভিয়াস গণনা সরলীকরণের জন্য ত্রিকোণমিতীয় তালিকা ব্যবহারের প্রস্তাব করেন। কিভাবে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হতো তার একটি ছোট্ট উদাহরণ দেওয়া যাক ঃ

আমরা জানি,

$$\sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta \cdots(1)$$

$$\sin(\alpha-\beta)=\sin\alpha\cos\beta-\cos\alpha\sin\beta \cdots(2)$$

(1) ও (2) নং থেকে পাওয়া যায়—

$$\sin\alpha\cos\beta=\tfrac{1}{2}\left[\sin(\alpha+\beta)+\sin(\alpha-\beta)\right] \ldots(3)$$

ধরা যাক, 0.17365×0.99027 কত নির্ণয় করতে হবে।

আমরা তালিকা থেকে জানি—

$\sin 10^0=0.17365$

$\cos 8^0=0.99027$

সুতরাং (3) নং সূত্র ব্যবহার করে পাওয়া যায়,—

$\sin 10^0\cos 8^0=\frac{1}{2}(\sin 18^0+\sin 2^0)$

আবার তালিকা থেকে

$\sin 18^0=0.30902$

$\sin 2^0=0.03490$

$\therefore\ \sin 18^0+\sin 2^0=0.34392$

বা $\frac{1}{2}(\sin 18^0+\sin 2^0)=0.17196$

সুতরাং $0.17365\times0.99027=0.17196$.........পাঁচ দশমিক স্থান পর্যন্ত।

* ঠাকুরাণী চক, হুগলী-712613

গণিতের ঐতিহাসিকরা অনুমান করেন, খুব সম্ভব, গণনা সরলীকরণের এই পদ্ধতি নেপিয়ারকে প্রভাবিত করেছিল। বস্তুত, তাঁর লগারিদমের ধারণা ত্রিকোণমিতি নির্ভর।

নেপিয়ারের প্রাথমিক ধারণা

লগারিদম সম্বন্ধে নেপিয়ারের ধারণা দুটি চলন্ত বিন্দুর উপর প্রতিষ্ঠিত যার একটি বিন্দু সমান্তর শ্রেণী উৎপন্ন করে, আর অপর বিন্দুটি গুণোত্তর শ্রেণী। এই দুটি শ্রেণী পরস্পরের সঙ্গে লগারিদমের চমকপ্রদ ধর্মে অন্বিত বা সম্বন্ধযুক্ত। এই দুটি শ্রেণী লক্ষ্য করা যাক ঃ

সমান্তর শ্রেণী ঃ 0 1 2 3 4 5 6

গুণোত্তর শ্রেণী ঃ 2^0 2^1 2^2 2^3 2^4 2^5 2^6

1 2 4 8 16 32 64

এখন, উভয় শ্রেণীকে অন্বিত করা যায় যদি আমরা মনে করি সমান্তর শ্রেণীর পদগুলি 2-এর ঘাত বা সূচক। তা হলে গুণোত্তর শ্রেণীর পদগুলিকে এই প্রক্রিয়ার ফল হিসাবে মনে করা যেতে পারে ঃ $2^0=1$; $2^1=2$; $2^2=4$ ইত্যাদি। অধিকন্তু, গুণনের সহজ সূত্রটিও এই সম্বন্ধ থেকে নির্ণীত হতে পারে ঃ $2^3 \times 2^4 = 2^{3+4} = 2^7$ ($a^m \times a^n = a^{m+n}$)। 2-কে নিধান হিসাবে ধরলে সমান্তর শ্রেণীর প্রত্যেকটি পদ গুণোত্তর শ্রেণীর অনুরূপ পদের লগারিদম হবে।

জন নেপিয়ার চলন্ত বিন্দুর গতি প্রকৃতপক্ষে একটি জ্যামিতিক চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করেন।
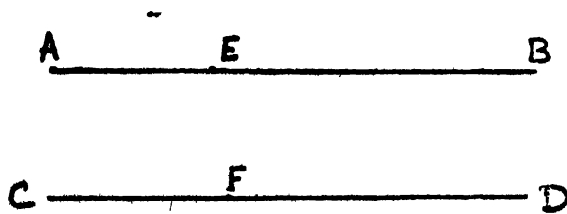
ধরা যাক, AB একটি নির্দিষ্ট সরলরেখা এবং CD D-এর অভিমুখে অনির্দিষ্টভাবে বিস্তৃত। ধরা যাক, দুটি বিন্দু একই সময়ে চলতে শুরু করল,—প্রথমটি A থেকে B অভিমুখে, আর দ্বিতীয়টি C থেকে D অভিমুখে। আরো মনে করা যাক, প্রথম মুহূর্তে উভয় বিন্দুর একই গতিবেগ এবং দ্বিতীয় বিন্দুটি সমবেগে চলছে, কিন্তু প্রথম বিন্দুর গতিবেগ এমনভাবে হ্রাস পাচ্ছে যে, যখন বিন্দুটি E বিন্দুতে উপস্থিত হয় তখন তার গতিবেগ BE দূরত্বের সমানুপাতিক। যতক্ষণ প্রথম বিন্দু AE-র উপর চলতে থাকলে দ্বিতীয় বিন্দুটি CF-র উপর চলতে থাকবে। নেপিয়ার F-কে BE-র লগারিদম বলে অভিহিত করলেন।

নেপিয়ার ও আধুনিক লগারিদম

নেপিয়ার ও আধুনিক লগারিদমে অনেক পার্থক্য। এবং তা খুবই স্বাভাবিক। কারণ, পরবর্তী কালে এই বিষয় নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে, রূপ-রীতির পরিবর্তনও হয়েছে। এ-বিষয়ে ব্রিগ্‌স-এর কথা অনেকের জানা। এমন কি, নেপিয়ারের সময় সূচক নিয়ম আবিষ্কৃত হলেও তিনি সম্ভবত এ-বিষয়ে অনভিহিত ছিলেন বলে 'ডেসক্রিপটিও' গ্রন্থে অনুপাতের সাহায্যে লগারিদমেব নিয়ম দিয়েছিলেন ঃ

1) যদি $a:b=c:d$ হয়, তা হলে $\log b - \log a = \log d - \log c$

2) যদি $a:b=b:c$ হয়, তা হলে $\log c = 2\log b - \log a$

3) যদি $a:b=c\,d$ হয়, তা হলে $\log d = \log b + \log c - \log a$
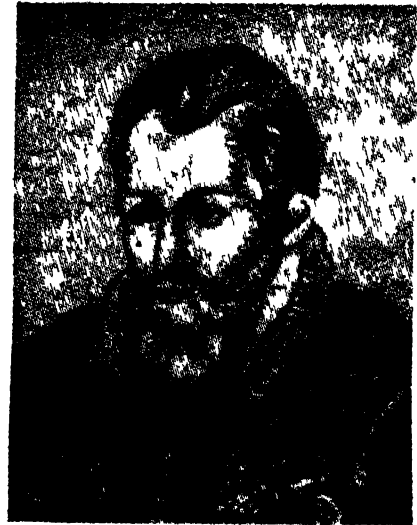
জন নেপিয়ার

নেপিয়ার প্রথমে লগারিদম বলতে 'কৃত্রিম সংখ্যা' বোঝাতেন। কিন্তু পরে তাঁর আবিষ্কার ঘোষণা করার সময় লগারিদম নামটি গ্রহণ করেন। এই শব্দটি দুটি গ্রীক শব্দ logos ও Arithmos থেকে উদ্ভূত। Logos শব্দের অর্থ অনুপাত (ratio), এবং arithmos মানে সংখ্যা (number)। লগারিদম শব্দের আভিধানিক অর্থ 'অনুপাত সংখ্যা'। হেনরী ব্রিগস 'পূর্ণক'

(Characteristic) ও 'অংশক' (Mantisa) শব্দ দুটি ব্যবহার করেন। Mantisa শব্দের অর্থ 'মূল্য' বা 'ক্ষুদ্রতর মান' বোঝালেও ব্রিগস 'পরিশিষ্ট' (appendix) অর্থটি গ্রহণ করেন। তারপর বিখ্যাত অয়লার ও গাউসের সমর্থনপুষ্ট হয়ে দশমিক ভগ্নাংশ বোঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

অনেক সময় সহজ অথচ মৌলিক আবিষ্কারের কৃতিত্ব সম্বন্ধে আমরা সচেতন থাকি না। ভারতের দশমিক স্থানিক মান পদ্ধতি ও শূন্য আবিষ্কার তেমনি দুটি ঘটনা। লগারিদম সম্বন্ধেও একই কথা বলা যায়। ছাত্র-শিক্ষক, বিজ্ঞানী এই নিয়ম গণনায় এমন অভ্যস্ত যে, এই তত্ত্বের উপলব্ধি করা সহজ নয়। প্রসঙ্গ, লাপ্লাসের ভাষায় বলতে গেলে,—"It is no exaggeration to say that the invention of logarithms by shortening the labours doubled the life of the astronomer" বলা বাহুল্য, কম্পিউটার বা যন্ত্রগণক গণনা-শ্রম আরো বহুল পরিমাণে লাঘব করতে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু লগারিদম গণিতের বিভিন্নশাখায় ও ধারণায় যে-ভাবে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে, তার অবসান এতে হবে বলে এখনই মনে হচ্ছেনা।

নাড়ী স্পন্দন ও মাপক যন্ত্র

অর্ঘ্য পানিগ্রাহী *

ছেলেবেলা থেকেই শুনতাম জেঠুর নাকি হার্টের অসুখ। বুঝতাম না হার্ট কি, কোথায় থাকে, কি কাজ? তবে এটুকু বুঝতাম জেঠুর মধ্যে মধ্যে খুব কষ্ট হয়। বুকে হয় প্রচণ্ড ব্যথা।

সেদিনও হঠাৎ তিনি খুব অসুস্থ হ'য়ে পড়লেন। ডাক্তারবাবু এলেন। এসেই করলেন কি জেঠুর বাম হাতের মণিবন্ধে বুড়ো আঙুলের কিছু নিচের দিকে তার তিনটি আঙুল রেখে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে কি যেন করতে লাগলেন। আমার মনে প্রশ্ন এলো,—

এসেই প্রথম তিনি কি দেখছিলেন?

ঘড়ির সঙ্গে মিলিয়েই বা কি করছিলেন?

তিনটা আঙুলইবা কেন রেখেছিলেন? এইসব এলো মেলো একগাদা প্রশ্ন, মাথার মধ্যে ভিড় জমালো। চেষ্টা করেই দেখিনা এই ভেবে নিজের বাম হাতের ঐখানে ডানহাতের আঙুল দিয়ে হাতড়াতে লাগলাম। ডাক্তারবাবুর মত গম্ভীর গম্ভীর মুখ করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলাম না। হাল ছাড়ি ছাড়ি, হঠাৎ মনে হলো এক জায়গায় ডান হাতের আঙুলকে কে যেন ঠেলে দিল। তারপর লক্ষ করলাম নিয়মিত ঐভাবেই কে যেন ঠেলেই চলেছে। ডাক্তারবাবুর মত ঘড়ির সঙ্গে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম। দেখলাম প্রতি মিনিটে প্রায় 70-72 বার ঐরকম ধমনী কেঁপে উঠা। উত্তেজনার ভরে উঠলো মন, কৌতুহলও বেড়ে গেল। ডাক্তারবাবুর অবসরমত দেখা করলাম তাঁর সঙ্গে। তিনি বললেন, ধমনীর ঐ কেঁপে কেঁপে ওঠাকে বলে পাল্‌স (Pulse) যা কিনা হৃদযন্ত্র বা হার্টের স্পন্দনের জন্য নিয়মিতভাবে হয় এবং সমস্ত রক্তবহা নালীতে তরঙ্গের আকারে ছড়িয়ে পড়ে এবং এইটার অস্তিত্ব পরীক্ষা করেই বাইরে থেকে হৃদযন্ত্রের অবস্থারও কিছুটা অনুমান করা যায়। জীবন-মৃত্যুর রেখা টানতেও প্রাথমিকভাবে এই পাল্‌সের পরীক্ষা প্রায় অপরিহার্য।

বাড়ী এলাম এবং এবিষয়ে কিছু পড়াশুনা করলাম, দেখলাম পাল্‌স (Pulse) রক্তবহা নালীর প্রাচীরে বৃদ্ধি ও প্রসারণ ছাড়া কিছুই নয় যা কিনা পরোক্ষভাবে ঘটে হৃদযন্ত্রের নিলয়ের সংকোচন ও প্রসারণের চাপ পরিবর্তনের জন্য। এবং হৃদযন্ত্রের স্পন্দনের জন্য রক্তের গতির চেয়ে এই পাল্‌স তরঙ্গের (Pulse Wave) গতি প্রায় 6 গুণ বেশী।

বাঁহাতের পাল্‌সের সঙ্গে হৃদযন্ত্রের সংযোগ অনেকটা সোজা পথে বলেই এই পাশের পাল্‌স পরীক্ষা বেশী যুক্তিসিদ্ধ। তবে দুপাশেই প্রায় সমান ফল পাওয়া যায়, কিছুক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছাড়া।

এরপর তিনটি আঙুল দিয়ে পরীক্ষা করার সার্থকতা কি? তিনটি আঙুল দিয়ে প্রথমে পাল্‌সের অবস্থান খুঁজে

* কাঁজিয়া পোঃ মানিকজনাম মেদিনীপুর

পেতে সুবিধা হয়। কারণ সবার পাল্‌স-এক জায়গায় থাকে না। তাছাড়া পাল্‌স-এর তিনটি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের পরীক্ষা করা হয়। যেমন প্রথম আঙুল দিয়ে দেখা হয় পাল্‌স-এর হার (Pulse Rate), অর্থাৎ প্রতি মিনিটে পাল্‌স-এর স্পন্দনের সংখ্যা— সাধারণতঃ যা হৃদস্পন্দনের উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল এবং তার সঙ্গে সমতাযুক্ত। মাঝের আঙুলটি দিয়ে দেখা হয় পাল্‌স-এর ছন্দ (Rhythm), অর্থাৎ স্পন্দনগুলি সমসময় সাপেক্ষ কি না। এবং তৃতীয় আঙুলটির সাহায্যে চাপ দিয়ে পাল্‌স-এর স্পন্দন বন্ধ করার চেষ্টা করা হয় এবং পরীক্ষা করা হয় এর পীড়ন (Tension) যা হৃদযন্ত্রের সচাপ সংকোচনের উপর নির্ভর করে অর্থাৎ রক্তচাপের অবস্থা।

সুতরাং এর থেকেই বোঝা যেতে পারে হৃদযন্ত্রের গতি প্রকৃতি, অবস্থা এবং রক্তে চাপ সৃষ্টি করার ক্ষমতা। অভিজ্ঞতা ও মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করলে কোন যন্ত্র ছাড়াই এর থেকে রক্তের চাপীয় অবস্থা সম্বন্ধে (বিশেষ করে সিস্টোল) কিছুটা অনুমান করা যায়। কারণ হৃদযন্ত্রের নিলয় অংশই সংকোচনের দ্বারা চাপ সৃষ্টি করে রক্তকে মহা ধমনীতে ঠেলে দেয়। এবং এই রক্ত দূরবর্তী রক্তবহা নালীতে তরঙ্গের আকারে ছড়িয়ে পড়ে যাকে আমরা পাল্‌স বলি।

শরীরের বিশ্রামরত অবস্থায় হৃদযন্ত্রের নিয়মিত সংকোচন প্রসারণের দ্বারা উৎপন্ন শক্তির শতকরা 98 থেকে 99 ভাগ পরিণত হয় স্থিতিশক্তি বা অবস্থান শক্তিতে (Potential Energy) ও মাত্র 1 ভাগ পরিবর্তিত হয় গতিশক্তি -তে,(Kinetic Energy) এবং এই গতিশক্তিই রক্তবহানালীতে রক্তের গতি দান করার জন্য দায়ী। কিন্তু শরীর চর্চার সময় বা এর ঠিক পরে শতকরা প্রায় 20 থেকে 50 ভাগ শক্তি পরিণত হয় গতিশক্তিতে যা রক্তকে অধিক গতিদান করে শারীরবৃত্তীয় স্থিতাবস্থা রক্ষা করতে সাহায্য করে।

এবার জানতে ইচ্ছা হলো একমাত্র এই মণিবন্ধনীতেই পাল্‌স (Pulse) এর স্পন্দন পাওয়া যায়, না আর কোথাও এর অস্তিত্ব আছে। এবং কাজকরে দেখলাম গলার দুপাশে এবং কনুইর ঠিক উল্টোদিকে বাজুবন্ধে এবং শরীরে অন্যান্য অনেকস্থানে এই ধরণের স্পন্দন পাওয়া যায়। পড়াশুনা করে জানলাম কনুইর বিপরীত স্থানের বাজুবন্ধের ধমনীটিকে বলে ব্রাকিয়েল ধমনী (Brachial Artery) এবং মণিবন্ধনীর কাছের ধমনীটিকে বলে রেডিয়েল ধমনী (Radial Artery) এবং এই স্পন্দন উপযুক্ত যন্ত্রের সাহায্যে রেকর্ড করা যায় যার নাম ডাডজিয়নের স্ফিগমোগ্রাফ (Dudgeon's Sphygmograph)।

চিত্র—1
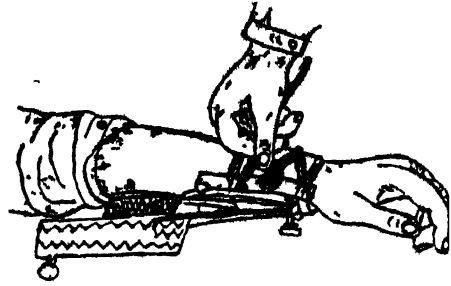
ডাডজিয়ণের স্ফিগমোগ্রাফের সাহায্যে ব্র্যাকিয়াল ধমনীর স্পন্দন রেকর্ড করা হচ্ছে।

'ডাডজিয়নের স্ফিগমোগ্রাফ-এর' সাহায্যে রেকর্ড করা রেডিয়েল ধমনীর তরঙ্গের গতি প্রায় নিম্নরূপ ঃ

চিত্র—2

নাড়ীর স্পন্দন ও মাপন যন্ত্র।

এই রেকর্ডের সম্পূর্ণ একটি তরঙ্গের ক্ষেত্রে ঊর্দ্ধমুখী অংশে কোন গৌন তরঙ্গ (Secondary Wave) দেখা যায় না, কিন্তু নিম্নমুখী অংশে (b) একটি স্পষ্ট, এবং তীক্ষ্ণ খাঁজ দেখা যায়—ডাইক্রোটিক (Dicrotic) খাঁজ (Notch) [চিত্রে—D] এবং এর ঠিক পরের তরঙ্গায়িত অংশটিকে বলে ডাইক্রোটিক তরঙ্গ-'D' (Dicrotic Wave) বা গৌণ তরঙ্গ। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই গৌণ তরঙ্গের আগে এবং পরে ছোট ছোট দুটি আন্দোলন বা অনুতরঙ্গ দেখা যায় যাদের যথাক্রমে বলে প্রাক-ডাইক্রোটিক তরঙ্গ (Predicrotic Wave ; চিত্রে—b) এবং পশ্চাদ ডাইক্রোটিক তরঙ্গ (Postdicrotic Wave ; চিত্রে—c)—এই দুটিকে সাধারণতঃ দেখা যায় হৃদযন্ত্রের অলিন্দের স্পন্দনের কার্যকরী রূপ হিসাবে।

কীটনাশক ব্যবহারের অপকারিতা

অর্ণবকুমার দে *

অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গদের দমনের উদ্দেশ্যে নানাপ্রকার কীটনাশক মানুষ ব্যবহার করছে। এদের মধ্যে বর্তমানে কৃত্রিম জৈব কীটনাশক (Synthetic Organic Pesticides) সর্বাধিক ব্যবহৃত হচ্ছে। কৃত্রিম জৈব কীটনাশক ব্যবহারের কয়েকটি অপকারিতার কথা এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। পরিশেষে, কীটনাশক ব্যবহারের কয়েকটি সম্ভাব্য বিকল্পের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

বর্তমানে বিশ্বে বিভিন্ন প্রজাতির প্রায় ত্রিশলক্ষ কীটপতঙ্গ বিরাজ করছে। এদের মধ্যে 99.9% ভাগ আমাদের উপর কোন ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে না কিন্তু অবশিষ্ট 0.1% বা প্রায় 3000 প্রজাতি মানবজাতির ও উদ্ভিদজগতের বিশেষ শত্রু। এইসব কীটপতঙ্গ মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীদের নানাবিধ রোগের কারণ। সুতরাং মানবজাতির সুস্থ, স্বাভাবিক জীবনযাপনের জন্য এই সব কীটপতঙ্গদের দমন করা একান্ত প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি হয়েছে এক শ্রেণীর নতুন রাসায়নিক পদার্থের, যার নাম কীটনাশক (Pesticides)।

বিগত দুই শতক ধরে নানাপ্রকার কীটনাশক মানুষ ব্যবহার করছে। প্রথমে অজৈব রাসায়নিক কীটনাশক যেমন আর্সেনিক (Arsenic) যৌগ, কপার (Copper) যৌগ, চুন-সালফার মিশ্রণ (Lime-sulphur mixture) ইত্যাদি ব্যবহৃত হত কিন্তু বর্তমানে অজৈব কীটনাশকের পরিবর্তে কৃত্রিম জৈব কীটনাশক (Synthetic Organic Pesticides) ব্যবহৃত হচ্ছে। কীটনাশক ব্যবহারের ফলে মানুষের জীবনযাত্রার মান কিছুটা উন্নত হয়েছে যেমন ম্যালেরিয়া, টাইফ্যাস্-এর মত রোগের হাত থেকে কিছুটা মুক্ত হয়েছে, শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। কিছু উপকারিতা সত্ত্বেও এইসব কীটনাশক মানুষ ও জীবজগতের বিশেষ ক্ষতিকারক।

কীটনাশক ব্যবহারে অতীতের বেশ কয়েকটি দুর্ঘটনার কথা আমাদের জানা। 1958-এ প্যারাথাওন (Partahion) কীটনাশক মিশ্রিত খাদ্যগ্রহণের ফলে আমাদের দেশে 102 জনের মৃত্যু ঘটে এবং 1967-তে কলোম্বিয়ায় 88 জনের মৃত্যু ঘটে।

কীটনাশক উৎপাদন থেকেও দুর্ঘটনার কথা আমাদের অজানা নয়। বিগত ডিসেম্বর মাসে ভূপালের ইউনিয়ন কার্বাইডের কীটনাশক উৎপাদন কারখানার ভয়াবহ গ্যাস দুর্ঘটনা বিজ্ঞানের ইতিহাসকে কলঙ্কিত করেছে। 1976-এ ইটালীর একটি কীটনাশক উৎপাদন কারখানা থেকে বিষাক্ত টেট্রাক্লোরোপ্যারাডাইঅক্সিন (Tetrachlropara-dioxin) নির্গত হবার ফলে বহু মানুষ এর দ্বারা আক্রান্ত হয়। 1970-তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়ার একটি কারখানা থেকে কেপটোন (Keptone) নির্গমনের ফলেও বহু মানুষ এর দ্বারা আক্রান্ত হয়। এই দুর্ঘটনাগুলি মানুষকে কীটনাশক ব্যবহারের ও উৎপাদনের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী এনে দিয়েছে।

যদিও কয়েকটি উন্নত দেশ কিছু শ্রেণীর কীটনাশক ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করেছে তবুও আজ বিশ্বের অনেক দেশেই কীটনাশক উৎপাদন ও ব্যবহার অব্যাহত আছে। ব্যাপকহারে বিভিন্ন কীটনাশক ব্যবহারের ফলে আমাদের পরিবেশে বিশেষ করে মাটি ও জলজ পরিবেশে এই রাসায়নিক পদার্থগুলি যথেষ্ট মাত্রায় ছড়িয়ে পড়ছে যা বহু সমস্যার সৃষ্টি করেছে ও করবে।

কৃত্রিম জৈব কীটনাশককে গঠনগতভাবে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—

1. অরগ্যানোক্লোরিন কীটনাশক (Organochl-orine pesticides) 2. অরগ্যানোফসফরাস কীটনাশক (Organo phosphorous pesticides) এবং 3. কার্বামেট কীটনাশক (Carbamate pesticides)। আমাদের অতি পরিচিত কীটনাশক ডিডিটি (DDT) যার রাসায়নিক নাম ডাইক্লোরোডাইফিনাইল ট্রাইক্লোরো ইথেন, প্রথম শ্রেণীভুক্ত অরগ্যানোফসফরাস শ্রেণীর কীটনাশকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ম্যালাথাওন (Mala-thion), প্যারাথাওন (Parathion) ইত্যাদি এবং কার্বামেট শ্রেণীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সেভিন (Sevin), বেগন (Baygon) ইত্যাদি।

* রসায়ন বিভাগ, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

কীটপতঙ্গ বিনষ্ট হবার পরেও জমিতে বেশকিছু পরিমাণ কীটনাশক উদবৃত্ত থাকে যা পরিবেশকে দূষিত করে। এই অতিরিক্ত পরিমাণ কীটনাশক বাষ্পীভূত, জলে দ্রবীভূত অথবা বিয়োজিত হয়ে পরিবেশে মিশে যায়। অরগ্যানোফসফরাস ও কার্বামেট শ্রেণীর কীটনাশকের জলবিশ্লেষণের (hydrolysis) দ্বারা বিয়োজিত হয়ে ক্ষতিকারক নয় এমন রাসায়নিক পদার্থ উৎপন্ন করে। সুতরাং এই শ্রেণীভুক্ত কীটনাশকেরা পরিবেশকে কম দূষিত করে। অপরপক্ষে, অরগ্যানোক্লোরিন শ্রেণীভুক্ত কীটনাশক দ্রুত বিয়োজিত হয় না—জীবাণুর সাহায্যে ধীরে ধীরে বিয়োজিত হয় এবং বিয়োজনের ফলে উৎপন্ন পদার্থগুলিও বিষাক্ত; অর্থাৎ অরগ্যানোক্লোরিন কীটনাশক পরিবেশকে যথেষ্ট দূষিত করে।

বিভিন্ন কীটনাশকের বিষক্রিয়া বিভিন্ন প্রকারের। অরগ্যানোক্লোরিন কীটনাশক দেহের স্নায়ুতন্ত্র আবেষ্টনকারী যে চর্বিযুক্ত প্রাচীর থাকে তাতে দ্রবীভূত হয়ে যায়। এর ফলে স্নায়ুতন্ত্রর ভিতর ও বাইরের মধ্যে চলাচলকারী আয়নের (ions) চলাচল বাধাপ্রাপ্ত হয়। এই আয়ন চলাচল স্নায়ুর উত্তেজক সংবহন (nerve impulse transmission) এর জন্য প্রয়োজনীয়। আয়ন চলাচল বেশীমাত্রায় ব্যাঘাতের ফলে শরীরে কম্পন, মাংসপেশীর প্রবল আলোড়ন দেখা যায় এবং অবশেষে মৃত্যু ঘটতে পারে। অরগ্যানোফসফরাস ও কার্বামেট শ্রেণীর কীটনাশক তন্ত্রর অ্যাসিটাইল কোলিনস্টিরেস (Acetylcholinesterase) নামক উৎসেচকের কর্মক্ষমতাকে হ্রাস করে এবং এর স্বাভাবিক কার্যের ব্যাঘাত ঘটায় এটিও শরীরে কম্পন, মাংশপেশীর প্রবলআলোড়ন এবং মৃত্যুর কারণ।

সর্বাধিক প্রচলিত এবং আমাদের অতি পরিচিত কীটনাশক ডিডিটি, মানুষ ও তার পরিবেশের উপর কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে তা এখন ভীতির কারণ হয়েছে। আজ পর্যন্ত ব্যবহৃত 25% ডিডিটি অবশেষে সমুদ্রে গিয়ে জমা হয়। সামুদ্রিক উদ্ভিদ ও প্রাণীদের দেহের মধ্যে এই ডিডিটি প্রবেশ করে। এই সকল উদ্ভিদ ও প্রাণীদের খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করায় অন্যান্য সামুদ্রিক জীব ও মাছের দেহেও ডিডিটি প্রবেশ করে থাকে। মানুষ যখন এই সামুদ্রিক মাছকে খায় তখন তার মারাত্মক ক্ষতির সম্ভাবনা। একই ভাবে অন্যান্য জলাশয়ের মাছ থেকেও মানুষের দেহে ডিডিটি প্রবেশ করতে পারে। বর্তমানে মানুষের খাদ্যোপযোগী মাছে ডিডিটির সর্বোচ্চ মাত্রা ধার্য করা হয়েছে প্রতি দশ লক্ষ ভাগে পাঁচ ভাগ।

অল্প পরিমাণে ডিডিটি দেহে প্রবেশ করায় কয়েকটি প্রজাতির পাখীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। এছাড়া দেখা গেছে এই পাখীদের ডিমের বাইরের আবরনটি স্বাভাবিকের তুলনায় পাতলা এংব দুর্বল। তাই-ডিমগুলি অকালে ভেঙ্গে গিয়ে তাদের বংশ লোপের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

মানুষের উপর ডিডিটির প্রভাব এখনো সঠিক ভাবে অনুসন্ধান করা সম্ভব হয় নি। মানুষের শরীরের কলায় সর্বোচ্চ মাত্রায় ডিডিটি পাওয়া গেছে গড়ে প্রতি দশ লক্ষ ভাগে 10 ভাগ। ডিডিটি থেকে মানুষের বড় কোন দুর্ঘটনার কথা এখনো জানা যায় নি, তবে মার্কিনযুরাষ্ট্র ও অন্য কয়েকটি দেশে, ক্ষতিকর প্রভাবের কথা চিন্তা করে ডিডিটির ব্যাবহার নিষিদ্ধ করেছে।

কৃত্রিম জৈবকীটনাশকের বিভিন্ন অপকারিতার জন্য বর্তমানে বিজ্ঞানীরা কীটপতঙ্গ দমনের উদ্দেশ্যে রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহারের বিকল্পের বিষয়টি চিন্তা করে দেখছেন। প্রকৃতিতে সহজে পাওয়া যায় এমন পরজীবী জীব অথবা রোগসৃষ্টিকারী জীব ব্যবহার করে কীটপতঙ্গদের বিনষ্ট করা সম্ভব। শক্তিশালী রশ্মি প্রয়োগ করে কীটপতঙ্গদের নির্বীজিত (Sterilised) করে এদের বংশবৃদ্ধি প্রতিরোধ করা যেতে পারে। বর্তমানে কৃষিবিজ্ঞানীরা কয়েকশ্রেণীর উদ্ভিদ উৎপাদন করেছেন যা কয়েকটি বিশেষ কীটপতঙ্গের আক্রমণকে প্রতিরোধ করতে পারবে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায়, বর্তমানে যে হারে কীটনাশক ব্যবহার ও উৎপাদন হচ্ছে তা থেকে আমাদের মারাত্মক ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। অত্যন্ত প্রয়োজন ছাড়া কীটনাশক ব্যবহার নিষিদ্ধ করা অবিলম্বে প্রয়োজন। ব্যবহার করতে হলে অতিরিক্ত সতর্কতামূলক ব্যাবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বিগত ডিসেম্বর মাসের ভূপালের গ্যাস দুর্ঘটনা প্রমাণ করেছে, কীটনাশক উৎপাদন ও ব্যবহারের বিষয়ে আমরা কতটা অসতর্ক। কীটনাশকের যথাযথ বিকল্পের অনুসন্ধানের জন্য আজ প্রয়োজন বিজ্ঞানীদের আরো ব্যাপক গবেষণার।

অবিশ্বাস্য (ভৌতিক ?) ফটোর—উত্তর

(জ্ঞান ও বিজ্ঞানের গত জুলাই আগস্ট '84 সংখ্যার প্রচ্ছদে মুদ্রিত জলভর্তি বেলুনকে হঠাৎ ফুটো করে অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে তোলা আলোকচিত্রটিতে উপস্থাপিত সমস্যার বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা)

এই ব্যাখ্যা বা উত্তরটি চাওয়া হয়েছিল কুড়ি বছরের অনুর্দ্ধ কিশোর বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে। তাতে যে উত্তরগুলি যথাসময়ে এসেছে তার মধ্যে যাদের উত্তরে বিজ্ঞানসম্মত ধারণা মোটামুটি ঠিক রয়েছে সেই উত্তর দাতাদের নামও পরিচয় নীচে দেওয়া হল। এদের প্রত্যেককে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের পক্ষ থেকে একখানা করে "আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর—রচনা সংকলন" পুস্তক, পুরস্কার হিসাবে দেওয়া হবে। সরকারী ছুটির দিন বাদে সপ্তাহের যে কোন দিন বেলা 2টো থেকে সন্ধ্যা 7টার মধ্যে (বুধবার 5টার মধ্যে) বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের অফিসে এসে নিজেদের যথাযথ পরিচয় দিয়ে উত্তরদাতারা যেন তাদের পুরস্কারটি নিয়ে যায় সেই অনুরোধ জানান হচ্ছে। অন্যথায় তারা যেন পত্রযোগে খবর দেয়।

মোটামুটি বিজ্ঞানসম্মত ধারণা নিয়ে যারা উত্তর দিয়েছে তাদের মান অনুসারে ক্রমিক নাম ঃ—

1. অনিমেষ রায়—বর্ধমান M.B.C. Inst. of Engg. & Tech. কলেজের ছাত্র। (দ্বিতীয় বর্ষ)
2. শুভব্রত হালদার—দমদম মতিঝিল কলেজের ছাত্র। (দ্বিতীয় বর্ষ)
3. প্রদীপ কুমার পাঁজাল—বজবজ পি. কে. হাইস্কুলের ছাত্র। (দ্বাদশ শ্রেণী)
4. অমিত ঠাকুর—হিন্দি হাইস্কুলের ছাত্র। (দশম শ্রেণী)

উপস্থাপিত সমস্যাটির যথাযথ ব্যাখ্যা ঃ—

(অনিমেষ রায়ের উত্তরটি কিছুটা অনুসরণ করেই)

বেলুনটিকে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ফুটো করার সময় আমাদের সামনে দুটো কথা রয়েছে। এক—বেলুনের রবারটি দ্রুত সংকোচনশীল-ইলাস্টিক পদার্থ। ফেটে যাওয়ার সাথে সাথে তা অতি দ্রুত গুটিয়ে যায়। আর দুই—বেলুনের ভিতরের জল, বেলুন ফাটার আগে সেই জল স্থির অবস্থায় ছিল। স্থির বস্তুর স্বাভাবিক অবস্থায় স্থির থাকার প্রবণতাকে বলে স্থিতি জাড্য। (নিউটনের প্রথম সূত্র) তাই বেলুন ফেটে রবার গুটিয়ে যাওয়ার কালে তার ভিতরকার জল পূর্ববৎ স্থির অবস্থাতেই থাকে যতক্ষণ না অন্য শক্তির প্রভাব তার উপর কাজ করে। সেই অবস্থায় তোলা ফটোটাই দেখান হয়েছে।

আধারহীন অবস্থায় (যে কোন অবস্থাতেই) জলের ভিতরের অণুগুলির মধ্যে একটি পারস্পরিক আকর্ষণ বল কাজ করে তাকে বলে সংশক্তিবল (Cohesive force), আর একেবারে বাইরে উপরের তলের (Surface) অণুগুলির মধ্যে পৃষ্ঠটান বল (Surface tension) কাজ করে যার ফলে শূন্যে জলের বিন্দু বা গ্যাসভর্তি বদবুদের আকার যথাসম্ভব গোল হয়ে ক্ষুদ্রতম আয়তনে আবদ্ধ হতে চায়। এর ফলে তরলের মধ্যেও কঠিনের মত ক্ষণস্থায়ী দৃঢ়তা দেখা যায়। তবে তা অতীব ক্ষীণ। বেলুন ফেটে রবার গুটিয়ে যাওয়ার পর মাধ্যাকর্ষণের সমস্ত শক্তিটাই আধারহীন জলের অণুগুলির উপর পড়ে এবং তারই টানে অণুগুলি ক্ষিপ্র ছড়িয়ে পড়ে। এই মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কাজ করার আগে পূর্বোক্ত শক্তিগুলিই জলের অণুগুলির উপর যে প্রভাব রেখেছিল তাতেই 12-13 মিলি সেকেণ্ড পর্যন্ত আধারহীন অবস্থায় ঐ জল পূর্বের বেলুনাকৃতিতেই ছিল। আর সেই সময়ের মধ্যেই ছবিটি তোলা। সাধারণ চোখের দৃষ্টিতে কোনমতেই জলের ঐ অবস্থানের চেহারা দেখা সম্ভব নয়। কারণ আমরা যে কোন বস্তুই দেখি না কেন তা একের দশ ($\frac{1}{10}$) সেকেণ্ড পর্যন্ত আমাদের স্মৃতিপটে অর্থাৎ মস্তিষ্কের দৃষ্টিকেন্দ্রে স্থির ছবি হয়ে থাকে। সেই সময়ের মধ্যে অন্য জিনিস দেখা যায় না, তা চোখে পড়লেও তাকে বোঝার মত যথার্থ অনুভূতি তৈরি হয় না। তার মানে একের দশ সেকেণ্ডের মধ্যে একাধিক পৃথক বস্তুর আলাদা সত্তা আমরা উপলব্ধি করতে পারি না, $\frac{1}{10}$ সেকেণ্ড পরেই সেটা সম্ভব হয়। সেইজন্যই সিনেমার চলন্ত ছবিগুলি (Movie Picture) অর্থাৎ দ্রুত চলন্ত ফিল্মের অসংখ্য পৃথক পৃথক ছবিগুলিকে একই ধারাবাহিক ছবি মনে হয়। সাধারণত সিনেমায় ফিল্মের স্পীড থাকে সেকেণ্ডে 24টা ছবি, সেই গতি সেকেণ্ডে 16 বা তার নীচে হলে Slow Motion Picture হয়ে যায়, যা খেলাধূলার ছবিতে দেখান হয়। সুতরাং আমাদের প্রদত্ত (আলোচ্য) ছবিতে বেলুনটি ফেটে যাওয়ার পর $\frac{1}{10}$ সেকেণ্ডের মধ্যে সেখানে যা যা ঘটেছে তা চোখে পড়া সত্ত্বেও আমাদের অনুভূতিকেন্দ্রে তার কোন ছাপই ওঠেনি অথচ ছবিতে তা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। কারণ ছবি তোলা হয়েছে এক মিলি সেকেণ্ডের মধ্যে। এইখানেই বিজ্ঞান প্রযুক্তিতে ফটোগ্রাফির বৈশিষ্ট্য।

কিশোর বিজ্ঞানীর আসর

প্লাস্টিক ঃ পলিমার ঃ জৈবরসায়ন

গুণধর বর্মন

প্লাস্টিক কথার আদি অর্থ আকার প্রদানক্ষম বস্তু অর্থাৎ ইচ্ছানুযায়ী যাদের বিভিন্ন আকারে রূপান্তর করা যায়। যেমন—কাদামাটি মোম। এখন কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত কিছু রাসায়নিক পদার্থকেই প্লাস্টিক বলে। এদের তাপ দিয়ে বা চাপ দিয়ে অথবা একত্রে উভয় পদ্ধতি প্রয়োগে চেহারা বদলান যায়, তাই প্রয়োজনমত বিভিন্ন আকারের ছাঁচে ঢালা বা মোল্ড (mould) করা যায়। আগে প্রকৃতিজাত কিছু আঠালবস্তুকেই এই কাজে লাগান হত—যথা গঁদ (Gum), ধুনা, রজন, রবার প্রভৃতি কিছু উদ্ভিদ দেহের রস বা আঠা। তখন প্রাণীজ স্বাভাবিক প্লাস্টিকের ব্যবহার যোগ্য একমাত্র উদাহরণ ছিল লাক্ষা বা গালা, একে জতুও বলে। অসংখ্য লাক্ষা কীটের দেহনিঃসৃত জমাট রস থেকেই এই গালা বা জতু তৈরি হয় (এখনও)। অতি প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের দেশে এর ব্যবহার প্রচলিত। মহাভারতে জতু গৃহের কাহিনী এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই যুগেও ঐ লাক্ষা বা জতুর ব্যবহার অতি গুরুত্বপূর্ণ ও বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং মূলত ভারতবর্ষই হচ্ছে তার প্রধান উৎপাদন স্থান। এইগুলোকে স্বাভাবিক প্লাস্টিক বা ন্যাচারাল রেজিন বলা হয়। বিজ্ঞানের উন্নত জ্ঞানে ঐসব বস্তুর গঠন প্রকৃতি জেনে এখন কৃত্রিম উপায়ে গবেষণাগারে নানাবিধ প্লাস্টিক বা রেজিন তৈরি করা হচ্ছে। আরও জানা গেছে লাক্ষাকীট ছাড়াও অন্য বহুকীট ও জীবাণু আছে যারা স্বাভাবিক প্লাস্টিক তৈরী করে এবং সেগুলির গুরুত্বও অসীম। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের গত নভেম্বর-ডিসেম্বর '84 সংখ্যায় প্রচ্ছদ চিত্রে তাদের কিছু ছবি ও ভিতরে আংশিক পরিচিতি দেওয়া হয়েছে। বিশ্ব প্রকৃতিতে বিভিন্ন যৌগ বস্তুর সৃষ্টি ও তাদের ক্রম-বিবর্তন এবং এই পৃথিবীতে জীবনের আবির্ভাবে এই প্লাস্টিকের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, সেই নিয়ে বেশী আলোচনার আগে আমাদের কৃত্রিম প্লাস্টিক নিয়ে কিছু জানা দরকার। চোখের সামনে হাতের কাছে যা দেখছি তার পরিচয় মোটামুটি জানা না থাকলে অতীতের বৈজ্ঞানিক তথ্য বা কাহিনীগুলি সহজে বোধগম্য হবেনা এবং যথার্থ তাত্ত্বিক বিজ্ঞান অনেকটা গল্পকথা বা নিছক কল্পনার বিষয় বলেই মনে হবে।

64A, গৌরীবাড়ী লেন, কলিকাতা-700004

প্লাস্টিক পদার্থের সবই হচ্ছে বিশেষ জৈবযৌগ। এই জৈবযৌগ এবং জৈব রসায়ন সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান খুব বেশীদিনের কথা নয়, মাত্র শ'দেড়েক বছরের কথা। তার আগের বিজ্ঞানীরা ভাবতেন জীবদেহের উপাদান সমূহ অর্থাৎ প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহবস্তু এবং তার থেকে উৎপন্ন পদার্থ সব, সাধারণ প্রাণ শূন্য (non-living বা inanimate) যেকোন বস্তু থেকে একেবারে আলাদা, তাই জীবদেহের উপাদান সমূহকে বলা হয় জৈব পদার্থ বা (organic matter) এবং প্রাণহীন (inanimate) বস্তুগুলিকে স্বাভাবিক ভাবেই inorganic বা অজৈব নাম দেওয়া হয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম চতুর্থাংশ পর্যন্ত রসায়নবিদ্‌রা শুধুমাত্র অজৈব কিছু এসিড, অ্যালকালী ও লবণজাতীয় (Salts) উপাদান নিয়েই কাজ করতেন যেগুলি সাধারণ খনিজ উপাদান থেকেই পাওয়া যায়, বা খনিজবস্তু ও ধাতু সংক্রান্ত বিষয়েই সংযুক্ত। এদের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়াগুলি অনেকটা সহজেই ঘটান যায়। কিন্তু জৈব উপাদানগুলি নিয়ে কাজকরা তখন খুবই কষ্টকর ছিল। সাধারণ অজৈব উপাদানের সঙ্গে তারা সহজে মিশত না, তাপ পেলে তা বিকৃতই হয়ে যেত, সাধারণ এসিড অ্যালকালীর সঙ্গে তাদের প্রতিক্রিয়া ছিল দুর্বোধ্য, তাই অজৈব অনেক জিনিষ তাঁরা তৈরি করতে পারলেও জৈব উপাদান তৈরি করতে পারতেন না। কিভাবে ঐসব বস্তু প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহে তৈরি হয় তাতে তাঁরা বিস্ময় প্রকাশ করতেন। সেদিনের বিজ্ঞানীদের মনে তাই দৃঢ় ধারণা হয়েছিল যে জীবদেহ ও জৈববস্তু সৃষ্টিতে এক বিশেষ (অলৌকিক) শক্তি কাজ করে। জ্যাকব বার্জেলিয়াসের মত উনবিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত ও সুপ্রতিষ্ঠিত রসায়নবিদ জৈব রসায়নের স্বরূপ ও ধর্ম নিরূপণে অসমর্থ হয়ে ঐ বিশেষ শক্তির নামকরণ করেন জীবনীশক্তি বা প্রাণশক্তি—"Vital force"। প্রাণশূন্য অজৈব বস্তু সমূহের মধ্যে সেই অলৌকিক শক্তি নাই। আর মানুষের পক্ষে সেই শক্তি তৈরী করা সম্ভব নয়। সুতরাং মানুষ নিজের চেষ্টায় কোনদিনই কোন জৈব পদার্থ তৈরি করতে পারবে না, এমনকি সেবিষয়ে সঠিক কিছু জানাও তার পক্ষে সম্ভব নয়।

কিন্তু 1828 খৃস্টাব্দে তরুণ জার্মান রসায়নবিদ

ফ্রিয়েডরিখ ভোলার প্রায় আকস্মিক ভাবেই—সায়ানিক এসিড ও এ্যামোনিয়া এই দুটি পরিচিত অজৈব উপাদানকে একত্রে উত্তপ্ত করার ফলেই—কৃত্রিম উপায়ে "ইউরিয়া" তৈরি হয়ে যায়। ইউরিয়া হচ্ছে প্রাণীদের মূত্রে নিঃসৃত একটি জৈবপদার্থ। "ইউরিণ" (urine) থেকেই ইউরিয়া নাম। এতে একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে কৃত্রিম উপায়ে গবেষণাগারে জৈব পদার্থ তৈরি করা সম্ভব। আর সেই থেকেই জৈব রসায়নের কাজ সুরু এবং মানুষের চিরাচরিত চিন্তা ধারায় তার সামগ্রিক জ্ঞানভাণ্ডারে সঞ্চিত এক বদ্ধমূল অন্ধবিশ্বাসের মূলোৎপাটনের কাজও সুরু। তারপরে গবেষণাগারে কৃত্রিম উপায়ে যত বস্তু ও উপদানের সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যে এই কৃত্রিম জৈব উপাদানের সংখ্যা ও মাত্রাই বেশী। পৃথিবীতে প্রকৃতিজ আদি বস্তু সমূহের সংখ্যাও তার কাছে হার মেনে গেছে। তার চেয়েও বড়কথা জৈব কি অজৈব—যেকোন পার্থিব বস্তুর সৃষ্টি, তার গঠন-প্রকৃতি ও নানাভাবে তাদের রূপান্তরের কাজে অতীতের সেই অন্ধবিশ্বাস,—কোন অলৌকিক শক্তির প্রভাব নিয়ে প্রাণ-বাদের (Vitalism) ধারণা আজ প্রকৃত বিজ্ঞানী-মন ও বিজ্ঞানের জগত থেকে ধীরে ধীরে একেবারেই মুছে গেছে। তবে সেই গোঁড়া মতবাদ ও অন্ধবিশ্বাসের কিছু জের আজও টিকে আছে দৃঢ় সংস্কারাচ্ছন্ন প্রবীণ কিছু মনে—বিশেষ করে আমাদের মত বিজ্ঞান চেতনায় অনগ্রসর দেশগুলিতে। বলা যেতে পারে এই সব দেশে বিজ্ঞান চেতনায় এবং যথার্থ বিজ্ঞানের কাজে অনগ্রসরতার প্রধান কারণই হচ্ছে ঐ অতীতের অন্ধবিশ্বাসের প্রতি অর্থাৎ সেই অলৌকিক শক্তির প্রতি আমাদের বিশেষ আকর্ষণ।

রসায়ন শাস্ত্রে এখন কার্বন মৌল যুক্ত যে কোন যৌগ উপাদানকেই জৈব পদার্থ বলা হয়—তা জীবদেহ থেকে আসুক অথবা কৃত্রিম উপায়েই তৈরি হোক। শুধু ব্যতিক্রম আছে কার্বনের অক্সাইডস, কার্বোনেট্‌স ও সায়ানাইড যৌগগুলি নিয়ে। ঐগুলি আগে থেকেই অজৈব রসায়নের অন্তর্ভুক্ত এবং অজৈব রসায়নের রাজ্যে তাদের গতিবিধি বা প্রয়োগও বেশী। এই জৈব রসায়নে প্লাস্টিক হচ্ছে এক বিশেষ ধরণের পলিমার (Polymer)। একই জাতীয় কিছু জৈবঅণু (organic molecules) যখন পরপর যুক্ত হয়ে একটা লম্বা চেনের আকার নিয়ে বৃহৎ অণুতে (macromolecule) পরিণত হয়, তখনই তাকে বলে পলিমার। এতে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ ঐ প্রাথমিক অণু যুক্ত হতে পারে এবং তাদের সংযুক্তিতে নানান বৈচিত্র্য ঘটাতে পারে। যেমন প্রাথমিক অণুগুলি একেবারে পাশাপাশি যুক্ত হলে একটা লম্বা চেন (chain) তৈরি হয়, সেই মূল চেনের দুধারে গাছের ডালের মত নিয়মিত শাখা বা ছোট ছোট সাইডচেনও ক্রমান্বয়ে তৈরি হতে পারে। আবার আঙুর লতার মত লম্বা চেন থেকে নিয়মিত ব্যবধানে ঝুলে থাকা অসংখ্য ছোট ছোট আঙুর-গুচ্ছের আকারে অথবা লম্বা তারে ঝোলান অনেক লণ্ঠনের মত একই দিকে অনেক থোকা থোকা সাইড চেন দেখা দিতে পারে। এদের তখন বলে ভাইনিল (vinyl) চেন। ভাইন (vine) মানে আঙুরলতা। তার থেকেই ভাইনিল নাম। অনেক সময় একই উৎস (কেন্দ্র) থেকে দুই বা ততোধিক চেন সৃষ্টি হয়ে ক্রমে পাশাপাশি সমান্তরাল চলে এবং কিছু দূর পরপর পরস্পরের মধ্যে আড়াআড়ি সংযোগ স্থাপনও করে, তাতে একদিকে অতি লম্বা অন্যদিকে বেশ জটিল চেন তৈরি হয়। লম্বা হওয়ার সময় সমান্তরাল চেনগুলি পাকানো দড়ির মত প্যাঁচ খেয়ে খেয়ে যেতে পারে, প্রকৃতি রাজ্যে এবং গবেষণাগারে এইভাবে অনেক অতিকায় বৃহৎ অণু (giant molecule) তৈরি হয়েছে। এইসব বৃহৎ অণুর বা পলিমারের প্রত্যেকটি আদি একক (ইউনিট) অণুকে বলে মনোমার (monomer)। তার মানে অনেক (দুই বা অধিক) মনোমার একত্রে যুক্ত হলেই পলিমার হয়। (Poly = অনেক, Mono = এক)। অনেক সময় একই জাতীয় আদি একক না হয়ে, একাধিক ভিন্ন ধরণের একক বা মনোমার মিলেও একটি পলিমার তৈরী করতে পারে। রাসায়নিক বিশ্লেষণে এই পলিমারের বড় চেনকে ভেঙে ছোট ছোট চেনে বা একেবারে আদি একক ঐ মনোমার-এ রূপান্তর করা যায় এবং এর বিপরীত ক্রিয়াও সম্ভব। তবে কেবলমাত্র জৈব অণু থেকেই এইরকম হয়, অজৈব অণু দিয়ে পলিমার হয় না। কারণ একমাত্র কার্বন কণাই নিজেরা এবং অন্য মৌল কণাদের সঙ্গে এইভাবে পরস্পর যুক্ত হয়ে কখনও সরল চেন, কখনও বা গোলাকার রিং, কখনও রিং যুক্ত চেন অথবা বিভিন্ন জ্যামিতিক ক্ষেত্রের আকারে সংগঠিত হতে পারে। অন্য কোন মৌলকণার এই ক্ষমতা নেই। তাই প্রাথমিক জৈব অণু বা জৈব যৌগ তৈরিতে কার্বনের ভূমিকাই প্রথম এবং প্রধান, আর পলিমার তৈরির বেলাও তাই। অজৈব কণা বা অণুসমূহ থেকে জীবনের আদি উপাদান জৈব অণু ও বিভিন্ন জটিল যৌগগুলি তৈরী হওয়া সম্ভব হয়েছে এই কার্বনের বিশেষ ধর্মের জন্যই। হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, সালফার ফসফরাস, ক্লোরিন, আইয়োডিন প্রভৃতি অন্যান্য মৌলকণারা কেবল কার্বনের সঙ্গে নানাভাবে নানাভঙ্গীতে যুক্ত হতে পারে এবং তারই ফলে রাসায়নিক ক্রম বিবর্তনের(Chemical evolution) ধারায় যাবতীয় জৈব পদার্থ তথা প্রাণবস্তুর

আদি ও পরবর্তী উপাদান সমূহের ধারাবাহিক সৃষ্টি। এই বিবর্তনের বিশেষ এক পর্যায়ে প্রকৃতির নিজস্ব রসায়নাগারে বিভিন্ন পলিমার ও প্লাস্টিক পদার্থের উৎপত্তি। তবে পলিমারদের সবাইকে ইচ্ছামত শক্ত বা নরম করা যায় না অর্থাৎ সব পলিমারই প্লাস্টিক হয় না, কিন্তু প্লাস্টিক মাত্র হচ্ছে বিশেষ ধরনের পলিমার।

প্লাস্টিক পদার্থের আবার প্রাথমিকভাবে দুটো দল বা ভাগ আছে। তার একটিকে বলে থার্মোপ্লাস্টিক্স। এগুলি কিছুটা তাপ পেলেই নরম হয়, এমনকি গলেও যেতে পারে ; আবার ঠাণ্ডা হলে শক্ত হয়ে যায়। সেই সুযোগে এদের নির্দিষ্ট ছাঁচে ঢেলে এবং দরকার মত চাপ দিয়ে বিভিন্ন আকারের প্রয়োজন মাফিক জিনিসপত্র তৈরি করা যায়। এইভাবে গরম ও ঠাণ্ডা করে বারবার এদের কাঠিন্যের তারতম্য ঘটিয়ে নানাভাবে এদের চেহারার পরিবর্তন করলেও তাদের ভিতরের বস্তুধর্ম বা উপাদানগত গঠন প্রকৃতির কোন পরিবর্তন হয় না। যতবার খুশী নরম ও শক্ত করা যায় এবং প্রয়োজনমত চেহারা বদলান যায়। কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত প্রথম আবিষ্কৃত প্লাস্টিক সেলুলয়েড-ই হচ্ছে এই দলে। আর অপর দলের প্লাস্টিক বস্তুকে বলে থার্মোসেটিং বা শুধু থার্মোসেট। এদের তাপ দিয়ে প্রথমে একবার নরম মরা যায় এবং নির্দিষ্ট আকারে ছাঁচে ঢালাও যায়। কিন্তু তারপর ঠাণ্ডা হয়ে একবার জমাটবেঁধে গেলে দ্বিতীয়বার আর নরম করা যায় না, তাই আর রূপান্তর করা যায় না। তাপে এদের রাসায়নিক গঠন প্রকৃতিতে পরিবর্তণ ঘটে। তাই পরবর্তী তাপে এরা আরও কঠিনই হতে থাকে, নরম হয় না। ডিমকে সিদ্ধ করলে যেমনটা হয়। তাপ দিয়ে একবারই এদের নির্দিষ্ট আকারে সেট (Set) করা যায়। তাই থার্মোসেট। "বেকেলাইট" নামের প্লাস্টিক্স এই জাতের। এই দুই মূল দলের প্রত্যেকের মধ্যে আবার অনেক রকমফের আছে। তাদের পরস্পরের আকৃতি ও প্রকৃতিগত পার্থক্য যেমন অনেক তেমনি তাদের রাসায়নিক নামও অনেক এবং গঠন বৈচিত্র্যেও প্রভেদ। তারপরে আছে তাদের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়িক পেটেন্ট নাম। সেইদিক থেকে প্রথম তৈরী প্লাস্টিক সেলুলয়েডের কথাই ধরা যাক।

সেলুলয়েড তৈরির মূল উপাদান হচ্ছে উদ্ভিদকোষের স্বাভাবিক আবরণ সেলুলোজ (cellulose)। সেল (cell) থেকে সেলুলোজ, তার থেকেই সেলুলয়েড (celluloid)। গাছপালার সামগ্রিক দৃঢ়তা ও গঠন কাঠামোর প্রধান বস্তুই হচ্ছে এই সেলুলোজ। এক একটা গাছ যে বিরাট উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, কত বড় বড় ডালাপালা বিস্তার করে, তার প্রত্যেকটি অংশ ঝড়ে বাতাসে নানা আকর্ষণ বিকর্ষণে ও উপদ্রবে যে অভাবনীয় চাপ সহ্য করে সেই সবের জন্য প্রয়োজনীয় দৃঢ়তা, নমনীয়তা ও সহিষ্ণুতার মূলশক্তিই হচ্ছে ঐ সেলুলোজ। গাছ বা উদ্ভিদমাত্রই তাদের খাদ্য হিসাবে ক্লোরোফিলের সাহায্যে যে গ্লুকোজ তৈরি করে সেগুলি প্রত্যেক কোষের মধ্যে তারা জমিয়ে রাখার চেষ্টা করে ভবিষ্যতের জন্য। ঐ জমানো গ্লুকোজ প্রথমে দানার আকারে কোষের মধ্যে শর্করা (starch) হিসাবে জমে। আর কোষের নিজস্ব পুষ্টির জন্য প্রয়োজনাতিরিক্ত গ্লুকোজ ঐ কোষের বাইরে ধীরে ধীরে জমাট বাঁধে এবং সেলুলোজ অণুতে রূপান্তরিত হয়। তাই সেলুলোজ আসলে হচ্ছে গ্লুকোজের ঘনীভূত পলিমার (condensed polymer)। এই ঘনীভূত হওয়ার সময় গ্লুকোজ অণুগুলি এমন শক্তভাবে জোড়া লাগে যে তাদের আর বাহিরের সাধারণ শক্তি দিয়ে সহজে খোলা যায় না। কেবল প্রখর তাপে বা রাসায়নিক পদ্ধতিতেই এই জটিল পলিমারকে ভাঙ্গা যায়। সেলুলোজ অণুগুলি লম্বা সুতোর মত অসংখ্য সূক্ষ্ম আঁশ বা তন্তুর (Fibre) আকারে গাছের প্রতিটি কোষের চারদিক ঘিরে বহুদূর বিস্তৃত হয় এবঃ পরস্পরের মধ্যে দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। তুলো ও শণের আঁশগুলি হচ্ছে প্রায় বিশুদ্ধ সেলুলোজ। সেলুলোজের এই বলিষ্ঠ বাঁধনই গাছের বা তৃণলতাদির সামগ্রিক কাঠামো এবং তাদের অসীম সহিষ্ণুতা ও দৃঢ়তার মূল কথা। "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুণা"....কথার মধ্যে এই সেলুলোজ পলিমারের গঠন বৈচিত্র্য ছাড়া অন্য কোন অলৌকিকত্ব নেই।

সেই কাঠের গুঁড়োকে মণ্ড করে তাতে নাইট্রিক এ্যাসিড ও কিছু সালফিউরিক এ্যাসিড মিশিয়ে দিলে বিভিন্ন ধরণের নাইট্রোসেলুলোজ বা সেলুলোজ নাইট্রেট তৈরি হয়। সেলুলোজ পলিমারের সরল লম্বা চেনের প্রত্যেকটি গ্লুকোজ ইউনিটে তিনটি পর্যন্ত নাইট্রেট অণু সাইডচেন হিসাবে যুক্ত হতে পারে। তবে অনেক সময় তিনটি না হয়ে কমসংখ্যক নাইট্রেট অণু প্রতি গ্লুকোজ অণুতে যুক্ত হয়ে নাইট্রোসেলুলোজের গুণ ও মানের পার্থক্য সৃষ্টি করে। আলেকজাণ্ডার পার্কস্ নামে জনৈক বৃটিশ কেমিষ্ট 1853 খৃষ্টাব্দে এইভাবে কাঠের মণ্ড থেকে প্রথম সেলুলোজ নাইট্রেট তৈরি করেন। তবে তাঁর তৈরি ঐ পদার্থটি ছিল একান্ত ভঙ্গুর, চাপ দিলে তা সহজে গুড়ো হয়ে যেত, কিন্তু দেখতে ছিল ধপধপে সাদা হাতির দাঁতের মত। এই নাইট্রোসেলুলোজের নাম প্রাইরক্সিলিন (Pyroxylin)। এর আগে অবশ্য তুলোকে নাইট্রিক

এ্যাসিডে ভিজিয়ে যে বিস্ফোরক গুঁড়ো বানানো হত তাকে বন্দুক ও কামানের বারুদ হিসাবেই ব্যবহার করা হত। তাই তার চলতি নাম ছিল গানকটন্ (Guncotton)। সেটিও আসলে সেলুলোজ নাইট্রেট। তবে তার রাসায়নিক ফরমুলা তখন জানা ছিলনা। কারণ জৈব রসায়নের কাজ তখনও পুরোদমে সুরু হয়নি। এখন আমরা জানি গানকটন্ হচ্ছে সেলুলোজ ট্রাইনাইট্রেট। অর্থাৎ তার প্রত্যেক গ্লুকোজ ইউনিটে তিনটি করে নাইট্রেট অণু যুক্ত। কিন্তু পাইরক্সিলিনে নাইট্রেট অণুর সংখ্যা কম, তাই এটি গানকটনের মত উগ্র দাহ্য বিস্ফোরক নয়।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে আমেরিকায় হঠাৎ হাতির দাঁতের চাহিদা বেড়ে যায়। তখন বিলিয়ার্ড খেলার বল তৈরি হত ঐ হাতির দাঁত বা আইভরি (Ivory) দিয়েই। বড়লোকদের সেই খেলার বলের জন্য নকল আইভরি তৈরি করা যায় কিনা সেই চেষ্টা চলে। এক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ঘোষণাই করে, যিনি নকল হাতির দাঁত তৈরী করতে পারবেন তাঁকে তখনকার দিনের দশ হাজার ডলার নগদ পুরস্কার দেওয়া হবে। সারা আমেরিকায় তাতে নকল আইভরি তৈরির হিড়িক পড়ে যায়। জন ওয়েসলি হায়াত নামে নিউইয়র্কের এক ছাপাখানার কর্মী (প্রিন্টার) এই কাজে বিশেষ সাফল্য অর্জন করেন। তিনি পূর্বোক্ত পার্কসের পাইরক্সিলিনের সঙ্গে কর্পূর ও আরও কিছু মিশিয়ে কিছুটা উচ্চচাপের মধ্যে এবং বেশী তাপমাত্রায় বেশীক্ষণ ধরে উত্তপ্ত করে তার থেকে প্রকৃত প্লাস্টিকধর্মী বেশ শক্ত অথচ নমনীয় একটি বস্তু তৈরী করেন। তার নাম হয় সেলুলয়েড। সেটি বেশ সাদা রঙের হলে কি হবে তা ঠিক হাতির দাঁতের মত শক্ত না হওয়ায় তা দিয়ে যথার্থ বিলিয়ার্ডবল তৈরি সম্ভব হয় নি। ফলে প্রতিযোগিতায় ঘোষিত নগদ পুরস্কারটি হায়াত পেলেন না। কিন্তু মানুষের ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োজন ভিত্তিক প্রথম কৃত্রিম প্লাস্টিক ঐ সেলুলয়েড তৈরি করে ওয়েসলি হায়াত এক নবযুগের সূচনা করেন। সেটি 1868 খৃষ্টাব্দ। সেলুলয়েড নামটি হায়াতেরই দেওয়া। তারপরে হায়াত নিজে এবং অন্যান্য বহু বিজ্ঞান কর্মী ও বিজ্ঞান সাধকের চেষ্টায় ঐ সেলুলয়েডের প্রস্তুতি পদ্ধতি ও গুণগত মানের বহু উন্নতি সাধিত হয়েছে। সেলুলয়েডের আদি শাদা রঙের পরিবর্তে তাকে একেবারে স্বচ্ছ অথবা বিভিন্ন রঙের এবং প্রয়োজনমত কাঠিন্যের তারতম্যও করা যায়। পরে আরও কত নতুন ধরণের কৃত্রিম প্লাস্টিক তৈরি হয়েছে, তবে উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষ অবধি এই সেলুলয়েডই ছিল দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার যোগ্য একমাত্র কৃত্রিম প্লাস্টিক। প্রথমে এর ব্যবহার হত নকল দাঁত বাঁধানোর প্লেট (Denture plates) তৈরি এবং জামার শক্ত কলার (stiff collars), কাফ ও শক্ত সার্ট-ফ্রন্ট তৈরির কাজে। ক্রমে চুলের ব্রাসের হাতল, ছুরির বাঁট, চশমার ফ্রেম, জানালার পর্দা (বিশেষ করে গাড়ীর) এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছবি তোলার ফিল্ম তৈরীতে এই সেলুলয়েডের ব্যবহার বিজ্ঞান প্রযুক্তিতে এক যুগান্তর আনে। অত সুন্দর ভাবে মসৃণ স্বচ্ছ নমনীয় অথচ শক্ত এবং প্রয়োজনমত পাতলা সেলুলয়েডের শীট (sheet) ছাড়া আজকের সিনেমা জগৎ সহ যাবতীয় ফটোগ্রাফী শিল্পের তথা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিজ্ঞান প্রযুক্তিরই অগ্রগমন সম্ভব হত না। এর আগে পাতলা কাঁচের প্লেটের উপরই ফটোগ্রাফীর ছবি তোলা হত এবং তা নিয়ে কত ঝামেলাই না ছিল। 1889 খৃষ্টাব্দে নিউইয়র্কের জর্জ ইষ্টম্যান এবং নিউজার্সির মন্ত্রী হ্যানিবল গুডউইন পৃথক পৃথক ভাবেই সেলুলয়েড শীটকে নির্দিষ্ট আকারে কেটে ফটোগ্রাফীর ফিল্ম তৈরী করেন। পরে টমাস আলভা এডিসন তার আরও উন্নতি করে প্রথম মোশন পিকচার বা চলন্ত ছায়াছবি (movie picture) তৈরি করেন। আর কৃত্রিম প্লাস্টিকের চলে অভিনব অভিযান।

নাইট্রোসেলুলোজ গানকটন (সেলুলোজ ট্রাইনাইট্রেট)-কে ইথার-এ (Ether) দ্রবীভূত করলে কলোডিয়ন (Collodion) নামে আঠাল তরল প্লাস্টিক তৈরী হয়, তার থেকেও সেলুলয়েড তৈরি হয়। এই সেলুলোজ নাইট্রেট হচ্ছে খরদাহ্য বস্তু (highly inflamable), সূর্যের প্রখর আলোয় বা জলন্ত ইলেকট্রিক বাল্বের সংস্পর্শে এলে মুহূর্তে এগুলি জ্বলে উঠতে পারে। বিস্ফোরক বস্তু হিসাবেই তাই গান কটন এর ব্যবহার। সেলুলয়েড নিয়ে প্রথম দিকে এই রকম বহু দুর্ঘটনাও ঘটে। পরে সেলুলোজ নাইট্রেটের সঙ্গে অ্যামোনিয়াম ফসফেট বা টিনক্লোরাইড মিশিয়ে উন্নত ধরণের সেলুলয়েড তৈরী হয় যাতে সহজে আগুন লাগেনা। এখন অবশ্য নাইট্রিক এ্যাসিডের বদলে এসেটিক এ্যাসিডের সঙ্গে সেলুলোজকে মিশিয়ে যে সেলুলোজ এসিটেট তৈরী করা হয়, তা অনেক কম দাহ্য এবং এতে প্লাস্টিক শিল্পে অভাবনীয় ব্যবহারিক উন্নতি হয়েছে। এই সেলুলোজ এসিটেট থেকে রেয়ন তৈরি হয়। পরে সেলুলোজ জ্যানথেট (Xanthate) নামে আর একটি সেলুলোজ যৌগ তৈরি হয়েছে। যথাসম্ভব পরিষ্কার (বিশুদ্ধ) কাঠের গুড়োর মন্তকে কস্টিক সোডায় (সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড) ভাল করে মিশিয়ে তারপর তাতে কার্বন-ডাই-সালফাইড ঘুঁটে ঘুঁটে মেশালে সেলুলোজ ডাই-সালফাইড তৈরী হয়। এই ধরনের ডাই-সালফাইড যৌগকেই জ্যানথেট যৌগ বলে। এই সেলুলোজ জ্যানথেট, হালকা (dilute)

কষ্টিক সোডায় সহজে গুলে যায়, তবে ঠিক দ্রবণ হয় না, একটা তরল ঘন আঠাল বস্তু (Colloidal Suspension) হয়। তাকেই বলে ভিসকোজ (viscose), viscous থেকেই viscose নাম। এই ভিসকোজকে একটু পাতলা করে সূক্ষ্মছিদ্রযুক্ত ছাঁকনির ভিতর দিয়ে সজোরে ঠেলে বারকরে দিলে সূতোর মত সরু ধারায় তা বেরোতে থাকে। সেগুলিকে একটি সালফিউরিক এ্যাসিড সলিউশন ভরা পাত্রে ধরা হয়। ঐ এসিডের সঙ্গে কষ্টিক সোডার সহজ বিক্রিয়া ঘটে সোডিয়াম সালফেট উৎপন্ন হয়। সেলুলোজ জ্যানথেট থেকেও তার সালফাইড অংশ ঐ এ্যাসিডে দ্রবীভূত হয়। ফলে নতুন করে খাঁটি সেলুলোজ পুনর্গঠিত হয় এবং ঐ এ্যাসিড মাধ্যমে তা তৎক্ষনাৎ শক্ত হয়ে নির্দিষ্ট সূক্ষতার সূতোয় বা তন্তুতে (Filament) পরিণত হয়, একে তাই পুনর্গঠিত বা রি-জেনারেটেড (regenerated) সেলুলোজ বলে। তবে আসল সেলুলোজ থেকে এই পুনর্গঠিত সেলুলোজ পলিমারের চেন লম্বায় অনেক ছোট হয়। বর্তমানের রেয়ন শিল্প মুখ্যতঃ এই ভিসকোজ পদ্ধতিতেই চলে। সেলুলোজ এ্যাসিটেট থেকে অন্যভাবে রেয়ন তৈরীর করা আগে বলা হয়েছে। এই রেয়ন থেকে অথবা রেয়নের সঙ্গে তুলো বা পশম মিশিয়ে কত রকমের বস্ত্র পোষাকাদি এখন তৈরী হয় তা সবাই জানে ও দেখে।

আবার ঐ ভিসকোজকে সূক্ষ্ম ছিদ্রের ছাঁকনির মধ্য দিয়ে পাস না করিয়ে দুটো চওড়া প্লেট বা পাটাতনের মাঝে নির্দিষ্ট সরু স্লিটের (slit মানে সংকীর্ণ ফাঁক) মধ্য দিয়ে পাস (Pass) করালে তা সূতোর মতন না হয়ে পাতলা চাদরের (sheet) আকার নিয়ে এ্যাসিড পাত্রে পড়ে শক্ত হয়ে খাঁটি সেলুলোজের স্বচ্ছ শিট তৈরী করে। তারই নাম সেলোফেন (Cellophane)। ভিসকোজ রেয়নকে চেষ্টা করলে অসম্ভব শক্ত করা যায় যা তুলো বা রেশম সূতোর চেয়েও বেশি শক্ত হয়। আবার সেলুলোজ থেকে সবরকমের সেলুলোজ ইথার (Cellulose-ether) যথা মিথাইল, ইথাইল, বেঞ্জাইল প্রভৃতি সলুলোজ ইথার তৈরি করা যায় এবং এগুলি বস্ত্রশিল্প, ফিল্ম ও প্লাস্টিক-শিল্পে নানাভাবে ব্যবহৃত হয়ে মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় কত অভাবই না মিটিয়ে চলেছে। সুতরাং প্রথম প্লাস্টিক সেলুলয়েড আবিষ্কারের পরে ঐ মূল উপদান সেলুলোজ থেকে কত রকমের কত নামের ও কত কাজের গুরুত্বপূর্ণ প্লাস্টিক বস্তু সব একের পর এক তৈরী হয়ে চলেছে তা ভাবতে অবাক লাগে। প্রকৃতির অজানা রহস্য গুলির মূলসূত্র একবার কষ্ট করে জানতে পারলেই মানুষ তার কষ্টিবলে প্রকৃতিকে বশে আনে; বিরূপ প্রকৃতির ভ্রুকুটিতে আজ আর হতাশ হয়ে কোন অলৌকিক শক্তির পায়ে মাথাখোঁড়ে না, আপন শক্তিতেই বিরুদ্ধ পরিবেশ ও প্রকৃতিকে জয় করার চেষ্টা করে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যাই হচ্ছে তার সেই সংগ্রামের মূল হাতিয়ার। তবে সেগুলিকে কিভাবে কাজে লাগাবে সেই মানসিকতা বা মননশীলতাকে সমষ্টিগত ভাবেই নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, কারও একার খেয়ালে নয়। এই সামগ্রিক সমাজচেতনা থেকে বিচ্ছিন্ন বিজ্ঞানী সেই কল্পিত খেয়ালী স্রষ্টার মতই আপন অজ্ঞাতে বিধ্বংসী ফ্র্যাকেনস্টাইনের জন্ম দিতে পারে। জীবনদর্শনের মহানতত্ত্বের কথা বলতে বা জানতে হলেও জীবনসৃষ্টির ও জীবনের সামগ্রিক বিকাশের বৈজ্ঞানিক ধারাগুলিকে যথাসম্ভব ভালভাবে জেনে নিয়ে সহজ ভাবেই তাকে গ্রহণ করতে হবে। নিছক কল্পনা দিয়ে বিজ্ঞান হয় না, জ্ঞানের মূল সত্যও সেখানে থাকে না, এই কথা সবাইকে বিশেষভাবে তরুণ ও কিশোরদের ভাল করেই বুঝে নিতে হবে। জীবনবিজ্ঞানের মূলরহস্য যে জৈব রসায়ন ও প্রাণরসায়নের মধ্যে নিহিত তার কিছুটা যথাসম্ভব সহজভাবে বুঝে নিতে হবে। তাই এই প্লাস্টিক ও পলিমার সম্বন্ধে আরও জানতে হবে।

নভেম্বর-ডিসেম্বর (1984) সংখ্যার শব্দ-শৃঙ্খলের সমাধান

লম্বালম্বি—1. রেডিওলজি 2. গামা 4. মাখন 6. নাভি 7. ইথার 8. মেসন 10. থমসন 13. বাদাম 15. রিকেট 16. লিটার 17. জিওলজী 18. অ্যামিবা 19. মিথেন 20. রুই।

পাশাপাশি—3. বিসমাথ 5. ডিনামাইট 9. বেনথস 11. বরফ 12. জীবাণু 14. ডরিস 18 অ্যামমিটার 21. বামন 22. সাইকোলজী।

পরিষদ সংবাদ

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর 91তম জন্মদিবস উদযাপন

1লা জানুয়ারী'85 বিজ্ঞান পরিষদের 'সত্যেন্দ্র ভবনে' আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর 91তম জন্মদিবস উদযাপিত হয়। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন পরিষদ সভাপতি ডঃ জয়ন্ত বসু। সভায় আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের জীবন ও কর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করেন পরিষদ-এর কর্মসচিব ডঃ সুকুমার গুপ্ত, শ্রীশিবচন্দ্র ঘোষ, ডাঃ গুণধর বর্মন, শ্রীসুকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুগলকান্তি রায়, ডঃ দিবাকর মখোপাধ্যায়, শ্রীরবীন্দ্রনাথ দে। সভাশেষে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বাসভবনে গিয়ে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের 37তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন ও আচার্য সত্যেন বসু সরণী'র ফলক উন্মোচন

25শে জানুয়ারী বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ও কলিকাতা পৌরসভার যৌথ উদ্যোগে সকাল 10 ঘটিকায় ভি. আই. রোড ও উল্টাডাঙ্গা মেন রোডের সংযোগস্থলে আচার্য সত্যেন বসু সরণির ফলক উন্মোচন অনষ্ঠান হয়। তাতে সভাপতিত্ব করেন বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি ডঃ জয়ন্ত বসু। ফলক উন্মোচন করেন পশ্চিমবঙ্গের পৌরমন্ত্রী শ্রীপ্রশান্ত শূর। অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন পরিষদের কর্মসচিব ডঃ সুকুমার গুপ্ত ও শ্রীজীবনতারা হালদার।

25শে জানুয়ারী '85 শুক্রবার সকালে ভি. আই. পি. রোড ও উল্টাডাঙ্গা মেন রোডের সংযোগস্থলে "আচার্য সত্যেন বসু সরণির" উদ্বোধন করছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পৌরমন্ত্রী শ্রীপ্রশান্ত শূর। ছবি—শ্রীরামকিংকর চক্রবর্তী।

25শে জানুয়ারী '85 শুক্রবার বিকালে সত্যেন্দ্র ভবনে পরিষদের 37তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমি ও ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী শ্রীবিনয় চৌধুরী 37টি প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করছেন। ছবি—শ্রীরাম কিংকর চক্রবর্তী।

25শে জানুয়ারী '85 বিকালে 'সত্যেন্দ্র ভবনে' বিজ্ঞান পরিষদের 37-তন প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী উদযাপিত হয়। 37টি প্রদীপ প্রজ্বলিত করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন পশ্চিমবঙ্গের ভূমি ও ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী শ্রীবিনয় কৃষ্ণ চৌধুরী। অনুষ্ঠানে সভাপতির এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন যথাক্রমে পরিষদের সভাপতি ডঃ জয়ন্ত বসু এবং পশ্চিমবঙ্গের পরিবেশ মন্ত্রী শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়। পরিষদের কর্মসচিব ডঃ সুকুমার গুপ্ত পরিষদের ইতিহাস ও কার্যবিবরণী সভায় বিবৃত করেন। শ্রীবিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে সমাজের অগ্রগতি সাধনে বিজ্ঞান পরিষদের ভূমিকার প্রশংসা করেন। শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায় পরিবেশ দূষণ রোধে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রয়াসের কথা উল্লেখ করে এই বিষয়ে বিজ্ঞান পরিষদের সহযোগিতা কামনা করেন, তার পরে ডঃ জয়ন্ত বসু তাঁর ভাষণে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্দেশ্য এবং কার্যাবলী সম্পর্কে ভাষণ দেন।

পরিশেষে ডঃ জগৎজীবন ঘোষ 'পরিবেশ-দূষণ' সম্পর্কে লোকরঞ্জক বক্তৃতা প্রদান করেন।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা 700006 থেকে প্রকাশিত এবং গুপ্ত প্রেস 37/7, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-700009 থেকে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

আবেদন

1948 সাল থেকে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা বিষয়ে পরিকল্পিত ধ্যান ধারণা পরিষদ পালন করে আসছে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার প্রকাশনের মাধ্যমে। ইতিমধ্যে পরিষদ কিছু অমূল্য রচনা বাংলাভাষায় প্রকাশ করেছে। বর্তমান পত্রিকা প্রকাশনা ছাড়াও পরিষদ বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে যাতে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান মানসিকতার বিকাশ ঘটে। গ্রাম বাংলার পল্লীতে, আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে ও শহরের বস্তিতে, যেখানে বেশীর ভাগ মানুষ জ্ঞানের আলো থেকে এখনও বঞ্চিত, তাদের কাছে বিজ্ঞানের মঙ্গলময় রূপ তুলে ধরতে পরিষদ বদ্ধপরিকর। এইসব বিজ্ঞানভিত্তিক কর্মসূচীর রূপায়নে অর্থের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। অথচ পরিষদের দারুণ অর্থাভাব। তাই পরিষদ সরকার, বেসরকারী সংস্থা, ব্যবসায়ী ও সহৃদয় ব্যক্তির কাছে অর্থসাহায্যের আন্তরিক আবেদন জানাচ্ছে। সাধারণ মানুষের জন্য তৈরী আচার্য্য বসুর পরিষদ যে কোনও সামান্য দানও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করে অবহেলিত মানুষের স্বার্থে ব্যয় করবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে পরিষদে প্রদত্ত সর্বপ্রকার দান আয়করমুক্ত।

কর্মসূচী

1. সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান মানসিকতা সৃষ্টি করা এবং বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন গড়ে তোলা।
2. 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকাকে সাধারণের নিকট আরও আকর্ষনীয় করে তোলা।
3. পরিষদের মাধ্যমে গ্রামবাংলার বিজ্ঞান ক্লাবগুলির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা এবং তাদের বিজ্ঞান ভিত্তিক জনহিতকর কাজে উৎসাহিত করা।
4. প্রতি বছরে পশ্চিম বাংলায় অন্ততঃ একবার বিজ্ঞান সম্মেলনের ব্যবস্থা করা।
5. গ্রামবাংলার বিভিন্ন মেলায় বিজ্ঞান ক্লাবগুলিকে নিয়ে পোষ্টার প্রদর্শনী বিজ্ঞানভিত্তিক সিনেমা, আলোচনা-চক্র অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে বিজ্ঞান, জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করা।
6. বছরের শেষে বিজ্ঞান মেলার আয়োজন করা।
7. হাতে-কলমে কারীগরী বিদ্যা শিখিয়ে ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রী ও নাগরিকদের স্বনির্ভরশীল করা। ব্যয়ভার বহনের জন্য সামান্য অর্থের বিনিময়ে টি ভি, টেপরেকর্ডার, রেকর্ড-প্লেয়ার, ট্রানজিস্টার এমারজেন্সি বৈদ্যুতিক আলো, ফটোগ্রাফী বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা দেওয়া।
8. মাটি পরীক্ষার কাজে শিক্ষা দিয়ে গ্রামের বিজ্ঞান ক্লাবগুলিকে সাধারণ চাষীদের সাহায্য করতে উৎসাহিত করা।
9. সাধারণ মানুষের জন্য বিজ্ঞান প্রবন্ধ থেকে মৌলিক গবেষণাপত্র পর্যন্ত বাংলা ভাষায় প্রকাশ এবং জনপ্রিয় বিজ্ঞানের বই ও বিজ্ঞান সাধক চরিতমালা প্রকাশ।
10. যোগব্যায়াম ও তার গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন।
11. পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগারটি সুসমৃদ্ধ করে গড়ে তোলা।
12. পরিষদ ভবনে 'বিজ্ঞান সংগ্রহশালা' স্থাপন করা।
13. নির্বিচারে যথেচ্ছ গাছপালা ও বনজঙ্গল ধ্বংসের ফলে পরিবেশ দূষণ ও আবহাওয়ার মারাত্মক পরিবর্তনের ভয়াবহতা সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সজাগ করা।
14. নির্বিচারে বন্যপ্রাণী ধ্বংসের দরুণ বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্যের বিঘ্ন ঘটার বিপদ সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা।
15. যাবতীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করা।
16. শহর ও গ্রামের প্রতিটি স্কুল, কলেজ ও গ্রন্থাগারে পরিষদের মুখপত্র 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার গ্রাহকীকরণের মাধ্যমে পরিষদের আদর্শ ও উদ্দেশ্য প্রচার।

সুকুমার গুপ্ত
কর্মসচিব

লেখকদের প্রতি নিবেদন

1. বিজ্ঞান পরিষদের আদর্শ অনুযায়ী জনসাধারণকে আকৃষ্ট করার মত সমাজের কল্যাণমূলক বিষয়বস্তু সহজবোধ্য ভাষায় সুলিখিত হওয়া প্রয়োজন।
2. মূল প্রতিপাদ্য বিষয় এবং পূর্ণ ঠিকানাসহ লেখকের পরিচিতি পৃথক কাগজে অবশ্যই লিখে দিতে হবে।
3. চলিত ভাষা এবং চলন্তিকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট বানান ও পরিভাষা ব্যবহৃত হবে। উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে আন্তর্জাতিক শব্দটি বাংলা হরফে লিখে ব্র্যাকেটে ইংরাজী শব্দটিও দিতে হবে। আন্তর্জাতিক সংখ্যা এবং মেট্রিক পদ্ধতি ব্যবহৃত হবে।
4. মোটামুটি 3000 শব্দের মধ্যে রচনা সীমাবদ্ধ থাকা বাঞ্ছনীয়।
5. বিভিন্ন ফীচার, সমকালীন বিজ্ঞান গবেষণা ও প্রযুক্তিবিদ্যার সংবাদ এবং বিজ্ঞান বিষয়ক সুন্দর আকর্ষণীয় ফটোগ্রাফীও গ্রহণীয়।
6. রচনার সঙ্গে চিত্র থাকলে আর্ট পেপারে চাইনিজ কালিতে সুঅঙ্কিত হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন।
7. প্রত্যেক চিত্র প্রস্থে 8 সে. মি. কিংবা এর গুণিতকের (16 সে মি 24 সে. মি.) মাপে অঙ্কিত হওয়া প্রয়োজন।
8. অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রবন্ধের মৌলিকত্ব বজায় রেখে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জনে সম্পাদক মন্ডলীর অধিকার থাকবে।
9. প্রত্যেক প্রবন্ধ ফীচার-এর শেষে গ্রন্থপঞ্জী থাকা বাঞ্ছনীয়।
10. জ্ঞান ও বিজ্ঞানে পুস্তক সমালোচনার জন্য দুই কপি পুস্তক পাঠাতে হবে।
11. ফুলস্ক্যাপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় যথেষ্ট মার্জিন এবং প্রতি লাইনের পর বেশ কিছুটা ফাঁক রেখে পরিস্কার হস্তাক্ষরে প্রবন্ধ লিখতে হবে।
12. প্রতি প্রবন্ধের শুরুতে পৃথক ভাবে প্রবন্ধের সংক্ষিসার দেওয়া আবশ্যিক।

সম্পাদনা সচিব

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ফেব্রুয়ারি, 1985
38তম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা

বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের অনুশীলন করে বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ ও সমাজকে বিজ্ঞান-সচেতন করা এবং সমাজের কল্যাণকল্পে বিজ্ঞানের প্রয়োগ করা পরিষদের উদ্দেশ্য।

বিষয় সূচী

প্রচ্ছদ পরিচিতি : একটি বিস্ময়কর ফটোগ্রাফ—ছবিটি মানুষের একটি জীবন্ত রক্তকোষের। তবে তার সাধারণ বাইরের চেহারার আলোকচিত্র নয়। এটি বিশেষ টেকনিকে মাইক্রোস্কোপে X-ray দিয়ে তোলা ছবি যাতে জীবন্ত রক্তকোষটির ভিতরের অতি পুঙ্খানুপুঙ্খ দিক সব দেখা সম্ভব হয়েছে। জীবন্তকোষের ভিতরের এইরকম চিত্র তোলা এর আগে সম্ভব হয় নি। এই প্রথম নিউইয়র্কের ইয়র্কটাউন-হাইটসে IBM কেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা সেই কাজে সফল হয়েছেন। এতে X-ray flash-এর সময় ছিল এক সেকেণ্ডের এক-শ' কোটি ভাগের এক ভাগ ক্ষণমাত্র (1,000 millions of a second)। সেকেণ্ডের এই ভগ্নাংশ সময়টুকুর কথাই তো অকল্পনীয় বিস্ময়কর। তারপর জীবন্তকোষের ভিতরের ছবি আর এক অসাধারণ কাজ। এই চেষ্টা আগে যতবারই করা হয়েছে তাতে কেবল মৃতকোষের চিত্রই উঠেছে। জীবন্ত অবস্থায় তার ভিতরকার সক্রিয় অংশের খুঁটিনাটি বোঝা যায় নি। জীবন্তকোষের ভিতরে কাজকর্ম কিভাবে চলে সেই বিষয়ে প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানে এই ছবি বিশেষ সহায়ক হবে। বিশেষ করে রক্তক্ষরণের সময় রক্তকোষের ভিতরে কি ঘটে তা প্রত্যক্ষ জানা যাবে। ফলে রক্ত-বিকৃতি রোগ (Blood disorders), হৃদযন্ত্রের গোলোযোগ বিশেষ করে স্ট্রোক (Strokes) জাতীয় রোগের গবেষণায় অনেক নতুন ও নিখুঁত তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাবে।

[ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিস—কলিকাতার সৌজন্যে]

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা : 30·00

মূল্য : 2·50

যোগাযোগের ঠিকানা :

কর্মসচিব

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট

কলিকাতা-700006

ফোন : 55-0660

জ্ঞা ন ও বি জ্ঞা ন

অষ্টাত্রিংশত্তম বর্ষ ফেব্রুয়ারী, 1985 দ্বিতীয় সংখ্যা

বিজ্ঞান ও সাহিত্য

রতনমোহন খাঁ

1309 বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—"সহিত শব্দ হইতে সাহিত্য শব্দের উৎপত্তি। অতএব ধাতুগত অর্থ ধরিলে সাহিত্য শব্দের মধ্যে একটি মিলনের ভাব দেখিতে পাওয়া যায়।" এই মিলনের মধ্যেই নিহিত আছে সাহিত্যের সংজ্ঞা। আমরা ইন্দ্রিয় সাহায্যে দেখি, অনুভব করি। কিন্তু এটাই সব নয়। বহির্জগৎ ছাড়াও আর একটি জগৎ আছে। সেটি আমাদের মনের জগৎ। প্রতিটি মানুষের এটি একেবারে নিজস্ব। বহির্জগতের দৃশ্যগুলি সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনা, ভয়-বিস্ময়, বাস্তব-কল্পনায় মাখামাখি হয়ে মনোজগতে এক নূতন রূপ পরিগ্রহ করে। এখানেই শেষ নয়। পুরাণে মহাদেবের জটায় বন্ধন ছাড়িয়ে গঙ্গা যেমন ধরিত্রীর বুকে নেমে এসেছিল, তেমনি মনোজগতের সীমানা ছাড়িয়ে নানা অনুভূতির জারকে জারিত অভিব্যক্তিগুলি বাইরে বেরিয়ে আসতে চায়। তখনই আমাদের মধ্যে আসে আবেগ, আসে প্রকাশের ইচ্ছা, আসে ব্যক্ত করার অস্থিরতা। এই অস্থিরতা, এই আকুলতা, এই ব্যগ্রতা রূপ পরিগ্রহ করে ভাষায়, অঙ্কনে, না হয় মূর্তি গঠনে। আমরা কথা বলি বা লিখি ভাষার মাধ্যমে। কিন্তু এই বলা বা লেখা ঠিক সাহিত্য নয়। যখন ভাষার নৈপুণ্যে রূপ, রস ও সৌন্দর্যের ডালি বেয়ে মনোজগত থেকে বেরিয়ে আসা এ কাও নিজস্ব অভিব্যক্তিগুলি সবার অন্তত অধিকাংশের মনে রেখাপাত করে, অর্থাৎ অপরের চেতনার সঙ্গে সহজে স্বচ্ছন্দে মিলিত হয় তখনই ঐ প্রকাশ হয় সাহিত্য।

সমালোচকের চোখে সাহিত্য দু-ধারায় বিভক্ত, একটি ভাবাত্মক আর অপরটি জ্ঞানাত্মক। ভাবাত্মক সাহিত্যে কল্পনার রাজ্য অসীম, ওখানে বাঁধন একেবারে আলগা। জ্ঞানাত্মক সাহিত্যে কল্পনার অবকাশ আছে, তবে ঐ রাজ্য কঠিন নিয়ম-শৃঙ্খলে বাঁধা, চলতে হয় সাবধানে। এ কারণেই মনে হয় রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানাত্মক রচনাকে সাহিত্য বলতে কিছুটা সংকোচ বোধ করেছেন। সাহিত্যে সামগ্রীতে লিখেছেন—"চিরকাল যদি মানুষ আপনার কোন জিনিষ মানুষের কাছে উজ্জ্বল নবীনভাবে অমর করিয়া রাখিতে চায় তবে তাহাকে ভাবের কথাই আশ্রয় করিতে হয়। এই জন্য সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন জ্ঞানের বিষয় নহে, ভাবের বিষয়।" সংকোচ ছিল, তবে গোঁড়ামি ছিল না। তাই তিনি জ্ঞানের বিষয়ের মধ্যেও ভাবের বন্যা এনেছেন। 'বিশ্ব পরিচয়ই' এই এর সাক্ষ্য বহন করেছে।

বিজ্ঞান জ্ঞানের বিষয়। তাই বিজ্ঞান নিয়ে যে সাহিত্য সেটি জ্ঞানাত্মক পর্যায়ে পড়ে। সাহিত্য পদবাচ্য হতে হলে সাহিত্যের গুণগুলি থাকতেই হবে, অর্থাৎ লেখকের মনোজগতের চিন্তা-ভাবনার রঙে-রসে সিঞ্চিত নিজস্ব অভিব্যক্তিগুলি অন্যের মনোজগতে শিহরণ জাগাবে। আবার ঐ প্রকাশে থাকবে বিজ্ঞানের নিগূঢ় বন্ধন, অর্থাৎ বিজ্ঞানের তথ্য, তত্ত্ব, নিয়মাবলী যা পরীক্ষিত সত্য সেগুলি অটুট থাকবে, কোনরকম বিকৃত হবে না। এ কারণেই কল্পবিজ্ঞানকে ঠিক বিজ্ঞান-সাহিত্য বলা যায় না। ওখানে ভাবের পাল্লাই ভারী, বিজ্ঞানের মোড়কে বেঁধে পরিবেশন মাত্র যেন sugar coating tablet। বিজ্ঞান সাহিত্য কি হবে, কিভাবে লিখতে হবে, ভবিষ্যৎ রূপরেখা কি হবে, এরূপ কোন খসড়া সাহিত্যের ক্ষেত্রে চলে না। এরূপ গাইড লাইন স্বাভাবিক বিকাশের পরিপন্থী। সাহিত্য সৃষ্টি হয় মানুষের মনোজগতের নিজস্বতা থেকে, দল বেঁধে উচ্চৈস্বরে পথ পরিক্রমা করে সাহিত্য সৃষ্টি হয় না। বিদ্যাসাগরীয় যুগ থেকে, বঙ্কিমী যুগ তারপর রাবীন্দ্রিক যুগে উত্তরণ কোন পূর্ব রচিত পরিকল্পনার ফল নয়। সমাজ স্থবির নয়, স্থির নয়, গতিশীল। সেই সঙ্গে সাহিত্যও গতিশীল। সে আপন খেয়ালে পথ বেছে নেয়, এটাই স্বাভাবিক, এটাই সুস্থতার লক্ষণ, প্রাণের লক্ষণ। বিজ্ঞান-সাহিত্যও

সাহিত্য, তাই কোন বাঁধা ধরা ছকে একে চালিত করা সম্ভব নয়। বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে প্রযুক্তিগত অন্বেষণের প্রভাব আমাদের সমাজের উপর পড়বেই, আর তার প্রতিফলন ঘটবে আমাদের জীবনযাত্রার, আমাদের চিন্তার। ফলে শুধু বিজ্ঞানের লেখার নয়, সমগ্র সাহিত্যের গতিপথ পরিবর্তিত হবে কালের সঙ্গে। ইতিহাস এ কথাই বলে। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের চর্চা বিদেশীরাই শুরু করে। প্রথম বই মে-গণিত (1817 খৃস্টাব্দ)। পুস্তকের ভাষা ও সাহিত্যজনোচিত গুণ আজকের পাঠকের কাছে হাস্যকর মনে হবে। তারপর সমাজে বিজ্ঞানের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। বিজ্ঞানের প্রসার হয়েছে, চাহিদা বেড়েছে, বিজ্ঞান লেখার ধারাও বদলেছে। বিজ্ঞান প্রবন্ধ বঙ্কিমী প্রতিভার সাহিত্যের আঙিনায় স্থায়ী ঠাঁই করে নিয়েছে। রাবীন্দ্রিক ও রামেন্দ্রিক যুগ পার হয়ে বিজ্ঞান সাহিত্য সমৃদ্ধির পথে যে এগিয়ে চলেছে, সেটা অস্বীকার করা যায় না।

প্রশ্ন করা যেতে পারে—ভাবাত্মক সাহিত্যের মত বিজ্ঞান সাহিত্য সমৃদ্ধ হচ্ছে না কেন। জনপ্রিয় হচ্ছে না কেন? প্রথমতঃ বিজ্ঞান-সাহিত্য রচনা করতে হলে, বিজ্ঞানকে ভাল করে জানতে হবে আর সেই সঙ্গে রসোত্তীর্ণ রচনায় পারদর্শী হতে হবে, বিজ্ঞান লেখক হবেন বিজ্ঞানী ও সাহিত্যিক। এদুয়ের সমন্বয় খুবই বিরল। যিনি বিজ্ঞান জানেন তিনি বিজ্ঞানের পঠন-পাঠন, গবেষণা ও প্রয়োগেই আনন্দ পান, মনের জগতের কারবারি হয়ে অপরের মন জয় করতে এগিয়ে আসেন না। আবার অনেক বিজ্ঞানী এরূপ মতও পোষণ করেন—বিজ্ঞানের সঙ্গে সাহিত্যের প্রয়োজন কি? বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনই বিজ্ঞানীর লক্ষ্য হলে, বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু বিজ্ঞানের ভাষাতেই প্রকাশ করলেই যথেষ্ট। দ্বিতীয়তঃ ভাবাত্মক সাহিত্যের ক্ষেত্রে বহু লেখক সাহিত্য সৃষ্টিকে জীবনের আদর্শ ও পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন। ফলে একাগ্র সাধনায় ভাবাত্মক সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে ও হচ্ছে। এধরণের বিজ্ঞান লেখক চোখে পড়ে না। তৃতীয়তঃ বিজ্ঞান বিষয়ে যাঁরা লেখেন তাঁদের অনেকেই ঠিক নিজস্ব আবেগ বা আকুতিতে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে লেখেন বলে মনে হয় না। যেন অন্যের তাগিদে বা খানিকটা সামাজিক দায়িত্ব পালনে লেখনী ধরেন। ফলে এসব লেখা হয় অনুকরণ দোষে দুষ্ট বা অনুবাদধর্মী। এগুলি সৃষ্টি নয় তাই চিরন্তন সাহিত্যের পর্যায়ে উঠে না, পাঠকের মনও জয় করতে পারে না। এছাড়াও আছে নানা সমস্যা। তবুও পাঠক হিসাবে মনে হয় এ সাহিত্যের সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল।

"যদি দেশটাকে বৈজ্ঞানিক করিতে হয়, আর তাহা না করিলেও বিজ্ঞান শিক্ষা প্রকৃষ্ট রূপে ফলবতী হইবে না, তাহা হইলে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শিখিতে হইবে। দুই চারিজন ইংরেজিতে বিজ্ঞান শিখিয়া কি করিবেন ;······তাহাতে সমাজের ধাতু ফিরিবে কেন? সামাজিক 'আবহাওয়া' কেমন করিয়া বদলাইবে? কিন্তু দেশটাকে বৈজ্ঞানিক করিতে হইলে যাহাকে তাহাকে যেখানে সেখানে বিজ্ঞানের কথা শুনাইতে হইবে। কেহ ইচ্ছা করিয়া শুনুক আর নাই শুনুক, দশবার নিকটে বলিলে দুইবার শুনিতেই হইবে। এইরূপ শুনিতে শুনিতেই জাতির ধাতু পরিবর্তিত হয়। ধাতু পরিবর্তিত হইলেই প্রয়োজনীয় শিক্ষার মূল সুদৃঢ় রূপে স্থাপিত হয়। অতএব বাঙ্গালাকে বৈজ্ঞানিক করিতে হইলে বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান শিখাইতে হইবে।"

বঙ্গে বিজ্ঞান (বঙ্গদর্শন, কার্তিক, 1289)

জৈবনিক

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ক্ষিতি, অপ্‌, তেজঃ, মরুৎ এবং আকাশ, বহুকাল হইতে ভারতবর্ষে ভৌতিক সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহারাই পঞ্চভূত—আর কেহ ভূত নহে। এক্ষণে ইউরোপ হইতে নূতন বিজ্ঞান-শাস্ত্র আসিয়া তাঁহাদিগকে সিংহাসন-চ্যুত করিয়াছেন। ভূত বলিয়া আর কেহ তাঁহাদিগকে বড় মানে না। নূতন বিজ্ঞান-শাস্ত্র বলেন, আমি বিলাত হইতে নূতন ভূত আনিয়াছি, তোমরা আবার কে? যদি ক্ষিত্যাদি জড়সড় হইয়া বলেন যে, আমরা প্রাচীন ভূত, কণাদকপিলাদির দ্বারা ভৌতিক রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া প্রতি জীব-শরীরে বাস করিতেছি, বিলাতী বিজ্ঞান বলেন, তোমরা আদৌ ভূত নও। আমার "Elementary Substances" দেখ—তাহারাই ভূত; তাহার মধ্যে তোমরা কই। তুমি, আকাশ, তুমি কেহই নও—সম্বন্ধবাচক শব্দ মাত্র। তুমি, তেজঃ, তুমি কেবল একটি ক্রিয়া,—গতিবিশেষ মাত্র। আর, ক্ষিতি, অপ্‌, মরুৎ, তোমরা এক একজন দুই তিন বা ততোধিক ভূতে নির্ম্মিত। তোমরা আবার কিসের ভূত?

যদি ভারতবর্ষ এমন সহজে ভূতছাড়া হইত, তবে ক্ষতি ছিল না। কিন্তু এখনও অনেকে পঞ্চ ভূতের প্রতি ভক্তিবিশিষ্ট। বাস্তবিক ভূত ছাড়াইলে একটু বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হয়। ভূতবাদীরা বলিবেন যে, যদি ক্ষিত্যাদি ভূত নহে, তবে আমাদিগের এ শরীর কোথা হইতে? কিসে নির্ম্মিত হইল? নূতন বিজ্ঞান বলেন যে, "তোমাদের পুরাণ কথায় একেবারে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া এ প্রশ্নের উত্তর দিতে চাহি না। জীব-শরীরের একটি প্রধান ভাগ যে জল, ইহা অবশ্য স্বীকার করিব; আর মরুতের সঙ্গে শরীরের একটি বিশেষ সম্বন্ধ আছে,—এমন কি, শরীরের বায়ু-কোষে বায়ু না গেলে প্রাণের ধ্বংস হয়, ইহাও স্বীকার করি। তেজঃ সম্বন্ধে ইহা স্বীকার করিতে তোমাদের বৈশেষিকেরা যে জঠরাগ্নি কল্পনা করিয়াছেন, তাহার অস্তিত্ব আমার লিবিগ অতি সুকৌশলে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আর যদি সন্তাপকেই তেজঃ বল, তবে মানি যে, ইহা জীবদেহে অহরহঃ বিরাজ করে, ইহার লাঘব হইলে প্রাণের ধ্বংস হয়। সোডা পোতাস প্রভৃতি পৃথিবী বটে তাহা অত্যল্প পরিমাণে শরীর মধ্যে আছে। আর আকাশ ছাড়া কিছুই নাই; কেন না, আকাশ সম্বন্ধজ্ঞাপক মাত্র। অতএব শরীরে পঞ্চ ভূতের অস্তিত্ব এ প্রকারে স্বীকার করিলাম। কিন্তু আমার প্রধান আপত্তি তিনটি। প্রথম, শরীরের সারাংশ এ সকলে নির্ম্মিত নহে; এ সকল ভিন্ন অন্য অনেক প্রকার উপকরণ আছে। দ্বিতীয়, ইহাদের ভূত বল কেন? তৃতীয়, ইহার সঙ্গে প্রাণাপানাদি বায়ু প্রভৃতি যে কতকগুলি কথা বল, বোধ হয়, হিন্দু রাজাদিগের আমলে আবকারির আইন প্রচলিত থাকিলে, সে কথাগুলির প্রচার হইত না।"

"দেখ, এই তোমার সম্মুখে ইষ্টক-নির্ম্মিত মনুষ্যের বাসগৃহ। ইহা ইষ্টক-নির্ম্মিত, সুতরাং ইহাতে পৃথিবী আছে। গৃহস্থ ইহাতে পানাদির জন্য কলসী কলসী জল সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে। পাকার্থ এবং আলোকের জন্য অগ্নি জ্বালিয়াছে, সুতরাং তেজঃও বর্ত্তমান। আকাশ, গৃহমধ্যে সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান। সর্ব্বত্র বায়ু যাতায়াত করিতেছে। সুতরাং এ গৃহও পঞ্চভূত-নির্ম্মিত? তুমি যেমন বল, মনুষ্যের এ স্থানে প্রাণ-বায়ু, ও স্থানে অপান-বায়ু ইত্যাদি, আমিও তেমনি বলিতেছি, এই দ্বার-পথে যে বায়ু বহিতেছে, তাহা প্রাণ-বায়ু ও বাতায়ন-পথে যাহা বহিতেছে, তাহা আপান-বায়ু ইত্যাদি। তোমারও নির্দ্দেশ যেমন অমূলক ও প্রমাণশূন্য, আমার নির্দ্দেশও তেমনি প্রমাণশূন্য। তুমি জীব-শরীর সম্বন্ধে যাহা বলিবে, আমি এই অট্টালিকা সম্বন্ধে তাহাই বলিব। তুমি যদি আমার কথা অপ্রমাণ করিতে যাও, তোমার স্বপক্ষের কথাও অপ্রমাণ হইয়া পড়িবে। তবে কি তুমি আমার এই অট্টালিকাটি জীব বলিয়া স্বীকার করিবে?"

প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রে এবং আধুনিক বিজ্ঞানে এই প্রকার বিবাদ। ভারতবর্ষবাসীরা মধ্যস্থ। মধ্যস্থেরা তিন শ্রেণীভুক্ত। এক শ্রেণীর মধ্যস্থেরা বলেন যে, "প্রাচীন দর্শন, আমাদের দেশীয়। যাহা আমাদের দেশীয়, তাহাই ভাল, তাহাই মান্য এবং যথার্থ। আধুনিক বিজ্ঞান বিদেশী, যাহারা খ্রীষ্টান হইয়াছে, সন্ধ্যা আহ্নিক করে না, উহারাই তাহাকে মানে। আমাদের দর্শন সিদ্ধ ঋষি-প্রণীত, তাহাদিগের মনুষ্যাতীত জ্ঞান ছিল, দিব্য চক্ষে সকল দেখিতে পাইতেন; কেন না, তাঁহারা প্রাচীন এবং এদেশীয়। আধুনিক বিজ্ঞান যাঁহাদিগের প্রণীত, তাঁহারা সামান্য মনুষ্য। সুতরাং প্রাচীন মতই মানিব।"

আর এক শ্রেণীর মধ্যস্থ আছেন, তাঁহারা বলেন, "কোন্‌টি মানিতে হইবে, তাহা জানি না। দর্শনে কি আছে, তাহা জানি না, বিজ্ঞানে কি আছে, তাহাও জানি না। কালেজে তোতা পাখীর মত কিছু বিজ্ঞান শিখিয়াছিলাম বটে, কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা কর, কেন সে সব মানি, তবে আমার কোন উত্তর নাই। যদি দুই মানিলে চলে, তবে দুই মানি। তবে যদি নিতান্ত পীড়াপীড়ি কর, তবে বিজ্ঞানই মানি; কেন না, তা না মানিলে, লোকে কালি মূর্খ বলে। বিজ্ঞান মানিলে লোকে বলিবে,

এ ইংরেজি জানে, সে গৌরব ছাড়িতে পারি না। আর বিজ্ঞান মানিলে বিনা কষ্টে হিন্দুয়ানির বাঁধাবাঁধি হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। সে অল্প সুখ নহে। সুতরাং বিজ্ঞানই মানিব।”

তৃতীয় শ্রেণীর মহাত্মেরা বলেন, “প্রাচীন দর্শনশাস্ত্র দেশী বলিয়া তত প্রতি আমাদিগের বিশেষ প্রীতি বা অপ্রীতি নাই। আধুনিক বিজ্ঞান সাহেবি বলিয়া তাহাকে ভক্তি বা অভক্তি করি না। যেটি যথার্থ হইবে, তাহাই মানিব—ইহাতে কেহ খ্রীষ্টান বা কেহ মূর্খ বলে, তাহাতে ক্ষতি বোধ করি না। কোন্‌টি যথার্থ, কোন্‌টি অযথার্থ, তাহা মীমাংসা করিবে কে? আমরা আপনার বুদ্ধিমত মীমাংসা করিব;—পরের বুদ্ধিতে যাইব না। দার্শনিকেরা আমাদিগের দেশী লোক বলিয়া তাঁহাদিগকে সর্বজ্ঞ মনে করিব না—ইংরেজরা রাজা বলিয়া তাঁহাদিগকে অভ্রান্ত মনে করি না। “সর্বজ্ঞ” বা “সিদ্ধ” মানি না, আধুনিক মনুষ্যাপেক্ষা প্রাচীন ঋষিদিগের কোন প্রকার বিশেষ জ্ঞানের উপায় ছিল, তাহা মানি না—কেন না, যাহা অনৈসর্গিক, তাহা মানিব না। বরং ইহাই বলি যে, প্রাচীনাপেক্ষা আধুনিকদিগের অধিক জ্ঞানবত্তার সম্ভাবনা। কেন না, কোন বংশে যদি পুরুষানুক্রমে সকলেই কিছু কিছু সঞ্চয় করিয়া যায়, তবে প্রপিতামহ অপেক্ষা প্রপৌত্র ধনবান্ হইবে সন্দেহ নাই। তবে আপনার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এ সকল গুরুতর তত্ত্বের মীমাংসা করিব কি প্রকারে? প্রমাণানুসারে। যিনি প্রমাণ দেখাইবেন, তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিব। যিনি কেবল আনুমানিক কথা বলিবেন, তাহার কোন প্রমাণ দেখাইবেন না, তিনি পিতৃপিতামহ হইলেও তাঁহার কথায় অশ্রদ্ধা করিব। দার্শনিকেরা কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বলেন, ক হইতে খ হইয়াছে, গর মধ্যে ঘ আছে ইত্যাদি। তাঁহারা তাহার কোন প্রমাণ নির্দেশ করেন না; কোন প্রমাণের অনুসন্ধান করিয়াছেন, এমত কথা বলেন না, সন্ধান করিলেও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। যদি কখন প্রমাণ নির্দেশ করেন, সে প্রমাণও আনুমানিক বা কাল্পনিক, তাহার আবার প্রমাণের প্রয়োজন; তাহাও পাওয়া যায় না। অতএব আজন্ম মূর্খ হইয়া থাকিতে হয়, সেও ভাল, তথাপি দর্শন মানিব না। এ দিকে বিজ্ঞান আমাদিগকে বলিতেছে, ‘আমি তোমাকে সহসা বিশ্বাস করিতে বলি না, যে সহসা বিশ্বাস করে, আমি তাহার প্রতি অনুগ্রহ করি না; সে যেন আমার কাছে আইসে না। আমি যাহা তোমার কাছে প্রমাণের দ্বারা প্রতিপন্ন করিব, তুমি তাহাই বিশ্বাস করিও, তাহার তিলার্দ্ধ অধিক বিশ্বাস করিলে তুমি আমার ত্যাজ্য। আমি যে প্রমাণ দিব, তাহা প্রত্যক্ষ। একজনে সকল কাণ্ড প্রত্যক্ষ করিতে পারে না, এজন্য কতকগুলি তোমাকে অন্যের প্রত্যক্ষের কথা শুনিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে। কিন্তু যেটিতে তোমার সন্দেহ হইবে, সেইটি তুমি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিও। সর্বদা আমার প্রতি সন্দেহ করিও। দর্শনের প্রতি সন্দেহ করিলেই, সে ভস্ম হইয়া যায়, কিন্তু সন্দেহেই আমার পুষ্টি। আমি জীব-শরীর সম্বন্ধে যাহা বলিতেছি, আমার সঙ্গে শবচ্ছেদ-গৃহে ও রাসায়নিক পরীক্ষাশালায় আইস। সকলই প্রত্যক্ষ দেখাইব।’ এইরূপ অভিহিত হইয়া, বিজ্ঞানের গৃহে গিয়া সকলই প্রমাণ সহিত দেখিয়া আসিয়াছি। সুতরাং বিজ্ঞানেই আমাদের বিশ্বাস।”

যাঁহারা এই সকল কথা শুনিয়া কুতূহলাবিশিষ্ট হইবেন, তাঁহারা বিজ্ঞান-মাতার আহ্বানানুসারে তাঁহার শবচ্ছেদ-গৃহে এবং রাসায়নিক পরীক্ষাশালায় গিয়া দেখুন, পঞ্চ ভূতের কি দুর্দশা হইয়াছে। জীব-শরীরের ভৌতিক তত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা যদি দুই একটা কথা বলিয়া রাখি, তবে তাঁহাদিগের পথ একটু সুগম হইবে।

বিষয়বাহুল্যভয়ে কেবল একটি তত্ত্বই আমরা সংক্ষেপে বুঝাইব। আমরা অনুমান করিয়া রাখিলাম যে, পাঠক জীবের শারীরিক নির্মাণ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। গঠনের কথা বলিব না—গঠনের সামগ্রীর কথা বলিব।

এক বিন্দু শোণিত লইয়া অণুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা পরীক্ষা কর। তাহাতে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্রাকার বস্তু দেখিবে। অধিকাংশই রক্তবর্ণ এবং সেই চক্রাণুসমূহের বর্ণ হেতুই শোণিতের বর্ণ রক্ত, তাহাও দেখিবে। তন্মধ্যে মধ্যে মধ্যে, আর কতকগুলি দেখিবে, তাহা রক্তবর্ণ নহে,—বর্ণহীন, রক্ত-চক্রাণু হইতে কিঞ্চিৎ বড়, প্রকৃত চক্রাকার নহে—আকারের কোন নিয়ম নাই। শরীরাভ্যন্তরে যে তাপ, পরীক্ষ্যমান রক্তবিন্দু যদি সেইরূপ তাপসংযুক্ত রাখা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, এই বর্ণহীন চক্রাণুসকল সজীব পদার্থের ন্যায় আচরণ করিবে। আপনারা যথেচ্ছা চলিয়া বেড়াইবে, আকার পরিবর্ত্তন করিবে, কখন কোন অঙ্গ বাড়াইয়া দিবে, কখন কোন ভাগ সংকীর্ণ করিয়া লইবে। এইগুলি যে পদার্থের সমষ্টি, তাহাকে ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকেরা প্রোটোপ্লাস্‌ম্ বা বিওপ্লাস্‌ম্ বলেন। আমরা ইহাকে “জৈবনিক” বলিলাম। ইহাই জীব-শরীর নির্মাণের একমাত্র সামগ্রী। যাহাতে ইহা আছে, তাহাই জীব; যাহাতে ইহা নাই, তাহা জীব নহে। দেখা যাউক, এই সামগ্রীটি কি।

একণকার বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা অনেকেই দেখিয়াছেন, আচার্য্যেরা বৈদ্যুতীয় যন্ত্রসাহায্যে জল উড়াইয়া দেন। বাস্তবিক জল উড়িয়া যায় না; জল অন্তর্হিত হয় বটে, কিন্তু তাহার স্থানে দুইটি বায়বীয় পদার্থ পাওয়া যায়—পরীক্ষক সেই দুইটি পৃথক্ পৃথক্ পাত্রে ধরিয়া রাখেন। সেই দুইটি পুনর্বার একত্রিত করিয়া আগুন দিলে আবার জল হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই দুইটি পদার্থের রাসায়নিক সংযোগে জলের জন্ম। ইহার একটির নাম অম্লজান বায়ু; দ্বিতীয়টির নাম জলজান বায়ু।

যে বায়ু পৃথিবী ব্যাপিয়া রহিয়াছে, ইহাতেও অম্লজান আছে। অম্লজান ভিন্ন আর একটি বায়বীয় পদার্থও তাহাতে আছে। সেটি যবক্ষারেও আছে বলিয়া তাহার নাম যবক্ষারজান হইয়াছে।

অম্লজান ও যবক্ষারজান সাধারণ বায়ুতে রাসায়নিক সংযোগে যুক্ত নহে। মিশ্রিত মাত্র। যাঁহারা রসায়নবিদ্যা প্রথম শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহারা শুনিয়া চমৎকৃত হয়েন যে, হীরক ও অঙ্গার একই বস্তু। বাস্তবিক এ কথা সত্য এবং পরীক্ষাধীন। যে দ্রব্য উভয়ের সার, তাহার নাম হইয়াছে অঙ্গারজান। কাষ্ঠ তৃণ তৈলাদি যাহা দাহ করা যায়, তাহার দাহ্য ভাগ এই অঙ্গারজান। অঙ্গারজানের সহিত অম্লজানের রাসায়নিক যোগ-ক্রিয়াকে দাহ বলে। এই চারিটি পদার্থ সর্বদা পরস্পরে রাসায়নিক যোগে সংযুক্ত হয়। যথা, অম্লজানে জলজানে জল হয়। অম্লজানে যবক্ষারজানে নাইট্রিক আসিড নামক প্রসিদ্ধ ঔষধ হয়। অম্লজানে, অঙ্গারজানে আঙ্গারিক অম্ল (কার্বণিক আসিড) হয়। যে বাষ্পের কারণ সোডা ওয়াটার উছলিয়া উঠে, সে এই পদার্থ। দীপশিখা হইতে এবং মনুষ্য-নিশ্বাসে ইহা বাহির হইয়া থাকে। যবক্ষারজান এবং জলজানে আমোনিয়া নামক প্রসিদ্ধ তেজস্বী ঔষধ হইয়া থাকে। অঙ্গারজান এবং জলজানে তারপিন তৈল প্রভৃতি অনেকগুলি তৈলবৎ এবং অন্যান্য সামগ্রী হয়। ইত্যাদি।

এই চারিটি সামগ্রী যেমন পরস্পরের সহিত রাসায়নিক যোগে যুক্ত হয়, সেরূপ অন্যান্য সামগ্রীর সহিত যুক্ত হয় এবং সেই সংযোগেই এই পৃথিবী নির্ম্মিত। যথা, সোডিয়মের সঙ্গে ও ক্লোরাইনের সঙ্গে অম্লজানের সংযোগবিশেষে লবণ; চূণের সঙ্গে অম্লজান ও অঙ্গারজানের সংযোগবিশেষে মর্ম্মরাদি নানাবিধ প্রস্তর হয়; সিলিকন এবং আলুমিনার সঙ্গে অম্লজানের সংযোগে নানাবিধ মৃত্তিকা।

দুইটি সামগ্রীর রাসায়নিক সংযোগে যে এক ফল হয়, এমত নহে। নানা মাত্রায় নানা দ্রব্যের সংযোগে নানা দ্রব্য হইয়া থাকে।

জলজান, অম্লজান, অঙ্গারজান এবং যবক্ষারজান, এই চারিটিই একত্রে সংযুক্ত হইয়া থাকে। সেই সংযোগের ফল জৈবনিক। জৈবনিকে এই চারিটি সামগ্রীই থাকে, আর কিছুই থাকে না, এমত নহে; অম্লজানাদির সঙ্গে কখন কখন গন্ধক, কখন পোতাস ইত্যাদি সামগ্রী থাকে। কিন্তু যে পদার্থে এই চারিটিই নাই, তাহা জৈবনিক নহে; যাহাতে এই চারিটিই আছে, তাহাই জৈবনিক। জীবমাত্রেই এই জৈবনিকে গঠিত; জীব ভিন্ন আর কিছুতেই জৈবনিক নাই। এই স্থলে জীব শব্দে কেবল প্রাণী বুঝাইতেছে এমত নহে। উদ্ভিদও জীব; কেন না, তাহাদিগেরও জন্ম, বৃদ্ধি, পুষ্টি ও মৃত্যু আছে। অতএব উদ্ভিদের শরীরও জৈবনিকে নির্ম্মিত। কিন্তু সচেতন ও অচেতন জীবে এ বিষয়ে একটু বিশেষ প্রভেদ আছে।

জৈবনিক জীব-শরীর মধ্যেই পাওয়া যায়, অন্যত্র পাওয়া যায় না। জীব শরীরে কোথা হইতে জৈবনিক আইসে? জৈবনিক জীব-শরীরে প্রস্তুত হইয়া থাকে। উদ্ভিদ্ জীব, ভূমি এবং বায়ু হইতে অম্লজানাদি গ্রহণ করিয়া আপন শরীর মধ্যে তৎসমুদায়ের রাসায়নিক সংযোগ সম্পাদন করিয়া জৈবনিক প্রস্তুত করে; সেই জৈবনিকে আপন শরীর নির্ম্মাণ করে। কিন্তু নির্জ্জীব পদার্থ হইতে জৈবনিক পদার্থ প্রস্তুত করার যে শক্তি, তাহা উদ্ভিদেরই আছে। সচেতন জীবের এই শক্তি নাই; ইহারা স্বয়ং জৈবনিক প্রস্তুত করিতে পারে না; উদ্ভিদ্কে ভোজন করিয়া প্রস্তুত জৈবনিক সংগ্রহপূর্ব্বক শরীর পোষণ করে। কোন সচেতন জীব মৃত্তিকা খাইয়া প্রাণ ধারণ করিতে পারে না, কিন্তু তৃণ ধান্য প্রভৃতি সেই মৃত্তিকার রস পান করিয়া জীবন ধারণ করিতেছে; কেন না, উহারা তাহা হইতে জৈবনিক প্রস্তুত করে; বৃষ মৃত্তিকা খাইবে না, কিন্তু সেই তৃণ ধান্যাদি খাইয়া তাহা হইতে জৈবনিক গ্রহণ করিবে, ব্যাঘ্র আবার সেই বৃষকে খাইয়া জৈবনিক সংগ্রহ করিবে। যাঁহারা এদেশের জমীদারগণের দ্বেষক, তাঁহারা বলিতে পারেন যে, উদ্ভিদ্ জীবেরা এ জগতে চাষা, তাহারা উৎপাদন করে; অপরেরা জমীদার, তাহারা চাষার উপার্জ্জন কাড়িয়া খায়, আপনারা কিছু করে না।

এখন দেখ, এক জৈবনিকে সর্ব্বজীব নির্ম্মিত। যে ধান ছড়াইয়া তুমি পাখীকে খাওয়াইতেছ, সে ধান যে সামগ্রী, পাখীও সেই সামগ্রী, তুমিও সেই সামগ্রী। যে কুসুম ঘ্রাণ মাত্র লইয়া, লোকমোহিনী সুন্দরী ফেলিয়া দিতেছেন, সুন্দরীও যাহা, কুসুমও তাই। কীটও যাহা, সম্রাট্ও তাই। যে হংসপুচ্ছলেখনীতে আমি লিখিতেছি, সেও যাহা, আমিও তাই। সকলই জৈবনিক। প্রভেদও গুরুতর। জয়পুরী শ্বেত প্রস্তরে তোমার জলপান পাত্র বা ভোজন-পাত্র নির্ম্মিত হইয়াছে; সেই প্রস্তরে তাজমহল এবং জুমা মসজিদও নির্ম্মিত হইয়াছে। উভয়ে প্রভেদ নাই কে বলিবে? গোষ্পদেও জল, সমুদ্রেও জল, গোষ্পদে সমুদ্রে প্রভেদ নাই কে বলিবে?

কিন্তু স্থূল কথা বলিতে বাকি আছে। জৈবনিক ভিন্ন জীবন নাই, যেখানে জীবন, সেইখানে জৈবনিক তাহার পূর্ব্বগামী। "অন্যথা সিদ্ধিশূন্যস্য নিয়তা পূর্ব্ববর্ত্তিতা কারণত্বং" এ কথা যদি সত্য হয়, তবে জৈবনিকই জীবনের কারণ। জৈবনিক ভিন্ন জীবন কুত্রাপি সিদ্ধ নহে এবং জৈবনিক জীবনের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী বটে। অতএব আমাদের এই চঞ্চল, সুখদুঃখবহুল, বহু স্নেহাস্পদ জীবন, কেবল জৈবনিকের ক্রিয়া, রাসায়নিক সংযোগ সমবেত জড় পদার্থের ফল। নিউটনের বিজ্ঞান, কালিদাসের কবিতা, হাম্বোল্ট্ বা শঙ্করাচার্য্যের পাণ্ডিত্য—সকলই জড় পদার্থের ক্রিয়া; শাক্যসিংহের ধর্ম্মজ্ঞান, আকবরের শৌর্য্য, কোমতের দর্শনবিদ্যা সকলই জড়ের গতি। তোমার বনিতার প্রেম, বালকের অমৃত ভাষা, পিতার সদুপদেশ—সকলই জড় পদার্থের আকুঞ্চন সম্প্রসারণ মাত্র—জৈবনিক ভিন্ন ভিতরে আর ঐন্দ্রজালিক কেহ নাই। যে যশের জন্য তুমি প্রাণপাত করিতেছ, সে এই জৈবনিকের ক্রিয়া—যেমন সমুদ্রগর্জ্জন এক প্রকার জড়পদার্থকৃত কোলাহল, যশ তেমনি জড়পদার্থকৃত অন্য প্রকার কোলাহল মাত্র। এই সর্ব্বকর্ত্তা জৈবনিক অম্ল[illegible] অঙ্গারজান এবং যবক্ষারজানের রাসায়নিক সমষ্টি [illegible] এই চারিটি ভৌতিক

পদার্থই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় সর্বকর্তা। ইহারা প্রকৃত ভূত, এবং এই ভূতের কাণ্ডসকল আশ্চর্য বটে। পাঠক দেখিবেন যে, আমাদের পূর্বপরিচিত পঞ্চ ভূত হইতে এই আধুনিক ভূতগণের যে প্রভেদ, তাহা কেবল প্রমাণগত। নচেৎ উভয়েরই ফল প্রকৃতিবাদ (Materialism), সাংখ্যের প্রকৃতিবাদ হইতে আধুনিক প্রকৃতিবাদের প্রভেদ, প্রধানতঃ প্রমাণগত। তবে আধুনিক বলেন, ক্ষিত্যাদি ভূত নহে, আমাদিগের পরিচিত এই ভূতগুলিই ভূত। যেই ভূত হউক, তাহাতে আমাদের বিশেষ ক্ষতি নাই,—কেন না, মনুষ্যজাতি ভূতছাড়া হইল না।

[বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ]

ধানের গুরুত্ব

ধানের গুরুত্ব সম্বন্ধে ডঃ এম. এস. স্বামীনাথন বলেন এশিয়া, আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকার প্রায় 15,000 লক্ষ লোকের খাদ্য তথা ক্যালরি ও আমিষের সূত্র হল ধান। বিকাশশীল দেশগুলির খাদ্যশস্য চাষের জমির এক তৃতীয়াংশে হয় ধানের চাষ। 36টি দেশের 100,000 হেক্টর জমিতে ধানের চাষ হয় যেসব অঞ্চলের মাথা প্রতি বাৎসরিক উপার্জন 100 ডলার। পৃথিবীর মোট লোকসংখ্যার অর্ধেক বাস করে দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব এবং পূর্ব এশিয়ায়। যার আয়তন পৃথিবীর স্থলভাগের মাত্র 15%। এখানকার অধিবাসীদের প্রধান খাদ্যশস্য ধান; এদের বর্তমান পুষ্টি পরিমাণ বজায় রাখার জন্য বৎসরে 80 লক্ষ টন চালের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে।

ধান বিভিন্ন পরিবেশে হয়। 50 উত্তর দ্রাঘিমা থেকে 50 দক্ষিণ দ্রাঘিমা পর্যন্ত ধান হতে দেখা যায়। নানারকম আবহাওয়া ও মাটিতে ধান হতে পারে। এই ফসলের বিভিন্ন পরিবেশে মানিয়ে নেবার ক্ষমতা অসীম, তাই আদি মানবের যুগ থেকেই এই ফসলের গুরুত্ব। একে একটি বাস্তব ফসল বলা যায়। কারণ যদিও ধানের চেয়ে গমের উৎপাদন বেশী, কিন্তু চাল, গমের চেয়ে বেশী পরিমাণ সরাসরি খাদ্য হিসেবে ব্যবহার হয়। গমের অর্ধেকই পশু খাদ্য। তেমনি ভুট্টা, জোয়ার বাজরা, বার্লীও অনেকটা পশু খাদ্য হিসেবে ব্যবহার হয়। যদিও ধানে খুব উচ্চমাত্রায় আমিষ পদার্থ থাকে না, কিন্তু এর আমিষের গুণগত উৎকর্ষ বেশী। অতি প্রয়োজনীয় অ্যামাইনো অ্যাসিড লাইসিন আছে যা মাছ বা ডালের সঙ্গে চমৎকার পুষ্টি যোগাতে পারে।

[ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ]

মৌমাছি পালন

মধু প্রকৃতির অন্যতম দান। স্বাদে, গন্ধে, পুষ্টিতে মধু অনবদ্য। মধুর ব্যবহারও অনেক। ওষুধ, রুটি, বিস্কুটের কারখানা, মদ, বিলাস দ্রব্য, তামাক প্রভৃতি নানা শিল্পে মধুর ব্যবহার। মৌচাকের মোমও শিল্পে ব্যবহার হয়। মধু ও মোমই মৌমাছি শুধু দেয় না। ফসলের প্রজননেও মৌমাছির বিরাট অবদান আছে।

মৌমাছি পালন—প্রকৃতি থেকে মৌমাছিকে কাঠের ঘরে এনে বসিয়ে দেওয়া। বাক্সে বসিয়ে দেবার পর এই বাক্স কৃষিক্ষেত্রে, বাগিচায় বা বনে রেখে দেওয়া হয়। বাড়ীর পেছন দিকেও জায়গা থাকলে এই বাক্স বসানো যায়। এরূপ 10—12টি বাক্স থেকে বছরে 1 কুইন্টাল পরিমাণ মক্ষিকা আহরণ করা যায়।

মৌমাছির সামাজিক জীবন অপূর্ব। একটি মৌমাছি আয়ে 15,000—20,000 কর্মী মক্ষিকা থাকে যার বন্ধ্যা শ্রমিক জাতের। বাচ্চা মৌমাছিদেরও এরাই খাওয়ায়। শত্রুর হাত থেকে কলোনী রক্ষা করা। পরাগ, মধু এবং জলকণা আহরণ করা এদের কাজ। মধু এবং পরাগ মৌমাছিরা খায় এবং উদ্বৃত্ত মধু মৌচাকে জমা হয়।

মৌমাছি পালনের যন্ত্রপাতি নিতান্ত সাধারণ। যে কোন সাধারণ গ্রামের মিস্ত্রী বাক্স তৈরি করতে পারে। এছাড়া মধু বার করার যন্ত্র, দস্তানা, ছুরি, টুল দরকার মৌমাছি পালনের জন্য।

[ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ]

ভারতবর্ষে প্রাচীন গণিত-চর্চা ঃ বিশুদ্ধ ও ফলিত

প্রভাসচন্দ্র কর*

আধুনিক গণিত—হয়তো সাধারণভাবে—'য়ুরোপীয় গণিত' হিসেবে আখ্যায়িত। বিষয়টা প্রাচীন ভারতবর্ষীয় গণিতের কাছে সমধিক ঋণী। কতটা? এর জবাব কঠিন। অতীতের সেই প্রাচীন যুগে ভারতবর্ষের সঙ্গে অন্যান্য দেশের আদান-প্রদান, —ভাবে, ভাষায় ও বিদ্যায়—কি ধরনে হয়েছিল বা চলে এসেছিল, তার সম্পূর্ণ ইতিহাস একরূপ অপরিজ্ঞাত; সুতরাং, কোন্ বিষয়ে বা কোন্ কোন্ বিষয়গুলিতে কার কাছে কে ঋণী, তা সঠিক বলা শক্ত, কল্পনা করা ততটা কঠিন ব্যাপার নয়। এসব অসুবিধা সত্ত্বেও, সন্দেহাতীতরূপে মন্তব্য করা যায় যে, আধুনিক গণিত শাস্ত্র ভারতবর্ষীয় প্রাচীন গণিতের নিকট বিশেষ ভাবে ঋণী। এমন কি, অত্যুক্তির ভয় না করে, বলা যেতে পারে, ভারতবর্ষীয় প্রাচীন গণিত বর্তমান গণিতের জন্মদাতা।

আবার এমন অনেক গণিতীয় (এই বিশেষণটি ব্যবহার করেছেন শ্রীসুরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় D.Sc. তাঁর প্রবেশিকা-জ্যামিতিতে তবে সচরাচর 'গাণিতিক' শব্দটি ব্যবহার করা হয় বিশেষণরূপে) তথ্য পাওয়া যায়, সেগুলি ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত ও উদ্ভূত হয়েও, য়ুরোপীয়গণের কাছে ছিল অজ্ঞাত। অতঃপর অনেক কাল পরে আধুনিক পণ্ডিতগণকে (সাধারণত য়ুরোপীয়) সেগুলি নবরূপে উদ্ভাবন করতে হয়েছিল নূতন কায়দায়! এর জন্যও অবশ্য আধুনিক গণিত ঋণী ভারতবর্ষীয় পুরানো দিনের গণিতের কাছে, তবে হয়তো বা পরোক্ষভাবে, কারণ সেগুলির আবিষ্কারের সম্মান এবং কৃতিত্ব ভারতবর্ষীয়গণেরই প্রাপ্য ও লভ্য। য়ুরোপীয়, সবিশেষ গ্রীক, নামকরণ অনুসারে আমরা এ যুক্তির অবতারণায় প্রয়াস পাব নিম্নোক্ত ভাবে।[1]

পাশ্চাত্য গণিত-বিজ্ঞানে Pythagorean Theorem নামটি বহুশ্রুত। এ স্থলে আমরা নামটির যাথার্থ্য বিষয়ে কিছু বলতে ইচ্ছা করি না। অধ্যাপক Russell তাঁর The ABC of Relativity (4th imp. 1931) গ্রন্থমধ্যে বলেই বলেছেন (পৃঃ 95 অনূদিত) 'ইতিহাসে মহানুতম চরিত্রগুলির অনেকগুলির মতো, Pythagoras হয়তো কখনও জীবিত ছিলেন না, তিনি আধা-উপাখ্যানমূলক চরিত্র। আমি অবশ্য ধরে নেবো যে, তিনি বিদ্যমান ছিলেন, মোটামুটি কনফুশিয়াস ও বুদ্ধের সমসাময়িক'।

খৃস্ট পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে Pythagoras নাকি পূর্বোক্ত উপপাদ্যটি আবিষ্কার করেছিলেন। ঐ উপপাদ্য-মধ্যে অন্যতম ঃ একটি আয়তক্ষেত্রের বা সমকোণী ত্রিভুজের কর্ণের বর্গফল, বাহুদ্বয়ের বর্গের যোগফলের সমান। বোধায়ন ও আপস্তম্ব-সঙ্কলিত 'শুল্ব সূত্র' গ্রন্থমধ্যে (শুল্ব—অর্থাৎ রজ্জু বা দড়ি দিয়ে জ্যামিতিক ক্ষেত্রের পরিমাণ নির্ণীত হতো; বলা বাহুল্য সূত্রগুলি অতীব প্রাচীন এবং বৈদিক সাহিত্যের অংশবিশেষ) হিসাবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রতত্ত্ব এটি সন্নিবিষ্ট ছিল।

শুল্ব-সূত্র মধ্যে অন্যতর নিয়ম—নির্দিষ্ট ক্ষেত্রফল যুক্ত বর্গক্ষেত্রের বাহু পরিমাণ নির্ণয় অর্থাৎ যে কোন সংখ্যার বর্গমূল নির্ণয়-বিধি এই সম্পর্কে বর্গমূল নির্ণয়ের নিম্নলিখিত পদ্ধতিটি প্রণিধানযোগ্য—

$$\sqrt{2} = 1 + \frac{1}{৩} + \frac{1}{১২} - \frac{1}{৪০৮}$$

এ-বিধির সাহায্যে ষষ্ঠ দশমিক স্থান পর্যন্ত নির্ভুল ফল পাওয়া যায়। সেই প্রাচীনতম যুগে মাত্র রজ্জু-মাপের সাহায্যে এতটা সূক্ষ্ম ফল পাওয়া গিয়েছিল, এটাই লক্ষণীয়!

শুল্ব সূত্রগুলির মধ্যে আর একটি—বৃত্তকে বর্গক্ষেত্রে এবং বর্গক্ষেত্রকে বৃত্ত-ক্ষেত্রে পরিণত করার নিয়ম। নিয়মটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বহুকাল ধরে বৃত্তাকার ক্ষেত্রের সমান বর্গক্ষেত্র নির্ধারণের প্রচেষ্টা অনেক দেশ-দেশান্তরে চলেছিল। গ্রীক পণ্ডিত Anakagoras (500?—428 খৃঃ পূঃ,—The Random House Dictionary of the English Language, College Edition) নাকি প্রথমে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে, চেষ্টা চালিয়েছিলেন। এটি একটি দুরূহ সমস্যারূপে পরিগণিত হতো।

সকলেরই জানা আছে যে, বৃত্তের পরিধির সঙ্গে ব্যাসের যে অনুপাত—(গ্রীক, অক্ষর 'পাই' দ্বারা চিহ্নিত হয়ে থাকে) তার যথার্থ ফলের উপর নির্ভর করে থাকে ঐ বর্গক্ষেত্র-নির্মাণের সাফল্য। শতাব্দীর পর শতাব্দীর বৃথা চেষ্টাতে, মাত্র অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রমাণিত হলো যে, উক্ত অনুপাত, গণিতের পরিভাষায়, অমেয়, incommensurable!

* 182/2, গোপাল লাল ঠাকুর রোড, বরাহনগর, কলিকাতা-700035

ভারতবর্ষীয় শুল্ব-সূত্রে এ সম্পর্কে যে কয়েকটি নিয়ম পাওয়া যায়, তার মধ্যে নিম্নলিখিত নিয়মটি সূক্ষ্মতায় যেমন অকাট্য, তেমনি নিপুণ উদ্ভাবনী পরিপাট্যে। বর্গক্ষেত্রের বাহু এবং বৃত্তের ব্যাস-অনুপাত বিষয়ক বিধিটি এই—

$$\text{বাহু} = \text{ব্যাস} \times \left(1 - \frac{1}{8} \quad \frac{1}{8\times29} \quad \frac{1}{8\times29\times6} \;. \quad \frac{1}{8\times29\times6\times8}\right)$$

ঐ অনুপাতের ফল, আমাদের এখনকার সুপরিচিত ফলাফলের সঙ্গে তুলনায়, দেখতে পাই দ্বিতীয় দশমিক স্থান পর্যন্ত শুদ্ধ থাকতে।

শুল্ব সূত্রের পর ও প্রাক্-আর্যভট্ট সময়

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, শুল্ব-সূত্রাদির পর এবং আর্যভট্টের পূর্ব (অর্থাৎ খৃস্টীয় পঞ্চম শতাব্দী) পর্যন্ত ভারতবর্ষে বিশুদ্ধ গণিত-চর্চার কোন ইতিহাস পাওয়া যায় নি। ঐ সময়ে জ্যোতিষ-চর্চার ইতিহাস, বেশি না হয়ে, কিছু কিছু অন্তত পাওয়া যায়। সূর্যসিদ্ধান্ত শ্রেণীর জ্যোতিষ-গ্রন্থ সমকালীন। সুতরাং সমসাময়িক কোন গণিত-গ্রন্থের অপ্রাপ্তিতে এটা সিদ্ধান্ত করা খুবই অন্যায় হবে যে, জটিল জ্যোতিষ-আলোচনায় যে ধরণের গণনাদির প্রয়োজন হতো, তার জন্য ঐ সময়ে ভারতবর্ষে বিশুদ্ধ গণিত চর্চা উপেক্ষিত রয়েছিল। বরং এর বিপরীতটুকুই ঠিক।

আর ভারতবর্ষীয় জ্যোতির্বিদ্যা কত প্রাচীন তা একটি মাত্র প্রামাণ্য উক্তি নিয়ে সমর্থন করলাম :

The knowledge of the Brahmins in astronomy is not inconsiderable and seems to have been of great antiquity[2]. যুগে যুগে এই প্রবাহ বয়ে গিয়েছিল অব্যাহত। বারাণসীতে স্থাপিত হয়েছিল মানমন্দির :

At Benaras is a prodigious observatory with instruments...made of stone, constructed with amazing exactness......a brief account given of it by Robert Barker Kt. in Philosophical Transactions vol. IXVIII p. 598.[3] এই নিবন্ধ মধ্যে তিনটি ছবি রয়েছে যেগুলি এই বিরাট কর্মযজ্ঞের কিছু আভাস দিয়ে থাকে ('—may give some idea of the stupendous work)।

ঐ লেখক অনর্গল স্তুতিবাদ করে চলেছেন এ বিষয়ে :··· another instance of their astronomical knowledge, exemplified in the carving of the signs of Zodiac, cut in a pagoda not remote from Cape Comorin. This is engraven in the I×iid vol. Philosophical Transactions p. 353.······

বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে আমরা চলে গিয়েছি। অন্য বিষয়ের আলোচনা আপাতত স্থগিত রেখে ক্ষেত্রফল বা কালি বিষয়ক আলোচনাটাই শেষ করা যাক। 'গণিতপাদে' আর্যভট্ট দিয়েছিলেন ত্রিভুজ, বৃত্তক্ষেত্র এবং সমলম্ব চতুর্ভুজ প্রভৃতির ক্ষেত্রফল পাওয়া যায়। তাঁর গণনানুসারে :

$$\text{বৃত্তের পরিধি : বৃত্তের ব্যাস} = \frac{62832}{20000} \text{ অর্থাৎ } 3{\cdot}1416\text{।}$$

বর্তমান গণনায় (পাঁচ দশমিক স্থান পর্যন্ত) ফল 3·14152 ; য়ুরোপে ষোড়শ শতকের আগে কেউ সূক্ষ্মফলের এত কাছা-কাছি পৌঁছাতে পারেন নি।

আর্যভট্টকে* বলা হয়েছে ভারতবর্ষীয় গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা-মূলক বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা : 'Aryabhatta in A.D. 476 was born near Patna and is called the founder of Mathematical and Astronomical Sciences in India।[4]

বরাহমিহির, 587 খৃঃ অব্দে, উজ্জয়িনীতে পরলোকগমন করেছিলেন, বিখ্যাত হয়েছিলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানমূলক শিক্ষার জন্য। তিনি নাকি গ্রীক জ্যোতির্বিজ্ঞানে পারদর্শী হয়েছিলেন।[5]

ব্রহ্মগুপ্ত (628 খৃঃ অঃ[6])-কালীন গণিত শাস্ত্রে ক্ষেত্রমিতি বিষয়ক জ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর মৌলিক আবিষ্কারের মধ্যে একটি—'বাহু চতুষ্টয় জানা থাকলে কর্ণদ্বয়ের পরিমাণ নির্ণয়।' পাশ্চাত্য গণিতেও এই নিয়মটি 'ব্রহ্মগুপ্ত' নামটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অনুরূপভাবে তাঁর-কৃত অন্য এক নিয়ম কখনো কখনো 'ব্রহ্মগুপ্তের চতুর্ভুজ' নামে খ্যাত হয়ে থাকে।

লীলাবতী-পাটিগণিত ও জ্যামিতির সমন্বয়

লীলাবতীর রচয়িতা ভাস্করাচার্য, জন্ম বিদুর নগরীতে (দাক্ষিণাত্য), শালিবাহন 1036 (অর্থাৎ 1114 খৃঃ অব্দে**)। কয়েকটি গ্রন্থের রচয়িতা তিনি—সবগুলিই জ্যোতির্বিজ্ঞান ও গণিত বিষয়ক। এগুলির মধ্যে প্রখ্যাত—লীলাবতী, বীজগণিত

* 'Al-Biruni (had the highest regard and respect for Aryabhatta...criticised Brahmagupta for being unduly harsh on Aryabhata...' —M. S. Khan (letter to the Editor) ; The Statesman, January 15, 1977

** A. D. 1019—Peary Ghand Mittra p. 135

ও শিরোমণি+। JOHN TAYLOR M.D. (ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বোম্বাই মেডিক্যাল এস্টাবলিশমেণ্টে) এগুলির অনুবাদ কালে (বোম্বাই, 1816) সুন্দর মূল্যায়ন ও মন্তব্য করেছেন এই ভাবে (অনুবাদে এগুলির—ভাষা সৌকর্য নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা, তাই যথাযথ আসলটাই দেওয়া গেল):

"The first, which relate to Arithmetic, Geometry and Algebra, appears to have superseded entirely the more ancient treatises on these subjects, no other being in use or so far as we know, having even seen, by astronomers of the present day."

'ভাস্করাচার্যের (দ্বাদশ শতাব্দী) 'লীলাবতী' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থখানিতে ক্ষেত্রব্যবহার' সম্বন্ধে আরও বিস্তৃত আলোচনা শৃঙ্খলা-বদ্ধভাবে পাওয়া যায়। নূতন বিষয়ের মধ্যে, তথাকথিত Pythogorean Theorem-টির দুটি বিভিন্ন প্রমাণ এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। উহার একটি ইউরোপে অজ্ঞাত ছিল। বহুকাল পরে সপ্তদশ শতাব্দীতে WALLIS নামক বিখ্যাত গণিতজ্ঞ উহার পুনরাবিষ্কার করেন। ব্রহ্মগুপ্ত এবং ভাস্করাচার্য উভয়ের গ্রন্থেই 'বৃত্তক্ষেত্র গণিত' নামক অধ্যায়ে এমন কতকগুলি উল্লেখযোগ্য সূত্র পাওয়া যায়, যাহা গ্রীক্ গণিতে পাওয়া যায় না।'[7]

...সূক্ষ্ম দুর্বোধ্য জ্যোতিষ শাস্ত্রে লীলাবতী নাম্নী ভারতীয় আর্য মহিলা সংস্কৃত পদ্য রচনা করিতে পারিতেন। জ্যোতিষে পদ্য রচনা...কঠিন ব্যাপার ভারত-মহিলার জ্যোতিষে সংস্কৃত-পদ্য রচনাও এক অদ্ভুত ব্যাপার। 1036 শকাব্দে সহ্য পর্বতের নিকটবর্তী বিজ্জলবিড় নামক গ্রামে ভাস্করাচার্য নামক এক ভাস্করতুল্য মহাপ্রভাব পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ... তাঁহার পত্নীর নাম শ্রীমতী লীলাবতী দেবী। ...লীলাবতী জ্যোতিষে অদ্ভুত পণ্ডিতা ছিলেন।' —পণ্ডিত হরিদেব শাস্ত্রী "ভারতের শিক্ষিত মহিলা"। 1321 পৃঃ 267।

ছন্দোবদ্ধ ভাষায় সমীকরণের দৃষ্টান্ত :

$$ক = \frac{ক}{5} + \frac{ক}{3} + 3\left(\frac{ক}{3} - \frac{ক}{5}\right) + 1$$

এক ঝাঁক ভ্রমরের এক পঞ্চমাংশ গিয়ে বসল প্রস্ফুটিত কদমফুলে; এক তৃতীয়াংশ বসল গিয়ে শিলিন্ধ্রা ফুলে, আর এই সংখ্যা দুটির বিয়োগ ফলের তিনগুণ উড়ে গেল কুটজ মুকুলের দিকে; বাকি একটি মাত্র ভ্রমর হাওয়ার এদিক ওদিক ঘুরতে লাগল। হে সুন্দরী, আমাকে বলতে পার, মোট কতকগুলি ভ্রমর ছিল?

—ভাস্করাচার্য (লীলাবতী ॥ 55 ॥)

ভাগ্যের বিপর্যয়—প্রাচীন ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত অঙ্ক লিখন পদ্ধতি অন্য দেশের উপর আরোপিত

অঙ্ক লিখন প্রণালীর মধ্যে দশমিক প্রথাই যে বর্তমান অঙ্ক গণিতের মূল ভিত্তি স্বরূপ তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। আর ঐ কথার আবিষ্কার ও পূর্ণ বিকাশ এই ভারতবর্ষেই হয়েছিল। DR. CAJORI প্রণীত 'গণিত ইতিহাস' বইখানিতে তিনি লিখছেন, "এই আবিষ্কারটি হিন্দুগণের একটি শ্রেষ্ঠ কার্য। গণিত শাস্ত্রে যাবতীয় আবিষ্কারের মধ্যে এইটিই মানব জ্ঞান বিস্তারে সবচেয়ে বেশি সহায়তা করেছে।"

ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত ও উদ্ভাবিত পদ্ধতিটি খ্যাতি পেয়ে গিয়েছিল আরবীয় প্রথা রূপে! যেমন Scott's Poetical Works, Geoge Routledge & Sons Ltd. বইয়ের পৃঃ 63তে রয়েছে

Pope Sylvester...actually imported from Spain the use of the Arabian numerals...

হিন্দুগণ-প্রবর্তিত সংখ্যা-লিখন-পদ্ধতি য়ুরোপে প্রথম প্রচারিত হয়েছিল Pisa-নিবাসী LEONARDO BONACCI-র প্রচেষ্টায়। পরে আমরা দেখতে পাবো যে, এই পণ্ডিতই য়ুরোপে বীজগণিত প্রচারে অগ্রণী ছিলেন।[8] ঐ পণ্ডিত ঈজিপ্ট থেকে আরবি ভাষার মাধ্যমে সংখ্যা-লিখন শিক্ষা করায় পদ্ধতিটি Arabic notation হিসেবে পরিচিত। কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান চালিয়ে জানা যায় যে পদ্ধতিটি প্রকৃতপক্ষে ছিল হিন্দুগণের প্রবর্তিত। এ ক্ষেত্রেও অদৃষ্টের পরিহাস।

কি ভাবে আরবীয়গণ দীপ্যমান হয়েছিল তার কারণ সবানে জানা যায় যে, 'প্রাচীনকালে ভূমধ্যসাগরের পাশের দেশগুলিতে যে সভ্যতার বিকাশ হয়, তাহা ক্রমে পূর্ণতা লাভ করিয়া, রোম-সাম্রাজ্যের সাহায্যে সভ্য জগৎ ছাইয়া ফেলে; কিন্তু পরে ঐ সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে সে সভ্যতা লোপ পায়। আবার,

+ 'The SIROMANI is a treatise on Astronomy. As it explains the science in afuller and more perspicuous manner than the ancient and celebrated work called the SURYA SIDDHANTA, it has a high repute among astronomers of the Deccan......It is divided into two *adhyas* or parts...the *Gola Adhya*...and the *Ganita Adhya*...

The LILAVATI exhibits a regular' well connected and considering the period in which it was written, a profound system of arithmetic and also contains many useful propositions in geometry and mensuration'. —JOHN TAYLOR M.D.

কয়েক শতাব্দী অতীত হইলে, মধ্য যুগের শেষে বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার আবির্ভাব এবং ক্রমবিকাশ হইয়াছিল। সময়ের হিসাবে এই দুই সভ্যতার মধ্যবর্তী হইয়া আরব-সভ্যতা, সেতুর মত সেই পুরাতন ও নূতনকে যোগ করিয়া দিয়াছিল, এক হইতে অপরে পৌঁছানো মানবজাতির পক্ষে সম্ভব করিয়াছিল'।[9]

বলাবাহুল্য অঙ্কলিখন পদ্ধতি গণিত শাস্ত্রে অপরিহার্য; A. R. Manser (—Advancement of Science, August 1965, p. 206)-এর কথা উদ্ধৃত করে বলা যায়ঃ 'science, as we know it, is impossible without mathematics and this in turn depends on its symbolism.

এমন যে বিজ্ঞানাত্মক ভারতবর্ষীয় (পাটীগণিতের) দশমিক প্রথা তা চীনদেশে প্রবেশ করেছিল বৌদ্ধধর্ম বিস্তারের সঙ্গে—মতটি WERNER-এর; Chines Sociology এঁরই লেখা

আধুনিক সমীকরণ $y^2 = ax^2 + b$—বিতর্কের ঝড়

ব্রহ্মগুপ্ত ও ভাস্করাচার্য উভয়েই 'বর্গ-প্রকৃতি' নামে একটি বিষয়ে অবতারণা করেছিলেন। আসলে এটিই ছিল উপরিউক্ত সমীকরণটির বীজ নির্ণয়ের প্রয়াসজনিত। পাশ্চাত্য গণিতে বিষয়টি ছিল সমস্যাসংকুল। এ বিষয়ে Wallis এবং Lord Brouncker (1658) আয়াসসাধ্য পন্থা, John Pell-এর কিছুটা অদল-বদল করা পদ্ধতি (1668) এবং Lagrange (ফরাসী জ্যোতির্বিদ 1736—1813) যে পদ্ধতি (1769) অবলম্বন করেছিলেন তা মূলত ছিল প্রাচীন ভারতবর্ষীয় পদ্ধতির অনুরূপ। অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস পড়েছে সমীকরণটির উপর। কারণ—The perversity of fate has willed it, that, the equation should now be called 'Pell's equation; the first incisive work on it is due to Brahmin scholarship.'[10]

অনুরূপ মন্তব্য করেছিলেন Herman Hankel এবং G. R. Kaye; শেষোক্ত যদিও ভারতবর্ষীয় গণিতে প্রশংসনীয় কিছু পান নি, তবুও তিনি স্বীকার করতে ছাড়েন নি এই বলে যে, 'একমাত্র পূর্বোক্ত সমাধানগুলিই হিন্দু গণিতশাস্ত্রকে গণিতেতিহাসে উচ্চ স্থলাভিষিক্ত করবার পক্ষে পর্যাপ্ত; এর পর অবশ্য তিনি যেটুকু লিখে গিয়েছেন তা নিতান্তই প্রত্যয়নক—'সম্ভবত এগুলির উৎপত্তি গ্রীস দেশেই হয়েছি'

পূর্বোক্ত Kaye মতবাদ মেনে নিলে প্রথমেই স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে ধরে নিতে হয় যে, গণিতের ঐ পর্যায়োপযোগী বুদ্ধি-বৃত্তি হিন্দুদের ছিল না যা গ্রীকগণের মস্তিষ্কের উর্বরতা একচেটিয়া। তারপরে দ্বিবিধ কল্পনার সাহায্য নেওয়া দরকার হয়ে পড়ে, যথা—আলোচ্যমান গণিত-চর্চায় গ্রীকগণের লব্ধ ফলাফল সম্ভবত হিন্দুদের হস্তগত হয়েছিল; দ্বিতীয়ত, DIOPHANTUS (খৃস্টীয় তৃতীয় শতাব্দী) শ্রেণীর গ্রীক গণিতজ্ঞের কৃতি লুপ্ত হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয় এবং তৃতীয়ত, হয়তো ঐ গ্রন্থের বিলোপ সাধনে সমূহ ক্ষতি হয়েছিল অন্তত গণিতের ঐ সমাধানটির বিষয়ে। তা হলে কি ঐ গ্রন্থমধ্যে নিহিত ছিল উল্লিখিত সমীকরণটির পূর্ণ সমাধান? মন্তব্য করা কঠিন?

বীজগণিত—আর্যভট্ট, DIOPHANTUS প্রমুখের অমর কৃতি

পূর্ব অনুচ্ছেদে আমরা DIOPHANTUS নামটি পেয়েছি। আর্যভট্টের প্রায় এক-শ' বছর আগে তিনি বর্তমান ছিলেন। অনেকের ধারণায়, গ্রীকদের মধ্যে তিনিই ছিলেন প্রথম বীজগণিতজ্ঞ।

এদিকে পণ্ডিতপ্রবর বাপুদেব শাস্ত্রী দেখাচ্ছেন যে, (সূর্য সিদ্ধান্ত শ্রেণীর) প্রাচীন জ্যোতিষ-বিষয়ক গ্রন্থাদিতে বীজগণিতের (বা অব্যক্ত গণিত—Alzebra) রীতিমতো প্রয়োগ রয়েছে। বীজগণিত বিষয়ক তৎকালীন মেধা সুশৃঙ্খল ভাবে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছিলেন আর্যভট্ট—তিনিই এ বিষয়ে ছিলেন অগ্রণী। (এ ব্যাপারে তাঁর কোন পূর্বসূরীকে খুঁজে পাওয়া যায় না)। সুতরাং আর্যভট্টকে যদি বীজগণিতের পুরোধা বলা হয়, তবে কি মনে করা হবে যে, এটি আমাদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত বা অভিসন্ধিমূলক চিন্তাধারার ফলপ্রসূত? বিষয়টি গভীরভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করার অপেক্ষা রাখে।

পৃথিবীর পরিধিঃ আর্যভট্ট-নিরূপিত

আর্যভট্টের বইয়ে নাকি পৃথিবীর ব্যাস 1050 যোজন, ও তা থেকে পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত $\frac{22}{7}$ ধরে পৃথিবীর পরিধি দাঁড়ায় 3300 যোজন।

নির্ধারণটি প্রকৃত পরিমাপের খুব কাছাকাছি—কারণ যোজনকে চার ক্রোশের সমান ধরে যদি ভাবা যায়, বর্তমানে যে মান চলিত রয়েছে এদেশে, তাতে এক ক্রোশের মান হয় 1·9 মাইল। আর এই হিসেবে পৃথিবীর পরিধি দাঁড়াবে 25080 মাইল।[11]

ঋণাত্মক রাশি

এখানে স্মরণ রাখতে হবে Hankel-এর অতি মূল্যবান মন্তব্যটিঃ "ধনাত্মক বা ঋণাত্মক (positive অথবা negative), করণীগত অথবা অকরণীগত (irrational এবং rational), সংখ্যাদ্যোতক কিংবা স্থান ও দূরত্ব পরিমাপজ্ঞাপক, যে কোন মিশ্র (complex) রাশির প্রয়োগ

কালে গণনাদি যে গণিতের সাহায্যে সুসম্পন্ন হয়—তাকে যদি আমরা বীজগণিত আখ্যায় ভূষিত করি, তবে হিন্দুস্থানের ব্রাহ্মণগণই এর যথার্থ উদ্ভাবক।"

বিশুদ্ধ ঋণাত্মক রাশির (negative quality) অস্তিত্ব হিন্দুদের গণিতেই প্রথম স্বীকৃত। এক্ষেত্রে Frederik Suddy[12] MA FRS-এর মতো নোবেল পুরস্কার বিজয়ীর অমোঘ উক্তি আমাদের সঠিক পথে পরিচালিত করতে সহায়ক হবে:

Personally I more and more come to regard the purely formal and mathematical presentation of physical theories as a disguise and evasion of the real problems rather than as any solutions of them. I have tried, in other fields to show the incredible confusions, of which the whole world is now one seething example, that have followed from the invention by the Hindu mathematicians of negative quantities, and their justification from their analogy to debt. So that naturally I am not among those who can bow down and worship the square-root of minus one."

ঋণাত্মক রাশির অস্তিত্ব বিষয়ে Diophantus নীরব।[13]

শ্রীধরাচার্য—একটি অবিস্মরণীয় কৃতি

বর্গ=সমীকরণে সম্পূর্ণ সমাধান ও তার সাধারণ সূত্র ব্রহ্মগুপ্তই বোধহয় প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন। বর্গ-সমীকরণ কালে যে অব্যক্ত রাশির দুটি মান (value) পাওয়া যায় তা Diophantus—বর্গীয় গ্রীক গণিতজ্ঞদের গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। নিঃসন্দেহে হিন্দুগণই এর প্রথম উদ্ভাবক। ইদানীংকালে বর্গ-সমীকরণে বীজ নির্ধারণ করতে আমাদের যে বর্গপূর্তি প্রক্রিয়ার দ্বারস্থ হতে হয় তার উদ্ভাবনী কৃতিত্ব শ্রীধরাচার্যের (দশম শতাব্দী) এবং এখনও তা শ্রীধরাচার্য নামেই ভূষিত![14] এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, মহীশূরের প্রথিতনামা মহাবীরাচার্য বীজগণিত শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁর পরবর্তী—পদ্মনাভ—অসামান্য গণিতশাস্ত্রী।

ভাস্করাচার্য-প্রণীত বীজগণিতে ক×খ শ্রেণীর মিশ্ররাশির বর্গমূল নির্ণয়ের নিয়ম রয়েছে। একঘাত (linear) সমীকরণে বীজানয়নের জন্য যে আর্যভট্ট-পদ্ধতি পাওয়া যায় তার অবিকল অনুরূপ Leonhard Euler (সুইডেনবাসী, 1707—1783) কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়। ব্রহ্মগুপ্ত ও তাঁর উত্তরসূরী ভাস্করাচার্য $xy = ax + by + c$ এই সমীকরণটির যে সমাধান ভাবিত-বীজম্ আখ্যায়, দিয়ে গিয়েছেন তাও Euler কর্তৃক পুনরুদ্ভাবিত হয়।

হিন্দু নৈপুণ্য—কুট্টক গণিত

অসাধারণ নৈপুণ্য কুট্টকগণিত (Indeterminate analysis)—বীজগণিতের অংশবিশেষ, জ্যোতিষিক গবেষণায় প্রয়োজনীয়। প্রাক্-আর্যভট্ট, DIOPHANTUS-গ্রন্থে, এ জাতীয় সমীকরণের কিছু কিছু আলোচনা দেখা যায়, 'কিন্তু ভারতীয় কুট্টক বিধির সহিত তাহার তুলনাই হয় না'।[15]

Indeterminate Analysis-এর অনুশীলন নূতনভাবে শুরু হয় পাশ্চাত্য গণিতে (সপ্তদশ শতাব্দীতে); একটি উচ্চাঙ্গের গণিত হিসেবে এটি পরিগণিত হতে থাকে। Theory of Numbers-এর সম্পর্কে Indeterminate Equations-এর সমাধানের প্রয়োজন হতো। কোন কোন সমীকরণ পরিচিত হয়েছিল 'দুরূহ সমস্যারূপে এবং PIERRE de FERMAT (1601—1665), Euler, Lagrange, Gauss প্রমুখ আধুনিক গণিতবিশারদগণকে ঐ সকল সমাধানে মস্তিষ্ক পরিচালনা করতে হয়েছিল।

এক্ষেত্রে DIOPHANTUS-গ্রন্থ তাঁদের কোন হদিস দিতে পারে নি। অন্যদিকে 'কুট্টক গণিত' তাঁদের কাছে ছিল অজ্ঞাত। বলতে সরম লাগে যে, য়ুরোপীয় প্রখ্যাত গণিতজ্ঞগণকে পুনরাবিষ্কৃত করতে হয়েছিল, হাজার বছরের হিন্দুদের লব্ধ ফলও পরিলক্ষিত বিষয়! আরও একটি বিষয় রয়েছে কুট্টক গণিত ব্যাপারে, আরব জাতি ভারতবর্ষীয় কুট্টক গণিতে দন্তস্ফুট করেন নি। আর আরব মুখাপেক্ষী সেকালের য়ুরোপ তা-ই এ বিষয়ে রয়ে গিয়েছিল অজ্ঞ।

হিন্দুদের গণিতে কৃতিত্বের স্বীকৃতি পাশ্চাত্য দেশীয়গণও অবদমিত করবার প্রয়াস পান নি যখন দেখি লেখা রয়েছে—

"AL-KHWARIZMI (780-850). Arabian mathematician, from his book, *Algebra* based on Hindu and Bābylonian sources, is derived our algebra and algorism."[16]

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, জ্যোতিষ শাস্ত্রের সাহায্যার্থেই বীজগণিতের অনুশীলন ও উন্নতিবিধান* হয়েছিল। জ্যোতিষশাস্ত্রজ্ঞদের এই পুস্তকাদি সংস্কৃত ভাষায় ছন্দোবদ্ধ আকারে লেখা হতো।

ত্রিকোণমিতি—Sine শব্দের ব্যুৎপত্তি

আলোচ্য গণিত বিভাগ—trigonometry। এতে

* আরবীয়গণ বীজগণিতে উন্নতি সাধন করেছিলেন। পণ্ডিত Leonardo Bonacci-র চেষ্টায় বীজগণিত য়ুরোপে প্রথম প্রচারিত (1200 খৃঃ অঃ) হয়ে ইংল্যাণ্ডে প্রথম প্রচারিত হয়েছিল Robert Recorde নামে এক চিকিৎসকের হাতে (1557)।

ভারতবর্ষের প্রাচীনত্ব প্রকাশ পায়। সংস্কৃত ভাষায় জ্যা (chord)-র দুটি অভিধা—জীব ও শিঞ্জিনী ; আরবীতে তা পরিণত হয়েছিল 'জৈব্'। ভারতবর্ষীয় জ্যা-গণিতের আরবদেশে প্রবর্তন করেছিলেন সেখানকার জ্যোতির্বেত্তা—আল্‌বাট্টানী (নবম শতাব্দী)। তাঁর গ্রন্থ অতঃপর ল্যাতিন ভাষায় অনূদিত হয় (দ্বাদশ শতাব্দী)। তখন জৈব্ শব্দটির অনুবাদ হয় 'sinus', কালক্রমে তা sine শব্দে পরিণত হয়। Tangent এবং co-tangent ব্যবহারের কৃতিত্ব আরোপ করা হয় পূর্বোক্ত জ্যোতির্বেত্তার উপর।

এখন, মনে রাখতে হবে জ্যোতিষ সংক্রান্ত গণনায় ত্রিকোণমিতির যথেষ্ট প্রয়োগের দরকার ছিল। আর্যভট্ট-গ্রন্থে এবং বরাহমিহির-প্রণীত পঞ্চ সিদ্ধান্তিকায় 90° পর্যন্ত 24টি কোণের জ্যা (sine) এবং উৎক্রম জ্যা (versed sine)-র ফলাফল-তালিকা পাওয়া যায়। এইভাবে দেখা যাচ্ছে যে, Sine function) (বর্তমানে যা ত্রিকোণমিতির ভিত্তিমূল হিসেবে পরিগণিত) উৎপত্তি লাভ করেছিল এই ভারতবর্ষেই।

Ptolemy (দ্বিতীয় শতাব্দীর)-র গ্রীক গণিতগ্রন্থে উক্ত কোণগুলির Chord function-এর নিষ্পত্তিমূল তালিকা পাওয়া যায়। তা হলে কি হিন্দুগণ নিজেদের জ্যা-তালিকা নির্ধারণে গ্রীক তালিকার বশবর্তী হয়েছিল ? তবে সেই সঙ্গে এটাও লক্ষ্য করবার রয়েছে যে, হিন্দুদের প্রবর্তিত গণিতে Chord-function-এর প্রয়োগ তো দূরের কথা, আদৌ উল্লেখ ছিল না !

ভাস্করাচার্যের 'সিদ্ধান্ত শিরোমণি' গ্রন্থে আলোচনা রয়েছে—জ্যা, উৎক্রম জ্যা, কোটি জ্যা (Cosine) এবং কোট্যুৎক্রম জ্যা (Coversed sine) বিষয়গুলির।

'গণিতবিদ্যা বিজ্ঞানের রাজমহিষী, আর পাটীগণিত গণিতের রাণী'— Gouss (প্রথিতযশা জার্মান গণিতজ্ঞ, 1777-1855)।

এই নিরিখে প্রাচীন ভারতবর্ষীয় গণিত-বিজ্ঞান বিষয়ক কয়েকটি সরস ও প্রণিধানযোগ্য মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত করলাম। আলবিরুণী লিখেছেন, "আমরা যে সকল অঙ্কচিহ্ন ব্যবহার করি, তা ভারতবর্ষ থেকে পাওয়া।"

Augustus de Morgan ব্রিটিশ গণিতজ্ঞ (1806-71) বলেছিলেন, "ভারতবর্ষীয় পাটীগণিত বহুগুণে গ্রীক পাটীগণিত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বর্তমানে আমাদের যে পাটীগণিত, তা ভারতবর্ষীয় গণিত ছাড়া অন্য কিছু নয়।"

প্রসঙ্গত বলা দরকার যে, প্রাচীন গ্রীস ও পুরাকালীন ভারতবর্ষ, এই দু-দেশের গণিত আলোচনা করলে দেখতে পাওয়া যাবে, ক্ষেত্র পরিমিতিমূলক গড়পড়তা জ্ঞান সম্বন্ধে ভারতবাসীগণ কিছু কম অভিজ্ঞ ছিলেন না গ্রীকদের চেয়ে। তবে এটাও স্বীকার করতে আপত্তি নেই যে, গ্রীকগণের ক্ষেত্রবিদ্যা, শৃঙ্খলা ও পদ্ধতি বিষয়ে, অনেকাংশে শ্রেয়ঃ ছিল (ভারতবর্ষীয় অনুরূপ বিদ্যার তুলনায়)। এ বিষয়ে Euclid (আনুমানিক 3000 খৃঃ পূঃ)-এর জ্যামিতি তুলনাবিহীন !

আগেকার দিনে পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ এই ধারণার বশবর্তী ছিলেন যে, ভারতবর্ষীয়দের ক্ষেত্র পরিমিতি বিষয়ক জ্ঞান গ্রীকদের কাছ থেকে শেখা-নেওয়া। কিন্তু Dr. George Frederick William Thibaut CIE খণ্ডন করেছিলেন ঐ মতবাদ, নজির টেনেছিলেন 'শুল্ব সূত্র'গুলির। বস্তুতঃ ক্ষেত্র-গণিতের উৎপত্তি এদেশে হয়েছিল বৈদিক যুগে। পরবর্তীকালে এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায় যে উভয় দেশে এ বিষয়টিতে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল— গ্রীক্ ক্ষেত্র বিষয়ক বিদ্যা প্রধানত প্রমাণসাপেক্ষ, পক্ষান্তরে ভারতবর্ষীয় ক্ষেত্রবিদ্যা ছিল প্রয়োগাত্মক। Dr. Cajori-এর মতে (—'গণিত-ইতিহাস' দ্রষ্টব্য) 'ভারতবর্ষীয় ক্ষেত্র-গণিত ব্রহ্মগুপ্তের বৃত্তান্তর্গত চতুর্ভুজ বিষয়ক উপপাদ্যসমূহ স্বরূপ'।

অনেক প্রাজ্ঞ মতামত এ বিষয়ে রয়েছে। সঙ্গত কারণে যে সব প্রকাশিত করা থেকে বিরত থাকা গেল।

নির্দেশপঞ্জী

1. শ্রীপ্রমথনাথ ভট্টাচার্য (ইন্দোর নিবাসী): গণিতে ভারতের দান, উত্তরা, জ্যৈষ্ঠ 1334 পৃঃ 650। আলোচ্যমান নিবন্ধে ঐ রচনাটি থেকে পর্যাপ্ত সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

2. The View of Hindooston, printed by Henry Hughs London 1798 p. 213.

3. পূর্বোক্ত 2. দ্রষ্টব্য।

4. পূর্বোক্ত 2. দ্রষ্টব্য।

5. PEARY CHAND MITTRA : The Spiritual Stray Leaves, Calcutta 187? p. 135

6. পূর্বোক্ত (ক) দ্রষ্টব্য।

7. পূর্বোক্ত (1) দ্রষ্টব্য পৃঃ 652।

8. শ্রীসুরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় D.Sc এবং শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ MA PH.D. বীজগণিত প্রবেশিকা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 1936 পৃষ্ঠা-চার।

9. স্যার যদুনাথ সরকার লিখিত ভূমিকা (সুরেশ চন্দ্র নন্দী : ওমর খৈয়াম ভাদ্র 1336)

10. DR. CAJORI

11. অধ্যাপক সত্যেন বোস : প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানে অগ্রগতি পৃঃ 4-5।

12. The Interpretation af Atom (Preface p. VI) London John Murray 1932.

13. পূর্বোক্ত (1) দ্রষ্টব্য পৃঃ 653।

14. পূর্বোক্ত (1) দ্রষ্টব্য পৃঃ 654।

15. পূর্বোক্ত (1) দ্রষ্টব্য পৃঃ 654।

[পরের অংশ 51 পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

কংক্রীট ও তেজস্ক্রিয় ছদন

নরেন্দ্রনাথ মল্লিক*

পারমাণবিক চুল্লীতে (Nuclear Reactor), কণাত্বরণ যন্ত্রে (Particle acelerator), বাণিজ্যিক বিকিরণ চিত্রণে (Industrial Radiorgphy), রঞ্জেনরশ্মি (X-Ray) চিকিৎসাবিদ্যায় তেজস্ক্রিয় রশ্মির প্রভাব থেকে ব্যবহারকারীদের রক্ষার্থে তেজস্ক্রিয় ছদন পদার্থ বা Shielding Material ব্যবহার করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

ছদনকারী পদার্থ বিভিন্ন রকমের হতে পারে। বহুল প্রচলিত ছদনকারী পদার্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সাধারণ ও ভারী ওজনযুক্ত কংক্রীট যা নিষ্ক্রিয় উপাদান (Inert aggragates) যেমন বালি, পাথরকুঁচি ইত্যাদিও সক্রিয় বন্ধক (Active binder) যেমন সিমেন্ট ও জলের সংমিশ্রণে তৈরী। এই কংক্রীটের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যেমন সুলভ, সংনম্যশীলতা ও তেজস্ক্রিয় রশ্মি শোষণ ক্ষমতা। এগুলি প্রায় সবরকমের তেজস্ক্রিয় রশ্মিকে বাধা দিতে পারে বিশেষ করে রঞ্জেনরশ্মি, গামারশ্মি ও নিউট্রনরশ্মি বাধাপ্রাপ্ত হয়।

রঞ্জেনরশ্মি, গামারশ্মি ইত্যাদির তেজস্ক্রিয়তাকে বাধা প্রদানের জন্য সাধারণভাবে $24KN/m^3$ শক্তি অপেক্ষা বেশী শক্তিশালী কংক্রীট ব্যবহার করা হয়। সমান বেধ (Equal thickness) সাধারণ কংক্রীটের তুলনায় ঐ একই বেধসম্পন্ন অধিকসংখ্যক হাইড্রোজেন বা অধিক জলের অণুযুক্ত কংক্রীট নিউট্রন বিকিরণকে বেশী বাধা দেয়। নিউট্রন বিকিরণকে বাধা দেওয়ার জন্য কখনও কখনও বেশী জলের পরিমাণ দেওয়া হয়। যেমন পোর্টল্যাণ্ড সিমেন্টকে বিশেষ কার্যে ব্যবহারের জন্য বেশী জল দেওয়া হয় কারণ এর রাসায়নিক সংশক্তি কম।

যখন নিউট্রন কণাগুলি আবদ্ধ হয়ে যায় তখন হাইড্রোজেন সহ অনেক মৌল তেজস্ক্রিয় রশ্মি বিকিরণ করে এবং এই বিকিরণই ছদনের প্রয়োজনীয়তা ঘটায়। পর্যাপ্ত পরিমাণে জলকণাসম্পন্ন কংক্রীট নিউট্রন ও গামারশ্মিকে সার্থকভাবে বাধা দান করে। যথাযথ ছদন প্রদানের জন্য সাধারণ কংক্রীটের পুরু দেয়াল দেওয়া যেতে পারে। তবে স্থান সঙ্কুলানের জন্য নক্সাকারীগণ (Designer) ভারী ওজন বিশিষ্ট কংক্রীটের কম বেধযুক্ত দেয়াল নক্সা করতে বাধ্য হন। এই ভারী কংক্রীটে স্থায়ী জলের পরিমাণ ও হাল্কা পদার্থ যেমন বোরনের পরিমাণ বেশী রাখা হয়। উচ্চ আপেক্ষিক গুরুত্বসম্পন্ন পদার্থ ভারী ওজন বিশিষ্ট কংক্রীটের জন্য ব্যবহার করা হয়।

প্রায় 60 রকমের খনিজ পদার্থ আছে যাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব 3·5-র অপেক্ষা বেশী সেগুলি ভারী ওজনযুক্ত কংক্রীট তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে প্রচলিত 10টি খনিজ পদার্থ নির্বাচন করা হয়। যেমন ব্যারাইট, ম্যাগনেটাইট, ইলমেনাইট, লিমোনাইট বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সাধারণভাবে কম ব্যবহৃত খনিজ পদার্থগুলি হল হেমাটাইট, টেপোনাইট, আরসেনোপাইরাইট, ক্রোমাইট, সাইলোমেলেন এবং গ্যালেনা। এই একই কার্যে ব্যবহারের জন্য ফেরোফসফরাস ও ফেরোসিলিকনের কথা আমরা ভেবে দেখতে পারি। তাছাড়াও লোহ বা ইস্পাতখণ্ড বা চূর্ণ কংক্রীটের উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

ছদনকার্যে ব্যবহৃত ভারী ওজনযুক্ত কংক্রীটের দুটি বিশেষ ভৌতিক ধর্ম হল আপেক্ষিক গুরুত্ব ও স্থায়ী জলকণা (Fixed water)। একই পদার্থের অতি মিহি কণার (Fine) আপেক্ষিক গুরুত্ব ঐ পদার্থেরই দানাদার (Coarse) কণার আপেক্ষিক গুরুত্ব অপেক্ষা বেশী।

সাধারণতঃ যে সমস্ত উপাদান কংক্রীট তৈরিতে ব্যবহৃত হয় তাদের ভৌত (Physical) ধর্মগুলি নিম্নের সারণীতে তালিকাবদ্ধ করা হল।

[50 পৃষ্ঠার পরের অংশ]

16. DR. JAY E. GREENE : 100 Great Scientists Published by Pocket Books, New York June 1969 p. 483।

এখানে AL-KHWARIZMI নামটি সম্ভবত ভুল। কারণ 'বীজগণিত প্রবেশিকা'য় (পূর্বোক্ত (8) দ্রষ্টব্য) রয়েছে Md. ibn Musa Alkhowari Zmi

বিশেষ দ্রষ্টব্য—আলোচ্যমান নিবন্ধ সম্বন্ধে আর একখানি মূল্যবান গ্রন্থ—L. V. GURJAR : Ancient Indian Mathematics and Vedha-Poona.

* হস্টেল—G, কক্ষ নং—309, পোঃ—আর-আই-টি, জামসেদপুর—14

সারণি

ভারী উপাদান (Heavy Aggrigate)	প্রাথমিক চিহ্নিতকরণ (Primary Identification)	আপেক্ষিক গুরুত্ব		শতকরা যোগের পরিমাণ		বিকিরণ, শোষণ Cm²/g	
		দানাকরণ (Coarse)	মিহিকণা (Fine)	লোহ (Iron)	স্থায়ী জল (Fixed water)	দ্রুত নিউট্রন (Fast Neutron)	গামারশ্মি (γ-Ray)
লিমোনাইট	$2FeO_3 3H_2O$	3·75	3·80	58			
গোয়েথাইট	$Fe_2O_3H_2O$	3·45	3·70	55	11	0·0372	0·0362
ম্যাগনেটাইট	Fe_3O_4	4·62	4·68	64	1	0·0258	0 0359
থ্যারাইট	$BaSO_4+H_3O$	4·30	4·34	60	2 to 5		
ব্যারাইট	92% $BaSO_4$	4·20	4·24	1 to 10	0		
ফোরোফসফরাস	90% $BaSO_4$ + FeP	4·28	4·31		0	0·0236	0·0363
ইস্পাত উপাদান	Fe_3P, Fe_2P, FeP	6·30	6·28	70	0	0·0230	0·0359
ইস্পাত টুকরা	Sheared Bars	7·78		99	0	0·0214	0·0359
ম্যাগনেটাইট	SAE Standard	—	7·50	98	0		

। প্রবন্ধটি রচনায় ডঃ শংকরীপ্রসাদ রায় এবং শ্রীচিরঞ্জন দেবদাস-এর নিকট থেকে যথেষ্ট সহযোগিতা পেয়েছি—লেখক

হাইড্রলিক হ্যাণ্ড প্রেস

বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের প্লান্ট অ্যাণ্ড প্রসেস ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের উদ্যোগে হাইড্রলিক হ্যাণ্ডপ্রেসের মডেল তৈরি করা হয়েছে। এই প্রেস মোট 10 টন চাপ প্রয়োগ করতে সক্ষম। প্রেসগুলোর কার্যক্ষমতা সাফল্যের সঙ্গে পরীক্ষা করা হয়েছে। এই প্রেস গবেষণাগার এবং বিভিন্ন ধরণের শিল্প কারখানার জন্যে বিশেষ উপযোগী। প্রেস তৈরি করতে ইচ্ছুক শিল্পপতিদের কাছে নক্স ডিজাইন ও নির্মাণ কৌশলাদি প্রশিক্ষণসহ ইজারাদেয়ারব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রেসগুলো কিনতে আগ্রহী ব্যক্তিদেরকে পাইলট প্লান্ট ও প্রসেস উন্নয়ন কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

[আজকের বিজ্ঞান, বাংলাদেশ]

জল দূষণ—একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা

মানস কুণ্ডু*

জাপানের মিনামাটা উপসাগরের রুপালি মাছ বহু বছর ধরে জলে মিশে যাওয়া বিষাক্ত মিথাইল মার্কারি খেয়েছিল। আর সেই মাছ খেয়ে সেখানকার ছোটবড় নির্বিশেষে সবাই স্নায়ুবৈকল্যের কবলে পড়েছিল। অনেকে হয়ে গিয়েছিল অন্ধ।

1967 খৃস্টাব্দে টোরি ক্যানিওন নামে এক তেলবাহী জাহাজে দুর্ঘটনা ঘটে। এরফলে 120000 টন তেল মিশে যায় সমুদ্রের জলে। ফল হয় ভয়ঙ্কর। অসংখ্য সামুদ্রিক প্রাণী এবং মাছ বিনষ্ট হয়। সামুদ্রিক পাখীই মারা গিয়েছিল প্রায় 1 লক্ষ বিভিন্ন প্রজাতির।

পুন্টাটোম্বোর সংরক্ষণ ওয়ার্ডেন অ্যালিবার্তো পাসেরা মন্তব্য করেন যে, প্রতিদিনই সমুদ্রতীরে তেলের ছোপ লাগা পেঙ্গুইনের মৃতদেহ ভেসে আসে। জলের নীচে খাবার সংগ্রহ করতে পেঙ্গুইনদের মসৃণ গা বিশেষ কার্যকরী। কিন্তু তাদের পালকে নোংরা তেল জমায় তারা জলের নিচে মারা যাচ্ছে।

সমুদ্রের জল দূষিত হওয়ার ফলে ঘটছে এরকমই মারাত্মক অসংখ্য ঘটনা। পৃথিবীর মোট সমুদ্রের আয়তন 59×10^6 ব. কি.মি. আর তাতে জল আছে 1420×10^{15} কিউবিক মি.। সংখ্যার দিকে তাকালে মনে হয় এত জল দূষিত হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু পেট্রল জাতীয় জনিজ তেল, পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়তা, হার্বিসাইডস, ফাঙ্গিসাইডস ও ইনসেক্টিসাইডস—এই তিন ধরনের পেস্টিসাইডস ধোয়া জল, আবর্জনা ও বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থ দিনের পর দিন ক্রমাগত পড়ার ফলে সমুদ্রের জলও দূষিত হয়ে উঠছে। মানুষের পক্ষে যা ভয়ঙ্কর ভাবে বিপজ্জনক। আরো বিপজ্জনক হয় যখন কোন দূষিত পদার্থ সমুদ্রের কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানে সঞ্চিত অবস্থায় থেকে সেখানকার জল দূষণের কারণ হয়।

সমুদ্র বাদ দিয়ে প্রাত্যাহিক জীবনে ব্যবহার্য জলের উৎসগুলোর দূষণের হার দেখলেও অবাক হয়ে যেতে হয়।

পৃথিবীতে যে পরিমাণ জল আছে তার মধ্যে মোটামুটি 3 ভাগ মাত্র পানের যোগ্য। সেই তিন ভাগের বেশী অংশই রয়েছে বরফ আকারে। যতটুকু বা ব্যবহার করা যায় তাও দূষিত হবার হাজারো পন্থা রয়েছে। যেমন :—

বর্জ্য পদার্থের দ্বারা দূষণ :—উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহ থেকে নির্গত বর্জ্য পদার্থের দ্বারা পুকুর, হ্রদ, নদী, কুয়ো ইত্যাদির জল দূষিত হয়। পানীয় জল হিসেবে জীবেরা তা ব্যবহার করে এবং নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

জীবাণুর দ্বারা দূষণ :—টাইফয়েড, আমাশয় ইত্যাদি রোগের জীবাণু জলের দ্বারা বাহিত হয়। এই জল পান করে মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীরা রোগগ্রস্ত হয়।

রাসায়নিক পদার্থের দ্বারা দূষণ :—বড় বড় নদীর কাছে শিল্পের প্রসার জল দূষণের মাত্রাকে আরো প্রকট করে তুলেছে। এইসব শিল্পকারখানা থেকে তরল বর্জ্য পদার্থ নদীর স্রোতে অনবরত পরিত্যক্ত হচ্ছে। সিমেন্ট, কাগজ, সারকারখানা, চিনি, রাসায়নিক পদার্থ তৈরির কারখানাগুলি বর্জ্য পদার্থগুলি নদীর জলে পরিত্যক্ত হয়। এতে জলের অক্সিজেনের মাত্রা স্বাভাবিক পরিমাণের অনেক নীচে নেমে যায়। এছাড়া কলকারখানার বর্জ্য পদার্থে অনেক সময় সায়ানাইড, ফিনল, অ্যামোনিয়া, ক্লোরিন প্রভৃতি বিষাক্ত পদার্থ মিশে থাকে। ক্লোরিন ও $NaOH$ তৈরির কারখানার পরিত্যক্ত পদার্থে পারদের পরিমাণ এত বেশী থাকে যে জলজ প্রাণীর স্নায়ুর ভারসাম্য নষ্ট করার পক্ষে তা যথেষ্ট। পেট্রোল ও ডিজেল তৈরির কারখানা পরিত্যক্ত সীসা জলের ওপরে পাতলা স্তরে ছড়িয়ে পড়ে। এই সীসা জলজ প্রাণীর সংস্পর্শে এসে মারাত্মক বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করে। জলে ক্যাডমিয়াম ও ক্রোমিয়ামের উপস্থিতি অনেক সময়ে সামুদ্রিক প্রাণীর মৃত্যুর কারণ হয়। একই রকমের আশঙ্কা থাকে মিঠা জলের প্রাণীদের ক্ষেত্রেও। অধুনা প্রতিষ্ঠিত পেট্রোকেমিক্যাল কমপ্লেক্স, তেলশোধনাগার, রাসায়নিক সার তৈরির কারখানার প্রভৃতি জল দূষণের অন্যতম প্রধান উৎস। এইসব কারখানা পরিত্যক্ত রাসায়নিক পদার্থ মাটি ভেদ করে নীচে নেমে মাটির অভ্যন্তরস্থ জলকেও দূষিত করে। স্টীমার, জাহাজ ইত্যাদি যানবাহনে মোবিল, পেট্রোলিয়াম ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। এই সকল তেল জলকে নানাভাবে দূষিত করে।

কীটনাশক দ্বারা দূষণ :—বিভিন্ন কীটনাশক জলে মিশে ইকোসিস্টেমকে বিঘ্নিত করে। এর ফলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয় এবং প্রকারান্তরে মানুষের ক্ষতির সম্ভাবনা বাড়ে।

আগাছানাশক দ্বারা দূষণ :—শস্যক্ষেত্রে আগাছা দমনকারী বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ বৃষ্টির জলে ধুয়ে অবশেষে নদীর জলে মেশে এবং সেখানকার পরিমণ্ডলকে জীবের বাসের অনুপযোগী করে তোলে।

কচুরিপানা, আগাছা ইত্যাদির দ্বারা দূষণ :—জলাধারের জল দূষিত হয়ে যাওয়া মানুষের পক্ষে চিন্তার কারণ। কচুরিপানা, আগাছা ইত্যাদি পচে জলকে দূষিত করতে সাহায্য করে। দেখা গেছে যে জল থেকে উৎপন্ন H_2S-এর ডিমপচা গন্ধের জন্যই কেবলমাত্র দূষিত নয়। এটি H_2SO_4-এ রূপান্তরিত হয়ে জলাধারের জলের মারাত্মক ক্ষতি করে।

বন্যার দ্বারা দূষণ :—বন্যার জল নানারকম প্রাণীর মৃতদেহ বহন করে বিভিন্ন স্থানকে প্লাবিত করে। এর ফলে প্লাবিত জলাধার জল দূষিত হয়।

উপরিউক্ত উপায়গুলিতে প্রায় সবদেশেই জল দূষণ ঘটে। অর্থাৎ সমস্যাটা মোটামুটি সারা পৃথিবী জুড়ে। এবং একই ধরনের সমস্যা।

*পোঃ রহড়া, জেলা-24 পরগণা

আমাদের গঙ্গানদী দিনের পর দিন সর্বসংহার মত হজম করে চলেছে কত যে আবর্জনা তার হিসেব কে রাখে! গার্ডেনরীচ, হাওড়া অঞ্চলে এখন স্নান করাও স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক। হুগলী নদীতে কাগজ কল, রেয়ন, রং, চামড়া ইত্যাদির কারখানা থেকে নির্গত আবর্জনা পড়ছে অবিরত! এর সঙ্গে আছে শহরের আবর্জনা।

প্রতিদিন 1 হাজার 850 কোটি গ্যালনেরও বেশী আবর্জনা সৃষ্টি করছে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেরই হাজার দুয়েক শিল্প কারখানা। এর প্রায় সবটাই নদীতে ফেলা হয়। অতএব অবস্থা যে কোন্ দিকে যাচ্ছে তা সহজেই অনুমেয়।

প্রাত্যহিক জীবনে দূষণ পুরোপুরি রোধ করা বর্তমানে অসম্ভব। তবে দূষণকে কমানর চেষ্টা করা যেতে পারে। আর তাতে কিছুটা ফলও পাওয়া যাবে নিঃসন্দেহে। নিচের কয়েকটি ব্যবস্থা এজন্য মেনে চলা যেতে পারে।

নদী-নালা, খালবিল ইত্যাদি আবর্জনামুক্ত রাখার চেষ্টা করা।

পুকুর বা জলাশয়গুলিতে যাতে কচুরিপানা বা আগাছা না জন্মায় সেদিকে দৃষ্টি রাখা।

কলকারখানার বর্জ্য দূষিত পদার্থগুলি যাতে নদীতে সরাসরি না পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখা। প্রয়োজন মত রাসায়নিক পদার্থগুলি বিশোধন করে তারপর নদীতে ফেলার ব্যবস্থা করা।

শহরের নালা-নর্দমার আবর্জনা বিশোধন করে নদীতে ফেলা।

যেখানে সেখানে মলমূত্র ত্যাগ না করা।

খনিজ তেল উৎপাদনের সময়ে সমুদ্রে বা নদীতে যাতে সেই তেল না মিশতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখা।

নদী ও সমুদ্রের জলে যাতে স্টীমার বা জাহাজের তেল মিশে না যায় তার ব্যবস্থা করা।

এছাড়াও রোগীদের জামা-কাপড় সাধারণের ব্যবহৃত পুকুরে কাচা উচিত নয়।

উদ্ভিদ কীট ধ্বংসের জন্য বিষাক্ত ঔষধের ব্যবহারের পরিবর্তে সর্বাধুনিক ব্যবস্থা biological control অবলম্বন করা অনেক বেশী বিজ্ঞানসম্মত।

উপেক্ষিত ফল আমড়া

বিশাল ভারতের বিভিন্ন প্রান্তরে বহু রকমের ফল-ফুলের সমারোহ। ভারতের বৈচিত্র্যময় পরিবেশে বিভিন্ন বিভিন্ন রকমের ফল জন্মায় যা মুখরোচক এবং বাজারে বহুমূল্য। এই বৈচিত্র্যময় পরিবেশে আবার এমন বহু ফল আছে যা বহুগুণের অধিকারী হয়েও মানুষের কাছে অনাদৃত। এমনই একটি ফল হল আমড়া। আমড়ার বৈজ্ঞানিক নাম 'স্পনডিয়াস পিন্নাটা' এটি আম প্রজাতিরই গাছ। এই গাছ 8 থেকে 10 মিটার লম্বা, কাণ্ড খুব মোটা নয়, কিন্তু কাঠ শক্ত হয়। এর পাতা ডালের পরস্পর মুখে দুই সারিতে সাজানো, সাদা রং-এর ফুল। পাতায় আমের গন্ধ পাওয়া যায়। মধ্যম আকারের এর ফল ডিম্বাকৃতি যার বোঁটার কাছে একটু দাবানো। কাঁচা অবস্থায় ফলের রং অলিভের মত সবুজ, পাকলে বাদামী রং ধরে। মার্চ-এপ্রিলে ফুল আসে। গাছের 6 বছর বয়সে 20 থেকে 30 কেজি ফল হয় প্রতি গাছে। এই ফল কাঁচা এবং পাকা দুই অবস্থাতেই খাওয়া যায়। চাটনী, স্টু, আচার, জ্যাম প্রভৃতি নানাভাবে এর ব্যবহার হয়। এর কিছু ঔষধি গুণও আছে—বিলিয়াস ডিসপেপসিয়ার ওষুধ আমড়া। আমড়ার ছাল কোষ্ঠবদ্ধকারী, শীতলকারক। আমাশয় এবং ডাইরিয়ার ওষুধ, বমনবদ্ধকারী, আমড়ার প্রলেপ বাতের ওষুধ। কানের ব্যথায় পাতা লাগিয়ে উপকার পাওয়া যায়। এত গুণের আধার আমড়াকে আর উপেক্ষা করা যায় না।

[ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ]

গলগণ্ড প্রসঙ্গে

রণতোষ চক্রবর্তী*

কথিত আছে, একবার দিল্লীর কোনও এক বাদশা তাঁর বেগম, পাত্র-মিত্রদের নিয়ে ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম সীমান্তের কোনও রাজ্যে বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে গিয়েছিলেন। সেখানে বেগম মহলে পরিচারিকা প্রায় সবারই ছিল গলগণ্ড। স্বভাবতই বেগম মহলের সুন্দরীরা এই কুৎসিৎ আকৃতি দেখে এর কারণ জানতে চাইলে—সেই এলাকার জলই এর প্রধান কারণ, এ কথা তাঁদের বলা হয়েছিল। এই উত্তর শুনে বেগমরা বাদশাকে প্রায় জোর করেই সে স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য করেছিলেন। ঘটনার সত্যতা বা এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব যাই হোক না কেন, উত্তর পশ্চিম ভারতের নানা এলাকায় এই গলগণ্ড এখনও নেহাত কম নয়, অঞ্চল বিশেষে শতকরা 40-45 জনও এ রোগের শিকার হতে দেখা যায়। শুধু আমাদের দেশেই নয় সারা বিশ্বে ধনী, দরিদ্র নির্বিশেষে প্রায় বিশ কোটি গলগণ্ড রোগী রয়েছে বলে হালের একটি খবরে প্রকাশ। আমাদের দেশে যেমন হিমালয়ের উঁচু পার্বত্য এলাকায়, তেমনি ইউরোপ আমেরিকায়ও পার্বত্য এলাকায় এ রোগের প্রকোপ অপেক্ষাকৃত বেশী।

গলগণ্ড বেশ প্রাচীন রোগ। খৃঃ পূঃ 3000 বছর আগে প্রাচীন চীনদেশে এ রোগের শুধু উল্লেখই নয়, এর ব্যবস্থা-পত্রেরও নির্দেশ পাওয়া যায়। প্রাচীন মিশর দেশে গলগণ্ডের জন্য ও দেশের বিশেষ এলাকায় লবণ ব্যবহারের কথা বলা হয়েছিল। দার্শনিক হিপোক্রেটিস গলগণ্ডের সঙ্গে সেই অঞ্চলের জলের সম্পর্ক আছে বলে বর্ণনা করেছেন।

আসলে দেহের থায়রয়েড (Thyroid) নামে একটি হরমোন গ্রন্থির সঙ্গে গলগণ্ড সম্পর্কিত। শ্বাসনালীর দু'পাশে থায়রয়েড গ্রন্থি রয়েছে—স্বাভাবিক অবস্থায় এর ওজন মাত্র 20 গ্রামের মত—তবে অস্বাভাবিক অবস্থায়, গলগণ্ডে এর ওজন বেড়ে এক কেজিও হতে দেখা যায়।

দেহের অন্যান্য গ্রন্থির মতো থায়রয়েড থেকেও একাধিক হরমোন রক্তে মিশে, এদের মধ্যে থাইরোক্সিন ও ট্রাইআয়ডো-থাইরোক্সিন নামে দুটিই প্রধান। অনেক সময় দেহে এই হরমোনের মাত্রা ঘাট্‌তি হলে থায়রয়েড গ্রন্থি আকারে বড় হয়ে গলগণ্ড দেখা দিতে পারে, আবার সময় বিশেষে এর বিপরীত কারণেও গলগণ্ড লক্ষণ দেখা দিতে পারে।

আসলে থায়রয়েড তৈরী হরমোনে আয়োডিন খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আয়োডিন প্রধানত জল থেকে দেহে প্রবেশ করে। কোনও কারণে ক্রমাগত কম পরিমাণ আয়োডিন দেহে প্রবেশ করলে থায়রয়েড গ্রন্থি এর কোষের পরিমাণ বাড়িয়ে বা আকৃতি বাড়িয়ে অপেক্ষাকৃত বেশী আয়োডিন সংগ্রহ করে হরমোনের মাত্রা স্বাভাবিক রাখতে চেষ্টা করে—ফলে থায়রয়েডের গ্রন্থির আকার বড় হয়ে গলগণ্ড দেখা দিতে পারে।

বেশ বড় আকৃতির থায়রয়েড গ্রন্থির জন্য গলার আকৃতি বিকৃত হওয়া ছাড়া অনেক সময় শ্বাসনালীর উপর চাপ পড়ে শ্বাসকষ্ট বা ঢোক গেলায় অসুবিধাও হতে পারে। তবে থায়রয়েডের বড় আকৃতির জন্য কোনও ব্যথা-যন্ত্রণা অনুভূত হয় না।

শিশুকাল থেকে দেহের গঠন, পুষ্টি ব্যাপারে থায়রয়েড হরমোন খুবই দরকার। দেহের স্বাভাবিক বিপাক কাজ পরিচালনা, মৌল বিপাকীয় হার ঠিক মত রাখা—এসব গুরুত্বপূর্ণ শারীরতাত্ত্বিক প্রণালী নিয়ন্ত্রণে—থায়রয়েড গ্রন্থি কাজ করে থাকে। খাদ্য-খাবারের সঙ্গে, বিশেষ করে জলের আয়োডিনের (যদিও খুব অল্প পরিমাণ) পরিমাণ এই গ্রন্থির হরমোন তৈরিতে সাহায্য করে। প্রসঙ্গত সমুদ্রের জলে আয়োডিনের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি, সেজন্য সমুদ্র উপকূল থেকে দূরে, এছাড়া পার্বত্য এলাকায় জলে আয়োডিনের পরিমাণ কম থাকে। অবশ্য মস্তিষ্কের হাইপোথালামাস ও পিটুইটারি গ্রন্থিও থায়রয়েডকে হরমোন তৈরি ও হরমোন নিঃসরণ ব্যাপারে অনেকটা সুবিবেচক অভিভাবকদের মত কাজ করে থাকে।

বস্তুত পুরুষ, স্ত্রীলোক সকলেরই গলগণ্ড দেখা দিতে পারে। যদিও স্ত্রীলোকের বেলায় গলগণ্ড বেশি দেখা দেয় বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত। স্ত্রীলোকের সাধারণত বয়ঃসন্ধি থেকে রজোনিবৃত্তি—এই সময়ের মধ্যে গলগণ্ড লক্ষণ প্রকাশ পায়। গর্ভ অবস্থায় অনেক সময়ই সামান্য ধরনের থায়রয়েডের স্ফীতি ঘটে থাকে—এর কারণ অতিরিক্ত বিপাক কাজে সহায়তায় অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণ হরমোন নিঃসরণ ঘটাতে হয় বলে।

আয়োডিন অভাবে যেমন গলগণ্ড লক্ষণ দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা, তেমনি আবার সয়াবিন, বাঁধাকপি, শালগম প্রভৃতি থেকেও গলগণ্ড-সহায়ক thiocyanate জাতীয় পদার্থ থাকে বলে জৈব-রসায়নবিদদের ধারণা। তবে নানা জাতীয় খাদ্যের উপস্থিতিতে সামান্য পরিমাণ thiocyanate কার্যকরী হয় না। বিশেষজ্ঞদের মতে, thiouracil, Sulfonamide, Resorcinol, Lithium, Phenozone—প্রভৃতি দেহে থায়রয়েড হরমোন তৈরি প্রক্রিয়াকে নানা ভাবে বাধা দেয় এবং সময় বিশেষে গলগণ্ড হতে সুবিধা করে। প্রসঙ্গত বৃহদন্ত্রে বসবাসকারী বহু ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে অনেকে thiouracil জাতীয় রাসায়নিক পদার্থ তৈরি করে থাকে, যদিও শুধুমাত্র এ কারণে গলগণ্ড হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশেও হরমোনঘটিত জটিল

[পরের অংশ 56 পৃষ্ঠায় দেখুন]

* শারীরতত্ত্ব বিভাগ, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, কলিকাতা-9

কার্বন ডাই-অক্সাইড বায়ুর চেয়ে বেশী তাপ শোষণ করে

[বায়ুর চেয়ে কার্বন ডাই-অক্সাইড বেশী তাপ শোষণ করে। একটি সহজ পরীক্ষার মাধ্যমে তা এখানে প্রমাণ করা হয়েছে। বায়ুমণ্ডলে ক্রমাগত কার্বন ডাই-অক্সাইড বৃদ্ধির ফলে ভবিষ্যতে পৃথিবীতে বিপর্যয় নেমে আসতে পারে।]

নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন হল বায়ুর প্রধান উপাদান ; এছাড়া বায়ুতে আছে কার্বন ডাই-অক্সাইড, জলীয় বাষ্প, নিষ্ক্রিয় গ্যাস ইত্যাদি। বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ প্রায় 0.04 ভাগ (আয়তন হিসাবে)। অবে এর পরিমাণ সর্বত্র সমান নয়। গ্রামাঞ্চল থেকে শহরাঞ্চল ও শিল্পাঞ্চলে বেশী। বায়ুর চেয়ে কার্বন ডাই-অক্সাইডের তাপ শোষণ করার ক্ষমতা যে বেশী তা একটি সহজ পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করা যেতে পারে।

একটি স্ট্যাণ্ডের সঙ্গে ক্ল্যাম্প দিয়ে একটি ফ্লাস্ক আটকাতে হবে। অপর একটি ক্ল্যাম্পের সঙ্গে একটি থার্মোমিটার এমন ভাবে আটকাতে হবে যেন এর কুণ্ডটি ফ্লাস্কের ভিতরে প্রায় তলদেশ পর্যন্ত যায়, কিন্তু ফ্লাস্ককে স্পর্শ না করে। কোন তাপের উৎস (যেমন—পাঁচ-শ' বা তার থেকে বেশী ওয়াটের বৈদ্যুতিক বাতি বা কেরোসিনের কুপী) ফ্লাস্কের বাইরে তবে খুব কাছাকাছি রাখতে হবে, তাপের উৎসের দূরত্ব থার্মোমিটারের কুণ্ডের থেকে যেন বেশী না নয়। বৈদ্যুতিক বাতি বা কেরোসিনের কুপী জ্বালিয়ে দিলে ফ্লাস্কের মধ্যের বায়ু গরম হতে থাকবে। ফলে থার্মোমিটারে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

তাপমাত্রা স্থিতিশীল হলে তা লিপিবদ্ধ (note) করতে হবে। অপর একটি ফ্লাস্কে সোডিয়াম কার্বনেট ও লঘু হাইড্রোক্লোরিক বা সালফিউরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ার মাধ্যমে কার্বন ডাই-অক্সাইড তৈরি করে তা একটি নির্গম নলের মাধ্যমে প্রথম ফ্লাস্কে পাঠাতে হবে। কার্বন ডাই-অক্সাইড বায়ুর চেয়ে ভারী বলে বায়ু অপসারিত করে ফ্লাস্কে জমা হবে। এই কার্বন ডাই-অক্সাইডের তাপামাত্রা প্রথম ফ্লাস্কের উত্তপ্ত বায়ুর চেয়ে কম বলে প্রথমে থার্মোমিটারের পারদ নেমে আসবে অর্থাৎ তাপমাত্রা কমে যাবে। এর পর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। আট-দশ মিনিট পরে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তাপমাত্রা আগের লিপিবদ্ধ করা তাপমাত্রার থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে। কাজেই এ পরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হয় যে, বায়ুর চেয়ে কার্বন ডাই-অক্সাইড বেশী তাপ শোষণ করে।

একদিকে ক্রমবর্ধমান জ্বালানী ব্যবহারের জন্য ও অপর দিকে ইচ্ছা মত গাছপালা কাটার ফলে আমাদের বায়ুমণ্ডলে দিন দিন কার্বন ডাই-অক্সাইড বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে বেশী পরিমাণে সৌরশক্তি শোষণের জন্য বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে পৃথিবীতে বিপর্যয় নেমে আসতে পারে। মেরু অঞ্চলের জমা বরফ গলে গেলে পৃথিবীর স্থলভাগ প্লাবিত হতে পারে।

[55 পৃষ্ঠার পরের অংশ]

রোগের মধ্যে গলগণ্ড অন্যতম একটি। বরং এই লক্ষণ ক্রমবর্ধমান। ধনী পরিবারের মধ্যে অনেক সময় অত্যধিক ওষুধ প্রয়োগে এই লক্ষণ দেখা দেয় বলে অনেকের ধারণা—আবার খাদ্য-খাবারের ভারসাম্যের অসমতাও এর কারণ হতে পারে।

* কৃষ্ণা রুদ্র, রূপশ্রী পল্লী, পোঃ রাণাঘাট, নদীয়া

সাপ নিয়ে ভুল ধারণা

চিত্তরঞ্জন সেনাপতি*

সাপ ধরা—সাপ ধরার কোন মন্ত্র নেই। অভিজ্ঞতা ও সাহসই সাপুড়েদের প্রধান ভরসা। অভিজ্ঞ সাপুড়েরা গর্তের মুখে সাপের বুকের ছাপ দেখে বুঝতে পারেন সাপ বিষধর না নির্বিষ এবং সে গর্তের বাইরে আছে না ভেতরে। একজন জাত সাপুড়ের মুখেই শুনুন, সাপ ধরতে চাই বারো আনা সাহস আর চার আনা শেকড়ের গুণ, কোন মন্ত্রতন্ত্র নেই। সাপ ধরতে গেলে একটা শাবল চাই গর্ত খোঁড়ার জন্য আর থলি চাই সাপকে রাখার জন্য এবং একটা ছুরি চাই দাঁত ভাঙ্গার জন্য।

সাপের নাচ—সাপের কান নেই, তাই তারা কোন কিছু শুনতে চায় না। সাপুড়ের বাঁশি বাজানোর সঙ্গে সাপ মাথা দোলায়। তার কারণ হল সাপের অদ্ভুত ধরনের দৃষ্টিশক্তি ও ও তার প্রকৃতি। সাপের চোখের গড়নটা এমন যে, কোন স্থির বস্তুর উপর তার দৃষ্টি ঠিক থাকে না। গতিশীল বস্তুই তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বেশি। সাপুড়ে বাঁশি মুখে নিয়ে এদিক-ওদিক করে বলেই সাপ ঐভাবে মাথা দোলায় ও ছোবলও মারতে চেষ্টা করতে থাকে। সাপের চোখ পাস্টার দিয়ে বেঁধে তার সামনে নানারকম শব্দ করে দেখা গেছে সে শুনতে পায় না।

সাপের মানুষ চেনা—সাপ মানুষ চিনে রাখতে পারে বলে একটা ধারণা আছে। ধারণাটা সত্য নয়। স্বচ্ছ আঁশ দিয়ে ঢাকা সাপের চোখ দেখে মানুষ ভাবে হয়তো সে চোখে শত্রু মানুষের ছবি আঁকা হয়ে থাকে এবং এতেই সাপ মানুষটিকে চিনে রাখতে পারে। তবে বিষধর সাপের গবেষক ডাঃ ভাড বলেছেন, আহত গোখরো, কেউটে প্রভৃতি সাপগুলো 15 মিটার ব্যাসের কোন জায়গায় লুকিয়ে থাকে। এদের প্রতিশোধ স্পৃহা এতই প্রবল যে সেই জায়গা দিয়ে কেউ গেলে—এমন কি গাড়ি গেলেও তাকে ছোবল মারে।

দুধকলা ও সাপ—সাপ জ্যান্ত প্রাণী খেতে ভালবাসে। দুধ, ফলমূল ওদের খাদ্য নয়। তবে ওদের অনেকদিন না খাইয়ে রাখলে যা পায় তাই খায়। সাপুড়েরা এই সুযোগ নেয় এবং লোকজন তাদের মনসার বাহন ভেবে দুধকলা নৈবেদ্য সামনে ধরলে দীর্ঘদিনের উপোসী সাপগুলো তাই খেতে শুরু করে। এই দেখে লোকেরা ভাবে সাপুড়ে তাদের দুধকলা খাইয়ে বশ করে রেখেছে।

বাঁট থেকে দুধ খাওয়া—দুধ সাপের খাদ্য নয়, তাছাড়া বাঁট থেকে দুধ টেনে খাওয়ার সামর্থ্যও সাপের নেই। কারণ সাপের ফুসফুস খুবই কমজোরী। তবে ইঁদুরের লোভে গোয়ালঘরে ঢুকে গরুর লেজ নাড়া বা পা নাড়ার জন্য পা দুটো জড়িয়ে ধরতে পারে এবং চোখের সামনে বাঁট ঝুলে থাকলে কামড়ও মারতে পারে। বিষাক্ত সাপ হলে গরু সেই কামড়ে মারা যেতে পারে।

বিষ পাথর—কামড়ানোর জায়গায় ওঝারা একটা পাথর বসিয়ে দেয়। তাদের বক্তব্য পাথরটি নাকি বিষ শুষে নেয়। বিশেষজ্ঞেরা বলেছেন এই 'বিষ পাথর' এক ধরনের ঝামা পাথর—যা শুকনো থাকলে খানিকটা জল শুষে নিতে পারে। পাথরটি ক্ষতস্থানের রক্তে আটকে থাকে এবং রক্ত শোষিত হলেই পড়ে যায়। এতে বিষের ক্রিয়া মোটেই কমে না বা কমবার কথাও নয়।

সাপ ও বেজী—কিছু লোকের ধারণা সাপ বেজিকে কামড়ালেও সে মরে না, কারণ তার শরীরে সাপের বিষের ক্রিয়া নষ্ট করার মত নাকি কিছু পদার্থ থাকে। তাছাড়া লড়াইয়ের সময় বেজি নাকি কোন গাছে গা ঘষে বা কামড়ে দেয়। ফলে যে গাছের বিষক্রিয়া নষ্ট করার ক্ষমতা জন্মে। আর এ ধরনের গাছের টুকরোকে তাবিজ-কবজ হিসাবে দেহে ধারণ করলে সাপুড়ের কামড়ের ভয় থাকে না। কিন্তু এ সবই ভুল ধারণা। বেজির শরীরের বা রক্তে সাপের বিষ নষ্ট করার মত তেমন কিছু পাওয়া যায় নি। বেজি লড়াই-এ জিতে তার কৌশলের জন্যই। সাপ যখনই ছোবল মারতে আসে বেজি তখনই এমনভাবে সরে যায় যে সাপের মুখ মাটিতে পড়ে থেতো হয়ে যায়। এভাবে বার বার মাটিতে ছোবল মেরে সাপ কাহিল হয়ে পড়ে। তাছাড়া সাপ ঠাণ্ডা রক্তের প্রাণী। লড়াই-এ তাড়াতাড়ি পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে। বেজী হয় না। দেখা গেছে সঠিক ভাবে কামড়ালে সাপের বিষে মারা পড়ে।

ঝাড়ফুক—সাপে কামড়ালে কখনও সাপের বিষ নামে না। সাপের বিষ ভালভাবে শরীরে মিশলে কোনও ওঝা-গুনিন রোগীকে বাঁচাতে পারে না। কেবল মাত্র সিরাম দিতে পারলেই রোগী বাঁচে। রোগীর শরীরে কম বিষ প্রবেশ করলেও রোগী বেশিক্ষণ বাঁচে, তখনই সাপুড়ে আলফাল মন্ত্র বলে রোগীর মনোবল কেবলমাত্র সচেষ্ট করে রাখে। এছাড়া কিছুই করে না।

* গাজনা, পোঃ—মেদ্যাডাঙ্গর, জেলা—মেদিনীপুর

কৃষিকার্যে সমস্থানিকের ভূমিকা

কমল চক্রবর্তী*

কৃষিকার্যে আমাদের দৃষ্টি সবসময় সজাগ রাখার সময় এসে গেছে, কারণ এই কৃষির ফসল থেকেই মানুষ তার জীবনের নিশ্চয়তা অনেকটা লাভ করতে পারে। ভাল ফসল উৎপাদনে জমিতে ঠিকভাবে চাষের প্রয়োজন অর্থাৎ সেই চাষে জল, সময়মতো বীজ রোপন, সারপ্রয়োগ ও তার তদারকির প্রয়োজন। এছাড়া ভাল ফসলের জন্য জলহাওয়ার ভূমিকাও খুব বেশি।

ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির হার ভাল করতে হলে তদারকির একান্ত দরকার নইলে বিভিন্ন শত্রুর হাতে ফসল বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে। উদ্ভিদ ও শস্য যে বিপুলভাবে নষ্ট হয়ে যায় তার কারণ হচ্ছে কীটপতঙ্গ ও রোগের আক্রমণ। এসবের হাত থেকে বাঁচার জন্য বিজ্ঞানীরা ছত্রাক, ভাইরাস বিভিন্ন জীবাণু ও কীটপতঙ্গকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন এবং সেগুলি অনেকাংশে সফল হয়েছে সমস্থানিক বা আইসোটোপ প্রয়োগের দ্বারা। এই আইসোটোপ কথাটির সৃষ্টি গ্রীক শব্দ আইসোটোপোস (Isotopos) থেকে। আইসো মানে সম এবং টোপোস মানে স্থান। কোন মৌলিক পদার্থের আইসোটোপ বলতে বোঝায় যে মৌলটির পারমাণবিক সংখ্যা একই কিন্তু পারমাণবিক ভর পৃথক। আইসোটোপ কথাটির নাম দেন ফ্রেডরিক সডি 1913 খৃষ্টাব্দে। সাধারণ কীটনাশক যেসব ওষুধ অনেক সময় ব্যবহার করা হয়, তার অনেকটাই কোন কাজে লাগে না। কেননা, অনেক কীট এই কীটনাশক ওষুধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা লাভ করছে। তাই কীটনাশকের কাজে এক ধরনের আইসোটোপকে কাজে লাগান হচ্ছে। এই বিশেষ ধরনের সমস্থানিক হচ্ছে তেজস্ক্রিয় সমস্থানিক। তেজস্ক্রিয় এই পদার্থগুলি নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে তিন ধরনের রশ্মি নির্গত করতে পারে।

কোন মৌলের নিউক্লিয়াস থেকে যেসব রশ্মি বেরিয়ে আসে সেগুলি জন্তু ও উদ্ভিদে যথেষ্ট প্রভাব ফেলতে পারে। নিউক্লিয়াস বলতে বোঝায় পরমাণুর মধ্যের ভারী কেন্দ্রকে যার মধ্যে প্রোটন ও নিউট্রন অবস্থান করে। দেখা গেছে যে পরিমিত রশ্মি প্রয়োগের ফলে পুরুষ কীটের প্রজনন ক্ষমতা নষ্ট হয় এবং একে পুরুষ বন্ধ্যা কৌশল বলে। এই পদ্ধতি নিয়ে মার্কিন বিজ্ঞানী রেমণ্ড বুশল্যাণ্ডে কাজ করে সফলতা অর্জন করেন। একসময় এক ধরনের মাছি আমেরিকার বহু গরু, মোষ, ছাগল প্রভৃতি পশুর মৃত্যু ডেকে আনে। প্রজনিত পুরুষ মাছিগুলিকে তিনি তেজস্ক্রিয় কোবাল্টের গামা রশ্মি দিয়ে বন্ধ্যা করে দেন। এই গামা রশ্মির প্রভাবিত মাছিগুলিকে তিনি সেইসব মাছিদের মধ্যে ছেড়ে দেন এবং লক্ষ্য করেন যে স্ত্রী মাছিরা এদের সাহায্যে অনিষিক্ত ডিম দেয় এবং তাতে মাছির প্রকোপ বন্ধ হয়। সুতরাং তেজস্ক্রিয় কোবাল্টের গামারশ্মি যদি বিভিন্ন কীটপতঙ্গকে মারতে পারে তবে ফসল রক্ষার উপায়ও হয়ে যাবে। তবে দেখতে হবে সেই রশ্মি কি কি ধরনের কীট নাশ করতে পারে এবং তাতে ফসলে কোন প্রভাব পড়ে কিনা।

তেজস্ক্রিয় রশ্মির প্রভাব নিয়ে বর্তমানে অনেক কাজ হয়েছে। রাশিয়ায় এর প্রভাবে ভুট্টার উৎপাদন বাড়ান সম্ভব হয়েছে। এছাড়া দেখা গেছে—মূলা ও বাঁধাকপির বীজকে তেজস্ক্রিয় রশ্মির প্রভাবে রাখলে, ঐ বীজ থেকে উৎপন্ন মূলা ও কপি অনেক তাড়াতাড়ি পূর্ণতা লাভ করে। দেখা গেছে, তেজস্ক্রিয় পদার্থের রশ্মির প্রভাবে তরমুজ, টম্যাটো, গাজর, আলু প্রভৃতির ফলনও বাড়ানো যায়। অবশ্য উদ্ভিদের প্রধান আহার হলো নাইট্রোজেন। উদ্ভিদ এই নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে অ্যামোনিয়া ও নাইট্রেট থেকে।

ভাল ফসল উৎপাদনের জন্য মাটির উর্বরতা বাড়ানোর চেষ্টা করা উচিত ও সেই সঙ্গে কোন্ জমিতে কি ধরনের চাষ ভাল হবে তা অনুধাবন করা উচিত। তার জন্য উপযুক্ত সারের প্রয়োগ করতে হবে। তেজস্ক্রিয় সমস্থানিক এ ব্যাপারে খুবই মূল্যবান এবং দেখা গেছে P-32 সমস্থানিকটি ব্যবহার করে বেশ সুফল পাওয়া গেছে। এর সাহায্যে মাটিতে কতটা ফসফরাস প্রয়োজন তা জানা যায়। তেজস্ক্রিয় ফসফরাসের কর্মপদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যায় উদ্ভিদের পাতা ও কাণ্ডে ফসফরাসের পরিমাণ নির্ণয় করে। কোন্ ফসলের জন্য কোন সার কি পরিমাণ প্রয়োজন তা তেজস্ক্রিয় ফসফরাসের গতিবিধি থেকে জানা যায়। পরীক্ষায় দেখা গেছে যে তামাক গাছ বৃদ্ধির জন্য ফসফেট সারের প্রয়োজন প্রায় নেই এবং তেজস্ক্রিয় ফসফরাসের গতিবিধি জানা যায় গাইগার মূলার কাউন্টারের সাহায্যে।

তেজস্ক্রিয় সমস্থানিক ব্যবহার করে প্রাণি ও উদ্ভিদের কিছু কিছু জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার কথা জানা গেছে। দেখা গেছে যে, উদ্ভিদ তার শ্বাসকার্যের জন্য যে কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2) নেয় সেই CO_2-এর সঙ্গে যদি তেজস্ক্রিয় কার্বন দিয়ে প্রস্তুত CO_2 মিশিয়ে দেওয়া যায় তবে সেই উদ্ভিদ থেকে উৎপন্ন কিছু কিছু পদার্থ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার কাজে আসে। এইসব উদ্ভিদ দিয়ে নানা ওষুধের সৃষ্টি করা যায়। তেজস্ক্রিয় কার্বন গ্রহণ করার ফলে উদ্ভিদ থেকে কিছু কিছু পদার্থ বেরিয়ে আসে অর্থাৎ সে সময় উদ্ভিদের পাতা ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যদি কোন প্রাণী খায় তবে সেসব প্রাণীর মল, মূত্রে তেজস্ক্রিয়তার চিহ্ন ধরা পড়ে।

তেজস্ক্রিয় সমস্থানিকের সাহায্যে জানা যায় যে শর্করা

* রসায়ন বিভাগ, সুরেন্দ্রনাথ সান্ধ্য কলেজ, কলিকাতা-700009

উৎপন্ন হয় পাতায় এবং সেখান থেকে কাণ্ড ও মূলে জমা হয়। সালোকসংশ্লেষের সময় উদ্ভিদ তার খাদ্য গ্লুকোজ, কার্বহাইড্রেট ও প্রোটিন তৈরি করে এবং তার জন্য প্রয়োজন হয় সূর্যের রশ্মি, CO_2 এবং জল। এইসব উপাদান থেকে উদ্ভিদ তার খাদ্য যেভাবে প্রস্তুত করে তা কিন্তু বেশ জটিল বিক্রিয়ার দ্বারাই হয়ে থাকে। তেজস্ক্রিয় কার্বন থেকে উৎপন্ন CO_2-কে কাজে লাগিয়ে উদ্ভিদ বৃদ্ধি পরীক্ষা করে এই জটিল বিক্রিয়াগুলির স্বরূপ অনেকটা জানা যায়। উদ্ভিদদেহে তেজস্ক্রিয় কার্বন ঢুকলে অতি অল্প সময়ে বিভিন্ন যৌগ ও অ্যামিনো অ্যাসিডের উৎপত্তি হয়। সুতরাং এই পদ্ধতি যদি সহজসাধ্য হয় তবে অল্প খরচে নির্দিষ্ট স্থানে নতুন ধরনের উদ্ভিদ সৃষ্টি করা যাবে। নতুন উদ্ভিদ সৃষ্টি ও তাদের খাদ্যের সরবরাহ যখন সহজসাধ্য হবে তখন অত্যধিক ফসল সহজেই উৎপন্ন করা যাবে। সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে সমস্থানিকের ব্যবহার কৃষিকার্যে এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে পরিগণিত হবে।

উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতে তেজস্ক্রিয় সমস্থানিক 14C, সাধারণ কার্বনের (12C) সঙ্গে মিশে থাকে। এদের মধ্যে যে সাম্যাবস্থা ($14_c \rightarrow 12_c$) থাকে তা জীবের ও উদ্ভিদের মৃত্যুর পর নষ্ট হয় এবং তাতে 14C-এর তেজস্ক্রিয়তা কমে আসে। কোন কাঠ বা প্রাণিজ পদার্থের বয়স নির্ণয় করা যায় 14C তেজস্ক্রিয়তা পরিমাপ করে। এই পদ্ধতিটি আবিষ্কার করেন উইলার্ড লিবি এবং এই কাজের জন্য তিনি 1960 খৃস্টাব্দে নোবেল পুরস্কার পান।

সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় তেজস্ক্রিয় C-14-এর ভূমিকার কথা বলা হয়েছে এবং এছাড়া পরিপুষ্টি কি কি খনিজের ওপর নির্ভর করে তাও জানা গেছে কয়েকটি তেজস্ক্রিয় মৌলের প্রয়োগের দ্বারা। এইসব মৌলের মধ্যে আছে—P, S, Cu, Ca, Zu, Mo প্রভৃতি। কোন কোন উদ্ভিদের পুষ্টিতে তেজস্ক্রিয় মলিবডেনাম (Mo) কাজে লাগলেও, সাধারণভাবে মলিবডেনামের উপস্থিতি মাটিকে বিষাক্ত করে এবং সেই মাটির ফসলে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। Ca, Zu, Cu প্রভৃতি গাছের প্রয়োজনীয় খাদ্য ঠিকই কারণ এগুলির উপস্থিতি গাছকে দ্রুত বাড়তে সাহায্য করে, তবে এগুলি গাছের প্রধান খাদ্য তালিকায় মধ্যে পড়ে না। গাছের ক্ষয় রোধ ও কোন কোন আগাছার বৃদ্ধিকে ব্যাহত করতে তেজস্ক্রিয় সমস্থানিককে কাজে লাগানো হয়। কৃত্রিম সারের প্রয়োগ কতটা উপযোগী তাও এই তেজস্ক্রিয় সমস্থানিক থেকে জানা যায়।

তেজস্ক্রিয় সমস্থানিকের প্রয়োগের ফলে কৃষিকার্যের গবেষণা অনেক ব্যাপকতা লাভ করেছে এবং তাতে উদ্ভিদের পুষ্টি ও বৃদ্ধির রহস্য ক্রমশঃ সহজ হয়ে গেছে।

আমাদের পূর্বসূরী

অতসি সেন*

বিংশ শতাব্দীর মানুষের আজ বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে গর্বের শেষ নেই। তবু প্রকৃতির ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীটপতঙ্গের কাছে এখনও অনেক কিছুই শেখার আছে। মানব সমাজের সৃষ্টি দশ লক্ষ বছরের কাছাকাছি হলেও পিঁপড়ে, মৌমাছি, উইপোকার কাছে আমরা নেহাৎ ছেলেমানুষ। ওদের সৃষ্টি হয়েছে তিন কোটি বছরেরও আগে। 'সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে' নীতিবাক্যটি যেখানে মনুষ্য সমাজে কথার কথাই রয়ে গেছে, সেখানে কীটপতঙ্গ সমাজের অনেক ক্ষেত্রে তার সুষ্ঠু প্রয়োগ যুগ যুগ ধরেই প্রকাশমান। বাঁচার জন্য খাদ্য উৎপাদনে মানুষ একাই শুধু চাষবাস করে না। দক্ষিণ আমেরিকার 'আট্টা' নামক ছত্রধর পিঁপড়েরাও গাছের পাতা চিবিয়ে সার তৈরি করে, সেই জমির ওপর এক বিশেষ জাতের ছত্রাকের চাষ করে। শুধু চাষবাসই নয়, সাহারা মরুভূমির 'মেসর' জাতের পিঁপড়েরা তাদের গুদামে ঘাসের বীজ জমিয়ে রাখে। স্যাঁতস্যাঁতানি ধরলে বাইরের তপ্ত বালিতে বয়ে এনে, শুকিয়ে নিতেও ভোলে না। ছিপ দিয়ে মাছ ধরাটাও কিছু মানুষদের নতুন আবিষ্কার নয়। 'ছিপধারী মাছ' বলে এক জাতের শিকারী মৎস্য অনেকদিন আগে থেকেই এর ব্যবহার করে আসছে। তাদের পিঠের পাখনার একটা লম্বা কাঁটা থেকে পোকার মত দেখতে একটা টোপ ঝোলানো থাকে, যেটিকে তারা নিজেদের মুখের সামনে এনে দোলায়—চারে মাছ এলেই তার আর রক্ষা নেই। আটলান্টিক মহাসাগরের অতল অন্ধকারে কিছু কিছু 'ছিপধারী'দের আবার দীপ্তমান টোপও থাকে। শিকার ধরা ফাঁদটিতেও আমাদের কৃতিত্ব তেমন বেশি কিছু নয়! 'পিপীলিকা-সিংহেরা (ant-lion) মানব জন্মের বহু পূর্ব থেকেই শুকনো বালিতে গর্ত খুঁড়ে এ জাতীয় ফাঁদ পেতে আসছে। আর 'ট্র্যাপডোর' মাকড়সাদের কথা তো আমরা সকলেই জানি। আমাদের মাছ ধরা জালের অনেকদিন আগে থেকেই

* সেনট্রাল ফুড ল্যাবোরেটরী, 3, কীড স্ট্রীট কলিকাতা-700 016

মাকড়সা আর ক্যাডিস্ ফ্লাই'রা জাল বুনে আসছে। অস্ট্রেলিয়াবাসী বিরাট বিরাট মাকড়সারা আবার তাদের আঠা মাখানো 'ল্যাসো' ছুঁড়েও শিকার ধরে।

সভ্যতার আদিযুগ থেকেই মানুষেরা গৃহপালিত পশুদের প্রতিপালন করে আসছে। ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়, এ বিষয়েও কীটপতঙ্গে অনেকে পারদর্শী। 'অ্যাফিড' বলে এক জাতের পোকাদের দেহনিসৃত মিষ্টরসের জন্যে পিঁপড়েরা তাদের প্রতিপালন করে। যাদের বলা হয় 'পিঁপড়েদের গরু'। সহাবস্থান কি শ্রম-বিনিময়ের ক্ষেত্রেও আমরা একক নই। 'নাপিত মাছ' বলে এক জাতের মাছেরা অন্যান্য মাছেদের গায়ের মরা মাস আর পোকামাকড় খেয়ে তাদের পরিষ্কার করে। প্রসাধনের জন্যে দূরদূরান্ত থেকে এসে তারা সারিবদ্ধ হয়ে প্রতীক্ষা করে। মাছেরাই শুধু নয়, কিছু কিছু পাখিরাও অন্যান্য পশুদের এভাবে সাহায্য করে। গরু মহিষদের গায়ে বসা পাখিদের লক্ষ্য করলেই ব্যাপারটা বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না।

চীনা আর ইজিপ্সিয়েরা কাগজের আবিষ্কর্তা বলে জগতে খ্যাতিলাভ করলেও, আরশোলারা তার বহু যুগ আগে থাকতেই ডিমগুলিকে কাগজের মোড়কে মুড়ে রাখত। বোলতাদের বাসা বানানোর মালমশলাটি আমাদের 'রি-ইনফোর্সড্ কংক্রিট-এর চেয়ে কোন অংশে কম নয়। সুড়ঙ্গ খোঁড়ার পারদর্শিতায় ছুঁচোরা আমাদের 'জহর টানেল'কেও হার মানায়। মাকড়সার জালের টানাপোড়েনগুলি লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় আমাদের 'ঝোলানো পুল'গুলির কোনটিই তার সমকক্ষ নয়। প্রাণীজগতের অনেকেই বুনন আর সীবন শিল্পে আমাদের চেয়ে অনেক নিপুণ। বাবুইপাখির বাসাটি তো এর উজ্জ্বল উদাহরণ। 'দর্জিপাখি'রা তাদের বাসাটিকে সেলাই করে সূচালো ঠোঁট আর মাকড়সার জাল থেকে বানানো সূতো দিয়ে।

বিমান বা যে কোন আকাশযানে তাদের অবস্থার স্থিতিসাম্য বজায় রাখতে যে জাইরোস্কোপের ব্যবহার হয় অনুরূপ যন্ত্র মাছিদের দেহেও রয়েছে। সেটি কিন্তু মানুষের আবিষ্কারের চেয়ে অনেক বেশি উন্নত। এছাড়া বেলুনের ব্যবহার তো 'গসেমার' মাকড়সারা আমাদের অনেক আগে থেকেই জানত। প্রতিধ্বনি শুনে অস্তিত্ব অনুভবের যন্ত্র তো পঞ্চাশ বছর আগেও আবিষ্কৃত হয় নি, তাছাড়া আমাদের 'রাডার' কি 'সোনার' বাদুড় আর ডলফিনদের শ্রবণশক্তির ও স্নায়বিক অনুমিতির তুলনায় নগণ্য বললেই চলে। 'জ্যামিং' বা অপ্রয়োজনীয় শব্দের বাধা বিপত্তি নিয়ে যেখানে আমরা অহরহ ব্যতিব্যস্ত, সেখানে বাদুড়েরা অন্যূন দু-হাজার গুণ জোরালো প্রতিধ্বনির মধ্যে থেকেও সামান্য একটি মশকের প্রতিধ্বনিকে সঠিক অনুধাবন করতে পারে। 'সোনার'-এর প্রতিধ্বনি থেকে আমরা যেখানে তিমিকে ডুবোজাহাজ বলে ভুল করি, সেখানে ডলফিনেরা বিভিন্ন উপাদানে গড়া সম-আয়তনের ভিন্ন ভিন্ন জিনিষের পার্থক্য খুব সহজেই বিচার করতে পারে।

'অ্যাকোয়ালাঙ' বা পিঠে-বওয়া অক্সিজেন-সিলিণ্ডার ডুবুরীদের এক অত্যাবশ্যকীয় সরঞ্জাম। কেউ কেউ 'স্নোর্কেল' জাতীয় বাতাসবাহী নলও ব্যবহার করে। 'ডাইভিং বীটল্'রা কিন্তু এ সব আবিষ্কারের বহু আগে থেকেই পাখনার তলায় বাতাসের থলি ভরে নিয়ে জলের তলায় ঘুরে বেড়ায় আর জলজ বিছারা ব্যবহার করে 'স্নোর্কেল' জাতীয় শ্বাসনল। খুব বেশিক্ষণ জলের নীচে থাকতে গেলে অবশ্য এসব পদ্ধতিতে আর চলে না, জলজ মাকড়সারা তাই জলনিরোধক বাসা বানিয়ে সেটিতে বাতাস ভরে নিয়ে বাস করে। অনেকটা আধুনিক 'বেথিস্ফিয়ার'-এর সঙ্গে তুলনা করা চলে। জুল ভের্ন'-এর কল্পনারও বহু যুগ আগে থেকে মাছেরা তাদের পটকার ভেতর বাতাস ভরে দিয়ে ডুবোজাহাজের মত ভেসে ওঠে আর সেটি বার করে দিয়ে পুনরায় জলের গভীরে ডুবে যায়। 'নিউট' বলে এক জাতের উভচর প্রাণীরাও তাদের ফুসফুসটিকে এইভাবে ব্যবহার করতে পারে। 'স্কুইড'রা তো পিচকিরীর জলের ধারা ছিটিয়ে তারই ধাক্কায় 'রকেট সাবমেরিন'এর মত সাগর জলে ছুটে বেড়ায়। তাদের শুঁড়গুলিও এক একটি 'সাকশন্' যন্ত্র বিশেষ, যার সাহায্যে তারা নিজেদের পাথরের গায়ে আটকে রাখে।

মানুষের শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র ত এই সেদিনকার আবিষ্কার। মৌমাছিরা বহুকাল ধরেই ওই জাতীয় পদ্ধতি ব্যবহার করে আসছে। শীতকালে মৌচাকটি শীতলতর হয়ে এলেই মধু খেয়ে শরীর গরম করে নিয়ে তারা এ ওর গায়ে জড়াজড়ি করে নিজেদের দেহের তাপে সেটিকে উত্তপ্ত করে তোলে। হিমাঙ্কের 28° সেলসিয়াস নিচ থেকে 31° উপর পর্যন্ত এইভাবে সেটিকে মোট প্রায় 59° সেলসিয়াস গরম করে তুলতে পারে। গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলেই মৌমাছিরা কুলকুচি করে মৌচাকের গায়ে জল ছিটিয়ে, পাখনা নেড়ে হাওয়া দিয়ে চাকটিকে ঠাণ্ডা করে। এইভাবে তাপমাত্রাটিকে সর্বদাই তারা 34/35° সেলসিয়াসে ধরে রাখে। উইপোকারা আবার তাদের বাসাটিকে এমন ভাবেই বানায় যে গরম হাওয়াটি নলের মধ্যে দিয়ে নিচে নামতে নামতে ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হতে থাকে, তারপর সেই শীতল বাতাসটি ধীরে ধীরে উপরে উঠে আসে। কর্মী উই-পোকারা তাপের তারতম্য অনুসারে নলের বেষ্টনীটিকে ছোট-বড় করে।

'ভ্যাকুয়াম ক্লীনার'এর জন্ম আর কতদিনের! কিন্তু সৃষ্টির সুরু থেকেই ঝিনুকেরা বালিতে গর্ত করার সময় ধুলো জঞ্জালগুলি 'ভ্যাকুয়াম ক্লীনার' এর মতই শুষে এনে বাইরে ফেলে। নিউগিনী, ইন্দোনেশিয়া আর অস্ট্রেলিয়ার 'ক্র্যাবটার্কি' বলে মুরগীর এক জাতভাইরা আমাদের 'ইন্‌কিউবেটার' বা ডিম্ ফুটিয়ে বাচ্চা বের করার যন্ত্র আবিষ্কারের অনেক আগে থেকেই পচানো উদ্ভিদের তাপে তাদের ডিম ফুটিয়ে আনছে। তাপমাত্রাটি বাড়তে সুরু করলেই তারা জঞ্জালের স্তূপটিকে কমাতে থাকে

আর কমে গেলেই সেগুলি বাড়িয়ে দেয়। তাদের ঠোঁটের তাপমান যন্ত্রটি এতই নিখুঁত যে তাপমাত্রাটিকে কখনই তারা 32° থেকে 36° সেলসিয়াস-এর বাইরে যেতে দেয় না।

ডাক্তারীবিদ্যাতেও এরা কম যায় না। 'র‍্যাটল' সাপের বিষদাঁত আর ডাক্তারদের 'হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জ'-এর মধ্যে তফাৎ অল্পই। এক জাতের পোকারা আবার বিষাক্ত ট্যারান্টুলা মাকড়সাদের না মেরে শুধু অজ্ঞান করেই জিইয়ে রাখে (তাদের অনাগত উত্তরপুরুষদের মজুত খাদ্য হিসাবে)। মাকড়সাদের বুক, পা আর চোয়ালের সন্ধিস্থলেই যে তাদের স্নায়ুকেন্দ্রটি অবস্থিত আর সেখানে বিষ ঢালতে পারলেই যে তারা জ্ঞান হারাবে, এতটা উঁচুস্তরের শারীরবিদ্যার জ্ঞান হয়ত আজকালকার অনেক ডাক্তারী ছাত্রদেরও থাকে না। শুধু তাই নয় খাদ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি হিসাবেও এটি যথেষ্ট উন্নত। কারণ শিকারটির তিন-চতুর্থাংশ অবধি খেয়ে ফেলার পরও বাকি সিকিভাগটি জীবন্ত থাকে।

রাসায়নিক যুদ্ধকেও মানুষের আবিষ্কার বললে ভুল বলা হবে। বহু প্রাণীই বিশেষতঃ কীটপতঙ্গেরা এ বিষয়ে অসীম পারদর্শী। পিঁপড়েরা 'ফরমিক অ্যাসিড' বলে এক জাতের ঝাঁঝালো রাসায়নিক ছিটোয়। আর এশিয়া আফ্রিকার 'বম্বার্ডিয়ার বীটল্'রা ত এ বিষয়ে স্বনামধন্যই। এদের পিছন দিকটা দেখতে অনেকটা বন্দুকের নলের মত। বিস্ফোরণের আওয়াজটি কানে শোনা যায় আর চোখে দেখা যায় তার ধোঁয়া। উত্তর আমেরিকার 'স্কাঙ্ক' বলে এক জাতের প্রাণীরাও তাদের বিরাট বিরাট পায়ুগ্রন্থি নির্গত দুর্গন্ধরস নিক্ষেপ করে। চার মিটার দূর থেকেও লক্ষ্যভেদে তাদের কদাচই ভুল হয়। রসের ঝাঁজে দমবন্ধ হয়ে আসে। সময় সময় সাময়িক অন্ধতাও ঘটে। বোল্ডা, ব্যাজার, উইজেলরাও এ বিষয়ে যথেষ্ট পারদর্শী।

আগাছা আর পোকামাকড়ের হাত থেকে শস্যক্ষেত্র বাঁচাতে মানুষ আজ 'রাসায়নিক' ব্যবহার করছে, কিন্তু আমাদের অনেক আগে থেকেই উইপোকারা আগাছা মারার ওষুধ ছিটিয়ে আসছে। 'ক্যাপ্রিলিক অ্যাসিড' ছড়িয়ে তারা তাদের বাগানটিকে এমনই আগাছামুক্ত করে নেয় যে বিশেষ এক জাতের ছত্রাক ব্যতিরেকে আর কিছুই সেখানে জন্মাতে পারে না।

এই সব জানলে কি নিজেদের নিয়ে গর্ব করাটা শোভা পায় মানুষের ? না কীটপতঙ্গ ও অন্যান্য প্রাণীদের কাছ থেকে অনেক কিছুই শিখে নিতে হবে আমাদের ?

সীমান্ত

প্রদীপকুমার বসু*

কোন দেশের বা অঞ্চলের সীমানা বলতে সাধারণতঃ জাতি, ধর্ম, ভাষা, খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদির ভিত্তিতে বিভাজিত দেশের বা অঞ্চলের মধ্যেকার নির্দিষ্ট রেখা। সীমানার গুরুত্ব মানুষের সমাজে অপরিসীম। আর তাই বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে দুটি দেশের সীমানা-বিরোধ দেখা যায়। শাসন ব্যবস্থার সুবিধার জন্যও সীমানা নির্দিষ্ট করতে দেখা যায়। আবার বিশেষ গোষ্ঠীর শাসনব্যবস্থা কায়েম রাখার জন্যয় সীমানা নির্দিষ্ট হয়ে থাকে।

আমাদের সমাজে যেমন সীমানার গুরুত্ব অসীম, প্রাণীজগতেও তেমনই। প্রাণীজগতে সীমানাভিত্তিক অঞ্চল তৈরি হয় সাধারণত খাদ্যের জন্য এবং জনন সংক্রান্ত সম্পর্ক রক্ষার ব্যাপারে। ফলে এদের সীমানা শুধু স্বজাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আমরা যেমন খাল কেটে, প্রাচীর তুলে সীমানা চিহ্নিত করি, এরা কিন্তু ভিন্ন উপায়ে সীমানা চিহ্নিত করে।

রাস্তায় একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাওয়া যায়, পথে যে কুকুর বাস করে তাদের সীমানা নির্ধারণের ধরন। এক অঞ্চলের পুরুষ কুকুরের সঙ্গে যদি পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের পুরুষ কুকুরের দেখা হয়, তাহলে প্রথমেই যে ঘটনাটি চোখে পড়বে, তাহল, উভয়েই দন্ত দ্বারা একে অপরকে ভয় দেখাতে থাকে এবং গরর্-গরর্ আওয়াজ করে। এইরকম কিছুক্ষণ চলার পর উভয়ের একজন কাছাকাছি দেয়াল বা কোন ঢিপির গায়ে মূত্র ত্যাগ করে ও চলে আসে এবং প্রতিদ্বন্দ্বী কুকুরটি সেই মূত্র সিঞ্চিত অংশটির ঘ্রাণ নেয় ও প্রথম কুকুরটি বিপরীত রাস্তা ধরে। অবশ্য সব সময়েই যে ব্যাপারটি অত সহজেই মিটে যায়, তা নয়। আর তাই সময় বিশেষে বিরাট লঙ্কাকাণ্ড ঘটতে দেখা যায়।

বনের মধ্যে বাঘের ক্ষেত্রে এইরকম মূত্রের দ্বারা সীমানা চিহ্নিত করতে অথবা মল দ্বারা সীমানা চিহ্নিত করতে দেখা যায়। সিংহদের ক্ষেত্রে তিন প্রকারের সীমানা চিহ্নিতকরণের পদ্ধতি দেখা যায়। অন্য প্রাণীদের মত এরা গর্জন করে এবং মূত্র চিহ্নিত করে কোন বিশেষ জায়গা নিজেদের দখলে রাখে। এদের তৃতীয় পদ্ধতিটি বেশ বিস্ময়কর। সেটি হল, মাঝে মধ্যে এলাকাটি পরিক্রমা করে নিজের কর্তৃত্ব বজায় রাখা। গর্জন দ্বারা সীমানা চিহ্নিতকরণের সময় দলবদ্ধভাবে

* সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল, 1, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলিকাতা-700073

অথবা দলপতি একাই প্রচণ্ড শব্দে গর্জন করে। আর মূত্রের দ্বারা সীমানা চিহ্নিতকরণের সময় এরা এদের মাথার সমান উচ্চতায় বন্য গাছপালা বেছে নেয়। তারপর পুনঃপুনঃ সেই গাছপালায় ঘ্রাণ নেয় এবং নিশ্চিত হয় যে আর কোন দল সেখানে চিহ্ন এঁকে দেয় নি। তখন পশ্চাৎ দিকটি গাছপালার দিকে রেখে সবেগে মূত্র ত্যাগ করে। তাই চিহ্নিতকরণের কাজটি সবসময় দলপতি সিংহটিই করে থাকে। মূত্রের সঙ্গে এরা এদের পায়ুগ্রন্থির ক্ষরণও মিশিয়ে দেয়। আবার পশ্চাতের পায়ে মূত্র লাগিয়ে পরিক্রমা করার সময়ে পুরো এলাকাটিতে একটি গন্ধের গণ্ডী এঁকে দিয়ে সীমানা চিহ্নিতকরণের কাজটি সম্পূর্ণ করে।

পুরুষ জলহস্তী আবার মূত্রের বদলে বিষ্ঠা দিয়ে তাদের সীমানা চিহ্নিত করে। এরা এদের জলজ পরিবেশ থেকে খাদ্যের জন্য নির্দিষ্ট ডাঙ্গা অবধি রাস্তার দু-পাশে, বিশেষ বিশেষ স্থানে বিষ্ঠা ত্যাগ করে দৈনিক যাত্রাপথ এবং বাসস্থান চিহ্নিত করে রাখে। তবে বিষ্ঠাত্যাগের প্রক্রিয়াটি একটু অদ্ভুত ধরনের। মলত্যাগের সময়ে এরা লেজটিকে দু-ধারে জোরে দোলায়; ফলে মলের অংশ বিশেষ লেজ-তাড়িত হয়ে ছিটকে ছিটকে নিকটবর্তী লতাগুল্মের ঝোপের উপর গিয়ে পড়ে। যেহেতু, ঝোপগুলি মাটির তল থেকে কিছু উপরে অবস্থিত, তাই পাতায় লেগে থাকা মল এদের নাক বরাবর হয় এবং সহজেই অন্য জলহস্তী তার ঘ্রাণ নিতে সক্ষম হয়। শ্বেত গণ্ডারকেও এই ভাবে মলের সাহায্যে সীমানা চিহ্নিত করতে দেখা যায়।

ভালুকও তাদের সীমানা চিহ্নিতকরণের কাজটি মূত্রের দ্বারা সম্পন্ন করে। এলাকার সীমান্তবর্তী গাছের কাণ্ডকে নখ দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে স্থানটিকে মূত্র সিঞ্চিত করে দেয়।

কিছু কিছু প্রজাতি আছে, যারা সীমানা চিহ্নের ব্যাপারে মলমূত্রের উপর নির্ভরশীল নয়। দেহের বিশেষ গ্রন্থির ক্ষরণের দ্বারা সীমানা চিহ্নিত করে। গ্রন্থির দ্বারা সীমানা চিহ্নিত করে বলে এরা যথেচ্ছ সীমানা চিহ্নিত করে না। অ্যানাল গ্ল্যাণ্ড বা পায়ুগ্রন্থি হল এইরকম একটি ক্ষরণ গ্রন্থি। সাধারণতঃ দেহের পশ্চাৎ দেশটি কোন বস্তু অথবা ঘাসের উপর ঘষে তার গায়ে গ্রন্থির ক্ষরণ লাগিয়ে দেয়। বেঁজি বা নকুলদের এই ভাবে সীমানা চিহ্নিত করতে দেখা যায়। চিহ্নিতকরণের সময় সামনের পায়ে ভর করে দেহের পশ্চাৎ অংশ উপরের দিকে তুলে ধরে এবং বৃক্ষ শাখাতে পায়ুসংলগ্ন গ্রন্থি ঘষে সেখানে ক্ষরিত পদার্থটি লাগিয়ে দেয়। হায়েনারা দলবদ্ধ ভাবে তাদের পায়ুগ্রন্থির ক্ষরণ মাটিতে ঘাসের উপর লাগিয়ে দিয়ে সীমানা চিহ্নিত করে। এরা আবার এদের আঙুলের ফাঁকের বিশেষ গ্রন্থির ক্ষরণ মাটি আঁচড়ে তাতে লাগিয়ে দিয়ে গন্ধ-গণ্ডি এঁকে দেয়।

লালা গ্রন্থির ক্ষরণও কিছু কিছু স্তন্যপায়ী প্রাণী সীমানা চিহ্নিত করার কাজে ব্যবহার করে। বিশেষ কতকগুলি ক্যাঙ্গারু জাতীয় প্রাণী চিহ্নের উপযোগী কতকগুলি বৃক্ষ বেছে নেয়, তারপর বৃক্ষশাখাতে মুখ লাগিয়ে লালা লেপন করে। আমেরিকা এবং আফ্রিকা মহাদেশের কিছু কাঠবেড়ালী আছে, যারা লালার বদলে মুখের পাশের বিশেষ গ্রন্থির ক্ষরণ গাছের ডালে মুখ ঘষে লাগিয়ে দেয়।

অ্যাকসিস হরিণ তাদের চোখের কাছের বিশেষ ক্ষরণ গাছের ডালে লাগিয়ে দিয়ে অঞ্চল চিহ্নিতকরণ করে। আবার অনেক প্রজাতির কপালের, চোখের অথবা শিং-এর দিকে বিশেষ ক্ষরণ-গ্রন্থি দেখতে পাওয়া যায়। যদি চিহ্ন বেশ দৃঢ় ভাবে লাগানোর দরকার হয়, তাহলে এলাকার গাছের কাণ্ডে মাথাটি বেশ করে ঘষে, যাতে করে ক্ষরণ যথাস্থানে লেগে যায়। যেমন গ্যাজেল-রা চিবুক-গ্রন্থির ক্ষরণ মাথাটি দু-পাশে দুলিয়ে জমির ঘাসে লাগিয়ে দেয়। আবার গলার গ্রন্থির সাহায্যে উট এবং ভালুক একই ভাবে তাদের ক্ষরণ দ্বারা এলাকা চিহ্নিত করে।

আবার তৃণভোজী হওয়া সত্ত্বেও একজাতীয় পুরুষ নীলগাইরা তাদের সীমানা চিহ্নিত করে মলের দ্বারা। নির্দিষ্ট এলাকার পুরুষ নীলগাই প্রতিদিন একই স্থানে মলত্যাগ করে। ফলে, সেই স্থানে মল জমে স্তূপের বা ঢিপির মত আকার নেয়, আর সেই ঢিপিই তাদের নিজস্ব সীমানা চিহ্নিত করতে সাহায্য করে। ঢিপি কোন কারণে নষ্ট হয়ে গেলে, তারা পুনরায় সেটিকে নবীকৃত করে।

সমতলচারীদের ক্ষেত্রে সব প্রাণীসেই এই সীমানা সংরক্ষণের বিষয়টি পরিলক্ষিত হয় না। তার জন্য অবশ্য কতকগুলি সমস্যা আছে। যেমন, চিহ্নিত স্থানটি বৃষ্টির জলে ধুয়ে যেতে পারে অথবা পচা পাতা ইত্যাদির দ্বারা চাপা পড়ে যেতে পারে। ফলে, এই চিহ্নিতকরণের ব্যাপারটি মাঝে মাঝেই নবীকরণের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। বৃক্ষচারী প্রাণীদের ক্ষেত্রেও অবশ্য কিছুটা অসুবিধা আছে। তবুও স্বল্প স্থানের মধ্যে বাস করে বলে এদের জীবনে সীমানা চিহ্নিত করণের ব্যবস্থা খুবই জরুরী।

এই জন্য নানা পদ্ধতিতে বৃক্ষচারী প্রাণীদের সীমানা চিহ্নিত করতে দেখা যায়। যেমন, ম্যাডাগাসকারের বৃক্ষচারী "সিফাকা লেমুর" তাদের থুতনির নিচের একটি গ্রন্থির ক্ষরণ দ্বারা সীমানা নির্দিষ্ট করে। এরা থুতনিটি গাছের ডালে ঘষে গ্রন্থি উদ্ভূত গন্ধ লাগিয়ে দেয়। ফলে স্বজাতীয় অন্য প্রাণীদের থেকে এই গন্ধের সাহায্যে নিজ অঞ্চলের অধিকার বজায় রাখে। আর সীমানাটি আরও জোরালোভাবে চিহ্নিত করার জন্য গাছের ডালে ডালে মূত্র ত্যাগ করে।

"ইন্দ্রিস" নামে আর এক প্রকার ঐ জাতীয় প্রাণী এইরূপ গ্রন্থির থেকে উৎপন্ন গন্ধের দ্বারা সীমানা চিহ্নিত করে। তাছাড়া, এরা সমবেত সঙ্গীতের মাধ্যমে সকাল-সন্ধ্যায় অঞ্চল চিহ্নিত করে এবং এই গান গাওয়ার সময় প্রত্যেকে আলাদা আলাদা সময়ে শ্বাসগ্রহণ করে যাতে সঙ্গীতের ছন্দপতন না, অর্থাৎ সঙ্গীতটি একটানা গীত হয়।

ম্যাডাগাসকারের "রিং-টেল্‌ড লেমুর" ও গন্ধ গ্রন্থির সাহায্যে সীমানা চিহ্নিত করে। এদের তিন ধরনের এই রূপ গ্রন্থি দেখা যায়। একটি থাকে কবজির ভেতর দিকে, যার ক্ষরণ আঙুলের মত একটা কাঁটার উন্মুক্ত হয় এবং দ্বিতীয়টি থাকে বুকের উপর দিকে প্রায় বাহুমূলের সন্নিকটে আর তৃতীয়টি থাকে পশ্চাৎ পাদদ্বয়ের মধ্যের অংশে জনন-অঙ্গের নিকটবর্তী অঞ্চলে। এই গ্রন্থির দ্বারা পুরুষ "রিং-টেল্‌ড লেমুর"রাই স্ত্রীদের থেকে অপেক্ষাকৃত বেশি সীমানা চিহ্নিত করে। যখন এদের একদল কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলে বাস করে, তখন নিকটবর্তী ছোট চারাগাছ বা বড় গাছের ডালগুলি ভালভাবে শুঁকে পরীক্ষা করে। যদি নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারে সেখানে অন্য কোন দল বাস করছে না, তখন মাটিতে সামনের হাতে ভর দিয়ে পিছন দিকটা যতটা সম্ভব উপরে তোলে; তারপর চারাগাছটির উপর দিকটি জনন-অঙ্গের দ্বারা ঘষতে থাকে এবং ফলে সেই অংশটি গন্ধদ্বারা চিহ্নিত হয়ে যায়। এরকম প্রক্রিয়া প্রায় এক মিনিট ধরে চলে। কখন কখন এই গন্ধদ্বারা চিহ্নিতকরণ পদ্ধতি বুকের গ্রন্থির দ্বারা সম্পন্ন হয়। আবার গাছের গায়ে আঁচড় কেটে সেখানে কব্‌জি গ্রন্থির গন্ধ ছড়িয়ে দেয়।

রিং-টেল্‌ড লেমুর"রা শুধুমাত্র যে অঞ্চল নির্ধারণের জন্যই গন্ধ ব্যবহার করে, তা নয়। প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রেও এই গন্ধ ব্যবহার করে। প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হলে এরা ব্যস্তভাবে বাহু দিয়ে বগলের গ্রন্থিটিকে ঘর্ষণ করে। তারপর দুই পশ্চাদ পায়ের মধ্যে দিয়ে লেজটিকে সামনে এনে কব্‌জী দিয়ে ঘষতে থাকে, যাতে কব্‌জী গ্রন্থির গন্ধ লেজে মেখে যায়। আর তখন লেজটিকে ঘন ঘন বাতাসে নেড়ে গন্ধটা ছড়িয়ে দিয়ে শত্রুকে দূরে সরিয়ে রাখার প্রয়াস পায়।

গন্ধ গ্রন্থির দ্বারা অঞ্চল নির্ধারণ একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। কিন্তু যাদের ঐ রকম কোন গ্রন্থি নেই, এই রকম বৃক্ষচারী প্রাণীরা এই সমস্যার সমাধান বেশ সহজভাবে করেছে। যেমন আসামের জঙ্গলে পাওয়া যায় "স্লো-লরিস" নামের এক প্রকার প্রাণী। এদের ধীর গমনের জন্য এদের নাম ঐরূপ দেওয়া হয়েছে। যেহেতু নিশাচর, তাই অঞ্চলের চিহ্নিতকরণের ব্যাপারটা খুবই জরুরী। এরা মূত্রের সাহায্যে অঞ্চল চিহ্নিত করে। কিন্তু সরু গাছের ডালে বাস করে বলে চিহ্নিতকরণের ব্যাপারটাও একটা সমস্যা সৃষ্টি করে। যদি সবেগে মূত্রত্যাগ করে তাহলে সেটা সরু ডালে না লাগতে পারে। আর তাই এরা করে কি, মূত্রত্যাগের সময় লোমশ হাতটিকে মূত্রদ্বারা ভিজিয়ে নিয়ে হাত দুটি দ্বারা গাছের শাখা-প্রশাখাতে ঘষতে থাকে। ফলে মূত্রের উগ্র গন্ধদ্বারা সমস্ত অঞ্চলটি চিহ্নিত হয়ে পড়ে।

দক্ষিণ আমেরিকার মারমোসেট এবং ট্যামাররিন্‌স নামক প্রাণীরা যদিও দিবাচারী, তথাপি এরা মূত্রের দ্বারা অঞ্চল চিহ্নিত করে। পুরুষরা নখ দিয়ে গাছের ছাল আঁচড়ে সেই অংশটি মূত্রের দ্বারা ভিজিয়ে দেয়।

সীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে মলমূত্র এবং ক্ষরণ গ্রন্থির উদ্ভূত গন্ধই আসল সীমানা নির্ধারক পদার্থ। কম-বেশি প্রায় সকল প্রাণীর মধ্যেই সীমানা চিহ্নিতকরণের ব্যাপারটি পরিলক্ষিত হয়। বিচিত্র যত প্রাণী, ততই বিচিত্র এদের সীমানা চিহ্নিতকরণের বিষয়টি।

এস্পেরান্তো ভাষাশিক্ষা

(ভূমিকা)

প্রবাল দাশগুপ্ত*

1887 খৃস্টাব্দে প্রবর্তিত এস্পেরান্তো (Esperanto) এক সহজ সুপরিকল্পিত আন্তর্জাতিক ভাষা। এর ভাষীর বর্তমান সংখ্যা কারও জানা নেই; ব্যয়সাপেক্ষ বিশ্বব্যাপী লোক-গণনা করলে তবে জানা যাবে; অনেকে অনুমান করেন, হয়ত দশ লক্ষ আর কুড়ি লক্ষের মাঝামাঝি। তবে সংখ্যাই সব নয়। এস্পেরান্তো যাঁরা বলেন তাঁরা এক বিপুল বন্ধুবৃত্ত; সীমা-পেরোনো ব্যক্তিগত বন্ধুত্বই সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে থাকা এই বৃত্তের বিভিন্ন অংশের মধ্যেকার যোগসূত্র। এই সূত্র ছিন্ন হয় নি এস্পেরান্তোর বিরুদ্ধে হিটলার স্টালিনদের রাষ্ট্র-শক্তির প্রয়োগে, ছিন্ন হয় নি দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধ আর দীর্ঘমেয়াদী ঠাণ্ডা লড়াইয়ের আন্তর্জাতিক শত্রুতায়। এস্পেরান্তো মানুষের সেই জাতি-মেলানো সত্তার প্রকাশমাধ্যম যা উগ্র জাতীয়তাবাদকে আসল বলে মানে না এবং কোন রাজায়-রাজায় লড়াই দেখে দমে যায় না। মানুষের সেই সত্তার প্রাণশক্তিই এস্পেরান্তোর প্রাথমিক পরিকল্পিত কঙ্কালে এক শতাব্দী ধরে সাহিত্যের রক্তমাংস পরিয়ে দিয়েছে। আজকের এস্পেরান্তো সাহিত্যে সমঝদার পাঠকেরও মন ভরে। এজন্যে এই ভাষাকে আজ আর কৃত্রিম বলা চলে না, বলতে হয় 'পরিকল্পিত ভাষা',

* ডেকান কলেজ, পোস্ট গ্রাজুয়েট অ্যাণ্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট, পুনে-411006

যেমন আকাশবাণী-প্রযুক্ত হিন্দীও পরিকল্পিত, এই হিন্দীর অধিকাংশ পরিভাষাই বিভিন্ন কমিটির হাতে তৈরি। আসল 'কৃত্রিম ভাষা' তো ফোর্ট্রান বা বেসিকের মতো কম্পিউটার-ব্যবহার্য গণিতাশ্রয়ী ভাষা যা মানুষের নয়। এস্পেরান্তো স্বাভাবিক ভাষা, মানুষেরই; কিন্তু এর উদ্দেশ্য, বিশ্বসচেতন ব্যক্তিদের নিরপেক্ষ দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে কাজ করা, কারও মাতৃভাষা বা প্রথম ভাষাকে জখম না করে। সবাইকেই এই ভাষা সচেতনভাবে শিখে নিতে হয়, তাই কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের লোকের অন্যদের তুলনায় অন্যায়রকম বেশি সুবিধে হয় না এস্পেরান্তো-জগতে।

এস্পেরান্তোর গঠন সুপরিকল্পিত বলে এই ভাষা শিখলে ভাষা ব্যাপারটা নিয়ে বৈজ্ঞানিক চিন্তা করা সহজ হয়। সেইজন্যে যে কোন বিজ্ঞানসাধকেরই উচিত মনের ব্যায়াম হিসেবে এস্পেরান্তো-শিক্ষায় কিছু দূর অগ্রসর হওয়া; ভাষাটা ব্যবহার করার দরকার পরে হলে হবে। না-হলে না হবে। তবে ভাষাবিজ্ঞান নিয়ে যাঁরা আগ্রহী তাঁদের জেনে রাখা ভাল যে এস্পেরান্তোর নিজস্ব ব্যাকরণচর্চার ঐতিহ্য কোন কোন ক্ষেত্রে খুবই প্রাগ্রসর, আধুনিক ইংরিজী-আশ্রয়ী ভাষাবিজ্ঞানের চেয়েও বেশি।

পরিচ্ছেদ 1

উচ্চারণ, লিপি

বইপত্র থেকে এস্পেরান্তো উচ্চারণ শেখা সম্ভব। তবে একটু চেষ্টা করতে হয়। উচ্চারণ নিয়ে ভাবতে আমরা অনেকেই অনভ্যস্ত। ভাবতে শেখাটাই চেষ্টাসাধ্য।

না-ভেবে যেটুকু হয় সেটুকু প্রথমে শিখে নেওয়া যাক।

স্বরধ্বনি পাঁচটা: ই এ আ ও উ। বড় হাতের অক্ষরে I E A O U, ছোট হাতের অক্ষরে i e a o u।

বিনা আলোচনায় এই ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোর উচ্চারণ শিখে নিতে পারেন:

K k ক্	Ĉ ĉ চ্	T t ত্	P p প্
G g গ্	Ĝ ĝ জ্	D d দ্	B b ব্
L l ল্	R r র্	H h হ্	M m ম্

অক্ষর হিসেবে এদের নাম কো, চো, তো, পো

এই যা শিখেছেন এটা প্রথমে অভ্যেস করা ভাল—অর্থহীন ধ্বনিবিন্যাস লিখে, পড়ে শুনে অভ্যেস।

keĉ কেচ্ tap তাপ্ lig লিগ্ hor হোর্

mip মিপ্ ret রেৎ ĝub জুব্ doĉ দোচ্

এর চেয়ে বড় ধ্বনিবিন্যাস যদি হয় তাহলে একাধিক স্বরধ্বনি এসে পড়বে। তখন এস্পেরান্তো উচ্চারণের একটা বিশেষ নিয়ম খাটে। শব্দের শেষ থেকে গুনলে যে-স্বরধ্বনি দ্বিতীয়, যাকে বলে 'উপান্ত্য স্বরধ্বনি', সেটার উপর জোর দিয়ে, ঝোঁক দিয়ে, উচ্চারণ করতে হয়-

kEci কেচি tApu তাপু ĝagOli গাজোলি rahemIdoĉ রাহেমিদোচ্ সবই অর্থহীন। খালি উচ্চারণের মহড়া।

এবার সেইসব ধ্বনির পালা যেগুলো একটু ভেবে শিখতে হয়।

সবচেয়ে কম ভাবতে হয় Nn নিয়ে। এর উচ্চারণ এমনিতে ন্; হরফটার নাম 'নো'। কিন্তু ক বা গ-এর আগে সাধারণত লোকে ঙ্ বলে। পিঙ্কু pinku, কিন্তু kintu। জোর করে সারাক্ষণ ন্-ই বলবেন এরকম পণ করলে কেউ আপনাকে আটকাবে না, কিন্তু punkto-কে পুঙ্ক্তো বলা সোজা, পুন্‌ক্তো বলা বেশ কঠিন।

তারপর Ss আর Zz-এর পালা। অক্ষর হিসেবে এদের নাম সো আর জো.। ধ্বনি হিসেবে দন্ত্য উষ্মধ্বনি। S হলো প্রকৃত দন্ত্য স। বাঙলা আস্তিন (astin)-এর স-এর মতো। বাঙলা 'আসীন' শব্দের বানানে দন্ত্য স থাকলে কী হবে, উচ্চারণের বেলায় তো আশিন্, তালব্য শ। আর Z হলো S-এর ঘোষবৎ দোসর, বাঙলা অক্ষরে কেউ কেউ জ-এ বিন্দু দিয়ে জ. লেখেন। যেমন আফ্রিকার একটা দেশ জ.াম্বিয়া (এস্পেরান্তো নাম Zambio জ.াম্বিও)।

Ŝ ŝ হচ্ছে তালব্য শ্; আসীন-এর উচ্চারণ aŝin, আশ্বিন-এর উচ্চারণ aŝŝin; এর ঘোষবৎ দোসর Ĵ ĵ বাঙলায় পাওয়া যায় না, ইংরিজী measure শব্দের s; বাঙলা হরফে ইচ্ছে করলে ঝ. লেখা যায়, যদিও বাঙলা ঝ-এর মহাপ্রাণ ভাবটা ("হ্"-এর ঝোঁকটা) এই ঝ. ধ্বনিতে নেই।

তালব্য উষ্ম ধ্বনির সঙ্গে তালব্য ঘৃষ্ট Ĉ ĉ (চ) ধ্বনির যে সম্পর্ক, দন্ত্য (আসলে মাড়ীতে উচ্চারিত, "দন্তমূলীয়") উষ্মধ্বনি s-এর সঙ্গে দন্তমূলীয় ঘৃষ্ট ধ্বনি Cc-এর সেই সম্পর্ক। পুব বাঙলায় কেউ কেউ বাঙলা চ-এর এই দন্তমূলীয় উচ্চারণ করেন, তাই বাঙলা হরফে c-কে চ' লেখা চলে। পশ্চিমবঙ্গেও অনেকে কোন কোন ক্ষেত্রে যেমন "কাপড় কাচতে" বলতে গিয়ে, kacte না বলে, তালব্য চ্ না বলে, কাচ'তে বা kacte বলেন, দন্তমূলীয় চ্' বলেন। হয়তো কারো কারো পক্ষে প্রথমে জ্যোৎস্না-র ৎস্ বলা অভ্যেস করে ক্রমশ দ্রুত ঘৃষ্ট উচ্চারণের দিকে গিয়ে চ. বলতে শেখা সহজ। ঠিক যেমন ফরাসীরা, ফরাসী ভাষায় তালব্য চ-ও নেই বলে, বাঙলা শিখতে গিয়ে "চার" বা "চাক" বলার জন্যে প্রথমে বলতে শেখেন ৎশার, ৎশাক, তারপর

ক্রমশ দ্রুত, ঘৃষ্ট উচ্চারণ করে ৎস্ থেকে চ্-এ পৌঁছতে শেখেন। তেমনি আমাদের ভাষায় চ' নেই বলে, আমরা ৎস্ বলে বলে চ্ বলা শিখতে পারি।

মুখের পিছন দিকে যেখানটাতে হাওয়ার পথ আটকে লোকে ক্ বলে সেইখানে অল্প একটু ফাঁক করে হাওয়া ঠেলে বার করলে যে অঘোষ খ-জাতীয় উষ্ম ধ্বনি শোনা যায় সেটা Ĥ, ĥ, খ্. । এর ব্যবহার যৎসামান্য।

উপরের দাঁতের সারিতে নিচের ঠোঁট ঠেকিয়ে যদি একটু ফাঁক রাখা যায়, সেই ফাঁক দিয়ে জোরের সঙ্গে অঘোষ হাওয়া ঠেললে F f ধ্বনি হয়, ফ্. । সেই একই একই ফাঁক দিয়ে মৃদুভাবে ঘোষবৎ হাওয়াকে বেরিয়ে যেতে দিলে যে ধ্বনি উৎপন্ন হয় তা V v, বাঙলায় ভ্. লেখা চলে। যাঁরা আহ্বান শব্দের বিশুদ্ধ দন্ত্যোষ্ঠ্য উচ্চারণ করেন, aovan, তাঁরা এ ধ্বনির উচ্চারণ জানেন; যাঁরা আহ্বানকে aohan বা দু-ঠোঁট-বন্ধ করা aobhan বলেন (এমন কি abbhanও শুনেছি) তাঁরা আমার দেওয়া f আর v উচ্চারণের বর্ণনা অনুসরণ করে f v বলতে শিখুন, বাঙলার কথা একেবারে ভুলে গিয়ে।

বাকী রইল দুটো অর্ধস্বর।

Uu স্বরের অর্ধস্বর সংস্করণ Ŭ ŭ ; I i স্বরের অর্ধস্বর সংস্করণ J j ; শব্দের শেষ থেকে স্বরধ্বনি গোনার সময় অর্ধস্বর গুনতে নেই। কাজেই ;

pra-U-lo প্রা-উ-লো

fr-A ŭ -lo ফ্র.াউ-লো

fe-I-no ফে.-ই-নো

vEj-no ভে.ই-নো

বাঙলা কথা এস্পেরান্তো অক্ষরে লেখার সময় খেয়াল করবেন। দয়িতা doita, দ্বৈত dojto ; দায়ী dai বা daji, দাই daj ; ইত্যাদি।

এস্পেরান্তো উচ্চারণের সব নিয়ে বলা হয়ে গেল। যেমন লেখা থাকে ঠিক তেমনিই উচ্চারণ হয়। ব্যতিক্রম নেই।

বর্ণমালা ঃ

A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ

K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z

শৈবালের ঔষধি গুণ

সমুদ্র-শৈবালের নানা ঔষধি গুণের কথা আজ লোকের অজানা নয়। প্রথমে এথেকে নানারকম মুখরোচক খাদ্য, পশুখাদ্য, উর্বরক প্রভৃতি তৈরি হত। এ থেকে নানা রকম শর্করা জাতীয় পদার্থ পাওয়া যায়। লোহিত শৈবাল থেকে পাওয়া যায় অ্যাগার, ক্যারাজিনাম এবং ফারসিলারাস। বাদামী শৈবাল থেকে পাওয়া যায় অ্যালজিন, ফিউকয়ডিন, ল্যামিনেরিন। গোয়ার সমুদ্রবিজ্ঞান সংস্থায় সামুদ্রিক শৈবাল নিয়ে গবেষণা হয়! এতে ভাইরাস, স্নায়ু, রক্তচাপ সম্বন্ধীয় নানা কৌতূহলোদ্দীপক ফলাফল লক্ষিত হয়। একজাতীয় নীল সবুজ শৈবাল রক্তের ক্যানসার রোগ প্রতিরোধী গুণ দর্শায়। টি. বি-র জীবাণুর প্রতিরোধ গুণ পাওয়া গেছে অরেকটি বিশেষ শৈবালে। আরেকটি শৈবালকে ইঁদুরের শরীরর কোলেস্টেরল কমাতে দেখা গেছে। এভাবে বিভিন্ন শৈবালের মধ্যে বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধী ও অন্যান্য গুণাবলী দেখা গেছে। তাই শৈবাল নিয়ে গবেষণার বিরাট দিগন্ত আজ মানুষের সামনে এবং তার ফলে সমুদ্র-শৈবাল থেকে বহু রকম রাসায়নিক পাওয়া যাবে যা মানুষের রোগ নিরাময়ে ও অন্যান্য কাজে লাগবে।

[ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ]

নানা জাতীয় পানা ও শেওলার ব্যবহার

উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ার জন্য বাংলাদেশে নানা জাতের পানা ও শেওলা প্রচুর পরিমাণে জন্মে। নৌ-চলাচল, কৃষি, মৎস্য চাষে বিঘ্ন ঘটায় ও স্বাস্থ্যগত অপ্রীতিকর সমস্যার সৃষ্টি করে। উষ্ণ মণ্ডলের সকল দেশই এই সমস্যার সম্মুখীন। বিগত 40-50 বছর ধরে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ইত্যাদি উন্নত দেশের বিজ্ঞানীরা নানা ধরনের গবেষণা চালিয়েও ঐ উদ্ভিদগুলিকে নির্মূল করতে পারেন নি। কাজেই গবেষণার মোড় ঘুরিয়ে তাঁরা এ সকল উদ্ভিদকে কি ভাবে কাজে লাগানো

এক জাতের পানা

যায় তারই চেষ্টা চালাতে থাকেন। দেখা গেছে যে, এ সকল উদ্ভিদে যথেষ্ট পরিমাণে উচ্চমানের খাদ্য আমিষ ও ভিটামিন রয়েছে। হাঁস-মুরগী ও গবাদি-পশুর খাদ্য হিসাবে এগুলি অতি সহজে ব্যবহার করা যেতে পারে। এমনকি মানুষের খাদ্য হিসাবেও কচুরিপানা ব্যবহৃত হতে পারে। জলজ উদ্ভিদে পর্যাপ্ত পরিমাণে নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাসিয়াম থাকায় উৎকৃষ্ট মানের জৈব সার হিসাবেও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তাদের ব্যবহার শুরু হয়েছে।

চীন, জাপান ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নানা দেশে কোন কোন শেওলা মানুষের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। গৃহপালিত পশুর আমিষ জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন মেটানোর জন্য নানা জাতীয় শেওলার উপর গবেষণা চলছে বিভিন্ন দেশে। যে কোন ধরনের শেওলাকেই জৈব সার হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। বিশেষ ধরনের নীলাভ সবুজ শেওলা জমিতে ব্যবহার করে নাইট্রোজেন সারের ব্যবহার শতকরা ত্রিশ ভাগ কমানো যেতে পারে।

ঢাকায় অবস্থিত বি.-সি.-এস.-আই.-আর ল্যাবরেটরীতে স্থানীয় পানা ও শেওলার উপর গবেষণা চলছে সাত-আট বছর ধরে। এই গবেষণায় দেখা গেছে যে, নয়টি জলজ উদ্ভিদকে উৎকৃষ্ট মানের হাঁস-মুরগীর খাদ্য হিসাবে এবং পাঁচটিকে গবাদি-পশুর খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। নয়টি শেওলাকে উৎকৃষ্ট মানের জৈব সার ও একটি শেওলাকে পশু খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যায়। গবেষণা চলাকালে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তব সমস্যার কথা গবেষকদের গোচরে
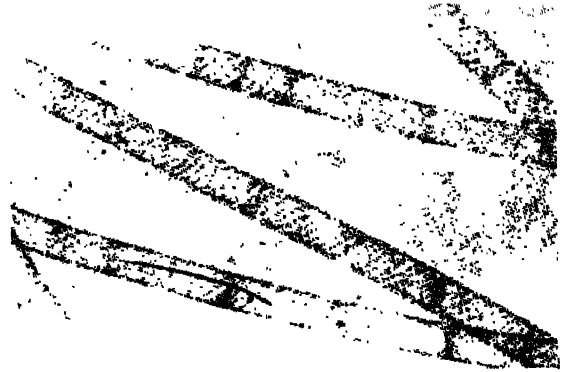
এক জাতের সবুজ শেওলা

আসে। ক্রমাগত কেবল কেমিক্যাল বা রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে সুজলা শস্য-শ্যামলা বাংলাদেশের অনেক অঞ্চলের মাটি সাধারণ উর্বরতা হারিয়ে ফেলেছে। এর ফলে বহু অঞ্চলের কৃষকেরা এখন কেমিক্যাল সারের ব্যবহার বন্ধ করেছেন। কাজেই পর্যাপ্ত সারের অভাবে কেমিক্যাল সারের সঙ্গে পরিমাণ মত জৈব সার মেশালেই এই বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের দেশে সমস্যাটি অত সহজে সমাধান হবার নয়। কারণ, এদেশে একমাত্র গোবর সারকেই ব্যাপক হারে জৈব সার ব্যবহার করা হয়ে থাকে। প্রয়োজনের তুলনায় দেশে গোবর সারের ঘাটতি থাকায় কৃষকেরা ব্যবহার করেন। উন্নত দেশগুলিতে গবাদি-পশুর প্রাচুর্যের কারণে ফসলের জমিতে সর্বদাই পর্যাপ্ত জৈব সার ব্যবহার করা হয়। এ সমস্যার সমাধান করতে হলে

এদেশে গোবর সারের পরিবর্তে অন্য কোন জৈব সার ব্যবহার বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন।

বি.-সি.-এস্.-আই.-আর গবেষণাগারে গবেষণার ফলে দেখা গেছে যে, কেমিক্যাল সারের সঙ্গে যে কোন ধরনের জলজ উদ্ভিদকে পচিয়ে জৈব সার হিসাবে ব্যবহার করলে গোবর সারের ব্যবহার বহুলাংশে কমানো যেতে পারে। কোন কোন শেওলাকেও এভাবে ব্যবহার করা সম্ভব। বিশেষ ধরনের শেওলা ও জলজ উদ্ভিদের সাহায্যে হাঁস-মুরগী এবং গবাদি-পশুর খাদ্য ও আমিষ জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন মেটাতে পারে।

শেওলা ও পানা ব্যবহারের গুরুত্ব বিশ্বের উন্নত দেশগুলি আজ বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করেছে বলেই সে সকল দেশে এসব উদ্ভিদের উপর বহু অর্থ ব্যয়ে নানা ধরনের উন্নত মানের গবেষণা চলছে। আমাদের দেশে শেওলা ও জলজ উদ্ভিদদের উপর গবেষণাকে অনেকেই হাস্যকর মনে করেন। কিন্তু যে কোন জিনিসকে সঠিক ভাবে ব্যবহার করতে হলে তার উপর গবেষণার প্রয়োজন হয়েছে।

এখন জলজ উদ্ভিদদের সমস্যার কয়েকটি বাস্তব উদাহরণ তুলে ধরে আলোচনা শেষ করা যাক।

ইদানীং দৈনিক সংবাদপত্র (ইত্তেফাক ইং 10-11-84) প্রকাশিত এক সংবাদে জানা যায় যে, ভৈরবের লোকেরা সার ও গোখাদ্য হিসাবে স্থানীয় জলাশয়ের সমস্ত কচুরিপানা ব্যবহার করায় সেখানে এখন কচুরিপানার অভাবে পশুখাদ্যের সংকট দেখা দিয়েছে। অন্যদিকে ফরিদপুরের মধুখালি উপজেলার রায়দিয়া বৈকুণ্ঠপুর বাওরে কচুরিপানার আধিক্যের ফলে ফসল উৎপাদন যেমন ব্যাহত হচ্ছে, তেমনি জনসাধারণ বাওরের জল ব্যবহার করতে পারছেন না। এ দুটি বিপরীত-মুখী সমস্যার সমাধান কিন্তু অতি সহজেই করা সম্ভব। ভৈরবের লোকদের জানিয়ে দিতে হবে যে, কচুরীপানা তোলার সময় শতকরা 25 ভাগ পানা জলে রেখে দিলে ভবিষ্যতে তাদের আর পানার অভাব হবে না। মধুখানির লোকদের কচুরীপানার ব্যবহার শেখাতে হবে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কচুরীপানাকে অনেকেই গোখাদ্য অথবা পুড়িয়ে ছাই করে সার হিসাবে ব্যবহার করেন। কিন্তু এই তথ্যটি অনেকেরই জানা নেই যে 1 ভাগ খড়ের সঙ্গে 1 ভাগ কচুরীপানা মিশিয়ে গোখাদ্য হিসেবে ব্যবহার করলে গরুর স্বাস্থ্য যেমন ভাল থাকে তেমনি তারা ভাল দুধ দেয়। কচুরীপানা পুড়িয়ে ছাই করে তা সার হিসাবে ব্যবহার করলে সারের অনেকখানি যে নষ্ট হয় এ তথ্যটিও অনেকের জানা নেই।

নর্দমার শেওলা আমাদের দেশে অতি অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে, অথচ জমিতে সার হিসাবে এ সকল শেওলা ব্যবহার করলে জমির উর্বরতা বেশ বৃদ্ধি পায়। একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে চার-পাঁচ বছর যে জমিতে কোন অজ্ঞাত কারণে ঘাস জন্মানো সম্ভব হয় নি নর্দমার শেওলা ব্যবহার করায় সেই জমিতে সুন্দর ঘাস জন্মায়।

[আজকের বিজ্ঞান, বর্ষ-1, সংখ্যা—1,
ঢাকা—5, বাংলাদেশ]

দীর্ঘ জীবনের জন্য কম খান

দীর্ঘ জীবনের জন্য কম খাবার কথা শুনলে অদ্ভুত শোনায়। কিন্তু তবু, বিজ্ঞানীরা বলছেন, কথাটা সত্যি, স্বল্প পুষ্টি দীর্ঘজীবন লাভের পক্ষে অনুকূল।

মার্কিন দেশের বিজ্ঞানী রয় ওয়ালফোর্ড মানুষের দীর্ঘজীবন লাভের সমস্যা নিয়ে গবেষণা করছেন প্রায় তিন দশক ধরে। লস এঞ্জেলস-এ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য কেন্দ্রের গবেষক ওয়ালফোর্ড এবং তাঁর সহকর্মীদের মতে, আগামী দিনে 90 বছরের বৃদ্ধ লোকের দৈহিক সামর্থ্য হবে আজকের 50 বছর বয়সী লোকের মতো। তাঁরা মনে করছেন কি করে তা সম্ভব। তার রহস্য তাঁরা ভেদ করেছেন। রহস্যটা হল বার্ধক্যকে বিলম্বিত করা—অর্থাৎ বার্ধক্য দীর্ঘায়িত না করে তারুণ্য ও যৌবনকে দীর্ঘস্থায়ী করা।

কথাটা শুনতে সহজ, কিন্তু বাস্তবে তা সহজসাধ্য বলে মনে হয় না। যৌবনকে চিরস্থায়ী করার স্বপ্ন দেখছে মানুষ সেই আদি কাল থেকে। তার জন্য তপস্যা করেছে অমৃত লাভের, কখনো ইহলোকে বার্ধক্যের কাছে পরাস্ত হয়ে প্রতীক্ষা করেছে পরলোকে অনন্ত যৌবন প্রাপ্তির প্রত্যাশায়।

অথচ রয় ওয়ালফোর্ড বলছেন, অমৃতের প্রয়োজন নেই— শুধু কম খান, অপুষ্টি নয়, প্রয়োজন স্বল্প পুষ্টির। অর্থাৎ এমন খাদ্য খেতে হবে যাতে ক্যালরি থাকবে কম, কিন্তু ভিটামিন আর খনিজ পদার্থ থাকবে যথেষ্ট। অন্ততঃ গবেষণাগারে ইঁদুরের ওপর এ ধরনের খাদ্য প্রয়োগ করে তাঁরা উৎসাহজনক ফল পেয়েছেন। সাধারণতঃ যে ইঁদুর বাঁচে মাত্র দু'বছর, এ ধরনের খাদ্য খেয়ে তারা বেঁচেছে চার বছর। তাদের চেহারায় আর চলাফেরায় ছিল সতেজ তারুণ্য। অবশ্য মানুষের ওপর এমনি পরীক্ষা তাঁরা এখনও করেননি।

ওয়ালফোর্ডের মূল বক্তব্য হল, এযাবৎ দীর্ঘজীবন লাভের

জন্য যে সব গবেষণা হয়েছে তার লক্ষ্য ছিল বার্ধক্যের নানারোগের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যেমন, ক্যানসার, হৃদরোগ, বহুমূত্র, সন্ন্যাস এবং বাত। কিন্তু আসলে বার্ধক্যে পৌঁছে তার উপসর্গগুলির সঙ্গে লড়াই না করে চেষ্টাটা হওয়া উচিত বার্ধক্যে পৌঁছাবার আগেই সেগুলি প্রতিহত করা। আজকে জরাবিজ্ঞানীরা মানুষের দেহে কেন জরা দেখা দেয় আর কি করে জরাজনিত বিভিন্ন ব্যাধিকে প্রতিরোধ করা যায় সেদিকেই তাঁদের দৃষ্টি দিচ্ছেন।

মানুষের দেহকোষের কেন্দ্রে রয়েছে বংশগতির ধারক অসংখ্য ডি, এন, এ, অণু আর তাদের সমাবেশে তৈরী অসংখ্য জিন-কণা। জীবনযাত্রার স্বাভাবিক ঘাত-প্রতিঘাতে এসব ডি, এন, এ, অণুতে সব সময়ই কিছু না কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটতে থাকে, ফলে দেহযন্ত্রের ক্রিয়াকলাপ ব্যাহত হতে পারে। কোন ডি, এন, এ, ক্ষতিগ্রস্ত হলে কোষটি সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যায় অথবা বল্গাহীনভাবে বংশবৃদ্ধি করতে থাকে—যেমন ঘটে ক্যানসারে। এজন্য দৈহিক টিসু বা দেহকলা দুর্বল ও অক্ষম হয়ে পড়ে। তাতেই দেখা দেয় বার্ধক্যের নানা ব্যাধি। অবশ্য দেহের ডি, এন, এ-কে এ ধরনের ঘাত-প্রতিঘাত থেকে রক্ষার জন্য রয়েছে দেহের 'ইমিউনিটি' বা অনাক্রম ব্যবস্থা। ওয়ালফোর্ড বলছেন, এই অনাক্রম ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে বার্ধক্যকে বিলম্বিত করতে পারে এমন কিছু জিনও রয়েছে জীবদেহে।

অন্য দিকে দেখা যায় যে দেহের উষ্ণতা কম থাকলে আয়ু বেড়ে যায় বলে মনে হয়। ব্রাজিলের এক জাতের মাছের স্বাভাবিক আয়ু কম, কিন্তু অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা জলে রাখলে তাদের আয়ু হয় প্রায় দ্বিগুণ। দীর্ঘজীবী ভারতীয় যোগীরা নাকি তাঁদের দেহের তাপমাত্রা ইচ্ছেমতো কমাতে বা বাড়াতে পারেন, সব মানুষই হয়তো একদিন এভাবে দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের কৌশল আয়ত্ত করবে। কিন্তু তাপমাত্রা কমাবার একটা সহজ উপায় হল খাদ্য নিয়ন্ত্রণ—কম খেলে দেহের উষ্ণতা কিছুটা কম থাকে।

খাদ্য নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আয়ু বৃদ্ধির গবেষণা অবশ্য একেবারে হালের নয়। 1935 খৃস্টাব্দে একজন গবেষক ইঁদুরের খাদ্য গ্রহণ স্বাভাবিকের তুলনায় 6 শতাংশে কমিয়ে এনে দেখতে পান, তাদের আয়ু দ্বিগুণ হয়েছে। কিন্তু এটা সম্ভব হয় যদি ইঁদুরের শৈশব অবস্থা থেকে পরীক্ষাটি শুরু করা হয়। পূর্ণবয়স্ক ইঁদুরের খাদ্য আকস্মিক কমিয়ে দিলে তাতে বরং দেহের বিপাকক্রিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং আয়ু কমে যায়। সাম্প্রতিককালে গবেষকরা দেখেছেন, এ সমস্যার সমাধান হল খাদ্য গ্রহণ আকস্মিক না কমিয়ে ধীরে ধীরে কয়েক মাস ধরে কমানো। তাতে বিপাকক্রিয়ার ক্ষতি হয় না বরং তারুণ্য ও যৌবন দীর্ঘকাল বজায় থাকে।

ওয়ালফোর্ড বলছেন, এই একই নীতি মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না হওয়ার কোন কারণ নেই। তাঁর নিজের বয়স এখন ষাট বছর। তিনি মিষ্টি, সাদা চিনি এবং লবণ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। গড়পড়তা তিনি দৈনিক 210 ক্যালরির খাবার খান, সপ্তাহে পর পর দু'দিন উপোস দেন। তাঁর বিশ্বাস এর বদলে তিনি পাচ্ছেন দৃষ্টি ও শ্রবণের তীব্রতা, মনের সজীবতা, ত্বকের ঔজ্জ্বল্য—এক কথায় দীর্ঘ যৌবন।

ওয়ালফোর্ড আর তাঁর সহকর্মীরা দেহের প্রয়োজনীয় সব রকম ভিটামিন আর খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায় এমন ধরনের খাদ্যতালিকা তৈরি করেছেন। দীর্ঘ জীবনের ওপর গবেষণার জন্য একটি গবেষণাগারও তাঁরা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁদের ধারণা ভবিষ্যতে মানুষের পক্ষে দেড়-শ' বছর বাঁচা এমন কিছু কঠিন ব্যাপার হবে না। আর সব মানুষই এমনি দেড়-শ' বছর পর্যন্ত বাঁচতে চাইবে, যদি সে বাঁচা হয় অথর্ব বার্ধক্য নিয়ে বাঁচা নয়, সজীব তারুণ্য নিয়ে বাঁচা।

বলা বাহুল্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো বাংলাদেশে স্বল্প পুষ্টি গ্রহণ কোন সমস্যাই নয়—এদেশের বেশির ভাগ মানুষই বেঁচে আছে স্বল্প পুষ্টি গ্রহণ করে। কিন্তু ওই যে বিজ্ঞানীরা বলছেন সুষম খাদ্য—অর্থাৎ খাদ্যে থাকা চাই প্রয়োজনীয় সব ভিটামিন আর খনিজ পদার্থ—তার ব্যবস্থা করা গেলে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের সব মানুষের দেড়-শ' বছর বাঁচা হয়তো খুব দুঃসাধ্য হবে না।

[আজকের বিজ্ঞান, বর্ষ-1, সংখ্যা-1,
ঢাকা-5, বাংলাদেশ]

কিশোর বিজ্ঞানীর আসর
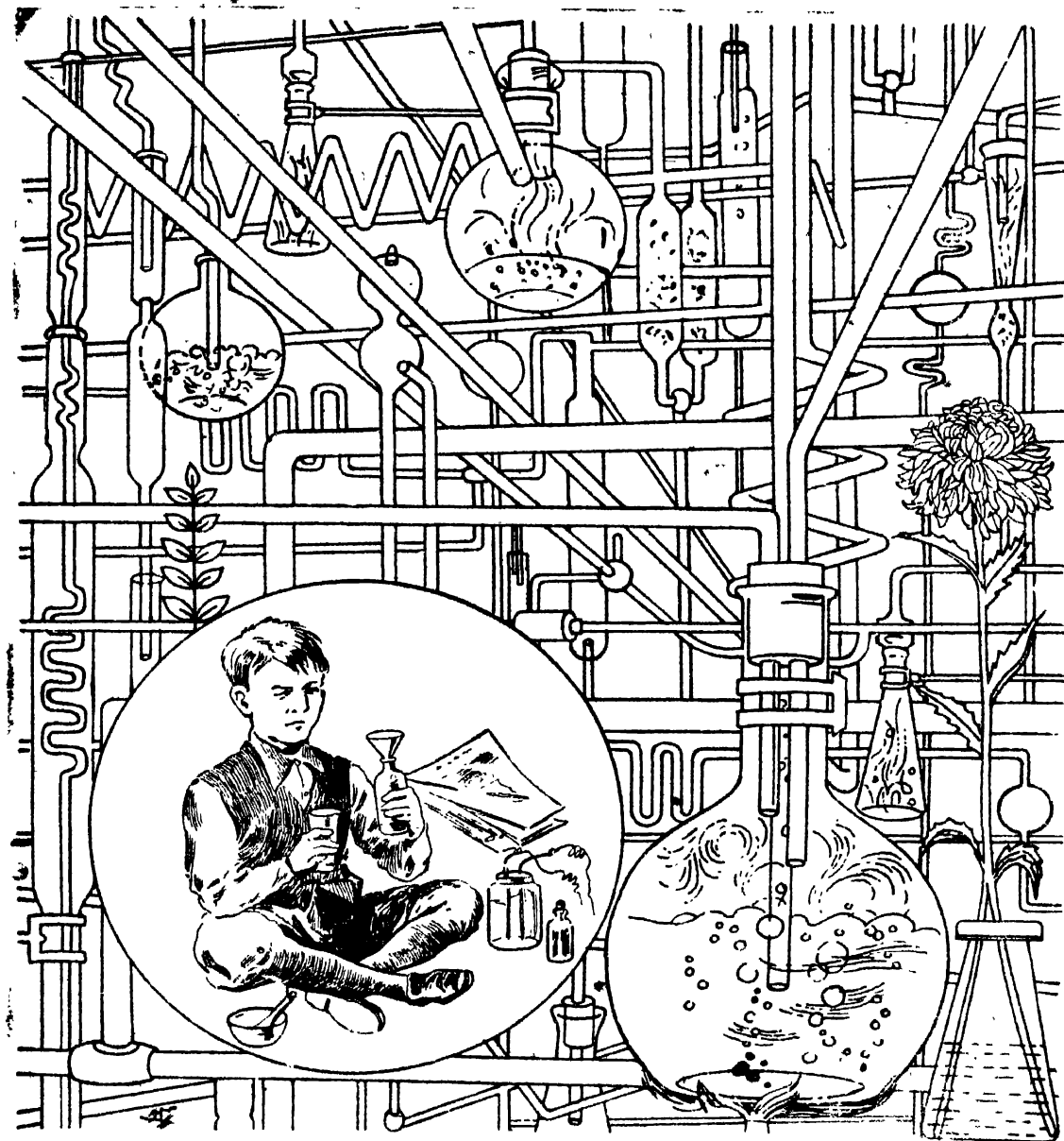
বাতাসের উপাদান ও গুরুত্ব

আব্দুল হক খন্দকার*

যে বস্তুটির অভাবে আমরা সবচেয়ে কম সময় বাঁচি তা বাতাস। একটি প্রবাদে বলা হয়েছে যে,—খাদ্য অভাবে তিন সপ্তাহ, জল অভাবে তিন দিন, কিন্তু বাতাস অভাবে আমরা তিন মিনিটেরও বেশী বাঁচি না। কথাগুলি একেবারে কাঁটায় কাঁটায় সত্য না হলেও বাতাস ব্যতীত আমরা যে বেশীক্ষণ বেঁচে থাকতে পারি না—আমাদের জীবনধারণের জন্য বাতাস যে অত্যাবশ্যক—তা প্রবাদবাক্যের কথাগুলিতে সুস্পষ্ট। বস্তুতঃ বাতাস না হলে আমরা পাঁচ মিনিটের বেশী বাঁচি না। কেবল আমরা কেন,—বাতাস না থাকলে পৃথিবীর স্থলভাগে কোন জীব বেঁচে থাকতে পারে না,—কোন গাছপালাও জন্মাতো না। শস্যশ্যামল এই পৃথিবীর সবটাই শূন্য খাঁ খাঁ করতো সাহারা মরুভূমির মতো। অথচ বিস্ময়ের ব্যাপার—জীবনধারণের জন্য যে বাতাস না হলে আমাদের মোটেই চলে না—সেই বাতাসকে আমরা অনেক সময় বেমালুম ভুলে থাকি। বাতাস অদৃশ্য—তাই তার অস্তিত্ব সম্পর্কে আমরা তেমন সচেতন নই—তবে অবস্থা বিশেষে এই বাতাস সম্পর্কে আমরা আবার অত্যন্ত সচেতন হয়ে উঠি। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরমে আমরা অতিষ্ঠ হই—একটু শীতল বাতাসের জন্য ব্যাকুল হই,—ঝড়ের তাণ্ডবলীলায় আমরা শঙ্কিত হয়ে পড়ি।

শুধু যে অদৃশ্য হওয়ার কারণে বাতাসের কথা আমরা অনেক সময় ভুলে থাকি—তা নয়—অন্য কারণও আছে। জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য সামগ্রী—যেমন খাদ্য, জল প্রভৃতি সংগ্রহ করতে কিছু না কিছু হাঙ্গামা পোহাতে হয় আমাদের—সময়ও কিছুটা ব্যয় করতে হয় সেজন্য—কিন্তু বাতাসের জন্য তেমন কোন হাঙ্গামা করা বা ভাবনার প্রয়োজন পড়ে না আমাদের—আলাদা ভাবে সময়ও দিতে হয় না। এক বিপুল বায়ুসমুদ্রে যেমন আমরা ডুবে আছি—কাজেই বাতাসের কথা অনেক সময়ই আমাদের ভাবনার মধ্যে আসে না। কিন্তু বাতাসের কথা আমরা ভাবি আর নাই ভাবি, বিশাল বায়ুসমুদ্রের মধ্যে আমরা বাস করছি—সেই অদৃশ্য সমুদ্রের মধ্যেই আমাদের—তথা সকল জীবের, জন্ম, জীবনধারণ এবং জীবনের শেষ পরিণতি।

যা হোক, বাতাস আছে বলেই পৃথিবীতে যেমন জীবনের বিকাশ ও বিস্তার ঘটেছে—তেমনি আরও অনেক কিছু নির্ভর করছে বাতাসের ওপর। বাতাস না থাকলে আকাশ বলে আদপে কিছু থাকতো না। নীল আকাশের বদলে ওপরের দিকটা দেখাতো ঘন কালো—আর সেই ঘন অন্ধকারের বুকে দিনের বেলাতেই জ্বল জ্বল করে জ্বলতো সূর্য ছাড়াও সুদূরের অন্যান্য জ্যোতিষ্ক। বাতাস না থাকলে আমরা যেমন কথা বলতে পারতাম না—তেমনি কারো কথা বা কোন শব্দও শুনতে পেতাম না। কেননা, বাতাসই হলো শব্দের বাহন। বাতাসের কারণেই আবার আমাদের চোখে পড়ে অনেক মনোরম দৃশ্য। শরতের সুনীল আকাশ, সকাল সন্ধ্যার মেঘমালার বর্ণবৈচিত্র্য—সমুদ্র সৈকতের শুভ্র ফেনারাশি, মেরু-প্রদেশের মেরুজ্যোতিঃ—সাতরঙা রামধনু—এমনি আরো অনেক কিছু আমরা দেখতে পেতাম না—যদি বাতাস কিংবা বাতাসে অবস্থিত কোন ধূলিকণা বা জলকণা না থাকতো। বাতাস এবং বাতাসে এ সকল কণা থাকার কারণেই—মেঘ জমে আকাশের বুকে—দেখা যায় চলচপলার নৃত্য—কানে আসে গুরু গুরু মেঘের গর্জন—অঝোর ধারায় ঝরে শ্রাবণের ধারা—আর তারই ফলে—"ধন, ধান্যে পুষ্পে ভরা / আমাদের এই বসুন্ধরা।"

যা হোক, আমরা যে বায়ু-সমুদ্রের তলদেশে বাস করছি—সেটি যে কতটা গভীর সঠিক ভাবে তা বলা যায় না। কোথায় যে বায়ুবিহীন মহাশূন্যের শুরু ঠিক বলা না গেলেও অন্ততঃ দু-হাজার মাইল ওপরেও বাতাস আছে বলে জানা যায়। তবে পৃথিবীর যতই ওপরে ওঠা যায় বাতাসের ঘনত্ব ততই কমতে থাকে—আর এই কমতির পরিমাণ ওপরের দিকে এত দ্রুত ঘটে যে,—বায়ুমণ্ডলের অর্ধেকেরও বেশীর ভাগ বাতাস ভূপৃষ্ঠ থেকে মাত্র 4 মাইলের মধ্যেই থাকতে দেখা যায়। 10 হাজার ফুট উঁচুতে বাতাস এতটাই হালকা বা পাতলা যে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। বেলুন বা উড়োজাহাজে খুব উঁচুতে উঠলে সেখানে বাতাস পাতলা বলে—দেহের বাইরের বাতাসের চাপ কম হয়—ফলে কান দিয়ে রক্ত ঝরতে থাকে—এমনকি মাথায় অতিরিক্ত রক্ত চলে আসার জন্য—মানুষ অজ্ঞান হয়ে যায়। দেখা গেছে, 40 হাজার ফুট উঁচুতে বাতাসের পরিমাণ এতই কম যে,—অল্পক্ষণের মধ্যেই মানুষ অজ্ঞান হয়ে মারা যায়।

বাতাস কোন মৌলিক বা যৌগিক পদার্থ নয়—কতকগুলি গ্যাসীয় পদার্থের সংমিশ্রণ মাত্র। এ সকল গ্যাসীয় পদার্থের কোন বর্ণ নেই বলে বাতাসও বর্ণহীন,—অদৃশ্য। কিন্তু অদৃশ্য হলেও বাতাসের ওজন আছে,—কেননা, পদার্থমাত্রেরই ওজন থাকে—তা সে পদার্থ কঠিন, তরল, গ্যাসীয় যাই হোক না কেন। এক ঘনফুট বাতাসের ওজন 1·3 আউন্স। পৃথিবীর ওপরে যে পরিমাণ বাতাস আছে তার ওজন 58 কোটি টনেরও বেশী। ভূপৃষ্ঠের প্রতি বর্গইঞ্চিতে তাই বাতাসের চাপের পরিমাণ হলো 14·7 পাউণ্ড। বাতাসের এই প্রচণ্ড চাপ থেকে আমরাও রক্ষা পাই না। একজন মাঝারী ধরনের লোকের ওপর সবসময় বাতাসের চাপ পড়ছে 370 মণের মতো। দেহের ওপর এই পরিমাণ চাপ পড়ায় ফলে আমাদের তো একেবারে দুমড়ে চ্যাপ্টা হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু তা

* 370 আউটার সারকুলার রোড, রাজারবাগ, ঢাকা-17, বাংলাদেশ

আমরা হই না—বরঞ্চ এই প্রচণ্ড চাপ আমরা অনায়াসে বহন করে চলেছি—কখনও অনুভব পর্যন্ত করতে পারি না। কিন্তু কেন? কারণ হলো—আমাদের দেহের চারধারে যেমন বাতাস রয়েছে—তেমনি দেহের ভেতরেও রয়েছে এই বাতাস—তাই ভেতরের বাতাস বাইরের বাতাসের চাপ সর্বদাই প্রতিহত করছে—ফলে আমাদের বোধগম্যে আসছে না বায়ুমণ্ডলের অমন প্রচণ্ড চাপের ব্যাপারটি।

বাতাস যে কয়েকটি গ্যাসীয় পদার্থের সংমিশ্রণ একটু আগেই তা বলেছি। এই সব গ্যাসীয় পদার্থের মধ্যে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের পরিমাণই বেশী। এই দুটি গ্যাসের সঙ্গে অল্প পরিমাণে থাকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড, জলীয় বাষ্প, নিষ্ক্রিয় বা বিরল গ্যাস এবং অল্প পরিমাণে নাইট্রিক অ্যাসিড বাষ্প, ওজোন, হাইড্রোজেন এবং প্রচুর পরিমাণে ধূলিকণা। বাতাস একটি মিশ্রণ (Mixture) বলে এর উপাদানগুলির অনুপাত সর্বত্র এবং সর্বদা নির্দিষ্ট থাকে না—তবু আয়তন হিসেবে বিশেষ উপাদানগুলির একটা মোটামুটি অনুপাত দেওয়া হলো নীচের তালিকায়:

নাইট্রোজেন	77·16 ভাগ
অক্সিজেন	20·60 ,,
জলীয় বাষ্প	1·40 ,,
বিরল গ্যাস	0·80 ,,
কার্বন ডাই-অক্সাইড	0·04 ,,
মোট	100·00 ভাগ

নাইট্রোজেন অনেকটা নিষ্ক্রিয় জাতের গ্যাস—কিন্তু অক্সিজেন সে তুলনায় অনেক বেশী সক্রিয়, অর্থাৎ অক্সিজেন অন্যান্য পদার্থের সঙ্গে সহজেই সংযুক্ত হতে পারে। সকল প্রকার দহন প্রক্রিয়ার সঙ্গে অক্সিজেন জড়িত। বাতাসে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বেশী এবং তা অনেকটা নিষ্ক্রিয় হওয়ায় অক্সিজেনের সক্রিয়তা ততটা প্রকাশিত হতে পারে না। বাতাসে নাইট্রোজেন না থাকলে অক্সিজেনের দৌরাত্ম্য যে কতটা বেড়ে যেতো—কত দিকে কত যে অঘটন ঘটতো তা বলার নয়। দাহ্যবস্তু সহজেই জ্বলে উঠতো। ক্ষণে ক্ষণেই এদিকে-ওদিকে আগুন জ্বলে উঠতো এবং মুহূর্তেই তা দাবানলে পরিণত হতো। চুলোতে কয়লা কেবল দাউ দাউ করে জ্বলতো না—জ্বলে পুড়ে ছাই হতো চুলোর ঐ লোহার শিকগুলি পর্যন্ত! কিন্তু সব চেয়ে যা মারাত্মক হতো আমাদের পক্ষে তা হলো—আমাদের দৈহিক দহন প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন হতো—ফলে বেড়ে যেত আমাদের দেহের তাপ, তাতে শারীরকলার ক্ষয় হতো এত বেশী যে, পরমায়ু যেত কমে!

নাইট্রোজেন অনেকটা নিষ্ক্রিয় জাতের গ্যাস হলেও অধিক তাপমাত্রায় অক্সিজেনের সঙ্গে তার সংযোগ ঘটে। আর এজন্য এক বিরাট ব্যাপারে সাধিত হচ্ছে প্রকৃতিতে—যার ফলটাও আমাদের জীবনের সঙ্গে বিশেষ ভাবে জড়িত। বর্ষাকালে—আকাশের বুকে যখন ক্ষণে ক্ষণেই বিজলি চমকাতে থাকে তখন বেশ উচ্চ তাপের সৃষ্টি হয়,—ফলে বাতাসের নাইট্রোজেনের সঙ্গে অক্সিজেনের সংযোগ ঘটে—সৃষ্টি হয় নাইট্রিক অক্সাইড নামে একটি গ্যাস। এই গ্যাস আবার অক্সিজেনের সঙ্গে মিলিত হয়ে উৎপন্ন করে নাইট্রোজেন পারঅক্সাইড নামে আর একটি গ্যাস। নাইট্রোজেন পারঅক্সাইড জলে দ্রবণীয়, তাই বৃষ্টির জলে এটি দ্রবীভূত হয়ে পরিশেষে তৈরি করে নাইট্রিক অ্যাসিড।

বৃষ্টির জলে তাই থাকে কিছু পরিমাণ নাইট্রিক অ্যাসিড। এই নাইট্রিক অ্যাসিড বৃষ্টি জলের সঙ্গে যখন মাটিতে জমে তখন মাটির কোন কোন উপাদানের সঙ্গে তার বিক্রিয়া ঘটে—ফলে মাটিতে তৈরি হয় কয়েক ধরনের নাইট্রেট নামক জমির সার।

তবেই দেখ, বাতাসের বুকে রয়েছে যে বিপুল পরিমাণ নাইট্রোজেন—যা সরাসরি কাজে লাগছে না—কিন্তু এক প্রক্রিয়ায় নিয়মিত ভাবে পরিণত হচ্ছে এমন সব উপাদানে—যা আমাদের মাটিকে করে তুলেছে উর্বর। আর জমির এই উর্বরতার অর্থ হলো অধিক ফসল উৎপাদন—যে ফসলের ওপর নির্ভর করছে আমাদের জীবনধারণ। কাজেই বাতাসে নাইট্রোজেনের উপস্থিতি, এক বিরাট উপস্থিতি এক বিরাট উপকার সাধন করে চলেছে মানুষের এবং অন্যান্য প্রাণীর। কেননা, মাটিতে যে ফসল ফলছে, গাছপালা জন্মাচ্ছে তাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে যুগিয়ে চলেছে আমাদের এবং অন্যান্য প্রাণীর আহার।

তবেই দেখ:—নাইট্রোজেন যদিও অনেকটা নিষ্ক্রিয় জাতের গ্যাস তবু তার উপস্থিতি বাতাসে অক্সিজেনের দৌরাত্ম্যকে দমিয়ে রাখার জন্য এবং সকল প্রাণীর খাদ্য সংস্থানের জন্য যেমন প্রয়োজন,—তেমনি বাতাসে বিপুল পরিমাণ নাইট্রোজেন আছে বলেই বাঁচোয়া—নইলে পৃথিবীর এত কোটি কোটি প্রাণীর খাদ্য আসতো কোন্ ভাণ্ডার থেকে?

যা হোক, বাতাসে কেন যে বিপুল পরিমাণ নাইট্রোজেন রয়েছে—আর এই বিপুল পরিমাণ নাইট্রোজেন যে এক বিরাট ভূমিকা পালন করছে আমাদের জীবনে—তা তোমরা এখন বেশ বুঝতে পারছো। পরিমাণের দিক থেকে এর পরেই আসে অক্সিজেনের কথা। অক্সিজেনের সঙ্গে আমাদের জীবন যে কতটা অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত—সেকথা তোমাদের অজানা নয়—অক্সিজেন—তথা বাতাস না হলে আমরা পাঁচ মিনিটের বেশী বাঁচি না। কিন্তু বাতাসের মধ্যে ঐ যে সামান্য পরিমাণ (0·04%) কার্বন-ডাই-অক্সাইড রয়েছে—সেও যে এক বিরাট ভূমিকা পালন করছে,—সমস্ত প্রাণী জগতের জীবনধারণ যে নির্ভর করছে ঐ সামান্য পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইডের ওপর সেকথা কি তোমরা জান?

যদিবা না জান, তবে একথা তোমরা সকলেই জান যে,

গাছপালা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে যুগিয়ে চলেছে সকল প্রাণীর খাদ্য। যারা তৃণভোজী তাদের জীবন প্রত্যক্ষ ভাবে নির্ভর করছে, যেমন গাছপালার ওপর তেমনি যারা মাংসাসী তারা এই তৃণভোজীদেরকেই ভক্ষণ করে বেঁচে থাকছে। অর্থাৎ আসলে এদের জীবনও গাছপালার ওপরই নির্ভরশীল। এখন এই গাছপালা—যার ওপর নির্ভর করছে সকল প্রাণীর খাবার—সেই গাছপালার খাবার যুগিয়ে আসছে কারা? বাতাসের নাইট্রোজেন যে একটি একথা তোমরা একটু আগেই জেনেছো। কিন্তু বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ কম হলেও (0·04%) এ ব্যাপারে তারও রয়েছে এক বিশিষ্ট ভূমিকা। গাছপালা সূর্যের আলো, জল, কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং তার দেহে, বিশেষ করে তার পাতায় যে ক্লোরোফিল (chlorophyll) থাকে তাদের সাহায্যে প্রথমে তৈরি করছে নিজেদের খাদ্য, কার্বোহাইড্রেট (carbohydrate), প্রাণীরা পরে তা সংগ্রহ করে। এটিও একটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া—যাকে বলে সালোকসংশ্লেষণ বা Photosynthesis। এই প্রক্রিয়ায় কেবল যে খাদ্যেই তৈরি হয় তা নয়। বাতাসে নানা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে কার্বন ডাই-অক্সাইড তৈরি হয়—তা থেকে অক্সিজেনকেও মুক্ত করে দেয়। অক্সিজেন যদি এমনি ভাবে বিমুক্ত না হতো তবে এ সকল প্রক্রিয়ার সূত্রে বাতাসের সবটুকু অক্সিজেন কার্বন ডাই-অক্সাইডের মধ্যে বন্দী হয়ে একদিন নিঃশেষিত হয়ে যেত—ফলে কোন প্রাণী (দু-এক জাতের জীবাণু ছাড়া) আর বেঁচে থাকতে পারতো না।

গাছপালা তাই সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ অনেকটা ঠিক রাখছে। গাছপালা আরো একটা উপকার করছে আমাদের। বাতাসের নাইট্রোজেন থেকে জমিতে যে সার জমছে—সেই সার এবং তার দেহের অন্যান্য উপাদান থেকে গাছপালা তৈরি করছে আমিষ বা প্রোটিন (Protein)—যে প্রোটিন প্রাণীর জীবনধারণ, তার দৈহিক বৃদ্ধি ও ক্ষয় পূরণের জন্য একান্ত প্রয়োজন।

কাজেই বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ ঠিক রাখার জন্য গাছপালার যেমন প্রয়োজন—তেমনি প্রয়োজন সকল প্রাণীর খাদ্য সংস্থানের জন্য। বেশী বেশী গাছপালা ধ্বংস করলে তাই বিপদ দাঁড়াবে আমাদের দু-দিক থেকে। একদিকে ঘটবে খাদ্যাভাব—অন্যদিকে বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ ক্রমাগত কমে গিয়ে বৃদ্ধি পাবে কার্বন-ডাই-অক্সাইড—ফলে শ্বাসকষ্টে সকল প্রাণীর ঘটবে অপমৃত্যু।

বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের বৃদ্ধি আরো একদিক থেকে বিপজ্জনক। আবহাওয়া অনেক কিছুর ওপর নির্ভরশীল হলেও,—জানা গেছে বাতাসে যদি কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তবে আবহাওয়া হয় উষ্ণ এবং শুষ্ক। কাজেই বাতাসে অক্সিজেনের মত পরিমিত পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইডও থাকা প্রয়োজন।

বাতাসের অন্যান্য উপাদান,—যেমন হিলিয়াম, আরগন, নিয়ন, ক্রিপটন প্রভৃতি—বিরল ও নিষ্ক্রিয় জাতের গ্যাসের উপস্থিতি যে কেন—সে সম্পর্কে নিশ্চিত ভাবে তেমন কিছু জানা না গেলেও বাতাস থেকে এগুলিকে উদ্ধার করে নানা কাজে ব্যবহার করা হয়। যেমন, হিলিয়াম হাইড্রোজেনের মত দাহ্য নয় বলে বেলুনে হাইড্রোজেনের বদলে ব্যবহৃত হয়। হিলিয়ামের সাহায্য নিয়েই আধুনিক যুগের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ধাতু ম্যাগনেসিয়াম তৈরি হয়। ব্যবসায়ীরা তাঁদের দোকান ও পণ্য দ্রব্য প্রচারের জন্য যে সকল সুন্দর সুন্দর রঙীন আলোর নল ব্যবহার করেন—সেগুলিতে রয়েছে হিলিয়াম, আরগন, নিয়ন প্রভৃতি বিরল গ্যাসের ব্যবহার।

শিল্প ক্ষেত্রে বাতাসকে তরল করে এ সকল বিরল গ্যাস যেমন তৈরি করা হয়—তেমনি প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন তৈরি করার জন্য—বাতাসকে তরল করা প্রয়োজন। যান্ত্রিক কৌশলের সাহায্যে অতি সহজে তরল বাতাস তৈরি করা যায় এবং তা বেশ সস্তা। আরো মজার ব্যাপার হলো—বাতাসকে তরল করলে তার প্রকৃতি বা আচরণ হয়ে দাঁড়ায় বড়ই অদ্ভুত আর বিচিত্র। মাছ, মাংস, ফল, ফুলকে যদি তরল বাতাসে কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রাখা যায়, তবে সেগুলি পাথরের মত এমনই শক্ত হবে যে হাতুড়ির ঘা ছাড়া সেগুলিকে ভাঙা বা গুঁড়ো করা যাবে না। যে বাতাসকে তুমি স্বচ্ছন্দে টেনে নিচ্ছো নাক দিয়ে—তাই যদি তরল হয় তবে তুমি আর নাক গলাতে পারবে না তার মধ্যে—ছোঁয়ামাত্র অনুভব করবে এক তীব্র দংশন তোমার নাকের ডগায়—আর মুহূর্তেই তা পরিণত হবে কঠিন পাথরে। তখন? তখন তোমার নাকটিকে দিব্যি উড়িয়ে বা গুঁড়িয়ে দেওয়া যাবে এক ঘুষির চোটে।

এমনি আরো বেশ মজার মজার ব্যাপার ঘটে তরল বাতাসের সংস্পর্শে অনেক জিনিসের—যাদের কথা আজ নয়—আর একদিন শোনাবো বলে—এবারের মতো বাতাসের বিচিত্র কথায় এখানেই ইতি করছি।

মডেল তৈরি

0·24 ভোল্ট-এর পরিবর্তনযোগ্য স্থির মানের ব্যাটারি এলিমিনেটার

সুধীর রায়*

আজকাল সাধারণতঃ বাজারে যে সব ব্যাটারি এলিমিনেটার বিক্রি হয়, সেগুলির সার্কিট বা ট্রান্সফমার-এর রেগুলেসন (regulation) সব ভাল নয়, যার ফলে লাইন ভোল্টেজ প্রতিনিয়তই ওঠা-নামা করতে থাকলে এলিমিনেটার-এর আউট পুট ভোল্টেজও সেই একই হারে ওঠা-নামা (fluctuation)
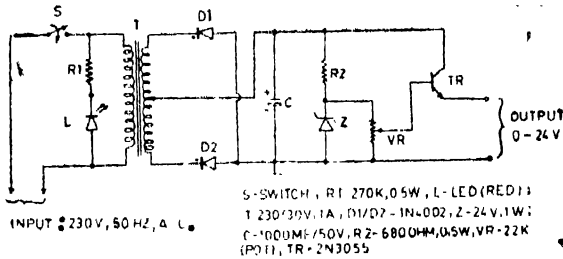
চিত্রে সব কয়টি প্রতীক, নাম ও মান দেওয়া হলো। সাধারণতঃ এই ধরণের সার্কিটকে যে কোন ভেরো বোর্ডের উপর করলেই চলবে। এই সার্কিটের জন্য কোনরকম তৈরী বোর্ড পাওয়া যায় না। ট্রান্সফর্মার-এর সেকেণ্ডারি ভোল্টেজ যথাক্রমে 15-0-15v অর্থাৎ ট্রান্সফর্মারটি সেণ্টার ট্যাপ (centre tap) হওয়া চাই। ব্যবহৃত সব উপাদানই কলকাতার বাজারে পাওয়া যায় এবং এই সার্কিট-এর আনুমানিক ব্যয় প্রায় 45 টাকা।

করতে থাকে। সেজন্য আমাদের ট্রানজিস্টর রেডিও থেকে স্পষ্ট ও জোরালো আওয়াজ পাই না।

*সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, সল্ট লেক, কলিকাতা-700 064

একটি স্থির মানের এলিমিনেটার (stabilised eliminator) এর সার্কিট বা বর্তনী দেখানো হলো। (চিত্র)। এই সার্কিট-এর সুবিধা এই যে, আমাদের প্রয়োজন মতো আউটপুট ভোল্টেজকে কম বা বেশি করতে পারি, যদিও লাইন ভোল্টেজ ওঠা-নামা (Fluctnation) করলে স্থির আউটপুট (stabilised output) পেয়ে যাব। চিত্রে প্রদর্শিত VR পোটেনসিওমিটার-এর সাহায্যে আউটপুট ভোল্টেজকে প্রয়োজনমত কম বা বেশি করতে পারি। তাছাড়া এই সার্কিট থেকে আমরা 1500 mA অর্থাৎ 1·5A তড়িৎ প্রবাহ পেতে পারি। তবে অবশ্যই পাওয়ার ট্রানজিস্টরটিকে একটি মোটা অ্যালুমিনিয়ামের প্লেটে (heat sink) বসাতে হবে। এই সার্কিট থেকে যে ভোল্টেজ পাওয়া যাবে, তা শতকরা 2 ভাগ (percentage of regulation) কম বা বেশি হতে পারে। এই সার্কিট-এর বিভিন্ন ব্যবহারিক প্রয়োগের ক্ষেত্র ট্রানস্টির রেডিও, অ্যামপ্লিফায়ার, পকেট বা ডেস্ক ক্যালকুলেটার, টেপ রেকর্ডার ইত্যাদিতে।

বেশী ক্যালসিয়াম—বেশী ডিম

হোয়াইট লেগহর্ন জাতের মুরগীকে খাদ্যে 3·5% ক্যালসিয়াম দেবার পর ক্যালসিয়ামের পরিমাণ আরো বাড়িয়ে অনেক বেশী সংখ্যায় ডিম দিতে দেখা গেছে—অন্য মুরগী, যাদের ক্যালসিয়াম বাড়ানো হয় নি তাদের থেকে। এই পরীক্ষাটি করা হয় নেরাক্কাতে। এই পরীক্ষায় আরো জানা গেছে যে ক্যালসিয়ামের পরিমাণের ওপর মুরগী দ্বারা খাদ্য গ্রহণ পরিমাণে কোন তারতম্য হয় না। কিন্তু খাদ্যে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ আরো বাড়ালে ক্যালসিয়াম গ্রহণের পরিমাণ কমে আসে। এর ফলে ডিমের খোসার কাঠিন্য বা ডিমের ওজনের কোন তারতম্য হয় না।

[ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ]

পরিষদ সংবাদ

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর তিরোধান দিবস

পরিষদের "সত্যেন্দ্র ভবনে" 4ঠা ফেব্রুয়ারী '85 আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর তিরোধান দিবস উদযাপিত হয়। পরিষদের কর্মসচিব ডঃ সুকুমার গুপ্ত আচার্য বসুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন।

পরিবেশ দূষণ সম্বন্ধে আলোচনা সভা

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ এবং গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির (উত্তর কলিকাতা শাখা) যৌথ উদ্যোগে 16ই ফেব্রুয়ারী '85 পরিষদের 'সত্যেন্দ্র ভবনে' "পরিবেশ দূষণ" শীর্ষক আলোচনা সভা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিষদ সভাপতি ডঃ জয়ন্ত বসু। সভার প্রধান বক্তা ছিলেন ডঃ মণীন্দ্র নারায়ণ মজুমদার। এছাড়া আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন বিজ্ঞান পরিষদের কর্মসচিব ডঃ সুকুমার গুপ্ত, শ্রী নির্মল ঘোষ।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদে পিয়ারলেসের দান

জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রসারকল্পে দি পিয়ারলেস জেনারেল ফাইনান্স অ্যাণ্ড ইনভেস্ট মেণ্ট কোং লিঃ বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদে পাঁচ হাজার টাকা দান করেছেন।

বিজ্ঞান পরিষদের যোগব্যায়াম কেন্দ্রের ছাত্রীর কৃতিত্ব

17 থেকে 20 জানুয়ারী '85 বার্নপুরের ভারতী ভবনে অনুষ্ঠিত 9ম জাতীয় যোগব্যায়াম চ্যাম্পিয়নশিপে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের যোগব্যায়াম কেন্দ্রের ছাত্রী বর্ণালী ঘোষ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য 1984 খৃস্টাব্দে অনুষ্ঠিত ব্যায়ামাচার্য বিষ্ণুচরণ ঘোষ মেমোরিয়াল নিখিল ভারত যোগব্যায়াম প্রতিযোগিতাতে সে তৃতীয় গ্রুপে প্রথম স্থান অধিকার করে।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের 37তম প্রতিষ্ঠা-বার্ষিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি পশ্চিমবঙ্গের পরিবেশ মন্ত্রী শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায় ভাষণ দিচ্ছেন। তাঁর ডান দিকে অনুষ্ঠানের উদ্বোধক পশ্চিমবঙ্গের ভূমি ও ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী শ্রীবিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী এবং বাঁ দিকে পরিষদের সভাপতি ডঃ জয়ন্ত বসু, ডঃ জগৎজীবন ঘোষ এবং পরিষদের কর্মসচিব ডঃ সুকুমার গুপ্তকে দেখা যাচ্ছে।

ফটো—রামকিংকর চক্রবর্তী

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-700 006

1983-84 খৃস্টাব্দের বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনের কার্যবিবরণী

ফোন-55-0660

স্থান : 'সত্যেন্দ্র ভবন' তারিখ : 23শে ফেব্রুয়ারী' 1985

পি-23, রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-700006 শনিবার, বিকাল 5টা

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের কর্মসচিব শ্রীসুকুমার গুপ্ত কর্তৃক প্রচারিত 3. 1. 85 তারিখের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে 23শে ফেব্রুয়ারী, 1985 শনিবার পরিষদের সত্যেন্দ্র ভবনের সভাকক্ষে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের 1983-84 খৃস্টাব্দের বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সভাপতি শ্রীজয়ন্ত বসু এবং সভার কার্য পরিচালনায় সহায়তা করেন কর্মসচিব শ্রীসুকুমার গুপ্ত। অধিবেশনের কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করার ভার পরিষদের সদস্য শ্রীসত্যরঞ্জন পাত্রের উপর দেওয়া হয়।

1. বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী কর্মসচিব শ্রীসুকুমার গুপ্ত 1লা জানুয়ারী 1983 থেকে 31শে মার্চ '84 পর্যন্ত সময়কালে পরিষদের কার্যবিবরণীর মুদ্রিত কপি সভায় উপস্থিত সভ্যদের মধ্যে বিতরণ করেন এবং সভাপতির নির্দেশে অধিবেশনের 1 নং কর্মসূচী হিসাবে তিনি তা পাঠ করেন। কর্মসচিবের প্রদত্ত কার্যবিবরণীর উপর আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন সর্বশ্রী গুণধর বর্মণ, রতনমোহন খাঁ, যুগলকান্তি রায়, সুনীলভূষণ গুহ, মিহিরকুমার ভট্টাচার্য, অনিলবরণ দাস ও সুকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ সদস্যগণ। পরিষদের বিভিন্ন কাজকর্মের প্রশংসা করা হয়। পত্রিকা প্রকাশনে উপযুক্ত লেখা পাওয়া, লেখক দক্ষিণার প্রচলন এবং যথাসময়ে পত্রিকা প্রকাশ করার ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা হয়। পরিষদের আর্থিক সঙ্কটের জন্য এগুলি সুষ্ঠভাবে সম্ভব হচ্ছে না। কার্যকরী সমিতির সদস্যগণসহ পরিষদের সমস্ত সভ্য-সভ্যা এবং শুভানুধ্যায়ীগণও যাতে আর্থিক সঙ্কট মোচনে সক্রিয়ভাবে আন্তরিক চেষ্টা করেন, সেজন্য আবেদন রাখা হয়। শ্রীদিবাকর মুখোপাধ্যায় কর্মসচিবের কার্যবিবরণী—সমর্থন ও অনুমোদন করার আবেদন জানালে তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

2. 2 নং কর্মসূচী অনুযায়ী কোষাধ্যক্ষ শ্রীশিবচন্দ্র ঘোষ পরিষদের 1983-84 খৃস্টাব্দের আয়-ব্যয়ের পরীক্ষিত হিসাব বিবরণী সভায় পেশ করেন। এই বিবরণী মুদ্রিতকারে সকল সভ্যের কাছে সেপ্টেম্বর '84 সংখ্যার জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার মাধ্যমে পূর্বেই পাঠান হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে শ্রীসুনীলভূষণ গুহ বলেন মুদ্রিত আয়-ব্যয়ের হিসাবের সঙ্গে হিসাব-পরীক্ষকের মন্তব্যটিও ভবিষ্যতে যুক্ত করা দরকার। এই প্রস্তাবটি সভায় গৃহীত হয়। কোষাধ্যক্ষের পেশ করা আয়-ব্যয়ের হিসাব-পরীক্ষার বিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত ও গৃহীত হয়।

3. 3 নং কর্মসূচীতে কোষাধ্যক্ষের প্রস্তাবক্রমে আগামী 1984-85 খৃস্টাব্দের পরিষদের আয়-ব্যয়ের হিসাব-পরীক্ষক হিসাবে মেসার্স মুখার্জী গুহঠাকুরতা এণ্ড কোং সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হয়।

4. আগামী বছরের (1984-85) সম্ভাব্য আয়-ব্যয়ের বাজেট পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ। তা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত ও গৃহীত হয়।

5. পরিষদের বিধি ও নিয়মাবলী সংশোধনের জন্য কর্মসচিব শ্রীগুপ্ত কার্যকরী সমিতির প্রস্তাব হিসাবে গৃহীত নিম্নলিখিত সংশোধনী প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন। পরিষদের বিধি ও নিয়মাবলীর 9 (গ) ধারায় শেষ লাইন 'ভোট দানের অধিকার থাকিবে'-এর পর সংযোজন হবে 'কর্মচারীদের নির্বাচিত তাঁহাদের নিজেদের মধ্যে একজন কর্মচারী প্রতিনিধিকে কার্যকরী সমিতিতে কো-অপ্ট করা হইবে।" এর পর 11 (ঘ) ধারায় সংশোধন হবে—'প্রয়োজন হইলে অনধিক⋯নির্বাচন করিতে পারিবেন'—এই কথাগুলির পরিবর্তে লেখা হবে, 'কর্মচারীদের নির্বাচিত তাঁহাদের নিজেদের মধ্যে একজন প্রতিনিধিকে কার্যকরী সমিতিতে সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করা হইবে এবং প্রয়োজনে আরো দুইজন সভ্যকে কার্যকরী সমিতিতে কো-অপ্ট করা যাইবে।' সম্পূর্ণ সংশোধনী প্রস্তাবটি অনুমোদিত ও গৃহীত হয়।

6. বিবিধ প্রসঙ্গে পরিষদের ধারাবাহিক কাজ অক্ষুণ্ন রাখার জন্য শ্রীযুগলকান্তি রায় বলেন পরিষদের স্বাভাবিক কাজের অঙ্গ হিসাবে যে সব স্মৃতি-বক্তৃতা ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা আছে সেগুলিও যথাসময়ে পালিত হয় নি। এটা দুঃখজনক। এই ত্রুটিগুলি সত্বর সংশোধন করতে হবে।

কর্মসচিব মহাশয় শ্রীরায়ের ঐ প্রশ্ন ও ঘটনার যথাসম্ভব সদুত্তর দেন এবং ত্রুটিগুলির জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। ভবিষ্যতে এইরূপ ঘটনা যাতে আর না ঘটে তার জন্য সবাইকে আন্তরিক সচেষ্ট হতে আবেদন করেন।

7. এই অধিবেশনের কার্যবিবরণী অনুমোদনের জন্য সংবিধান অনুযায়ী নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে অনুমোদকমণ্ডলী গঠিত হয়।

নাম	স্বাক্ষর
(ক) শ্রীগুণধর বর্মণ	শ্রীগুণধর বর্মণ
(খ) শ্রীকালিদাস সমাজদার	কালিদাস সমাজদার
(গ) শ্রীনারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
(ঘ) শ্রীরতনমোহন খাঁ	রতনমোহন খাঁ
(ঙ) শ্রীশিবচন্দ্র ঘোষ	শিবচন্দ্র ঘোষ

8. সভাপতির ভাষণ ঃ—অধিবেশনের সভাপতি শ্রীজয়ন্ত বসু তাঁর নাতিদীর্ঘ ভাষণে উপস্থিত সবাইকে অভিনন্দন জানান। পরিষদের কাজকর্মে ও উন্নয়নে সকলের সক্রিয় সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করেন। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ একটি মহান আদর্শের সংগঠিত রূপ। কোন একক ব্যক্তির পক্ষে সেই আদর্শের বাস্তব রূপায়ণ সম্ভব নয়। মহান কর্মযজ্ঞে বহু কর্মীর মধ্যে এক একজনের ভুলত্রুটি অস্বাভাবিক নয়। তবে সবাই সচেষ্ট হলে সেগুলি সংযত করা এবং প্রতিরোধ করা সম্ভব। এ নিয়ে বক্তৃতা, উপদেশ ও সমালোচনা খুবই দরকার। কিন্তু সবার আগেই চাই প্রত্যেকেরই কিছু নির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কাজের ভার নেওয়া। নিঃস্বার্থভাবে কয়জন কতখানি সময় দিতে পারেন, সেটাতো স্বাভাবিক প্রশ্ন। এই সব কাজে নিজেদের ব্যক্তিগত ক্ষতি ও কষ্ট স্বীকার করতে হয়। সেইভাবে যতটুকু যাঁরা করছেন তাঁদের অভিনন্দন জানান দরকার। সবার আন্তরিক সাহায্য ও সক্রিয় চেষ্টায় ত্রুটিগুলির সংশোধন করতে হবে। তবেই পরিষদ সঠিক পদক্ষেপে আরও উন্নত হবে।

স্বাক্ষর—জয়ন্ত বসু
সভাপতি
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

স্বাক্ষর—সুকুমার গুপ্ত
কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

বিজ্ঞপ্তি

1956 খৃস্টাব্দের সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) রুলের 4 নং ফরম অনুযায়ী বিবৃতি ঃ

1. যে স্থান হইতে প্রকাশিত হয় তার ঠিকানা ঃ বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-700006
2. প্রকাশনার কাল মাসিক ঃ মাসিক
3. মুদ্রাকরের নাম, জাতি ও ঠিকানা ঃ শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য, ভারতীয়, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-700006
4. প্রকাশকের নাম, জাতি ও ঠিকানা ঃ শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য ভারতীয় পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-700006
5. সম্পাদকের নাম, জাতি ও ঠিকানা ঃ শ্রীগুণধর বর্মণ (সম্পাদনা সচিব) ভারতীয়, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-700006
6. স্বত্বাধিকারীর নাম, জাতি ও ঠিকানা ঃ বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ (বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান) পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-700006

আমি, শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য ঘোষণা করিতেছি যে উপরিউক্ত বিবরণ সমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

স্বাক্ষর—শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে
প্রকাশক "জ্ঞান ও বিজ্ঞান" মাসিক পত্রিকা

27.2.85

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-700 006 থেকে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেস, 37/7, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-700 009 হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

আবেদন

1948 সাল থেকে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা বিষয়ে পরিকল্পিত ধ্যান ধারণা পরিষদ পালন করে আসছে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার প্রকাশনের মাধ্যমে। ইতিমধ্যে পরিষদ কিছু অমূল্য রচনা বাংলাভাষায় প্রকাশ করেছে। বর্তমান পত্রিকা প্রকাশনা ছাড়াও পরিষদ বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে যাতে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান মানসিকতার বিকাশ ঘটে। গ্রাম বাংলার পল্লীতে, আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে ও শহরের বস্তিতে, যেখানে বেশীর ভাগ মানুষ জ্ঞানের আলো থেকে এখনও বঞ্চিত, তাদের কাছে বিজ্ঞানের মঙ্গলময় রূপ তুলে ধরতে পরিষদ বদ্ধপরিকর। এইসব বিজ্ঞানভিত্তিক কর্মসূচীর রূপায়নে অর্থের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। অথচ পরিষদের দারুণ অর্থাভাব। তাই পরিষদ সরকার, বেসরকারী সংস্থা, ব্যবসায়ী ও সহৃদয় ব্যক্তির কাছে অর্থসাহায্যের আন্তরিক আবেদন জানাচ্ছে। সাধারণ মানুষের জন্য তৈরী আচার্য বসুর পরিষদ যে কোনও সামান্য দানও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করে অবহেলিত মানুষের স্বার্থে ব্যয় করবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে পরিষদে প্রদত্ত সর্বপ্রকার দান আয়করমুক্ত।

কর্মসূচী

1. সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান মানসিকতা সৃষ্টি করা এবং বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন গড়ে তোলা।
2 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকাকে সাধারণের নিকট আরও আকর্ষনীয় করে তোলা।
3. পরিষদের মাধ্যমে গ্রামবাংলার বিজ্ঞান ক্লাবগুলির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা এবং তাদের বিজ্ঞান ভিত্তিক জনহিতকর কাছে উৎসাহিত করা।
4. প্রতি বছরে পশ্চিম বাংলায় অন্ততঃ একবার বিজ্ঞান সম্মেলনের ব্যবস্থা করা।
5. গ্রামবাংলার বিভিন্ন মেলায় বিজ্ঞান ক্লাবগুলিকে নিয়ে পোষ্টার প্রদর্শনী বিজ্ঞানভিত্তিক সিনেমা, আলোচনা-চক্র অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে বিজ্ঞান, জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করা।
6. বছরের শেষে বিজ্ঞান মেলার আয়োজন করা।
7. হাতে কলমে কারীগরী বিদ্যা শিখিয়ে ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রী ও নাগরিকদের স্বনির্ভরশীল করা। ব্যয়ভার বহনের জন্য সামান্য অর্থের বিনিময়ে টি. ভি. টেপরেকর্ডার, রেকর্ড-প্লেয়ার, ট্রানজিস্টার এমারজেন্সি বৈদ্যুতিক আলো, ফটোগ্রাফী বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা দেওয়া।
8. মাটি পরীক্ষার কাজে শিক্ষা দিয়ে গ্রামের বিজ্ঞান ক্লাবগুলিকে সাধারণ চাষীদের সাহায্য করতে উৎসাহিত করা।
9. সাধারণ মানুষের জন্য বিজ্ঞান প্রবন্ধ থেকে মৌলিক গবেষনাপত্র পর্যন্ত বাংলা ভাষায় প্রকাশ এবং জনপ্রিয় বিজ্ঞানের বই ও বিজ্ঞান সাধক চরিতমালা প্রকাশ।
10. যোগব্যায়াম ও তার গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন।
11. পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগারটি সুসমৃদ্ধ করে গড়ে তোলা।
12. পরিষদ ভবনে 'বিজ্ঞান সংগ্রহশালা' স্থাপন করা।
13. নির্বিচারে যথেচ্ছ গাছপালা ও বনজঙ্গল ধ্বংসের ফলে পরিবেশ দূষণ ও আবহাওয়ার মারাত্মক পরিবর্তনের ভয়াবহতা সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সজাগ করা।
14. নির্বিচারে বন্যপ্রাণী ধ্বংসের দরুণ বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্যের বিঘ্ন ঘটার বিপদ সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা।
15. যাবতীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করা।
16. শহর ও গ্রামের প্রতিটি স্কুল, কলেজ ও গ্রন্থাগারে পরিষদের মুখপত্র 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার গ্রাহকীকরণের মাধ্যমে পরিষদের আদর্শ ও উদ্দেশ্য প্রচার।

সুকুমার গুপ্ত
কর্মসচিব

JNAN-O-BIJNAN
MONTHLY JOUNAL Regd. No. WB/NC-210 FEBRUARY 1985

গ্রন্থাগার—গণশিক্ষার একটি মাধ্যম

গ্রন্থাগারের মত গণশিক্ষার একটি শক্তিশালী মাধ্যম দীর্ঘকাল অনাদৃত পড়ে ছিল। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর নতুন শিক্ষানীতী এবং নবপর্যায়ে গৃহীত কয়েকটি ব্যবস্থার আওতায় গ্রন্থগারের কাজ বিপুল উদ্যমে এগিয়ে চলেছে।

গত সাত বছরে সরকার পোষিত গ্রন্থাগারের সংখ্যা ৭৭৬ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২৪১৬। এছাড়া ১৯৭৯ সালের গ্রন্থাগার আইন এবং তার কয়েকটি সংশোধনের মাধ্যমে গ্রন্থাগারগুলিকে আরো সুচারুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে। যথাযথ কার্যনির্বাহ এবং উন্নয়নের জন্য স্থাপিত হয়েছে একটি গ্রন্থাগার অধিকার ও একটি গ্রন্থাগার সংসদ।

সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মাধ্যমে সুচিন্তিত জনমত গড়ে তোলার জন্য গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুবিধাকে এমনকি সুদূর পল্লীগ্রামেও পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। ৮৩৭টি গ্রন্থাগারে খোলা হয়েছে শিশু-বিভাগ, সারা ভারতবর্ষে এর নজীর আর নেই।

৯-১৪ বছর বয়েসের ছেলেমেয়ে অর্থনৈতিক কারণে বা জীবিকার্জনের জন্য বিদ্যালয় ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছে, তাদের জন্য খোলা হয়েছে ১৬,৬০০টি প্রথা-বহির্ভূত শিক্ষাকেন্দ্র। গত ৪ বছরে এইসব কেন্দ্রে ১১.৭৫ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষার্জন করেছে। সরকারের ৩৪ দফা কর্মসূচীর অন্তর্গত বয়স্ক শিক্ষা প্রকল্পের ২২ হাজার কেন্দ্রেও শিক্ষালাভ করেছেন ৬ লক্ষ মানুষ। এদের শিক্ষার ক্ষেত্রেও গ্রন্থাগারগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

বই আমাদের অকৃত্রিম বন্ধু। সুসংগঠিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুফল পৌঁছে দেবার কাজে এগিয়ে আসতে হবে প্রতিটি সচেতন মানুষকে।

॥ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ॥

৯২২-তথ্য/এ

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—শৈলী, কলিকাতা-54 মূল্য—2.50

লেখকদের প্রতি নিবেদন

1. বিজ্ঞান পরিষদের আদর্শ অনুযায়ী জনসাধারণকে আকৃষ্ট করার মত সমাজের কল্যাণমূলক বিষয়বস্তু সহজবোধ্য ভাষায় সুলিখিত হওয়া প্রয়োজন।
2. মূল প্রতিপাদ্য বিষয় এবং পূর্ণ ঠিকানাসহ লেখকের পরিচিতি পৃথক কাগজে অবশ্যই লিখে দিতে হবে।
3. চলিত ভাষা এবং চলন্তিকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট বানান ও পরিভাষা ব্যবহৃত হবে। উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে আন্তর্জাতিক শব্দটি বাংলা হরফে লিখে ব্র্যাকেটে ইংরাজী শব্দটিও দিতে হবে। আন্তর্জাতিক সংখ্যা এবং মেট্রিক পদ্ধতি ব্যবহৃত হবে।
4. মোটামুটি 3000 শব্দের মধ্যে রচনা সীমাবদ্ধ থাকা বাঞ্ছনীয়।
5. বিভিন্ন ফীচার, সমকালীন বিজ্ঞান গবেষণা ও প্রযুক্তিবিদ্যার সংবাদ এবং বিজ্ঞান বিষয়ক সুন্দর আকর্ষণীয় ফটোগ্রাফীও গ্রহণীয়।
6. রচনার সঙ্গে চিত্র থাকলে আর্ট পেপারে চাইনিজ কালিতে সুঅঙ্কিত হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন।
7. প্রত্যেক চিত্র প্রস্থে 8 সে. মি. কিংবা এর গুণিতকের (16 সে মি 24 সে. মি.) মাপে অঙ্কিত হওয়া প্রয়োজন।
8. অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রবন্ধের মৌলিকত্ব বজায় রেখে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জনে সম্পাদক মণ্ডলীর অধিকার থাকবে।
9. প্রত্যেক প্রবন্ধ ফীচার-এর শেষে গ্রন্থপঞ্জী থাকা বাঞ্ছনীয়।
10. জ্ঞান ও বিজ্ঞানে পুস্তক সমালোচনার জন্য দুই কপি পুস্তক পাঠাতে হবে।
11. ফুলস্ক্যাপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় যথেষ্ট মার্জিন এবং প্রতি লাইনের পর বেশ কিছুটা ফাঁক রেখে পরিস্কার হস্তাক্ষরে প্রবন্ধ লিখতে হবে।
12. প্রতি প্রবন্ধের শুরুতে পৃথকভাবে প্রবন্ধের সংক্ষিসার দেওয়া আবশ্যিক।

সম্পাদনা সচিব

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

মার্চ—1985
38তম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা

বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের অনুশীলন করে বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ ও সমাজকে বিজ্ঞান-সচেতন করা এবং সমাজের কল্যাণকল্পে বিজ্ঞানের প্রয়োগ করা পরিষদের উদ্দেশ্য।

বিভিন্ন লেখকদের স্বাধীন মতামত বা মৌলিক সিদ্ধান্ত সমূহ পরিষদের সম্পাদকমণ্ডলীর চিন্তার প্রতিফলন হিসাবে সাধারণতঃ বিবেচ্য নয়।

বিষয় সূচী

প্রচ্ছদ পরিচিতি ঃ ধূমকেতু ঃ
উৎকেন্দ্রিক উপবৃত্তাকার কক্ষপথে সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে উপস্থিত একটি অপেক্ষাকৃত বড় ধূমকেতুর সম্ভাব্য চেহারা ও তাদের পারস্পরিক গতিপথের চিত্র। বিশদ বিবরণ ভিতরের প্রবন্ধ 110 পৃষ্ঠা।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ঃ 30·00

মূল্য ঃ 2·50

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

কর্মসচিব

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ

কলিকাতা-700006

ফোন ঃ 55-0660

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

অষ্টাত্রিংশত্তম বর্ষ মার্চ, 1985 তৃতীয় সংখ্যা

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্দেশ্য

সুবোধনাথ বাগচী*

দীর্ঘদিনের পরবশতার ফলে আমরা প্রতিপদেই জীবন-যুদ্ধে পশ্চাদপসরণ করছি এবং আমাদের জীবনে প্রতিক্ষণেই আসছে ব্যর্থতা। এর মূল কারণ আমরা শিক্ষার আদর্শ হারিয়ে ফেলেছি—জীবনের সঙ্গে যোগসূত্র ছিঁড়ে ফেলেছি। প্রকৃত শিক্ষা তাই যা জীবনকে সুস্থ, সবল ও সুন্দর করে তোলে—প্রকৃত শিক্ষণীয় বিষয় সেই যা জীবনকে পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিতর স্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে—জগতের সঙ্গে একতালে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে পরিপূর্ণতার দিকে। ব্যক্তির সঙ্গে জীবনের ও প্রকৃতির যোগ সহস্র গ্রন্থিতে বাঁধা এবং এর সঙ্গতি অক্ষুণ্ণ রাখছে আমাদের জ্ঞান। জীবনের এই পরিপূর্ণ ও সামাগ্রিক দৃষ্টিলাভ করতে সক্ষম হলেই আমরা জ্ঞানী হতে পারি। কিন্তু আমরা যারা শিক্ষিত বলে গর্ব করছি তারা ভেসে বেড়াচ্ছি ত্রিশঙ্কুর রাজত্বে—ফলে আমাদের বহু কষ্টার্জিত বিদ্যা হয়ে পড়েছে নিস্ফল একমাত্র জীবনকে যাচাই করেই আমাদের বিদ্যা জ্ঞানে পরিণত হতে পারে এবং তা সম্ভব হয় যদি আমরা শিক্ষাদীক্ষা গ্রহণ করি মাতৃভাষার মারফত।

সৃষ্টির আদি থেকেই মানুষ তার জীবন ও সমাজকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে, তার জ্ঞানের সাহায্যে, অন্যথায় তার বিলোপ হত অবশ্যম্ভাবী। মানুষ জ্ঞানার্জন করেছে তৎকালীন বিদ্যাকে আয়ত্ত করে এবং জীবনের সঙ্গে সঙ্গতি স্থাপন করে। এই বিবিধ ও বিশেষ বিদ্যার (যা কালক্রমে পরিণত প্রাপ্ত হয়েছে বিজ্ঞানে) সামগ্রিক সংশ্লিষ্টিকেই জ্ঞান বলতে পারি। সুতরাং বিজ্ঞানই জ্ঞানের উৎস। চিরকালই সভ্যতার বাহন ও ধারক হয়েছে বিজ্ঞান এবং বিংশ শতাব্দীতে জ্ঞানের বিধি এমন বিপুল বিস্তৃতিলাভ করেছে, যে সমস্ত জীবনটাই হয়ে গেছে বস্তুতপক্ষে বিজ্ঞানময়। এই ক্রমবর্ধমান সমস্যাবহুল জটিল জীবনে যখন চারিদিক থেকে গভীর সঙ্কট ঘিরে ধরেছে তখন বিশেষ ভাবেই প্রয়োজন আমাদের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত করে এই বিজ্ঞানকে। জীবনকে সুন্দরময় ও সাফল্যমণ্ডিত করে পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে বিজ্ঞান-চর্চার বহুল প্রচার ও প্রসার শুধু প্রয়োজন নয় অবশ্যকর্তব্য, নইলে আমাদের জাতীয় জীবনের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং আজকের দিনে বিজ্ঞানীদের নিজের স্বার্থেই এগিয়ে আসা কর্তব্য জনগণের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসারের জন্য। পরিভাষার দুরূহ সমস্যায় ভীত কিংবা হতাশ হবার কিছুই নেই। রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দরের ভাষায় বৈজ্ঞানিক ভাব প্রকাশ করা নিশ্চয় সম্ভব। পূর্বগামীরা যদি সম্পূর্ণ সাফল্য অর্জন করতে না পেরে থাকেন তবে তার প্রধান কারণ তদানীন্তন কঠোর প্রতিকূল পরিবেশ। আজ ভারতে নব পটভূমিকার সৃষ্টি হয়েছে—চারিদিকে নতুন আশা ও আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছে। এই নবীন ভারতের উজ্জ্বলালোকে আমরা এগিয়ে যাব—দোদুল্যমান ভীরু বা ত্রস্ত পদে নয়—দৃঢ় পদক্ষেপে সোৎসাহে। নতুন পরিবেশে জীবনকে সমগ্রভাবে পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার পথে আমাদের প্রথম প্রচেষ্টার সোপান হল এই বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ।

জীবনের এইসর্বাঙ্গীন দৃষ্টিভঙ্গী অক্ষুণ্ণ রেখে অথচ আমাদের স্বল্প ক্ষমতার কথা স্মরণ করে আমাদের আপাততঃ দৃষ্টি থাকবে প্রথমতঃ জনগণের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলবার দিকে।

শিক্ষা ও দীক্ষা জীবনরসে সিঞ্চিত হয়ে দৃষ্টিভঙ্গী বাস্তবে পরিণত হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলবার প্রধান

* বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রথম (প্রতিষ্ঠাকালীন) কর্মসচিব

উপাদান বৈজ্ঞানিক তথ্য সমূহের বহুল প্রচার। কিন্তু তথাকথিত জ্ঞানের আহরণেই সুস্থ্য দৃষ্টিভঙ্গী যে গড়ে ওঠে না একথা আমরা নিত্যই জীবনে প্রত্যক্ষ করছি। বিখ্যাত খাদ্যবিজ্ঞানীর পাতে হয়ত দেখবেন তাঁর বহু বিঘোষিত ও বহু নিন্দিত খাদ্যসামগ্রী। সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক যিনি হয়ত স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের সারগর্ভ পাঠ্যপুস্তক লিখেছেন —তাঁর বাড়ীতে হয়ত দেখবেন স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের প্রাথমিক নিয়মের উপেক্ষা। এটা ঘটতে পেরেছে শুধু আমাদের শিক্ষাদীক্ষার সাথে জীবনের যোগ নেই বলেই—তার ভিতর প্রাণের স্পর্শ নেই বলেই। আমাদের শিক্ষাদীক্ষা সমস্তই ওভারকোটের মত বাহিরের আবরণ হয়ে আছে —ঘরে ঢুকেই আলনায় ঝুলিয়ে রাখি—মস্তিষ্ক থেকে অন্তরে প্রবেশ করতে পারে না, কাজেই জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে ওঠে না। আমরা শিখে রেখেছি পাঠ্যপুস্তকের সারগর্ভ নীতিকথা এবং সঙ্গে সঙ্গে এটা মনে গেঁথে রেখেছি যে এই ছাপার অক্ষরে লেখা নীতিকথার সাথে বাস্তব-জীবনের কোন সম্পর্ক নেই—বরঞ্চ এগুলো বিরুদ্ধবাদী। জেনে রেখেছি যে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেই এই উপদেশ পুঁথিতে ও আলমারীতে সীমাবদ্ধ করে রেখে দিলে চলবে।

আর একটা প্রধান অন্তরায় আমাদের ঘরের ভিতর যুগোপযোগী শিক্ষার প্রচার মোটেই হয় নি। এটা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার যে ঘরের ভিতরের শিক্ষা জীবনের সাথে যোগ হারিয়ে ফেললে সব নিস্ফল হয়ে যাবে। পশ্চিমে আজ যে ঘরের ভিতর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে দৈনন্দিন জীবন-যাপন করবার প্রচেষ্টা হয়েছে সে শুধু ফ্যাশনের খাতিরে নয়—পারিপার্শ্বিক সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এমন অবস্থার সৃষ্টি করেছে যে এ ছাড়া গত্যন্তর নেই। আমাদের জীবনে এর প্রয়োজন আরও বেশী। আমাদের সমাজ-জীবন রয়েছে মধ্যযুগীয় আবহাওয়ায় অথচ কর্মজগৎ ও অর্থনৈতিক জগৎ বর্তমান সভ্যতার ধাক্কায় টলমলিয়ে উঠেছে। চতুর্দিকের বিবিধ সমস্যার সমাধানের উপায় আমাদের বের করতে হবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যা আমাদের সাহায্য করবে আমাদের যেটুকু সরঞ্জাম রয়েছে তার সদ্ব্যবহার করে আমাদের জীবনযাত্রা যেন ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে যেতে পারে। এদিক থেকে জনসাধারণকে সাহায্য করতে আমরা সর্বদাই প্রস্তুত থাকব।

এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি করবার জন্য লেখার ভিতর দিয়ে জনসাধারণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক তথ্যের পরিবেশনের সময় আমাদের আদর্শ হবে রবীন্দ্রনাথের নির্দেশ—"বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সাধারণের গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হবে, তোমাদের পাণ্ডিত্য ও দুরূহ বাক্যজালের আঘাতে শিক্ষার্থীর কাছে শিক্ষণীয় বিষয় যাতে দুঃসহ হয়ে না ওঠে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখো ; আর তথ্যের বোঝা হালকা করে অযথা ফেনার যোগান দিয়ে তার পাতটাকে প্রায় ভোজ্যশূন্য করো না। দয়া করে বঞ্চিত করাকে দয়া বলে না।"

দ্বিতীয়তঃ স্কুল ও কলেজের পাঠ্যবস্তু সহজ ও সরল ভাষায় বৈজ্ঞানিক যথাযথতা অক্ষুণ্ণ রেখে বিভিন্ন পরিবেশে প্রকাশ করার জন্য। পাঠ্যতালিকাভুক্ত বিষয়বস্তু মামুলী হলেও বাংলা ভাষায় তার প্রকাশের প্রয়োজন বর্তমান খুবই রয়েছে। তা ছাড়া মামুলী বিষয়বস্তুও বিভিন্ন উপায়ে, বিভিন্ন ভঙ্গীতে ও বিভিন্ন পরিবেশে সুন্দর রূপে প্রকাশ করতে পারলে তা সুখপাঠ্য ও চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠে।

আমাদের বর্তমান বৈজ্ঞানিক শিক্ষার আর একটি প্রধান দোষ যে ছাত্রদিগকে যান্ত্রিক ভাবাপন্ন করে তোলে না। বলা বাহুল্য আমাদের বিশেষ দৃষ্টি থাকবে এই ত্রুটি যথাসম্ভব দূর করবার জন্য। এই ত্রুটি দূর করবার প্রধান অস্ত্র হবে মিউজিয়ম, প্রদর্শনী, মডেল ও খেলনা এবং স্কুল কলেজে ছেলেদের খেলনা, মডেল বা যেকোনো ঐ জাতীয় দ্রব্যাদি তৈরী করার ও তা নিয়ে নাড়াচাড়া করার সুযোগ দেওয়া।

তৃতীয়তঃ স্কুল কলেজের উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক পাঠ্য-পুস্তক, বিশেষ বিষয়বস্তু সংক্রান্ত প্রামাণ্য গ্রন্থ ও পরিক্রমা প্রকাশ করবার জন্য আমরা সর্বদাই সচেষ্ট থাকবো। এই কার্যের সাহায্যার্থে আমরা ইংরেজি বৈজ্ঞানিক শব্দের ও ভাবের পরিভাষা বের করতে ও আলোচনা করতে ইচ্ছুক।

আমাদের আর একটা গুরুদায়িত্ব হবে বাজারে যে বৈজ্ঞানিক পুস্তক বাংলা ভাষায় বিশেষতঃ ছাত্রদের জন্য বেরোয় তার সতর্ক ও সহানুভূতিশীল সমালোচনা করা যাতে আমাদের প্রকাশিত পুস্তকের আদর্শ বেশ উঁচুতে থাকে।

চতুর্থতঃ লোকসাহিত্য ও শিশুসাহিত্যকে সর্বপ্রকার বৈজ্ঞানিক জ্ঞানসম্পদে সমৃদ্ধশালী করে তোলা।

জনগণের মনের ও দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিফলক সাহিত্য। প্রকৃত সাহিত্য শুধু জীবনের সমালোচনা নয় জীবনের রূপায়ণ। লোকশিক্ষায় ধর্ম ও পুরাতন ঐতিহ্য বিরাট স্থান অধিকার করে আছে—সাহিত্যে তার প্রতিফলন হয়েছে কিন্তু সমাজব্যবস্থা যে দ্রুত তালে এগিয়ে চলেছে তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের ব্যক্তি, সমাজ ও

সাহিত্য এগিয়ে যেতে পারেনি। তার ফলে ঘটেছে প্রতিপদে অসঙ্গতি। পুরাতন জীর্ণ সমাজ-ব্যবস্থার ভিত্তিতে তদানীন্তন লোকশিক্ষা অনেক ক্ষেত্রেই হয়ে পড়েছে কুশিক্ষা। এবং অশিক্ষিতের চেয়ে কুশিক্ষিতের বিপদ যে অনেক বেশী-বিশেষতঃ এই গণভোটের যুগে সে কথা বলাই বাহুল্য। এই নতুন শিক্ষায় জনগণকে দীক্ষিত করবার গুরুদায়িত্ব প্রধানতঃ সাহিত্যিকের। কিন্তু আমাদেরও একটা দায়িত্ব রয়েছে, সেটা হচ্ছে সাহিত্যিক-গণকে সচেতন করে তোলা এবং তাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান-সম্ভার বৃদ্ধি করে তুলতে যথাসম্ভব সাহায্য করা।

যেখানে সাধারণ সাহিত্যের অবস্থাই এইরূপ—যেখানে শিশুসাহিত্য এখনও উচ্চস্তরে পৌঁছতে পারেনি সেখানে বিশেষ করে শিশু সাহিত্যের প্রসঙ্গে আলোচনা না করাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু আমরা সর্বদাই মনে রাখব যে শিশু চিরকাল শিশুই থাকবে না এবং আজকের শিশু কাল দেশের নেতা হবে—দেশকে গড়ে তুলবে।

পঞ্চমতঃ বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রচার ও প্রসারের জন্য ও তার পথের বাধাবিপত্তি দূর করবার জন্য বাৎসরিক সম্মেলন আহ্বান করা এবং বৎসরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে শিক্ষামূলক অথচ জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুর প্রদর্শনী ও তৎসংক্রান্ত বক্তৃতার ব্যবস্থা করা।

নতুন পথে যাত্রার বাধা ও বিঘ্ন অনেক। প্রতি পদেই উঠবে নতুন সমস্যা এবং গোড়া থেকেই সেগুলো ভালভাবে সমাধান করার প্রয়োজন হবে। বাৎসরিক সম্মেলনে দেশের সুধীবৃন্দ একত্রিত হয়ে পরস্পরের মতামত বিচার করতে পারবেন এবং দেশকে সন্ধান দিতে পারবেন ঠিক পথের।

জ্ঞানার্জনের প্রকৃষ্ট পন্থা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। কিন্তু কার্যকারণ সম্পর্ক সঠিক বিশ্লেষণ করতে না পারলে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও অনেক সময়েই জন্ম দেয় কুসংস্কারের। পরীক্ষালব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে এতাদৃশ মধ্যযুগীয় কুসংস্কারের বন্ধন ছিন্ন করে বর্তমান বিজ্ঞান জন্মলাভ করেছে। তেমনি বিজ্ঞানে ও চিন্তাধারায় তাই পরীক্ষালব্ধ জ্ঞানের প্রাধান্য এত। মিউজিয়াম ও প্রদর্শনীর সার্থকতা এইখানেই। প্রদর্শনীর ভিতর দিয়ে জনগণ তাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কার্যকারণ সম্পর্ক জানতে পারবে—বুঝতে পারবে যে বৈজ্ঞানিক ঘটনা একটা ভৌতিক ব্যাপার মাত্র নয়—অহরহই তাদের জীবনে ঘটে চলেছে সেই ক্রিয়া সাধারণ বিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারেই।

আমাদের উদ্দেশ্য সফল করে তুলতে হলে এবং পরিষদকে সুষ্ঠুভাবে গড়তে হলে প্রয়োজন হবে পরিষদের নিজস্ব বাড়ী, প্রেস, স্থায়ী মিউজিয়ম, প্রদর্শনী ও কারখানা। এগুলো ভালভাবে চালাতে হলে প্রয়োজন হবে বহুবিধ কর্মচারীর এবং বহু বিশেষজ্ঞের সাহায্য।

আমাদের স্বপ্নকে সার্থক করতে হলে প্রয়োজন হবে প্রচুর অর্থের। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় অর্থের কথা উঠলেই অনেক উৎসাহী ব্যক্তি বা মনীষীও হতাশ হয়ে পড়েন। তার অবশ্য যথেষ্ট কারণ রয়েছে। কিন্তু ভারতে যুগান্তর হয়েছে। সরকার যখন সাময়িক পুনর্বসতির জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করছেন তখন জনগণকে দৃঢ় ভিত্তির উপর পুনঃসংস্থাপিত করার কাজ প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব হবে কেন? শুধু তাই নয়, যে অর্থ আজ ব্যয় করে শিক্ষার বীজ বপন করা হবে, নিশ্চয় জানি কালক্রমে তা প্রচুর ফসল উৎপাদন করবে। আমাদের মধ্যে বাংলা দেশের বহু মনীষীর ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ জ্ঞানী ও গুণীর সমাবেশ হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও হবে আশা করি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস জাতীয় জীবনের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা যদি একত্রিত হয়ে দেশের জনগণের প্রকৃত হিতাকাঙ্খায় ও মঙ্গল কামনায় কোন পরিকল্পনা গড়ে তোলেন, তবে তাকে রূপায়িত করবার জন্য অর্থ বা লোকের অভাব নিশ্চয়ই হবে না এবং লোকায়ত সরকারও তাঁদের মতামত উপেক্ষা করবেন না। জাতীয় চিন্তাধারাকে ও জাতীয় জীবনকে নতুন পথে, মাঙ্গল্যের পথে সর্বকালে এবং সর্বদেশেই এগিয়ে নিয়ে যান্ দেশের মনীষীরা, ঋষিরা কর্ণধাররা। আমরা জানি আমাদের মধ্যে যে অনুপ্রেরণা এসেছে, যে চিন্তাধারার প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে, দেশের অগণিত নরনারীর মনেও আজ ঠিক সেই চিন্তাই বড় হয়ে উঠেছে। আমরা নিশ্চিত বুঝতে পারছি যে আমরা অন্ধকারে পা ফেলছি না। স্পষ্টই অনুভব করছি যে জনগণ উন্মুখ হয়ে রয়েছেন আমাদের কাজে নামবার আশায়। তাই আমাদের অনুরোধ বাংলাদেশের সর্বস্তরের মনীষী, জ্ঞানী ও গুণীরা যেন এগিয়ে এসে পরিষদের কর্মভার হাতে তুলে নেন। জনসাধারণের প্রতি আমাদের অনুরোধ তাঁরা যেন সাহায্য ও সহানুভূতি দিয়ে পরিষদের ভিত্তি দৃঢ় করে তোলেন এবং যাতে এর উদ্দেশ্য সফল হয়ে ওঠে তার জন্য সচেষ্ট থাকেন।

* 1948 খৃস্টাব্দের জানুয়ারী সংখ্যা 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' থেকে পুনর্মুদ্রিত

পাল্‌সার রহস্য

সলিলকুমার চক্রবর্তী *

বেশী দিনের কথা নয়। 1968 খৃস্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাস। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যায়ের অ্যান্টনি হিউইশ (Antony Hewish) ও তাঁর সহকর্মী জ্যোতির্বিদেরা সৌরমণ্ডলের বাইরে বিন্দুপ্রমাণ এক অদ্ভুত ধরনের জ্যোতিষ্কের সন্ধান পেলেন, যা থেকে পর্যায়ক্রমে রেডিও সংকেত এসে পৌঁছচ্ছে আমাদের পৃথিবীতে। এই সংকেতের পর্যায়কাল (Time period) অবিশ্বাস্য রকম নিখুঁত এবং অত্যন্ত স্বল্প ; মাত্র 0·25 সেকেণ্ড থেকে 1·3 সেকেণ্ড।

এ রকম একটা আশ্চর্য নৈসর্গিক ঘড়ি আবিষ্কারের সংবাদ প্রকাশিত হবার সঙ্গেই দেশ বিদেশের বিজ্ঞানী-মহলে দেখা গেল বিশেষ তৎপরতা। দিনের পর দিন এই রেডিও সংকেতের স্বভাব ও দিক পরীক্ষা করে দেখা গেল যে, সংকেতগুলো আসছে অপেক্ষাকৃত কাছের কোনও জ্যোতিষ্কীয় বস্তু থেকে। গ্রহান্তর থেকে মানুষের মতই কোনও বুদ্ধিমান জীব এ ধরনের রেডিও সংকেত পাঠাচ্ছে কিনা—প্রথম প্রথম সেরকম সন্দেহও হয়েছিল। মনে পড়ে, খবরের কাগজগুলোতেও এই নিয়ে সে সময় বেশ কিছু উত্তেজনা ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। বিজ্ঞানীদের নিরলস প্রচেষ্টায় অল্পদিনের মধ্যেই অবশ্য এই আশ্চর্য ধরনের জ্যোতিষ্কগুলির সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানতে পারা যায় এবং সেই সঙ্গে ব্রহ্মাণ্ড-রহস্যের অনেকটাই হয় উন্মোচিত।

"Pulsating Star"—এই ইংরেজী শব্দযুগ্ম থেকেই 'Pulser' (পাল্‌সার) নামের উৎপত্তি। এক কথায় স্পন্দনশীল তারকা। পর্যায়ক্রমে ঝাঁকে ঝাঁকে রেডিও বিকিরণ নির্গত হয় বলেই এ ধরনের জ্যোতিষ্কের এরূপ নামকরণ।

পাল্‌সারের আয়তন ও দূরত্ব

স্পন্দনের এত ক্ষুদ্র স্থায়িত্বকাল থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল যে, এধরনের রেডিও সংকেতের উৎস অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকৃতি বস্তু। কারণ কোনও বস্তুর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে আলো পৌঁছতে যে সময় লাগে, সেই বস্তু থেকে বিকীর্ণ স্পন্দনের স্থায়িত্বকাল তার থেকে কখনই কম হতে পারে না। পাল্‌সারের রেডিও চমকের স্থায়িত্ব-কাল মাত্র 10 থেকে 20 মিলিসেকেণ্ড। তা থেকে সহজেই হিসাব করা যায় যে তাদের ব্যাসার্ধ কয়েক হাজার কিলোমিটারের বেশী নয়।

বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে, আন্তর্নাক্ষত্রিক অঞ্চল কখনই সম্পূর্ণ শূন্য নয়। সে দেশ প্রধানতঃ হাইড্রোজেন গ্যাসে পূর্ণ। সূর্য এবং অন্যান্য উষ্ণ নক্ষত্রের বিকিরণের সংঘাতে ঐ হাইড্রোজেন পরমাণুসমূহ আয়নে (ion) পর্যবসিত। এ ছাড়াও, ঐ আন্তর্নক্ষত্র অঞ্চল জুড়ে আছে যথেষ্ট পরিমাণ স্বাধীন ইলেকট্রন। পাল্‌সারের বিকিরণকে এ রকম একটা আয়নিত মাধ্যমের (প্লাজমার) ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পৌঁছতে হয় পৃথিবীতে (1নং চিত্র)।
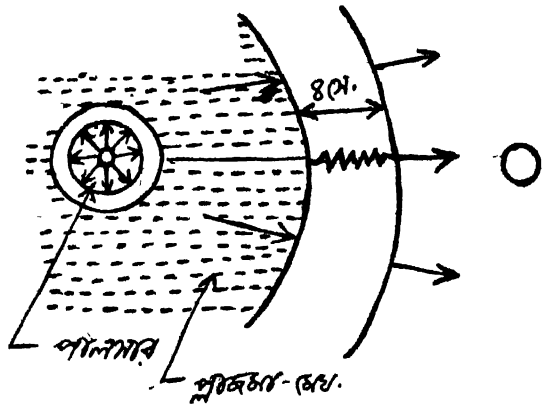
1 নং চিত্র

প্রথম আবিষ্কৃত পাল্‌সারের CP 1919 বিকিরণের ধারা

* ইউ. কো. ব্যাঙ্ক, দমদম ক্যান্টনমেন্ট শাখা

এক-একটি বিচ্ছিন্ন রেডিও স্পন্দনে সর্বদা একাধিক তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিকিরণ উপস্থিত থাকে। প্লাজ্‌মা মেঘের মধ্য দিয়ে আসার সময় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিকিরণ দ্রুততর হয় আর বড় দৈর্ঘ্যের তরঙ্গরা ক্রমশঃ পিছিয়ে পড়ে। রেডিও-দূরবীনের গ্রাহক-যন্ত্র সর্বপ্রথম সাড়া দেয় স্পন্দনের ক্ষুদ্রতম তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিকিরণে এবং ক্রমান্বয়ে বড় তরঙ্গের বিকিরণে। একে বলে রেডিও তরঙ্গের বিচ্ছুরণ (Dispersion), আর এই বিচ্ছুরণের পরিমাণ নির্ভর করে মাধ্যমের দৈর্ঘ্য এবং তার ইলেকট্রন ঘনত্বের উপর।

আন্তর্নাক্ষত্রিক দেশের ইলেকট্রন ঘনত্ব মোটামুটি 0·1 থেকে 0·01 ঘন সেন্টিমিটার ধরে নিয়ে প্রথম আবিষ্কৃত পালসার CP1919-এর দূরত্ব নির্ণীত হয়েছিল প্রায় 130 পারসেক। (1 পারসেক=3·26 আলোকবর্ষ অর্থাৎ, 3·26 × 3,00,000 × 60 × 60 × 24 × 365 কিলো মিটার)। হিসাব অনুযায়ী আমাদের নক্ষত্রজগতের ব্যাস প্রায় 30,000 পারসেক। সুতরাং কেম্ব্রিজ পালসারটি যে সৌরমণ্ডলের অতি কাছের বস্তু, তা পরিষ্কার বোঝা গেল।

দূরত্বের পরিমাপ থেকে আরও একটা জিনিস স্পষ্ট হল। কাছাকাছি যে অঞ্চল উজ্জ্বল নক্ষত্রেরা ভিড় করে আছে, পাল্‌সারের সংকেত আসছে সেইসব অঞ্চল থেকে। পালসার আবিষ্কারের কিছু পর থেকেই পৃথিবীর রেডিও জ্যোতির্বিদ্যার বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্রে বিপুল উদ্যমে শুরু হলো পালসার খোঁজার প্রচেষ্টা। কেম্ব্রিজে 2048টি অ্যান্টেনার সাহায্যে মোট 7টি পাল্‌সার আবিষ্কৃত হল। ইংল্যাণ্ডের জডরেল ব্যাঙ্কে 250 ফুট রেডিও-দূরবীনের কমপিউটার ব্যবহার করে ডেভিড (David) ও তাঁর সহকর্মীরা খুঁজে পেলেন 9টি পাল্‌সার। আমেরিকার ন্যাশন্যাল রেডিও অ্যাস্ট্রনমির অবজারভেটরিতে রাইফেন-স্টাইন (Rifenstein) ও হিউগেনিন্‌ (Heugenin) আবিষ্কার করলেন 4টি পাল্‌সার। রাশিয়ার পুশচিনো ও ইটালীর বোলোনার রেডিও মানমন্দিরে আরও কয়েকটা পাল্‌সারের সন্ধান পাওয়া গেল। ভারতবর্ষও পিছিয়ে থাকলো না এ ব্যাপারে। উটকামণ্ডে স্থাপিত রেডিও-দূরবীনের সাহায্যে গোবিন্দ স্বরূপ ও তাঁর সহকর্মীরা আবিষ্কার করলেন 3টি নতুন পাল্‌সার, এ ছাড়া আরও কতগুলো দুর্বল পাল্‌সারের পর্যবেক্ষণের ব্যাপারেও তাঁরা বিশেষ কৃতিত্বের দাবী রাখেন।

পাল্‌সার নিঃসৃত রেডিও তরঙ্গের গুণাগুণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ধরা পড়লো যে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে পাল্‌সারের পর্যায়কাল। ভারতীয় বিজ্ঞানী রাধাকৃষ্ণণ লক্ষ্য করলেন, ভেলা পাল্‌সারের বেলায় এই পরিবর্তনের হার কয়েক ন্যানোসেকেণ্ড (10^{-9} সেকেণ্ড)। আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার জানা গেল যে, পাল্‌সাররা কেবলমাত্র রেডিও তরঙ্গেই নয়, পর্যায়ক্রমে আলোকতরঙ্গ এবং এক্স-রশ্মিতেও (X-Ray) অনুরূপ বিকিরণ সৃষ্টিতে সক্ষম।

পাল্‌সারের স্বরূপ

পাল্‌সার আবিষ্কারের পর তাদের অদ্ভুত আচরণের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেবার জন্যে তত্ত্বীয় জ্যোতিপদার্থ বিজ্ঞানীরা উদ্ভাবন করলেন নানা রকম মতবাদ, প্রক্রিয়া ও মডেলের। পর্যবেক্ষণের কষ্টিপাথরে যাচাই করে শেষ পর্যন্ত নিউট্রন তারকার (Neutron Star) ব্যাখ্যাই সবচেয়ে সন্তোষজনক প্রতিপন্ন হয়েছে। এবার সে বিষয়ে কিছু বলা দরকার।

নক্ষত্র দেহ থেকে নির্গত বিকিরণের তীব্রতার পর্যায়-ক্রমিক হ্রাসবৃদ্ধি নিম্নলিখিত তিনটি কারণে হতে পারে।

1) নিয়মিত ভাবে কোনও নক্ষত্রের আয়তনের সঙ্কোচন ও প্রসারণ,
2) পরস্পর পরস্পরকে কেন্দ্র করে দুটি নক্ষত্রের এরূপ-ভাবে আবর্তন, যাতে একটি অপরটিকে পর্যায়ক্রমে আড়াল করে ঘুরতে পারে।
3) দেহের বিভিন্ন অংশের ঔজ্জ্বল্য সমান নয়, এরকম একটি নক্ষত্রের আবর্তন।

নিউট্রন তারকার আয়তন এত ছোট এবং তার ঘনত্ব এত বেশী যে, তার স্পন্দনের হার অত্যন্ত দ্রুত এবং স্পন্দনের পর্যায়কাল অত্যন্ত ছোট। অতএব প্রথম সম্ভাবনা ধোপে টিকলো না।

যুগ্ম নিউট্রন তারকার ঘূর্ণনের সাহায্যে স্পন্দনের পর্যায়কাল ব্যাখ্যার বেলায় প্রধান বাধা এলো পদার্থবিদ্যার প্রচলিত নিয়মকানুনের তরফ থেকে। দুটি তড়িদন্বিত বস্তু এভাবে ঘুরতে থাকলে উভয়েই তেজ বিকিরণের মাধ্যমে শক্তিক্ষয় করে ফেলবে এবং ক্রমশঃ পরস্পরের কাছে সরে আসার দরুণ তাদের পর্যায়কালও ক্রমশঃ কমতে থাকবে। হিসাব করে দেখা গেলো যে এভাবে ঘূর্ণায়মান যুগ্ম নিউট্রন তারকার পক্ষে এক বছরের বেশী টিকে থাকা সম্ভব নয়।

তৃতীয় সম্ভাবনা—একক নিউট্রন তারকার আবর্তন। 1968 খৃষ্টাব্দে কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের টমাস গোল্ড (Tomas Gold) একক নিউট্রন তারকার আবর্তন ও আলোকস্তম্ভ পদ্ধতিতে পর্যায়ক্রমিক রেডিও বিকিরণের যে মডেল তৈরি করেন, তা থেকে পাল্‌সারের পর্যায়কালের

সঠিক হিসাব পাওয়া গেলো। এখনও পর্যন্ত পাল্‌সারের বিচিত্র ব্যবহারের এটাই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা।

আবর্তনশীল নিউট্রন তারকার মডেল অনুযায়ী পাল্‌সারে যে প্রচণ্ড পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হয়, তার এক হাজার ভাগের এক্‌ভাগ একত্র আত্মপ্রকাশ করে রেডিও স্পন্দন হিসাবে। নিউট্রন তারকার শক্তিশালী চৌম্বকক্ষেত্র তার চার পাশের প্লাজ্‌মাকে আঁকড়ে ধরে থাকার ফলে, নিউট্রন তারকার সঙ্গে সঙ্গে সমান কৌণিক বেগে (Angular Velocity) সেই প্লাজ্‌মা আবর্তিত হয়।

আলোরবেগ C এবং নিউট্রন তারকার কৌণিক বেগ (w) ধরে নিলে, নিউট্রন তারকার কেন্দ্র থেকে প্লাজমার দূরত্ব যখন $\frac{c}{w}$-এর কাছাকাছি পৌঁছবে, তখন প্লাজ্‌মার বেগ হবে আলোর বেগের কাছাকাছি। এই দূরত্বে কল্পিত বৃত্তকে আখ্যা দেওয়া হ'য়েছে 'আলোকবেগ বৃত্ত' (Velocity of Light Circle)। এই বৃত্ত-পরিধির বাঁকা পথে চলার দরুন আহিত কণিকারা বা ইলেকট্রনরা সমলয় পদ্ধতিতে রেডিও বিকিরণ সৃষ্টি করবে। এখন নিউট্রন তারকার দুই মেরুর কাছ থেকে যদি সরু পেন্সিলের আকারে ইলেকট্রন স্রোত নির্গত হয়, তবে আলোক বেগ বৃত্তের দুটি বিশেষ অঞ্চলে এরা জড়ো হয়ে আলোকস্তম্ভের মত পর্যায়ক্রমে রেডিও ঝলক সৃষ্টি করবে (2নং চিত্র)।
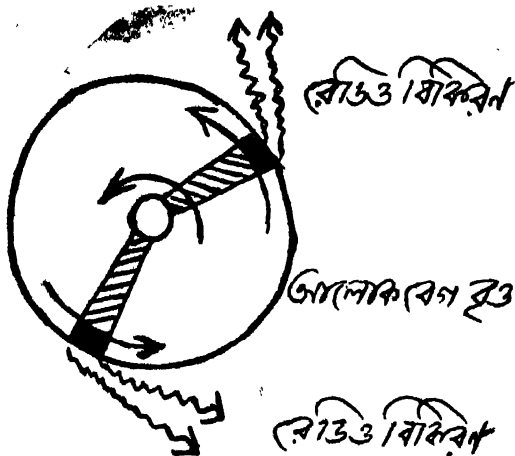
2নং চিত্র—টমাস-গোল্ডমডেল

ভারতীয় বিজ্ঞানী রাধাকৃষ্ণণ, ঘূর্ণ্যমান নিউট্রন তারকার সঙ্গে ঘূর্ণায়মান প্লাজমাকে কল্পনা করার প্রয়োজন বোধ করেন নি। তিনি নিউট্রন তারকার দুই চৌম্বক মেরু থেকে সরাসরি যে ইলেকট্রন স্রোত নির্গত হয়ে থাকে, তার ভিত্তিতেই রেডিও বিকিরণ ব্যাখ্যা করেন। তাঁর মতে মেরুর দুই ছিদ্র থেকে শক্তিশালী ইলেকট্রন প্রায় আলোকের বেগে নিস্ক্রান্ত হতে পারে। সেই ইলেকট্রন যখন নিস্ক্রমণের পর চৌম্বক ক্ষেত্রের বাঁকা বলরেখা অনুসরণ করতে থাকে, তখনই উদ্ভব হয় রেডিও বিকিরণের। নিউট্রন তারকার সব জায়গা থেকে না হয়ে কেবল দুই মেরু থেকে ইলেকট্রন স্রোত নির্গত হবার দরুণই বিকিরণের এই পর্যায়ক্রমিক স্পন্দন।

পাল্‌সারের উৎপন্ন মোট শক্তির এক হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র আত্মপ্রকাশ করে রেডিও ঝলক হিসাবে। স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগবে বাকী শতকরা 99·9 ভাগ শক্তি গেল কোথায়? অস্ট্রিকার (Astriker) ও গান (Gun) দেখিয়েছেন যে, ঘূর্ণায়মান নিউট্রন তারকা থেকে যে তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গের উদ্ভব হয়, সেই তরঙ্গকে অবলম্বন করে এবং তা থেকে শক্তি সঞ্চয় করে ইলেকট্রনরা প্রায় আলোকের মত দ্রুতগামী হয়ে ওঠে।

তারপর একসময় তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গের বন্ধন-মুক্ত হয়ে নীহারিকা মেঘের চৌম্বকক্ষেত্রে প্রবেশ করে ইলেকট্রনরা সমলয় পদ্ধতিতে তেজ বিকিরণ করতে শুরু করবে। পাল্‌সার-শক্তির অধিকাংশ ভাগেরই আত্মপ্রকাশ ঘটে এই ভাবে।

নানা হিসাব-নিকাশের পর পাল্‌সারদের গড়-বয়স অনুমান করা হয়েছে প্রায় 10 মিলিয়ন বছর। বর্তমানে যত সংখ্যক পালসারকে আমরা সক্রিয় দেখছি, তার প্রায় দশ হাজার গুণ পালসার সম্ভবতঃ এখন নিষ্ক্রিয় বা মৃত পাল্‌সারে পর্যবসিত হয়ে আমাদেরই খুব কাছে—দশ আলোকবর্ষ দূরত্বের মধ্যেই অবস্থান করছে সাধারণ নক্ষত্র হিসাবে।

সম্প্রতি আবিস্কৃত মহাকাশের অধিবাসী অদ্ভুত জ্যোতিষ্ক এই পাল্‌সারদের সম্বন্ধে অনেক তথ্য ইতিমধ্যেই জানা হয়ে গেলেও বিজ্ঞানীদের কৌতূহল চরিতার্থ হয়নি। এখনও তাদের ঘিরে নানা রহস্যের জট। পাল্‌সার রহস্যের মধ্যেই হয়তো লুকিয়ে আছে বিশ্ব-সৃষ্টি এবং বিশ্বের পরিণামের সুস্পষ্ট ইংগিত। বিজ্ঞানীরাও তাই বসে নেই। বিভিন্ন মানমন্দিরে শক্তিশালী রেডিও-দূরবীনকে কার্যরত রেখে অতন্দ্র প্রহরীর মতো তাঁরা সজাগ। গবেষণাও চলছে এগিয়ে জোর কদমে। অদূর ভবিষ্যতে না জানি আরও কত নবাবিস্কৃত তথ্য সমৃদ্ধ করবে মানুষের জ্ঞানের ভাণ্ডার!

প্রকৃতি-সংরক্ষণ—প্রাথমিক ধারণা

কৌশিক সেনগুপ্ত *

বর্তমানে মানসভ্যতার একটা জ্বলন্ত সমস্যা হল প্রকৃতি-সংরক্ষণ। সমস্যাটা আমাদের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে গেছে যে, "প্রকৃতি-সংরক্ষণ" কথাটা বৈজ্ঞানিকদের গণ্ডী ছাড়িয়ে নেমে এসেছে সাধারণের দৈনন্দিন আলোচনার ক্ষেত্রে। তাই সীমাবদ্ধ পরিসরে দু-চার কথা বলে এই সম্বন্ধে একটা প্রাথমিক ধারণা গড়ে তোলার চেষ্টা করছি।

প্রাকৃতিক সম্পদের যুক্তিপূর্ণ খরচ, সংরক্ষণ ও পুনর্নবীকরণের জন্য যে সামাজিক প্রচেষ্টা—সেটাই সাধারণভাবে প্রকৃতি-সংরক্ষণ হিসেবে স্বীকৃত। সমাজ ও পরিবেশের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতিসাধনই প্রকৃতি-সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা। পরিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নতি সাধন এবং প্রাকৃতিক সম্পদের যুক্তিপূর্ণ ব্যবহার ও নবীকরণের বিভিন্ন পদ্ধতি এই উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক, রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত স্তরে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

এই শতকের গোড়ার দিকে বিজ্ঞানীরা মনে করতেন প্রকৃতি-সংরক্ষণের অর্থ হল শুধু কিছু প্রাকৃতিক পদার্থকে অর্থনৈতিক প্রবাহ থেকে সরিয়ে এনে অধিকতর মাত্রায় সংরক্ষত এলাকা তৈরি করা। কিন্তু 1929 খৃস্টাব্দে অনুষ্ঠিত প্রথম রাশিয়ান প্রকৃতি-সংরক্ষণ কংগ্রেসে বলা হয় যে, প্রকৃতি-সংরক্ষণের গোড়ার কাজ হল প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারকে যুক্তিপূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করা। তবে এটা করতে গিয়ে প্রকৃতির কোন অংশকে ব্যবহারের আওতা থেকে সরিয়ে আনার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। পরবর্তী সময়ে এই নতুন তত্ত্বের কোন কোন অনুগামী বলেন যে, 'প্রকৃতি-সংরক্ষণ' এই নামের পরিবর্তে ব্যবহার করা উচিত "প্রকৃতির (যুক্তিপূর্ণ) ব্যবহার।" কোন প্রাকৃতিক সম্পদকে সাময়িকভাবে ব্যবহারের আওতা থেকে সরিয়ে এনে সংরক্ষণ এবং পরবর্তী সময়ে যুক্তিপূর্ণ ব্যবহারের একটি সুন্দর নিদর্শন হল সাইগা নামের একজাতীয় অ্যান্টিলোপ। প্রাচীনকাল থেকেই সাইগাকে অবাধে শিকার করা হত। অবশেষে, 1922 খৃস্টাব্দে রাশিয়াতে দেখা গেল যে, আর মাত্র এক হাজারটি প্রাণী বেঁচে আছে। সঙ্গে সঙ্গে আইন করে সাইগা শিকার 30 বছরের জন্য সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হল। 1951 খৃস্টাব্দে এই সংখ্যা বেড়ে দশ লক্ষ হওয়ার পর আবার শিকার শুরু করা সম্ভব হয়। পরবর্তী সময়ে যুক্তিপূর্ণ ব্যবহারের নমুনা হিসেবে নিয়ন্ত্রিত শিকারের সঙ্গে প্রজননের পরিবেশ বজায় রাখায় বর্তমানে রাশিয়ায় সাইগার সংখ্যা 2 মিলিয়ন ছাপিয়ে গেছে। প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার তথা সংরক্ষণকে জোর দেওয়ার জন্য এই সময় 'আন্তর্জাতিক প্রকৃতি-সংরক্ষণ সংসদ' (International Union for Conservation of Nature) নিজেদের নামের সঙ্গে "এবং প্রাকৃতিক সম্পদ (and Natural Resources)" কথা কয়টি যোগ করেছেন।

1968 খৃস্টাব্দে প্যারিসে জৈবমণ্ডলের সম্পদের যুক্তিপূর্ণ ব্যবহার ও সংরক্ষণের বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর বিশেষজ্ঞদের প্রথম আন্তঃসরকারী সম্মেলনের প্রধান দৃষ্টিভঙ্গী ছিল —দ্রুত উন্নয়নশীল উৎপাদন এই গ্রহের জৈবমণ্ডলকে অর্থাৎ মানুষসহ সমস্ত জীবের জৈবনিক পরিবেশকে পরিবর্তিত অধিকাংশ ক্ষেত্রে দূষিত করছে। বিভিন্ন ধরণের কঠিন, তরল অথবা বায়বীয় বর্জ্য পদার্থের পরিমাণ ব্যবহৃত সম্পদের পরিমাণের সঙ্গে সমানুপাতিক হারে বেড়ে চলেছে। এইসব বর্জ্য পদার্থের মধ্যে যাদের প্রকৃতি সহজে গ্রহণ করতে পারে না তারা ক্রমাগত সঞ্চিত হয়ে পরিবেশকে দূষিত করে চলেছে। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে সংরক্ষণ-সম্মেলনের প্রধান দৃষ্টিভঙ্গী দূষণের ওপর কেন্দ্রীভূত হল কেন ? আসলে সংরক্ষণ মানে তো শুধু জৈব, অজৈব কিছু বস্তুকে সুরক্ষিত করা নয়, সেই সঙ্গে তাদের প্রয়োজনীয় পরিবেশের গুণগত মান বজায় রাখাও বটে। দূষণ পরিবেশের এই গুণগত মানের অবনতি ঘটিয়ে উদ্ভিদ, প্রাণী, অজৈব সম্পদ সব কিছুরই অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তোলে। দূষণকে এড়িয়ে সংরক্ষণের কথা ভাবা তাই অসম্ভব। দূষণ প্রাকৃতিকও হতে পারে কৃত্রিমও হতে পারে ; কিন্তু দুটোই সমানভাবে, বরং মানুষের সৃষ্ট দূষণ আরও ব্যাপকভাবে, জৈবমণ্ডলের ক্ষতি করে। প্রকৃতি-সংরক্ষণবিদ বার্নহার্ড গ্রিমেক প্রাকৃতিক দূষণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত জীবজগতের উদাহরণ দিয়েছেন। পূর্ব আফ্রিকার কিভু পার্কে জীবন্ত আগ্নেয়গিরি থেকে প্রায়শই বিষাক্ত গ্যাস নির্গত হয়। কার্বন ডাই-অক্সাইড জমা হয় নীচু জায়গায় ; বিশেষ করে রাতে কম তাপমাত্রায় বাতাস যখন থেমে যায়, এই গ্যাস আরও ঘন হয়ে জন্তুজানোয়ারের ওপর বিষক্রিয়া শুরু করে। পাখি, বাদুড়েরা পাথরের মত মাটিতে আছড়ে পড়ে। একবার এক জায়গায় 25টা

* 5A. আর. কে. ঘোষাল রোড, কলিকাতা-700042

হাতিকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। গ্রিমেক তাঁর বর্ণনায় জায়গাটাকে 'কংকালের পাহাড় সমেত মৃতের শহর' বলে অভিহিত করেছিলেন। মানুষের সৃষ্ট দূষণ আরও ব্যাপকভাবে সারা পৃথিবীতে ধীরে ধীরে এই মারণযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে। কয়েকটি ছোট ছোট উদাহরণ ব্যাপারটাকে বুঝতে সাহায্য করবে। পূর্ব জার্মানীর লাইপজিগের একটি গ্রামে সার কারখানার কাছে আলুর উৎপাদন 47 শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। নির্গত সালফার-ডাই অক্সাইডের প্রভাবে গাছের প্রোটিনের পরিমাণ এবং আলুতে শর্করার পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। বর্ধিত ওজোন এবং পারঅক্সিঅ্যাসিটাইল নাইট্রেটের প্রভাবে লস এঞ্জেলস উপত্যকার চাষীরা কিছু শাকসব্জীর চাষ বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে। বিশাল বিশাল তেলবাহী ট্যাঙ্কার, সামুদ্রিক তৈলকূপ, উপকূলবর্তী শহরের দূষিত বর্জ্য পদার্থ, প্রভৃতি, সমুদ্রের জলকে ক্রমাগত দূষিত করে সামুদ্রিক প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনকে, সেই সঙ্গে মানুষকেও, বিপন্ন করে তুলেছে। বহু জায়গাতেই মাছ খাওয়ার অযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। ফরাসী সমুদ্রবিজ্ঞানী জ্যাকুইস-ইভস কস্ত্যুর মতে ভূমধ্যসাগরের কোন কোন জায়গায় শুধুমাত্র স্নানই চর্মরোগের সৃষ্টি করতে পারে। ইটালির নেপলস থেকে সার্ডিনিয়া পর্যন্ত উপকূল কলেরার জীবাণু অধ্যুষিত হয়ে পড়েছে। দূষণের আক্রমণে প্রকৃতি আজ ক্ষতবিক্ষত। সুতরাং প্রকৃতি-সংরক্ষণ করতে গেলে দূষণের সঙ্গে লড়াই করতেই হবে। তাই প্রকৃতি-সক্ষংরণের এই দিকটা ক্রমশঃই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে—বিজ্ঞানীরা লড়াই করছেন জল ও বায়ু দূষণের বিরুদ্ধে, চেষ্টা করছেন জীবনের জন্য একটা সুষ্ঠু পরিবেশ মানুষকে উপহার দিতে।

প্রাকৃতিক সম্পদ

যে সামগ্রিক অবস্থার অধীন মানুষের অস্তিত্ব বর্তমান তারই একটা অংশ হল প্রাকৃতিক সম্পদ যা সমাজের বস্তুবাদী ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজনের স্বার্থে উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে প্রধান হল সৌর শক্তি, ভূগর্ভস্থ তাপ, খনিজ পদার্থ, ভূমি, জল, উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ সম্পদ।

প্রকৃতি-সংরক্ষণের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল কতখানি পরিমাণে প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহার করা যাবে। এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে প্রাকৃতিক সম্পদকে সাধারণতঃ ক্ষয়শীল এবং ক্ষয়হীন—এই দুইভাগে ভাগ করা হয়।

ক্ষয়শীল সম্পদ

এর মধ্যে আছে নবীকরণের অযোগ্য খনিজ সম্পদ এবং নবীকরণযোগ্য উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ সম্পদ। তবে, বিবেচনাহীন অধিক ব্যবহার অনেক সময় নবীকরণযোগ্য সম্পদকেও নবীকরণের অযোগ্য করে তোলে। উদাহরণ স্বরূপ, ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলোতে কেটে ফেলা জঙ্গল আজ পুরোপুরি পুনরুদ্ধার অসম্ভব ; নির্বিচার শিকারের ফলে বিলুপ্ত প্রাণিকুলও আর পৃথিবীতে ফিরবে না। ভূগর্ভে খনিজ সম্পদের সঞ্চয় বিরাট, কিন্তু অসীম নয়। ব্যাপক ব্যবহার এই সঞ্চয়কে ক্রমশঃ ক্ষীণ করে চলেছে। কতদিন এই সঞ্চয় থাকবে এ সম্পর্কে নানা মত আছে। কেউ কেউ বলেন, লোহা আছে 250 বছরের মত, তামা আছে 30 বছরের মত, কয়লা চলবে 500 বছর এবং তেল ও গ্যাস 70 বছর। এই হিসেব হয়ত ঠিক নয়, কিন্তু এটাতো ঠিক যে, খনিজ সঞ্চয়ের স্থায়িত্ব সীমিত, চিরায়ত নয়। তাই এখন থেকেই যদি যুক্তিপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে সংরক্ষণের চেষ্টা না করা হয় ভবিষ্যতের মানুষ তাহলে আমাদের ক্ষমা করবে না।

ক্ষয়হীন সম্পদ

মহাজাগতিক শক্তি, আবহাওয়া এবং জল ক্ষয়হীন সম্পদ হিসেবে বিবেচিত। এই শ্রেণীবিন্যাস অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে আপেক্ষিক হয়ে পড়ে ; যেমন ভূপৃষ্ঠের কোন কোন অংশে মিষ্টি জলকে ক্ষয়শীল সম্পদ হিসেবে ধরা যেতে পারে। অবশ্য জলের এই অভাব আঞ্চলিক অথবা দূষণজনিত। সামগ্রিক হিসেবে এই গ্রহের জলসম্পদ নিঃশেষ হওয়া অসম্ভব।

প্রকৃতি সংরক্ষণের লক্ষ্য

প্রকৃতি সংরক্ষণের প্রথম লক্ষ্য হল মানবসমাজ এবং প্রকৃতির মধ্যেকার সম্পর্ক এবং তার কারণ ও ফলাফলকে খুঁজে বার করা। সত্যি কথা বলতে কি, মানুষের কাজের জন্য উদ্ভূত অবাঞ্ছনীয় পরিস্থিতি দূর করার পদ্ধতি খোঁজার থেকেও এটা আরও বেশী কঠিন।

কার্যতঃ, প্রকৃতিকে যারা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যবহার করে, তাদের স্বার্থ কোন না কোনভাবে একসঙ্গে জড়িত থাকে। ফলে, দুর্ভাগ্যবশতঃ, কোন একদিকের পক্ষে উপকারী সংরক্ষণ পদ্ধতি হয়ত অন্যদিকে জাতীয় অর্থ-নীতির পরিপন্থী হয়। একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই, রাশিয়াতে বাসকুনচাক হ্রদে সঞ্চিত রয়েছে প্রচুর সাধারণ লবণ (NaCl) বা খাওয়ার নুন। কিন্তু এই বাসকুন-চাকের নুন শুধুমাত্র গৃহস্থালীর কাজে বা খাদ্যশিল্পে ব্যবহার হয় না ; ব্যবহার হয় ফিশারীতে, রাসায়নিক প্রস্তুতিতে, কাঁচ, কাগজ ও সার শিল্পে। প্রতি বছর যে 4-5 মিলিয়ন টন নুন তুলে আনা হয় তার অধিকাংশই যায় কারিগরী উৎপাদনে। এই বিপুল ব্যবহার বাসকুন-চাক সঞ্চয়কে করে তুলেছে বিপন্ন। এর একমাত্র সমাধান

হল এই সঞ্চয়কে শুধুমাত্র খাওয়ার প্রয়োজনে ব্যবহার করা ; আর শিল্পে খনিজ লবণ ব্যবহার করা। এখন, হ্রদ থেকে সাধারণ লবণ তুলে আনার থেকে খনিজ লবণ আহরণ করা অনেক বেশী খরচসাপেক্ষ। কিন্তু দেশের স্বার্থে, খাওয়ার নুনের সঞ্চয়কে বাঁচিয়ে রাখতে রাশিয়ার অর্থনীতিকে আজ এই বাড়তি খরচের বোঝা বহন করতেই হবে। আসলে মানুষের সামগ্রিক হস্তক্ষেপের ফলে প্রকৃতিতে যে নেতিবাচক ক্রিয়া চলে তাকে আবিষ্কার করে নিষ্ক্রিয় বা দুর্বল করতে পারলেই সংরক্ষণের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

প্রকৃতি সংরক্ষণের প্রধান লক্ষ্যগুলোকে এইভাবে সাজানো যেতে পারে,—

ক) পরিবেশ দূষণ প্রতিহত করা এবং মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষা ;

খ) প্রাকৃতিক সম্পদের বিবেচনাপূর্ণ ব্যবহার ;

গ) বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান, ক্রীড়া-বিনোদন, প্রভৃতির জন্য নির্দিষ্ট বিশেষ অঞ্চলগুলোতে অর্থনৈতিক কার্যকলাপ প্রতিহত করা।

এইসঙ্গে এটাও মনে রাখা দরকার যে, আজকের দিনে প্রকৃতি-সংরক্ষণ শুধু আক্ষরিক অর্থে সংরক্ষণই নয়, পরিবেশের গুণগত উন্নতিসাধনকেও বোঝায়।

প্রকৃতির ব্যবহার ও সংরক্ষণ

অনেক অর্থনীতিবিদ মনে করেন যে, শুধুমাত্র কঠোরভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ এবং শিল্প ও কারিগরী অগ্রগতিকে সীমাবদ্ধ করতে পারলেই পরিবেশের দূষণ এবং অবনতিকে রোধ করা যাবে। কিন্তু সময় ও ইতিহাসের পথ ধরে মানব সমাজের বৃদ্ধি ও উন্নতি ঘটবেই এবং সেই সঙ্গে বেড়ে চলবে শিল্প ও শক্তির খরচ। তাই বাঁচার জন্য কারিগরী অগ্রগতি থামিয়ে দেওয়া চলবে না। পথ খুঁজতে হবে প্রকৃতিকে সংরক্ষণ এবং তাকে যথাযথ ব্যবহারের মধ্যে। প্রকৃতি-সংরক্ষণ এবং তাকে ব্যবহার করা—কখনোই পরস্পরবিরোধী নয়, একই প্রক্রিয়ার দুটো ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত দিকমাত্র। প্রকৃতিকে এই কারণেই সংরক্ষণ করা হয় যাতে তাকে ব্যবহার করা যায়, শুধু লক্ষ্য রাখতে হবে যে, এই ব্যবহার যেন যথাযথ ও বিবেচনাপূর্ণ হয়। প্রথমতঃ, পরিবেশের গুণগত মানকে রক্ষা করা এবং দ্বিতীয়ত, সমতাপূর্ণ আহরণ ও নবীকরণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সম্পদের উৎপাদন তথা সঞ্চয়কে বজায় রাখা—এই দুটো কাজ ঠিকমত হলে তবেই সংরক্ষণ প্রকৃত অর্থে সফল হয়।

প্রকৃতিকে বিবেচকভাবে ব্যবহার করতে গেলে কয়েকটি নীতি আমাদের মনে রাখতে হবে,—

ক) প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার সব সময় পরিবেশের অবস্থা বিবেচনা করে করতে হবে। তা না হলে যে কি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে তার নিদর্শন হয়ে রয়েছে আফ্রিকায় জাম্বেজী নদীর ওপর তৈরি একটা বাঁধ। এটা তৈরি করা হয়েছিল জলসম্পদকে কাজে লাগিয়ে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করার জন্য কিন্তু সেই সঙ্গে এটা সৃষ্টি করেছে কিছু অচিন্ত্যপূর্ব সমস্যা। পরিকল্পনার কর্তাব্যক্তিরা বলেছিলেন,বাঁধ করতে গিয়ে যে চারণভূমি বা কৃষিজমির ক্ষতি হয়েছে তা পুষিয়ে যাবে মাছের উৎপাদনে। কিন্তু আদপেই তা হয় নি, এবং এটা যে হবে না পরিবেশ-বিজ্ঞানীরা জানলেও তাঁদের কাছে কোন মতামত চাওয়া হয় নি। জাম্বেজী হ্রদের বেড়ে যাওয়া তটভূমি হয়ে উঠেছিল সেৎসি মাছির প্রিয় আবাস, ফলস্বরূপ দেখা দিয়েছিল গবাদি পশুর মহামারী। লোকজনের স্থানত্যাগের পর স্বাভাবিক ভাবেই শুরু হয়েছে ভূমিক্ষয় আর অনুপযুক্ত জমি বা অপ্রস্তুত শহরে আশ্রয় নেওয়ার ফলে সৃষ্টি হয়েছে জটিল সামাজিক সমস্যা। বাঁধের থেকে ছাড়া নিয়ন্ত্রিত জলস্রোত সাধারণ বন্যার থেকেও ক্ষতিকর প্রতিপন্ন হয়েছে ; কারণ আগে প্রতি বছরই বন্যার পলি নিম্নভূমিকে উর্বরা করে তুলত। বর্তমানে দামী সার আমদানী করতে হচ্ছে কমে যাওয়া উর্বরাশক্তিকে পুনরুদ্ধারের জন্য, ফলে অর্থনীতিতে চাপ পড়ছে। আরও কত যে সমস্যার সৃষ্টি হবে তা বলতে পারে শুধু ভবিষ্যৎ। অতএব, দেখা যাচ্ছে, পরিবেশের কথা বিবেচনা না করে প্রকৃতির তথা মানুষের উপকারের থেকে অপকার হয়ে যাচ্ছে বেশী।

খ) কোন সম্পদের ব্যবহার যেন অন্য সম্পদের ক্ষতি না করে। এই প্রসঙ্গে একটা সমস্যার কথা বলি। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের উপকূলবর্তী অঞ্চলে, বিশেষ করে সুন্দরবনের নদীতে ও মোহনায় বাগদা চিংড়ির চারা ধরা একটা জনপ্রিয় ও লাভজনক ব্যবসা। বাগদার চারা ধরার সময় বহু মাছের, যেমন ভেটকি, পারসে প্রভৃতির চারাও জালে ধরা পড়ে। এইবার বাগদার চারাগুলো বেছে নেওয়ার পর বাকী মাছের চারাগুলোকে ফেলে দেওয়া হয় শুকনো মাটিতে অথবা বালিতে। এইভাবে বাগদাকে লাভজনকভাবে ব্যবহার করতে গিয়ে অন্য মাছের চারাদের এই নিধনযজ্ঞ যদি চলতেই থাকে এবং কর্তৃপক্ষ যদি অবিলম্বে এ বিষয়ে নজর না দেন, তবে অদূর ভবিষ্যতে মাছের সংখ্যার উল্লেখযোগ্য হ্রাস জাতীয় অর্থনীতির পক্ষে চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। অনুরূপভাবে

গভীর সমুদ্রে ট্রলিং নেটে বেহিসাবী পন্থায় Prawn প্রভৃতি বিশেষ বাছাই মাছ ধরার কালে ব্যাপক হারে অন্যান্য অবাছাই ছোটবড় মাছকে তাচ্ছিল্যভরে ধ্বংস করা হচ্ছে, তাতে তট-সন্নিকটে সহজ লভ্য সাধারন অবাছাই মাছের সমাগম বিপর্যস্ত, উপকূল অঞ্চলে মৎস্যভাব,

গ) ভূ-প্রকৃতির অপব্যবহারে প্রাকৃতিক বিপর্যয় :- প্রকৃতির নিজস্ব ধারায় গড়ে ওঠা বিভিন্ন ধরনের ভূমিখণ্ডে বলপূর্বক তার চরিত্রহানি ঘটালে (Change of land Character) কি ভয়াবহ পরিণাম হতে পারে তার বহু নজীর আছে। কল্লোলিনী ইউফ্রেটিস-টাইগ্রিস-এর স্নেহাঞ্চলে সযত্নে বেড়ে ওঠা তরুণী মেসোপোটেমিয়ার অকাল বার্ধক্য, প্রমত্তা নীল-(নদী)-অববাহিকার যৌবনেই জরা, ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলে শ্যামলী বনানীর সাহারাবক্ষে লীন হয়ে যাওয়া প্রভৃতি ধারাবাহিক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মূলেতো ভূমির স্বভাবিক ধর্মেরউপর মানুষের অদূরদর্শী অত্যাচারের ইতিহাস। একইভাবে আমাদের দেশের পাহাড়ী বনাঞ্চলে কৃষি ও শিল্প বিস্তার করে এবং নিম্নাঞ্চলের স্বাভাবিক জলা জঙ্গল বদ্ধ নদীখাত ভেড়ি প্রভৃতির স্বাভাবিক ধর্ম নষ্ট করে যে নগর সম্প্রসারণ ও বেহিসাবী কৃষি আন্দোলনের হুজুগ চলছে ও তাতে যে প্রকৃতির বিপর্যয় আসছে তার বিষময় পরিণামে কে ঠেকাবে ? পূর্বের স্বাভাবিক জলা বিল বাঁওড় নদীখাতের অপব্যবহারেই এদেশে মাছের আকাল সৃষ্টি হয়েছে। আবার বেশী খাদ্য উৎপাদনের অত্যুৎসাহী কৃষি সম্প্রসারণের ফলে গ্রামাঞ্চলে সাধারণ ঝোপজঙ্গলের ছোট বনাঞ্চল আর নেই, কৃষি-ক্ষেতের সংলগ্ন বা মধ্যে প্রসারিত ছোটবড় আল বাঁধ ও রাস্তা পর্যন্তও কেটে ক্ষেতের সামিল করা, শ্মশান, ভাগাড়, গোচারণস্থান সবই চাষের জমিতে পরিণত—ফাঁকাপতিত ডাঙ্গা জমি বলতে কিছু নেই, ফলে গরু ছাগল পোষার উপায় নেই। দেশে তাই রোগী ও শিশুদের জন্যও দুধ মেলেনা। মাংস ডিমেরও অভাব, কারণ হাঁসমুরগীতে ফসল নষ্ট করে দেবে। এই বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচতে হলে চাষের জমির কিছু অংশ আবার পশুপালনের ভূমিতে এবং স্বাভাবিক জলাকে বারমাস জলভর্তি করে রেখে মাছের উৎপাদনে লাগাতে হবে। নইলে প্রকৃতি তার শোধ নেবেই।

ঘ) এখন নবীকরণযোগ্য সম্পদকে এমনভাবে ব্যবহার করা উচিত যাতে ক্ষতিপুরণের জন্য প্রয়োজনীয় সময়ের অভাব না ঘটে এবং পরিবেশ বজায় থাকে।

বহু প্রাচীনকাল থেকেই চীন এবং তিব্বতে জিনসেং নামে গুল্মের শিকড় অদ্ভুত ভেষজগুণসম্পন্ন হিসেবে স্বীকৃত। বর্তমানে জিনসেং রপ্তানীও হয় এবং বহু ওষুধের উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু যেহেতু জিনসেঙের উৎপাদন সীমিত এবং ব্যবহার যদি বেড়েই চলতে থাকে তবে নবীকরণ দুঃসাধ্য হয়ে পড়বে। তাই কাজ চলতে থাকে পরিবর্ত খোঁজার। খুঁজে পাওয়া যায় ইলিউথেরোকক্কাস (Eleutherococcus) নামে একটি গুল্মের মূল। তাই বর্তমানে জিনসেঙের পরিবর্ত হিসেবে ব্যবহার হয় ইলিউথেরোকক্কাস, আবার তার যোগানেও টান পড়লে ব্যবহৃত হয় লিওনিউরাস (Leo neurus)। সমগুণান্বিত পরিবর্ত ব্যবহারের ফলে একদিকে ওষুধের উপাদানে ঘাটতি হচ্ছে না, অন্যদিকে তিনটি উদ্ভিদই বংশবিস্তারের প্রয়োজনীয় সময় পেয়ে প্রকৃতির ক্ষতিপুরণ করতে পারছে। কিন্তু আমাদের দেশে ভেষজ গাছগুলির উপযুক্ত সংরক্ষণ ও বিস্তারের পরিকল্পিত চেষ্টা আজও নেই।

ঙ) নবীকরণের অযোগ্য সম্পদের ব্যবহার এখন যথাযথ করতে হবে যাতে প্রয়োজনাতিরিক্ত কোন অপচয় না ঘটে। উদাহরণ হিসেবে বাসকুনচাক হ্রদের নুনের কথা তো আগেই বলেছি। এছাড়া বর্তমানে প্রায় প্রতিটি দেশই তেল ও গ্যাসের ব্যবহার সম্বন্ধে সতর্ক হয়ে উঠেছে এবং সৌরশক্তি প্রভৃতি ক্ষয়হীন সম্পদকে বিকল্প হিসেবে ব্যবহারের চেষ্টা চলছে।

বর্তমানে প্রকৃতি-সংরক্ষণের জন্য সব দেশেই নানা রকম আইন করা হচ্ছে। কিন্তু শুধু আইন করে এই সমস্যার সমাধান করা যাবে না। দেশের সাধারণ মানুষকে এই সম্বন্ধে সচেতন করতে হবে। প্রকৃতি-সংরক্ষণের মূলকথাগুলো অধিকাংশ মানুষকে বোঝাতে হবে তবেই দূষণ, ভূমিক্ষয়, প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রভৃতির মত জটিল ও ভয়ঙ্কর সমস্যার সঙ্গে লড়াই করাটাও অনেক সহজ হয়ে যাবে।

প্রাণের উৎস সন্ধানে ধূমকেতু

অশোক কুমার ধাড়া*

ব্রিটেনের দুই জ্যোতির্বিদ ধূমকেতু সম্পর্কীয় গবেষণায় প্রাণ সৃষ্টির ব্যাপারে ধূমকেতুর নিউক্লিয়াসে জৈবঅণুর উপস্থিতির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। উৎকেন্দ্রিক কক্ষপথে সূর্য পরিক্রমণকালে, ধূমকেতুর মধ্যস্থ ঐ জৈব অণু-সকল দীর্ঘকালব্যাপী ক্রমপর্যায়ে তীব্র উষ্ণতা ও হিমশীতলতার সম্মুখীন হয়ে বিশেষ অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। এইভাবে ধূমকেতুর মধ্যে কিছু আদি-জীবের উৎপত্তি সম্ভব। হয়ত এইরূপ কোন ধূমকেতু থেকে পৃথিবীর বুকে প্রাথমিক প্রাণ নেমে আসে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী ধূমকেতুর আবির্ভাব অশুভ হতে পারে; ধূমকেতু থেকে আগত নূতন জীবাণুদের বিরুদ্ধে পৃথিবীতে বসবাসকারী জীব-সকলের প্রতিরোধ-শক্তি ব্যর্থ হলে মহামারী দেখা দিতে পারে।

প্রাচীন ও আধুনিক বহু শাস্ত্রে ধূমকেতুর আবির্ভাবকে অশুভ ইঙ্গিত বলে অভিহিত করা হয়েছে; ধূমকেতু নাকি পৃথিবীতে মহামারী ও মৃত্যু ডেকে আনতে পারে। 1977 খৃস্টাব্দে ব্রিটেনের খ্যাতনামা জ্যোতির্বিদ স্যার হয়েল ও তাঁর সহকর্মী অধ্যাপক উইক্রামসিং (Sir Fred Hoyle and Prof. N. C. Wickramasinghe) ধূমকেতু সম্বন্ধে যে তত্ত্ব দিয়েছেন, তাতে দুটি প্রশ্ন উঠেছে; প্রথমতঃ, প্রাক-জীবন সৃষ্টি কি পৃথিবীতে হয়েছিল এবং দ্বিতীয়তঃ, ধূমকেতু সম্বন্ধে উপরিউক্ত প্রাচীন মতবাদ কি নিতান্ত কুসংস্কার প্রসূত ধারণা? না, এসবের মধ্যে কোন বৈজ্ঞানিক সত্য লুকিয়ে আছে?

স্যার হয়েল ও তাঁর সহকর্মী ধূমকেতু নিয়ে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে, পৃথিবীর বুকে প্রাণ-সৃষ্টি সম্পর্কীয় প্রচলিত মতবাদের (ওপারিন-হলডেন তত্ত্ব) বাইরে কিছু ভিন্নমত প্রকাশ করেছেন। বহুপূর্বেই জানা গেছে, প্রাণ সৃষ্টির জন্য কার্বন (C), হাইড্রোজেন (H), নাইট্রোজেন (N) এবং অক্সিজেন (O)—প্রাথমিকভাবে এই চারটি মৌল প্রয়োজন। ওপারিন-তত্ত্ব অনুযায়ী কিছু সরল অজৈব যৌগ যেমন, জল (H_2O), অ্যামোনিয়া (NH_3), মিথেন (CH_4) আদি পৃথিবীর বুকে, উচ্চ তাপমাত্রায় এবং হাইড্রোজেন-প্রধান বিজারণ-ক্ষম (Reducing) পরিবেশে, রূপান্তরিত হয়ে প্রাণসৃষ্টির আদি জৈবঅণু সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু হয়েল ও তাঁর সহকর্মীদের বক্তব্য হলো যে, জ্যোতির্বিদ্যা ও ভূতত্ত্ববিদ্যা থেকে নির্দিষ্টভাবে প্রমাণ করা যায় না যে, আদি পৃথিবীর পরিবেশে হাইড্রোজেনই প্রধান ছিল। তাঁরা বলেন যে, প্রাণ সৃষ্টির আদি জৈব উপাদান পৃথিবীতে সৃষ্টি হয়নি; ধূমকেতুর বুকে সৃষ্ট ঐ উপাদান পৃথিবীতে নেমে আসে ধূমকেতুর ভগ্নাবশেষের মাধ্যমে।

* বৌবাজার, পোঃ খলিসানী, হুগলী।

ধূমকেতুর গঠন সম্পর্কে আলোচনা করলে দেখা যায় তার গঠনটি ঝাঁটার মত, একটি গোলাকার মাথা
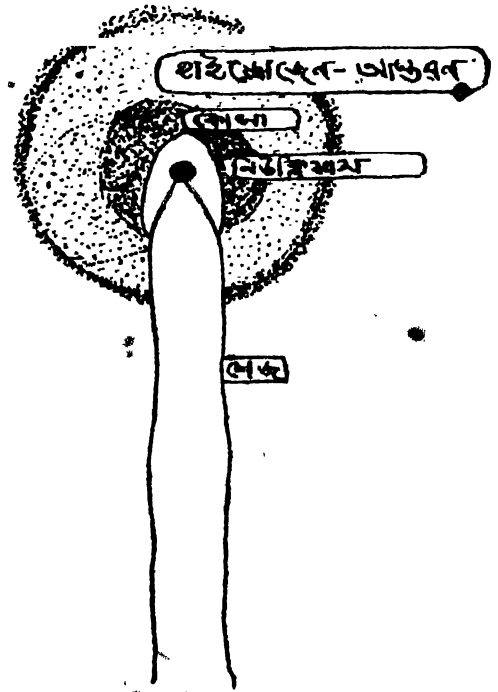
1নং চিত্র

(নিউক্লিয়াস ও কোমা) এবং একটি লেজ আছে। (1নং চিত্র)নিউক্লিয়াসের ব্যাসার্ধ প্রায় 2....3 কি. মি. বা তারও বেশী এবং তার মধ্যে CH_3CN (মিথাইল সায়ানাইড), HCN (হাইড্রোজেন-সায়ানাইড) প্রভৃতি জৈব যৌগের সন্ধান পাওয়া যায়। CO^+, CO_2^+ N_2^+, C_2, C_3, OH, CH, CH_2, NH, NH_2, CN

এবং H_2O^+ এই ধরণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু ও অজৈব মূলকের সন্ধান ধূমকেতুর কোমা ও লেজ অংশে পাওয়া যায়। এ'ছাড়া ধূমকেতুর লেজে পলিফরম্যালডিহাইড ও পলিস্যাকারাইড-এর উপস্থিতি সম্পর্কেও পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় স্যার। হয়েল-এর মতানুযায়ী, জটিল জৈব অণু ও জৈব মূলক সমন্বিত মহাশূন্যের আন্তঃনাক্ষত্রিক পরিবেশ (Intrastellar medium) থেকে সৌরমণ্ডল সৃষ্টি হবার সময় বেশ কিছু জৈব-অণু ধূমকেতুর নিউক্লিয়াসে চলে আসে। ধূমকেতুর কক্ষপথ তীব্র উৎকেন্দ্রিক (Eccentric) হওয়ায় (2নং চিত্র) তা মাঝে মাঝে সূর্যের অতি নিকটে চলে আসে এবং পরে সূর্য থেকে বহুদূরে চলে যায়। সূর্যের নিকটে আসার সময় তাপ বৃদ্ধি হেতু ধূমকেতুর নিউক্লিয়াস মধ্যস্থ উদ্বায়ী পদার্থ
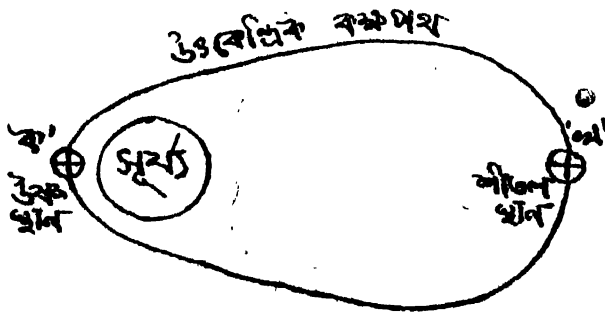
ধূমকেতুর অবস্থান, ক—সূর্যের অতি নিকটে, খ—সূর্য থেকে দূরে

বাইরের দিকে ছড়িয়ে পড়তে চেষ্টা করে; আবার সূর্য থেকে দূরে চলে যাবার সময় যখন তাপমাত্রা খুব কমে যায় এবং ঐ পদার্থগুলি হিমশীতল অবস্থায় তীব্র ঘনীভূত হয়। এইভাবে উষ্ণ-শীতল চক্র বার-বার অনুষ্ঠিত হওয়ায় ধূমকেতুর নিউক্লিয়াসের মধ্যে কেবলমাত্র সেই পদার্থগুলি থাকে যেগুলি 300°K—100°K তাপমাত্রায় নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে। সূর্যের খুব নিকটে আসার সময় সূর্যের আলোকের প্রভাবে ধূমকেতুর নিউক্লিয়াসের মধ্যে প্রাণ-সৃষ্টির আদি জৈব উপাদান তৈরি হয়; সূর্য থেকে দূরে যাবার সময় ঐ সকল জৈব-পদার্থগুলি ঘনীভূত হয় এবং পুনরায় সূর্যের নিকটে আসার সময় জৈব পদার্থগুলি পুনঃরূপান্তরিত হয়। এইভাবে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বছর ধরে ক্রমান্বয়ে এই প্রক্রিয়া চলার ফলে ধীরে ধীরে ধূমকেতুর মধ্যে কিছু আদি জীবের (সালোক-সংশ্লেষকারী ও তাপ-সহ্যকারী ব্যাকটেরিয়াদির) উদ্ভব হয়। সম্ভবতঃ চার-শ' কোটি বছর পূর্বে এই ধরণের আদি জীব ধারণকারী কোন ধূমকেতু থেকে, ভগ্নাবশেষের মাধ্যমে, পৃথিবীতে জীবনের সূত্রপাত ঘটেছিল।

অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক অবশ্য হয়েল-এর এই তত্ত্ব মানতে রাজী নন। তাঁরা এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে যে জোরালো যুক্তি দাঁড় করিয়েছেন তাহলো, প্রতিটি জীবের মধ্যে অন্ততঃ 50% প্রোটিন থাকে; সুতরাং আন্তঃনাক্ষত্রিক পরিবেশে প্রাক্‌জীবন সৃষ্টি হলে সেখানে প্রোটিনের উপস্থিতি প্রয়োজন। কিন্তু আন্তঃনাক্ষত্রিক পরিবেশে বা ধূমকেতুর মধ্যে প্রোটিনের সন্ধান পাওয়া যায়নি। অতএব সেখানে জীবন-সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব। সম্প্রতি আমেরিকার কৃত্রিম উপগ্রহ 'এক্সপ্লোরার' (Explorer) পৃথিবীতে যে তথ্য পাঠিয়েছে, তাতে আন্তঃনাক্ষত্রিক পরিবেশে যথেষ্ট প্রোটিনের উপস্থিতি ভাবা হচ্ছে। প্রোটিনের ধর্ম হলো, অতিবেগুনী রশ্মি (U-V ray) কিয়দংশে শোষণ করতে পারা।

দূরবর্তী নক্ষত্র থেকে আগত আলোকরশ্মি গ্রহণ করে 'এক্সপ্লোরার' সম্প্রতি যে চিত্র পাঠিয়েছে, তার বর্ণালী বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে, তাতে অতি-বেগুনী রশ্মির পরিমাণ আশানুরূপ নয়, অনেক কম। এই ঘটনা আন্তঃনাক্ষত্রিক পরিবেশে প্রোটিন কণার অস্তিত্ব প্রমাণ করে। এক্সপ্লোরার থেকে প্রাপ্ত তথ্য হয়েল-এর মতবাদকে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারছে না।

হয়েল-এর মতানুযায়ী ধূমকেতুতে যদি ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস জাতীয় কোন প্রাণের উৎস থাকে তবে পৃথিবীর নিকটে কোন ধূমকেতুর আবির্ভাব হলে সেই ধূমকেতু থেকে পৃথিবীতে সংক্রামক ব্যাধি ছড়িয়ে পড়তে পারে। সেই মতানুযায়ী, 1918-1919 খৃস্টাব্দে সমগ্র পৃথিবী জুড়ে ইনফ্লুয়েঞ্জার এবং 429 B. C.তে এথেন্সে প্লেগ্‌-এর প্রাদুর্ভাব-এর সঙ্গে ধূমকেতু থেকে জীবণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্পর্ক ছিল কিনা ভাবা দরকার। কারণ ঐ সময় মহামারী সৃষ্টিকারী রোগের ব্যাপক জীবাণুর উৎপত্তি সম্পর্কে কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় নি। তাঁরা প্রস্তাব দিয়েছেন, ভবিষ্যতে ধূমকেতু থেকে যাতে এই ধরনের ক্ষতিকর মহামারী জীবাণুর প্রাদুর্ভাব না দেখা দেয়, তার জন্য বায়ুমণ্ডলের স্ট্রাটোস্ফিয়ার-এর বিভিন্ন জীবাণুর গুণগত ও সংখ্যাগত পরিবর্তন সম্বন্ধে দৃষ্টি রাখা উচিত। 1986 খৃস্টাব্দ এক গুরুত্বপূর্ণ সময়, কারণ পৃথিবী পুনরায় হ্যালীর ধূমকেতুর মুখোমুখী হবে। এখন থেকে সমগ্র পৃথিবী জুড়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। হয়তো এবারের অনুসন্ধানে ধূমকেতুর অবগুণ্ঠন খুলে যাবে; আমরা বুঝতে পারবো, সত্যই ধূমকেতু গ্রহে গ্রহে জীবনের বীজ বপন করে বেড়ায় কিনা।

জাপানে প্রতিবেশ দূষণ ও প্রতিরোধ

অমরবিকাশ ঘোষ

সূচনা

অতীতের কুহেলী সমাচ্ছন্ন অধ্যায়ে নিহিত ঐতিহ্যের উপর বর্তমান জাপানের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। বর্তমান জাপান পৃথিবীর মধ্যে দ্রুত পরিবর্তনশীল দেশ। 378 হাজার বর্গ কিলোমিটার ভূখণ্ডে কৃষিজমি, বসতজমি, নদী, পথঘাট ইত্যাদি মিলিয়ে মোট সমতল ভূমির আয়তন মূল ভূখণ্ডের 30 শতাংশমাত্র এবং প্রায় 11 কোটি 40 লক্ষ লোকের বসবাস। দ্রুত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য গত তিনদশকে জনসমষ্টি ও কোলাহলমুখর শিল্পগত কার্যকলাপ প্রধানত বৃহৎ নগরগুলিতেই কেন্দ্রীভূত হয়েছে। এর ফল দাঁড়িয়েছে প্রতিবেশের মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতি, জলবায়ু দূষণ ও প্রকৃতির ধ্বংস।

পরিবেশগত নিরাপত্তা

দ্রুত অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও শিল্প সংগঠনের প্রসারে জাপানের শিল্পকাঠামো অকমিউনিস্ট পৃথিবীতে দ্বিতীয় বৃহত্তম। ফলস্বরূপ, হালকা শিল্পগুলি থেকে ভারী ও রসায়নভিত্তিক শিল্পতে স্থানান্তর। এছাড়া মোটর গাড়ির ব্যবহার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় জীবনযাত্রা প্রণালী ভীষণভাবে পালটে গেছে। এর জন্য বর্তমান জাপানে পরিবেশগত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

আজ তাই জাপানের জনগণ ও সরকার আবাস পরিবেশ ও স্বাস্থ্যপরিবেশ রক্ষার আবশ্যকতা উপলব্ধি করে, আগের কিছু অদূরদর্শিতা সম্পর্কে সতর্ক হয়ে, ভবিষ্যত দূষণ সম্ভাবনার প্রতিরোধ করে, একটি উন্নততর জীবন-প্রতিবেশ রচনায় সচেষ্ট হয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ, কারখানার বর্জ্যনীয় গ্যাসগুলির সঙ্গে নির্গত সালফার অক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড ও কার্বন অক্সাইড নিঃসরণের উপর কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করায় বায়ুমণ্ডলে যেমন সালফার অক্সাইডের পরিমাণ লক্ষণীয় ভাবে কমে এসেছে তেমনি ফটোরাসায়নিক ধোঁয়াশাজনিত রোগের প্রকোপও উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পেয়েছে। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে দূষণপ্রবণ নগরাঞ্চলের 26টি কেন্দ্রে 1967 খৃস্টাব্দে বাতাসে সালফার-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ ছিল 0·06 পি, পি, এম এবং 1975 খৃস্টাব্দে তা কমে দাঁড়িয়েছে 0·02 পি. পি. এম। এছাড়া মোটর গাড়ীর এগ্‌জস্ট থেকে বেরিয়ে আসা ধোঁয়ার উপরও কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

বিধিপ্রণয়ন ও দূষণ নিরোধক নানা ব্যবস্থা

জাপানের শিল্প ইতিহাসের গোড়া থেকেই খনি সম্পর্কিত ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণের একাধিক আইন ছিল। কিন্তু 1967 খৃস্টাব্দে পরিবেশদূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য মৌলিক বিধি রচনা করে তার আওতায় আনা হয় ব্যাপকভাবে জুড়ে থাকা দূষণ সৃষ্টিকারী উৎসগুলিকে। পরে মৌলিক বিধিগুলিকে আরও সুদৃঢ় করার জন্য ব্যাপকভাবে বিশ্লেষিত আইন প্রণয়ন করা হয়। তার মধ্যে আছে 1968 খৃস্টাব্দে বায়ুদূষণ প্রতিরোধকবিধি, 1970 খৃস্টাব্দে জলদূষণ, আবর্জনা অপসারণ ও পরিষ্করণ বিধি, সমুদ্রদূষণ নিরোধক বিধি, কৃষিজমির মৃত্তিকা দূষণ প্রতিরোধক বিধি, 1971 এ কটুগন্ধ নিয়ন্ত্রণ বিধি ও 1972 খৃস্টাব্দে প্রকৃতি সংরক্ষণ বিধি।

দূষণের কুপ্রভাবে শারীরিক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ও অন্যান্য ক্ষতি পূরণের কথা মনে রেখে, পরিবেশ দূষণের নানা অভিযোগ ফয়সলা করার উদ্দেশ্য, 1970 খৃস্টাব্দে মানব স্বাস্থ্য হানিকর পরিবেশ দূষণ অপরাধের আইন ও দূষণ সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি আইন চালু করা হয়। এর ফলে কলকারখানায় জনস্বাস্থ্য ক্ষতিকারক বিপজ্জনক পদার্থ বাইরে নিঃসরণ করার শাস্তি সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। এই আইন বলে শুধুমাত্র প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ব্যক্তিরই শাস্তি হয় না, সেই ব্যক্তির নিয়োগকর্তা বা উক্ত প্রতিষ্ঠান সমান ভাবে শাস্তি ভোগ করেন।

1972 খৃস্টাব্দে প্রকৃতি সংরক্ষণ আইনবলে অরণ্য-ভূভাগ সংরক্ষণ, প্রমোদ বিনোদনের জন্য উন্মুক্ত প্রান্তর, নগরাঞ্চলে সবুজ মেখলা প্রমোদ উদ্যানের উৎকর্ষ বিধান ও রক্ষণাবেক্ষণের উপর কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলে আজ জাপানের প্রতিটি ছোট-বড় শহর ও গ্রামাঞ্চলে সুদূর প্রসারী সবুজের সমারোহ দেখা যায়।

1971 খৃস্টাব্দে কেন্দ্রীয় প্রশাসন প্রকৃতি পরিবেশ রক্ষার্থে ও দূষণ দূরীকরণের উদ্দেশ্যে একটি "ENVIRONMENT AGENCY"র প্রতিষ্ঠা করেন ও স্থানীয় শাসন অধিকারগুলিকেও নিজ নিজ এলাকায় দূষণ প্রতিরোধ ও নিরোধের জন্য উক্ত এজেন্সির আওতায় আনা হয় এবং এলাকাভিত্তিক প্রশাসন সংস্থা গঠন করারও অনুমতি দেওয়া হয়। সরকার বায়ু, শব্দ ও জলদূষণের বিস্তীর্ণ এলাকা নিজ অধিকারে এনে প্রশাসনিক লক্ষ্য হিসাবে

পরিবেশগত মানদণ্ড নির্ধারণ করেন। এই প্রশাসনিক নির্দেশের সঙ্গে ধোঁয়া নির্গমন, নর্দমাবাহী নোংরা ইত্যাদির উপর মান আরোপ করায় বর্তমানে তা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে। কোন ভাবে এইসব মান অমান্য করলে শাস্তি দানের ব্যবস্থা আছে।

1973 খৃস্টাব্দে দূষণজনিত স্বাস্থ্যহানির ক্ষতিপূরণ বিধি প্রণীত হওয়ায় মানব শরীরে দূষণ প্রতিক্রিয়াজনিত বিপদ থেকে রক্ষার জন্য গৃহীত নানা আইনগত ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করা হয়েছে। এর ফলে দূষণজনিত ব্যধিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সরকার নির্দেশিত হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছে এবং চিকিৎসা ব্যয় ও ক্ষতিপূরণ, দূষণ কারী রূপে চিহ্নিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে আদায়ের ভারও সরকার নিয়েছেন।

দূষণকারী রূপে সন্দেহ ভাজন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ও ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে বিরোধ যদি দু-পক্ষ সরাসরি মিটিয়ে না ফেলতে পারেন তবে সরকারী সালিশী বা মীমাংসার জন্য প্রশাসনিক সূত্রে, না হয় মোকদ্দমার আইনগত পথে দুই বিবদমান পক্ষকে এগিয়ে যেতে হয়। এই ক্রমবর্ধমান সমস্যা সমাধানের জন্য 1974 খৃস্টাব্দে স্বাস্থ্যহানি ক্ষতিপূরণ প্রকল্প অনুসারে সরকার দূষণ অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে আদায়ীকৃত জরিমানা ও সারচার্জের অর্থ দিয়ে একটি বিশেষ অর্থ-ভাণ্ডার গঠন করেছেন। এই অর্থভাণ্ডার থেকে ক্ষতি-গ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ ও মামলামোকদ্দমার ব্যয় বহন করা হয়।

জীবদেহে রাইবোসোমের ভূমিকা

সমীরণ মহাপাত্র *

জীবেরদেহ কোষ দিয়ে গঠিত। জীবদেহের জৈবনিক ও শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়াগুলির জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় খাদ্য, উৎসেচক ও হরমোন কোষে উৎপন্ন হয়। খাদ্য সংশ্লেষণ হয় বিপাকের মাধ্যমে। শক্তির রূপান্তর, শুষ্ক ওজন বৃদ্ধি অথবা হ্রাস ইত্যাদি বিপাকের মাধ্যমেই ঘটে। প্রোটিন-বিপাক এরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিপাক। প্রোটিন শুধু খাদ্য উপাদান নয় উৎসেচকেরও উপাদান। প্রোটিন বিপাকে অ্যামিনো অ্যাসিডও উৎপন্ন হয়। অ্যামিনো অ্যাসিড অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক পদার্থ। নিউক্লীয়াসের ক্রোমোজোমের DNA ও RNA সংশ্লেষণে অ্যামিনো অ্যাসিড প্রয়োজন। উপরিউক্ত প্রোটিন বিপাক ঘটে কোষের সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত রাইবোসোমে। রাইবোসোম হচ্ছে প্লাস্টিড, গল্গিবস্তু কিংবা মাইটোকণ্ড্রিয়ানের মত প্রোটোপ্লাজমিয়ান অঙ্গাণু।

রাইবোসোমে প্রোটিন বিপাক নিয়ন্ত্রিত হয় নিউক্লিয়াস থেকে আগত ট্রান্সফার RNA-এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত উৎসেচক উৎপাদনের মাধ্যমে। রাইবোসোম উদ্ভিদ কোষ ও প্রাণী কোষেথাকে। এই দু'ধরণের কোষ ইউকেরিওটিক কোষ। আর প্রো-ক্যারিওস্টিক কোষগুলি হল ব্যাকটিরিয়া অ্যাকটিনোমাইসেটিস, রিকেটসি ইত্যাদি।

রাইবোসোমের বিভিন্নতা নির্ধারণ করা হয় তার সেডিমেন্ট কো-এফিসিয়েন্ট-এর দ্বারা—যা 'S' দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। রাইবোসোমের বিভিন্নতা থাকে এবং কতগুলি উপ-উপাদান থাকে। সেগুলির বিভিন্ন সেডিমেন্ট কো-এফিসিয়েন্ট থাকে ও আণবিক ওজন থাকে। এগুলি সামগ্রিকভাবে প্রোটিন বিপাকে অংশ গ্রহণ করে। প্রোক্যারিওটিক কোষে যদি কোন রাইবোসোমের সেডিমেন্ট কো-এফিসিয়েন্ট 60S হয় তাহলে তার উপ-উপাদানের সেডিমেন্ট কো-এফিসিয়েন্ট হবে 30S ও আণবিক ওজন ·55 মিলিয়ন ডাল্টন, 40S ও 1·07 মিলিয়ন ডালটন। প্রথম উপ-উপাদানটিতে প্রোটিন 21 স্ট্রেন ও RNA 16S, দ্বিতীয় উপ-উপাদানটিতে প্রোটিন 34 স্ট্রেন ও RNA 23S। ইউক্যারিওটিক কোষের সেডিমেন্ট কো-এফিসিয়েন্ট যদি 80S হয় তাহলে তার উপ-উপাদান দুটির সেডিমেন্ট কো-এফিসিয়েন্ট হয় 40S ও 60S। প্রথমটির RNA-এর সেডিমেন্ট কো-এফিসিয়েন্ট 18S, আণবিক ওজন 0·75 মিলিয়ন ডালটন ও প্রোটিন স্ট্রেন আছে। দ্বিতীয়টি RNA-এর সেডিমেন্ট কো-এফিসিয়েন্ট 28S, আণবিক ওজন 1·75 মিলিয়ন ডালটন ও প্রোটিন

* নিমতলা বক্রেশ্বর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়

প্রোটিন আছে। ইউক্যারিওটিক কোষের রাইবোসোমের ওজনের তুলনায় এর উপ-উপাদানগুলি আণবিকর ওজন সব সময় বেশী হয়।

রাইবোসোমের বিভিন্নতা ও বৈশিষ্ট্য পরীক্ষা করা হয়েছে এসচেরেসিয়া কোলি ব্যাকটিরিয়ার রাইবোসোম নিয়ে। এই ব্যাকটিরিয়ার উপাদান, RNA 40% ও প্রোটিন 60% রাইবোসোমকে রাসায়নিক ভাবে RNP বা রাইবোনিউক্লিও প্রোটিন পদার্থ বলা হয়।

ভবিষ্যতে রাইবোসোমের গঠন বৈচিত্র্য ও উৎসেচক নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে গবেষণা হবে যার ফলে অ্যামিনো অ্যাসিডের বিভিন্ন যৌগ উৎপন্ন করা সম্ভব হবে।

সংক্রামক যকৃৎপ্রদাহ ও জণ্ডিস

[ইনফেক্‌টিভ হেপাটাইটিস]

গুণধর বর্ধন *

কলিকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা এবং সম্ভবত সমস্ত বাংলাভাষাভাষী মানুষ এখন ভাইরাস হেপাটাইটিস কথাটি বা ঐ নামের রোগটির সঙ্গে অথবা বলা যেতে পারে ঐ নামের একটি আতঙ্কের সঙ্গে এখন কমবেশী পরিচিত। কারণ এই নিয়ে এ রাজ্যের প্রায় সবকয়টি লব্ধপ্রতিষ্ঠ বহুল প্রচারিত দৈনিক ও সাময়িক পত্র-পত্রিকা-সহ রেডিও টেলিভিশন প্রভৃতি শক্তিশালী প্রচার ও যোগাযোগ মাধ্যমগুলি সচিত্র নানা উদাহরণ ও হৃদয়গ্রাহী বিচিত্র ছবি সহযোগে এই রোগের যে ত্রাসসঞ্চারী বিবরণ, আলোচনা, সরকারী ও বেসরকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ও কর্তৃত্বপদে অধিষ্ঠিত বিশেষজ্ঞগণের বক্তব্য, মন্তব্য, কথোপকথন প্রভৃতি যেভাবে সবার সামনে তুলে ধরেছেন তা সুনিশ্চিতভাবে বৃহত্তম জনমানসে গভীর রেখাপাত করতে সক্ষম হয়েছে। তবে তাতে ঐ রোগ সম্পর্কে এদেশের বৃহত্তর জনমনে কতখানি বিজ্ঞান সম্মত চিন্তাধারা অর্থাৎ অযথা আতঙ্কিত না হয়ে সমস্যা সমাধানে কিভাবে এগোন উচিৎ তার উপযোগী জ্ঞান ও চেতনা সৃষ্টি হয়েছে কিনা—সেই প্রশ্নটি বেশ বড় আকারেই আমাদের সামনে রয়েছে। সেই কথা আলোচনার আগে ঐ রোগটি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি কথা সাধারণভাবেই সবার জানা দরকার।

ভাইরাস হেপাটাইটিস নামটি থেকেই বোঝা যাচ্ছে রোগটি ভাইরাসঘটিত। গ্রীক শব্দ হেপার (Hepar) মানে লিভার—(Liver) বাংলায় যকৃৎ। চিকিৎসাশাস্ত্রে শরীরের কোন অঙ্গ বা যন্ত্রাংশের নামের শেষে—itis শব্দাংশ প্রত্যয় হিসাবে যোগ করলে সেই অঙ্গের বা অংশের প্রদাহ (Inflamation) বোঝায়। যেমন টনসিলের প্রদাহ হলে বলে টনসিলাইটিস। তেমনি Hepar-এ প্রদাহকে Hepatitis অর্থাৎ যকৃতের প্রদাহ বোঝায়। আর ভাইরাস রোগ মাত্রই কমবেশী সংক্রামক, একজনের কোন ভাইরাসরোগ হলে তার সংসর্গে আসা অন্য ব্যক্তিতে, একস্থান থেকে অন্য স্থানে সেই রোগ বিভিন্ন মাধ্যমে দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে। (অবশ্য ভাইরাসছাড়া অন্য রোগ-জীবাণু দিয়েও এমন হতে পারে—যেমন কলেরা)। এইরকম দ্রুত ছড়িয়ে পড়া রোগকে বলে সংক্রামক ব্যাধি (Infectious disease)। হেপাটাইটিস ভাইরাস তাই করে। সেইজন্য একে সংক্রামক রোগ বলে। কোন রোগ হঠাৎ বিস্তৃত এলাকায় ব্যাপকভাবে সংক্রামক হয়ে দেখা দিলে তাকে বলে এপিডেমিক (Epidemic) বা মহামারী। বহুলোক এতে মারা যায়। এই সময় সেই রোগের প্রকোপ বা তীব্রতা খুবই বেশী থাকে। আবার সময়ে সময়ে বড় বিস্তৃত এলাকায় ব্যাপক না হয়ে স্থানীয় কিছু অঞ্চলের মধ্যে কিছুটা কম তীব্রতায় সংক্রামক হয়ে দেখা দিলে সেই অবস্থাকে এপিডেমিক না বলে এনডেমিক (Endemic) বলা হয়। ভাইরাস হেপাটাইটিস আমাদের দেশে সাধারণতঃ এনডেমিক আকারেই দেখা দেয়। তবে মাঝে মাঝে এর এপিডেমিকও হয়। 1955-56 খৃস্টাব্দে

* জিতেন্দ্র নারায়ণ রায় শিশু হাসপাতাল রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা 700006

দিল্লীতে পানীয় জল দূষিত হয়ে ভাইরাস হেপাটাইটিস সাংঘাতিক এপিডেমিক হয়ে দেখা দিয়েছিল। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে 40,000 এর বেশী লোক ভয়াবহভাবে আক্রান্ত হয়েছিল।

হেপাটাইটিস ভাইরাসের সাধারণভাবে দুটি গ্রুপ বা পৃথক জাত আছে। একটিকে বলে Type-A, অন্যটি Type-B, 1973 খৃস্টাব্দে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) এক্সপার্ট কমিটির প্রস্তাবক্রমেই এই ভাইরাসের পৃথক পৃথক সংক্রমণধারা ভিত্তি করেই তাদের আক্রমণে সৃষ্ট অসুখকে দুটি পৃথক নামকরণ করা হয়—(1) ভাইরাস হেপাটাইটিস টাইপ-এ এবং (2) ভাইরাস হেপাটাইটিস টাইপ-বি ; যদিও উভয় জাতের ভাইরাস আক্রমণে রোগের লক্ষণগুলি প্রায় একই হয়,—ল্যাবরেটরী পরীক্ষা ছাড়া বাইরের দিক থেকে রোগী দেখে (clinically) তাদের পৃথক করা যায় না। এখন অবশ্য এই ভাইরাস গোষ্ঠীর অ্যান্টিজেনিক ধর্মকে উন্নত পদ্ধতিতে নিখুঁতভাবে নির্ণয় করার কৌশল আয়ত্তের ফলে দেখা গেছে ঐ দুটি গ্রুপ ছাড়া আরও কয়েক জাতের ভাইরাস অনরূপ হেপাটাইটিস রোগ সৃষ্টি করে। তাদের বলা হয় নন-এ (Non-A) ও নন-বি (Non-B) হেপাটাইটিস ভাইরাস। উপরিউক্ত টাইপ-এ হোপাটাইটিস ভাইরাস আক্রমণকেই আগে ইনফেক্টিভ হেপাটাইটিস বা এপিডেমিক জণ্ডিস রোগ বলা হত ।

রোগ সৃষ্টিকারী যে কোন জীবাণু বা ভাইরাস কোন শরীরে প্রবেশ করলে সেই জীবাণু ও ভাইরাসের দেহ থেকে বা তাদের দেহের কোন বিশেষ অংশ থেকে বিভিন্ন রকমের বিষ (Toxin) নির্গত হয়, আর সেই বিষক্রিয়ার ফলেই শরীরে বিভিন্ন উপসর্গ ও রোগ লক্ষণ প্রকাশ পায়। জীবাণু বা ভাইরাসদের এই বিষ সৃষ্টিকারী দেহাংশ বা গোটা দেহটাকেই অ্যান্টিজেন (Antigen) বলে। ঐ আক্রমণ-কারী অ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধে তখন আক্রান্ত শরীরে নির্দিষ্ট প্রতিরোধ ক্ষমতা বা প্রতিষেধক তৈরি হয়। ঐ প্রতিষেধক বা অনাক্রম্যতা উপাদানকে বলা হয় অ্যান্টিবডি (Anti-body)। যেকোন অ্যান্টিজেনের বা বিষক্রিয়ার বিরুদ্ধে যথাসম্ভব নির্দিষ্ট বিশেষ অ্যান্টিবডি তৈরি করাই শরীরের প্রকৃতিগত বিশেষ ধর্ম এবং এই ধর্ম বা ক্ষমতাবলেই শরীর স্বনিয়ন্ত্রিতভাবে যে কোন রোগের বা বিষক্রিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে। সেই লড়াইতে শরীর ঐ আগ্রাসীজীবাণু বা ভাইরাসদের প্রথমে পূর্বসঞ্চিত শক্তি দিয়েই প্রতিহত করতে চেষ্টা করে এবং পরে ঐ বিষের চরিত্র জেনে নিয়েই তারই উপযোগী নির্দিষ্ট বা বিশেষ অ্যান্টিবডি তৈরি করেই তাদের ধ্বংস বা সম্পূর্ণ সংযত করতে সমর্থ হয়। অন্যথায় শরীর বা তার বিশেষ আক্রান্ত অংশই বিনষ্ট হয়। যে কোন বহিরাগত বা অবাঞ্ছিত বিষাক্ত পদার্থের বিরুদ্ধেই শরীর এই সহজাত স্বয়ংক্রিয় শক্তিতে তার আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা সমূহের দ্বারা এই প্রতিষেধক বা প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলে। এরই অপর নাম অনাক্রম্যতা শক্তি বা ইমুউনিটি। এইখানে একটি কথা স্মরণীয় যে আগ্রাসী জীবাণু বা বিষক্রিয়ার বিরুদ্ধে শরীরে নিজস্ব প্রতিষেধক শক্তি পূর্ব থেকেই কিছুমাত্রায় না থাকলে এবং পরে যথাযথ অ্যান্টিবডি তৈরি করতে না পারলে বাইরে থেকে জীবাণুনাশক কোন ঔষধ দিয়েই রোগের ধ্বংসাত্মক প্রক্রিয়াকে পরিপূর্ণ ঠেকান যায় না। ভাইরাস আক্রমণের ক্ষেত্রে একথা বেশী করেই প্রযোজ্য। কারণ ভাইরাসকে প্রত্যক্ষভাবে ধ্বংসকারী কোন ঔষধই এখন আমাদের হাতে নেই। আর প্রত্যক্ষ জীবাণুনাশক ঔষধগুলি (যেমন অ্যান্টিবায়োটিকস ও বিশেষ কেমোথেরাপি) প্রাথমিকভাবে উগ্রজীবাণুদের কিছুটা ধ্বংস করে তাদের যৌথ আক্রমণের তীব্রতাকে সাময়িকভাবে দমিত করে মাত্র, না হলে জীবাণুদের সেই প্রাথমিক তীব্র আক্রমণে শরীরের বিশেষ কলা (Tissue) বা অঙ্গ ঐ প্রথম চোটেই কাবু ও ধ্বংস হয়ে যেত, তার পরবর্তী প্রতিরোধ গড়ে তোলার ক্ষমতা আর সহজ হত না। এই খানেই অ্যান্টিবাওটিক্স ও কেমোথেরাপির গুরুত্ব। আর অন্যান্য লাক্ষণিক চিকিৎসার ঔষধগুলি আক্রান্ত বা আক্লিষ্ট কোষকলা ও অঙ্গকে উপযুক্ত রসদ যুগিয়ে বা প্রয়োজনীয় উদ্দীপনা দিয়ে সবল সতেজ করে বা যন্ত্রণাকর অবস্থা থেকে তাদের আত্মরক্ষায় সাহায্য করে ফলে তারা ক্লান্ত অবসন্ন হয়েও নবপ্রেরণায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেয়। এরই নাম সহায়ক বা সাপোর্টিভ (Supportive) থেরাপি। আবার ভাইরাসদের আক্রমণকালে অথবা বিপাকীয় বৈকল্যে (Metabolic disorder) বিশৃঙ্খল শারীরবৃত্তীয় পরিস্থিতিতে অনুগ্র কোন জীবাণুও যদি শরীরে প্রবেশ করে তবে তাদের বৃদ্ধি ও নাশকতা শক্তি ভাইরাসদের আগ্রাসী শক্তিকে উগ্রতর করার সাহায্য করে অথবা বিপাকীয় বৈকল্যকে আরও বাড়িয়ে শরীরবৃত্তীয় কর্মধারাকে বিপর্যস্ত করে তোলে, তাই এই সব ক্ষেত্রেও ঐ জীবাণুনাশক ঔষধ প্রয়োগের গুরুত্ব রয়েছে যাতে পরোক্ষে ভাইরাসদের শক্তি প্রতিহত হয়। একে অনেক সময় অ্যাডজুভেন্ট থেরাপি (Adjuvant Therapy) বলা হয়। এই সব কথা মনে রেখেই ভাইরাস হেপাটাইটিসের প্রকৃতি ও তার চিকিৎসা বা নিরোধক ব্যাবস্থা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা দরকার।

হেপাটাইটিস ভাইরাসদের—পরিচয় জানতে তাদের ঐ অ্যান্টিজেনিক ক্ষমতাই বিশেষ সহায়ক। রোগীর রক্তে সেই ভাইরাসের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট অ্যান্টিবডি

পাওয়া যায়। তারই সাহায্যে ভাইরাসদের পৃথক পৃথক বা বিশেষ গ্রুপকে সহজে চেনা যায় এবং এপিডেমিক বা এনডেমিক কালে কোন্ ভাইরাস সক্রিয় সেটা নির্দিষ্টভাবে ধরা যায়। সেইভাবে (Hepatitis) A virus (H A V)-এর-পরিচয় হচ্ছে এটি একটি R N A-ভাইরাস, সাধারণ তাপে, এসিডে এবং ইথারে এটি সহজে মরে না, তবে ফর্মালডিহাইড, ক্লোরিন ও অতিবেগুনী রশ্মির (Ultraviolet rays) সংস্পর্শে এরা পরিপূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়, জলে ফোটালে (Boiling) অবশ্যই মরে পাঁচ মিনিটে। এদের মধ্যেও আবার কয়েকটি উপদল (Different strain) আছে, বিশেষ সূক্ষ্ম পরীক্ষায় তাদের পৃথক করে চেনা যায় তবে তাদের সবারই আক্রমণাত্মক অ্যান্টিজেনিক ধর্ম মূলত একই রকমের, ফলে তাদের যেকোন দলের আক্রমণে শরীরে যে অ্যান্টিবডি তৈরি হয় তা ঐ টাইপ-এ গোষ্ঠীর সব স্ট্রেনের উপর সমান কার্যকর। তাই অনাক্রম্যতা শক্তির বিচারে এরা অভিন্ন (Immunologically indistinguishable)। মৃদু বা তীব্র যে কোন ভাবেই এই টাইপ-এ ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হলে পরে এই রোগের বিরুদ্ধে একটা স্থায়ী প্রতিষেধক শক্তি সেই শরীরে জন্মায় এবং তা দীর্ঘকাল সক্রিয় থাকে। সেইজন্য একবার যাদের ইনফেকটিভ হেপাটাইটিস হয়েছে তাদের আর দ্বিতীয় বার এই রোগ হওয়ার আশঙ্কা প্রায় নেই। শতকরা 5 জনেরও কম লোক দ্বিতীয় বার আক্রান্ত হতে পারে তবে মূলত অন্য কারণে শরীর দুর্বল হয়ে পড়াই এর জন্য দায়ী, আর সেক্ষেত্রে ঐ রোগের প্রকোপ বা তীব্রতা কখনই বেশি হয় না, এনডেমিক অঞ্চলে বেশীর ভাগ লোক শৈশবেই অলক্ষিত-ভাবে এই রোগে আক্রান্ত হয়ে যায়, তাদের শরীরে নির্দিষ্ট অনাক্রম্যতা শক্তি গড়ে ওঠে, তাই ঐ সব অঞ্চলে সহজে এ রোগের এপিডেমিক হয় না, এইখানেই জীবন সংগ্রামে প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কালে মধ্যপ্রাচ্যে উপস্থিত বৃটিশ ও আমেরিকান সৈন্যদের বৃহত্তর অংশ হঠাৎ এই এপিডেমিক জণ্ডিসে ভয়ানকভাবে আক্রান্ত হয়, কিন্তু সেখানকার স্থানীয় লোকের এবং ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে তার কোন প্রকোপই ছিল না, সেইজন্যই এই টাইপ-এ ভাইরাস হেপাটাইটিসের যথার্থ গতি-প্রকৃতি না জেনে তাই নিয়ে অযথা আতঙ্কিত হওয়া বা করা উচিত নয়।

আক্রান্ত রোগীর যকৃতে, পিত্তে, রক্তে ও মলে এই ভাইরাস প্রচুর পরিমাণে থাকে, তবে তা ঐ জণ্ডিস দেখা দেওয়ার আগেই, জণ্ডিস দেখা দেওয়ার অল্প-কয়েক দিনের মধ্যেই ঐ ভাইরাস শরীর থেকে দ্রুত অন্তর্হিত হয়ে যায়। মলের সঙ্গে বাইরে নির্গত হয়েই ভাইরাসরা অন্যত্র ছড়ায়, মূলতঃ খাদ্য ও পানীয়ের মাধ্যমে এইভাবে ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে এবং স্থান থেকে স্থানান্তরে এর সংক্রমণ ঘটে। ইংরেজীতে খুব সুন্দরভাবেই এক কথাতেই এই সংক্রমণের ধারা প্রকাশ করা হয় Faecal-oral Route, বাংলায় "একে মল থেকে মুখ" বললে কি ভাল শোনাবে? শ্রুতিকটু হলেও কথাটি সত্য। তবে মল থেকে জলে তারপরে মুখে (অপরের) আর প্রত্যক্ষ মল থেকে অপরের মুখে যাওয়াও এদেশে অসম্ভব নয়। শৌচকর্মে অধিকাংশ লোকেই এদেশে সাবান ব্যবহার করে না, তাই রোগাক্রান্ত মা ভাল করে হাত না ধুয়ে যখন তার সন্তানকে কিছু খাওয়ায় তখন তাঁর আঙুল থেকে শিশুর মুখে সোজাসুজি এই ভাইরাস চলে যায়, আর শিশুটি আক্রান্ত হয়। খাদ্য-পানীয় পরিবেশনে বা তৈরিতে যাঁরা থাকেন তাঁদের সাধারণ স্বাস্থ্য বিধি সম্বন্ধে চেতনা না থাকার জন্য এই রোগ এবং এই জাতীয় খাদ্য-পানীয়বাহী সমস্ত রোগই এদেশে ঘরে ঘরে পাড়ায় পাড়ায় বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে ঐ এনডেমিক আকারে বিরাজ করছে—যেমন আমাশা। সুতরাং শুধু ওষুধ দিয়েই কি এই রোগ সারান যাবে? না এর আক্রমণ বন্ধ করা সম্ভব? ওষধ দেওয়া এবং সাবধানতার কথাতো বলা হয় রোগলক্ষণ, বিশেষ করে ঐ জণ্ডিস দেখা দেওয়ার পরে। কিন্তু তখনতো তার সাবধান হওয়ার কিছু নেই, যা ঘটার তা আগেই ঘটে গেছে। আগে বলেছি জণ্ডিস দেখা দেওয়ার পরে এই ভাইরাস আর শরীরে প্রায় খুঁজে পাওয়াই যায় না। তাই সেই রোগীকে নিয়ে সাবধানতারও কিছু থাকে না। এই ভাইরাস শরীরে (মুখ দিয়েই) প্রবেশ করার পর দুই থেকে ছয় সপ্তাহ সময় লাগে রোগ লক্ষণ প্রকাশ পেতে। এই সময়টাকে বলে রোগের প্রস্তুতি পর্ব—Incubation period. এই পিরিয়ডের শেষের দিক এবং রোগলক্ষণ প্রকাশের প্রথম অংশ (জণ্ডিস দেখা দেওয়া পর্যন্ত) সময়টাই রোগী সাংঘাতিক সংক্রামক, তার রোগের প্রকোপ যাই-ই হোক। আসলে রোগ প্রকোপের সঙ্গে সাংক্রামকতা শক্তির সম্পর্ক নেই। বস্তুত এই ভাইরাসে আক্রান্ত বহু রোগীর জণ্ডিসই হয় না। কিন্তু রোগের অন্যান্য প্রাথমিক লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়। তাদের বলা হয় জণ্ডিসহীন ভাইরাস হেপাটাইটিস—ইংরাজীতে Anicteric Viral Hepatitis। তাদের অনেকের আবার আপাতদৃশ্য কোন উপসর্গ নাও থাকতে পারে। শুধু সাধারণ একটু অসুস্থতাভাব, ক্ষুধাহীনতা, পায়খানার গোলমাল, পেটফাঁপা প্রভৃতি। এদের অধিকাংশই আবার শিশু ও কিশোর। তাই তারা রোগের সব কথা গুছিয়ে বলতেও পারে না, তবে পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে লিভার কিছুটা বেড়েছে

এবং তাতে ব্যাথাও আছে (Tender)। অল্প কিছু চিকিৎসায় বা বিনা চিকিৎসাতেই তারা ভাল হয়ে যায়। তাই রোগটা যে মোটেই আতঙ্কের কিছু নয় এইটাই প্রমাণিত হয়। কিন্তু ঐ অপ্রমাণিত রোগীদের মলে ঐ ভাইরাস থাকে—যা দিয়ে রোগটা সংক্রামিত হয়ে চলে এবং এইভাবেই যে রোগের চেনটা ধারাবাহিকভাবে চলে তা প্রমাণিত। কারণ মানুষ ছাড়া অন্য কোন জীবে এই ভাইরাস পাওয়া যায় নি। মানুষেরই এই রোগ হয় এবং মানুষই এর একমাত্র ধারক বলে এখন পর্যন্ত জানা, অবশ্য কিছু শিম্পাঞ্জী এই ভাইরাস বহন করে বলে সন্দেহ করা হয়। তবে চিংড়িজাতীয় মাছ (Shell-fish) দিয়েও এই ভাইরাস বাহিত হতে পারে। রোগীর মল-দূষিত জলাশয়ে ঐ মাছ থাকলে তার খোসা (Shell) বা খোলার তলেই ভাইরাসরা লেগে থাকে। সেই মাছ নাড়াচাড়া বা কাটাকুটি যারা করে তাদের হাতে আঙুলে ভাইরাস লাগে এবং রোগ ছড়ায় (ফুটিয়ে রান্নার পরে ঐ মাছে আর ভাইরাস থাকে না)। একইভাবে রাস্তায় কাটাফল বিক্রীর মাধ্যমে এই রোগ বিস্তারের সম্ভাবনা। যে জলে সেই ফলগুলি ধোয়া হয় (কাটার আগে বা পরে) তা দূষণমুক্ত না হওয়ারই কথা, আর যারা সেগুলি বিক্রী করে তারা সবাই অস্বাস্থ্যকর বস্তির বাসিন্দা, স্বাস্থ্যবিধির কোন নিয়মই তারা মানে না ও জানেই না। তাই জলদ্বারা বাহিত কোন রোগই এদেশে নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছে না বিশেষ করে শহরাঞ্চলে। এই জন্যই বারে বারে বলা হয় অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশগুলিতেই এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী। তার মধ্যে ঘন বসতির অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, দৈনন্দিন সামগ্রিক ব্যবহারে দূষণমুক্ত জলের অভাব (শুধু পানীয় জলটুকু বিশুদ্ধ হলেই চলবে না), সভ্যসমাজে উন্নত জীবন যাপনে স্বাস্থ্যবিধির সাধারণ জ্ঞান না থাকা, অভাব ও দারিদ্র জনিত স্বাস্থ্যহীনতা (যাতে সাধারণ রোগ প্রতিষেধক শক্তি হ্রাস পায়) এবং সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণে সরকারী ব্যবস্থার গলদ ও ব্যর্থতাই এই জাতীয় রোগের দীর্ঘ স্থায়িত্ব ও ভয়াবহতার মূল কারণ।

এই রোগের ভয়াবহতা নিয়ে যে আতঙ্কের কথা ছড়ান হয়েছে তার কিছুটা অবশ্য ঠিকই। বেশ কিছু রোগী এতে মারা গেছে এবং যাবে। তবে বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসাশাস্ত্র বলে এই টাইপ-এ ভাইরাসকৃত ইনফেকটিভ হেপাটাইটিস রোগটি এককভাবে পরিপুর্ণ নিরাময়যোগ্য। আগে থেকে সুস্থ শরীরে এই রোগ হলে তার কোন জটিলতা (Complication), দীর্ঘস্থায়িতা (Chronicity) বা মারাত্মক ভয়াবহতার (Fatality) কারণ নেই। তবে এপিডেমিক কালে কিছু কিছু কেসে রোগের প্রকোপ খুবই তীব্র হয়। যকৃতের বৃহত্তর অংশ সাংঘাতিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে রোগী হঠাৎ অজ্ঞান (Hepatic coma) হয়ে পড়ে এবং যথাযথ চিকিৎসার সুযোগ না দিয়েই মারা যেতে পারে। এদের সংখ্যা অবশ্য যৎসামান্যই—উপসর্গযুক্ত আক্রান্ত রোগীর শতকরা একজনও নয়, হাজারে একজনও নয়। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরা বয়স্ক রোগী, 50-এর বেশী বয়স এবং আগে থেকে অন্য কোন জটিল দীর্ঘ-স্থায়ী রোগ তাদের ছিল, যেমন ডায়াবেটিস, হৃদযন্ত্রের জটিলতা, ক্যানসার, বেশীমাত্রায় রক্তশূন্যতা বা অ্যানিমিয়া (Anaemia), যক্ষ্মা প্রভৃতি। কিছু ক্ষেত্রে অবশ্য হঠাৎ পিওনালী রুদ্ধ হয়ে (Cholestasis) জণ্ডিসের মাত্রা এমন বাড়িয়ে দেয় যে রোগের তীব্রতা মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি পায় এবং মারাত্মক হয়। এইসব ক্ষেত্রেও দেখা যায় রোগী পূর্বে আপাত সুস্থ থাকলেও তাঁদের অনেকেই দীর্ঘ স্থায়ী যকৃতের ক্ষতিকারক ঔষধ ব্যবহার করতেন, যেমন বিভিন্ন রকমের হরমোনযুক্ত ঔষধ, গর্ভনিরোধক বড়ি, বিভিন্ন ট্রাংকুইলাইজার (Tranquilizer) ও অ্যান্টি-ডিপ্রেসাণ্ট (Antidepressant) এবং কিছু অ্যান্টি ডায়াবেটিক বড়ি প্রভৃতি। এইসব কারণে রোগ সম্পর্কে যথার্থ বিজ্ঞান সম্মত জ্ঞানটাই বড় কথা। ঐ নিয়ে হৈচৈ করলে কিছু হয় না। কিন্তু সেই জ্ঞানটা আসবে কোথেকে ?

আমরা সাধারণভাবেই ভাবি চিকিৎসা এবং রোগ সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান আমাদের চিকিৎসক মণ্ডলীর কাছ থেকেই জনসাধারণ পাবেন। কিন্তু সেইখানেই বুঝি এখন বড় গলদ ! কেন জানি না বিজ্ঞান সম্মত চিকিৎসা-বিদ্যায় যথার্থ এবং উচ্চ ডিগ্রীধারী চিকিৎসকের সংখ্যা বর্তমানে অনেক হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃত বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসার ধারা এবং সেই মানসিকতা এদেশ আজ বিপন্ন বা বিপথগামী। প্রথম কথা রোগী যখন ডাক্তারের কাছে আসে তখন সে প্রথমে চায় তার যন্ত্রণার লাঘব এবং নিরাময়ের আশ্বাস। সেই কষ্ট বা যন্ত্রণা উপশমে নির্দিষ্ট কিছু ঔষধ চাই। তবে তার সংখ্যা ও মাত্রা সীমিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। অনেক সংখ্যক ঔষধ বারে বারে খাওয়া রোগীর পক্ষে একদিকে কষ্টকর অন্যদিকে হতাশা ব্যঞ্জক। রোগের প্রকৃতি এবং ঔষধের গুণাগুণ সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান থাকলেই কম ঔষধে বেশি বা যথাযথ ফল পাওয়া সম্ভব। অন্যথায় প্রত্যেক লক্ষণ বা উপসর্গের জন্য আলাদা আলাদা ঔষধ দিলে ঔষধের সংখ্যা বেশী হয়ে যায়। সামগ্রিক চিকিৎসায় এই ধারাটাই এখন প্রবল এবং বিপজ্জনক। কারণ এযুগের অধিকাংশ ঔষধই বহু উদ্দেশ্যসাধক এবং বহুমুখী তার প্রতিক্রিয়া। এক ঔষধে বহু ফল পাওয়া সম্ভব। রোগের উপসর্গ বা লক্ষণের

মূলগত কারণ ঠিক করতে পারলে তাই কম ঔষধে বেশী ফল পাওয়া যাবে। অন্যান্য রোগের মতই ভাইরাস হেপাটাইটিসেও তাই অনেক ঔষধ দিলে অধিংকাশ রোগীর মনে একটা আতঙ্ক সৃষ্টি হয়—এই ভেবে যে রোগটা নিশ্চয়ই খুব খারাপ এবং জটিল, না হলে এত ওষুধ কেন! তারপর যথার্থ আশ্বাসের কথায় পৃথকভাবে রোগী কোন আশ্বাস পায় কিনা সন্দেহ। বরং তার বিপরীতটাই বেশী। জণ্ডিস একটি ভয়ানক রোগ এই ধারণা সৃষ্টি করাটাই যেন অধিকাংশ চিকিৎসকের বিশেষ লক্ষ্য বা সেইরকম মানসিকতা দেখা যায়। তা না হলে রোগীরা তাঁর কাছে বারে বারে ছুটে আসবে না—এটাই হয়ত কারণ। অথবা রোগের যথার্থ গুরুত্ব বুঝতে না পারাটাও অন্য কারণ হতে পারে। এর জন্য নানারকম ল্যাবরেটারী পরীক্ষা থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ বড় চিকিৎসকের মতামত নেওয়ার উপদেশ যদি প্রথম থেকেই এবং অধিকাংশ কেসেই দেওয়া হয় তবে তাঁর কাছে রোগী আশ্বাস পাবে কি করে? পরন্তু রোগ নিয়ে—জীবন নিয়ে তার দুশ্চিন্তা তো বাড়বেই।

আমাদের এই আলোচনায় আগেই বলা হয়েছে যে এইরোগে দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোন ঔষধই লাগে না। আপনিই রোগ সেরে যায়। ডাক্তারের কাছে যাওয়াও লাগে না। আর ঠিক এই কারণেই জন্ডিসের মালা, জড়িবটি, ঝাড়ফুঁক, শীতলা মায়ের চরণামৃত প্রভৃতিতে এই রোগ সেরে যায় বলে অন্ধবিশ্বাস। চিকিৎসাশাস্ত্রের সব বইতেই লেখা আছে এই রোগের নির্দিষ্ট কোন ঔষধ নেই—অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার প্রয়োজনও নেই। তাই পথ্যের কথায় একটা আতঙ্ক সৃষ্টি করেন অধিকাংশ প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসকও। স্নেহদার্থ (মাখন ঘি তেল) খাওয়া তো যাবে না এমনকি ছোঁয়াও নিষেধ বলে অনেকে বলেন। অনেক মহিলা রোগীর মুখে শুনেছি জন্ডিস হওয়া থেকে মাসের পর মাস তাঁরা মাথায়ও তেল দিচ্ছেন না—পাছে জন্ডিস ফিরে আসে। কি সাংঘাতিক আতঙ্ক! কিন্তু চিকিসাশাস্ত্রে কোথাও এই তেল বা তৈলাক্ত জিনিষ খাওয়ার নিষেধ নাই। রোগের প্রারম্ভিক স্তরে যখন খুবই অরুচিভাব হয়, সর্বদা বমি বমিভাব বা বমিও হতে থাকে, তখন তৈলাক্ত জিনিষ খেলে ঐ বমির ভাব বেড়ে যায়; তাই তৈলাক্ত খাদ্যে রোগীর স্বাভাবিক অনিচ্ছাই হয়। তেল ঘি খেলে তার অন্য কোন ক্ষতি হবে এমন কোন কথা নেই। তবে এই রোগে পিত্ত নিঃসরণ ঠিক ঠিক না হওয়ার জন্য তৈলাক্ত উপাদান হজমে অসুবিধা হবে, বদহজম হবে, পেট ফাঁপ হবে বা বেড়ে যাবে। তাই ঐ সময়ের জন্যই তেল ঘি নিষেধ। রুচি, ফিরে এলে হজমে অসুবিধা না থাকলে তেল ঘি খেতে কোন বাধা নেই। একইভাবে ঝাল মশলার কথাও। লিভার অসুস্থ হলে তার প্রতিবেশী উদর বা স্টম্যাকও কিছুটা বিব্রত ও অসুস্থ হয়। গ্যাসট্রাইটিস ভাব হয়। পেটে জ্বালা জ্বালা অনুভূতি হয়। ঐ সময় মশলা দিয়ে রান্না খাবার সহ্য হয় না। সেই ভাবটা কেটে গেলেই সাধারণ মশলা দিয়ে রান্নায় কোন ক্ষতি নেই। ভাইরাস হেপাটইটিস-এ বেশী ক্যালরীযুক্ত খাদ্য দরকার ভাইরাস আক্রমণে শরীরের ক্ষয় নিবারণ বা পূরণের জন্যই। সুতরাং বেশীদিন অরুচিকর খাদ্য দিয়ে তা হতে পারে না। শুধু হজমের দিক ঠিক আছে কিনা দেখা দরকার। এই বেশী ক্যালরীর জন্য গ্লুকোজ বা চিনি বেশী করে খেতে দেওয়া হয়—তাকে রুচিকর করতে যথেষ্ট লেবুর রস দিতে বলা হয় (যেকোন লেবুর)। তবে এর জন্য আখের রস খাওয়া বিশেষ নির্দেশ এবং তা সংগ্রহে বাড়ীতে হৈ চৈ অশান্তির সৃষ্টি—কোন মতেই স্বাস্থ্যকর নয়। বিশেষ করে শহরে রাস্তার উপরে আখ মাড়াই কল থেকে আনা আখের রস কোন মতেই গ্রহণযোগ্য নয়। কাটা ফলের মত এখানেও সেই রস জল দূষণে দূষিত এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক, আর রাস্তার ধূলোময়লা কত নোংরা তাতে উড়ে এসে পড়ে। গ্লুকোজ খাওয়ানর বদলে অনেকে দু-বেলাই গ্লুকোজ ইঞ্জেকশন দিতে থাকেন—অনেক দিন ধরে। দু-বেলা শিরার ইঞ্জেকশন নেওয়া একটা আতঙ্কের ব্যাপার এবং অনেক সময় বিপজ্জনকও। অধিকংশ ক্ষেত্রেই ব্যবসায়িক লাভ ছাড়া এর কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। অতিরিক্ত বমি যারা করে তাদের ক্ষেত্রেই গ্লুকোজ ইঞ্জেকশন লাগে। তবে সে কেস হাসপাতালে পাঠান উচিৎ।

এই চিকিৎসায় সাধারণ নির্দেশগুলির মধ্যে বিশ্রাম কথাটা খুব উল্লেখযোগ্য। বাধ্যতামূলক দীর্ঘ বিশ্রাম (বেডরেস্ট) কোন সময়ই দরকার নেই। তবে কায়িক শ্রমের নিয়ন্ত্রণ দরকার। যে কাজ করলে পরিশ্রান্ত হয় সেইরকম কাজ কিছুদিন বন্ধ রাখতে হবে। আর বেশী অসুস্থকালে তো শুয়ে থাকতেই হবে। এই বিশ্রামের উপদেশ বা নির্দেশ নিয়ে কত বাড়িতে কি অশান্তি ও আতঙ্ক সৃষ্টি হয় তা ভাবাই যায় না। হয় রোগী বিশ্রাম নিচ্ছে না বলে শুভানুধ্যায়ীদের কি আক্ষেপ ও আতঙ্ক, না হয় জণ্ডিস হওয়া সত্বেও কেউ তাকে বিশ্রাম দিল না—বা বিশ্রামের ব্যবস্থা করল না, সংসার চালাতে খেটেই মরতে হল—কি হবে তার পরিণতি কে জানে—এই রকম অশান্তির আক্ষেপ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এবিষয়ে যথাযথ নির্দেশের বিভ্রান্তিই এই ক্ষতিকর পরিস্থিতি ও

পারিবারিক অশান্তির কারণ হয়—সেটা নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ ও ক্ষমতা তো পারিবারিক চিকিৎকের হাতেই। তা না করে পরবর্তী যে কোন অসুখেই যদি চিকিৎসক মহাশয় আবার খোঁচা দিয়ে মনে করিয়ে দেন যে তখন বিশ্রাম না নেওয়ার জন্যই এখন তার অন্যান্য অসুবিধা-গুলো হচ্ছে (যে কষ্টগুলোর যথার্থ চিকিৎসা তিনি করতে পারছেন না) তা হলে ঐ বিশ্রাম ব্যবস্থাটা একটা আতঙ্ক সৃষ্টি করে কি না? রোগীকে আলাদা করে রাখা, তার খাবার বাসনপত্র পৃথক করা প্রভৃতি নিয়ে আর এক আতঙ্ক হয়। কিন্তু তার মলমূত্র নিয়ে কেউ ভাবে না। সেই উপদেশটা কে দেবেন?

এই রোগে দুটি ওষুধ খুব ব্যাপক ও মারাত্মকভাবেই ব্যবহার করছেন অধিকাংশ চিকিৎসক। একটি ব্রড-স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক, অন্যটি কর্টিকোস্টেরয়েড। তাঁরা ওগুলি কেন দেন—সেটা একটু ভেবেচিন্তে দেখেন বলে মনে হয় না। এই ভাইরাসের উপর তাদের কোন কাজ নেই। জ্বর—এই রোগে খুব স্বাভাবিক উপসর্গ। তার জন্য কোন অ্যান্টিবায়োটিক লাগে না। অন্য কোন জীবাণুর মিলিত (simultaneous) আক্রমণ না হলে কোন অ্যান্টিবায়োটিক বা কেমোথেরাপির প্রয়োজন নেই। তবু অ্যান্টিবায়োটিক না দিয়ে এই রোগের কোন চিকিৎসাপত্র দেখাই যায় না কেন? আর মুড়িমুড়কির মত স্টেরয়েড-এর ব্যবহার কেন যে চলছে—এই রোগে, কি অন্য যেকোন সাধারণ রোগেও—তাতো বোঝা দায়! কোন বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাধারা এতে কাজ করে কি? একটা ভেগ্ টক্সিসিটির (Vague Toxicity) কথা যে বলা হয় তার যথার্থ ব্যাখ্যা ও অনুরূপ প্রয়োগ কদাচিত দেখা যায়। অথচ প্রকৃত বিপদকালে এটি হচ্ছে যথার্থ জীবনদায়ী অমূল্য এক ঔষধ। সেটার খামখেয়ালী অন্ধ ব্যবহারে কী যে সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে দেশের—তা কে বুঝবে? যাকে দেওয়া হয় সেই মানুষটার আর পরবর্তী কোন অসুখ হবে না—যেখানে স্টেরয়েড ছাড়া তাকে আর বাঁচান যাবে না—এমন পরিস্থিতির কথা কি বিজ্ঞান সম্মত শিক্ষাপ্রাপ্ত চিকিৎসকগণ ভাববেন না? অহেতুক যখন তখন স্টেররেড প্রয়োগে এমন অবস্থা হতে পারে যে যখন স্টেরয়েডের প্রয়োজন তখন আর সেটি কাজ করছে না। সুতরাং তখন সে রোগীকে বাঁচান দায়। ভাইরাস হেপাটাইটিস-এর ফালমিনেটিং (Fulminating) টাইপে স্টেরয়েড অবশ্যই প্রয়োজন এবং তা অনেক বেশী মাত্রায়, যে মাত্রার ধারেকাছেও অধিকাংশ চিকিৎসকই যান না। আর ঐ পিত্তনালী রুদ্ধ হওয়া (Chalestasis) কেসেই উপযুক্তমাত্রায় স্টেরয়েড দিতে হয়। এই দুই ধরণের রোগীকে ঘরে চিকিৎসা না করে হাসপাতালে যথাযথ নিয়ন্ত্রণে চিকিৎসার প্রয়োজন। তবে আগেই বলেছি এই রোগে রোগীর শরীরে রোগপ্রতিষেধক শক্তি কিরকম ছিল এবং এই ভাইরাস আক্রমণে নতুন অ্যান্টিবডি ও অনাক্রমণ শক্তি কতখানি তৈরি হল তার উপরই নির্ভর করে রোগীর ভবিষ্যৎ ও চিকিৎসার ফলাফল। এর বাইরে সুচিন্তিত বিজ্ঞানসম্মত পথনির্দেশ ও ব্যবস্থাপনা চাই যাতে জণ্ডিস হয়েছে শুনে রোগী ও তার আত্মীয়রা আর বেশি আতঙ্কিত না হয়।

লেখা ইতিমধ্যে এতখানি বেড়ে গেছে যে পাঠকের ধৈর্যচ্যুতির সম্ভাবনা। তবু অনেক কথাই লেখা হল না। বিশেষ করে টাইপ বি, ভাইরাস নিয়ে বলা দরকার ছিল। তবে বন্ধ করার আগে আমাদের পত্রপত্রিকার ও ও প্রচার মাধ্যমগুলির গুরুত্ব সম্পর্কে একটু উল্লেখ দরকার। তাদের আন্তরিক প্রচারে ভাইরাস হেপাটাইটিস নিয়ে যতটা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে ঠিক ততটা বিজ্ঞানসমত চেতনা সৃষ্টি হয়েছে কিনা তাঁরা ভাবুন। রাইটার্স বিল্ডিংস-এ মন্ত্রীমহোদয় জলের ট্যাঙ্কে ক্লোরিন ঢালছেন সেই ফটোর চেয়ে ফুটপাথে কত কাটাফল আর আখের রস কিভাবে বিক্রী হচ্ছে, ফুচকাওয়ালার নোংরা হাতে কিভাবে তরুণতরুণীরা খাবার খাচ্ছে, পানীয় জল ছাড়া অন্য ব্যবহার্য জল কতটা দূষিত এবং কোথায় কিভাবে তার ব্যবহার হচ্ছে, শহরের ফুটপাথে বসেই হেপাটাইটিস রোগাক্রান্ত বাচ্চারা কত জায়গায় কেমন মনের সুখে মলত্যাগ করছে এবং তার দূষণ কতদূর গড়াচ্ছে এই রকম বহু ছবিই ভদ্র শিক্ষিত চিন্তাবিদ সমাজের সামনে তুলেধরা দরকার। আর ক্লোরিন যদি দিতে হয় তবে ছাদের উপর ট্যাঙ্কে নয় নীচে আন্ডারগ্রাউন্ড যে রিজার্ভার থেকে ছাদে জল তোলা হয় তাতেই ক্লোরিন দিয়ে শুদ্ধ করা আগে দরকার—সে কথাটি কেউ বলে নি কেন? ছাদের ট্যাঙ্কতো প্রায়ই খালি হয়ে যায় আর রোদের দাপটেই জীবাণুমুক্তও হয়ে যায় কিন্তু নীচের অন্ধকারে প্রোথিত রিজার্ভারটা শুধু জল নয় জীবাণু ও ভাইরাসদের স্থায়ী রিজার্ভার হয়েই থাকে। এই সব বলতে, লিখতে আর প্রচার করতে হলে আমাদের সাংবাদিকগণকে যে আরও একটু বিজ্ঞানের পাঠ নিয়ে যথার্থ বিজ্ঞান সচেতন হতে হবে এবং কোন্ খবর, কোন্ ছবি, কার মতামত কিভাবে ছাপা হবে তা নিয়েও বিজ্ঞানোচিত দক্ষতা দেখাতে হবে।

বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন

রতনমোহন খাঁ *

স্বাধীনোত্তর ভারতে শিক্ষা নিয়ে অনেক চিন্তা-ভাবনা হয়েছে, এখনো হচ্ছে। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় স্তরে প্রায় কুড়িটি কমিশন সারা ভারতে বিভিন্ন শিক্ষার বারে বারে রূপরেখা রচনা করেছেন। রাজ্যস্তরেও অনেক কমিশন বা কমিটি গঠিত হয়েছে, শিক্ষানীতির পরিবর্তনও ঘটেছে। শিক্ষা সংক্রান্ত নীতি, ধারা বা পদ্ধতি এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়। আলোচনা বিষয়বস্তু হলো পাঠ্য-পুস্তকের নির্বাচন। বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তকের কথা হলেও সব রকমের পাঠপুস্তকের ক্ষেত্রে কমবেশী একই কথা প্রযোজ্য।

ভাল পাঠ্যপুস্তক কেবলমাত্র ছাত্র-ছাত্রীদের অপরিহার্য নয়, শিক্ষাক্রমের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে, বিষয় সম্বন্ধে কৌতূহল জাগাতে, পঠন-পাঠনকে সঠিক পথে চালিত করতে ভাল পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। শিক্ষার সুচারু রূপায়ণে যেমন চাই ভাল শিক্ষক তেমনি চাই ভাল পাঠ্যপুস্তক। যেখানে পাঠ্য-পুস্তক নির্ধারিত নাই সেখানে ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন মোটেই সহজসাধ্য নয়। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় পুস্তক সম্বন্ধে আলোচনা সময়মত পাওয়া যায় না, পাওয়া গেলেও আলোচনায় সব দিক স্থান পায় না বা নিরপেক্ষ সমালোচকের ভূমিকা পালিত হয় না। আবার ছকে বাঁধা পথে এই নির্বাচন সম্ভব নয়। একই বিষয় বা পাঠ্যতালিকার উপর প্রকাশিত বইগুলির খুব ভালভাবে পর্যালোচনার মধ্য দিয়েই তুলনামূলক বিচার সম্ভব। তার উপর দেখতে হবে অবস্থা, পরিস্থিতি ও পরিবেশ। বিশেষ করে আমাদের মত দেশে যেখানে পাঠাগারের অপ্রতুলতা, পুস্তকের অপ্রাচুর্য এবং ক্রয়ক্ষমতা সীমিত সেখানে সঠিক পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে পর্যালোচনার ক্ষেত্রে গাইড লাইন হিসাবে নিম্নলিখিত ধর্মগুলি বিবেচনা করা যেতে পারে।

I. সাধারণ ধর্ম

i) প্রচ্ছদপটা হবে শোভন, নয়নাভিরাম ও অর্থবহ।

ii) কাগজ হবে টেকসই, ছাপা হবে সুন্দর ও স্পষ্ট।

iii) চিত্রগুলি হবে সুস্পষ্ট এবং যে কারণে চিত্রগুলি পরিবেশিত সে কারণগুলি চিত্রে উল্লেখ থাকবে।

iv) মুখবন্ধ পুস্তকটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় বহন করবে।

v) সূচীপত্রে প্রতি অধ্যায়ে আলোচিত প্রসঙ্গগুলির উল্লেখ থাকবে।

vi) কোন শিক্ষার পাঠ্যতালিকার সব বিষয়গুলি পুস্তকে আলোচিত হবে।

vii) ভাষা হবে সহজ সরল।

viii) বিষয়ের আলোচনা বেশীর ভাগ ছাত্র-ছাত্রীদের বোধগম্য ও গ্রহণযোগ্য হওয়া প্রয়োজন।

ix) সোজাসুজি, সংক্ষিপ্ত পরিবেশন খুব গুরুত্বপূর্ণ।

x) প্রতি অধ্যায়ে প্রতি প্রসঙ্গের থাকবে যথাযথ উদাহরণ ও অনুশীলনী।

xi) প্রতি অধ্যায়ের শেষে কিছু সমাধানযুক্ত প্রশ্ন ও সাধারণ প্রশ্নমালা থাকবে।

xii) পরিভাষা হবে স্বীকৃত ও অর্থবহ।

xiii) আলোচনা সর্বাধুনিক তত্ত্ব ও তথ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

xiv) পরিশেষে বর্ণানুক্রমিক পদের সূচী পৃষ্ঠাসহ থাকবে।

xv) আলোচনার বিস্তৃতি ও পুস্তকের আকার এমন হবে যাতে নির্দিষ্ট সময়ে শিক্ষণ সম্ভব হয়।

xvi) প্রয়োজনীয় তথ্য-সংগ্রহের তালিকায় সংযোজিত হবে যেগুলি সহজলভ্য।

xvii) দাম অধিকাংশের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে থাকা বাঞ্ছনীয়।

xviii) পুস্তক হবে সহজপ্রাপ্য।

II. বিশেষ ধর্ম

i) ঈপ্সিত শিক্ষাক্রমের মানের উপযুক্ত হবে।

ii) যেকোন প্রসঙ্গ বা তত্ত্বের আলোচনা হবে সংক্ষিপ্ত, যথাযথ, অন্যের পরিপূরক ও যথাসম্ভব সম্পূর্ণ।

iii) পূর্বপঠিত জ্ঞানের সাহায্যে আলোচিত বিষয়গুলি অনুধাবনযোগ্য ও সহজবোধ্য।

iv) প্রস্তুনা পরস্পর সঙ্গতিপূর্ণ।

v) পরিবেশন ও আলোচনা ছাত্র-ছাত্রীদের কৌতূহল জাগাতে সাহায্য করবে এবং কৌতূহল মেটাতে যথেষ্ট তথ্যতালিকা থাকবে।

vi) পরিবেশনের মধ্যে আরোহ ও অবরোহ সিদ্ধান্ত

---

* সিটি কলেজ, কলিকাতা-700 009

বা যুক্তিগুলি হবে পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ।

vii) পরিবেশিত তত্ত্ব বা প্রসঙ্গের সঙ্গে ঐতিহাসিক বা আবিষ্কারের ঘটনার ইঙ্গিত থাকবে।

viii) পরস্পর নিরপেক্ষ উদাহরণ ও বিশেষ ধরণের উদাহরণের সমাধান ও অনুশীলন থাকবে।

ix) সূত্র, তত্ত্ব বা ঘটনাবলীর সংগ্রহের উৎসের তালিকা থাকবে, যাতে সহজেই সন্দেহের নিরসন হতে পারে।

x) পরিবেশন হবে শিক্ষাক্রমের মানোপযোগী, সুবিন্যস্ত, একার্থক, প্রয়োজনমাফিক এবং অবিহ্বল।

xi) সনাতন তত্ত্ব বা আবিষ্কারের সঙ্গে অতি আধুনিক গবেষণার সঙ্গতি ও অসঙ্গতির উল্লেখ থাকবে।

xii) পরীক্ষার সঙ্গে, প্রাক্ ও ভবিষ্যৎ শিক্ষার সঙ্গে আধুনিক প্রবণতার সঙ্গে সমতা রেখে উদাহরণগুলি সন্নিবেশিত হবে। নির্বাচিত উদাহরণগুলি ছাত্র-ছাত্রীদের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ধর্মী মনোবিকাশের সহায়ক হবে।

xiii) উদাহরণগুলি হবে সুস্পষ্ট দ্ব্যর্থতাহীন। পুস্তকে বর্ণিত তত্ত্বনির্ভর ও প্রাক-জ্ঞানের নির্ভরশীল।

xiv) তত্ত্বের প্রয়োগগুলি এমনভাবে আলোচিত হবে, যাতে বিষয় সম্বন্ধে আকর্ষণ বাড়ে।

xv) ভাল ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কিছু উদাহরণ ও তথ্যতালিকা থাকবে।

xvi) অতি প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গগুলি বিশেষভাবে দর্শনীয় ও আকর্ষণীয় করে পরিবেশিত হবে।

III. সাধারণ দোষ-ত্রুটি

i) প্রয়োজনের অতিরিক্ত সমাধিত প্রশ্ন, প্রশ্নমালায় একই ধরণের প্রশ্নের সন্নিবেশন, বিস্তারিত বিবরণ, পরীক্ষার ফললাভই মুখ্য উদ্দেশ্য পাঠ্যপুস্তকের বিশেষ ত্রুটি হিসাবে গণ্য হবে।

ii) শ্রেণীগত বা শিক্ষার স্তরের মানের সঙ্গে সমতা না রেখে বিষয়ের জটিলতা ও দুরূহতা পাঠ্য-পুস্তকের ত্রুটি।

iii) অযৌক্তিক মতবাদ বা নিজস্ব মতবাদের প্রাধান্য সঠিক মূল্যায়নের পরিপন্থী।

iv) উপাত্ত বা তথ্যনির্ভর যৌক্তিকতার বদলে অনুমান নির্ভর ব্যাখ্যা শিক্ষার্থীদের বিপথগামী করার সম্ভাবনা।

v) তথ্যগত ভ্রম, সংজ্ঞা, সূত্র ও তত্ত্বের মধ্যে ভ্রম খুবই মারাত্মক।

vi) এলোমেলো বিন্যাস বা গ্রন্থনা বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণে সহায়ক নয়।

vii) প্রয়োজনীয় বিষয়ে ছাড় খুবই বিভ্রান্তিকর।

viii) কেবলমাত্র খুব জটিল বা সোজা উদাহরণের সন্নিবেশ ছাত্রছাত্রীর জ্ঞানলাভের সম্পূর্ণতায় বাঁধার সৃষ্টি করে।

ix) পাঠ্যতালিকার বা শিক্ষণের সব বিষয় পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত না হওয়া অসম্পূর্ণতার লক্ষণ।

x) প্রয়োজনীয় টেবিল, চার্ট, তথ্যতালিকা বা সূচির অপ্রতুলতা ত্রুটি হিসাবে গণ্য।

ভালো পাঠ্যপুস্তক নির্বাচকমন্ডলীর একটি দায়িত্বপূর্ণ কাজ। দায়িত্ব পালনে, কর্তব্য স্মরণে এই প্রবন্ধ সহায়ক হবে বলে আশা করি।

ইঁদুর নাশের নতুন উপায়

সমগ্র পৃথিবীর কাটা ফসলের 20% খাদ্যশস্য এবং 420 লক্ষ টন খাদ্যদ্রব্য ধ্বংস করে বিভিন্ন জাতের ইঁদুর। যদিও নানারকম রাসায়নিক এদের ধ্বংস করার জন্য ব্যবহার হয়। কিন্তু কিছুদিন পর গন্ধ দ্বারা বা অন্য ভাবে এরা এসব বস্তু চিনতে পারে। তাই এসব দিয়ে এদের আর নষ্ট করা যায় না।

রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা এদের দমন করার জন্য এক নতুন জিনিস আবিষ্কার করেছে যার নাম এরা দিয়ে অ্যালগো পেস্ট। এই জিনিসটি এক রকম শৈবাল থেকে তৈরী। এই শৈবালে এমন এক জৈব পদার্থ থাকে যা ইঁদুরকে বিরক্ত করে এবং তারা পালিয়ে যায়। নানারকম ইঁদুর ও পোকামাকড় এর দ্বারা দমন করা যায়—এটি মানুষের কোন ক্ষতি করে না।

[ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ]

এস্পেরান্তো

পরিচ্ছেদ 2

প্রবাল দাশগুপ্ত *

2-1 প্রথমে কয়েটা সহজ কথা শিখে নিন।

bela lando সুন্দর দেশ
nova amiko নতুন বন্ধু
alia afero অন্য জিনিস
bona tempo ভালো সময়
rica homo "ধনী মানুষ", বড়লোক
granda cambro বড় ঘর (কামরা)
facila vojo সহজ রাস্তা (পথ)

2-2। বাঙলায় বলুন।

bela cambro
facila afero
rica amiko
granda lando
bona homo
alia tempo
nova voja

2-3 এস্পেরান্তোয় বলুন ঃ

নতুন জিনিস
সুন্দর পথ
ধনী দেশ
বড় রাস্তা
অন্য মানুষ
ভালো ঘর

2-4 এবার বহু বচনা

belaj landoj সুন্দর সুন্দর দেশ
novaj amikoj নতুন নতুন বন্ধু
aliaj aferoj অন্যান্য জিনিস

2-5 এস্পেরান্তোয় বলুন ঃ

ভালো ভালো লোক (মানুষ)
নতুন নতুন পথ
অন্যান্য দেশ

2-6। একটুখানি পরিভাষা। বাঁ দিকের শব্দগুলো—bela, nova, alia—বিশেষণ। আর ডান দিকের শব্দগুলো—lando, amiko, afero—বিশেষ্য। বিশেষণের চিহ্ন a আর বিশেষ্যের চিহ্ন o; এরকম চিহ্নকে বলে বিভক্তি। তৃতীয় একটা বিভক্তি শিখেছেন, j, ওটা বহুবচনের বিভক্তি। ওটা থাকলে বহুবচন—aliaj landoj অন্যান্য দেশ, একাধিক। না থাকলে একবচন—alia lando অন্য (একটা) দেশ—একটা।

বিশেষণ, বিশেষ্য, বিভক্তি, একবচন, বহুবচন। আরও একটা পরিভাষিক শব্দ শিখে নেওয়া ভালো এই সময়ে। শব্দটা হলো প্রতিফলন। বিশেষ্যের যখন একবচন, lando, তখন বিশেষণেরও তাই ঃ alia lando বলি, aliaj lando বলি না। বিশেষ্যের একবচনটা বিশেষণে প্রতিফলিত হচ্ছে। বিশেষ্যের যখন বহুবচন, landoj, তখন বিশেষণ সেই বহুবচন প্রতিফলন করে—aliaj landoj।

এভাবে বললে মনে হয় যেন বিশেষ্যের গায়ে j বিভক্তি আছে কি নেই দেখে নিয়ে তার দেখাদেখি বিশেষণটাও ওই বিভক্তি ধারণ করে বা করে না। প্রতিফলন ব্যাপারটা ঠিক অতটা স্থূল নয় কিন্তু। খুলে বলছি।

2-7। একটা শব্দ শিখুন ঃ kaj (কাই), আর এবং। নতুন দেশ আর নতুন বন্ধু, nova lando kaj nova amiko, যোগ করলে কী হয়? Nova lando kaj amiko? তা বলতে পারেন, ভুল নয়, লোকে ধরে নেবে আপনি দ্বিতীয় বারের nova-টা উহ্য রাখলেন পুনরুক্তি এড়াবার জন্যে। তবে আরো স্পষ্ট হয় যদি বলেন novaj lando kaj amiko। এখানে novaj বিশেষণের বহুবচন-বিভক্তি j বলে দিচ্ছে যে, এটা যে-বিশেষ্যর বিশেষণ সেই বিশেষ্য মাত্র একটা ব্যাপারের কথা বলছে না, একাধিক ব্যাপারের কথা বলছে। কিন্তু novaj-এর পাশে lando পড়ে প্রথমে Lando তো একটাই ব্যাপারের নাম। তাহলে? Lando kaj amiko। একা কোনোটাই বহুবচন নয়। কিন্তু kaj থাকাতে দুটো একবচনে মিলে বহুবচন হয়ে গেল। সেই মিলিত বহুবচন প্রতিফলিত হচ্ছে novaj-এর j বিভক্তিতে।

---

* ডেক্‌কান কলেজ, পুনে-411 006

উলটো দিকে, bela kaj rica landôj মানে কী?

মানে দুটো দেশ—একটা bela lando, অন্যটা rica landô! যদি বলেন bela kaj rica lando, শ্রোতা ধরে নেবেন এমন একটা দেশের কথা হচ্ছে যে দেশ একাধারে সুন্দর আর ধনী। এই দৃষ্টান্তে landôj বলছে দুটো দেশের কথা, অর্থাৎ lando+landô; প্রথম landoটার বিশেষণ bela; আর rica দ্বিতীয় landoটার বিশেষণ। একবচন বিশেষ্যের বিশেষণ, তাই একবচন।

এক দিকে novaj lando kaj amiko আর অন্য দিকে bela kaj rica landoj—এই দুটো দৃষ্টান্ত পুরোপুরি বুঝে নিলেই দেখতে পাবেন প্রতিফলন ব্যাপারটা থাকলে ভাষার কী লাভ হয়।

2-8। বচন নিয়ে কথা বলছিই যখন, কয়েটা সংখ্যা শিখে নিন না।

unu amiko একজন বন্ধু
du amikoj দুজন বন্ধু
tri amikoj তিনজন বন্ধু
kvar amikoj চারজন বন্ধু
kvin amikoj পাঁচজন বন্ধু

উচ্চারণ এখনও রপ্ত হয় নি হয়তো? Amikoj আর amiko দুই রূপেই জোর বা ঝোঁকটা পড়ে mi এই দল (সিলেব্‌ল্)টার উপর। আরেকটা কথা। Kvar আর kvin-এর মতো শব্দে নিজেই দেখতে পাবেন v-এর উচ্চারণে বেশি জোরে ঠেলে বেরোতে পারছে না হাওয়াটা, নিচের ঠোঁট আর উপরের দাঁতের মধ্যে দিয়ে দিয়ে মোটামুটি চুপচাপ বেরিয়ে যাচ্ছে, অল্প চাপে বা বিনা চাপে। এস্পেরান্তো v সম্বন্ধে এ কথা সাধারণভাবে খাটে, অন্যান্য পরিবেশেও। ইংরেজী v-তে উচ্চারণের জোর এর চেয়ে বেশি, যেজন্যে আমরা বাঙলায় মহাপ্রাণ ভ-কে ইংরেজী v-র প্রতিরূপ বলে ধরে নিয়েছি। Kvar বাঙলা হরফে লিখতে গেলে ক্‌ভ.ার না লিখে হয়তো ক্‌ব.ার লেখাই ভালো, তবে বিন্দু দেওয়া "ব.!" দেখলে কেউ কি বুঝবেন যে এর উচ্চারণে উপরের দাঁতের ভূমিকা আছে? সেই ভেবে আগের পরিচ্ছেদে v-র প্রতিবর্ণ হিসেবে ভ. ব্যবহার করেছি, যদিও বাঙলা ভ বা ইংরেজী ভ.-এ জোর এই এস্পেরান্তো ধ্বনির চেয়ে বেশি।

খেয়াল করুন যে এস্পেরান্তো ভাষায় বচন বেশ জরুরী। বাঙলায় 'একজন বন্ধু' আর 'তিনজন বন্ধু' তফাতটা দেখতে পাই 'এক' আর 'তিন'-এ; 'বন্ধু' শব্দটার চেহারা পালটায় না। আমরা 'তিনজন বন্ধুরা' বলি না। এস্পেরান্তোয় কিন্তু tri amikoj বলতেই হবে, tri amiko হয় না।

2-9। গণিতে '=' হচ্ছে সমত্বের প্রতীক। Tri kaj unu=kvar; '=' প্রতীকটার উচ্চারণ estas: tri kaj unu estas kvar। এবার স্বাধীনভাবে বাক্য রচনা করুণ। যা শিখেছেন তাতেখালি যে অল্পস্বল্প অঙ্ক কষতে পারবেন তাই নয় এইসবও পারবেন: Bela homo estas unu afero, kaj bona homo estas alia afero; বলুন দেখি এর মানে কী? দেখুন, কত কথা বলতে পারছেন।

মাঠে ও খামারে ব্যবহারের জন্য 'লেসার'

কাজাকে এস. এস. আর এর আলসা আটা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা পক্ষী প্রজননে লেসার বায়োস্টিম্যুলেশন-এর ব্যবহারের কথা বলছেন। এই পদ্ধতিতে ডিম সামান্য সময়ের জন্য হিলিয়াম নিয়ন রশ্মিতে রেখে দিলে ডিমের ইনকিউবেশন-এর সময় কমে যায়। এতে বাচ্চা হওয়ার সংখ্যা 4.% বৃদ্ধি পায় এবং সবল বাচ্চা হতে সাহায্য করে। বীজেও বপনের আগে এই রশ্মি প্রয়োগ করলে, অঙ্কুরোদ্গমে উন্নতি হয়, মূলতন্ত্র তাড়াতাড়ি বিকাশ লাভ করে এবং শস্যের চারা বেশী ভারী হয়। এর ফলে উৎপাদন 15.% বেশী বৃদ্ধি পায়।

[ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ]

কিশোর বিজ্ঞানীর আসর
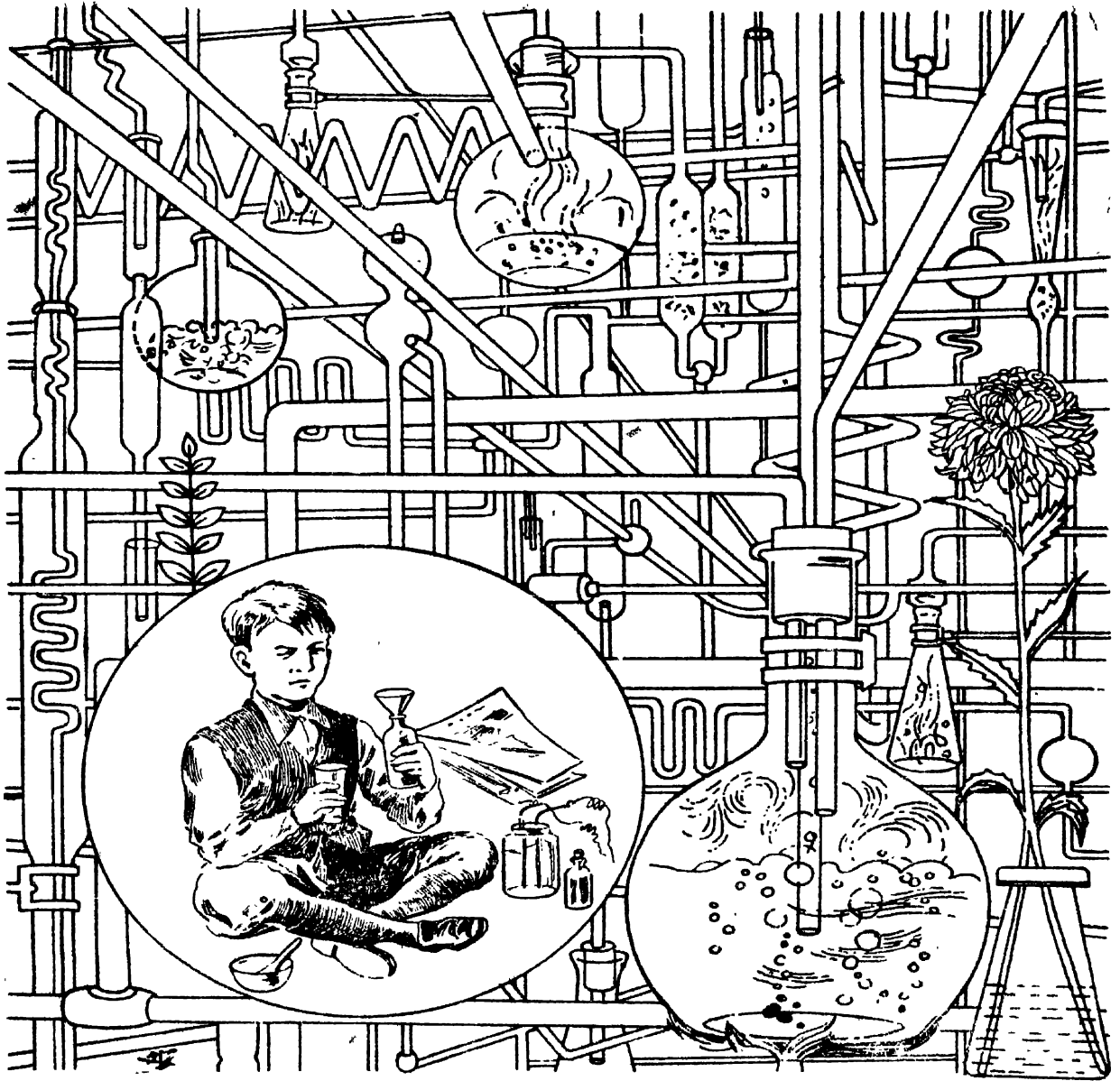
অ্যাণ্ডারস সেলসিয়াস ও থার্মোমিটার

শুভতোষ চক্রবর্তী*

বিজ্ঞানের প্রাথমিক বিকাশের কালে অতি সাধারণ যন্ত্রপাতি আবিষ্কারে কত যে শ্রম ও দীর্ঘসময় লেগে গেছে সেকথা ভাবলে আজ অবাক হতে হয়। বিজ্ঞানের জগতে এবং সাধারণ ঘরোয়া ব্যবহারে নিত্যপ্রয়োজনীয় তেমনি একটি সাধারণ যন্ত্র হচ্ছে উষ্ণতামাপক যন্ত্র—থার্মোমিটার। কিছু জটিল কলকাঠি বা যন্ত্রাংশ এতে নেই, কোনও দুর্লভ উপাদানও এতে লাগে না। তবু প্রথম চেষ্টা থেকে সফল প্রস্তুতি পর্যন্ত সে যুগের বেশ কয়েকজন বা কয়েক দল বাঘা বাঘা বিজ্ঞানীর সময় লেগে গেল প্রায় দেড় শত বছর। এই শেষ সফল বিজ্ঞানী 'হলেন সুইডেনের অ্যাণ্ডারস সেলসিয়াস, আর প্রচেষ্টাটি শুরু করেছিলেন কালজয়ী পথপ্রদর্শক বিজ্ঞানী গ্যালিলিও। বিভিন্ন বস্তুর উষ্ণতাপরীক্ষা বিজ্ঞানের কাজকর্মে অতি গুরুত্বপূর্ণ। সেই উদ্দেশ্যেই 1592 খৃস্টাব্দে গ্যালিলিও একটা অতি সরল যন্ত্র তৈরি করেন—সরু কাচের নলের একটা দিক বাল্বের (Bulb) মত করে ফুলিয়ে নিয়ে তার অবশিষ্ট লম্বা নলের মুখটা যেমন ছিল তেমনি খোলা রেখেই। ঐ খোলা মুখটাকে উল্টো করে জলের ভিতর ডুবিয়ে উপরের বন্ধ বাল্ব অংশটিকে গরম করলে তার ভেতরের বাতাস সেই গরমে আয়তনে বাড়ত আর নীচের খোলা মুখ দিয়ে জলের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে যেত। তারপরে উপরের বাল্বটি ঠাণ্ডা হলে তার ভেতরের বাতাসও ঠাণ্ডা হয়ে সংকুচিত হত। ফলে তখন খোলা মুখ দিয়ে খানিকটা জল খাড়া নলের মধ্যে উঠে যেত বাইরের জলের লেভেল ছাড়িয়ে। ঐ নলের ভিতর উঠেযাওয়া জলের স্তম্ভটা (column) বাল্বের মধ্যকার বাতাসের চাপের সমান হবে। এখন জলের উষ্ণতা বাড়লে নলের জলটা উপরে উঠে আর জলের উষ্ণতা কমলে নলের জল নীচে নেমে যায়। তাতে বাইরের জলের উষ্ণতার তারতম্য বোঝা যায়। কিন্তু কত তফাৎ হল সেটা বোঝা যেত না। কারণ নলের গায়ে তাপমাপার কোন দাগ ছিল না। একই ভাবে বাল্বে বাতাসের উষ্ণতা বাড়লে তার বেড়ে যাওয়া আয়তনের চাপে নলের জল নেমে যেত, আর সেই বাতাসের উষ্ণতা কমলে তা সঙ্কুচিত হওয়ার ফলে নলের জলের লেভেল উপরে উঠে যেত। তাতে বাইরের বাতাসেরও উষ্ণতার তারতম্য বোঝা যেত। ফলে ঐ যন্ত্র দিয়ে ঐ জলের বা বাতাসের তাপের তারতম্য ঘটছে কিনা জানা যেত। গ্যালিলিও তাঁর এই যন্ত্রের নাম দেন থার্মোস্কোপ, আর এটাই আদি থার্মোমিটারের মডেল।

ঐ থার্মোস্কোপের কাচের বাল্বে বাতাস না রেখে সেখানে জল বা অন্য কোন তরল পদার্থ রাখলে তাও বাইরের তাপে সঙ্কুচিত প্রসারিত হতে বাধ্য। এই কথা ভেবে 1632 খৃস্টাব্দে জিন র‍্যায় (Gean Rey) নামে এক ফরাসী চিকিৎসক গ্যালিলিওর ঐ যন্ত্রে জল ভরে তার নলটাকে খাড়া করে বাল্বটাকে বাইরের জলে বসিয়ে একই ভাবে থার্মোমিটারের কাজ পেলেন। তারপরে ইটালির টুসকানীর গ্রাণ্ড ডিউক,—গ্যালিলিওর শিষ্য দ্বিতীয় ফার্ডিন্যাণ্ড (Ferdinand II) ঐ থার্মোমিটারের বাল্বে জলের পরিবর্তে অ্যালকোহল (wine)-এর প্রচলন করেন এবং খোলা নলের মুখ বন্ধ (Sealed) করে দেন না হলে অ্যালকোহল উবে যাবে। তারপর ফ্লোরেন্সের বিখ্যাত Accademia del cimento বা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার আকাদেমীতে এই থার্মোমিটারের ব্যবহার দীর্ঘদিন ধরে চলে। টুসকানীর রাজধানী ছিল ফ্লোরেন্স। তার শাসক বিজ্ঞানোৎসাহী মেডিসি পরিবারের (যার অন্যতম উপরোক্ত ডিউক ফার্ডিন্যাণ্ড) অর্থানুকুল্যে গ্যালিলিও ও তাঁর বিখ্যাত শিষ্যদের অনেকেই এই আকাদেমীতে কাজ করেন। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য নাম টরিসেলি (Evangelista Torricelli)—ব্যারোমিটারের আবিষ্কারক এবং বিখ্যাত গণিতবিদ ভিভিয়ানি।

কিন্তু আদির সেই থার্মোমিটারের গায়ে কোন পরিমাপের দাগ (Scale) ছিল না। এ বিষয়ে প্রখ্যাত ওলন্দাজ বিজ্ঞানী ক্রিশ্চিয়ান হাইগেন্‌স্‌ প্রথমে প্রস্তাব দেন যে জলের হিমাঙ্ক (Freezing point) ও স্ফুটনাঙ্ক (Boiling point) স্থির করে ঐ নিয়ে নলের গায়ে আনুপাতিক হারে দাগ কেটে বিভিন্ন অবস্থায় উষ্ণতার মাত্রা ঠিক করা যাবে। কিন্তু জলের স্ফুটনাংকে অ্যালকোহল থাকবেনা, তাই অন্য কোনও তরল পদার্থ ব্যবহারের চেষ্টা চলে এবং পারদকেই কাজে লাগান হয়। পারদের স্ফুটনাংক

* নবপল্লী বারাসাত ২৪ পরগনা

(357°C) জলের থেকে অনেক উপরে এবং হিমাঙ্ক (—39°C) জলের হিমাঙ্কের বেশ নীচে। সুতরাং থার্মোমিটারের নলে পারদের ব্যবহারই সুবিধাজনক বিবেচিত হয়। 1714 খৃস্টাব্দে জার্মান বিজ্ঞানী গ্যাব্রিয়েল ড্যানিয়েল ফারেনহাইট যে পারদ বা মার্কারি (Mercury) থার্মোমিটার তৈরি করেন তা তাঁর নামেই প্রচলিত এবং চিকিৎসাবিদ্যাতেই বেশী ব্যবহৃত। তাই এর অপর নাম ক্লিনিক্যাল (রোগী দেখার) থার্মোমিটার। ফারেনহাইট প্রথমে জলকে ঠাণ্ডা করে বরফ করেন, তারপর তরল করার জন্য তাতে অ্যামোনিয়া সল্ট দেন। ফলে সেই তরল জলের উষ্ণতা আসল জলের হিমাঙ্কেরও নীচে ছিল। আর সেটিকেই 'O' শূন্য বা জিরো (zero) পয়েন্ট ধরেন। তারপর সুস্থ মানুষের রক্তের উষ্ণতাকে 96° ডিগ্রী ধরেন। জলের স্ফুটনাংক ছিল আরও উপরে। অতবড় থার্মোমিটার বানানো তাঁর পক্ষে অসুবিধা হয়। তাঁর মৃত্যুর পর সেটা ঠিক করা হয় 212° ডিগ্রী। আর এই থার্মোমিটারে খাঁটি জলের হিমাংক হয় 32° ডিগ্রী। আগেই বলেছি ফারেনহাইটের শূন্য ডিগ্রীটা জলের হিমাংকের অনেক নীচে চলে গেছে। তাই পরে জলের স্বাভাবিক হিমাংককে শূন্য ডিগ্রী ধরে এবং তার স্ফুটনাংককে 100° ডিগ্রী মান দিয়ে যে কার্যকরী থার্মোমিটার তৈরি হয় তার নাম সেন্টিগ্রেড বা শত ডিগ্রী ভাগের থার্মোমিটার—এর আবিষ্কর্তা সুইডনের বিজ্ঞানী অ্যাণ্ডারস সেলসিয়াস। প্রস্তুতিকাল 1742 খৃস্টাব্দ। গ্যালিলিওর প্রথম চেষ্টা সেই 1592 থেকে একটা কার্যকরী থার্মোমিটার তৈরি করতে তা হলে কত সময় লেগেছে? এবং কতজনকে কতভাবে মাথা খাটাতে হয়েছে?

অবশ্য বিজ্ঞানের আরও উন্নত কাজের জন্য আর একটি বিশেষ থার্মোমিটার স্কেল পরে তৈরি হয়েছে,—একে বলে "Absolute scale" বা তার প্রবর্তকের নাম অনুসারে Kelvin scale। এতে শূন্য (O°) ডিগ্রী হচ্ছে —273°C, জলের হিমাংক O°C হচ্ছে 273°A (A হচ্ছে Absolute ডিগ্রী) আর স্ফুটনাংক (100°C) হচ্ছে 373°A অর্থৎ সেন্টিগ্রেড থেকে Absolute করতে হলে শুধু 273 যোগ করতে হবে।

বিজ্ঞানজগতে সাধারণভাবে এবং সারা ইউরোপে উষ্ণতা মাপার জন্য সেন্টিগ্রেড থার্মোমিটারই প্রচলিত। তবে রোগীদের জ্বর দেখার জন্য এবং বৃটিশ পদ্ধতিতে যে সব দেশে শিক্ষা ব্যবস্থা, সেখানে ফারেনহাইট থার্মোমিটারের ব্যবহার বেশি। বর্তমানে সব দেশেই বৈজ্ঞানিক কাজকর্মে সেন্টিগ্রেড থার্মোমিটারে হিসাব নেওয়া যুক্তিযুক্ত বলে গৃহীত হয়েছে। তাই ঐ সেন্টিগ্রেড কথার বদলে তার আবিষ্কর্তা বিজ্ঞানী সেলসিয়াস-এর নামই এখন উষ্ণতার একক ধরা হচ্ছে।

সেই অ্যানডারস সেলসিয়াস (ANDERS CELSIUS) ছিলেন সুইডেনবাসী। সুইডেনের উপসালা নামক স্থানে 1701 খৃস্টাব্দে 27শে নভেম্বর তারিখে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতামহ সেই অঞ্চলের একজন নামকরা জ্যোতির্বিদ ছিলেন। সেলসিয়াস গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ে শিক্ষালাভ করে তাঁর স্বদেশের উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে অধ্যাপনায় নিযুক্ত হন। অধ্যাপনাকালে তিনি ইউরোপের নানা বিশ্ববিদ্যালয়ের মানমন্দির পরিদর্শন করেন এবং কয়েক বছরের মধ্যে তিনি নিজে একটি উঁচু মানের মানমন্দির তৈরি করেছিলেন। 1733 খৃস্টাব্দে সেলসিয়াস সুমেরু প্রভা সম্পর্কে বেশ কয়েকটি বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ প্রকাশ করেন। এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য একাধিক বৈজ্ঞানিক অভিযান করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে নানা গবেষণাকালে সেলসিয়াস সেন্টিগ্রেড থার্মোমিটার আবিষ্কার করেছিলেন। সুইডেন বিজ্ঞান অ্যাকাডেমীতে তিনি সেন্টিগ্রেড থার্মোমিটার সম্পর্কে 1742 খৃস্টাব্দে প্রথম বক্তৃতা দিয়েছিলেন। ফারেনহাইট থার্মোমিটার থেকে তাঁর তৈরি থার্মোমিটার আলাদা ধরণের-সেকথা আগে বলা হয়েছে।

এখন সেন্টিগ্রেড বা সেলসিয়াস মাত্রাকে ফারেনহাইটে রূপান্তর করতে হলে আগের অঙ্ককে 9/5 দিয়ে গুণ করে তার সঙ্গে 32 যোগ করলেই হবে। আবার ফারেনহাইট থেকে 32 বাদ দিয়ে অবশিষ্টকে 5/9 দিয়ে গুণ করলে সেন্টিগ্রেড হবে। জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ের বিভিন্ন গবেষণা ছাড়াও সেলসিয়াস এই সেন্টিগ্রেড থার্মোমিটার আবিষ্কারের জন্য বেশী বিখ্যাত হয়ে আছেন। 1744 খৃস্টাব্দের 25শে এপ্রিল মাত্র 43 বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

প্লাস্টিক্স ও জৈবরসায়নের ক্রমবিকাশ

শিবানী বর্মন *

জৈবরসায়নে প্লাস্টিকের উৎপত্তি ও সেলুলয়েড সম্পর্কে আগে জানুয়ারী '85 সংখ্যায় কিছু আলোচনা হয়েছে। উদ্ভিদদেহের প্রধান উপাদান সেলুলোজ থেকে সেলুলয়েড ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য প্লাস্টিক তৈরির কৌশল জানার সঙ্গেই রসায়নবিদদের মনে প্রাণীদেহের মূলকাঠামো প্রোটিন থেকে প্লাস্টিক তৈরির সংকল্প জাগে। উদ্ভিদের নিজস্ব তৈরী বিশুদ্ধ সেলুলোজ হচ্ছে তুলো, তার থেকে সুতো, কাপড়, পোষাকাদি তৈরি হয়ে মানবসভ্যতার অগ্রগমনের সূচনা করে। আর সভ্য উন্নত মানুষ কাঠের গুঁড়ো, ধানের তুষ, গমের ভুসি ও অন্যান্য খাদ্যশস্যের খোসা থেকে সেলুলোজ পুনরুদ্ধার করে ভিসকোজ রেয়ন বা এসিটেট রেয়ন দিয়ে আসল তুলোর মত, এমন কি তার থেকেও উন্নত তন্তুর সুতো ও বস্ত্রাদি তৈরিতে সক্ষম হয়েছে। তেমনি পশুর লোম থেকে উৎপন্ন পশম এবং গুটিপোকার লালা দিয়ে তৈরী গুটি থেকে উৎপন্ন প্রকৃতিজাত রেশম, গরদ, তসর, এণ্ডি, মগা, মটকা প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিত সিল্কের গঠন-উপাদান জেনে নিয়ে তা দিয়েও প্লাস্টিক এবং কৃত্রিম রেশম তৈরির জন্য বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করতে থাকেন। তাই সেলুলয়েড তৈরির পরই প্রাণীদেহের প্রোটিন থেকে প্লাস্টিক তৈরির চেষ্টা চলে। সহজলভ্য প্রাণীজ প্রোটিন দুধ থেকে ছানা। তবে ছানার প্রোটিনের আসল নাম হচ্ছে কেজিন (Casein)। সাধারণ দুধ থেকে তৈরী ছানার মধ্যে বেশ কিছু স্নেহ পদার্থ (Fat) বা মাখন থাকে। শুদ্ধ কেজিন পেতে হলে দুধ থেকে আগে সেই মাখন তুলে নিতে হবে। আর মাখন-তোলা (Skim) দুধে কিছু এসিড (সাধারণত ল্যাকটিক এসিড) বা বিশেষ এনজাইম, রেনিন মিশিয়ে দিলে খাঁটি কেজিন জমাট বেঁধে পৃথক হয়ে যায়। উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষেই দুই জার্মান কেমিস্ট ভিলহেলম ক্রিস্কে ও এডল্ফ স্পিটেলার ঐ কেজিনের সঙ্গে ফর্মালডিহাইড মিশিয়ে পশুদের শিং-এর মত চেহারার একটি প্লাস্টিক বস্তু তৈরি করেন, দেখতে অনেকটা স্লেটের (Slate) মত হয়,—বেশ শক্ত মসৃণ চকচকে। তাই দিয়ে তাঁরা ভাল ব্যাকবোর্ড বানিয়ে ফেলেন। পরে এর থেকে নানান ব্যবহারযোগ্য বস্তু তৈরী হয়। 1900 খৃস্টাব্দেই এই কেজিন প্লাস্টিককে ব্যবসার উপযোগী করে জার্মানী ও ফ্রান্সের বাজারে "গ্যালালিথ" (galalith) নামে ছাড়া হয়। ল্যাটিন শব্দ Gala=milk, আর Lithos=stone অর্থাৎ দুধ থেকে পাথর। তারপর বহু গবেষণা করে ঐ কেজিন প্লাস্টিকের কালো স্লেটের মত রং-এর পরিবর্তন করা হয় এবং তার থেকে সুতো তৈরি করে "এরালাক" (Aralac) নামে বয়ন শিল্পে তার ব্যবহার চলে। প্রোটিনজাত সুতো হলেও ঐ এরালাক ঠিক পশম বা রেশমের সমতুল্য হয় নি। সেদিক থেকে বরঞ্চ রেয়নকেই নকল সিল্ক বলা হয়। তবে এরালাকতন্তুকে তুলো, পশম ও অন্যবিধ সুতোর সঙ্গে সহজে মেশান যায়, তাতে বস্ত্রশিল্পে অভাবনীয় পরিবর্তন আসে। আর মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারিক প্রয়োজনে এই প্লাস্টিক্স ও কৃত্রিম তন্তুর আবিষ্কার জৈবরসায়নের ক্রমবিকাশে অদম্য প্রেরণা সৃষ্টি করে। কারণ ব্যবসায়ীভিত্তিক প্রয়োজনীয় গবেষণায় সমগ্র ব্যবসায়ী গোষ্ঠী উৎসাহিত হয়ে ওঠে। তাতে জীবদেহজাত উপাদান ঐ সেলুলোজ ও কেজিন ছাড়া অন্য কোন খনিজ উপাদান বা অজৈব বস্তু থেকে প্লাস্টিক তৈরি সম্ভব কিনা সেই অনুসন্ধানও চলে। অবশ্য এই ধরণের গবেষণার মূল প্রেরণা এসেছিল একদা অবহেলিত আবর্জনা রূপে পরিত্যক্ত কয়লা থেকে উৎপন্ন বর্জ্যপদার্থ, আলকাতরা (Coaltar) নামধারী কদর্য বস্তুটিকে সুকৌশলে আংশিক পাতনের (Fractional distillation) ফলে নানাধরণের অত্যাশ্চর্য রাসায়নিক উপাদান—বিশেষ করে কৃত্রিম রং-এর অবিষ্কারের পর। ঐ ঘৃণ্য আলকাতরার বিভিন্ন উপাদানই জৈবরসায়নে তথা সমগ্র বিজ্ঞান প্রগতিতে বৈপ্লবিক পথ নির্দেশ করেছে। সেকথা পরে আলোচনা করা যাবে। এখন দেখা যাক অজৈব খনিজ উপাদান থেকে প্লাস্টিক তৈরির কৌশল।

প্লাস্টিকশিল্পের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় নাম—লিও হেনড্রিক বেকেল্যাণ্ড (Baekeland), বেলজিয়ামে জন্ম আমেরিকা নিবাসী বিশিষ্ট কেমিস্ট তিনি ঐ আলকাতরা থেকে উৎপন্ন ফেনল (যাকে সাধারণ কথায় বলে ফিনাইল) এবং মেথিলেটেড স্পিরিট থেকে তৈরী ফর্মালডিহাইড (Formaldehyde), এই দুটি উপাদানকে নানাভাবে একত্রে মিশিয়ে দীর্ঘ গবেষণার পরে 1909 খৃস্টাব্দে একটি নতুন প্লাস্টিক তৈরি করেন, রসায়নের ভাষায় যার নাম ফেনল-ফর্মালডিহাইড রেজিন বা ফেনলিক প্লাস্টিক

* 64A, গৌরীবাড়ী লেন, কলিকাতা-700 004

কিন্তু সাধারণে পরিচিত "বেকেলাইট" নামে (ঐ আবিষ্কার-কের নাম অনুসারে)। পরে অবশ্য ফেনল থেকে তৈরি আরও অনেক প্লাস্টিককে এই 'বেকেলাইট' নামেই চালান হয়। আগেই বলা হয়েছে যে এটি হচ্ছে থর্মোসেট গ্রুপের প্লাস্টিক অর্থাৎ নরম অবস্থায় একে ইচ্ছামত 'সেট' বা মোল্ড করা যায়। কিন্তু একবার শক্তহলেইআর দ্বিতীয়বার তার চেহারা বদলান যায় না, কারণ দ্বিতীয়বার একে আর নরম করা যায় না। সুতরাংছাঁচে ঢেলে (Casting করে) এর থেকে বহু রকমের শক্ত জিনিষ তৈরি হয়। আর একে তরল অবস্থায় রাখতে পারলে অর্থাৎ এর সলিউশন (Solution) তৈরি করলে তা হয় খুব ভাল আঠা বা এডেসিভ (Adhesive), যা দিয়ে কাঠ, কাগজ, কাপড় ও অন্য বহু জিনিষকে বেশ শক্ত করেই জোড়া যায়। এইভাবে প্রত্যক্ষ জীবদেহজাত উপাদানের বাইরে খনিজাত ও অন্যভাবে প্রাপ্ত অথবা কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত জৈব উপাদান থেকে প্লাস্টিক তৈরির কৌশল একবার জানার পর থেকেই অর্থাৎ ঐ 1909 খৃস্টাব্দের পরেই কৃত্রিম উপায়ে প্লাস্টিক তৈরির নানা পদ্ধতি এবং তাদের ব্যবহারযোগ্য ব্যবসায়ভিত্তিক প্রতিযোগিতা অভাবনীয়ভাবে সুরু হয়ে যায়। এখন তাই বহু সাধারণ উপাদান থেকেই প্লাস্টিক তৈরি হয়। তার মধ্যে সহজলভ্য উল্লেখযোগ্য হচ্ছে পেট্রেলিয়ামজাত উপাদান (বাইপ্রোডাক্টস্) প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, কয়লার গ্যাস, আলকাতরা থেকে উৎপন্ন বাইপ্রোডাক্টস্, চুনাপাথর, চুন, বিভিন্ন রকমের লবণ, গন্ধক এমনকি সাধারণ জল ও বাতাস। এসবের প্রস্তুতি ও ব্যবহৃত উপকরণগুলির বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করতে গেলে মহাভারত হবে। তাই এদের মধ্যে অল্প কয়েকটি অতি পরিচিত প্লাস্টিকের একেবারে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এই স্বল্প পরিসরে তুলে ধরতে চাই।

বস্ত্রশিল্পে অতিচেনা নাম 'নাইলন'। যেমন শৌখিন রুচিকর, রেশমতুল্য নরম চাকচিক্যময়, তেমনি দৃঢ়, টেকসই এবং বহুমুখী এর ব্যবহার। যদি বলা হয়—এই মহামূল্য বস্তুটি নোংরা কয়লা থেকেই তৈরি—তা হোলে কেমন লাগে? হাঁ—কথাটি সত্য, তবে পুরোপুরি নয়। কারণ সোজাসুজি কয়লা থেকেই এটা তৈরি হয় না, কয়লার বিশেষ অংশ থেকেই এর সৃষ্টি। নাইলন তৈরিতেআবশ্যকীয় প্রাথমিক উপাদান হচ্ছে কয়লা থেকে জাত ফেনল অথবা বেনজিন। এই দুটোর যেকোন একটার সঙ্গে বাতাস থেকে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন এবং জল থেকে হাইড্রোজেন অণু সরবরাহ করে ধারাবাহিক রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রথমে অ্যাডিপিক এসিড ও হেক্সামেথিলিন ডাই অ্যামাইন নামে দুটি পৃথক জৈবযোগ সৃষ্টি হয়। তারপর নিয়ন্ত্রিত তাপে ও চাপে তাদের মধ্যে পরবর্তী রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে নাইলন তৈরি হয়। ঠান্ডা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এগুলি শক্ত হয়ে সাদা সাদা মার্বেল কুচির মত দেখায়। তার পরে তাতে বিশেষ তাপ দিলে তা নরম হয়ে যায় এবং তখন ইচ্ছা মত রূপ দেওয়া যায়। তাই এটি থার্মোপ্লাস্টিকেরই দলে। তাপে তরল নাইলনকে সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত ছাঁকনির ভিতর দিয়ে ঠেলে বার করলে মাকড়ার সূতার মত মসৃণ, চিক্কন, স্বচ্ছ সূক্ষ্ম তন্তুর সৃষ্টি হয়। বাতাসেই তা ঠাণ্ডা হয়ে যায় এবং তার পরই তাদের রোলারের সাহায্যে টেনে আরও বিস্তৃত (লম্বালম্বি Stretch) করা হয়। প্রাথমিক তন্তুকে এইভাবে টেনে চারগুণ পর্যন্ত লম্বা করা যায়। তার পরে অন্যান্য তন্তুর মতই এদের পাকান ও বোনা হয়। তৈরির সময়ই প্রয়োজন বোধে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় এর স্বচ্ছভাব দূর করে নানা রকম রং ফলানো যায়।

নাইলন তুলোর থেকে হালকা, অথচ অনেক বেশি শক্ত, রেশমের চেয়েও দৃঢ়, ঘাতসহ এবং যেকোন তন্তুর চেয়ে বেশী স্থিতিস্থাপক (ইলাস্টিক) ও টেকসই। তৈরির সময় নাইলন তন্তুকে ইচ্ছামত লম্বা করা যায় অথবা প্রয়োজনমত ছোট কুচি (Staple) করে অন্য তন্তুর সঙ্গে এদের মেশানও (Blend) যায়। নাইলনকে সহজে পরিষ্কার করা যায়, জলে ভিজলে তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়, কাপড়ে ভাঁজ ধরে না বা কুঁচকায় না, তাই ইস্ত্রি করতে হয় না। জলে পড়ে থাকলে পচে যায় না, ঘরে গুছিয়ে রাখলে পোকায় কাটে না, বিশেষ করে রেশমের মত একে মথে খায় না। অন্য প্লাস্টিকের মত তাপে সহজে গলে না। এর গলনাঙ্ক 263° সেন্টিগ্রেড। এর উৎপাদনে যে হেকসামেথিলিন ডাই অ্যামাইন যৌগটির ব্যবহার, রসায়নের ভাষায় তা হচ্ছে একটি অ্যামাইড। তারই পলিমার হিসাবে নাইলনের সৃষ্টি তাই নাইলনকে রসায়নবিদরা পলিঅ্যামাইড্স্ বলে। আবার প্রাকৃতিক উপাদান প্রোটিনকেও রসায়নে পলিঅ্যামাইড্স্ বলা হয়। [আসলে অ্যামাইড্স্ থেকেই প্রথমে প্রকৃতিরাজ্যে অ্যামাইনো এসিডের উৎপত্তি এবং কালক্রমে নানাভাবে তাদের বিভিন্ন রকমের সংযোজনে বিভিন্ন রকমের প্রোটিন পদার্থের সৃষ্টি। প্রকৃতিরাজ্যে অ্যামাইনো এসিডের সংখ্যা মাত্র 26টি। কিন্তু তার থেকে সৃষ্ট প্রোটিনের সংখ্যা কয়েক-শ (চার শতাধিক)। তবে জীবদেহ ও জীবন সৃষ্টির অতি গুরুপূর্ণ উপাদান হচ্ছে এই প্রোটিন]। সুতরাং ব্যবসায়িক প্রয়োজনে নাইলন তৈরি করতে গিয়ে মানুষ কৃত্রিম উপায়ে প্রোটিন তৈরির প্রাথমিক কৌশলই জেনে ফেলে এবং ঐ অতিকায়

জটিল জৈব অণু সৃষ্টিতে যে, কোন অলৌকিকত্ব নেই, হঠাৎ খেয়াল বশে একে যে তৈরি করা যায় না সেইকথা বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানানুরাগীমাত্রেই জানে। তাই নাইলন হচ্ছে মনুষ্যকৃত এক ধরণের প্রোটিন প্লাস্টিক। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে তার ব্যবহার এতই বহুমুখী যে, কোন প্রকৃতিজাত পদার্থ দিয়ে তা সম্ভব নয়। কারণ প্রকৃতির নিজস্ব শক্তিতে এরকম বস্তুর সৃষ্টিই হয় না। এখন দেখা যাক কী কাজে কতভাবে লাগে সেই নাইলন।

আসল সিল্ক ও উলের মত কৃত্রিম তন্তু উদ্ভাবনের কাজে দেশে দেশে বহু বিজ্ঞানীর বহু গবেষণার মধ্যে ডব্লিউ, এইচ. ক্যারোথারস্ নামে জনৈক আমেরিকান কেমিস্ট 1928 খৃস্টাব্দে এই নাইলন আবিষ্কার করেন। কিন্তু একে ব্যবহারযোগ্য করে বাজারে ছাড়তে আরও একযুগ বা পুরো 12 বছর সময় লেগে যায়। 1940 খৃস্টাব্দে আমেরিকার ডু পন্ট কোম্পানী—'নাইলন' নাম দিয়ে এই প্লাস্টিকের ব্যবসা সুরু করে। প্রথমে শুধু মোজা বা স্টকিংসই তৈরি হত এই নাইলন দিয়ে। লোকে 'নাইলন' আর "স্টকিংস" একই কথা ভাবত। পরে প্লাভস্, আণ্ডারউয়্যার ও গেঞ্জি জাতীয় জিনিস তৈরি হতে থাকে নাইলনের ঈষৎ কুঁচকান ইলাস্টিক একটানা লম্বা সুতো দিয়ে। ক্রমে নাইলনের উৎপাদন পদ্ধতিতে কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটতে থাকে, ফলে তার গুণে-ধর্মে ও চেহারায় বেশ বিভিন্নতা আসে। নাইলনকে তখন একটিমাত্র প্লাস্টিক না ভেবে তাদের বিভিন্ন আকৃতির একদল প্লাস্টিক বলেই ভাবা হয়। ওদের আকার ও গুণের পার্থক্য অনুসারে ব্যবহারের তারতম্যও ঘটে। প্রস্তুতি পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যেই এদের ইচ্ছামত বা প্রয়োজনমত কোমল ও কঠিন করা সম্ভব হয়। তবে এদের সাবিক দৃঢ়তা, শক্তি ও সহনশীলতা সবক্ষেত্রে প্রায় সমানই থাকে। তাই 1950 খৃস্টাব্দের পর দেখা যায় নাইলন দিয়ে একদিকে রেশমতুল্য নরম চিকন মনোহর বস্ত্র ও পোষাক তৈরি হচ্ছে, অন্যদিকে শক্ত মোটা দড়ি কাছি এবং আরও কর্কশ কঠিন রোঁয়া বা কুঁচি ও তারের মত শক্ত সুতার জিনিষপত্রও বাজারে এসে গেছে। কর্কশ কুচি লাগে বুরুশ তৈরিতে। আগে বিভিন্ন পশুর (বিশেষ করে বুনো শুওরের) শক্ত লোম দিয়েই বুরূশ তৈরি হত। কিন্তু লোভী ব্যবসায়ী ও নৃশংস শিকারীদের বেহিসেবী আক্রমণে ঐ প্রাণীর সংখ্যা এতই কমে যায় যে সভ্যসমাজে বুরুশের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে ঐ নাইলনের রোঁয়াই একমাত্র বিকল্প হয়ে সভ্যতার পরিত্রাতা হয়ে দাঁড়ায়। কারণ নিত্যব্যবহার্য অনেক জিনিষই আমাদের বুরুশের সাহায্যে পরিষ্কার করা একান্ত দরকার।

নেলব্রাশ তো নাইলন দিয়েই তৈরি হয়। তারপর চুলের ব্রাশ, কোটের ব্রাশ, দাড়ি কামানোর ব্রাশ এমনকি জুতোর ব্রাশেও এখন ঐ নাইলন—হয় পুরোপুরি, না হয় মিশ্রিতভাবে উপস্থিত। মুখ হাত ধোয়ার বেসিন, প্যান—ঘরের সৌখিন মেজে-দেয়াল এবং অনেক আসবাব ও তৈজসপত্র পরিষ্কারেও বুরুশের প্রয়োজন। এইখানে নাইলনের রুক্ষ রোঁয়া না হলে সভ্যতার সঙ্কটই দেখা দিত। তাছাড়া পশুলোমে অনেক সময় রোগজীবাণু সংক্রমণের আশঙ্কা ছিল। কিন্তু নাইলনের রোঁয়া ও সূতোকে যথা সম্ভব জীবাণুমুক্ত অবস্থায় পাওয়া এবং সহজে জীবাণুশূন্য করে ব্যবহার করা যায়। তাই শল্যচিকিৎসকগণ আগে অপারেশনে বাইয়ের চামড়া সেলাইতে (Suture) যেখানে তুলো বা সিল্কের সুতো ব্যবহার করে জীবাণুর ভয়ে শঙ্কিত হতেন এখন সেখানে নাইলনের শক্ত সরু সুতো নিরাপদে ব্যবহৃত হচ্ছে। দাড়ি কামানর ব্রাশেও আগে অনেক প্রতিক্রিয়া হত, নাইলনের ব্রাশে তা বন্ধ হয়েছে। আর বস্ত্র পোষাকের চেয়ে মাছধরার কাজে বেশি শক্ত সূতার দরকার—বিশেষ করে সমুদ্রে মৎস্য শিকারে,—সেখানে শুধু বড় বড় মাছ নয় হাঙর তিমি প্রভৃতিও ধরা হয়। নাইলনের সূতো এবং তার জালই আজ সেখানে প্রধান সহায়। ছিপ দিয়ে মাছ ধরার কাজেও এখন আর সাধারণ সূতো বা রেশম সুতোরও কদর নেই। নাইলন সুতো সেখানে বেশী আদৃত ও ব্যবহৃত। ছিপের হুইলটাও এখন নাইলনে তৈরী। নাইলনের ছাতাতো সবার পরিচিত কিন্তু সবচেয়ে মজবুত ছাতার কাপড় লাগে প্যারাসুটে, তার কাপড় এবং দড়িদড়া সবই এখন নাইলনের। যুদ্ধের তাঁবু তৈরিতে নাইলনের দরকার। আবার বন্দুক রাইফেলের কুঁদাও (Rifle stock) এখন নাইলন দিয়েই তৈরী। তবে সৈন্যদের বর্ম হিসাবে নাইলনের পোষাক বুলেটের গুলি থেকে তাদের রক্ষা করবে এমন কথা কি ভাবা যায়? হাঁ—তাও সম্ভব হয়েছে। গত কোরিয়ার যুদ্ধে সৈন্যদের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত নাইলনের বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট তাই প্রমাণ করেছে। আগে এই রকম আর্মার জ্যাকেট বা যুদ্ধের বর্ম, ইস্পাত প্রভৃতি বিশেষ ধাতু দিয়েই তৈরি হত। কত ঝামেলা ছিল তাতে!

যে বস্তু ইস্পাতের মত শক্ত হতে পারে এবং ইচ্ছামত যার চেহারার পরিবর্তন করা যায় তার দিকে এযুগের বিশ্বকর্মাদের অর্থাৎ সৃজনশীল ইঞ্জিনীয়ারদের দৃষ্টি আকৃষ্ট না হয়ে পারে কি?৷ তাই ইঞ্জিনীয়ারিং কাজে বহু ঘাতসহ যন্ত্রাংশ তৈরিতে নাইলনের ব্যবহার ক্রমশঃই বাড়ছে। মজবুত গিয়ার, হুইল, বিয়ারিংস, ক্যাম

(Cams), স্পীডোমিটার এবং বহু রকমের টেকসই মেশিন পার্ট্‌স, পাইপ ও শক্ত গৃহস্থালী উপকরণ তৈরিতে এখন নাইলনের বহুল ব্যবহার। কারণ নাইলন শুধু শক্ত এবং দৃঢ় নয়, এটি অসাধারণ ঘাতসহ অর্থাৎ ঘর্ষণে ও আঘাতে ধাতুর মত এটি ক্ষয়ে যায় না। আবার সাধারণ তাপে বিকৃতও হয় না। কেমিক্যালস-এর বিরুদ্ধেও এর প্রচন্ড প্রতিরোধ শক্তি অথচ নিখুঁতভাবে নির্দিষ্ট ছাঁচে একে মোল্ড করা যায়।

নাইলনের মত আরও কিছু প্রোটিনপ্লাস্টিক তৈরি হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য মেলামিন-ফর্মালডিহাইড ও ইউরিয়া-ফরমালডিহাইড। এদের অ্যামাইনো প্লাস্টিকও বলে। কারণ অ্যামাইনো এসিড থেকেই এরা তৈরি। এরা মূলত থার্মোসেট গ্রুপের প্লাস্টিক, চকচকে মসৃণ ও নানান রঙের করা যায়। টেবিলের কভার, বোতাম চিরুনি, ইলেকট্রিক যন্ত্রাংশ, রেডিও টেলিভিশনের কেবিন সহ বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং পার্টস এদের দিয়ে তৈরী হয়।

আমাদের সাধারণের নামজানা আর দু-একটি প্লাস্টিকের কথা এখানে বলতে হয়। তার মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত নাম পলিথিন। আসল রাসায়নিক নাম পলিএথিলিন (Pollyethylene),। এথিলিন নামক খুব সরল জৈবযৌগটির (CH_2CH_2) পলিমার। শুধুমাত্র কার্বন আর হাইড্রোজেন অণুদের পরপর সরল চেনে যুক্ত করেই কি অপূর্ব এক প্লাস্টিকের সৃষ্টি। বাজারে এখন যত রকমের প্যাকেট আর থলি তার প্রায় সবই তো পলিথিনের। লজেঞ্জের মোড়ক প্যাকেট থেকে আরম্ভ করে বাজার-থলি (অবশ্য নাইলন দিয়েও বাজার-থলি হয়েছে)। দোকান থেকে কিছু দামী জিনিষ কিনলেই তো এখন বিনামূল্যে একটা পলিথিনের ব্যাগ বা ঠোঙাই দিয়ে দেয়। এমন কি দুধ বিক্রী হচ্ছে এখন নিখুঁত পলিথিন প্যাকেটে মাদার ডেয়ারী থেকে। পলিথিন চাদর (শীট) তো বাগানে, পথে ঘাটে বসার আসন, মাদুরের কাজ দিচ্ছে, গায়ে মাথায় জড়িয়ে বৃষ্টির হাত থেকে (rain cover) বাঁচাচ্ছে, অস্থায়ী চালা হিসাবে তাঁবুর মত কাজ দিচ্ছে (যেখানে হোগলা, টালি, খড় ইত্যাদি লাগত) শহরে ফুটপাথ দোকানীদের রোদবৃষ্টি থেকে বাঁচার এখন একমাত্র সহায় হচ্ছে এই পলিথিনের শিট। আবহাওয়া অফিসের বিশেষ বেলুন সব এই পলিথিনে তৈরী। দেয়ালে বাষ্প (moisture) রোধক উপাদান হিসাবে কংক্রিটের তলায় পলিথিন শিট দেওয়া হচ্ছে। মেজেকেও (Floor) অনুরূপভাবে damp proof করা হয়। কত রকমের পাইপ, টিউব, জ্যাকেট সব তৈরি হচ্ছে পলিথিনে। বোতল, ডিস, গামলা (Bowl) বালতি, ট্রে, থালা বাটি, কাপ, খেলনা কিনা হচ্ছে পলিথিনে। ঔষধের বোতল প্রায় সবই তো এখন পলিথিনের, বিশেষ করে স্কুইজবট্‌ল, জলের বোতল, ড্রপারের নল, এসিড বা অ্যালকালির জার, কারণ পলিথিন সব রকমের কেমিক্যাল রোধক (Resistant)। একই ভাবে বিদ্যুৎরোধক হিসাবে ইলেট্রিক কেব্‌ল্‌সের মোড়ক (Insulator)। আবার পলিথিন থেকে তন্তুও (Fibre) হয়, একটু চওড়া তন্ত দিয়ে ডেক-চেয়ারের ছাউনি হচ্ছে, আর সরু সুতো বানিয়ে মাছ ধরার জালও হচ্ছে, সমুদ্রে ট্রলিং নেট (Trawl nets) এই পলিথিনেরই সুতোয় হয়—সাধারণভাবে প্লাস্টিক সুতো নামে পরিচিত (তুঃ-নাইলন সুতো)।

পলিথিনের সঙ্গে ক্লোরিন কণা (পরমাণু) জুড়ে দিতে পারলে হয় পলিভাইনিল ক্লোরাইড পলিমার (P.V.C.)। এথিলিনের (CH_2CH_2) একটা হাইড্রোজেন পরমাণু সরিয়ে তার জায়গায় একটা ক্লোরিন পরমাণু (CH_2CHCL) যুক্ত হয়। তবে ঐ ক্লোরিন এটম টি সোজাসুজি কার্বণ এটমের সঙ্গেই যুক্ত হয়। এই পলিভাইনিল প্লাস্টিক, পলিথিনের চেয়ে শক্তিশালী এবং আরও দৃঢ় থার্মোপ্লাস্টিক, পলিথিনের সবরকম ব্যবহারের ক্ষেত্রেই এটি সমানে চলে, বাহির থেকে দেখে তাই পলিথিন আর পলিভাইনিলকে পৃথক করা যায় না। অন্য সুপরিচিত প্লাস্টিক হচ্ছে পলিএস্টার, সাধারণে যাকে বলে ডেক্রণ (Dacron) অন্যটি টেরিলিন। একইভাবে সাধারণ কাঁচ বা গ্লাসের তুল্য প্লাস্টিক—প্লেক্সিগ্লাস তৈরি হয়েছে যা অনেকক্ষেত্রে সাধারণ গ্লাস থেকে বেশী কার্যকর।

তবে প্লাস্টিক দিয়ে শুধুমাত্র বাহিরের ব্যবহারযোগ্য জিনিসই নয় মানব শরীরে বিভিন্ন অঙ্গে উন্নত প্লাস্টিককে অপারেশন দ্বারা সংযোজন করে অনেক অকেজো অঙ্গকে সুস্থ সক্রিয় করে তোলা হচ্ছে, যার দ্বারা অন্ধ মানষ দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাচ্ছে; খোঁড়া পঙ্গু অনেক সুস্থভাবে হেঁটে চলে বেড়াতে পারছে, অকেজো হৃদপিণ্ডের কপাটিকা বা ভাল্‌ব্‌কে সারিয়ে তোলা হচ্ছে, ক্ষতিগ্রস্ত ট্র্যাকিয়া, ল্যারিংক্স, ধমনী, মূত্রনালী প্রভৃতিকে যথাযথ রিপেয়ার বা অনেকাংশ পরিবর্তন করে দেওয়া হচ্ছে। তাই প্লাস্টিক আজ এক যুগান্তর সৃষ্টি করেছে। এর উৎপাদনে পরিবেশদূষণের ভয় সর্বদাই রয়েছে, তবে তার পিছনে বিজ্ঞান ততখানি দায়ী নয়—যতখানি দায়ী সংকীর্ণ স্বার্থের সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা।

স্বাগত হ্যালি

রণতোষ চক্রবর্তী*

রাজার মৃত্যুতেও অনুরক্ত প্রজারা যেমন "রাজা দীর্ঘজীবী হউন"—কমনা করে ("The king is dead, —Long live the King"—এই রকম প্রবাদ বাক্য) —সেইভাবে প্রখ্যাত জ্যোতিবিজ্ঞানী এডমণ্ড হ্যালী (1656-1742) প্রায় আড়াই শত বছর আগে মারা গেলেও প্রকৃত বিজ্ঞানানুরাগীরা আজও—"হ্যালি স্বাগতম, হ্যালি—তুমি যুগে যুগে এসো"—এইকথা মনে মনে কামনা করে। হ্যালি নিজে আর আসতে পারবেন না। কিন্তু তাঁর নামের ধূমকেতুটি প্রতি শতাব্দীতে অন্তত একবার—কখনওবা দুবার (যেমন এই বিংশ শতাব্দীতেই) পৃথিবীর মানুষের সামনে কয়েক দিনের মত দেখা দিয়ে একদিকে হ্যালির অপূর্ব বিজ্ঞানকৃতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, অন্যদিকে অজ্ঞতাজনিত অন্ধবিশ্বাসের আতঙ্ক দূর করে যথার্থ বিজ্ঞান কিভাবে সাবলীল গতিতে জনমানসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তারই বলে কিহারে মানবসভ্যতা দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে তারই এক কালজয়ী উদাহরণ হিসাবেই হ্যালী আমাদের সামনে উপস্থিত হয়।

* * *

1910 খ্রীষ্টাব্দের পর হ্যালির ধমকেতু আবার আসছে। জ্যোতিবিজ্ঞানীদের কাছে এ এক দুর্লভ সুযোগ। সূর্যের পূর্ণগ্রাসের সময় সূর্যকিরীট বা, মেরু প্রদেশের মেরুপ্রভা প্রত্যক্ষ করা যেমন রোমাঞ্চকর তেমনি হচ্ছে হ্যালির ধূমকেতু। হ্যালির ধূমকেতু অতি প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ দেখে আসছে। যদিও অতীতে এটি এ নামে পরিচিত ছিল না। মহাভারতের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বিবরণীতে পুষ্যা নক্ষত্র পথে যে মহাঘোর ধূমকেতু দেখা গিয়েছিল, অনেকের মতে সেটি হ্যালির ধূমকেতু ছাড়া অন্য কিছু নয়। 1682 খ্রীঃ ইংরেজ জ্যোতিবিদ এডমণ্ড হ্যালি এই ধূমকেতু পর্যবেক্ষণ করে ও নানা হিসাব কষে প্রায় 75 বৎসর অন্তর একে দেখা যাবে বলেছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে, সেই থেকে এই ধূমকেতুর সঙ্গে হ্যালির নাম যুক্ত হয়ে আছে।

প্রকৃতপক্ষে ধমকেতুর জন্মরহস্য বা এদের প্রকৃতি সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের জ্ঞান এখনও সীমিত। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বলা যায়, সূর্যই ধূমকেতুর উৎস, সেই ভাবে এরা সৌরজগতের অংশ। তবে সূর্যকে এদের প্রদক্ষিণ করার পথ বৃত্তাকার নয়—Eliptical, অর্থাৎ অনেকটা লম্বাটে ধরণের। যেমন হ্যালি সৌর-জগতের একেবারে শেষ প্রান্ত—প্রায় প্লুটোর কাছাকাছি পর্যন্ত পাক দিকে আবার সূর্যের দিকে এগিয়ে আসে। আসলে ধূমকেতু যখন সূর্যের কাছে আসতে থাকে তখনই একে উজ্জ্বল দেখায় এবং সবচেয়ে উজ্জ্বল দেখায় এর মাথার কেন্দ্রীয় অংশ, যাকে নিউক্লিয়াস বলা হয়। এর বাইরের বাষ্পীয় আবরণী অংশকে বলে "কোমা"। অবশ্য ধূমকেতুর সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অংশ হচ্ছে এর বিশাল বিস্তারিত পুচ্ছ বা লেজ। সূর্যের কাছে আসার সঙ্গে সঙ্গে ধূমকেতুর ভৌত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। সূর্যের প্রচণ্ড উত্তাপে ধূমকেতুর গ্যাসীয় অংশ আয়তনে বেড়ে যায়—এবং এরই একটি অংশ বিস্তারিত পুচ্ছের আকার ধারণ করে—স্বভাবতই এইটি সূর্যের বিপরীত দিকে প্রসারিত হয়ে থাকে।

জানা গিয়েছে হ্যালির ধূমকেতু আগামী বছর 1986 খ্রীঃ খালি চোখেই দেখা যাবে। সূর্যের দিকে এগিয়ে আসার খবর ইতিমধ্যে 1982 খ্রীঃ 16ই অক্টোবর আমেরিকার একটি মানমন্দির সর্বপ্রথম দিয়েছেন। এবার হ্যালির ধূমকেতুকে বিশদ ভাবে পর্যবেক্ষণের জন্য এক সুপরিকল্পিত পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বস্তুত আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার নবতম কৌশলে হ্যালিকে প্রত্যক্ষ করার ব্যবস্থা হবে, যা এর আগে কখনও সম্ভব হয়নি। এ বিষয়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের NASA (National Aeronautics and Space Administration)-এর পরিচালনায় International Halley Watch (I H W) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ধূমকেতুর কাছাকাছি অঞ্চলে যন্ত্রযান পাঠিয়ে এর বিভিন্ন খবর সংগ্রহের জন্য একাধিক মহাকাশ-যান ইতিমধ্যেই ধূমকেতুর দিকে এগিয়ে চলেছে। সোভিয়েট থেকে Vega-I ও Vega-II এ ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা নেবে বলে আশা করা যায়। অবশ্য এই Vega যন্ত্রযান শুক্র বা Venus গ্রহকে পরিক্রমা করে হ্যালির দিকে যাবে। এছাড়া জাপান থেকে দুটি মহাকাশযান এ বছরের ('85) জানুয়ারী ও অগাস্ট মাসে হ্যালির দিকে পাঠাবার ব্যবস্থা হয়েছে। এগুলি ছাড়া ইউরোপের কয়েকটি দেশ একত্রিত ভাবে European Space Agency মাধ্যমে হ্যালির ধূমকেতু পর্যবেক্ষণের জন্য GIOTTO নামে একটি মহাকাশযান আগামী জুলাই (1985) মাসে উৎক্ষেপনের পরিকল্পনা

* সুরেন্দ্রনাথ কলেজ কলিকাতা-700 009

নিয়েছেন।

বস্তুতপক্ষে এসব মহাকাশযান নিজেদের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় রক্ষা করে কাজ করবে এবং আগামী 1986 খৃঃ মার্চ মাসে হ্যালির সর্বাপেক্ষা কাছে থেকে এই ধূমকেতু সম্পর্কে নানা তথ্য অনুসন্ধান করবে। যেমন ইউরোপীয় মহাকাশযান 'জিওটো' (Giotto) হ্যালির ধূমকেতুর নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রের 100 কিঃ মিঃ মধ্যে ঢুকে তথ্যাদি সংগ্রহে সমর্থ হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এবার হ্যালি ধূমকেতুর আগমনকে কেন্দ্র করে ধূমকেতু সম্পর্কে, সেই-সঙ্গে সৌরজগত বিষয়ে নানা তথ্য সংগ্রহ সম্ভব বলে আশা করা যায়।

বলা বাহুল্য, এর আগে হ্যালির ধূমকেতু বা অন্যান্য ধূমকেতু বিষয়ে পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকেই যাবতীয় অনুসন্ধান কাজ চালান হয়েছে। এইবারই সর্বপ্রথম মহাকাশ থেকে মহাকাশীয় ধূমকেতু বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা হবে এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানিগণ প্রায় নিশ্চিত যে মহাকাশযান থেকে সংগৃহীত মূল্যবান তথ্য থেকে বিজ্ঞানের নানা রহস্য উন্মোচনে এসব তথ্য অত্যন্ত সহায়ক হবে।

ধূমকেতুর জন্মরহস্য ও জীবনকথা

সনাতন মাঝি

ধূমকেতুর উৎপত্তি সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা আজও নির্দিষ্ট কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে না পারলেও তাঁদের প্রস্তাবিত মতবাদগুলির মধ্যে নিম্নোক্ত কয়েকটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

1) জগৎসৃষ্টির আদিম উপাদান ঘনীভূত হয়ে মহাকাশে গ্রহ-তারাদের বস্তুময় দেহ গঠনের পরে অবশিষ্ট যে অত্যল্পপরিমাণ সৃষ্টিক্ষম উপাদান (Building materials) প্রায় অদৃশ্য অবস্থায় নিতান্ত পাতলা (Rarefied) হয়ে গ্রহ-তারাদের ফাঁকে ফাঁকে ভেসে বেড়াচ্ছিল সেগুলি কালক্রমে পুঞ্জীভূত হয়ে বিশেষ কক্ষপথে ঘূর্ণ্যমান অতি হাল্কা এই জ্যোতিষ্কদেহের রূপ নিয়েছে। [বৃহৎ অট্টালিকা তৈরির পরে তার চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকা চুন-বালি ইটের টুকরো প্রভৃতি পরিত্যক্ত উপাদানগুলিকে পরে ঝাঁটিয়ে জায়গায় জায়গায় জড় করার মতই।]

2) প্রথমে সৃষ্ট কোন এক (বা একাধিক) জ্যোতিষ্কদেহ বিশেষ কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে (সংঘর্ষে বা বিস্ফোরণে) তার বিক্ষিপ্ত অংশগুলি দূরে দূরে ক্রমে পাতলা হয়ে ছড়িয়ে পড়ে ধূমকেতুর আকার নিয়েছে। (Remnants of shattered worlds)।

3) নেদারল্যাণ্ডের বিশিষ্ট জ্যোতির্বিজ্ঞানী J. H. Oort. 1950 খৃস্টাব্দে বলেন যে সৌরজগতের দূরতম গ্রহের কক্ষপথের ওপারে এক বিস্তীর্ণ হিমায়িত অঞ্চলে জমান রয়েছে ধূমকেতুদের বিপুল ভাণ্ডার (Vast Store house of Comets)। প্রবল হিমায়িত অবস্থায় (Deep Freeze) নিষ্ক্রিয় মেঘের আকারে সেখানে জমা আছে কম করেও একশত বিলিয়ন (100,000,000,000) ধূমকেতু। এই অঞ্চলের অবস্থান প্রায় আন্তর্নক্ষত্রীয় মধ্যস্থানে অর্থাৎ আমাদের নক্ষত্র—সূর্য ও তার নিকটবর্তী অন্য নক্ষত্রের মধ্যে উভয় সীমার বাইরে নির্লিপ্ত অঞ্চলের প্রায় মাঝা মাঝি জায়গায়। বাইরের ঐ নক্ষত্র তার গতিপথের বিশেষ অবস্থায় এসে সেই নিষ্ক্রিয় অঞ্চলে মহাকর্ষের জোর খাটালে ধূমকেতুর মেঘগুলি চঞ্চল হয়ে উঠে এবং বিশেষ গতি পায়। তখন আমাদের নক্ষত্রও (সূর্য) তাদের টানতে থাকে, ফলে তাদের অনেকে ছুটে আসে সূর্যেরই দিকে। পথে বৃহস্পতি শনি প্রভৃতি বড় বড় গ্রহগুলির মহাকর্ষবলও তাদের উপর খাটে। আর ঐ উভয়বিধ আকর্ষণে (সূর্যের ও গ্রহদের দ্বারা) প্রভাবিত হয়ে একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সূর্য এবং ঐ গ্রহকে বেষ্টন করে ঘুরতে থাকে ধূমকেতুরা। এইভাবে ধূমকেতুদের নিয়ে বিভিন্ন গ্রহের আবার আলাদা আলাদা পরিবার আছে, সবাই অবশ্য যৌথভাবে সৌর-পরিবারের সদস্য। যাই হোক সেই কক্ষপথে অসংখ্য আবর্তন—কেউ কেউ মাত্র কয়েক শত আবার কেউ কেউ লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি আবর্তন—শেষ করে তাদের ঘূর্ণায়মান অতি পাতলা মেঘপুঞ্জের বস্তুসামগ্রী ধীরে ধীরে সবটাই হারিয়ে ফেলে মহাশূন্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় অথবা কখনো হঠাৎ বিস্ফোরিত বা বিচ্ছুরিত হয়ে (disintegrated) অসংখ্য ক্ষুদ্রক্ষুদ্র খণ্ডে উল্কা ধারায় পরিণত হয়।

4) অপর একটি মতবাদ — আমাদের নিজস্ব নক্ষত্র (আমাদের সূর্য) আমাদেরই ছায়াপথের (Our Galaxy) ভিতর মহাবেগে আপনকক্ষে চলাকালে সময়ে সময়ে (কয়েক লক্ষ বা মিলিয়ন বৎসর অন্তর) বিশেষ মহাজাগতিক ধূলি ও গ্যাসের রাজ্যে উপনীত হয়। সেই মহাজাগতিক ধূলিকণার মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় সূর্যের আকর্ষণে ঐ ধূলি-মেঘের অংশ বিশেষ স্থানে স্থানে পুঞ্জীভূত হয়ে বিভিন্ন আকারের অসংখ্য ধূমকেতু রূপে সৌরজগতের অংশ হয়েই সূর্যের পিছনে ধাওয়া করে।

মহাকাশে মনমাতানো আলোকচ্ছটা ঐ ধূমকেতুদের উৎপত্তি নিয়ে এই সব মতবাদের কোনটি এখনও স্থিরভাবে গৃহীত হয় নি সত্য—তবে একথা প্রমাণিত যে ধূমকেতুর আবির্ভাব অলৌকিককোন ব্যাপারই নয়। সূর্য ও চন্দ্রের নিত্য উদয় ও অস্তের মত, রাতের আকাশে অসংখ্য তারকার নির্দিষ্ট সময়ে আবির্ভাব এবং যথানিয়মে তাদের স্থান পরিবর্তনের মত অথবা সূর্যচন্দ্রাদির গ্রহণের মতই ধূমকেতুরাও আসে যায়, দেখা দেয়, নির্দিষ্ট কক্ষে পরিভ্রমণ করে এবং সবই ভৌতরসায়নের স্বাভাবিক নিয়মে পরি-

চালিত হয়। একেবারে অংকের হিসাবেই। মুখ্যত সূর্যের প্রভাবে অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহের মতই ধূমকেতুরা ঘোরে। কিন্তু যেহেতু ধূমকেতুরা সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহেদের একই তলে (plane) আবর্তিত হয় না এবং সব ধূমকেতুই গ্রহদের গতির বিপরীতমুখের কক্ষপথে চলে, আর পরাবৃত্তে ও অধিবৃত্তে আবর্তিত ধূমকেতুরা সৌরজগতের সীমা ছাড়িয়েই যায়, সেইজন্য সৌরজগতের বাহিরে তাদের উৎপত্তির কথাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাই ধূমকেতুর উৎপত্তি নিয়ে আধুনিক সিদ্ধান্ত হচ্ছে যেভাবে আদিম মহাজাগতিক উপাদান পুঞ্জীভূত ও ঘনীভূত হয়ে বিভিন্ন নক্ষত্রজগত এবং গ্রহ-উপগ্রহাদির সৃষ্টি হয়েছে ধূমকেতুগুলি অনুরূপভাবেই সেই মহাজাগতিক মেঘপুঞ্জ থেকে সৃষ্ট (1নং মতবাদ)। তবে গ্রহ-উপগ্রহগুলি ক্রমে ঘনীভূত ও শীতল হয়ে তাদের বস্তুসামগ্রীর যে ধারাবাহিক রূপান্তর ঘটেছে ধূমকেতুতে পরিপূর্ণরূপে তা হয় নি। সুতরাং ধূমকেতুর মধ্যে হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে আমাদের সৌরজগৎ তথা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির আদিম কিছু মৌল উপাদান বা তাদের ক্রমবিবর্তনের কিছু সূত্র।

ধূমকেতুর চেহারা এবং তার গঠন-উপাদান

পৃথিবীর মানুষ ধূমকেতুকে যখন দেখতে পায় তখন তার চেহারাকে সাধারণত একটা ঝাঁটার সঙ্গে তুলনা করা হয়। ঝাঁটার গোড়াটির মত একটি অতি উজ্জ্বল গোলাকার মাথা বা শিরোদেশ। তারপর উজ্জ্বল আলোর লম্বা বিস্তৃত দেহ ক্রমে ঝাঁটার কাঠির মত ছড়িয়ে পড়ে বহুবিস্তৃত পুচ্ছে। ইংরেজী (আসলে গ্রীক) কমেট (Comet) কথাটির অর্থ লম্বাচুলওয়ালা মাথা (গ্রীক Kometes=Long haired)। এই শিরোদেশের কেন্দ্র অংশকে বলে নিউক্লিয়াস, এটি সবচেয়ে উজ্জ্বল ঘনীভূত অংশ, তার চারপাশে কিছুটা লঘু পাতলা আবরনের বৃহৎ আলোক ছটা (Halo) তাকে বলে কোমা (Coma), অনেকটা ঘোমটার মত। এখন পর্যন্ত যতদূর জানা গেছে ঐ নিউক্লিয়াস অংশে আছে ভারী উপাদানের জমাট বাঁধা অসংখ্য উল্কার ঝাঁক-বাঁধা সমাবেশ অর্থাৎ অসংখ্য ছোট ছোট কঠিন পদার্থের (Vast number of small solid bodies) পরস্পরের আকর্ষণে একত্রীভূত অবস্থা (held together by mutual attraction)। সাধারণভাবে ধারণা করা হয় এগুলি একেবারে বরফঠাণ্ডা গ্যাস ও ধূলার জমাটবাঁধা রূপ (dirty snowballs)। আর তার বাইরের 'কোমা' অংশ শুধু গ্যাস আর ধূলো।

আসলে এই নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রীন অংশটাকে এখনও সঠিকভাবে জানার কোন সুযোগই হয় নি। এটিকে প্রত্যক্ষভাবে দেখা যায় না তার চারদিকের বহুবিস্তৃত ঐ ঘোমটাটির (কোমা) জন্যই। যে সব ধূমকেতু পৃথিবীর খুব কাছে এসেছে তার থেকে বোঝা গেছে এই নিউক্লিয়াসের আয়তন তার দেহের তুলনায় অতি নগণ্য। 1861 খৃস্টাব্দে যে-ধূমকেতুটি সারা আকাশের দুই তৃতীয়াংশের বেশী ছেয়ে ফেলেছিল এবং এত উজ্জ্বল ছিল যে সেই আলোতে মানুষ ও গাছপালার আবছা ছায়া পড়ত, সেহেন ধূমকেতুর নিউক্লিয়াসও ছিল 100 মাইলের কম ব্যাসের। অথচ তার পুচ্ছটি ছিল প্রায় আড়াই কোটি মাইল (4 কোটি কিলোমিটার)। ছোট-খাটো ধূমকেতুর নিউক্লিয়াসের ব্যাস মাত্র দু এক কিলোমিটার হয়। তাদের পুচ্ছও অনেক সময় থাকে না। তবে সব সময়ই বৃহৎ আকারের কোমা বা ঘোমটাটা দেখা যায়। খুব ছোট্ট ধূমকেতুরও কোমার পরিধি আমাদের পৃথিবীরআকারের চেয়েও বড় হয়। আর বড় ধূমকেতুর কোমা তো ধারণার বাইরে—সূর্যের আসল আকারের চেয়েও বড় হয়। তবে ওর মধ্য কঠিন বস্তু কিছু নেই। সবই হাল্কাগ্যাস আর ধূলো। আর এত পাতলা যে তার ভিতর দিয়ে অকাশের অন্যান্য জোতিষ্ক (গ্রহ-নক্ষত্রাদি) সবই দেখা যায়। সেইজন্যই শিরোদেশের নিউক্লিয়াসের চেহারা বা আকারটা পৃথিবী থেকেই বেশ ভাল বোঝা যায় যখন ধূমকেতুরা কাছাকাছি আছে। এবার চেষ্টা হচ্ছে,—আর কয়েক মাস পরে যে হ্যালির ধূমকেতু আসবে তার কোমার ভিতর দিয়ে বিশেষ 'যন্ত্রযান' পাঠিয়ে ঐ নিউক্লিয়াসের যথাসম্ভব কাছাকাছি গিয়ে তার সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ খোঁজখবর কতটা নেওয়া যায়। এই কোমা ও পুচ্ছ ধূমকেতুর স্থায়ী চেহারা নয়, যদিও এই অংশদুটিই দেখতে সুন্দর এবং যুগে যুগে মানুষের মনে অপার বিস্ময় ও কৌতুহল সৃষ্টি করে এসেছে। সূর্যের কাছাকাছি এলেই ঐ কোমার বাহাদুরি বাড়ে আর যেন অতি আনন্দে তার লেজ গজিয়ে যায়। এই আনন্দ আর কিছু নয় সূর্যের অবারিত প্রাণের স্পর্শ, তার প্রাণময় আলোক ধারার প্রভাব।

ডিম্বাকৃতি কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে সূর্য থেকে দূরে অতিদূরে তার উষ্ণ স্নেহাঞ্চল ছাড়িয়ে ধূমকেতুরা তাদের জীবনের বেশীরভাগ সময়ই কাটায় সৌরজগতের দূরতর প্রান্তে ও প্রদেশে হিম শীতল অঞ্চলে। এই পরিবারের গ্রহ-উপগ্রহাদি অন্যান্য সদস্যারা যেভাবে গৃহকর্তা সূর্যের অবারিত উষ্ণস্পর্শ নিয়মিত ভাবে পায় ধূমকেতুদের ভাগ্যে তা জোটে না। তাই জীবনের বেশীর ভাগ সময়ই তারা প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় কুঁকড়ে সুঁকড়ে দিন কাটায়। ফলে তাদের উৎপত্তিকালীন সেই শত শত কোটি বৎসর আগেকার আদিম দেহসত্তার উপাদানগুলি যেমনটি ছিল, এখনও প্রায় তেমনি রয়েছে বলে ভাবা হয়—(তুঃ কোল্ডস্টোরে বা

হিমঘরে যে কোন বস্তুকে অবিকৃত অবস্থায় যেমন বহুদিন রাখা যায়)। সূর্যের নৈকট্য হেতু তাপ প্রবাহে অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহে কালের ধারায় যে ভৌতরাসায়নিক পরিবর্তন বা বিবর্তন ঘটেছে,—ধূমকেতুতে তা হয়নি, বিশেষ করে তার ঐ নিউক্লিয়াস অংশে। সেখানে মৌল উপাদানগতভাবে কার্বন (C), নাইট্রোজেন (N), অক্সিজেন (O), হাইড্রোজেন (H) প্রভৃতি উপাদন, সূর্য দেহের আনুপাতিক হারেই পাওয়া সম্ভব। কারণ সূর্যের সন্তানই তো তারা—অথবা প্রাথমিক একই উপাদান থেকেই উভয়ের দেহ গঠিত। তাই ধূমকেতুর নিউক্লিয়াস থেকে এবার সৃষ্টিতত্ত্বের রহস্য খোঁজার কিছু চেষ্টা হবে,—1986তে, হ্যালির আগমনে।

প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে মহাকর্ষের টানে কক্ষপথের দূরতম প্রান্ত (এফেলিয়ন বা অপসূর) থেকে হিমায়িত সঙ্কুচিত দেহ নিয়ে ধূমকেতুরা যখন দীর্ঘকাল পরে আবার সূর্যের দিকে আসে তখন দীর্ঘ প্রবাসের পর পরিবারের বড় কর্তার সামনে আসতে লজ্জায় সম্ভ্রমে একটু ঘোমটার আড়াল দেওয়া ভাল মনে করে—সেইটি হচ্ছে তার কোমা। সূর্যের তাপস্পর্শে ধূমকেতুর সঙ্কুচিত দেহের (ঐ নিউক্লিয়াসের) বাইরের উপাদানগুলি হাল্কা গ্যাসে ও ধূলায় পরিণত হয়ে অতি আনন্দে নাচতে নাচতে বহুদূর ছড়িয়ে পড়ে। আমাদের পৃথিবী বা অন্য কোন গ্রহের উপাদান সূর্য তাপে এভাবে ছড়িয়ে পড়ে না। তারা যে স্থায়ী সংসারের লোক। বহু যুগের ঘাত প্রতিঘাতে এদের উপাদানে যে স্থায়ী রাসায়নিক বিবর্তন ঘটে গেছে তাতে এরা গুছিয়ে সংসার সাজিয়ে বসেছে। সেখানে কোন অংশের আর সহজ বিচ্যুতি নাই। বাইরে থেকে আক্রমাণকারী অবাঞ্ছিত অনেক শক্তিকে ঠেকাবার জন্য নিজেদের ঘরের সীমার চারদিকে বহুদূর বিস্তৃত অদৃশ্য অনেক বেড়া তৈরি করেছে। যেমন পৃথিবীর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বায়ুমণ্ডল তার চারদিকে অবিচ্ছেদ্য সহজ সুন্দর বেড়া, আবার তারও বাইরে বহুদূর বিস্তৃত রয়েছে বিশেষ চৌম্বক ক্ষেত্র বা ভ্যান এলেন বলয়ের বেড়া যাতে বাহির থেকে আগত অনেক অবাঞ্ছিত শক্তিকণা প্রতিহত হয়ে অন্য দিকে ফিরে যায় কিন্তু ধূমকেতুরা যে আদিম ভবঘুরে বোহেমিয়ানের দল। তাদের ঘর বাঁধার ইচ্ছাই নেই, বেড়া দেবে কোত্থেকে? তার গৃহসীমার চারধারে না আছে একটু বাতাস, না—তেমন শক্তিশালী কোন চৌম্বক-ক্ষেত্র। ফলে বড় কার্তার (সূর্যের) সঙ্গে দেখা করতে এসে তার (সূর্যের) বিশাল মুকুট (Corona) ঘিরে যে বিস্তীর্ণ বিকিরণ বলয় (Solar radiation) রয়েছে তার থেকে অবিরাম নিঃসৃত অজস্র তড়িতাহিত কণার (Electrified particles)—প্রবল স্রোতের সম্মুখীন হতে হয়। এই কণাগুলি হচ্ছে খরগতি সম্পন্ন (high velocity) মুক্ত ইলেকট্রন-প্রোটন। আর তাদেরই দুর্বার স্রোত নিয়ে এক বিশেষ সৌর কণা প্রবাহ বা Solar wind সূর্যের চারদিকে সর্বদা ঘুরে বেড়াচ্ছে। সৌর প্রবাহের সেই খরগতি প্রোটন-ইলেকট্রন কণাগুলি দূরন্ত বেগে ধূমকেতুর অবারিত কোমা অংশে, আগে থেকে সূর্যতাপেই প্রসারিত পূর্বোক্ত হাল্কা গ্যাস ও ধূলিকণার অণুগুলিতে আঘাত হেনে তাদের প্রবল স্রোতের আকারে বহুদূরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয়। এর থেকেই তৈরি হয় ধূমকেতুর বহুবিস্তৃত পুচ্ছ। আর সেই পুচ্ছটি সর্বদাই সূর্য থেকে দূরে প্রসারিত। সূর্যের সাধারণ তাপে এর উৎপত্তি বা বিস্তৃতি নয়। তা হলে তো চারদিকে সমানভাবে এর বিস্তার ঘটত—যেমন করে ধূমকেতুর কোমা অংশের সৃষ্টি হয়। এই পুচ্ছে গ্যাস ও ধূলিকণা প্রায় সমানুপাতেই রয়েছে, গ্যাস অণুগুলির বেশির ভাগই স্বল্পজীবী, সৌরবিকিরণের আঘাতে তারা বিভিন্ন মূলকে (Radicals) ও পরমাণুতে বিভক্ত, তাদের অনেকে আবার সেই আঘাতে আয়নিত হয়ে প্লাজমায় পরিণত হয়। ফলে ধূমকেতুর পুচ্ছে সারাণত দুটি ভাগ দেখা যায়, একটি আয়নিত বা প্লাজামাপুচ্ছ, অন্য অংশ সাধারণ গ্যাস ও ধূলিকণার পুচ্ছ (Dust tail)। এই পুচ্ছের ও কোমা অংশের উপদানগত ভৌত রাসায়নিক বিশ্লেষণে আজ পর্যন্ত জানা গেছে যে তার উদাসীন (neutral) অণুপরমাণুগুলি হচ্ছে H, OH, O, S, C, C_2, C_3, CH, CN, CO, CS, NH, NH_2, HCN, CH_3, Na, Fe, K, Ca, V Cr, Mn, CO, Ni, এবং Cu, আর প্লাজমাপুচ্ছে পাওয়া গেছে আয়নিত CO^+, CO_2^+, H_2O^+, OH^+, CH^+, CN^+, N^+, C^+, Ca^+.

প্লাজমাপুচ্ছের আয়নিত অণুরা আপনা থেকেই একটা ফ্লুরোসেন্ট আলো ছড়াতে পারে। তবে পুচ্ছের ও ধূমকেতু দেহের বিস্তৃত অংশের সমস্ত অণু-পরমাণুই সূর্যের আলো প্রতিফলিত করে ধূমকেতুর আসল ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ করে। ধূমকেতুর নিজস্ব কোন আলো নেই। তাই ধূমকেতুর উজ্জ্বলতা ও আকৃতি নির্ভর করে সূর্যের কত কাছে তার অবস্থান তারই উপর। তবে পৃথিবীর কাছাকাছি না এলে মানুষ তাকে দেখতে পাবে না—সূর্যের কাছে এলেও সূর্য তাকে আড়াল করে বা নিজের প্রখর আলোয় ঢেকে রাখতে পারে যদি ছোট ধূমকেতু হয়। আবার সূর্য থেকে দূরে সরার সঙ্গেই তার তেজের বাহাদুরিও ক্রমে কমতে থাকে এবং বহুদূরে প্রসারিত অণুগুলির অনেকাংশই শূন্যে উবে যায় বা সৌর প্রবাহের

স্রোতে পড়ে সূর্যের দিকেও কিছু ছুটে চলে। এই শেষের কারণেই ধূমকেতুপুচ্ছের ধূলি অংশের চূড়ান্ত প্রান্তভাগটা সূর্যের দিকে কিঞ্চিত বাঁকান দেখা যায়। এইভাবে প্রতিবার সূর্য প্রদক্ষিণকালে ধূমকেতু দেহের কিছু অংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং ক্রমে ক্রমে তার ঔজ্জ্বল্য ও লেজের মাত্রা কমতে থাকে। শেষকালে তার কোমাটাও আর থাকে না। আর তখন তার নিউক্লিয়াসটা বিদীর্ণ হয়ে অসংখ্য উল্কার ধারায় আকাশে ছড়িয়ে পড়ে। সূর্যের কাছে এসে কখনও কখনও তার প্রচন্ড টানে কোন কোন ধূমকেতু দ্বিখন্ডিতও হয়ে যায়। সেই খন্ড দুটি একত্রে কিছুকাল তার নির্দিষ্ট কক্ষে ঘুরে চলে এবং শেষ পর্যন্ত ঐ উল্কা বর্ষণে পরিণত হয়।

ধূমকেতুর সঙ্গে কোন গ্রহ-উপগ্রহের সংঘর্ষ কি সম্ভব?

এই আতঙ্ক বহুবারই পৃথিবীতে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে এবং এখনও করে না তা নয়। অবশ্য ধূমকেতু নিয়ে আতঙ্কের বিভিন্ন দিক আছে। সেগুলির সম্ভাব্য আলোচনা করা যাবে। তবে সংঘর্ষের আশঙ্কায়—প্রথম কথা হচ্ছে বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহের মতই ধূমকেতুরও নির্দিষ্ট কক্ষপথ মহাকর্ষ-সূত্রেই স্থিরীকৃত। সুতরাং সাধারণ ভাবে কখনও সংঘর্ষ হওয়ার কথা নয়। তবে তার বহুবিস্তৃত পচ্ছটি তার পথের পাশের যেকোন গ্রহ-উপগ্রহের গায়ে —বিশেষ করে সূর্যের নিকটতরগুলিতে—বুলিয়ে বুলিয়ে যেতে পারে। তবে তা পোষা পুষির লেজ বোলানর মত নির্দোষ আরামের। টেরই পাওয়া যায় না ধূমকেতুর লেজের কোন অনুভূতি। (পুষির লেজটাতো তবু বোঝা যায়) বাস্তবিক পক্ষে আমাদের অনুভব করার মত কোন বস্তুকণার উপস্থিতি নেই ধূমকেতুর লেজে, শুধ দূর থেকে তার আলোর প্রতিফলন দেখতে পাওয়া ছাড়া। কতবারইতো ধূমকেতুর লেজের ভিতর দিয়ে আমাদের পৃথিবীটা চলে গেছে—কিন্তু কারও কোন ক্ষতি হয় নি—কেউ বিশেষ টেরও পায় নি—ঐ আকাশে আলো দেখা ছাড়া। পৃথিবীর গায়ে ঠেকান লেজের অংশে আলোও তো দেখা যাবে না, কারণ রাত্রে ঐ অংশে সূর্যের কিরণ পড়বে না, তাই তাতে কোন আলো প্রতিফলিত হবে না, দূর আকাশের যে অংশেই তখনও সূর্যের কিরণের প্রভাব সেই অংশই উজ্জ্বল হয়ে দেখাবে, পৃথিবীতে লাগান অংশে নয়। অথচ আমরা তখন ঐ লেজের ভিতরেই আছি। কিন্তু তাকে দেখতে পাচ্ছি না। শুধু লেজ কেন কোমার ভিতর দিয়েও পৃথিবী চলে যেতে পারে—কোন সংঘর্ষ ছাড়াই। শুধু নিউক্লিয়াসের সঙ্গে লাগলেই কিছু বিপদ। সেটা নির্ভর করছে আবার ঐ নিউক্লিয়াসের সাইজের উপর। দু-এক কিলোমিটার নিউক্লিয়াসের সঙ্গে সংঘর্ষে কি আর হবে! পৃথিবী পৃষ্ঠে কিছু অংশে বড় বিস্ফারণ ঘটার মতই হবে। আর কিছু নয়। এই রকম ছোট নিউক্লিয়াসগুলোই পৃথিবী বা অন্য কোন গ্রহের বেশি কাছাকাছি এসে গেলে মাধ্যাকর্ষণের প্রবল টানে তার উপর আছড়ে পড়তে পারে। কিন্তু বড় নিউক্লিয়াসের বেলায় তা হবার নয়। কারণ তার উপর সূর্যের প্রভাবই বেশি। সূর্যের টানে তার কক্ষপথ ঠিক থাকবে। সুতরাং সংঘর্ষ নিয়ে ভাববার বা আতঙ্কের কিছু নেই। [ধূমকেতুর সম্ভাব্য চেহারা, তার গতিপথ, সূর্য পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহের সঙ্গে তার আনুপাতিক সম্পর্ক সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ চিত্র প্রচ্ছদে দেখান হয়েছে।]

এখন আতংকের আলোচনায় যাওয়ার আগে ধূমকেতুর দেহবস্তুর উপাদানগত ঘনত্ব (material density) সম্পর্কে আর একটু ভাল করে বুঝে নেওয়া দরকার। ধূমকেতুর নিউক্লিয়াসটা বাদ দিয়ে তার কোমা এবং পুচ্ছের গ্যাস ও ধূলিকণার অণুগুলি এতই পাতলা অর্থাৎ অণুগুলি পরস্পর থেকে (একটি অণু থেকে আর একটি অণু) এমন দূরত্বে অবস্থিত যে আমাদের যেকোন শ্রেষ্ঠ ল্যাবরেটারীতে উপযুক্ত ভ্যাকুয়াম জার-কে যথাসাধ্য বায়ুশূন্য করার পরে সেই জারের মধ্যে যে কয়টা বাতাসের অণু থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা তাদের ঘনত্ব (density) থেকেও ধূমকেতুর অণুদের ঘনত্ব বহুগুণ কম, লক্ষ লক্ষ গুণ কম। সেইজন্যই ধূমকেতুর পুচ্ছে কয়টা অণু আর আছে যা আমাদের বায়ুমন্ডলে মিশে আমাদের উপর কোন অনুভূতি তৈরি করতে পারে বা আমাদের বায়ুমন্ডলকে কোন মতে দূষিতও করতে পারে? এই কারণেই ধূমকেতুর লেজের ভিতর আমাদের পৃথিবী বারে বারে ঢুকে গিয়েও ক্ষতি হয় নি, ভবিষ্যতে তা নিয়ে যথার্থ ভয়েরও কোন কারণই নেই। ওরকম ফাঁকা অবিশ্বাস্য ভ্যাকুয়ামে জীবাণু জাতীয় কোন কিছুর বেঁচে থাকা বা কোন রকম অবস্থিতির ও অস্তিত্বের সম্ভাবনাই নেই। ফ্রেড হয়েল ও উইক্রাম সিংঘে—তাই নিয়ে যাই বলুন না কেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই জাতীয় মতবাদের প্রচার বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক হয়ে থাকে এবং তা অপবিজ্ঞান ও অপসংস্কৃতির নজীর হিসাবে পরবর্তীকালে ধিকৃত হয়েছে। 1910 খৃস্টাব্দে হ্যালির ধূমকেতু যখন আসছিল তখন কিছু জ্যোতির্বিজ্ঞানী এই রকম এক সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিলেন যে আমাদের পৃথিবী সেই ধূমকেতুর লেজের ভিতর দিয়ে যাবে। আর যেহেতু ধূমকেতুর লেজে সায়ানোজেন গ্যাস, কার্বণ মনোক্সাইড প্রভৃতি মারত্মক গ্যাস কণা কিছু আছে

সেইজন্য পৃথিবীর মানুষের এবং জীবজন্তুরও সমূহ বিপদ, প্রায় শেষদিনই ঘনিয়ে এসেছে। ফলে আমেরিকার ও ইউরোপের বহু জায়গায় কত যে গ্যাসমাস্ক বিক্রী হয়েছিল তা অকল্পনীয় এবং সুযোগ সন্ধানীদের চক্রান্তে গরীব মানুষদের জন্য অজস্র অ্যান্টিকমেট পিল (বড়ি) ও (Anti-Comet Pills) বিক্রী হয়েছিল। কিন্তু তারপর হ্যালি এল, হ্যালি গেল, পৃথিবীর সবাই রইল, কারও কিছু হল না, হয় নি, হবে ও না। আসছে আবার হ্যালি। দেখা যাক তার নিউক্লিয়াসে আর কি আছে এবং সত্যিই অন্য কিছু ঘটে কিনা ? তবে মহাবিশ্বের অন্যত্র জীবনের সম্ভাবনা আছে কিনা তার কিছু তথ্য ও প্রমাণ এইবারের হ্যালি—দিতে পারে। কারণ জীবন-সৃষ্টির প্রারম্ভিক উপাদান কার্বন নাইট্রোজেনের জটিল যৌগ ধূমকেতুতে পাওয়ার সম্ভাবনা।

স্বয়ংক্রিয় মাটি বিশ্লেষক যন্ত্র

রাশিয়া ও ফরাসীদেশের বিজ্ঞানীদের যুক্ত প্রয়াসে একটি স্বয়ংক্রিয় মাটি বিশ্লেষক যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছে, যার দ্বারা প্রতিবার 250-500 রকম মাটি বা গাছের নমুনার বিশ্লেষণ সম্ভব। চলিত প্রথায় এসব বিশ্লেষণ সময় নেয় এবং একজন কর্মী একদিনে 10/15 টির বেশী নমুনা বিশ্লেষণ করতে পারে না। এই যন্ত্র একটি নমুনার অন্তর্গত 7টি বিভিন্ন পদার্থ বিশ্লেষণ করতে পারে।

এই যন্ত্রে প্রথমে একটি জেনারেটর থেকে বিচ্ছুরিত নিউট্রন নমুনায় প্রয়োগ করা হয় যা খনিজ পদার্থের ক্ষণস্থায়ী আইসোটোপ তৈরি করে। এরপর একটি গামা স্পেকট্রোমিটার এই ভঙ্গুর আইসোটোপ থেকে বিচ্ছুরিত গামা রশ্মিকে চিহ্নিত করে। এর ফলে যে সঙ্কেত পাওয়া যায় এই যন্ত্র তার অর্থ বিশ্লেষণ করে একটি নমুনায় কি কি রাসায়নিক পদার্থ আছে তা একটি ফিতেয় চিহ্নিত হয়ে যন্ত্র থেকে বেরিয়ে আসে।

এই যন্ত্রের সাহায্যে একটি গাছ বা মাটির নমুনায় কি কি খনিজ পদার্থ কত পরিমাণ আছে কতখানি নাইট্রোজেন মাটিতে আছে এবং তার কতখানি গাছ নিয়েছে ইত্যাদি যে সব তথ্য সংগ্রহ করা যাবে তা শস্য-বিদ, উদ্ভিদ-প্রজনন-বিদ, এবং মৃত্তিকা বিজ্ঞানিদের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ।

[ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ।]

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-700006 থেকে প্রকাশিত এবং গুপ্ত প্রেস 37/7, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-700009 থেকে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

JNAN-O-BIJNAN
MONTHLY JOURNAL

Regd. No. WB/NC-210

MARCH 1985

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—শৈলী, কলিকাতা—54

মূল্য—2·50

আপন ভাষায় ব্যাপকভাবে শিক্ষার গোড়াপত্তন

"আপন ভাষায়
ব্যাপকভাবে শিক্ষার
গোড়াপত্তন করবার আগ্রহ
স্বভাবতই সমাজের
মনে কাজ করে,
এটা তার
সুস্থ চিত্তের লক্ষণ।"

"শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ"।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শিক্ষা ব্যবস্থাকে ব্যাপকভাবে জনগণের
মধ্যে প্রসারিত করা এবং শিক্ষার
গণতন্ত্রীকরণের নীতিতে বামফ্রন্ট
সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

।। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ।।

2213/85

এপ্রিল মে 1985
38তম বর্ষ, চতুর্থ-পঞ্চম সংখ্যা

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের অনুশীলন করে বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ ও সমাজকে বিজ্ঞান-সচেতন করা এবং সমাজের কল্যাণকল্পে বিজ্ঞানের প্রয়োগ করা পরিষদের উদ্দেশ্য।

বিষয় সূচী

বিষয় — পৃষ্ঠা

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

মূল্য : 6·00

যোগাযোগের ঠিকানা :

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট
কলিকাতা-700006
ফোন : 55-0660

বিজ্ঞান-সাহিত্য সংখ্যা

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

অষ্টাত্রিংশত্তম বর্ষ | এপ্রিল-মে, 1985 | চতুর্থ-পঞ্চম সংখ্যা

বাংলায় বিজ্ঞান সাহিত্য : স্বরূপ, সমস্যা ও প্রয়োজন

গুণধর বর্মন

বাংলা ভাষাভাষী ও অনুরাগী জনগোষ্ঠী তথা বৃহত্তর মানব সমাজের সার্বিক জীবনধারার গতিপ্রকৃতি ও মান অনুযায়ী প্রয়োজনীয় উন্নয়নের কাজে কিছু সাধারণ ও সবিশেষ আলোচনার আবশ্যকতা অনুভব করেই 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার এই বিশেষ সংখ্যার প্রকাশ। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানের' সুদীর্ঘকালের সম্পাদক প্রয়াত বিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের চতুর্থ মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণ সভায় 9ই এপ্রিল '85 "বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্য" বিষয়ে এই বিশেষ আলোচনার সুরু। শিরোনামা থেকেই স্পষ্ট অনুমেয় যে ভাষা, বিজ্ঞান ও সাহিত্য এই তিনটি বিষয় নিয়েই এই আলোচনার প্রস্তাব। কারণ এই তিনটিই মানব সভ্যতার বা সভ্য মানবের বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সমষ্টিজীবনের যথার্থ স্বরূপ নির্ধারক। এই তিনের সমন্বয়েই মানুষের সভ্যতা সংস্কৃতির সৃষ্টি ও তার ক্রমবিকাশ। অবশ্য ভাষার ক্রমোন্নত ব্যবহার ও বিজ্ঞানের প্রয়োগেই মানুষের আদিম সংস্কৃতির সৃষ্টি। তার থেকে ক্রমে সভ্যতা বলতে যা বোঝায় তার ধারাবাহিক বিকাশ। এতে সাহিত্যের জন্ম হয়েছে অনেক অনেক পরে, যখন ভাষাকে অক্ষরে প্রকাশ করে তার লেখ্য রূপ দেওয়া সম্ভব হয়েছে। সুতরাং মানুষের আদি সভ্যতা বিকাশের অনেক পরের ঘটনাই হচ্ছে সাহিত্য রচনা। কিন্তু ভাষা আর বিজ্ঞান এই দুটি মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির আদিস্রষ্টা।

একথা বৈজ্ঞানিক ভাবে সত্য যে ভাষাই মানুষকে মানুষ করেছে, তাকে অন্য জীবগোষ্ঠী থেকে পরিপূর্ণরূপে পৃথক করেছে। নিজেদের মধ্যে ব্যাপক ও সম্যক বোঝাবুঝির, আদান প্রদানের ও পারস্পরিক যোগাযোগের এই উন্নত মাধ্যমই মানবপ্রজাতির মননশীলতা ও তার ক্রমোন্নতির মূলভিত্তি। অন্য প্রজাতির জীবগোষ্ঠীরা বহু আগে ধরাধমে এসেও উপযুক্ত ভাষার অভাবে তাদের মননশীলতার বিকাশ হয়নি। অবশ্য ভাষাশিক্ষার উপযোগী জনিগত বিবর্তন (genetic evolution) মানবেতর জীবে ঘটেনি। যাইহোক ভাষার উন্নতিই সুনিশ্চিত ভাবে সেই ভাষার মানব গোষ্ঠীর যথাসম্ভব উন্নতির পরিচায়ক।

এই ভাষা আয়ত্ত করার সঙ্গে সঙ্গেই আদিম মানবপ্রজাতি আর একটি বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছে সেটি হচ্ছে যন্ত্র-কুশলতা যন্ত্র তৈরি ও তার ব্যবহার। গাছের ডাল, পশুর হাড় বা পাথরকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করার দক্ষতাই মানুষকে অন্য পশুদের থেকে উন্নত করে তার আত্মরক্ষা ও জীবনধারণের পথ সহজ ও সুরক্ষিত করেছে এবং তার পরবর্তী বিকাশের পথকে অব্যাহত রেখেছে। যন্ত্রের ঐ প্রাথমিক সহজতম রূপ ও তার ব্যবহার-কৌশলই প্রাথমিক বিজ্ঞানের ধারণা এবং সুনিশ্চিতভাবে আদিম প্রযুক্তিবিদ্যা—যখন অন্য কোন বিদ্যা বা জ্ঞানের চর্চা আরম্ভই হয় নি। তারপরে সে শিখেছে আগুনের ব্যবহার.— আগুন তৈরি ও তার রক্ষার ব্যবস্থা, গুহায় স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় বাইরে ঘর তৈরী করা, আবাসস্থলের কাছেই খাদ্য উৎপাদনের জন্য কৃষি ব্যবস্থা, শিকারের নানাবিধ সরঞ্জাম তৈরির চেষ্টা ইত্যাদি সবইতো ক্রমোন্নত বিজ্ঞানের কাজ এবং এর এক একটি আবিষ্কার ও তার প্রয়োগই মানব সভ্যতার অগ্রগমনে এক একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। যে সংস্কৃতি বলে মানুষ আজ জীবজগতের শ্রেষ্ঠ

প্রজাতিরূপে পরিচিত এবং প্রকৃতি রাজ্যের নানা বিরুদ্ধ শক্তি ও পরিবেশকে বশীভূত করতে সমর্থ হয়েছে সেই সংস্কৃতিসৌধের প্রধান সোপানগুলির সবই হচ্ছে বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সবকিছুকে বৃহত্তর জনমানসে যথাসম্ভব ব্যাপক ভাবে পৌঁছে দিতে না পারলে সভ্যতা সংস্কৃতির যথাযথ অগ্রগমন ব্যাহত হতে বাধ্য। আর তাই হয়েছে এদেশে। এই দেশ একদা প্রাকৃতিক প্রাচুর্যে ভরা ছিল। অল্পশ্রমেই জনসাধারণ জীবনের ন্যূনতম চাহিদাগুলি মেটাতে পারত। অবশিষ্ট বেশীর ভাগ সময় অলসভাবে কাটিয়ে দিত পরকালের চিন্তা করে এবং সবাইকে ত্যাগের উপদেশ দিয়ে শান্তির বুলি আউড়িয়ে। আর রোগ শোক প্রাকৃতিক বিপর্যয় এমনকি রাষ্ট্রবিপ্লবের ঘটনাগুলিকেও কোন অলৌকিক শক্তির কারবার ভেবে অন্ধ বিশ্বাসে দেবতার রোষ প্রশমনের চেষ্টা করেই আত্মরক্ষার পথ খুঁজেছে। তাতে রেহাই না পেলেও সহজভাবে ভাগ্যের দোষ বলেই মেনে নিয়েছে সমষ্টিগতভাবে ঐ সবের প্রতিকারের জন্য কোন পরিকল্পিত চেষ্টাই হয় নি। ফলে সুদীর্ঘকাল এদেশের জনজীবনে বিজ্ঞান প্রযুক্তির চিন্তা পরিত্যক্ত ছিল। ভাগ্যবাদের প্রাবল্যেই গড়ে উঠে ছিল অন্ধবিশ্বাসের তমসা আর বিজ্ঞানের প্রতি অনীহা। সেই অবস্থা আজ পরিবর্তিত। প্রকৃতির সেই প্রাচুর্য আর নেই। জনসংখ্যার চাপ বেড়েছে। কর্মসংস্থানের উপায় নেই, অথচ অলস চিন্তার সময়ও নাই। অভাবের চাপে ত্যাগের কথা ভুলে গেছে সবাই, সংকীর্ণ স্বার্থ চিন্তা বেড়ে গেছে। অভাবযুক্ত ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা দেশময় বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির কারণ হয়ে উঠেছে। ক্ষুদ্র গোষ্ঠীস্বার্থ প্রবল হয়ে আঞ্চলিকতা, সাম্প্রদায়িকতা এবং কোথাও কোথাও বিধ্বংসী সন্ত্রাসবাদের জন্ম দিচ্ছে। সভ্যতার অগ্রগমনের সঙ্গে মানুষের শিক্ষাসংস্কৃতি ও মনের প্রসারতা না ঘটে আদিম বর্বরতা পশুবৎ হিংস্রতার আচরণই বৃদ্ধি পাচ্ছে। সংস্কৃতির মূল চালিকা শক্তি যে নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ অশিক্ষিত-ধনী-দরিদ্র সর্বস্তরের বৃহত্তর জনমনের স্বাভাবিক ধর্মই ছিল এবং মানব সমাজের মহত্তম গুণ হিসাবে সভ্যতা উন্মেষের আদিকাল থেকেই স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত ছিল, বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে সভ্যতার ক্রমোন্নত শিখরে এসে মানব মনের সেই অমূল্য সম্পদটি এদেশে আজ একান্ত হীনতায় জঘন্যভাবে বিকৃত। সুস্থ চিন্তাবিদমাত্রই তাতে আতঙ্কিত। যে কোন মতবাদ ও আদর্শ তৈরির গোড়ার কথাই হচ্ছে এই নৈতিকতা ও মূল্যবোধ,—মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের বিশেষ মূল্যায়ন,—ক্ষুদ্রতার গণ্ডী ছাড়িয়ে বৃহত্তর সীমায় হৃদ্যতার সম্পর্ক স্থাপন,—সেই ভূমার অনুভূতি। আর এদেশে এখন ঐ সব মহান মতবাদ এবং আদর্শের বুলিই হচ্ছে সংকীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার—যার মধ্যে মানবতার,—নৈতিকতার লেশমাত্র নেই। এই দুঃসহ লাঞ্ছিত মানবতার মুক্তির পথ কে দেখাবে? অভাব অভাব—নানাবিধ অভাবের চাপেই সবার স্বভাব যাচ্ছে বদলে অজ্ঞ জনগণ থেকে উচ্চনেতৃত্ব পর্যন্ত সবারই। এতকাল যে সমাজনীতি, ধর্মনীতি ও রাজনীতি সমাজ ও সভ্যতাকে রক্ষা করে এসেছে—সমষ্টিগত ভাবে সবার মধ্যে সু-সম্পর্ক স্থাপনের নৈতিক দায়িত্ব বহন করেছে—সীমিত ক্ষমতা সত্ত্বেও তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে নিজেদের চেষ্টাতেই যথাসম্ভব উৎপাদন বৃদ্ধি করে নিজেদের স্থানীয় অভাব মোচনের বড় দায়িত্ব নিয়ে এসেছে এবং তারই মাধ্যমে নিজেদের কর্তব্য ও মানবিক মূল্যায়নের ধারাটাকে অব্যাহত রেখেছিল—আজ সেই সাংস্কৃতিক ধারায় এসেছে বড় গলদ। ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগতভাবে সংকীর্ণ স্বার্থের প্রবণতা সব নীতিবোধকে ধূলিসাৎ করেছে। বিভিন্ন অভাবের অনুভূতিটাকে হাতিয়ার করেই মানব মনের আদিম সংকীর্ণতাকে প্রখর করে তুলছে,—তাতে প্রতিবেশীদের পরস্পরের মধ্যে সংস্কৃতিগত উদার মানবিক সম্পর্কটা তুচ্ছ হয়ে উঠেছে। আদর্শের বদলে স্বার্থগত চিন্তাতেই বিভিন্ন গোষ্ঠী তৈরি হচ্ছে, আর সামগ্রিক অভাব ও দুঃখের জন্য একে অপরের উপর নানা কায়দায় দোষারোপ করেই চলেছে—যার মধ্যে প্রকৃত অভাব মোচনের কোন পথ নির্দেশই নাই। এই দেউলিয়া মনোবৃত্তির রাজনীতি বা সমাজনীতি দিয়ে যে সমাজ ও দেশের কোন কল্যাণ হতে পারে না সেই মতবাদকে বলিষ্ঠভাবে জাহির করবে কে? এইখানেই গুরুত্ব আমাদের সাহিত্যের এবং বিভিন্ন জনসংযোগও স্বাধীন প্রচার মাধ্যমগুলির।

উন্নত সভ্যতায় সাহিত্যই হচ্ছে সংস্কৃতির প্রধান ধারক ও বাহক। আর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি তার সর্ববিধ অভাব মোচনের প্রধান হাতিয়ার। সেই কথা মনে রেখেই আমাদের বিজ্ঞান সাহিত্যের আলোচনা। সুকুমার সাহিত্য বা রস সাহিত্য নামে সাহিত্যের যে বিশেষ ধারা মানব সভ্যতার গৌরবের বিষয় বলেই বিবেচিত তার গুণাগুণ বিশ্লেষণের বিশেষ সুযোগ এই আলোচনায় নেই। কিন্তু বিজ্ঞান এবং সাহিত্য যে পরস্পরের পরিপূরক—এদের একের উন্নতি অপরের বিস্তারে সহায়ক, আর উভয়ের মিলিত শক্তির উপরেই সমগ্র মানব সমাজ ও সভ্যতার উন্নতি ও অগ্রগমন নির্ভর করে—এই চিন্তার প্রসার ও প্রয়োগই আজ অত্যন্ত জরুরীভাবে আমাদের সামনে উপস্থিত। মানুষের দুটো পায়ে সমান জোর না থাকলে সে যেমন সবলে এগিয়ে চলতে পারে না, এমনকি সুস্থভাবে দাঁড়িয়ে থাকতেও পারে না—সমষ্টিগত জীবনে বিজ্ঞান ও সাহিত্যের গুরুত্ব ঠিক সেই রকমই। এদের একটি দুর্বল হলে অপরটিরও পঙ্গু হতে বাধ্য। তাতে সমাজ সংস্কৃতি সামগ্রিক ভাবে শুধু দুর্বল নয় অসুস্থই হয়ে পড়বে, অন্য দেশের তুলনায় পিছিয়ে পড়বে এবং আমাদের অবস্থা তাই হয়েছে। তাই কি ভাবে এই উভয়ের সমন্বয় সম্ভব এবং তারই সাহায্যে সমস্যা জর্জরিত এই দেশের বিভিন্ন অভাব পূরণ করা সম্ভব—সেই কথা একদিকে আমাদের বিজ্ঞানী বিজ্ঞান কর্মী ও বিজ্ঞান লেখকদের যেমন ভাবতে হবে, অন্য দিকে সুকুমার সাহিত্যের শিল্পী কবি সাহিত্যিকদেরও সমান আগ্রহে উৎসাহে আন্তরিকতার সঙ্গে এই কাজে এগিয়ে আসতে হবে। সাধারণ

সাহিত্য ও বিজ্ঞান সাহিত্যের সীমারেখার চুলে-চেরা বিচারের কোন গুরুত্বই এখানে নেই। বিজ্ঞানের সত্যকে সহজভাবে এবং যথাযথভাবে বাংলাভাষায় প্রকাশ নাই—আমরা বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্য বলতে আগ্রহী। এই সাহিত্যের প্রধান লক্ষ্য হোক বিজ্ঞানকে বৃহত্তর জনগণের কাছে সরল সরস করে ব্যাপক ভাবে পৌঁছে দেওয়া এবং তাদের চিন্তায় ও কর্মে যথার্থ বিজ্ঞান মানসিকতা গড়ে তোলা। সত্যকে জানার আগ্রহ মানব মনের চিরন্তন কৌতূহল। সেই অনুভূতি সবার মনে বিশেষ রসসৃষ্টি করে এবং অন্য রসের মত এই রস কখনও স্থান কাল পাত্র ভেদে বিকৃত হয় না। তাই বিজ্ঞানের যথার্থ জ্ঞানের দ্বারা সুকুমার সাহিত্যও যে সমৃদ্ধ হতে বাধ্য।

আর একটি কথা সুকুমার সাহিত্য একক চেষ্টায় ও দক্ষতায় তৈরি হওয়া সম্ভব এবং তাই হয়েছে, কিন্তু বিজ্ঞান সাহিত্যে যৌথ প্রচেষ্টা—বহুজনের মিলিত সাধনার প্রয়োজন। কোন একক ক্ষমতায় তা সম্ভব নয়। সুতরাং তার জন্য একটি যোগ্য প্লাটফর্ম বা স্থায়ী মঞ্চের প্রয়োজন। দেশ ও জাতির উন্নতি ও মঙ্গল কামনায় নিবিষ্ট চিন্তাবিদগণ তাঁদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় যা করেন বা করছেন তা তো চলবেই। কিন্তু গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত নানাভাবে বিচ্ছিন্ন চিন্তাধারায় এই দেশে ক্ষুদ্র গোষ্ঠী ও মতবাদের ঊর্ধ্বে একটি বলিষ্ঠ নিরপেক্ষ মঞ্চ যে এই কাজে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সেই কথাটা সর্বস্তরের চিন্তাবিদ নেতৃবৃন্দকে আজ অনুভব করতে হবে এবং তদনুরূপ ভাবে এগিয়ে আসতে হবে। এই উদ্দেশ্যেই আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু সহ সমকালীন মহান চিন্তাবিদদের বহুজনের সাধনায় প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদকে সেই অবারিত ও আকাঙ্ক্ষিত মঞ্চ হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। অর্থাৎ বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদকে অবলম্বন করে বাংলায় বিজ্ঞান লেখকদের একটি মিলিত সংগঠন গড়ে তোলা দরকার, যাঁরা বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে সমাজে রাষ্ট্রে যথার্থ মানবিক মূল্যবোধকে নবরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন।

আপাতত শেষ করার আগে এই আলোচনায় আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের কিঞ্চিৎ উল্লেখ প্রয়োজন। সেটি হচ্ছে ভাষা, বিশেষ করে বাংলাভাষার কথা। বাংলাভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ধারা সামগ্রিক সভ্যতা সংস্কৃতির ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। আজকের যে বাংলায় আমরা কথা বলি, লিখি, সাহিত্য-রচনা ও বিজ্ঞানের আলোচনা করি, তার আত্মপ্রকাশ ও বিকাশকাল মাত্র শ-দুয়েক বছরের কথা। রামমোহনের আগে যথার্থ বাংলা গদ্যের কোন অস্তিত্বই ছিল না। তার আগে মঙ্গলকাব্য আশ্রয় করে যে পদ্য সাহিত্যের সৃষ্টি—যাকে মোটামুটি বর্তমান ভাষার সঙ্গে সহজে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সাধারণের বোধগম্য বলা যায়—তার সৃষ্টিকাল খৃস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতেই। আর তার আগে বাংলাভাষার নিজস্ব রূপের সূত্রপাত ঘটে খৃস্টীয় নবম কি দশম শতাব্দীতে রচিত 'চর্যাপদ' গীতগুলির মধ্যে—যে চর্যাগীতিগুলি আজকের কোন বাঙালীর কাছে কোন মতে বোধগম্যই নয়। কিন্তু তার আগে সুদূর অতীতে—ভারতে আর্য সভ্যতা সংস্কৃতির উপস্থিতির কয়েক হাজার বছর আগেই, বলা যায় মহেঞ্জোদাড়োর দ্রাবিড় সভ্যতার আগেও এই বাংলার মাটিতে সেদিনের উপযোগী সভ্যতার বিপুল জনগোষ্ঠীর সমাবেশ ছিল। ভারতে কৃষিভিত্তিক সভ্যতার প্রবর্তক বা জনক তারাই। এটা কল্পনার কথা নয়—বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রমাণিত। সভ্যতা সংস্কৃতিতে কালোপযোগী উন্নত সেই জনগোষ্ঠীর কি নিজস্ব কোন ভাষা ছিল না? সুতরাং বাংলার আপাতত ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে যে প্রাচীনতম অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, মঙ্গোলীয় ও ককেশীয় রক্তের সংমিশ্রণে সৃষ্ট নব জনগোষ্ঠীর উৎপত্তি—তা এখনও দৈহিক ও মানসিক গঠনে ভারতের অবশিষ্ট জনগোষ্ঠী থেকে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে প্রতীয়মান, যদিও সবার সঙ্গে আত্মিক মিলনে ও একতার ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র তৈরিতে তার কোন ত্রুটি নেই। বরং সর্বভারতীয় ঐক্যবদ্ধ চিন্তাধারার প্রধান পথিকৃৎই এই জনগোষ্ঠী। কিন্তু তার ভাষার বৈশিষ্ট্য এক স্বকীয় সুষমায় অপরূপভাবে প্রাণবন্ত। উৎপত্তিগত ভাবে আদিম সমস্ত গোষ্ঠীর ভাষা ও শব্দকে সে আত্মসাৎ করেছে—নিজস্ব রূপ দিয়েছে। আবার সুদূর পাশ্চাত্ত্য থেকে আসা আধুনিক জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ভাষা ও সংস্কৃতিকে এই জনগোষ্ঠীই সর্বাগ্রে গ্রহণ ও আত্তিকরণের চেষ্টা করেছে। বস্তুত এই আধুনিক জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রভাবই স্বল্পকালের মধ্যে—মাত্র দু-শ বছরের মধ্যে—বাংলা ভাষার উদ্দাম বিকাশের মূল চাবিকাঠি। এই কালের মধ্যে পাশ্চাত্য ভাষা আয়ত্তেও বাঙালী সমাজ কম দক্ষতা দেখায় নি। এতে এই কথাই মনে আসে যে, ভাষার ব্যুৎপত্তি অর্জন বাঙালীর জনিগত (Genetic) বৈশিষ্ট্য। তাতে সে পিছু হটবে না। বাংলায় বিজ্ঞান সাহিত্য রচনার ভাষা ও শব্দের চয়নে পরি-ভাষার কথায় বলতে হয়—প্রাণবন্ত কোন ভাষায় রক্ষণশীল গোঁড়ামির স্থান নেই।

বাংলাভাষা প্রসঙ্গে আর একটু উল্লেখ্য—বাংলা ভাষা এখন শুধু বাঙালীর প্রিয় এবং ভারত উপমহাদেশের একটি উন্নততর ভাষামাত্র নয়, এটি এখন সারা পৃথিবীর সমুন্নত ভাষাগুলির অন্যতম। যে ভাষায় উন্নত চিন্তার বিকাশ ও ভাবের সুষ্ঠু প্রকাশ সম্ভব—তাই তো উন্নত ভাষা, আর কত সংখ্যক মানুষ তা ব্যবহার করে সেটাও গুরুত্বের বিষয়। সেদিক থেকে সংযুক্ত বাংলায় 17-18 কোটির বেশী জন-গোষ্ঠীর মাতৃভাষা বাংলা, যা জাপান ফ্রান্স প্রভৃতি একক উন্নত ভাষার স্বাধীন উন্নত রাষ্ট্রের জনসংখ্যা থেকেও বেশী। বর্তমান দ্বিধাবিভক্ত উভয় বাংলার বাইরে ত্রিপুরা, আসাম, আন্দামান রাজ্যের প্রধান ভাষা বা সে রাজ্যের বেশ বড় অংশের জনগণের ভাষাই বাংলা। ভারতের সব রাজ্যেই বাংলা ভাষা কম-বেশি প্রচলিত কারণ অধিকাংশ রাজ্যেই যথেষ্ট সংখ্যায় বাঙালীর স্থায়ী বাস এবং তাদের মধ্যে ঘরোয়া ও প্রকাশ্যে স্থানীয়

জনগণসহ বঙ্গসংস্কৃতির চর্চা চলে। প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য ও ভাষার সম্মেলন, নিয়মিতভাবে বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত হয়। যথার্থ মননশীলতার উৎকর্ষে পুষ্ট এই বাংলাসাহিত্য এবং উচ্চ চিন্তার সহায়ক বাংলা ভাষা ভারতের বাইরে অনেক দেশেই নানা ভাবে আলোচিত ও সমাদৃত হয়ে চলেছে। যে গীতাঞ্জলির অনুবাদ (যা আসল লেখা থেকে স্বাভাবিক ভাবেই নিম্নমানের হয়েও) নোবেল পুরস্কার এনেছে—তার থেকে আরও কত ভাল লেখাই তো আছে রবীন্দ্রনাথের। একই ভাবে "পদ্মানদীর মাঝি" ও "পুতুল নাচের ইতিকথা" যখন রাশিয়ায় ট্রান্সলেট করে মুখে মুখেই শোনান হচ্ছিল মঞ্চোতে, তখন সেই বিদেশী শ্রোতৃমণ্ডলী অবাক বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেছিল এই ভাষা ও সাহিত্যের গভীরতায় ও সরলতায়। তাই ব্রিটেন, আমেরিকা, জার্মানী, রাশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ায় রীতিমত বাংলাভাষার চর্চা বিশেষ আগ্রহের সঙ্গেই চলে। ঐসব দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পঠন-পাঠন গবেষণা ধারাবাহিক ভাবেই চলে (সুকুমার সেন—ভারতকোষ)। এতে প্রমাণিত বৃহত্তর মানবসমাজের উন্নত চিন্তা-চেতনায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিশেষ স্থান রয়েছে। তাই শুধুমাত্র বাঙালীর স্বার্থে তাদের প্রিয় মাতৃভাষা হিসাবে নয় সার্বিক মানবতার যথাযথ বিকাশে ও উন্নয়নে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এমতাবস্থায় বাংলাকে আঞ্চলিক ভাষা হিসাবে দেখে যে কোন স্তর থেকেই এর প্রতি তাচ্ছিল্য ও অবহেলা বা এই ভাষার উন্নয়নে যথাযথ গুরুত্ব না দেওয়ার মনোভাব কোনমতেই গ্রহণীয় ও সহনীয় নয়। বাংলার নেতৃবৃন্দ ও কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে তীক্ষ্ণ মর্যাদাপূর্ণ দৃষ্টি দিতে হবে এবং যথার্থ আন্তরিকতার সঙ্গে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আর বাংলাভাষার লেখক, সাহিত্যিক, চিন্তাবিদ, বিজ্ঞানকর্মী এবং বিশেষ ভাবে বিজ্ঞান লেখকদের আজ গুরুদায়িত্ব কিভাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে যথাযথ উন্নত করা যায়। বিজ্ঞান সাহিত্যের আলোচনায় সেই গুরুত্বের কথাও ভাবতে হবে! তবে সাধারণ সাহিত্যের সঙ্গে তার সম্পর্কটাও বুঝে নিতে হবে। জানি না এই অমূল্য প্রচেষ্টায় কতখানি সাড়া পাওয়া যাবে এবং বাংলার চিন্তানায়করা কিভাবে এগিয়ে আসবেন! ভবিষ্যতের পথনির্দেশে এই যৌথ প্রচেষ্টাই গুরুত্বপূর্ণ।

বিজ্ঞান-শাস্ত্র মাত্রেরই দুইটা অঙ্গ আছে। একটা অঙ্গ পণ্ডিতদের জন্য অর্থাৎ খাঁটি বৈজ্ঞানিকের জন্য, যে অংশে ইতর সাধারণের প্রবেশাধিকার নাই, অনধিকারীর পক্ষে সেখানে প্রবেশ করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা। বিজ্ঞানের অপর অঙ্গ সাধারণের জন্য। কতকটা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান না থাকিলে মানুষের জীবনযাত্রাই আজকাল অচল হইয়া পড়ে, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জ্যোতিষ, জীববিদ্যা, ভূ-বিদ্যা, সকল শাস্ত্রেরই মধ্যে খানিকটা অংশ আছে। যাহা সকলের পক্ষেই জ্ঞাতব্য; সেইটুকু না জানিলে মূর্খ বলিয়া সমাজে পরিচিত হইতে হয় তাহা নহে। সেটুকু জীবনরক্ষা ও সংসার যাত্রার জন্যও নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। সাধারণ লোককে বিজ্ঞানের এই ভাগের সহিত পরিচিত করা লোক-শিক্ষার একটা প্রধান উদ্দেশ্য। সাধারণের সহিত বিজ্ঞানের এই ভাগের পরিচয় করাইতে হইলে বিজ্ঞানের ভাষাকেও সাধারণের বোধগম্য করিতে হইবে।

—আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর

বিজ্ঞান-সাহিত্য*

লীলা মজুমদার**

যা কিছুকে চেতনা, উপলব্ধি, বুদ্ধি আর কল্পনা দিয়ে আয়ত্ত করা যায়, জ্ঞান বলতে সে-সমস্তকেই বুঝতে হবে। কাজেই তার ক্ষেত্রও অপার এবং অপরিসীম। তারি মধ্যে কোনো বিশেষ জ্ঞানের অনুশীলন করাকে আমরা সাধারণ মানুষরা বিজ্ঞান বলে ভাবি। আরো মনে করি বিজ্ঞান আর সাহিত্য দুটি পরস্পর বিরোধী ব্যাপার। বাস্তব নিয়ে বিজ্ঞানের কারবার, অবাস্তব স্বপ্ন নিয়ে সাহিত্যের। কিন্তু এই আলাদা করার চেষ্টাটাকে কিঞ্চিৎ হাস্যকর বলে মনে হয়।

মাটির ওপরে ডালপালা বিস্তার করে, সবুজ পাতা মেলে যে সুন্দর ফুলটি ফোটে, তার সুগন্ধে বাতাস আমোদিত হয়। ওদিকে মাটির নিচে রংহীন শিকড়টি কঠিন পাথর ভেদ করে গাছের জন্য রস আহরণ করে, তবে না গাছের শিরায় শিরায় সেই রস প্রবাহিত হয়ে, ফুল ফোটায়, রং ধরায়, সৌরভ ছোটায়। সাহিত্যকর্ম হল ঐ পাতায় ঘেরা ফুলটির মতো, যার বিকশিত হওয়া সম্ভব হত না, যদি না লোকচক্ষুর অন্তরালে বিজ্ঞানীর সত্যসন্ধানী দৃষ্টি কাজ করত।

সাহিত্যের প্রধান উপজীব্যই হল রস। সাহিত্য কর্মের বাইরের রূপটি যেমন-ই হক না কেন, তাকে লালিত-পালিত হতেই হবে সত্যের কোলে, নইলে সে সাহিত্য নামের যোগ্য হবে না। এ সত্য বাস্তব জগতের ঘটনামূলক সত্য না-ও হতে পারে, কিন্তু হাজার কাল্পনিক ব্যাপার হলেও, তার ভাবগত সত্য অক্ষুন্ন থাকা চাই।

তার মানে সাহিত্যে ও বিজ্ঞানে আদর্শগত কোনো তফাৎ নেই। দুজনেই সত্যকে খোঁজেন; একজন ভাবের পথ ধরে আর অন্যজন বাস্তবের পথ ধরে, প্রতিটি তথ্য পরীক্ষা করে, গবেষণার সাহায্যে। যদি কখনো পুরনো প্রতিষ্ঠিত কোনো তথ্যে কোনো ভুল ধরা পড়ে, বিজ্ঞানী নির্মমভাবে তাকে বর্জন করে, নতুন তথ্যটিকে প্রতিষ্ঠা করেন। বিজ্ঞানের গবেষণায় ভ্রান্তির সুযোগ থাকলেও, অসত্যের স্থান নেই। তথ্যগত ভুলেরও নয়।

সাহিত্যিক নিজের কল্পনাকেই আশ্রয় করে থাকতে চান, তার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য যখন যা দরকার হয়, সেগুলি খুঁজে বেড়ান। তথ্যে ভুল থাকলে, সাহিত্যকর্মেও খুঁৎ থাকে। যদি ভুল ধরা পড়ার আগে সাহিত্যকর্মটি প্রকাশিত হয়ে গিয়ে থাকে, সে-ভুল শুধরোবার সম্ভাবনা কমে যায়। তবে সাহিত্যের ক্ষেত্রে তথ্যগত সত্যের চেয়ে, ভাবগত সত্যের গুরুত্ব বেশি। তাই অনেক স্বনামধন্য লেখকের, বিখ্যাত রচনায় ভুল থাকা সত্ত্বেও, তার আদর কমে না।

বিজ্ঞান আর সাহিত্য নিজের নিজের ক্ষেত্রে এতকাল নির্বিঘ্নে চলে আসছিল। কল্পনা বাদ দিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষকের আদৌ চলে না। তবে পরখ না করে তাঁরা কল্পনায় প্রশ্রয় দেন না। প্রতিটি নতুন আবিষ্কারের পিছনে, বিজ্ঞানীর দুঃসাহসিক কল্পনা কাজ করে।

গত 50 বছর ধরে একটা নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে। বিজ্ঞান সাহিত্য বলে এক নতুন জিনিসের জনপ্রিয়তা বিশেষতঃ কিশোর সাহিত্যে এতই বেড়ে গিয়েছে যে এখন তাকে সবচেয়ে জনপ্রিয় বলে স্বীকার করতেই হয়। যদিও বাংলায় এখনো এর প্রচার কিশোর-সাহিত্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে, তবে বিশ্ব সাহিত্যের সর্বত্র এর জয়জয়কার। এতে এমন-ও বলা যায় দিনে দিনে সাহিত্যে মানবিকতার আদর কমে যাচ্ছে। আপাততঃ সে প্রসঙ্গ থাক।

বিজ্ঞান-সাহিত্য বলতে আমি প্রধানতঃ বাংলা কিশোর সাহিত্যের কথাই ভাবছি। তিন রকম রচনার কথা মনে পড়ছে। বিজ্ঞান-ভিত্তিক গল্প উপন্যাস, কল্পবিজ্ঞানের গল্প এবং বৈজ্ঞানিক বিষয়ে প্রবন্ধজাতীয় রচনা। তিনটির তিন রকম ভূমিকা, তিন রকম বিপদ-আপদ।

ভালো বিজ্ঞানভিত্তিক গল্পের তুলনা হয় না। একসঙ্গে জ্ঞান-বিস্তার এবং গল্পের আনন্দ যোগায়। বিপদ হল গল্প বলার উৎসাহে বৈজ্ঞানিক তথ্যটির না ক্ষতি হয়ে যায়। সার্থক বিজ্ঞান-ভিত্তিক রচনা খুব সহজ কাজ নয়। একাধারে তথ্যগত সত্য আর কল্পনারসকে অক্ষত রাখতে হয়। এই ক্ষেত্রের সার্থক লেখকদের হাতে গোণা যায়। রসোত্তীর্ণ না হলে কেউ পড়বে না। মানবিকতার স্পর্শ না থাকলে সার্থক সাহিত্য হয় না। এই জন্য অনেক নির্ভুল তথ্যসমৃদ্ধ লেখাও আদর পায় না।

বিজ্ঞানের গল্প থাকলেই পাঠকরা অনেক সময় গল্পকে বিজ্ঞানভিত্তিক বলেন। অজেয় রায়, সঙ্কর্ষণ রায় বিজ্ঞান-ভিত্তিক গল্প লেখেন। সেখানে বিজ্ঞানটাই মুখ্য, আর সব কিছু তার সহায়ক। সত্যজিৎ রায়ের অপূর্ব গল্পগুলি, কিম্বা আমার নিজের এই ধরনের রচনাকে কল্প-বিজ্ঞান বলা উচিত। অর্থাৎ বিজ্ঞান-কল্প; বা বিজ্ঞানের মতো হলেও, ঠিক বিজ্ঞান নয়। এ ক্ষেত্রে রস-সৃষ্টিই প্রধান স্থান নিচ্ছে, বিজ্ঞান কিছু অতি-কাল্পনিক মাল-মশলা যোগাচ্ছে। বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া উদ্দেশ্য নয়। বিপদ হল যেটুকু বৈজ্ঞানিক তথ্যের সাহায্য নেওয়া হয়, সেটা সব সময় নির্ভুল হওয়া চাই। তা না হলে নবীন পাঠকের অশেষ ক্ষতি হয়।

আজকাল বিজ্ঞান-সাহিত্যে প্রবন্ধের আদর বেড়েছে। প্রাণী-

---

* 9ই এপ্রিল '85 বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদে গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের চতুর্থ বার্ষিক স্মরণ সভা উপলক্ষে আয়োজিত "বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্য" শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির ভাষণ

** 11/4, ওল্ড বালীগঞ্জ সেকেণ্ড লেন, কলিকাতা-700019

বিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান, ভ্রমণ কাহিনী, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কাহিনী, বৈজ্ঞানিকদের জীবনী—এসব একেকটি সোনার খনি। এখানেও একই কথা ওঠে, রসোত্তীর্ণ না হলে পাঠকদের কাছে আদর পাবে না। কিন্তু এক্ষেত্রে কোনো কাল্পনিক সাজসজ্জা দিয়ে বিষয়বস্তুকে আকর্ষণীয় করার চেষ্টা চলবে না। স্বচ্ছ নির্মল প্রবল সত্যের নিজস্ব একটা মধুর রস থাকে। এমন কি গণিতেও এ-রসের দেখা পাওয়া যায়। এ হল সব রসের পরম রস। এর কাছে কোনো রকম কৃত্রিম রস দাঁড়াতে পারে না। এসব হল সত্য সাধনার অঙ্গ। কৃত্রিম সাজসজ্জা না থাকলেও, এর একটা ব্যক্তিগত আবেদন থাকে, কারণ বিজ্ঞান-সাহিত্য প্রাণ-ধারণেরই একটা অংশ। কোনো জটিল বিষয়বস্তু যা বিশেষজ্ঞ ছাড়া কারো বোধগম্য হবে না, বিজ্ঞান-সাহিত্যের আওতায় পড়ে না। তাই দিয়ে ঐ বিষয়ে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ রচনার অবশ্যই প্রয়োজন আছে। কিন্তু তাকে সাহিত্য নাম দিলে ভুল হবে।

বিজ্ঞান সাহিত্যের উপযুক্ত ভাষা বিষয়েও কিছু বলতে হয়। সে ভাষা হবে সহজ সরল এবং সুস্পষ্ট। বৈজ্ঞানিক শব্দ নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। বিদেশী নাম কি বর্জন করা উচিত? তার জায়গায় সমার্থক বাংলা নাম স্বচ্ছন্দে দেওয়া যায়। তবে আমার মনে হয় বিজ্ঞানের একটা আন্তর্জাতিক দিক আছে। যে-সব আখ্যা ইউরোপ আমেরিকার সব ভাষাতেই স্থান পেয়েছে, আমাদের কিশোর পাঠকদেরও সে শব্দগুলি জানা উচিত। সমস্যা দূর করার সহজ উপায় হল, বাংলা বইতে বাংলা শব্দটি ব্যবহার করলেও, তার পাশে ব্র্যাকেটে বিদেশে প্রচলিত পরিশব্দটি সর্বদা দেওয়া উচিত। এই ভাবে ব্যবহারিক কারণে আইন-আদালতের ক্ষেত্রে বহু মূল্যবান আরবি ফারসি শব্দ বাংলা অভিধানে জায়গা পেয়ে, বাংলা ভাষাকে আরো সমৃদ্ধ করেছে।

"আমি মনে করি যে ভারতবর্ষে জাতির সঙ্গে জাতির, স্বদেশীর সঙ্গে বিদেশীর বিরোধ তত গুরুতর নয়, যেমন তার অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যতের বিরোধ। আমরা উভয় কালের মধ্যে একটি অতল স্পর্শ ব্যবধান সৃষ্টি করে মনকে তার গহ্বরে ডুবিয়ে দিয়ে বসেছি।...একদিকে মোটর রেল টেলিগ্রাফকে জীবনযাত্রার নিত্য সহচর করেছি, আবার অন্যদিকে বলছি যে, বিজ্ঞান আমাদের সর্বনাশ করল, পাশ্চাত্য বিদ্যা আমাদের সইবে না। তাই আমরা না আগে, না পিছে—কোন দিকেই নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারছি না। আমাদের এই দোটানার কারণ হচ্ছে যে, আমরা অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যতের বিরোধ বাধিয়েছি, জীবনের নব নব বিকাশের ক্ষেত্র ও আশার ক্ষেত্রকে আয়ত্তের অতীত করে রাখতে চাচ্ছি, তাই আমাদের দুর্গতির অন্ত নেই"।

—রবীন্দ্রনাথ

বিজ্ঞান-সাহিত্য

সাধন দাশগুপ্ত*

খুব বেশী দিন আগেকার কথা নয়। এই সেদিনেও গ্রামে গঞ্জের কোন বাড়িতে নতুন মানুষ, অতিথি এসে হাজির হলে সে বাড়ির প্রাচীনতমা মহিলাটি জিজ্ঞেস করতেন, 'বাবা, তোমার বাড়ি কোথায়, কি কর, বাড়িতে কে আছেন'—ইত্যাদি। পরিচয় পাবার পর তিনি খুঁজতেন সম্পর্ক বা সম্বন্ধ; —চেনাজানা জায়গা বা মানুষের সঙ্গে এই অতিথিটিকে মেলাতে পারেন কিনা। অত্যন্ত সিরিয়াস ভঙ্গীতে এই খোঁজটি তিনি করতেন। আর সবশেষে একটা সম্পর্ক বা মিল খুঁজে পেলে ভারি আশ্বস্ত হয়ে স্বস্তিতে একগাল হেসে বলতেন, 'আরে, তুমি তো আমাদের আপনজন।' ···কোলের কাছে বসে থাকা শিশুটিকে বলতেন, 'সম্পর্কে এ তোদের কাকা হয়; কাকা ডাকিস।' ···সম্পর্কটা খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত যে যন্ত্রণা তাঁর চোখে মুখে প্রকাশ পাচ্ছিল, সে সব মিটে গিয়ে সারা মুখে ফুটে ওঠে খুশি খুশি, সুখী সুখী হাসিটি!

সম্পর্ক খোঁজা নিয়ে বিজ্ঞানীদের সেই এক যন্ত্রণা। জগতের মঞ্চে প্রকৃতির নানা কারুকৃতি, নানা অভিনয়, নানা ক্রিয়াকলাপ। এর মধ্যে কোথাও লুকিয়ে থাকে রীতি নীতি অথবা নিয়ম-সম্পর্ক। কারুকৃতিতে ধরা পড়ে আঙ্গিক বা ফর্ম; অভিনয়ে আছে ছলাকলা —লীলা-খেলা; ক্রিয়াকলাপে থাকে অভিজ্ঞতার বিস্তৃতি। আর এদের পরিবেশনায় প্রকৃতির রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, সম্পর্ক সম্বন্ধের মূল সূত্রগুলো জানা যায়; নিয়মকে খুঁজে পাওয়া যায়। এই নিয়মগুলোই মানুষ আর প্রকৃতির সম্বন্ধটি সুদৃঢ় করে তোলে। প্রকৃতির রহস্যের একটা কূলকিনারার দেখা পায় মানুষ; সেই দেখাতে তার মুখে ফুটে ওঠে খুশি-খুশি হাসি। —সে হাসি বিজ্ঞানের।

এই যে সম্পর্ক খোঁজা—যার ফলে নিয়মকে জানা যায়,—সেই খোঁজের পরিধি-পরিবেশ কতটা? যেমন 'ক' বাবুর গল্প। ইনি অফিসে দোর্দণ্ড প্রতাপ সাহেব, ক্লাবে ভারি মজলিশি; সভাসমিতিতে বিদগ্ধ সম্পন্ন; আর বাড়িতে ইনি নাতিটির সঙ্গে খুনসুটি করেন; স্ত্রীর সঙ্গে পুজোর বাজার নিয়ে হিসেব করেন; ভয়াবহ চাহিদা দেখে মিনমিন করে প্রতিবাদ তোলেন। —'ক' বাবুর কোন্ রূপটা আসল? জীবন চরিতকার বলবেন, সব মিলিয়েই তিনি। একেক পরিসীমা—পরিবেশে, একেক সময়ে তিনি বিভিন্ন ঘটনার নায়ক; বিভিন্ন তাঁর ক্রিয়াকলাপ। কোথাও তিনি স্বয়ম্ প্রধান, কোথাও তিনি অনেকের একজন; কোথাও তিনি দায়িত্ববান, কোথাও বা পরনির্ভরশীল। সব অবস্থায়, নানা সময়ে, বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে তাঁকে জানা যাবে। বহু ঘটনার সম্পর্ক পথে তাঁকে বিশদ ভাবে বোঝা যায়। এই সব নানা ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্কটি 'ক' বাবুর আসল রূপটি জানাবে। তিনি তখন আর রহস্য নন।

বিজ্ঞানী যখন প্রকৃতিকে জানতে চান, তখন তাঁদের একটি ইচ্ছা—প্রকৃতির রহস্যের যবনিকাটি সরিয়ে তাকে বিশ্বমঞ্চের পাদপ্রদীপে প্রকাশ করা। এই জন্য এত সম্পর্ক সম্বন্ধ খোঁজা—নিয়ম জানতে চাওয়া। প্রতিটি নিয়মের আবিষ্কারের পর, রহস্যের কুহেলি যেন কিছুটা ঘুচে যায়। অতি তুচ্ছ ঘটনাগুলোও এখানে তুচ্ছ করা যায় না। সামান্যতম আন্দোলন আলোড়নটুকুও এই রহস্যের উন্মোচনের সূত্র হতে পারে; সেই সূত্রটির পরিমাণ জানা যেতে পারে তুলনামূলক পদ্ধতিতে; এটি হতে পারে স্বাভাবিক অথবা সম্ভাবনার দৃষ্টিতে ঘেরা। সম্বন্ধ-সম্পর্কের সূত্রটিই জানায় নিয়ম।

প্রথম যুগে এই খোঁজা ছিল মুখের ভাষার আঙ্গিকে। সে যুগে সাহিত্যের রমরমা, বিজ্ঞানের শৈশব আবার মানব ইতিহাসেরও কৈশোর। সম্বন্ধ-সম্পর্কের চিহ্নগুলো সে যুগে খুব একটা জটিল ছিল না। কাজেই মুখের ভাষায়, আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সম্পর্কের পথ ধরে প্রাথমিক নিয়মগুলোকে খুঁজে নেওয়া মানুষের অসাধ্য বা কঠিন ছিল না। আর এই নিয়মের বর্ণনা করা হতো সুন্দর ব্যঞ্জনাময় কুশলতায়। নানা উপমা উৎপ্রেক্ষা দিয়ে এই সম্বন্ধ-সম্পর্কগুলো প্রকাশ করলেন যে যুগের বিজ্ঞানীরা—যাদের বলা হতো রিলেশনিস্ট স্কুল।

যতদিন যায়, প্রকৃতির রহস্যের জটিলতা তত যেন ধরা পড়ে। জটিল সম্পর্ক-চিহ্ন-কণ্টকিত প্রকৃতির পথ। সে পথের বর্ণনায় মুখের ভাষা দিশেহারা হয়ে যায়। এখানে দরকার হলো অন্য একটি ভাষার, যে ভাষা হবে সংক্ষিপ্ত, আটসাঁট—কারণ দীর্ঘ জটিল পথ দ্রুত পার হতে হবে। হতে হবে যুক্তিনিষ্ঠ, নিরপেক্ষ— কারণ সম্পর্কের এলোমেলো অগোছাল বহুধা ভঙ্গীদের যাচাই করে, বাছাই করে, ঠিকমত সাজিয়ে নিতে হবে। হতে হবে অর্থবহ ও উদাসীন,—তা না হলে প্রকৃতির গভীরতার স্রোতে সে ভাষা থই পাবে না, খেই হারিয়ে ফেলবে। হতে হবে অতিশয়োক্তি ও অতিরঞ্জন মুক্ত—কারণ প্রকৃতির সম্পর্ক চিহ্নের রোমাঞ্চনায় বিহ্বল না হয়ে সম্বন্ধটি সঠিক ভাবে প্রকাশ করা দরকার। —পৃথিবীতে এইরকম একটি মাত্র ভাষা মানব সমাজে আছে,—সেই একমদ্বিতীয়ম্ ভাষাটি হলো গণিত। ভাষাটির তারুণ্যের জোয়ার মাত্র ষোড়শ শতাব্দীতে দেখা দিয়েছিল। তার আগে গণিত নামক ভাষাটিও মুখের ভাষা আশ্রয় করে গড়ে ওঠা। ষোড়শ শতাব্দীতেই পালক পক্ষীমাতার স্নেহচ্ছায়াটি তুচ্ছ

* 30A, লেক প্লেস, কলিকাতা-9

করে, নিজের ভাষায় কুহুধ্বনি তুলে সে আকাশে পাড়ি জমায়।

এই অকৃতজ্ঞ-বিদ্রোহীভাষাটি হাতে নিয়ে বিজ্ঞান পরীক্ষা নিরীক্ষা করে। তবে তখনো, সেই ষোড়শ শতাব্দীতে ভাষাটির শক্তি ক্ষমতা নিয়ে সন্দেহ থেকে যায়। তার প্রয়োগের সার্থকতা নিয়ে তখনো সংশয়। ...বিজ্ঞানে গণিতের সার্থক অনুপ্রবেশ ঘটালেন সপ্তদশ শতাব্দীতে—স্যার আইজাক নিউটন। পূর্বসূরীদের এবং নিজস্ব নানা সংগৃহীত তথ্যের সাহায্যে গণিতের ভাষায় তিনি তত্ত্ব খুঁজে পেলেন। সেই তত্ত্বেই প্রথম জানা গেল ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়,—আগে থেকে বলা যাবে কখন আসবে জোয়ার বা ভাটা, কখন ঘটবে সূর্য-চন্দ্র গ্রহণ। অর্থাৎ গণিত নামক ভাষাটির সাহায্যে শুধু যে নিয়মটি জানা যায়, তা নয়; সেই নিয়ম নিজেও নতুন তথ্যের ইঙ্গিত জানায় ও জানাতে পারে; যারা আবার প্রমাণিত হয়ে নতুন নিয়মের গঠনের দ্বারে উপকরণ হয়ে সেজে দাঁড়ায়।

নিউটনের কাল থেকে বিজ্ঞানে গণিতের ব্যাপক ব্যবহার। অনেকটা যেন যান্ত্রিক ভাবে গণিতের প্রয়োগ করে সম্পর্ক-সম্বন্ধের লতাবিতানে বিজ্ঞানীরা নানা নিয়মকে প্রতিষ্ঠা করে গেলেন, নিরাসক্ত-উদাসীন রীতিতে নিয়ম খোঁজা হলো। তবু উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ম্যাক্সওয়েলের কালে গণিত নিয়ে বিজ্ঞান একটু দ্বিধা সংশয়ে পড়ে। প্রকৃতির সম্পর্ক যে মানুষ খোঁজে সে মানুষ বিজ্ঞানী, সে শিল্পীও। সে নিরাসক্ত-উদাসীন, যখন সে অন্বেষণের পথযাত্রী। তবুও সে সামাজিক মানুষ—যুক্তিনিষ্ঠ হলেও সে অনুভূতিপ্রবণ। সংক্ষিপ্ত আটসাঁট গণিতের ভাষা চর্চা করলেও সে যে কোন মুহূর্তে মুখর হয়ে উঠতে পারে, পারে কথায় হাসিতে ভেঙে পড়তে। মানুষ নামক প্রকৃতির সৃষ্টিটিই প্রকৃতির নিয়ম খোঁজে। সেইখানে, তার নিজস্ব স্বাভাবিকতাবাদ দিয়ে সে কি যন্ত্র হয়ে উঠতে পারে ?—

না, পারে না। —সেই প্রাচীনযুগে সারাদিন ধরে সমস্যার সমাধানের চিন্তায় মাথা গরম করে আর্কেমিদিস মাথা ঠাণ্ডা করতে স্নানাগারের জলাধারে ঢোকেন। তখনো তিনি অন্যমনস্ক, চিন্তায় আকুল, সমাধানটি জানতে চাওয়ার উৎকণ্ঠায় ব্যাকুল। আর হঠাৎ জলাধারের উপচে পড়া জলের দিকে তাকিয়ে তিনি সমাধানের সূত্রটি খুঁজে পান,—সেই সমাধানটি গণিতের ছক হয়ে বিদ্যুতের মত তাঁর মনে প্রতিভাত হয়। আর তারপর বিজ্ঞানী আর্কেমিদিস হঠাৎ মানুষ আর্কেমিদিস হয়ে নিরাবরণ বাইরে বেরিয়ে ছুটে চলেন, মুখে বলেন 'ইউরেকা, ইউরেকা—আমি পেয়েছি, পেয়েছি।—নিরাসক্ত উদাসীন খোঁজার পথের যাত্রীটি পথের শেষে এসে হঠাৎ আবেগে ভেঙে পড়ে মুখর হয়ে ওঠেন। গণিতের ছকে নিয়ম সাজানোর মুহূর্তে শোনা যায় মুখর সংলাপ।...এমন ঘটনা ঘটে ম্যাক্সওয়েলের জীবনে। গণিতের ভাষায় বিদ্যুৎ-চুম্বক তরঙ্গতত্ত্বটি প্রকাশ করেন আর নিজের সৃষ্টি ইথারের তুলনাহীন রূপ দেখে বিস্মিত মুগ্ধ হয়ে কলধ্বনি তোলেন। ইথারের বন্দনা-স্তুতি গানে তিনি এবং আরো অনেকে মুখর হয়ে ওঠেন। যেন ভাষাগণিতের ফুলসাজে-সাজা বিজ্ঞানের পায়ে বেজে ওঠে অবহেলিত মুখের ভাষার নূপুর ধ্বনি, হাতে বাজে কংকনের কিংকিনী !

তবু উনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানে গণিতের প্রাধান্য ;—সেই একই প্রাধান্য দেখা গেল বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে। জটিল গণিতের মাধ্যমে এলবার্ট আইনস্টাইন তাঁর আপেক্ষিকতাবাদ প্রচার করলেন। সেই গণিতের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে বিজ্ঞানী সমাজ চিত্রার্পিত হয়ে যেন দাঁড়িয়ে থাকে। —মহাকাশ তত্ত্বের গবেষণায় গণিতের প্রাধান্য। একই প্রাধান্য ক্ষুদ্র কণার জগতে, কোয়ান্টাম গতিবিদ্যার গঠনে। গণিতের ধারায় বন্যার ঢল নামে যেন। মুখের ভাষা থেকে বিজ্ঞান শব্দ গ্রহণ করে এল এটম, প্রোটন, আইসোটপ, মেসন, কোয়ার্ক ইত্যাদি শব্দ। অন্যদিকে মুখের ভাষার বর্ণনায় গণিতের বাগ্‌ভঙ্গী ধরা পড়ে। দেখা দেয় স্ট্যাটিসটিক্স, ইনভেরিয়েন্ট কো-ভেরিয়েন্ট ইত্যাদি শব্দ। মুখের ভাষাও গণিতের শব্দসম্ভার গ্রহণ করে ধনী হয়ে ওঠে। তবু বিজ্ঞান, সঠিক অর্থে, গণিত নির্ভর। কেন এই নির্ভরতা ?

(2)

গ্রীক চিন্তার পথ অনুসরণ করে চিন্তাবিদরা যে বিমূর্ত ভাবনায় পা রাখলেন, সেই একই সময়ে, গণিত অনুসরণ করে বিজ্ঞানী-দার্শনিক-গণিতবিদ্ পোআঁকার (Poincare) একই বিমূর্ততার স্থিতিতে এলেন। পোআঁকারের সময়ে বিজ্ঞানের বিশ্বাসের ভিতে ফাটল দেখা দেয়। যুগ যুগ ধরে বিজ্ঞানের সত্যকে চরম বা পরম ভাবা হয়েছে—তার লজিকে-যুক্তিতে ভুল নেই, ভুল ঘটা মানে নিয়মের ব্যাখ্যায় ভুল পাওয়া। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ধরে নেওয়া হলো, বিজ্ঞানের সব মহাসমস্যার সমাধান পাওয়া গেছে। বাকি যা কাজ, তা শুধু সমাধান কটিকে আরো মার্জিত, আরো মসৃণ করা। ইথারের মাধ্যমে আলোর পথ পরিক্রমার সমস্যা তখনো একটা ছিল। তবে সে যে পরম স্পেস, পরম সময়, পরমবস্তু এমনকি পরম প্রসারত্বকে ভেঙে তছনছ করতে পারে, পারে কাচের দোকানে ষাঁড়ের মত সব লণ্ডভণ্ড করতে, তা কল্পনাও করা যায় নি। তবু তা ঘটে, এবং ঘটে জ্যামিতিক নিয়মে। পোআঁকার জানেন গণিতে সাদামাটা এসাম্‌সন নেই ; জ্যামিতিতে আছে এক্সিয়ম্, পস্টুলেট আর জেনারেল নোশন ; স্বতঃসিদ্ধ, সিদ্ধান্ত আর সাধারণ ধারণা। এই স্বতঃসিদ্ধের দলকে প্রমাণ করা যায় না। এদের ভিতের উপর দাঁড়িয়ে থাকে সনাতন বিজ্ঞানের কাঠামো। তবু এই স্বতঃসিদ্ধদের অসম্ভবতাকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে পাওয়া যায় নতুন জ্যামিতি। পুরনো জ্যামিতির বিরোধ ঘোচাতে আসে অন্য একটি বিরোধাভাস। গণিত যেন অনিশ্চয়তার স্বাদ পায়। অথচ নতুন জ্যামিতির সাহায্যে আইনস্টাইনের তত্ত্ব প্রকাশ পায়। এই

গণিতও ভাষা। এও গণিতের সত্য। দুটি ধারার গণিতেই সত্য থাকে। তবে গণিতের সত্য কি?

বিজ্ঞানের ভিত্তি (Foundation of Science) নামে বইটিতে পোআঁকার বললেন, গণিতের সত্য ক্যান্টের জানানো a-priori বিচার নয়। তা যদি হতো, তবে এই সত্য হতো অভিজ্ঞতার ধরাছোঁয়ার বাইরে। এটিকে মেনে নিলে নব জ্যামিতি, ননইউক্লিডিয়ান জ্যামিতিকে পাওয়া যায় না। অন্য দিকে জ্যামিতিক স্বতঃসিদ্ধদের কেবলমাত্র অভিজ্ঞতার নিরিখে বর্ণনা করা যায় না। তা যদি হতো, তবে এই স্বতঃসিদ্ধ দলের বারবার পরিবর্তন ঘটতো—জ্যামিতিকেই পাওয়া যেত না। পোআঁকার বললেন, জ্যামিতিক স্বতঃসিদ্ধদল যেন কনভেনশন বা রীতি অথবা শর্ত। অভিজ্ঞতার জগতে এদের পাওয়া গেলেও নিজের নিজের পরিসীমায় এরা স্বাধীন। শর্তানুযায়ী জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধের মধ্যেই আছে তার সংজ্ঞা। এই চিন্তার প্রসার ঘটিয়ে পোআঁকার বললেন, গণিতভিত্তিক বিজ্ঞানের সত্যও নির্দিষ্ট পরিবেশে সত্য; এই সত্য সম্পূর্ণ বা পরম নয়। জানার পথে অনেক তথ্যকে কুড়িয়ে নিতে হবে। তবু কোন্ তথ্যকে কুড়িয়ে নিতে হবে, জোগাড় করতে হবে, অথবা দেখতে হবে? —অনেক ফুল চয়ন করে মালি। তবু মালাকার পুষ্পসম্ভার থেকে বেছে নেয় ফুল, যা তার মালায় শোভা পাবে। সব ফুলে মালা গাঁথা যায় না, হয় না। পোআঁকার বললেন, There is a hierarchy of facts: তথ্যেরও ক্রমোচ্চ শ্রেণী বিভাগ থাকে। যে ফুল যে ঋতুতে সহজলভ্য—সে ফুলই মালায় বেশি দেখা দেয়। যে তথ্য সহজ সরল সাধারণ—সেই বেশি কাজের। যা সব সময়ে হাতের কাছে, কাজের, তাই ভালো। যা অবরে সবরে হাজির হয়, কাজে লাগে, তা অবরে সবরেই ভাল। যেমন, হাতের কাছে স্পেসিস (Species) না থেকে যদি শুধু একটি প্রাণী বা জন থাকতো, যদি পিতামাতার রূপগুণ সন্তানে সঞ্চারিত না হতো, তবে প্রাণীবিজ্ঞানীদের কাজ সহজ হতো না, সরল হতো না। —সহজ সরল তথ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটে। বিজ্ঞানী এই সহজসারল্যকে খুঁজে পেতে চায়। তার খোঁজা বিরাটত্বের পটভূমিতে এবং ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রের জগতে। এই খোঁজার পথে সে নিয়ম পায়। আর সেই নিয়মে মিলটেনে আসা তথ্যগুলো হঠাৎ মনে হয় একঘেয়ে। তখন সে খোঁজে বৈপরীত্যকে। যা সবচেয়ে বিরোধী—সেই তখন অবকর্ষণের। তবু আকর্ষণীয় বলেই সেই তথ্যকে বিজ্ঞানী সাজানোর উপকরণে টেনে নেয় না। তার সাজাবার রীতিতে থাকে অনেক অভিজ্ঞতার সংবদ্ধ রূপ, অনেক চিন্তার সংক্ষিপ্ত প্রকাশ। এই অভিজ্ঞতা, চিন্তা আর উপকরণ হাতের কাছে থাকলেও; সবাই সাজাতে পারে না। কেউ কেউ পারে। সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি। —এ কেন হয়? পোআঁকার মগ্নচৈতন্যের অস্তিত্বের আবির্ভাবের কথা বললেন। বললেন, এটি হলো Subliminal Self—যাকে অন্য পথ অনুসরণ করে অন্য চিন্তাবিদরা পেলেন, বললেন এটি Preintellectual Awareness বা উপলব্ধি-পূর্ববোধ। কান্টির দর্শনের অবজেকটিভের বেড়া ভেঙে সাবজেকটিভের চৌকাঠে এই অস্তিত্বের, এই বোধের পা রাখা। গণিত এইখানে দাঁড়াতে পারে। পারে বলেই অনেক তথ্যের ভিড়ে সঠিক আলপনার অলংকরণটির আভাস সে এনে দেয়। মানুষের মগ্ন চৈতন্যে গণিতের সৌন্দর্য ভেসে ওঠে। গণিতের গঠনে-কারুকৃতে আছে সুষমা, আছে সুরসঙ্গতি-হার্মনি। আর সব মিলিয়ে সুন্দরতা। 'সব কিছুর কেন্দ্রে আছে এই সৌন্দর্য! এই সৌন্দর্য রোমান্টিক নয়। এটি ক্ল্যাসিক্যাল—যা প্রতিটি অংশের সঙ্গতি-সাযুজ্যে গড়ে ওঠে; যা জাগায় রোমাঞ্চ! একে বাদ দিয়ে জীবন অর্থহীন, তুচ্ছ। এ যেন একজনের স্বপ্ন—যা আবার বহুজনের। এখানে পার্থক্য নেই। পার্থক্য টানা যায় না। এই হার্মনি বা সুষমার অন্বেষণে বেরিয়ে মানুষ তথ্যকে বেছে নেয়। সম্বন্ধ সম্পর্ক খোঁজে। ···বিজ্ঞানের ভিত্তিতে আছে সৌন্দর্যবোধ —যা সে গণিতের মাধ্যমে সহজে চিনতে পারে। এবং পারে গণিতের সহায়তায় সেই সহজসারল্যের সুন্দরতাকে প্রকাশ করতে।" —বিজ্ঞানের ভিত্তিতে গণিত থাকে—এ কথাটি জানালেন পোআঁকার—জানালেন মুখের ভাষায়, আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে। গণিতের সৌন্দর্য মুখের ভাষায় প্রকাশ পেল। একটি ভাষার মোহময় বর্ণনা হলো অন্য আরেকটি ভাষায়।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বাইরে গণিত পা রাখতে পারে—পো-আঁকারের এই কথার প্রতিধ্বনি তুললেন উলফগাঙ পাউলি এবং লাইনাস পাউলিং। আজকের বিজ্ঞানের প্রমাণে যে জটিলতা পরোক্ষতা সে যেন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুজগতের বাইরে অনুভূতির শিহরণ। যেন গণিত নামক ভাষাটি মানুষের তৈরি মানুষেরই মত, On his Image! এটি একটি লাঘব শরীরী ভাষা। বিজ্ঞানের প্রকাশে এটির প্রবেশাধিকারকে রোখা যায় না।

এলবার্ট আইনস্টাইন বিজ্ঞানের এই সহজিয়া সৌন্দর্য-বোধের অন্বেষণের কথা বললেন। 'একটি তত্ত্বে গৃহীত সূত্র যত সহজ ও সরল হবে, যত সে বিচিত্রগামী হবে, বিস্তৃত হবে তত্ত্বটি ততই আকর্ষণের।' 'আমাদের চিন্তা শব্দ ঘিরে শুধু যে গড়ে ওঠে তা তো নয়, শব্দের আওতা এড়িয়ে অবচেতনার সাম্রাজ্যে তার নিঃশব্দ পদচারণ যে ঘটে—সেখানে সন্দেহ কোথায়। তা নইলে কোন ঘটনায় অভিজ্ঞতায় হঠাৎ আমরা বিস্মিত হই কেন? আমাদের চেনা জানা, অভিজ্ঞতায় গড়া বিশ্বস্ত জগতের বিরোধী ঘটনায় আমরা অবাক হই। এই বিরোধ আমাদের চিন্তার জগতে আলোড়ন তোলে। বিস্ময়বোধের ঝরণাধারায় অভিষিক্ত হয় আমাদের চিন্তাজগৎ। মনের কোণে গুণগুণ করে তখন সুর জেগে ওঠে—বড় বিস্ময় লাগে! এই বিস্ময়, এই রসানুভূতি—এ কি গণিতে সেজে দাঁড়ায়? এই প্রশ্ন এলবার্ট আইনস্টাইনের। জ্যামিতি ও অভিজ্ঞতা (Geometry & Experience) নামের প্রবন্ধে তিনি বললেন, 'গণিত, যা মানুষের চিন্তার একটি ফসল, যাকে

অভিজ্ঞতার আওতায় বাঁধা যায় না—এই বাস্তব বস্তুজগতের ব্যাখ্যায় সে কেন এত বিশিষ্ট? অভিজ্ঞতাকে এড়িয়ে কেবল চিন্তার পথে গড়ে তোলা মানুষের যুক্তিবোধ বাস্তব জাগতিক বস্তুর গুণাগুণ বিচার করতে কি সক্ষম? আমার মতে এই প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর হলো বাস্তবের বর্ণনায় যে গাণিতিক প্রতিজ্ঞা বা proposition-এর প্রয়োগ হয়—সেটিকে 'নিশ্চয়' বলা যায় না। আর যখন এটি নিশ্চিত—তখন বাস্তবের বর্ণনা সঠিক নয়।'—গণিতের এই অনিশ্চয় পদক্ষেপ, তার সীমাবদ্ধতার কথা জানালেন আইনস্টাইন। জানালেন মুখের ভাষায়। ...তবু অনিশ্চয়তার বিস্ময়ঘেরা গণিত নামক ভাষাটি সম্ভাবনা-অনিশ্চয়তার বেড়ায় বাঁধা আজকের বিজ্ঞান জগৎকে প্রকাশ করতে পারে। —অন্য কোন ভাষার সেই ক্ষমতা যে নেই!

(3)

অন্যদিকে গণিতে পাওয়া নিয়মগুলির বর্ণনা মুখের ভাষায় দিতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা দেখেন গণিতের প্রতীক রূপটির ব্যাখ্যা মুখের ভাষায় সব সময়ে দেওয়া যায় না। কারণ শব্দার্থের পূর্বস্মৃতি অথবা অর্থের সংকীর্ণতা। যেমন ক্রিয়েশন ও এনিহিলেশন শব্দ দুটি,—যার প্রচলিত অর্থ হলো সৃষ্টি ও লয়। গণিতের ভাষায় জানা গেল, এরা জানায় রূপান্তরিত অবস্থা। এই সৃষ্টি ও লয় চিরপ্রবহমান। যা ধরা পড়ে, তা শুধু রূপান্তরিত অবস্থা। অথবা ইলেকট্রন, ফোটন ইত্যাদির আচার-ব্যবহার। এরা কণা, এরা তরঙ্গ; হয়তো বা কণাতরঙ্গ—যার সঠিক ধারণা গণিতের ছকে জানা যায়; অথচ মুখের ভাষায় নিশ্চিন্তে প্রকাশ করা যায় না; খানিকটা অস্পষ্টতা থেকে যায়। অথবা ধরা যাক Inert—ইনার্ট শব্দটি। এর প্রাচীনতম অর্থ ছিল অদক্ষ। অদক্ষ বলেই অকাজের, অলস। নিউটনের কালে ইনার্টের অর্থ হলো অলস, জড় এবং ইনারশিয়ার ভাষান্তর জাড্য। আবার আর্গন, নিওন ইত্যাদি মৌল গ্যাস, যাদের বলা হলো ইনার্ট অথবা অলস, তারা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ নেয় না। সুতরাং ইনার্ট হলো নিষ্ক্রিয়। আরো পরে জানা যায় এই সব গ্যাসের এটমের বাইরের কক্ষের ইলেকট্রনরা সহজে নড়তে চড়তে চায় না বলেই কাজেকারবারে নামে না। গ্যাসটি নিষ্ক্রিয়, কারণ এদের ইলেকট্রনরা নিষ্ক্রিয়। আরো পরে জানা যায়, এই ইলেকট্রনের কাজে নামানো যায়, দরকার শুধু এদের কাজে নামানোর জন্য প্রবল ঠেলাঠেলির শক্তি। এই গ্যাসরাও, এতএব, ক্রিয়াকলাপে নামতে পারে; এদের ইলেকট্রনরা আক্ষরিক অর্থে Immovable বা অচল নয়। এরা Nonmovable বা নিশ্চল। অতএব ইনার্ট শব্দের আভিধানিক অর্থের বিস্তৃতি ঘটে, অদক্ষ, অলস, জড়, নিষ্ক্রিয়, নিশ্চল। অর্থাৎ অভিজ্ঞতার পথে গড়ে তোলা গণিতের সংজ্ঞা ধরে অর্থের বিস্তৃতি ঘটানো হচ্ছে। গণিতের শব্দাংশের অনুবাদ করা হচ্ছে মুখের ভাষায়। শব্দের পূর্বস্মৃতিকে সরিয়ে নতুন অর্থ হাজির হয় অভিধানে। বড় দ্রুত এই অর্থের পরিবর্তন। —অন্যদিকে মুখের ভাষায় শব্দের অর্থ পরিবর্তন ঘটে সাধারণত ঢিমে তালে। কালিদাসের কালে একরাট্ শব্দের অর্থ ছিল বৃহৎ সাম্রাজ্য—যা রবীন্দ্রনাথের হাতে পেল One world-এক পৃথিবীর রূপ। হাজার বছর লাগল, সাম্রাজ্যকে পৃথিবীর রূপ পেতে। অন্যত্র দেখা যায় বৈদিক রোদসী শব্দের অনুসরণে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন ক্রন্দসী—মানে আকাশ যা রোদসীরও অর্থ। তবু অতুলপ্রসাদ যখন লেখেন ক্রন্দসী পথচারিণী—তখন আকাশের বদলে একটি দুঃখ ভারাক্রান্ত ক্রন্দনমুখী নারীর ছবি ধরা পড়ে। মুখের ভাষায় অর্থের স্থিতি নেই। অথচ গণিতে অর্থের নির্দেশনা থাকে। থাকে নিত্যতা।

আরো একটি সংশয় দেখা দেয়। শিল্পীর মনে তাঁর শিল্পকর্মটির একটি ভ্রূণরূপ ধরা পড়ে। এটিকে শরীরী রূপ দেবার যন্ত্রণা শিল্পীর। প্রকাশের বেদনাটিও তাঁর। নিজের উপলব্ধিটিকে কবি প্রকাশ করেন ভাষায়, চিত্রী করেন রঙ তুলিতে; মূর্তিকার মাটি পাথরে অথবা ধাতুর ছাপে। প্রকাশের ভঙ্গী ভিন্ন, আঙ্গিকও ভিন্ন। তবু এই সব প্রকাশিত শিল্প কর্মগুলির দিকে তাকিয়ে সমজদাররা বিস্ময়ে আনন্দে মুখর হয়ে ওঠেন, নন্দিত ভাষায় ব্যাখ্যা জানান; যে ব্যাখ্যা বা বর্ণনাটি পেয়ে আরো অনেকে শিল্পকর্মটির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হতে পারে। —বিজ্ঞানেও তাই ঘটে। কি হতে পারে, কি ঘটছে, সব হয়তো জানা যায় না, বোঝানোও যায় না। বিজ্ঞানী তাঁর শিল্পকর্মটি প্রকাশ করছেন গণিতের ছকে। সেই কর্মটির ব্যাখ্যা বা বর্ণনাটি মুখের ভাষায় করা যে দরকার!

তত্ত্ব গঠন করতে নিউটন গণিতের যে শাখাটি ব্যবহার করলেন, সেটি তাঁর নিজের সৃষ্টি কেলকুলাস। ম্যাক্সওয়েল তড়িৎ-চুম্বক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে দ্বারস্থ হলেন গাউসের হাতে সাজানো ভেক্টর গণিতের কাছে। আপেক্ষিকতাবাদ সৃষ্টি করতে আইনস্টাইন তুলে নিলেন রীমানের জ্যামিতিভিত্তিক ক্রিস্টোফেলের টেনসর। এটিকে তিনি পরিবর্তন পরিবর্ধন করে নিজের চিন্তাটি প্রকাশ করতে প্রয়োগ করলেন। অনিশ্চয়তা তত্ত্ব গঠনের কালে হাইসেনবার্গ একটি গণিতের ছক পেলেন; —ডিরাক তাঁকে জানান, গণিতের এই ছক নতুন নয়, এটি হেমিলটনের চিন্তায় পাওয়া ম্যাট্রিক্স এলজেব্রা, গণিতের এই শাখাটি ব্যবহার করে অন্য বিজ্ঞানীরাও তাদের ব্যঞ্জনাটি খুঁজে পান। ডিরাক ও রোজার পেনরোজ তাঁদের তত্ত্বের গঠনের জন্য গণিতের দুটি নতুন রূপের কথা ভাবেন, স্পিনোর ও টুইস্টোর। কণা পদার্থ বিভাগে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে হিবগনায় গণিতের গ্রুপ থিয়োরিটির ব্যবহারের কথা চিন্তা করেন; এবং বিজ্ঞানীদের হাতে সৃষ্টি হলো গ্রুপ থিয়োরির সহযোগী লাইএলজেব্রা। অন্যদিকে পরীক্ষক বিজ্ঞানীদের হাতে, বিজ্ঞানের ফলিত শাখায়, কম্পুটার ও ইলেকট্রনিক বিভাগে গণিতের আরো একটি শাখার প্রয়োগ হলো,—বুলিয়ান এলজেব্রা। যেমন ভাষায় সৃষ্টিতে নিজের

চিন্তার নির্মিতিরূপ দিতে কেউ আশ্রয় নেন কবিতার, কেউ প্রবন্ধের, গল্প বা উপন্যাসের, সেখানে শৈলী আলাদা, ভঙ্গী আলাদা শব্দ ও বাক্যগঠন আলাদা ; কেউ সৃষ্টি করেন নতুন শাখা, কেউ পুরনো ধারার মার্জনা করেন, কেউবা করেন পরিবর্ধন—বিজ্ঞানেও সেই এক রীতি ধরা পড়ে। ভাষা-গণিতের আবির্ভাব অথবা সৃষ্টি, পরিমার্জনা অথবা পরিবর্ধন, প্রয়োগ অথবা সংযোগ,—বিজ্ঞানীদের হাতে। তাঁরাই এই ভাষার রূপকার।

এই ভাষাটি কেন এত আদরের ? চিন্তাবিদরা যুক্তিশৃঙ্খলের ধারার সম্বন্ধ সম্পর্কের কার্যকারণ খুঁজতে গিয়ে কতগুলো পদ্ধতির কথা ভাবেন—যেমন colligating, coalescence—যা একাঙ্গীকরণের সুষমাটি জানায়। গণিতের ধারায় নানা উপকরণের সম্বন্ধ-সম্পর্কের জের টেনে একাঙ্গীকরণ অথবা একত্রে আবদ্ধকরণ সম্ভব। অতি দ্রুত সাজিয়ে গুছিয়ে ডালা ভরা যায়,—আর এই একাঙ্গীকরণের রূপসজ্জায় যে অপরূপটি ধরা পড়ে, সে একটি বিশেষ প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। যেন কুমোরের হাতে মূর্তি গড়া। খড়, কাঠি, মাটি রঙ এর একাঙ্গীকরণে যে রূপ সে সাজিয়ে তোলে—তা হতে পারে শিব, অথবা সরস্বতী বা অন্য কিছু। কারুকৃতির পথে যা পাওয়া যায়, গণিতের ভাষায় সেই একই পদ্ধতি ধরা পড়ে। তথ্য থেকে তত্ত্ব গড়ার পথে বিজ্ঞানীদের তাই গণিতের দ্বারস্থ হওয়া।

তবু মূর্তি গড়ার আগে থাকে প্রস্তুতি, থাকে ভাবনা। মূর্তি গড়ার পর থাকে মূর্তির ব্যঞ্জনাময় বর্ণনা। দুটি সীমার মাঝে থাকে উপকরণ নিয়ে শৈল্পিক গঠন। অথবা যেমন হনুমানের সাগরপাড়ি। লাফ দেবার আগে হনুমান খুঁজে নেয় উপযুক্ত স্থান—যেখান থেকে সে লাফ দিতে পারে, শরীরকে বিস্তৃত সে করে, আর ক্ষমতার জন্য পবনদেবের সাহায্য চায়। সাগর লাফের কালে ছোটখাট বিপদ দেখা যায়। —তবু প্রস্তুতি আর শক্তি দুটিই সঠিক হওয়ায় সাগর পার হতে সে পারে। লাফের আগে সে জানে, যেখানে সে পৌঁছুবে সেখানে হয়তো সীতাদেবীর দেখা পাবে। লাফের শেষে যা 'সে দেখে, তা' সীতা কিনা সে সন্দেহ থেকে যায়। তবু সে সংশয়হীন হয়ে সীতার দেখা পায়। —এই যে অন্বেষণ, এ যেন বিজ্ঞানের যাত্রাপথ। তথ্য আর উপকরণ নিয়ে বিজ্ঞানীর প্রস্তুতি। তথ্য সাজাবার কালে সে মূর্তিকারের মত মডেলের কথা ভাবে। নিউটন ভাবেন লাটুর কথা শুধু নাগরদোলার কথা ; গাউস ভাবেন নদীর জলে ভাসা মালাটির কথা, ওজনহীনতা বুঝতে চেয়ে আইনস্টাইন ভাবেন লিফট আর তার ভেতরের মানুষটি ; নিয়েলস বোর দেখেন এটমের অভ্যন্তরে ইলেকট্রনের একা দোক্কা খেলা ; আর দ্রবজী দেখেন হার্প নামক তার-যন্ত্র। এই যে মডেল, এরা আমাদের অভিজ্ঞতার জগতে পাওয়া, যারা ঘরের জিনিস, যারা পরিচয়ের, যাদের আচার ব্যবহার মুখের ভাষায় দেওয়া যায়। এখানে গণিতের প্রয়োজন নেই। তবু এই মডেল না থাকলে সাজানোর রীতিটি সহজ লভ্য নয়। এই প্রস্তুতি পর্বে মুখের ভাষার কলরোল থাকে। আবার সাজাবার পর যে মূর্তিটি পাওয়া যায়—সেটি কে, সেটি কী—সে ব্যাখ্যা গণিতে নেই। এখানেও এটিকে সঠিক ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে, বর্ণনা করতে লাগে মুখের ভাষা। বিজ্ঞানের যাত্রাপথে গণিতের পদরেখার শেষ ও শুরুর সীমান্তে থাকে মুখের ভাষার মুখরতা। —গণিত নামক ভাষাটি বিচিত্রগামী হলেও সর্বত্রগামী নয়। ভাষাটি উদাসীন নিরপেক্ষ হলেও সে স্বাধীন নয়। মানুষের মত হয়েও মায়াবশরীরী ভাষাটির চালচলন মানুষেরই হাতধরা ! মুখের ভাষায় শিল্পকর্ম করার মত এটিও ব্যক্তিনির্ভর।

(4)

বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের চিন্তায় আইনস্টাইন একটি নতুন ধারা আনলেন। তথ্য থেকে তত্ত্ব গড়া—এই ছিল সনাতন বিজ্ঞানের রীতি। বিজ্ঞানের গবেষণায় তাই তথ্য সংগ্রহের এত প্রাবল্য। এবং থাকে পরীক্ষক বিজ্ঞানীদের স্বীকৃতি। এমন কি নোবেল পুরস্কারের ঘোষণাপত্রে এই স্বীকৃতির ঘোষণা দেখা যায় ;—পুরস্কার পাবার যোগ্যতা শুধু আবিষ্কারক বিজ্ঞানীদের—ডিসকভারারদের—যাঁদের আবিষ্কারের ফলিত রূপ মানব সেবায় লাগবে। বিজ্ঞানের সব তত্ত্ব কি তাই ? তাদের অনেক হয়তো বা জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে তোলে। তবু মানব সেবায় তারা কি ব্যবহৃত হতে পারে ? —এই প্রশ্ন থাকে। অথচ বিজ্ঞানীরা প্রকৃতির নিয়ম খুঁজতে বিরত হন না ; কারণ সেই নিয়ম সত্যের কাছে তাঁদের নিয়ে যায়।

1905 খৃস্টাব্দে আইনস্টাইন চারটি পেপার প্রকাশ করলেন, যাদের তিনটি একটি আশ্চর্য ধারা প্রকাশ করে। সামান্য কিছু সীমাবদ্ধ তথ্যকে মেনে নিয়ে ইন্‌টুইশনের সাহায্যে, উপলব্ধির পথে তিনি তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করলেন। প্রতিষ্ঠা নয়, বরং বলা হোক, ঘোষণা করলেন। পরীক্ষা গবেষণার পথ এড়িয়ে কাগজ-পেন্সিলে তিনি তত্ত্বকে খুঁজে পান। আর সেই তত্ত্বের তথ্যভিত্তিক প্রমাণ পাওয়া যায় পরীক্ষক বিজ্ঞানীদের হাতে,—অনেক পরে। তাঁরাই তখনো না-পাওয়া, না-জানা তথ্য শৃঙ্খলের ধারাবাহিকতাটিকে প্রতিষ্ঠা করেন ; যে ফাঁকফোকরগুলো আইনস্টাইন উপলব্ধি দিয়ে ভরাট করেছিলেন, তাদের বাস্তবে উপস্থিতি দেখা যায়। পরীক্ষা-তথ্য-চিন্তা-তত্ত্ব এই সার্বিক সনাতনী বিজ্ঞানের রীতিটিকে পালটে আইনস্টাইন এক নতুন শৃঙ্খলের ধারণা আনলেন : প্রাথমিক তথ্য-উপলব্ধি-চিন্তা-উপপত্তি-পরীক্ষা-তথ্য-তত্ত্ব। আইনস্টাইনের প্রাকতত্ত্ব-উপপত্তির সৃষ্টিতে আছে যুক্তি ও কল্পনা ;—যে যুক্তি ও কল্পনা হলো গণিতের প্রয়োগে গড়া অনিরুদ্ধ-উষার স্বপ্ন কাহিনী—যা তথ্যভিত্তিক বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠার পূর্বরাগ, এবং, হয়তোবা, উপলব্ধির পথে ভেসে আসা স্বপ্নস্বরূপ চৈতন্য। তবু এই উপলব্ধিকে, স্বপ্নস্বরূপ চৈতন্যটিকে বর্ণনা করতে হয় ; ব্যাখ্যা বা প্রকাশ করতে হয় ; সেই প্রকাশের ভাষা—প্রাক-বিজ্ঞান ভাষা। গণিত নয়,

মুখের ভাষা। পোআঁকার জানিয়েছেন, উপলব্ধির দ্বার-দেশে গণিত এলেও, তার প্রবেশাধিকার ঘটে নি। অন্যদিকে দৈনন্দিন প্রাত্যহিক আটপৌরে মুখের ভাষা এই উপলব্ধিকে সঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারে কি ?

একটি প্রবন্ধে এই সংকটের কথা আইনস্টাইন বললেন। 'অভিজ্ঞতার জগতের কোন ধ্যানধারণার অংশটুকু আমাদের প্রাক্-বিজ্ঞান উপলব্ধিকে গঠন করতে সাহায্য করে, তা আমরা জানি না। আরো দেখি, পুরনো কালের প্রতিষ্ঠিত ধ্যানধারণার চশমার মধ্য দিয়ে দেখা ছাড়া অভিজ্ঞতার জগৎটিকে এমন কি নিজের কাছেও প্রকাশ করা যেন দুঃসাধ্য। আরেক সমস্যা হলো, যে ভাষায় তা প্রকাশ করতে বাধ্য হচ্ছি, সেটি ঐ পুরনো ধ্যানধারণার ভিত্তিমূলে যেন অবিচ্ছেদ্য ভাবে গাঁথা। স্পেসের তত্ত্ব গঠনে প্রাক্বিজ্ঞান-উপলব্ধির বিশেষত্ব যখনই বর্ণনা করার চেষ্টা করছি, তখনই এসব বাধা দুর্বার হয়ে দাঁড়াচ্ছে।' —প্রচলিত ভাষার কাঠামোতে প্রাক্বিজ্ঞান-উপলব্ধিটিকে প্রকাশ করা কঠিন। এখানে যে মডেলের কাছে হাতপাতা হয়, সে হয়তো, বাস্তবে সম্পূর্ণ নেই। এটি যেন অর্ধেক বাস্তব—অর্ধেক কল্পনার মিশ্রণ। সেই উপলব্ধির সাহায্যে নরসিংহী মডেলের সহায়তায় গণিতের রূপরেখায় বিজ্ঞানের তত্ত্ব গঠন করা হয়তো সম্ভব ; আবার অসম্ভব সেই তত্ত্বের সত্যটিকে মুখের ভাষায় প্রকাশনে। কারণ এই তত্ত্ব চেনাজানা নিউটনের জগৎ নিয়ে গড়ে ওঠে নি। পরিদৃশ্যমান জগতের সীমার বাইরে এই তত্ত্বের পা রাখা! সেখানে থাকে মহাবস্তু বা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণা।... আধুনিক বিজ্ঞানের সংকট এইখানে।

নানা যন্ত্র উদ্ভাবন করে বিজ্ঞানীরা তথ্য জোগাড় করেন। সেই তথ্য নিয়ে অন্য একদল বিজ্ঞানীর চিন্তা ভাবনা। কী জানা যাবে তথ্যগুলি থেকে? কেমন করে জানা যাবে নানা তথ্যের সম্পর্কটি? পরীক্ষার যে ফল পাওয়া যায়, সেই শেষ নির্দেশনার আগে থাকে প্রস্তুতি, থাকে শুরু থেকে শেষে যাবার প্রবাহ। পরীক্ষায় পাওয়া তথ্য কি সেই প্রবাহ কে জানাতে পারে? তবে কেমন করে থিয়োরি বা তত্ত্বের আঙিনায় বিজ্ঞানীরা আসেন ?—এই প্রশ্নগুলি চিহ্নিত করে 1926 খৃস্টাব্দে হাইসেন-বার্গকে আইনস্টাইন বললেন, 'লেবরেটারিতে যা দেখা যায়, সেটি জানায় একটি ঘটনা, একটি ফেনোমেনা। আর তার থেকে যুক্তিসম্মত বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা গড়ে তোলা হয়। এটমের অন্দরমহলে কিছু একটা ঘটছে ; আলো বেরিয়ে আসে, তার আঘাতের চিহ্ন ফোটোগ্রাফ প্লেটে ধরা পড়ে ; আমরা সেই পড়ে থাকা চিহ্ন দেখি। এসবই ঘটছে! এই পরিদৃশ্যমান ঘটনার জগতে এটমের লীলাখেলা আর তোমার চোখ ও বোধির সমন্বয়ের চৈতন্যে, তুমি ভাব,—ক্লাসিক্যাল ফিজিক্সের রীতিতে সব বুঝি বোঝা যায় ; সবকিছু বুঝি ঘটে! এবার তথ্য সাজানোর দৃষ্টি-কোণটা যদি পালটাও, অথবা যদি পালটাও ঘটনার প্রবাহশৃঙ্খল, তা তখনো দেখবে, নতুন ভাবে যা চোখে ধরা পড়ছে, সেই ঘটনাও যেন সুন্দর শ্রীছাঁদে সেজে দাঁড়ায়।'—দেখার নির্দেশনাগুলো চেতনার স্পর্শে অন্যরূপ পেতে পারে। মালাকারের হাতে মালির চয়ন করা ফুল নতুন সাজে সাজতে পারে। যাকে ভাবা যায় কণা, ভিন্ন চোখের আলোয় সে তরঙ্গের ঢেউ তুলতে পারে। এই যে 'দেখা'-এযেন কবির চোখে দেখা—যেখানে চেতনার রঙে পান্না সবুজ হয়ে ধরা পড়ে।—তবু সেই 'দেখা'ও যে বাস্তব।

দেখার জগতের দৃশ্যগুলিকে বুঝতে চেয়ে চিন্তার দ্বারে, কল্পনার দ্বারে বিজ্ঞানীদের বারবার ফিরে ফিরে তাকানো। পরীক্ষার পথের শেষটুকু দেখা যায় ; অথবা শেষের ঈপ্সিতটুকু ধরা পড়ে। কী আছে পথের মাঝখানে অথবা পথের শুরুতে? সূর্য থেকে পৃথিবীর বুকে আলো-তাপ নেমে আসে। সূর্যের বুকে কী ঘটছে যা তাকে জ্বালিয়ে রাখে? কী সেই যন্ত্রণা অথবা কী সেই আনন্দ ?—কেন এই খোঁজা? কেন খোঁজার যন্ত্রণাকে মেনে নেওয়া?

(5)

আমরা যাকে সভ্যতা বলি, তার বেশির ভাগ শরীরের প্রয়োজন আর বিলাসের দাবী মেটাবার কৌশল। এদের আবিষ্কারে মানুষের যে শক্তি, যে বুদ্ধি কাজ করে তার জটিলতা বিস্ময়কর। একই দাবীর তাগিদে হাঁসের দল যাযাবর হয়ে পাড়ি দেয়, গুটি পোকা তাঁত বোনে, কাকের বাসার সামনে কোকিল কুহুধ্বনি তোলে। তবু প্রয়োজনভিত্তিক চাহিদা মেটাতে সভ্যতা নিঃশেষ হয় না। পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাবের ক্ষণটি আজো অজ্ঞাত। তার চেয়েও গূঢ় রহস্য প্রাণীর শরীরে মনের বিকাশ। এই মন—যাকে Subliminal self অথবা Preintellectual awareness—এরও বাইরে রাখি, প্রাণের রক্ষা আর পুষ্টিতে অন্দরমহলে তার ছোট তরফের ক্রিয়াকলাপ। এই ক্রিয়া যত ব্যাপক, যত জটিল তত সে বিচিত্র। মনকে প্রাণের যন্ত্রমাত্র কল্পনা করে জটিলকে সহজবোধ্য করার প্রলোভনও স্বাভাবিক। তবু প্রাণের কাজে ব্যয় হয়েই মন নিঃশেষ হয় না। শ্রদ্ধেয় অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় বললেন, 'মানুষের এই অবশেষ মন শরীর ও প্রাণের প্রয়োজনে নয়, অন্য এক প্রেরণায় এক শ্রেণীর সৃষ্টি করে চলেছে, যার লক্ষ্য মনের নিজের তৃপ্তি ও আনন্দ ছাড়া আর কিছু নয়। প্রাণ ও শরীরের যা প্রয়োজনে লাগে, তাই যদি হয় লৌকিক, মনের এই-সৃষ্টি অলৌকিক।...শরীর ও প্রাণের প্রয়োজনে মানুষের যে প্রকাণ্ড সৃষ্টি, তাকে যদি বিনা প্রশ্নে স্বাভাবিক বলে মেনে নেওয়া চলে, তবে মনের নিজের তৃপ্তি ও আনন্দের প্রয়োজনে তার যে সৃষ্টি তাকেও সমান স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে কোনো বাধা নেই।—কথাগুলি অতুল গুপ্ত মহাশয় সাহিত্যসৃষ্টির পটভূমিকায় বললেন। আধুনিক বিজ্ঞানে যে সৃষ্টি-রহস্যময়তা দেখা দেয়, এ যেন সভ্যতার প্রায়োজনিক রূপটিকে মেনে ধরছে না। এটি যেন সেই অবশেষ মনের খেলা বা লীলা।

শ্রেষ্ঠ সাহিত্য বা কাব্য বলে যা স্বীকৃত, তাদের মধ্যে এমন অনেক আছে যেখানে সামাজিক মঙ্গলের লক্ষ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। গোটা মেঘদূত কাব্য ঘেঁটে 'যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামাঃ,'—পঙক্তিটি পেয়ে গোঁড়া কট্টর সমাজবাদী নিশ্চিন্ত হতে পারেন। তবু মেঘদূত মেঘের কথা জানালেও চাষের কাজে লাগে না। আধুনিক বিজ্ঞানের অনেক কিছুই ফলিত রূপ পেতে পারে নি। তবু মহাবিশ্বে বা কণাজগতে তত্ত্বতালাশ চলে। কারণ মানুষ সত্যকে জানতে চায়। আর এই জানতে চাওয়া আকাঙ্ক্ষাটিও ঐ অবশেষে মনের!

আইনস্টাইনের তত্ত্ব মানুষকে সামান্যতা দিয়েছে। এই বিশাল মহাবিশ্বের একটি সামান্য তারকার একটি ছোট্ট গ্রহের নাম পৃথিবী—যেখানে কয়েকটি বিশেষ শর্তে পরিবেশে প্রাণের আবির্ভাব। পৃথিবীর ইতিহাসের পাতায় এই আবির্ভাব কাহিনী লেখা আছে। আবার অন্য কয়েকটি শর্তে মানুষ দেখা দেয়—এই আবির্ভাব সৃষ্টির তুঙ্গমুখে ঘটে নি; এই আবির্ভাব ঘটে প্রাকৃতিক পরিবেশের আন্তঃক্রিয়ায়। আবার অন্য কোন এক পরিবেশে, শর্তে বা অন্তঃক্রিয়ায় মানুষ লোপ পাবে, সৃষ্টি ধ্বংস হবে। বিশাল মহাবিশ্বের মহাকালের কাছে এই প্রাণের আবির্ভাব তুচ্ছ; প্রাণের ধ্বংসও নগণ্য। তবু মানুষ প্রশ্ন তোলে, খোঁজে, স্বপ্ন দেখে। মানুষের জীবন যেন তাঁতের টানাপোড়েনে গড়ে-তোলা বিচিত্র এক নকশা। যে নকশা সে নিজের আনন্দে বোনে, অথবা বুনতে বাধ্য হয়। এই নকশার প্রয়োজন নেই, তবু সবকিছু সে আনন্দের জন্য করে থাকে। জীবনের নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, সহজ বা জটিল, ভয়ঙ্কর অথবা সুন্দর নকশা মানুষ গড়ে চলে। নকশার রঙ তুলি কখনো সে বাছাই করে, কখনো সে পারে না। এই সৃষ্টি-প্রবাহ যেন এক নদী—যার উৎস জানা নেই, জানা নেই মোহনা। তবু মানুষের কাছে এ চিরপ্রবহমান।—মানুষের তুচ্ছতা মানুষকে শূন্যতার বোধ এনে দেয়। তবু সেই শূন্যতার মুষ্টি থেকে মানুষ সৃষ্টির গোপন রহস্যটি জানার চেষ্টা করে। এই জিজ্ঞাসা, এই প্রয়াস তার নকশাটি পরিপূর্ণ-অলংকৃত করে তোলে।

সাধারণ মানুষের জীবনের নকশা সরল, সহজ। সামান্য কজন জটিল সূক্ষ্ম নকশার কারিগর। সেই নকশার নকল সকলে করতে পারে না। কারণ এর জটিলতা। এখানে প্রয়োজন 'দেখার' ও 'বোঝার' পালটানো ভঙ্গীর, পুরনো ধ্যানধারণার অবলুপ্তির। মানুষের ইতিহাসে বারবার এই পরিবর্তন এসেছে। আর বিংশ শতাব্দী আনে নববিজ্ঞানের নকশা—দৃষ্টিভঙ্গী ও ধ্যানধারণার পরিবর্তন যেখানে প্রবল ও সার্বিক!

কি ঘটেছে তার শেষ নির্দেশটুকু লেবরেটারির পরীক্ষায় নিরীক্ষায় ধরা পড়ে;—তবু সম্পূর্ণ ঘটনা প্রবাহ বা ঘটনা শৃঙ্খল জানা যায় না। সেই জানার যন্ত্রণায় বিদ্ধ বিজ্ঞানীরা কল্পনায়, উপলব্ধিতে পথের ছবি আঁকেন—সে ছবি প্রকাশের ভাষায় থাকে গণিত; অন্ততঃ বর্তমানে। গণিতের শব্দসম্ভার-পদ্ধতি দিয়ে ঘটনার শূন্যতাটুকু ভরাট করে বিজ্ঞানীরা নিটোল-সুস্পষ্ট-অর্থবহ ছবিটি সৃষ্টি করেন। কল্পনা-চেতনা-বোধি ও ভাষাগণিতের টানেটোনে-রঙে পরীক্ষায়-দেখা তথ্যটির একটি সুসামঞ্জস্য ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তবু সেই ব্যাখ্যাটিকে পরিপূর্ণ করে প্রকাশ করা কি যায়? হাইসেনবার্গকে একদা নিয়েলস বোর বললেন, 'এটম সম্পর্কে আমরা ব্যাখ্যা দিতে চাই। আর সেই ব্যাখ্যার জন্য দ্বারস্থ হচ্ছি পুরনো স্মৃতি, পুরনো শব্দের কাছে। এ যে কি এক সমস্যা! আমরা যেন দূরপ্রবাসে হঠাৎ আসা একদল নাবিক, যারা সেই দেশটি চেনে না, জানে না সেই দেশের ভাষা। অতএব এখানে মতবিনিময় ঘটে না; কথোপকথন হয় না।... ক্লাসিক্যাল ধ্যানধারণার উপর ভিত্তি করে শুধু শব্দ-বাক্যে আমরা ইলেকট্রনের গতি-শক্তি-ধর্ম ইত্যাদির কথা জানাতে হয়তো পারি;—শব্দ দিয়ে আঁকা সেই ছবি নিশ্চয় শুদ্ধ—অন্ততঃ আমি তো তা মনে করি। তবু সেই ভাষা আমাদের চিন্তা কতটা পরিপূর্ণ করে প্রকাশ করতে পারে!'

নিজেকে সবার জন্য বিস্তৃত করতে চায় বিজ্ঞান। তার সত্য—সে সকলেরই জন্য; তার সাধনার ফলটুকুও সর্বসাধারণের। বিজ্ঞানের সত্য ও সাধনাকে জনমানসের কাছে নিয়ে যেতে চান বিজ্ঞানীরা। গণিতকে এড়িয়ে মুখের ভাষায় এই সত্যটিকে প্রকাশ করতে হয়; এবং ভবিষ্যতেও হবে। কারণ মনের গণিত নেই, গণিতের মন নেই। —একযুগে সরল বিজ্ঞানের রীতিনীতির ব্যাখ্যা সহজেই দিতে পেরেছিলেন এনসাইক্লোপিডিস্ট স্কুল। কিন্তু যত জটিল তথ্য জানা যায়,—মহাকাশের বিশাল পটভূমিকায় অথবা এটমের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সংসারে যে ঘটনা ঘটে,—তাদের সম্পর্কবোধের জটিল গাণিতিক ছকের বর্ণনাটি মুখের ভাষায় খণ্ডিত হয়ে ধরা পড়ে। ভাষায় জানানো বিজ্ঞানের সত্য ও যন্ত্রণাটি অপূর্ণ, খণ্ডিত এবং হয়তো, কলঙ্কিত। জানানোর আগ্রহ বিজ্ঞানীদের, জানার আগ্রহ জনসাধারণের। তবু দু' পারের মাঝে থাকে দুর্বার-দুস্তর ভাষার বেড়া। কথোপকথন হয় না; মত বিনিময় ঘটে না। বোর দেখলেন নাবকদের বাণীর ঘনযামিনীর মাঝে নব বিজ্ঞান বন্দী! এই অন্ধকার গাঢ় ঘন; এই নৈঃশব্দ্য মন রুদ্ধকারী, দুর্বিষহ! ...নোবেল পুরস্কার বক্তৃতাতে, বোর বললেন, 'কোয়াণ্টাম ধারণা এটমের অভ্যন্তরে ইলেকট্রনদের স্থিতাবস্থার স্থির শক্তিটিকে জানাতে পারে, রাসায়নিক আর পদার্থবিদ্যাভিত্তিক গুণধর্মের ব্যাখ্যা দিতে পারে, পারে মেণ্ডেলীভের পর্যায় সারণীর সাজার কারণটি জানাতে। এই যে ব্যাখ্যা, যা মেটারের গুণধর্ম জানাতে পারে, এটি যেন বাস্তব রূপ নিয়ে আসে। ...অতীতে পিথাগোরাসরা স্বপ্ন দেখতেন যে, প্রাকৃতিক নিয়মদের শুধু সংখ্যার ভিত্তিতে জানা যাবে। আর এই যে মেটারকে কোয়াণ্টাম জগতে জানার স্বপ্ন—এ যেন আরো মধুর, আরো সুন্দর।'

এই স্বপ্নটিকে জনমানসের কাছে বর্ণনা করার আকাঙ্ক্ষা জাগে; মুখের ভাষায় মুখর করে তুলতে আগ্রহ হয়। কোন্

ভাষায় সেই বর্ণনা দেওয়া যায় ? —হাইসেনবার্গকে বোর বললেন, 'বুঝলে, আধুনিক গণিতের ছকে এটম ইত্যাদির যে আচার-ব্যবহার পাওয়া যায়, তাদের বর্ণনা ব্যাখ্যা করতে হলে যে ভাষা ব্যবহার করতে হবে—সেটি কবির ভাষা। কবিরা তাঁদের চিত্রকল্প সৃষ্টি করতে তথ্যের কথ্যরূপ নিয়ে যত ভাবেন, এখানে সেই ভাবনা আরো বেশি।'

সঙ্গীতের শ্রুতিমধুর রূপ মুখের ভাষায় সম্পূর্ণ প্রকাশ পায় না। শিল্পভাস্কর্যের দৃষ্টিনন্দন ভঙ্গী মুখের ভাষা প্রকাশ করতে অক্ষম। যা প্রকাশ পায়, তা অনুবাদ নয় ; অনুসৃজন। একদা আইনস্টাইনকে প্রশ্ন করা হলো সব চিন্তাকে শেষ মেশ বৈজ্ঞানিক রীতিতে প্রকাশ করা কি যায় ? —আইনস্টাইন বললেন, 'এটি হয়তো সম্ভব, তবে অর্থহীন। বিটোফেনের নাইন্থ সিমফোনির রূপকে বায়ু-চাপের কার্ভে রেখায় ফুটিয়ে তোলায় মত বাতুলতা।' —সঙ্গীতে যে অনুভূতির অনুরণন তা কাব্যের গাথায় প্রকাশ পেতে পারে, রঙ তুলির টানে ভরে উঠতে পারে। মন কেমন করার কথা গণিত জানাতে অক্ষম। ভাষা কিছুটা হয়তো পারে ; কিছু পারে অন্য শিল্প কর্ম ! —তবু সব কি জানানো যায় !—

—বোর পরিপূরকত্বের কথা বললেন।

ব্রহ্মনিষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্য গৃহস্থাশ্রম ছেড়ে প্রব্রজ্যা নেবার কালে নিজের ধনসম্পত্তি তাঁর দুই পত্নীকে ভাগ করে দেবার সংকল্প জানালে পত্নী মৈত্রেয়ী জিজ্ঞেস করেন, 'তাতে কি অমৃত লাভ হবে ?' —ঋষির অন্য পত্নী কাত্যায়নী স্বামীর প্রস্তাবে কি বলেছিলেন, উপনিষদে বলা হয় নি। তবে অমৃতত্ব পাওয়া যায় না বলে ধনসম্পত্তি বা বিত্ত যে তুচ্ছ—একথা তিনি মনে করেন নি। —যাজ্ঞবল্ক্যের দুই স্ত্রী—মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী ; এ'দের নিয়েই তাঁর সংসার। একজন তাঁর বাইরের মনের সঙ্গী, তাঁর গৃহিণী সচিব সখী ; তাঁর নর্ম সঙ্গী। অন্যজন মৈত্রেয়ী তাঁর অবশেষ মনের সাথী ; তাঁর মর্মসঙ্গী। দুই মিলিয়ে যাজ্ঞবল্ক্যের সংসার। এখানে বিরোধ নেই। আছে সহযোগিতা, সহমর্মিতা। এককথায় দুই স্ত্রী মিলিয়ে তাঁর মনের সমাজ। দুই স্ত্রী পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। —এই যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মজ্ঞ ; তিনি জ্ঞানী, তার্কিক। ধীরে ধীরে জানার পথের সোপান আরোহনে পারঙ্গম। তবু জনকের সভায় স্বর্ণশৃঙ্গ সহস্র গাভী গ্রহণে বিরূপতা দেখা যায় না। সভ্যতার কাত্যায়নী মূর্তিতে গাভী তাঁর প্রয়োজন। আবার সভ্যতার মৈত্রেয়ী মূর্তি তাঁকে বাচক্নবী গার্গীর সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত করে। —দুটিই সত্য। দুটি মিলিয়ে যাজ্ঞবল্ক্যের সংসার। এখানে বিরোধ নয়। আছে পরিপূরকত্ব। —এই যাজ্ঞবল্ক্য আলোচনার কালে গার্গীর 'ব্রহ্মলোক সকল কাহাতে ওতপ্রোত ?'—প্রশ্নের উত্তরে বলেন, 'গার্গি, অতি প্রশ্ন করো না।' —সাময়িক বিরতির পর গার্গী আবার প্রশ্ন করেন, 'আকাশ কাহাতে ওতপ্রোত !' —যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীকে বাধা দেন না। প্রশ্নের যন্ত্রণা গার্গীকে সাহসী করে তোলে—সেই সাহসের মর্যাদা দেন তিনি। তিনি জানান সব কিছু এক বিনাশহীন অক্ষরে ওতপ্রোত। যে অক্ষর 'অদৃষ্ট হলেও দ্রষ্টা, অশ্রুত হলেও শ্রোতা, মননের অবিষয় হয়েও মন্তা, অবিজ্ঞাত হয়েও বিজ্ঞেতা।' —যাজ্ঞবল্ক্য ভাষায় যে অক্ষরের বর্ণনা দিলেন, তা কোন নির্দিষ্ট মডেলে জানানো হলো না। ভাষায় বর্ণনা দেবার অক্ষমতা থাকে। তবু গার্গী সুখী হলেন। যা শুনলেন, তা তাঁর মনে এক বিমূর্ত ছবির রূপ ফুটিয়ে তুলতে পারে। এই ছবিই তাঁর প্রশ্নের উত্তর।

বোর একই কথা বললেন। তিনি বললেন, কণাজগতে কণাতরঙ্গের যে রূপ, তা যাজ্ঞবল্ক্যের সংসার। কণা ও তরঙ্গ পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক এই পরিপূরকত্ব বিশ্বের সর্বত্র থাকে, আছে। আছে ফলিত বিজ্ঞান ও তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের মধ্যে। থাকে মানব প্রকৃতি ও জীব প্রকৃতির সহাবস্থানে। থাকে বিজ্ঞানের নানা শাখায়। মানুষের চিন্তার যে নানা ধারা আছে, শিল্প-সাহিত্য-বিজ্ঞান-এখানেও কি পরিপূরকত্ব থাকে ? —বোর এই প্রশ্ন তুললেন ! আর জানালেন, একটি সত্যকে অন্য ভাষায় প্রকাশ করা সর্বাঙ্গীন ভাবে যায় না। ব্রহ্মলোককে খাটো করে আকাশে নামিয়ে প্রশ্নের উত্তর খোঁজা যায়। তবু সেই ব্যাখ্যার ভাষা অক্ষম হলেও, সে যে ছবি আঁকে, যে সুর তোলে, মন তাতে ভরে ওঠে। মনেই সেই উত্তর জাগে। —কিন্তু প্রশ্ন থাকে চিন্তা জগতে পরিপূরকত্বের চিহ্ন কোথায় ?

1930 খৃস্টাব্দে 14ই জুলাই অপরাহ্নে আইনস্টাইনের বাসভবন কাপুথে কবি ও বিজ্ঞানীর দ্বিতীয় সাক্ষাৎ ঘটে। আলোচনায় সত্য শিব ও সুন্দর বিষয় হয়ে ধরা দেয়। কবির দৃষ্টিতে 'বিশ্ব-জগৎ যখন মানুষের সঙ্গে এক সূত্রে চলে, তখন আমরা তাকে সত্য বলে জানি, সুন্দর বলে অনুভব করি।' —আইনস্টাইন জানেন, এই বক্তব্য বিশ্বজগৎ সম্পর্কে মানবভিত্তিক ধারণাই প্রকাশ করে। তবু রবীন্দ্রনাথ মানুষের অস্তিত্ব ও অস্তিত্বের এই উপলব্ধির উপর জোর দেন। তিনি জানেন, পরমসত্যকে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জানা যায় না, জানা যায় উপলব্ধির সাহায্যে। এই উপলব্ধি, এটি একের নয়, বহুর সামগ্রিক উপলব্ধি। বিজ্ঞান সেই সমগ্রের সঙ্গে জড়িত। বিজ্ঞানের সহায়ক ধর্ম। বিজ্ঞান যদি জ্ঞান বা সত্য হয়, তার পরিপূরকত্ব উপলব্ধিসঞ্জাত ধর্ম অথবা গুণ বা QUALITY'-র পথে পাওয়া যাবে হার্মনি বা সুন্দরকে।·· আইনস্টাইনের মতে সত্য মানব নিরপেক্ষ। তবু কবি মনে করেন, মানুষকে বাদ দিয়ে সত্যের কোন অস্তিত্ব নেই। মানুষই খোঁজে, প্রশ্ন তোলে, উত্তর খোঁজে। খোঁজার পথের হাতিয়ার—সেও মানুষের সৃষ্টি। আইনস্টাইন তবু সংশয়ী। অথচ সৌন্দর্যের কল্পনায় দুজনে একমত,—সৌন্দর্য মানব নিরপেক্ষ নয়।—দুজনের আলাপে সত্যের মীমাংসা হয় না। সত্য আমাদের সচেতনতা নিরপেক্ষ কিনা তা বোঝা গেল না। রবীন্দ্রনাথের মতে বিজ্ঞানে থাকে 'ব্যষ্টিমনের সীমিত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে কাটছাঁট করার শৃঙ্খলা।' আর এই ভাবেই আমরা বিশ্বমানবের

মনে অধিষ্ঠিত সত্যকে উপলব্ধি করি। আইনস্টাইনের বিশ্বাস, আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের কতগুলো অত্যাবশ্যকীয় বস্তুর ক্ষেত্রে মানব-নিরপেক্ষ বাস্তবতা আরোপ না করলে আমাদের চলে না। তবু এই যে মানব নিরপেক্ষ বাস্তব এর তাৎপর্য আমরা জানি না। কিন্তু সত্যের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হলে মানব নিরপেক্ষ এই বাস্তব আমাদের পক্ষে অপরিহার্য। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, মানুষের সঙ্গে সম্পর্কহীন কোন সত্য আদৌ যদি থেকে থাকে, তবে আমাদের কাছে তার কোন মূল্য নেই। রবীন্দ্রনাথের কথায়—"সত্যের চেতনায় বিশ্বজনীন মানব-মনের সঙ্গে ব্যক্তির মধ্যে আবদ্ধ ঐ একই মানব-মনের চিরন্তন বিরোধ রয়েছে। আমাদের বিজ্ঞানে, দর্শনে ও নীতিশাস্ত্রে এদের সমন্বয় সাধনের অবিরাম চেষ্টা চলেছে। যাহোক, মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক বিরহিত কোন সত্য যদি আদৌ থেকে থাকে, তবে আমাদের কাছে তা অর্থহীন। এমন মনের কল্পনা করা দুরূহ নয়, যেখানে ঘটনার অনুক্রম কোন জায়গায় ঘটে না ; গানের ক্ষেত্রে সুরের মত সেখানে তা ঘটে সময়ের রাজ্যে। এরূপ মনের ক্ষেত্রে বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে যে ধারণা, তা সঙ্গীত জগতের বাস্তবেরই সগোত্র। ওখানে পিথাগোরাসের জ্যামিতির কোন মানে নেই।···কাগজের বাস্তবতার সঙ্গে সাহিত্যের বাস্তবতার অনন্ত পার্থক্য। কেননা, কাগজখেকো পোকার যে ধরনের মন আছে সেখানে সাহিত্যের কোনই অস্তিত্ব নেই। অথচ মানুষের মনের কাছে কাগজের চেয়ে সাহিত্যের সত্য মূল্য আরো অনেক বেশি। একই ভাবে বলা চলে, মানুষের মনের সঙ্গে ইন্দ্রিয়গত বা যুক্তিগত কোন সংযোগ নেই, এমন সত্য যদি থেকে থাকে, তবে যতদিন আমরা মানুষ আছি, ততদিন আমাদের কাছে তা শূন্য।'

বিজ্ঞানের যে সত্য—তা যদি মানব-নিরপেক্ষ হয়, তবে ভাষাগণিতে তাকে বাঁধা গেলেও, মুখের ভাষায় তার প্রকাশে খামতি থাকে। কারণ মুখের ভাষায় বর্ণনায় যে সত্য হাজির হয়, তা সর্বজনীন নয়, মানব নিরপেক্ষ নয় ; মানবভিত্তিক। সত্য প্রকাশের দুটি ধারায় আছে একটি মিল—যেটি সৌন্দর্য। এই সৌন্দর্য মানব নিরপেক্ষ নয়। এই দিকচিহ্নটি মনে রেখে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বপরিচয় লিখছেন—যেখানে প্রাধান্য পেল সত্যের চেয়ে সুন্দর! ভূমিকায় বললেন, 'চেষ্টা করছি ভাষার দিকে। বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ শিক্ষার জন্য পারিভাষিকের প্রয়োজন আছে। কিন্তু পারিভাষিক চর্ব্যজাতের জিনিস। দাঁত ওঠার পরে সেটা পথ্য। সেই কথা মনে রেখে যতদূর পারি পরিভাষা এড়িয়ে সহজ ভাষার দিকে মন দিয়েছি।' আরো বললেন, 'এই বইখানিতে একটি কথা লক্ষ্য করবে—এর নৌকোটা অর্থাৎ এর ভাষাটা যাতে সহজে চলে সে চেষ্টা এতে আছে, কিন্তু মাল খুব বেশি কমিয়ে দিয়ে একে হালকা করা কর্তব্য বোধ করি নি। দয়া করে বঞ্চিত করাকে দয়া বলে না। আমার মত এই যে যাদের মন কাঁচা তারা যতটা স্বভাবত পারে নেবে, না পারে আপনি ছেড়ে দিয়ে যাবে, তাই বলে পাতটাকে প্রায় ভোজ্যশূন্য করে দেওয়া সদ্ব্যবহার নয়।'

নিজের জীবনে সাহিত্য সাধনায় রবীন্দ্রনাথ জানতেন সমাজ ও সাহিত্যের যোগাযোগ সাহিত্য বিচারে অনেক বিপত্তির সৃষ্টি করে। ভাবি সমাজের বিজয় দুন্দুভি বাজানো, কি তার তালে তাল দিয়ে পা ফেলা যদি সকলের কর্তব্য হয়, তবে সেটা সামাজিক কর্তব্য, সাহিত্যিক নয়। 'যে বিজ্ঞানী রিলেটিভিটি কি কোয়ান্টাম নিয়ে দিনরাত মেতে আছে, সে কেন কৃষির ফলনে ত্রিগুণের চেষ্টা করে না এ দোষারোপ করিনে।"—তবু বিজ্ঞানের বই লেখায় বিচারে প্রশ্ন ওঠে, কাদের জন্য এ লেখা। রবীন্দ্রনাথ জানালেন, যারা এর সদ্ব্যবহার করবে, তারা যতটা স্বভাবত পারে নেবে। কোয়ান্টার লাফ বলতে তিনি উপমায় জানালেন উচ্চিংড়ের লাফ। এই উপমায় বিজ্ঞানের সত্য ধরা পড়ে না—যেমন ধরা পড়ে না হোয়াইট হেড-এর জানানো ক্যাঙারুর লাফ উপমায়। তবু সত্যের বিকৃতি এখানে নেই। যা আছে তা সত্যের আংশিক প্রকাশ। সহজ সুন্দর ভাষায় দুরূহ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে বুঝিয়ে বলার প্রচেষ্টা!

(7)

গণিত আর মুখের ভাষা দুটিই আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষা। একটি সন্ন্যাসীর মত উদাসীন, নিরাসক্ত নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে সম্বন্ধ-সম্পর্ক বিচার করে, মিল গরমিল চুকিয়ে বুকিয়ে পরীক্ষায় পাওয়া তথ্যের পটভূমিতে তত্ত্ব খোঁজে। আরেকটির সাহায্যে বিজ্ঞানীরা তাঁদের উপলব্ধিটির প্রকাশ খোঁজেন, নানা তথ্যের ভিড়ে হঠাৎ-পাওয়া আইডিয়াটির বর্ণনা করতে চান ; এবং চান গণিতের ভাষায় পাওয়া সম্বন্ধ-সম্পর্কের রূপ-রসে-বর্ণে সিঞ্চিত করে মানুষের মনের কাছে নিবেদন করতে। বিজ্ঞানের সাধনা হলো সম্পূর্ণতার সাধনা। সেখানে যেমন থাকে চরিতার্থতাবোধ, তেমনি থাকে বিস্তৃত হবার আকাঙ্ক্ষা। এই চাওয়া, এই আকাঙ্ক্ষা—এও যে শিল্পীর, কবির প্রার্থনা!

আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের গাণিতিক গঠনের দিকে তাকিয়ে একদিন ডিরাক বললেন, 'প্রকৃতি নিজে সুন্দর, তার নিয়মটিও সুন্দর। সেই সুন্দর নিয়মের ভাষাটিকেও যে সুন্দর হতে হবে।' —এই আপেক্ষিকতাবাদকে মুখর করে তোলার সময় জর্জ গেমো বললেন, 'সেই সুন্দর তত্ত্বের ব্যাখ্যার ভাষাটিকেও সুন্দর হতে হবে।' বিজ্ঞানের গঠন বর্ণনায় গেমো তোলেন গণিত ও মুখের ভাষায় ছন্দগান। সেই সঙ্গীতের সুরধুনী প্রবাহ রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় আনলেন—যেখানে সুরধুনীর সুরধ্বনি ধারায় অভিষিক্ত হয়ে প্রকাশ পায় বাক্ ও অর্থের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা পার্বতী পরমেশ্বরের অর্ধনারীশ্বর রূপ ; যার দুটি অর্থই মহিমাময় ও বিশেষ, সুন্দর ও আনন্দ স্বরূপ, আকর্ষণীয় এবং পরিপূর্ণ। সেই পরিপূর্ণতায় বিজ্ঞানের মুখে দেখা দেয় ধূর্জটির মুখে ভেসে আসা পার্বতীর হাসির আভা। সেই হাসিটির

দিকে তাকিয়ে নির্দেশ করে, বাইরের জগতের মানুষদের ডেকে বিজ্ঞানীরা বলবেন, 'দেখ দেখ, এরা কত আপনজন। এ তোমাদেরই আত্মীয়।' —বোধের পরিপূরকত্ব তত্ত্ব সৌন্দর্যের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে।—

মুখের ভাষায় বিজ্ঞানের সত্য প্রকাশে পঙ্গুত্ব থাকে। তবু সারা মুখ হাসিতে ভরে তুলে গর্জে গেয়ে বলবেন, 'তা হোক। মেলোর পাওয়া ভেনাসের মূর্তির হাত ভাঙা, সে তো পঙ্গু! তবু সে কি সুন্দর নয়!' বিজ্ঞান সাহিত্যের বিশেষত্ব এখানেই জানা যায়। এই বিজ্ঞানের লেখকের থাকবে স্বাদ গ্রহণের ক্ষমতা, উপভোগের আনন্দ সে ছড়িয়ে দেবে অন্যের কাছে। কারণ আনন্দ হলো রসানুভূতি—সে তো শুধু একার নয়। তাকে অনেকের সঙ্গে মিলিয়ে উপভোগ করতে হবে। এই বিলানো—মিলানোটি সুন্দরের স্পর্শ দিয়ে ভরা। —সুন্দর আর আনন্দ—এদুটি হলো বিজ্ঞান সাহিত্যের মূলকথা।

এই কথা কটি বিশ্বপরিচয় গ্রন্থের ভূমিকাতে রবীন্দ্রনাথ বললেন। "বিজ্ঞান থেকে যাঁরা চিত্তের খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে তাঁরা তপস্বী; মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ জনাঃ—আমি রস পাই মাত্র। সেটা গর্ব করবার মত কিছু নয়। কিন্তু মন খুশি হয়ে বলে—'যথালাভ'। এই বইখানি সেই যথালাভের ঝুলি, মাধুকরী বৃত্তি নিয়ে পাঁচদরজা থেকে সংগ্রহ।" —মাধুকরী বৃত্তিতে অমর্যাদা নেই, আছে সত্য, সুন্দর ও বিনয়ের একান্ত মানবিক সাধনা। বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ নিয়ে এলেন মন খুশকরা যথালাভ আর পাঁচদরজা থেকে সংগ্রহ করা মধু!

এবং আনলেন বিজ্ঞান পরিবাহী জন্মনস্ক অভিনিবিষ্ট ভাষা। যে ভাষার রবীন্দ্রনাথের পথ অনুসরণ করে পরশুরাম ও চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের একমেটে কাজ। যে ভাষা হলো অর্থবহ, সংবদ্ধ সংক্ষিপ্ত,—অথচ রূপসমৃদ্ধ ও বর্ণাঢ্য। যে ভাষায় থাকে গণিতের ছন্দ, মুখের ভাষার কাব্যগুণ। —বিষয় অনুসারে ভাষার কথা বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন; সেই কথাটির অনুরণন বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্যে বাজে, থাকে।

বিজ্ঞান সব কিছুকে স্পর্শ করতে চলেছে। তবু মানুষের কাছে বিজ্ঞানকে মনের আপনজন হয়ে ধরা দিতে হবে। সর্বগ্রাসী সর্বপ্রাবী বিজ্ঞানের প্রকাশ সাহিত্য গুণরহিত হলে, সে তো সম্পূর্ণ নয়। সে কুৎসিত। মুখের ভাষায় অনূদিত বিজ্ঞান অরুণের মত সূর্যসারথি হতে পারে: পারে না পক্ষীরাজ হতে, ইন্দ্রজয়ী—বিষ্ণুবাহন হতে। —তবু সে তো সূর্যোদয় জানাতে পারে; সে তো সুন্দর!

রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষা' প্রবন্ধে লিখলেন, 'পশ্চিমদেশে পোলিটিক্যাল স্বাতন্ত্র্যের যথার্থ বিকাশ হতে আরম্ভ হয়েছে কখন থেকে? যখন থেকে বিজ্ঞানের আলোচনা তাদের মনকে ভয়মুক্ত করেছে। যখন তারা জেনেছে সে নিয়মই সত্য—যে নিয়ম ব্যক্তি বিশেষের কল্পনার দ্বারা বিকৃত হয় না।' আর একজায়গায় বললেন, 'পশ্চিম মহাদেশ তার পোলিটিক্সের দ্বারা বৃহৎ পৃথিবীকে নিরন্ন করেছে। বিজ্ঞানের দিকেই তার আলোক জ্বলছে। সেইখানেই তার যথার্থ আত্মপ্রকাশ; কেননা বিজ্ঞান সত্য আর সত্যই অমরতা দান করে।'

সাধারণ মানুষের কাছে বিজ্ঞানকে জানানো সত্য ধর্ম—এটি রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন। বিজ্ঞানের স্বাদ তিনি নিলেন। এই স্বাদ গভীরতায় ভরে আনন্দ হয়ে দেখা দেয়। সেই আনন্দই বিজ্ঞান সাহিত্য। কারণ স্বাদ আর আনন্দ হলো সাহিত্য সৃষ্টির অভিপ্সা; আবার এরাই হলো জানার পথের পাথেয়—যা বিজ্ঞান। এরই ছোঁয়া পেয়ে ছিয়াত্তর বছর বয়সে তিনি বিশ্বপরিচয় গ্রন্থ লিখলেন। সেদিনই সারা পৃথিবীর বিজ্ঞান সাহিত্যের আসরে বাংলা ভাষা আসন পেতে বসে!

(৪)

নোবেল পুরস্কার পাবার পর মাদাম কুরী জনমানসের কৌতূহলের শিকার হন। তাঁর একান্ত নিভৃতে বারবার রিপোর্টার হানা দেয়। একদিন সমুদ্রের ধারে নিরালায় পদচারণার পর তিনি জুতো মোজা পোশাক থেকে ধুলো ঝাড়ছেন, পাথরের এক ঢিবির উপর বসা—এক এলোমেলো রিপোর্টার সেখানেও হানা দেয়। একথা সেকথা বলার পর তাঁকে ব্যক্তিগত প্রশ্ন করেন রিপোর্টারটি। মাদাম কুরী বলেন, 'আমরা নই, আমরা যা দিয়েছি তাই জানতে চেষ্টা করো।' —মাদাম কুরী বিজ্ঞানের ঝুলি ভরিয়ে দিলেন। সেই দান নিয়ে মানুষ বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে। তবু দান, ঐ সুন্দর দানটি তিনি করলেন, সেই দাতাকে জানার ইচ্ছা থাকে গ্রহীতার। দাতাকে বাদ দিয়ে দানটিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে সময় কাটানো কি যায়? —সূর্যের তাপ আলো বাদ দিয়ে সূর্যকে নিয়েও যে বিজ্ঞানীদের অনুসন্ধিৎসা! —বিজ্ঞান সাহিত্যের সীমারেখাটি কোথায় টানা হবে?

রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'অসীমের মধ্যে কোথা থেকে আরম্ভ হলো। অসীমের মধ্যে একান্ত আদি ও একান্ত অন্তের অবিশ্বাস্য তর্ক চুকে যায় যদি মেনে নিই, আমাদের শাস্ত্রে যা বলে, অর্থাৎ কল্পে কল্পান্তরে সৃষ্টি হচ্ছে আর বিলীন হচ্ছে, ঘুম আর ঘুম ভাঙার মত।' —শুরু আর শেষ নিয়ে মাথা ব্যথা নেই। যত কিছু ঝামেলা মাঝের টুকু নিয়ে। নইলে যে গল্প প্রাচ্যের মহাজ্ঞানী রাজাকে শুনিয়েছিল—মানুষের ইতিহাস, সে তো এক লাইনের গল্প। 'মানুষ এল, বাঁচল এবং মারা গেল।'—মানুষ বাঁচল বলেই তার অন্বেষণ। তার সমন্বয়ের ধারণা। গণিতের মত সব কিছুকে একাঙ্গী করে, একত্রিত করার সাধনা।

বিজ্ঞান সাহিত্য সেই সাধনার ফল। এখানে বিজ্ঞানের প্রমাণের উপায় পাওনা হলো সাহিত্যিক আনন্দ—মনের অনুভূতি ছাড়া তার অন্য প্রমাণ তো সম্ভব নয়।

সচেতসামনুভবঃ প্রমাণং তত্র কেবলম্।

বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যের বিকাশে গণ-মাধ্যমের ভূমিকা*

এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়**

আজকে আমরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উপর সর্বক্ষেত্রে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি এবং আগামী দিনে আরও বেশি পরিমাণে হব। অথচ বাংলায় আশানুরূপ ভাবে বিজ্ঞান সাহিত্য বিকশিত হচ্ছে না। বই কিছু প্রকাশিত হচ্ছে ঠিকই, তবে তা স্কুলের পাঠক্রমের দিকে নজর রেখে প্রস্তুত অথবা বড়ই অসার ও অনুবাদ ধর্মী। তেমন ভাল বিজ্ঞান-সাহিত্য যা লোকপ্রিয় অথচ খেলো নয়, যা পড়ে সাধারণ অবৈজ্ঞানিক মানুষ বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কে চিন্তা করতে উৎসাহিত হবেন। তাদের কৌতূহল চরিতার্থ করতে পারবেন। নতুন কিছু জানবেন এবং বুঝবেন অথচ সব মিলিয়ে সৎ সাহিত্য পাঠের পরিতৃপ্তিও পাবেন— তেমন বই সংখ্যায় খুবই কম। এরকম হওয়ার কারণটা কি এই নিয়ে অনুসন্ধান হওয়া খুবই জরুরী। আপনাদের আজকের এই আলোচনা সভায় যদি তদন্তের চেষ্টা হয় এবং তার ফলে কিছু তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয় তাহলে সম্ভবত উপরের দিকে একটা দিকনির্দেশ করা অসম্ভব হবে না।

বাংলায় সেরকম বিজ্ঞানের লেখা যে হচ্ছে না তার পিছনে অনেক ব্যাপার থাকতে পারে। কেউ লিখতে এগিয়ে আসছেন না বলেই কি লেখা হচ্ছে না? না লেখার লোক আছেন অথচ ছাপার লোক নেই বলে লেখকরা উৎসাহ পাচ্ছেন না? তৃতীয় সম্ভাব্য কারণ হতে পারে প্রকাশিত বইগুলি পাঠকের কাছে পৌঁছে দেবার কাজে ঘাট্‌তি। লিখতে গেলে লেখকেরা আবার নানা অসুবিধার মোকাবিলা করতে বাধ্য হন—যার মধ্যে ভাল বৈজ্ঞানিক কোষগ্রন্থ, অভিধান, পরিভাষা ইত্যাদি পড়ে— আপাতত আমি সেই প্রসঙ্গে যাচ্ছি না। সমস্যাটি খুব জটিল। এই নিয়ে প্রচুর আলোচনা, বিতর্ক সভা ইত্যাদি হওয়া দরকার। তবে সময়াভাবের কারণে আমি সমস্যাটিকে একটু অন্যভাবে এবং অবশ্যই আংশিকভাবে তুলে ধরতে চাই এবং আপনারা যদি অনুমতি দেন তাহলে এই কাজে আধুনিক বিপনন বিজ্ঞানের কিছু ফরমুলার সাহায্য নেব। বিপননের একটি স্বীকৃত মডেল হল AIDA—অর্থাৎ Awareness, Interest, Desire ও Action, সচেতনতা, আগ্রহ, ইচ্ছা ও পরিশেষে সেদিকে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ—অর্থাৎ কেনা। এই চারটি ধাপকে আলাদা আলাদা করে বিশ্লেষণ করা যায়। বিজ্ঞান-সাহিত্য সম্পর্কে পাঠকদের সচেতনতা কোন স্তরে আছে বা আদৌ আছে কিনা। এটা হল প্রথম ধাপ। তার পরে আসছে আগ্রহ—এটারও নানা ভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভব। তারপর এই বই কেনার ইচ্ছা। বই ও ভোগ্যপণ্য অবশ্য ঠিক এক বস্তু নয়। এই বইটা কিনলে আমার কতটা ভাল হবে, যেমন অমুক সাবানে এত বালতি কাপড় কাচা যাবে—ঠিক সেইভাবে হিসেব এক্ষেত্রে হবে না। তবে হবে না কথাটা বলা ঠিক হল না। কিছু কিছু বইয়ের হিসেব সেই ভাবেই হয়—যে কারণে আজকাল পরীক্ষায় ভাল করার জন্য লেখা বা কুইজভিত্তিক বইয়ের চাহিদা প্রচুর। তবে বিপনন ও বিজ্ঞাপনের কায়দা কৌশল আজকাল কিসে না ব্যবহার করা হচ্ছে। বইকেও সামগ্রী যা একজন উৎপন্ন করছেন একজন পরিবেশন করছেন ও একজন কিনছেন—এইভাবে বিচার করলে হয়ত আমরা বিজ্ঞান গ্রন্থগুলি কেন কাটছে না তার উত্তরের দিকে কিছুটা এগিয়ে যেতে পারি।

সচেতনতার প্রশ্নটিও আপাতদৃষ্টিতে জটিল। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে চাকরীর খাতিরেই আজ অগণিত শিক্ষিত মানুষ সংশ্লিষ্ট, পরোক্ষ সংযোগের ক্ষেত্র তো এত ব্যাপক যে তার আওতায় পড়েন না এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া কঠিন। তাহলে বিজ্ঞান বিষয়ে সচেতনতা যে আদপেই জন্মায় নি এমন যুক্তি কি করে দেওয়া যাবে? এখানে একটা কূট প্রশ্ন অবধারিত ভাবেই এসে পড়ছে—তা হল বিজ্ঞান সচেতনতা আর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গী বা বিজ্ঞান-মানসিকতা কি সমার্থক? বিজ্ঞানের ক্ষেত্র যত বাড়ছে ততই দেখা যাচ্ছে কুসংস্কারের অন্ধকার গ্রাস করছে— আপাতদৃষ্টিতে যাঁদের বুদ্ধিমান, শিক্ষাদীপ্ত ও রুচিশীল বলে মনে হয় তাঁদেরও। এটা সমাজবিজ্ঞানীদের পক্ষে গবেষণার বস্তু—আমরা শুধু এটুকু বলতে পারি যে এই কুসংস্কারের প্রাধান্যকে খর্ব করার জন্যও অন্তত ভাল বিজ্ঞান-সাহিত্যের আজ বিশেষ প্রয়োজন।

বাস্তব পরিস্থিতির দিকে দৃষ্টি ফেরালে দেখা যাবে বাংলা আজ হয়ে দাঁড়িয়েছে কবিতা ও উপন্যাসের ভাষা। প্রবন্ধ সাহিত্য কলেবরে অতি ক্ষীণ। প্রবন্ধ সাহিত্যের একটি ভগ্নাংশ আছে বিজ্ঞানের দখলে। এদের চেহারা বড়ই কৃশ; বৃহদাকার উপন্যাসগুলির চাপে এরা যে কোথায় ঢাকা পড়ে গেছে বৃহৎ পাঠকগোষ্ঠীর কাছে তার কোন খবর পৌঁছচ্ছে না। ক্বচিৎ কখনো একটি দুটি ভাল বিজ্ঞানের বই প্রকাশিত হলেও তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানাবার সংগঠিত প্রচেষ্টা নেই। কাজেই উৎসুক পাঠক তাদের নাগাল পাচ্ছেন না। প্রকাশকরা মনে করেন এই সব বইয়ের জন্য বিজ্ঞাপনে খরচ করা পোষায় না। অর্থাৎ সহজ বাংলায় এ বইয়ের ক্রেতা নেই। অবস্থাটা একটা দুষ্ট বৃত্তের মত। চাহিদা অনুযায়ী জোগান বলে একটা কথা আছে। চাহিদা—আপনারা সকলেই জানেন আজকাল অত্যন্ত পরিশীলিত বিপনন রীতি প্রয়োগ করে তৈরি করা হয়। মার্কেটিং সমর-নীতিতে বলা হয় কে বা কারা আপনার লক্ষ্য, অর্থাৎ টার্গেট।

* 9ই এপ্রিল '85 বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদে গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের চতুর্থ বার্ষিক স্মরণ উপলক্ষে আয়োজিত "বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্য" শীর্ষক আলোচনা সভায় পঠিত।

* 164/78, লেক গার্ডেন্‌স, কলিকাতা-700045

তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার উপর বিশদ সমীক্ষা না করে দ্রব্য বাজারে ছাড়া হয় না। বই অবশ্য অন্য ভোগ্যপণ্যের থেকে আলাদা। তাহলেও বিজ্ঞাপনের দ্বারা বাঙালী পাঠকের বই কেনার অভ্যাস কিভাবে প্রভাবিত হচ্ছে এটা আমরা চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি। বাঙালীরা শতকরা একশো জনই উপন্যাস পড়তে ভালবাসেন কথাটা সত্য বলে মেনে নেওয়া যায় না। কেউ হয়ত বলবেন বিজ্ঞান-সাহিত্য তেমন ভাল হলে মধুর লোভে মৌমাছির মত পাঠক এসে জুটত ঠিকই। সেটা সম্ভব ছিল জগদানন্দ বা রামেন্দ্রসুন্দরের যুগে যখন গণমাধ্যমের দৈত্যরা আমাদের জীবনযাপন প্রণালী ও চিন্তাধারায় এরকম বিপুলভাবে ছাপ ফেলতে সুরু করে নি। প্রভূত ক্ষমতাসম্পন্ন সংবাদপত্র গোষ্ঠীগুলি আজকে কার্যত বাংলা সাহিত্যের ভাগ্য-নিয়ন্তা—তাঁরাই ভাঙেন, তাঁরাই গড়েন সবই কাগজ বিক্রির খাতিরে। যদি লাভের চেয়ে সমাজকল্যাণ ও লোকশিক্ষা তাঁদের উদ্দেশ্য হত তাহলে হয়ত চিন্তা উদ্দীপ্তকারী, মননশীল বিজ্ঞান-সাহিত্যকে পার্বালিসিটি দেওয়া হত—মধ্যবিত্ত কূপমণ্ডূকদের খোড়-বড়ি-খাড়া জাতীয় ক্ষতিকর চর্চা—যার অপর নাম উপন্যাস—তার এই বিপুল প্রসার হত না।

উপন্যাস ও কবিতা ভাব প্রকাশের দুটি উপযুক্ত বাহন, কিন্তু কোন ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ কেবলমাত্র এই দুটি বিভাগের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়লে তাতে চিন্তার দৈন্য প্রকট হয়—নিখুঁত ভাব প্রকাশের ক্ষমতা কমে যায় এবং আবেগনির্ভর ঢোলো প্রকাশভঙ্গী গুরুত্ব পায়। ভাষা হয়ে পড়ে অক্ষম, দুর্বল, বিকলাঙ্গ। বাঙালী মাত্রেই নাকি কবিতা লিখে থাকেন এই নিয়ে আমাদের একটা গোপন অহংকার আছে। একবার বই মেলায় লিটল ম্যাগাজিনের স্টলে কয়েকটি তরুণ কবি তাদের কবিতা পত্রিকা কেনার জন্য খুব জেদ করতে থাকলে আমি তাদের প্রশ্ন করি—তোমরা কবিতা কেন লেখো? তারা বলে লেখা খুব সহজ, তাই। কথাটা বড় সাংঘাতিক। কবিতা লিখে প্রতিষ্ঠা পাওয়াও অপেক্ষাকৃত সহজ। খুব অল্প পরিশ্রমে নাম করার চেষ্টা—যুবকদের সামনে এটা খুব ভাল আদর্শ বলে আমার মনে হয় না। অথচ নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করে কেউ কবিতা পত্রিকা বার করছে শুনলে আমাদের হৃদয় দ্রবীভূত হয়।

বিজ্ঞান-সাহিত্যের স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ বিকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এই মানসিকতা। এই জাতীয় মূল্যবোধ যার সঙ্গে প্রশ্রয় আছে অপরিণত কবি ও গল্পকারদের প্রতি। কবিতার মধ্যে দিয়ে জীবনের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়ান সম্ভব যদি বলেন তাহলে বলব সত্যের মোকাবিলা করার আরও অনেক উপায় আছে—কবিতা তার একটি—একমাত্র কখনই নয়।

আসল কথা যে কোন সময় ও সমাজের প্রতিবিম্ব তার সাহিত্য। আজ পশ্চিমবঙ্গের শিল্পে যে দুর্দিন, যে সার্বিক অবক্ষয় দেখা দিয়েছে তারই প্রতিফলন এর একপেশে সাহিত্যে যা কেবল রস সৃষ্টিতেই নিয়োজিত কিন্তু স্বাস্থ্য ও পুষ্টি জোগাতে অসমর্থ। সত্যি বলতে কি বলিষ্ঠ বিজ্ঞান চেতনার অভাবে গল্প উপন্যাস কবিতাও অসুস্থ হয়ে পড়ছে। একটা প্রাণশক্তিতে উদ্দীপ্ত সমাজের সাহিত্য কোনমতেই কবিতা ও গল্পে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। সার্থক বিজ্ঞান-সাহিত্যের তখনই জন্ম হবে যখন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র হবে ঘনিষ্ঠ ও আন্তরিক। সমাজের সার্বিক অগ্রগতির সঙ্গে তার সংযোগ থাকতে বাধ্য।

"সত্য যুগে যুগে নূতন করে আত্মপরীক্ষা দেবার জন্য যুবকদের মল্লযুদ্ধে আহ্বান করেন। সেই সকল নবযুগের বীরদের কাছে সত্যের ছদ্মবেশধারী পুরাতন মিথ্যা পরাস্ত হয়। সবচেয়ে দুঃখের কথা এই যে আমাদের দেশের যুবকেরা এই আহ্বানকে অস্বীকার করেছে। সকল প্রকার প্রথাকেই চিরন্তন বলে কল্পনা করে কোন রকম শান্তিতে ও আরামে মনকে অলস করে রাখতে তাদের মধ্যে পীড়া বোধ হয় না. দেশের পক্ষে এইটাই সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয়।"

—রবীন্দ্রনাথ

বাংলাভাষায় বিজ্ঞানচর্চা

নারায়ণ চৌধুরী*

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমে বিজ্ঞানচর্চা করবার জন্য দেশবাসীর নিকট বারংবার আবেদন জানিয়ে গেছেন। তাঁর আবেদনের যৌক্তিকতা দেশবাসী ধীরে ধীরে উপলব্ধি করতে শুরু করেছেন এবং এই পথে কিছু-কিছু উল্লেখযোগ্য কাজেরও সূত্রপাত হয়েছে ইতোমধ্যে। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ এই ক্ষেত্রে যে-নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তা সর্বদা সাধুবাদের যোগ্য।

বাংলাভাষায় বিজ্ঞানচর্চা অথবা বিজ্ঞানের সত্যগুলিকে বাংলাভাষার সাহায্যে প্রচার করার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম উদ্যমী হয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তৎসম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার পৃষ্ঠায় তিনি জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে প্রবন্ধ প্রণয়ন করে প্রচার করেছিলেন। বঙ্কিমের নেতৃত্বে গঠিত 'বঙ্গদর্শন' লেখক গোষ্ঠীর আরও কেউ কেউও বিজ্ঞানচর্চায় বাংলাভাষার ব্যবহারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে এই ক্ষেত্রে আরও যেসব প্রথিতযশা লেখক অগ্রণী হন তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের বালককালের প্রথম গদ্যরচনা জ্যোতিষ বিষয়ক, এটি একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ সংঘটন। জ্যোতিষ অর্থে এখানে নভোমণ্ডল বিষয়ক বিদ্যা বুঝতে হবে, ফলিত জ্যোতিষ নয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরিণত জীবনের প্রান্তে এসে 'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থখানি লিখে তাঁর বিজ্ঞানে বাংলাভাষা ব্যবহারের বৃত্তটি পূর্ণ করেছিলেন। এছাড়া প্রথম, মধ্য ও অন্ত্য বয়সের বহু-বহু কবিতায় অন্তরীক্ষ বিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁর গভীর কৌতূহল ও আগ্রহের প্রমাণ ইতস্ততঃ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। জগদীশচন্দ্র ও রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞান সাধনায় ও বিজ্ঞানের প্রচারে বাংলাভাষার ব্যাপক ব্যবহারের কথা সুবিদিত। প্রফুল্লচন্দ্র ও মেঘনাদ সাহা তাঁদের বিজ্ঞান গবেষণার সুফল মূলতঃ ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে প্রচার করলেও উত্তরকালে তাঁরা দু-জনই এই উদ্দেশ্যে বাংলা রচনার দ্বারস্থ হয়েছিলেন। অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথের কথা আগেই বলেছি।

তাঁদের সম্মিলিত দৃষ্টান্তে উদ্বুদ্ধ হয়েই সম্ভবতঃ পরবর্তী সময়ে নীলরতন ধর, জগদানন্দ রায়, সুকুমার রায়, প্রিয়দারঞ্জন রায়, হরগোবিন্দ বিশ্বাস, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, তেজেশচন্দ্র সেন (শান্তিনিকেতন) প্রমুখ লেখকগণ বিজ্ঞানের প্রচারে বাংলাভাষার মাধ্যমকে ভাবপ্রকাশের বাহন হিসাবে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করেন। সাহিত্যস্রষ্টা ও সাহিত্যমনস্ক লেখকদের মধ্যে যে স্বল্পসংখ্যক অভিনন্দনযোগ্য ব্যক্তি এ পথে এগিয়ে আসেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন ও আছেন—পরিমল গোস্বামী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, সত্যেন্দ্রনাথ সেন, মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ, সমর্পণ রায়, অরূপরতন ভট্টাচার্য, সমরজিৎ কর, শ্রীমতী এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। ইদানীং কালে আরও একাধিক গোষ্ঠী ও ব্যক্তি বিজ্ঞানসাহিত্যের প্রচারে বিশেষ মনোযোগী হয়েছেন লক্ষ্য করা যায়। এঁদের ভিতর 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার পরিপোষিত লেখক সম্প্রদায়ের উল্লেখ অবশ্যই করতে হবে। এঁরা সব আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ ও গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের উত্তরসূরী, শ্রদ্ধেয় পূর্বসূরীদের প্রদর্শিত পথে আত্মপ্রত্যয়দীপ্ত বলিষ্ঠ পদক্ষেপে অগ্রসর হয়ে চলেছেন।

বাংলার বিজ্ঞানসাহিত্যের প্রচারে উপযুক্ত পরিভাষার অভাব প্রায়শঃ একটা যুক্তিস্বরূপ উত্থাপন করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু এটা নিষ্ক্রিয়তার পক্ষে সাফাই গাওয়ার প্রয়াস ভিন্ন আর কিছু নয়। এ একটা বাজে ওজর, যার উদ্ভব আলস্যের কুমন্ত্রণা থেকে। কাজ না করতে চাইলে বুদ্ধিমানের আবরণে চতুর লোক কত অজুহাতই যে খাড়া করতে পারে এ তার একটা মোক্ষম উদাহরণ।

বাংলায় ইতোমধ্যে প্রচুর সংখ্যক বৈজ্ঞানিক পরিভাষা তৈরি হয়েছে, আরও তৈরি হচ্ছে। সুতরাং ওটা কোন বাধাই নয়। আর তাছাড়া পরিভাষা ভাষার একটা ভগ্নাংশ মাত্র। পরিভাষাকে অছিলা হিসাবে দাঁড় করিয়ে হৈ-চৈ করার চেষ্টা অংশকে সমগ্রের মর্যাদা দেওয়ার অপপ্রয়াস মাত্র। বুদ্ধিমানেরা এ জাতীয় ভুল করেন না।

* ফ্ল্যাট E-4, সি-আই-টি বিল্ডিং, মদন চ্যাটার্জী লেন, কলিকাতা-700007

"...বিজ্ঞান যাহাতে দেশের সর্বসাধারণের নিকট সুগম হয় সে উপায় অবলম্বন করিতে হইলে একেবারে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার গোড়াপত্তন করিয়া দিতে হয়।...যাহারা বিজ্ঞানের মর্যাদা বোঝে না তাহারা বিজ্ঞানের জন্য টাকা দিবে, এমন অলৌকিক সম্ভাবনার পথ চাহিয়া বসিয়া থাকা নিষ্ফল। আপাততঃ মাতৃভাষার সাহায্যে সমস্ত বাংলাদেশকে বিজ্ঞানচর্চায় দীক্ষিত করা আবশ্যক। তাহা হইলেই বিজ্ঞান সভা সার্থক হইবে।"

—রবীন্দ্রনাথ

বিজ্ঞানসাহিত্য ও নবজাগরণ

জয়ন্ত বসু*

সাহিত্য বলতে আমরা সাধারণত বুঝি এমন সব গল্প, কবিতা, উপন্যাস, নাটক ইত্যাদি, যেগুলিতে মূলত রয়েছে 'রসস্য নিবেদনম্'। অর্থাৎ এক কথায় 'রসসাহিত্য'। কিন্তু সাহিত্যে নানান চিন্তা-ভাবনা, তত্ত্ব-তথ্য, যুক্তি তর্ক ইত্যাদিও পরিবেশিত হতে পারে। তবে পরিবেশন এমন সহজ, সাবলীল, স্বাভাবিক হতে হবে যে, সেগুলি যেন পাঠকের মনে অনুরণিত হতে থাকে। চুম্বক যেমন লোহার মধ্যে চুম্বকত্ব আবিষ্ট করে তাকে কাছে টানে, প্রকৃত সাহিত্য তেমনি পাঠকের মনে সহমর্মিতার সৃষ্টি করে তাকে আকৃষ্ট করতে থাকে।

বিজ্ঞানের সেই শাখাকে আমরা যথার্থ বিজ্ঞানসাহিত্য বলতে পারি, যার প্রধান উপজীব্য বিজ্ঞানের এক বা একাধিক বিষয়। সেই সাহিত্য নানান রূপে প্রকাশ পেতে পারে— প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, নাটক, এমনকি কবিতা বা ছড়ার রূপে তা থাকতে পারে কিন্তু তার সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে বিজ্ঞানের উপর। আমরা মাঝে মাঝে বিজ্ঞানের অলৌকিক কাহিনীর কথা শুনে থাকি। এ যেন সোনার পাথরবাটি। বিজ্ঞানের মধ্যে কোন অলৌকিকত্ব বা ম্যাজিক থাকতে পারে না। কোন ঘটনাকে অত্যাশ্চর্য মনে হলেও তার মধ্যে নিঃসন্দেহে প্রকৃতির নিয়মই কাজ করছে এবং কোন না কোন কার্য-কারণ সম্বন্ধ দিয়ে তাকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। বিজ্ঞানের কাজ হল সেই নিয়মকে খুঁজে বের করা, সেই কার্য-কারণ সম্বন্ধকে উদ্‌ঘাটন করা। বিজ্ঞানসাহিত্যের একটি প্রধান কাজ হল মানুষের জিজ্ঞাসু মনকে জাগিয়ে তোলা।

এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠতে পারে—বিজ্ঞানসাহিত্যে কি কল্পনার স্থান নেই? নিশ্চয়ই আছে কিন্তু সেই কল্পনা এমন হতে হবে যে, বাস্তব ঘটনার সঙ্গে, পরীক্ষালব্ধ তথ্যের সঙ্গে তার যেন কোন বিরোধ না থাকে। শুধু তাই নয়, আর্থার ক্লার্ক রচিত কয়েকটি কল্পকাহিনীর কল্পনার মতন তা এমন হওয়া বাঞ্ছনীয় যে, ভবিষ্যতে তার বাস্তবে রূপান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত প্রবল। বস্তুত এই ধরনের কল্পনা বিজ্ঞানবিধৌত মনের চেতন বা অবচেতন যুক্তির সৃষ্টিকর্ম।

বিজ্ঞানসাহিত্যের গুরুত্ব

বর্তমানে আমাদের দেশ যেন এক সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে। স্বাধীনতা-আন্দোলনের সমসাময়িক ধ্যান-ধারণা, মূল্যবোধ প্রভৃতি অনেকাংশে ক্ষয়ে গেছে অথচ কোন কার্যকর বিকল্পের উৎপত্তি হয় নি। ফলে মাঝে মাঝে মাথা চাড়া দিচ্ছে বর্ণবিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িকতা, আঞ্চলিকতা, বিচ্ছিন্নতাবাদী নানান শক্তি। ধনী-দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য বেড়ে চলেছে, বেড়ে চলেছে বেকারের সংখ্যা। সুবিধাবাদ ও সংকীর্ণ স্বার্থের মোহ জাঁকিয়ে বসেছে দেশ জুড়ে। এরপর হয় চরম দুঃসময়, নয়তো নবজাগরণের মধ্য দিয়ে আলোর উত্তীর্ণ হওয়া। জনসাধারণের মধ্যে যদি এই নবজাগরণ আসে, জনগণ যদি সত্যিকারের উদ্বুদ্ধ হয়, তবেই সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সম্ভব, সম্ভব স্বল্প সময়ের মধ্যে বিশ্বের দরবারে প্রথম সারিতে প্রতিষ্ঠিত হবার যোগ্যতা অর্জন।

আমাদের দেশে এই নবজাগরণে একটি মুখ্য ভূমিকা নিতে পারে বিজ্ঞানসাহিত্য। সে দিক থেকে এর গুরুত্ব অপরিসীম। দুঃখের বিষয়, এ সম্বন্ধে সচেতনতা আমাদের দেশে নেই বললেই চলে। এই বিষয়ে তাই একটু বিশদ ভাবে আলোচনা করা যেতে পারে।

'সাহিত্যের জন্য সাহিত্য কিনা'—এই নিয়ে নানান মতভেদ আছে। কিন্তু বিজ্ঞানসাহিত্যের ক্ষেত্রে যে একথা প্রযোজ্য নয়, তা নিঃসংশয়ে বলা চলে। বিজ্ঞানসাহিত্যকে সার্থক হতে হলে অবশ্যই উদ্দেশ্যমুখী হতে হবে। উদ্দেশ্যগুলি হল :—

1. বিজ্ঞানের মূল তত্ত্ব ও তথ্যগুলিকে যথাসম্ভব সহজ ও সরস করে জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে হবে, যাতে বিজ্ঞান সম্পর্কে তাদের ভয়-ভীতি কেটে যায়, বিজ্ঞানের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে। (যাঁরা নিরক্ষর, তাঁরাও শুনে শুনে কালক্রমে বিষয়গুলি জেনে যাবেন। অবশ্য নিরক্ষরতা দূরীকরণের আন্দোলনও পাশাপাশি চালাতে হবে। তবে সে অন্য প্রসঙ্গ।)

2. বিজ্ঞানের যেসব প্রয়োগ জনসাধারণের পক্ষে কল্যাণকর, সেগুলি তাদের পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে।

3. বিজ্ঞানের নানান অপব্যবহার এবং প্রযুক্তিবিদ্যার অশুভ দিকগুলি সম্বন্ধে সকলকে সচেতন ও সতর্ক করতে হবে।

4. জনসাধারণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর উন্মেষ ঘটাতে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গী থাকলে মানুষ সমস্ত বাস্তব ঘটনাকে স্বীকার করে নেয়। পুরনো ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাস যদি ভেঙে যায়, তাহলেও সে বাস্তব সত্যকে এবং নবলব্ধ জ্ঞানকে অস্বীকার করে না, বরং সেই জ্ঞানের ভিত্তিতে তার জীবনদর্শন নতুন করে গড়ে তোলে। প্রতিটি ঘটনাকে সে নৈর্ব্যক্তিক ভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে এবং তার ভিত্তিতে পরবর্তী কর্মপন্থা স্থির করে থাকে। এই দৃষ্টিভঙ্গী মনের জড়তা কাটিয়ে দেয়, কাটিয়ে দেয় ভাগ্যের উপর নির্ভরতার মানসিকতা।

5. বিজ্ঞানের যে অজস্র সম্ভার, তা যাতে সমাজের সামগ্রিক কল্যাণে ব্যবহৃত হয়, সভ্যতা ও সংস্কৃতির সত্যিকারের অগ্রগতিতে সহায়ক হয়, সেজন্য উপযুক্ত মানসিকতা তৈরি করতে হবে।

---

* সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা

বিজ্ঞানসাহিত্যে এখনো পর্যন্ত এদিকটি অত্যন্ত অবহেলিত। মনে রাখতে হবে, বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতিতে বিজ্ঞানের সঙ্গে মানবিকতার সংশ্লেষণ একটি অত্যন্ত জরুরী কাজ।

বিজ্ঞানসাহিত্য যদি উপরিউক্ত উদ্দেশ্যগুলি সাধন করতে পারে—অন্তত কিছুটা আংশিক ভাবেও, তাহলে আমাদের দেশ নিশ্চয়ই নতুন করে জেগে উঠবে। আমাদের সমাজে বিজ্ঞান তখন বহুলাংশে বিস্তৃততর হবে এবং তার প্রবেশ ঘটবে সমাজের অন্তঃস্তলে। আমাদের সমাজ-সত্তার উপর থেকে পুরণো যুগের ধোঁয়াশা ক্রমশঃ কেটে যেতে থাকবে, সেই সত্তা উদ্ভাসিত হবে নতুন যুগের আলোকচ্ছটায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বিজ্ঞানসাহিত্য ছাড়াও বিজ্ঞানবিষয়ক বক্তৃতা, আলোচনা-চক্র, প্রদর্শনী, আকাশবাণী ও দূরদর্শনে বিজ্ঞানের প্রচার প্রভৃতি নানান উপায়ে উপরিউক্ত উদ্দেশ্যগুলি আংশিক ভাবে সাধিত হতে পারে। বস্তুত আমাদের দেশে নবজাগরণের জন্য সার্বিক বিজ্ঞান আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা আছে। তবে এই পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞানসাহিত্যের দুটি বিশেষ উপযোগিতা রয়েছে—

1. বিজ্ঞানসাহিত্য লিপিবদ্ধ হওয়ায় পাঠক যে-কোন বিষয় বারবার পড়তে পারেন। ফলে বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করা তাঁর পক্ষে সহজসাধ্য হয়। বিজ্ঞানবিষয়ক বক্তৃতা ইত্যাদির ক্ষেত্রে শ্রোতা কেবল একবারই বিষয়টি শুনতে পান। (টেপ বা ক্যাসেটে বক্তৃতা ধরে রাখলে অবশ্য পরে বারবার তা শোনা যেতে পারে কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এটি খুব কার্যকর পন্থা নয়।)

2. পাঠক তাঁর অবসর সময়ে বা ইচ্ছা মতন যে কোন সময়ে বিজ্ঞানসাহিত্যের রচনা পড়তে পারেন কিন্তু বক্তৃতা ইত্যাদির ক্ষেত্রে শ্রোতার পক্ষে সময়ের এই স্বাধীনতা নেই; তিনি যদি শুনতে চান, তাঁকে নির্ধারিত সময়েই শুনতে হবে।

বাংলাভাষায় বিজ্ঞানসাহিত্য

বিজ্ঞানসাহিত্যের যে উদ্দেশ্যগুলির কথা উপরে বলা হল। সেগুলি, বলা বাহুল্য, সুষ্ঠু ভাবে সাধিত হতে পারে জনসাধারণের মাতৃভাষায় বিজ্ঞানসাহিত্যের মাধ্যমে। বাঙালীর পক্ষে প্রাসঙ্গিক হল বাংলাভাষায় রচিত বিজ্ঞানসাহিত্য। কেউ কেউ অবশ্য ইংরেজি বিজ্ঞানসাহিত্যের প্রচারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন; তাঁরা মনে করেন, এতে পাঠকরা বেশি উপকৃত হবেন এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের কাছে বিজ্ঞানকে পরিচিত করানোর এইটাই সহজতম উপায়। কিন্তু এই পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিরা ভুলে যান যে, ইংরেজি ভাষায় বিজ্ঞানের প্রচার হলে তা আমাদের দেশের একেবারে উপর-তলায় মানুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে, অধিকাংশ মানুষের কাছে তা পৌঁছবে না। অথবা তাঁরা হয়তো তাঁদের শ্রেণীস্বার্থ অক্ষুন্ন রাখবার জন্যেই ইংরেজিতে বিজ্ঞান প্রচারের পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন। তাঁদের মনোগত ইচ্ছা হয়তো এই যে, সামান্য কিছু লোক বিজ্ঞানের ছড়ি ঘোরাক আর বেশির ভাগ মানুষ সেই ছড়ির মার খাক মুখ বুজে।

ভারতবর্ষ একটি বিরাট দেশ এবং এর বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মাতৃভাষা বিভিন্ন। যে অঞ্চলে যে মাতৃভাষা, সেখানে সেই ভাষায় বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রচার হলে, সার্থক বিজ্ঞানসাহিত্য রচিত হলে তবেই কেবল জনসাধারণ প্রকৃত ভাবে উপকৃত হবে, সমাজে নবজাগরণের উন্মেষ ঘটবে।

এদেশে আধুনিক বিজ্ঞানের প্রচারের যাঁরা গোড়াপত্তন করেছিলেন, সেই ইয়োরোপীয় মিশনারীরা বাহন হিসেবে মাতৃভাষার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যের প্রস্তুতিপর্বে তাঁরাই ছিলেন পুরোধা। সেটা এখন থেকে একশো ষাট-সত্তর বছর আগেকার কথা। কালক্রমে এদেশীয় বহু মনীষীও বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাম হল: রামমোহন রায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, জগদানন্দ রায়, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রমুখ। এঁদের মধ্যে কয়েকজন খ্যাতনামা বিজ্ঞানী, কয়েকজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক, কয়েকজন খ্যাতনামা সমাজ সংস্কারক।

বহু বাংলা পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞানবিষয়ক রচনা প্রকাশিত হয়েছে ও হচ্ছে। কেবলমাত্র বিজ্ঞানবিষয়ক প্রথম পত্রিকা 'প্রকৃতি', যা 1924 খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয়ে 14 বছর জীবিত ছিল। পরবর্তী কালে কিছু কিছু বিজ্ঞান-পত্রিকা বেরিয়েছে, কিন্তু সেগুলি ছিল স্বল্পায়ু। সেদিক থেকে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' একটি নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত—1948 খৃস্টাব্দ থেকে দীর্ঘ 37 বছর ধরে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। আনন্দের বিষয়, সাম্প্রতিককালে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিজ্ঞানের বেশ কয়েকটি পত্রিকা বের করা হচ্ছে।

বাংলাভাষায় বিজ্ঞানের বই সর্বপ্রথম রচনা করেছিলেন ইয়োরোপীয় মিশনারীরা। বিজ্ঞানসাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে, এমন বহু বই কালক্রমে প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্বভারতী ও বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ থেকে জনপ্রিয় বিজ্ঞানের গ্রন্থমালা একসময়ে বের করা হয়েছিল। সম্প্রতি বেশ কয়েকজন প্রকাশকের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ দেখা যাচ্ছে বিজ্ঞানের বই ছাপবার ব্যাপারে।

সন্দেহ নেই, বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্য কালক্রমে পল্লবিত হয়েছে। তবে একথা স্বীকার করতে হবে যে, বর্তমানে বিজ্ঞান-সাহিত্যের নামে এমন কিছু কিছু রচনা প্রকাশিত হচ্ছে, যেগুলি থেকে বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্য সম্পর্কে ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "তথ্যের যাথার্থ্যে এবং সেটাকে প্রকাশ করার যাথাযথ্যে বিজ্ঞান অল্পমাত্রও স্খলন ক্ষমা করে না।" এই কথাগুলি বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। অন্যদিকে আবার এমন দুর্বোধ্য রচনাও মাঝে মাঝে প্রকাশলাভ করে, যেগুলি

কোনক্রমেই সাহিত্যপদবাচ্য নয়। কারণ অধিকাংশ পাঠকের মনের 'সহিত' বা সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে না, তাকে সাহিত্য আখ্যা দেওয়া যায় না। বিজ্ঞানলেখককে বিজ্ঞান ও সাহিত্য—দু'দিকেই নজর রাখতে হবে। সুখের কথা, বাংলা-ভাষায় সার্থক বিজ্ঞানলেখকের সংখ্যা নগণ্য নয়।

উপসংহার

ঐতিহাসিক কারণে বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। তথাকথিত উন্নত দেশগুলিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা অনেক আগে এসেছে এবং প্রবেশ করেছে সমাজের অন্দরমহলে। সেখানে বিজ্ঞানসাহিত্যের কাজ হল এদের পরিপূরক হওয়া। আমাদের দেশের মানুষের কাছে বিজ্ঞান ও তার প্রযুক্তি এখনো তেমন করে আপন হয়ে ওঠে নি। এখানে বিজ্ঞানসাহিত্যের কাজ হল সমাজের বৃহৎ প্রেক্ষাপটে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠায়, কল্যাণকর কাজে বিজ্ঞানের প্রয়োগে ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রসারে নেতৃত্ব দেওয়া। এই ভাবে যে জনজাগরণ দেখা দেবে, তাতে আমাদের অর্ধমৃত সমাজ সজীব, সতেজ, প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে।

বিজ্ঞান-সাহিত্য

সঙ্কর্ষণ রায়*

সম্প্রতি বিভিন্ন সভায় বিজ্ঞান-সাহিত্য নিয়ে আলোচনায় অংশ গ্রহণের সুযোগ আমি পেয়েছি। এই সব আলোচনা থেকে আমার মনে হয়েছে যে একদিকে যেমন গোঁড়া বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানকে সাহিত্যের উপজীব্য করে তুলতে কুণ্ঠিত, অন্যদিকে তেমনি "বিশুদ্ধ" সাহিত্যিকরা বিশুদ্ধ সাহিত্যের মধ্যে বিজ্ঞানকে স্থান দিতে নারাজ।

অথচ যাঁরা সত্যিকারের খাঁটি সাহিত্য স্রষ্টা, তাঁরা সাহিত্যের উদার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানকে বরণ করে নিয়েছেন বিনা দ্বিধায়। বাংলা গদ্য সাহিত্যের জনক বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস, সাহিত্য ও ধর্মমূলক রচনাবলীর পাশাপাশি বিজ্ঞান বিষয়ক সরস প্রবন্ধাবলীও রচনা করেছেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল তাঁর সমসাময়িক বিজ্ঞানের অগ্রগতির ওপরে আরও অনেক প্রবন্ধ লেখার। তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাবলীর যে সঙ্কলন-গ্রন্থ তিনি প্রকাশ করেছিলেন, তাঁর ভূমিকায় তিনি ভবিষ্যতে আরও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পুস্তকাকারে প্রকাশের বাসনা জ্ঞাপন করেছিলেন। তাঁর সেই বাসনা পূর্ণ না হলেও তাঁর বিজ্ঞান-প্রীতি তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যকর্মের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভাবে প্রকাশ পেয়েছে বার বার তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত।

বঙ্কিমচন্দ্রের চেয়েও বেশি বিজ্ঞান-সচেতন ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর প্রতিটি রচনা কবিতা ও গানের মধ্যে তাঁর বিজ্ঞান চেতনা ও ভাবনা প্রতিফলিত। তাঁর মতে বিজ্ঞান সচেতন না হলে সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব নয়, সাহিত্য রচনা বিজ্ঞানভিত্তিক হলেই সার্থক হয়। তিনি মনে করতেন যে অবৈজ্ঞানিক চিন্তা-ভাবনার সাহিত্যে কোন স্থান নেই। তিনি তাঁর ধর্মবিষয়ক অন্যতম প্রবন্ধে লিখেছিলেন যে 'জ্ঞান' ও 'বিজ্ঞানের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, বিজ্ঞান-বিচ্ছিন্ন জ্ঞান সোনার পাথরবাটির মতই অসম্ভব ব্যাপার। তিনি লিখেছিলেন:

'জ্ঞান যখন বিশ্বজগতে অখণ্ড নিয়মকে আবিষ্কার করে, যখন দেখে কার্যকারণের কোনও ছেদ নেই, তখনই সে মুক্তি-লাভ করে (সার্থক হয়)।

শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও কবির মত শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীরাও বিজ্ঞানকে সাহিত্যের উদারক্ষেত্রে নামিয়ে এনেছিলেন এবং বিজ্ঞান দিয়ে বাংলাভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। জগদীশচন্দ্র বসু দুরূহ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিয়ে সহজবোধ্য সরল প্রবন্ধ এবং রম্যরচনা লিখেছিলেন। বাংলা ভাষায় প্রথম বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প লেখার কৃতিত্ব তাঁরই।

বিজ্ঞানকে বাংলা ভাষার মাধ্যমে জনপ্রিয় করে তোলার ব্যাপারে জগদীশচন্দ্রের চেয়ে বেশি উৎসাহী ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু। ইংরেজী বাদ দিয়ে নির্ভেজাল বাংলাভাষায় তিনি বহু সুখপাঠ্য বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তিনিই এই "জ্ঞান ও বিজ্ঞান" পত্রিকায় প্রতিষ্ঠাতা।

গোঁড়া বিজ্ঞানী বা সাহিত্যিকরা যাই বলুন, বিজ্ঞান সম্পর্কে জনসাধারণের আগ্রহ বাড়ছে এবং বাংলাভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করে তোলার চেষ্টা বেড়েই চলেছে। "জ্ঞান ও বিজ্ঞান" ছাড়া আরও বিজ্ঞান-বিষয়ক পত্রিকা বেরিয়েছে। সাধারণ পত্র-পত্রিকাতেও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হচ্ছে নিয়মিত। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ছাড়া বিজ্ঞানভিত্তিক রম্যরচনা, গল্প এবং উপন্যাসও লেখা হচ্ছে। কল্প-বিজ্ঞানের গল্প ও উপন্যাস (ইংরেজীতে যাকে বলে Science Fiction) বিস্ময়কর জনপ্রিয়।

জনপ্রিয়তার টানে খাঁটি সাহিত্যিকরাও বিজ্ঞানের আসরে নেমেছেন। কিন্তু বিজ্ঞান ওঁদের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মধ্যে নেই, অতএব বিদেশী রচনাবলীকে অনুসরণ করেন তাঁরা। ফলে

* P-583, লবণহ্রদ পার্ক, কলিকাতা-700055

তাঁদের লেখা অধিকাংশ প্রবন্ধ, গল্প বা উপন্যাসের মধ্যে মৌলিকতা থাকে না।

প্রবন্ধাবলীর মধ্যে মৌলিকতা না থাকলেও ক্ষতি নেই, কারণ জ্ঞান ও বিজ্ঞান ভূগোলের সীমা মানে না, বিদেশ থেকে আহৃত তত্ত্ব ও তথ্য দেশী তথ্যাবলীর সঙ্গে অনায়াসে মিলে মিশে যেতে পারে। কিন্তু গল্প ও উপন্যাসে বিদেশী সাহিত্যের ছায়া স্বাস্থ্যকর নয়, কারণ বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্য গ্রহণযোগ্য হলেও, বিদেশী কাহিনীকে আমাদের দেশীয় পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া খুবই কঠিন ব্যাপার। আমার মতে বাংলায় বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প ও উপন্যাসকে সার্থক করে তুলতে হলে মৌলিক দেশীয় উপকরণের ভিত্তিতে লেখা উচিত। বৈজ্ঞানিক উপকরণ তো চারদিকেই ছড়িয়ে আছে, তাদের কুড়িয়ে নিয়ে মৌলিক বিজ্ঞান ভিত্তিক গল্প বা উপন্যাস রচনা বাংলার গল্প বা উপন্যাস লিখিয়েদের পক্ষে কঠিন নয়।

বিদেশী কল্প-বিজ্ঞান কাহিনী লেখকরা সম্প্রতি পারমাণবিক মহাযুদ্ধে মানুষের একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার কথা কল্পনা করতে শুরু করেছেন। এই জনমানবশূন্যে জগতে তাঁরা রোবোটদের ক্রিয়াকলাপের কথা লিখছেন। মানুষের সৃষ্ট রোবট মানুষ নিশ্চিহ্ন হওয়ার পর মানুষের জায়গা নিয়েছে। মানুষ নেই, পৃথিবীতে রাজত্ব করছে রোবট এ হেন কল্পনা বহু লেখকের গল্প ও উপন্যাসের মধ্যে ফুটে উঠেছে। বিস্ময়ে পাঠক-পাঠিকারা তা হয়তো উপভোগ করে, নয়তো এ হেন অমানবিক কল্পনাকে কোন লেখকই তাঁদের রচনার মধ্যে মূর্ত করে তুলতেন না। কিন্তু পাঠক-পাঠিকারা যতই উপভোগ করুন, এ হেন 'অমানবিক' রচনা কোন লেখকেরই লেখা উচিত নয়। কারণ মানুষের জন্যই বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের প্রয়োগ এমন কোন ক্ষেত্রেই হওয়া উচিত নয়। যা মানবতাবিরোধী। সবার ওপরে মানুষ সত্য, এই হচ্ছে সার সত্য, এই সত্যের বিরোধিতা করাটা মানবতাবিরোধী। আশা করি বিজ্ঞানকে যাঁরা জনপ্রিয় করতে চলেছেন, তাঁরা কখনোই মানুষকে বাদ দিয়ে চলবেন না।

বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করে তোলার ঝোঁকে বাংলাভাষায় তথ্যসমৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লেখা হচ্ছে না। এই প্রসঙ্গে আলোচনাক্রমে অধিকাংশ বাঙালী বিজ্ঞানী এই মত প্রকাশ করেছেন যে বিজ্ঞানকে পুরোপুরি বাংলাভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ তাঁদের মতে বাংলাভাষা বিজ্ঞানের সার্থক বাহন নয়।

বাঙালী বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত তাঁদের বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপ বা গবেষণার ফলাফলকে কখনোই বাংলাভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করার চেষ্টা করেন নি। তাঁদের সমীক্ষা বা গবেষণামূলক প্রবন্ধাবলী ইংরেজিতেই লেখা হয়েছে। কোন বিজ্ঞান-গবেষকই তাঁদের ডক্টরেটের থীসিস বাংলায় লেখেন নি বা লেখার কথা চিন্তা করেন নি। শামুকের খোলের মত তাঁরা ইংরেজি ভাষাকে তাঁদের গবেষণার সঙ্গে যুক্ত করে নিয়েছেন। বাংলাভাষার মাধ্যমে তাঁদের বৈজ্ঞানিক সমীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা সম্ভব কি না তা কখনো যাচাই করে দেখেন নি তাঁরা।

আমার মতে বাংলাভাষাকে সুযোগ দিলে তা বিজ্ঞানের সার্থক বাহন হয়ে উঠতে পারে। বাংলাভাষা নিয়ে যাঁরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন তাঁরা বাংলাভাষার অপরিমেয় সম্ভাবনার কথা বলেছেন, বাংলাভাষার ভাণ্ডারে "বিবিধ রতনের" সন্ধান পেয়েছেন। তাঁরা বলেন যে বাংলা পৃথিবীর কোন ভাষার চেয়ে হীন নয়। চীন বা জাপানী ভাষার তুলনায় বাংলার শ্রেষ্ঠতা ভাষাতত্ত্ববিদদের দ্বারা স্বীকৃত। চীন বা জাপানী ভাষায় যদি বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপ ও গবেষণার ফলাফলকে প্রকাশ করা যায় য়ুরোপীয় কোন ভাষার সাহায্য না নিয়ে বাংলাভাষাতেও তা সম্ভব। অতএব, আমার অনুরোধ, বিজ্ঞানীরা ইংরেজি ছেড়ে বাংলাভাষাকে তাঁদের গবেষণার বাহন করে তুলুন।

"যে জাতি মনে করে বসে আছে যে অতীতের ভাণ্ডারের মধ্যেই তার সকল ঐশ্বর্য, সেই ঐশ্বর্যকে অর্জন করবার জন্য তার স্বকীয় উদ্ভাবনার কোন অপেক্ষা নেই, তা পূর্বযুগের ঋষিদের দ্বারা আবিষ্কৃত হয়ে চিরকালের মত সংস্কৃত ভাষায় পুঁথির শ্লোকে সঞ্চিত হয়ে আছে, সে জাতির বুদ্ধির অবনতি হয়েছে, শক্তির অধঃপতন হয়েছে। নইলে এমন বিশ্বাসের মধ্যে শুদ্ধ হয়ে বসে কখনই সে আরাম পেত না। কারণ, বুদ্ধি ও শক্তির ধর্মই এই যে, সে আপনার উদ্যমকে বাধার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে যা অজ্ঞাত, যা অলব্ধ, তার অভিমুখে নিয়ত চলতে চায়, বহুমূল্য পাথর দিয়ে তৈরী কবরস্থানের প্রতি তার অনুরাগ নেই। যে জাতি অতীতের মধ্যেই তার গৌরব স্থির করেছে, ইতিহাসে তার বিজয়যাত্রা শুদ্ধ হয়ে গেছে, সে জাতি শিল্পে, সাহিত্যে বিজ্ঞানে কর্মে শক্তিহীন ও নিষ্ফল হয়ে গেছে।"

—রবীন্দ্রনাথ

বাংলায় বিজ্ঞানসাহিত্যের ধারা*

সূর্যেন্দুবিকাশ করমহাপাত্র**

বাংলা ভাষায় যে বিজ্ঞান চর্চা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি তা সাহিত্যের মাপকাঠিতে কতটা উত্তীর্ণ তা নিয়ে ভাবনার অবকাশ আছে। স্কুল-কলেজের পাঠ্যবই আর সাহিত্য—এ দুয়ের নিশ্চয়ই পার্থক্য আছে। তবু কবিতা, উপন্যাস, গল্প প্রভৃতি সাহিত্যের যেমন এক ধরনের উপকরণ, প্রবন্ধসাহিত্যও তাই, তবে তা ক্ষেত্রবিশেষে কিছুটা গুরুগম্ভীর হবে সন্দেহ নাই। বিজ্ঞান সাহিত্য ঠিক তাই। কেউ যদি মনে করেন হাল্কা গল্প উপন্যাসের মত বিজ্ঞানও বাংলা ভাষায় সরস হবে না কেন? তা হবে না, কারণ বিজ্ঞান তথ্যনির্ভর—তার নিজস্ব ভাষা থাকে। যেহেতু আধুনিক বিজ্ঞানের উৎস ভিন্ন দেশে, তাই তার নিজস্ব ভাষাও কিছুটা বিদেশী। তাই আমাদের পরিভাষার আশ্রয় নিতে হয়। অবশ্য ছোটদের জন্য লেখা বিজ্ঞানসাহিত্য কিছুটা সাবলীল হতে পারে। বিদ্যাসাগরের রচনায় এরকম কিছু বিজ্ঞান প্রবন্ধের নিদর্শন পাওয়া যাবে। পরবর্তীকালে সাহিত্যিক যাঁরা বাংলায় বিজ্ঞান লিখেছেন তার সাহিত্যসম্পদ অবশ্যই মূল্যবান। তবে রামেন্দ্রসুন্দর ও জগদীশচন্দ্রই বিজ্ঞানকে খাঁটি সাহিত্য পর্যায়ে উন্নীত করেছেন।

বিজ্ঞান যে সাহিত্যনিরপেক্ষ নয় রবীন্দ্রসাহিত্যে তার যথেষ্ট উদাহরণ আছে। বিজ্ঞানসাহিত্য ও সাধারণ সাহিত্য পৃথক হলেও রবীন্দ্রনাথের লেখা কবিতা, প্রবন্ধ প্রভৃতিতে এখানে ওখানে বিজ্ঞানের প্রসঙ্গ ছড়িয়ে আছে। যেমন জটিল সালোক-সংশ্লেষ (photosynthesis)-এর মত বৈজ্ঞানিক ক্রিয়া রবীন্দ্রনাথের বৃক্ষবন্দনা কবিতায় যে প্রচ্ছন্ন আছে তা সহজে ধরা পড়ে—

> সূর্যের বক্ষে জ্বলে বহ্নিরূপে
> সৃষ্টিযজ্ঞে যেই হোম তোমার সত্তায় চুপে চুপে
> ধরে তাই শ্যাম স্নিগ্ধরূপ। ওগো সূর্যরশ্মিপায়ী
> শত শত শতাব্দীর দিনধেনু দুহিয়া সদাই
> যে তেজে ভরিলে মজ্জা মানবেরে তাই করি দান
> করেছ জগৎজয়ী,—

এ সত্ত্বেও আমাদের মনে রাখতে হবে যে বিজ্ঞান কাব্যের প্রধান উপজীব্য নয়—রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে তাই বিজ্ঞানের প্রাধান্য কোথাও নাই—থাকলে কবিপ্রতিভা ক্ষুণ্ণ হত। তবু যে সব বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী কবিতার কাব্যধর্ম অক্ষুণ্ণ রেখেও রবীন্দ্রনাথের লেখায় স্থান পেয়েছে—তা থেকে রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান মনীষার পরিচয় পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথের যে সুপ্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী কাব্য ও সাহিত্যের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল, তা পরে প্রবল উচ্ছ্বাসে বহির্মুখী হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান প্রতিভা কাব্য বা সাহিত্যের গণ্ডীতে বাধাপ্রাপ্ত হয় নি। বরং বিজ্ঞান অপূর্ব এক সাহিত্যে উন্নীত হয়েছে—রবীন্দ্রনাথের লেখা বিশ্বপরিচয়ে। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসুকে এই বইটি উৎসর্গ করতে গিয়ে কবি বলেছেন "শিক্ষা যারা আরম্ভ করেছে, গোড়া থেকেই বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে না হোক, বিজ্ঞানের আঙিনায় তাদের প্রবেশ করা অত্যাবশ্যক। এই জায়গায় বিজ্ঞানের সেই প্রথম পরিচয় ঘটিয়ে দেবার কাজে সাহিত্যের সহায়তা স্বীকার করলে তাতে অগৌরব নেই। সেই দায়িত্ব নিয়েই আমি একাজ সুরু করেছি।" কবির এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায় সাধারণ মানুষের কাছে সাহিত্যের ভাষায় বিজ্ঞানের চিন্তাধারাকে পৌঁছে দেওয়াই ছিল এই বই লেখার প্রধান উদ্দেশ্য। একাধারে লেখক সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক না হলে এই উদ্দেশ্য সাধন করা যায় না। আর সর্বতোমুখী প্রতিভা না থাকলে কোন সাহিত্যিক বিজ্ঞানী হতে পারেন না। বরং কোন বিজ্ঞানী মাঝারি সাহিত্যিক হয়েও বিজ্ঞানসাহিত্য লিখতে পারেন। এদেশে ওদেশে আজকাল বিজ্ঞানসাহিত্যের অভাব নেই, প্রধানত সেগুলি বিজ্ঞানী সাহিত্যিকের লেখা। কিন্তু সাহিত্যিক বিজ্ঞানীর বিশ্বপরিচয় কবি রবীন্দ্রনাথকে রীতিমত বিজ্ঞানীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এর পেছনেও কবির প্রচুর সাধনা ছিল, কবি বলেছেন "কিন্তু ক্রমাগত পড়তে পড়তে মনের মধ্যে বৈজ্ঞানিক একটা মেজাজ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল···অথচ কবিত্বের এলাকায় কল্পনার মহলে বিশেষ যে লোকসান ঘটিয়েছে সে তো অনুভব করিনে।" আমরাও করি না। বৃক্ষবন্দনা বা রবীন্দ্রনাথের অন্য কোনও লেখায় যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রচ্ছন্ন রয়েছে, তা লেখার সাহিত্য মাধুর্য নষ্ট তো করেই নি, বরং তাকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেছে। এদিকে আবার বিশ্বপরিচয় গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্য প্রতিভা দিয়ে জড়লোকের জটিল তত্ত্বকে শুধু সাধারণের বোধ্য নয়, শ্রীমণ্ডিত করেছেন।

পরমাণুলোক, নক্ষত্রলোক, সৌরজগৎ, গ্রহলোক, ভূলোক এই কয়টি প্রবন্ধ নিয়ে বিশ্বপরিচয়। তদানীন্তন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের তথ্যগুলি রবীন্দ্রনাথ যে কী নিষ্ঠার সঙ্গে আয়ত্ত করেছিলেন তা এই প্রবন্ধগুলি পাঠ করলেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। কোন জটিল তত্ত্বকে অন্তরের সঙ্গে গভীরভাবে উপলব্ধি না করলে তা এত সুন্দরভাবে প্রকাশ করা যায় না। বিজ্ঞানকে উপলব্ধি করা বিজ্ঞানীর পক্ষেই সম্ভব—কিন্তু কবি রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এই উপলব্ধি ছিল সহজ। বাংলাভাষা পরিচয়ের ভূমিকায় কবি লিখেছেন "বিজ্ঞানের রাজ্যে স্থায়ী বাসিন্দাদের মত সঞ্চয় জমা হয় নি ভাণ্ডারে, রাস্তায় বাউলদের মত খুশী হয়ে ফিরেছি,

* ৯ই এপ্রিল '85 বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদে গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের চতুর্থ বার্ষিক স্মরণ উপলক্ষে আয়োজিত "বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্য" শীর্ষক আলোচনাসভায় সভাপতির ভাষণ।

** সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-700009

খবরের ঝুলিটাতে দিন-ভিক্ষা যা জুটেছে তার সঙ্গে দিয়েছি আমার খুশীর ভাষা মিলিয়ে" বিশ্বপরিচয় সম্বন্ধে পাঠকের প্রতি এই বক্তব্য থেকে কবির সহজ বিজ্ঞান মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রোত্তর যুগে বাংলার বিজ্ঞানসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের বিপুল প্রভাব রয়েছে। বিশ্বভারতীর লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার ভূমিকায় কবি লিখেছেন "শিক্ষণীয় বিষয়মাত্রই বাংলাদেশের সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত করে দেওয়া এই অধ্যবসায়ের উদ্দেশ্য। বুদ্ধিকে মোহমুক্ত ও সতর্ক করবার জন্য প্রধান প্রয়োজন বিজ্ঞান চর্চার।"

এই প্রয়োজনের ও অধ্যবসায়ের সার্থক রূপ দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। সমালোচনার দৃষ্টিতে মনে হবে, বিশ্ব পরিচয়-এর ভাষা ও ভাব সম্পদই বুঝি সর্বস্ব—তাত্ত্বিক দিকটা যেন গৌণ। রবীন্দ্রপূর্ব বা পরবর্তী যুগের বাংলার বিজ্ঞান সাহিত্য থেকে তুলনামূলক দৃষ্টিতে এরকম অনুমান করা সম্ভব। কিন্তু সেখানে বক্তব্য হল কোন তত্ত্বের ব্যাখ্যা বা প্রকাশ বহুভাবেই সম্ভব। কিশোরদের জন্য লেখা কোন বৈজ্ঞানিক সাহিত্য বয়স্কদের জন্য লেখা বই থেকে কম জটিল হওয়াই উচিত। সাধারণের কাছে বিজ্ঞানের প্রথম পরিচয় হিসেবে বিশ্ব পরিচয়ের অর্থ-সম্পদ যথেষ্ট মূল্যবান—তা যে কোন বৈজ্ঞানিকই বুঝতে পারবেন। তবে ভাবসম্পদ হয়ত অতিরিক্ত লাভটুকু ঘটেছে কারণ রবীন্দ্রনাথ সেখানে লেখক।

ভবিষ্যৎ বাংলার বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানের তত্ত্বকে প্রকাশ করতে গিয়ে যে পূর্বসূরীদের কথা স্মরণ করবেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের অন্যতম হয়েও এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন।

রবীন্দ্রপরবর্তী যুগে বাংলায় বিজ্ঞানসাহিত্য এখন বহুধা বিস্তৃত। তবু রবীন্দ্রনাথ যে উদ্দেশ্য নিয়ে বিশ্বপরিচয় লিখেছিলেন, সেই উদ্দেশ্য এখনও সফল হয় নি। বিজ্ঞান সাহিত্যের নামে তথ্যসমৃদ্ধ ছাত্রপাঠ্য রচনাই বেশী। বিশেষ লেখকের নাম উল্লেখ না করেও কিছু কিছু লেখা যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে তা নিশ্চিতই বলা যায়।

এ যুগের লেখকের ভেতর যাঁর স্মরণে আজকের এই সভা সেই গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। আমাদের তরুণ বয়সে গোপালচন্দ্রের বিজ্ঞান রচনা পড়ে আমরা বাংলায় বিজ্ঞান লেখার প্রেরণা পেয়েছিলাম। নিজের বিজ্ঞান গবেষণা সাবলীল ভাষায় তিনি সাধারণের বোধগম্য করতে সক্ষম ছিলেন। তাছাড়া অন্যান্য বিজ্ঞান প্রসঙ্গেও তাঁর অবাধ বিচরণ ছিল। দীর্ঘদিন 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র সম্পাদনায় তিনি বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান লেখকের একটি গোষ্ঠী তৈরি করেছেন—অজস্র বিজ্ঞান রচনায় তিনি বাংলার বিজ্ঞানসাহিত্য সমৃদ্ধ করেছেন। এ যুগের বিজ্ঞানসাহিত্যিকদের কাছে গোপালচন্দ্র স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

রামেন্দ্রসুন্দর, জগদীশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, গোপালচন্দ্র এঁদের রচনা বাংলায় বিজ্ঞানসাহিত্যের পথে মাইলস্টোনের মত। গত পঞ্চাশের দশকে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' ছিল একমাত্র বিজ্ঞান পত্রিকা। এই পত্রিকার সাহায্যে কিছু বিজ্ঞানসাহিত্যিকের সৃষ্টি হয়েছে। এর কিশোর বিজ্ঞানীর আসর সীমিত পরিসরে ছোটদের কাছে বিজ্ঞান পরিবেশন করে থাকে। অধুনা অনেক বিজ্ঞান পত্রিকাই শুধু ছোটদের জন্য প্রকাশিত হচ্ছে। কিশোর জ্ঞান ও বিজ্ঞান এদের মধ্যে বিশেষত্বের দাবী রাখে। আনন্দবাজার পত্রিকাগোষ্ঠী বার্ষিক সংখ্যা হিসেবে দু-একটি বিজ্ঞান সাহিত্য সংকলনও প্রকাশ করেছেন। এসব প্রচেষ্টা এ কারণেই পর্যাপ্ত নয় যে, বর্তমান দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রসার যে হারে ঘটেছে, তাতে সাধারণ মানুষের কাছে তথ্যসমৃদ্ধ বিজ্ঞান সাহিত্যের আকারে আরও বেশী পরিমাণে পৌঁছে দেওয়া প্রয়োজন। সাধারণ মানুষ বিজ্ঞানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে পারলে প্রযুক্তিগত সরকারী পরিকল্পনায় মতামত প্রকাশের অধিকার অর্জন করতে পারবে। গণতন্ত্রের সর্বোত্তম উৎকর্ষ মনে হয় এই সম্ভাবনার মধ্যে নিহিত আছে। বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সাংবাদিক বর্তমান প্রয়াত সন্তোষকুমার ঘোষ মহাশয় একটি সভায় আমার এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত হয়ে বলেছিলেন শুধু সাহিত্য নয় সাংবাদিকতায়ও বিজ্ঞানকে নির্ভুল ভাবে ও প্রচুর পরিমাণে সাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়া নিশ্চিতই প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন কী বাংলা সাহিত্যে কী সাংবাদিকতায় আজও প্রায় অবহেলিত।

বাংলাভাষায় বিজ্ঞান চর্চার মৌলিক নীতি এখনও দ্বিধাগ্রস্ত রয়েছে। এই দ্বিধা তখনই অপসৃত হবে যখন বিজ্ঞান মাতৃভাষায় সাধারণের বোধগম্য হয়ে উঠবে। পশ্চিমবাংলার কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাভাষায় রচিত পি.-এইচ.-ডি. থিসিস গ্রহণ করার নীতি গ্রহণ করেছেন—তবু তা অনেকটা কাগজে কলমেই রয়েছে। এখনও কেউ কেউ মনে করেন বাংলায় বিজ্ঞান শিক্ষা পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তরে রয়েছে। সার্বিক আগ্রহ ও প্রচেষ্টা না থাকলে এই স্তর থেকে উত্তরণ সম্ভব নয়। আগামী দিনে শুধু বিজ্ঞানী নন বিজ্ঞান মনস্ক লেখকদের রচনায় বাংলার বিজ্ঞান সাহিত্য মহত্তর উৎকর্ষে সমৃদ্ধ হতে পারে।

সত্যি বলতে কি বাংলায় বিজ্ঞান প্রচারের আদি লেখকেরা কেউই বিজ্ঞানী ছিলেন না। এমনকি রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে সম্প্রতি জানা গেছে 1874 খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর সংখ্যায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে তিনি 'গ্রহগণ জীবের আবাস ভূমি' শীর্ষক একটি বিজ্ঞান প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। রচনাটি অস্বাক্ষরিত ছিল—তাই কারো নজরে পড়েনি।

এছাড়া বাংলায় এখন তো কল্পবিজ্ঞান রচনায় বেশ উৎসাহ দেখা যাচ্ছে—যার অধিকাংশ লেখকই বিজ্ঞানী নন। বিদেশী সাহিত্যেও নামী কল্পবিজ্ঞানী লেখকেরা অধিকাংশই বিজ্ঞানী নন, কেউ কেউ বিজ্ঞানী হলেও নামী বিজ্ঞানী বলা যায় না। এই সব কল্পবিজ্ঞান রচনায় বিজ্ঞান মূল্য অস্বীকার্য নয়। একটি

উদাহরণ থেকে বোঝা যাবে জুলভার্ণ তাঁর Mysterious Island বইতে Hydrogen জ্বালানীর ব্যবহারের কথা বলেছিলেন। এই শতকেই হয়ত জ্বালানী তেলের পরিবর্তে Hydrogen-ই আমাদের প্রয়োজনীয় জ্বালানীর কাজ করবে। ক্লার্ক তাঁর কল্পবিজ্ঞান রচনায় যে ভূসমলয় কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে সংবাদ আদান প্রদানের কথা বলেছিলেন তা এখনই কার্যকরী হয়েছে।

অবশ্য কাল্পনিক কল্পবিজ্ঞানের নামে অনেক রচনা আছে যার বিজ্ঞানমূল্য নেই বললেই চলে। বাংলায় কল্পবিজ্ঞান লিখতে গিয়ে সেই বিজ্ঞান মনস্কতার প্রয়োজন যা বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য সাধন করবে। বিশেষত কিশোরদের জন্য লেখা এমন হওয়া প্রয়োজন যা কাল্পনিক রূপকথা পর্যায়ে না পড়ে—কারণ কিশোরমনই ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানমনস্ক সমাজের ভিত্তিভূমি বিবেচিত হওয়া উচিত।

উপসংহারে বলা প্রয়োজন যে বাংলায় বর্তমান বিজ্ঞান সাহিত্য আশাব্যঞ্জক। হতাশ হওয়ার কোন কারণ নাই। এই সাহিত্যের ধারা বিপথগামী নয়—তবে তার প্রবাহটিকে বেগবান করার প্রয়োজন আছে।

"মানুষের বুদ্ধিসাধনার ভাষা আপন পূর্ণতা দেখিয়েছে দর্শনে, বিজ্ঞানে, হৃদয়বৃত্তির চূড়ান্ত প্রকাশ কাব্যে, দুইয়ের ভাষায় অনেক তফাৎ, জ্ঞানের ভাষা যতদূর সম্ভব পরিষ্কার হওয়া চাই ; তাতে ঠিক কথাটার ঠিক মানে থাকা দরকার, সাজসজ্জার বাহুল্যে সে যেন আচ্ছন্ন না হয়। কিন্তু ভাবের ভাষা কিছু যদি অস্পষ্ট থাকে, যদি সোজা করে না বলা হয়, যদি তাতে অলংকার থাকে উপযুক্তমত তাতেই কাজ দেয় বেশি, জ্ঞানের ভাষার চাই স্পষ্ট অর্থ ; ভাবের ভাষায় চাই ইশারা, হয়তো অর্থ—বাঁকা করে দিয়ে।

ভালো লাগা বোঝাতে কবি বললেন 'পাষাণ মিলায়ে যায় গায়ের বাতাসে ; বললেন 'ঢলঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি অবনি বহিয়া যায়।' এখানে কথাগুলোর ঠিক মানে নিলে পাগলামি হয়ে দাঁড়াবে, কথাগুলো যদি বিজ্ঞানের বইয়ে থাকত তা হলে বুঝতুম, বিজ্ঞানী নতুন আবিষ্কার করেছেন এমন একটি দৈহিক হাওয়া যার রাসায়নিক ক্রিয়ায় পাথর কঠিন থাকতে পারে না, গ্যাস রূপে হয় অদৃশ্য। কিংবা কোন মানুষের শরীরে এমন একটি রশ্মি পাওয়া গেছে যার নাম দেওয়া হয়েছে লাবণি, পৃথিবীর টানে যার বিকিরণ মাটির উপর দিয়ে ছড়িয়ে যেতে থাকে। শব্দের অর্থকে একান্ত বিশ্বাস করলে এই রকম একটা ব্যাখ্যা ছাড়া উপায় থাকে না। কিন্তু এ যে প্রাকৃত ঘটনার কথা নয়, এ যে মনে হয় যেন'র কথা, শব্দ তৈরী হয়েছে ঠিকটা কি জানাবার জন্যে ; সেই জন্যে ঠিক যেন কি বলতে গেলে তার অর্থকে বাড়াতে হয়; বাঁকাতে হয়। ঠিক যেন-কী-র ভাষা অভিধানে বেঁধে দেওয়া নাই, তাই সাধারণ ভাষা দিয়েই কবিকে কৌশলে কাজ চালাতে হয়। তাকেই বলা যায় কবিত্ব। বস্তুত কবিত্ব এত বড়ো জায়গা পেয়েছে তার প্রধান কারণ, ভাষার শব্দ কেবল আপন সাদা অর্থ দিয়ে সব ভাব প্রকাশ করতে পারে না। তাই কবি লাবণ্য শব্দের যথার্থ সংজ্ঞা ত্যাগ করে বানিয়ে বললেন, যেন লাবণ্য একটা ঝর্ণা, শরীর থেকে ঝরে পড়ে মাটিতে। কথার অর্থটাকে সম্পূর্ণ নষ্ট করে দিয়ে এ হল ব্যাকুলতা ; এতে বলার সঙ্গে সঙ্গেই বলা হচ্ছে বলতে পারছি নে। এই অনির্বচনীয়তার সুযোগ নিয়ে নানা কবি নানা রকম অত্যুক্তির চেষ্টা করে। সুযোগ নয়তো কী ; যাকে বলা যায় না তাকে বলবার সুযোগই কবির সৌভাগ্য। এই সুযোগেই কেউ লাবণ্যকে ফুলের গন্ধের সঙ্গে তুলনা করতে পারে ; কেউবা নিঃশব্দ বীণা ধ্বনির সঙ্গে, অসঙ্গতিকে আরও বহু দূরে টেনে নিয়ে গিয়ে, লাবণ্যকে কবি যে লাবণি বলেছেন সেও একটা অধীরতা, প্রচলিত শব্দকে অপ্রচলিতের চেহারা দিয়ে ভাষার আভিধানিক সীমানাকে অনির্দিষ্ট ভাবে বাড়িয়ে দেওয়া হল।"

—রবীন্দ্রনাথ

বিজ্ঞান-বিপ্লব ও বিজ্ঞান-লেখক

আবদুল্লাহ আল-মুতী*

বাংলাদেশের একজন ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি একবার ঘোষণা করেছিলেন : বিপ্লব আমাদের দরজায় ভেতর এক পা বাড়িয়ে দিয়েছে, ঘরে ঢুকে পড়ল বলে!—তিনি কোন্ বিপ্লবের কথা ভেবেছিলেন, তার আবির্ভাবের সম্ভাবনায় তাঁর মনে উল্লাস বা আতঙ্কজাতীয় কোন ভাব দেখা দিয়েছিল কিনা তা আমাদের জানা নেই।

তবে আমাদের জানামতে একটি বিপ্লব সারা পৃথিবীতে তোলপাড় সৃষ্টি করলেও বাংলাদেশে পৌছবার জন্য আজো পথ খুঁজে মরছে; সে হল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিপ্লব। সহজেই বোঝা যায় আঠার শতকের ইংলণ্ডে বুর্জোয়া বিপ্লবের সাথী হয়ে যে শিল্প-বিপ্লব দেখা দিয়েছিল তারই অনুসরণে এই নামটি। শিল্প-বিপ্লবের ফলে সেদিনের ইংলণ্ডে উৎপাদন পদ্ধতির বিপুল বিকাশ ঘটেছিল। 1783 খৃস্টাব্দে জেম্‌স্ ওয়াট-এর স্টীম ইঞ্জিন আবিষ্কারকে সচরাচর এই বিপ্লবের প্রতিভূ হিসেবে ধরা হয়। ক্রমে ক্রমে আঠার আর উনিশ শতক জুড়ে সে বিপ্লব ছড়িয়ে পড়েছিল ইউরোপ আর উত্তর আমেরিকায়। আজ বিশ শতকে দেখা দিয়েছে এমনি আরেক বিপ্লব—তাকেই বলা হচ্ছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লব।

বিপ্লবের চরিত্র

ষোল আর সতের শতকের ইউরোপে নতুন নতুন জিজ্ঞাসা আর আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে মানুষের বিশ্বদৃষ্টিতে ব্যাপক রূপান্তর ঘটেছিল। আইজাক নিউটন ছিলেন এই বিজ্ঞান-বিপ্লবে সর্বশ্রেষ্ঠ; আজো তাঁকে ধরা হয়ে থাকে সর্বকালের সেরা বিজ্ঞানী হিসেবে। তেমনি বিশ শতকের প্রথম ভাগে নানা মৌলিক আবিষ্কারের ফলে বিজ্ঞানে ঘটেছে আরেক বিপ্লব। পরমাণুর অন্তর্লোকের গঠন, বস্তু আর শক্তির অভিন্ন সত্তা, আপেক্ষিকতার তত্ত্ব, আলোকের দ্বৈত রূপ—ইত্যাকার নানা আবিষ্কার মানুষের জ্ঞানলোকে যে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করে আইনস্টাইনকে তার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতীকরূপে ধরা হয়ে থাকে।

আঠার-উনিশ শতকের শিল্প-বিপ্লব আর আজকের দিনের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লবের মধ্যে একটা বিষয়ে বেশ সাদৃশ্য দেখা যাবে। উভয় ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানের তত্ত্বের আবিষ্কার রূপান্তরিত হয়েছে উৎপাদন বিকাশের অগ্রগতিতে। এই অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে প্রধানত বিজ্ঞানের সাথে প্রযুক্তির মেলবন্ধনের ফলে। আর সেই মেলবন্ধন থেকে উদ্ভব ঘটেছে বিজ্ঞানের গবেষণার জন্য আরো নতুন, আরো শক্তিশালী নানা উপকরণ।

শিল্প-বিপ্লব থেকে আমরা শুধু যে স্টীম ইঞ্জিন পেয়েছি তা নয়, সাধারণ ভাবে উদ্ভব ঘটেছে শিল্পে যান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি; কয়লা, তেল প্রভৃতি শক্তির নতুন উৎস, শক্তিচালিত যাতায়াত ব্যবস্থা; অসংখ্য নতুন নতুন রাসায়নিক দ্রব্য। যান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি সৃষ্টি করেছে পণ্যসামগ্রীর বিপুল প্রাচুর্য, উন্নত যাতায়াত ব্যবস্থা সহজ করেছে বিনিময় আর যোগাযোগ, জ্বালানি ও যন্ত্রের শক্তি লাঘব ঘটিয়েছে দুঃসহ কায়িক শ্রমের—মানুষের জীবনে এনেছে স্বাচ্ছন্দ্য।

তবু সে শিল্প-বিপ্লব কাজে লাগিয়েছিল মূলতঃ বস্তুর বাইরের এলাকার শক্তিকে। বস্তুর গভীরে নিহিত যে শক্তি তাকে কাজে লাগাবার জন্য মানুষকে অপেক্ষা করতে হয়েছে বিশ শতকের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির জন্য। আজকের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লব নির্ভরশীল বস্তুর অন্তরতম লোকের রহস্যের ওপর, পরমাণুকেন্দ্রের সূক্ষ্ম কণিকার বিনাশ থেকে লভ্য শক্তি। অর্ধপরিবাহী বস্তুতে ইলেকট্রন-কণিকা স্থানান্তরের নিয়ম কাজে লাগিয়ে তৈরী কম্পিউটার, প্রাণিকোষের গভীর কন্দরে লুকানো জিন কণার পরিবর্তনের মাধ্যমে নতুন নতুন গুণাগুণ-সম্পন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীর উদ্ভাবন—বিজ্ঞানের এ ধরনের অসংখ্য কীর্তির ফলাফল আজ প্রসারিত হচ্ছে সাধারণ মানুষের জীবনেও।

এসব বৈশিষ্ট্যের একটা মোট ফল এই যে, শিল্প-বিপ্লব মানুষের জীবনে যে বিপুল রূপান্তরের সম্ভাবনা নিয়ে দেখা দিয়েছিল, আজকের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লব তার চেয়েও বড় রকম উত্তরণের সম্ভাবনা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। এই উত্তরণ শুধু ইতিমধ্যে মানুষের অধিকারের এলাকা গভীর সাগরতল থেকে মহাকাশের সুদূর প্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত করে নি, সবার জন্য এক প্রাচুর্য ও আনন্দময় পৃথিবী সৃষ্টির যে স্বপ্ন মানুষ দেখেছে চিরকাল, তাকেও আজ অবশেষে এর মাধ্যমে বাস্তবে পরিণত করা সম্ভব।

জাতীয় বিকাশে বিজ্ঞান

এখানে একটি প্রশ্ন স্বভাবতঃই সকলের মনে দেখা দেবে। বাংলাদেশের মতো একটি পিছিয়ে পড়া উন্নয়নশীল দেশে এই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লবের তাৎপর্য কি? যে দেশে অধিকাংশ অধিবাসী এখনো সামন্তযুগীয় পরিবেশে বাস করে, শিল্প-বিপ্লবের ফলে সৃষ্ট স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকাংশ উপকরণ যাদের জীবনে আজো লভ্য নয়, অনাহার-অস্বাস্থ্য-অশিক্ষা যাদের নিত্যসঙ্গী —তাদের কাছে বিশ শতকের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির মূল্য কি?

এ প্রশ্নের জবাব দু-ভাগে দেওয়া যেতে পারে। একথা সত্যি যে, ইউরোপের বুর্জোয়া সমাজ তাদের দেশে উৎপাদন বিকাশের স্বার্থে পৃথিবীর দিকে দিকে উপনিবেশ স্থাপনে মনোনিবেশ করেছিল। এসব উপনিবেশকে তারা দেখেছিল প্রধানতঃ তাদের কলকারখানার জন্য কাঁচামালের যোগানদার হিসেবে এবং উৎপন্ন সামগ্রীর ক্রেতা হিসেবে। এই প্রক্রিয়ায়

---

* 4, কাহ্‌কাশান, বেইলী রোড, ঢাকা-2, বাংলাদেশ

উচ্চ মুনাফাই ছিল তাদের লক্ষ্য। সে লক্ষ্যে উপনিবেশে উন্নত শিল্প স্থাপন তাদের স্বার্থের অনুকূল ছিল না, তাই তা তারা হতে দেয় নি। অবশ্য শিল্প-বিপ্লবের কিছু ফলাফল—যেমন রেল-স্টীমার, টেলিযোগাযোগ ইত্যাদি—উপনিবেশে স্থাপন করতে হয়েছে ঔপনিবেশিক শাসনেরই প্রয়োজনে এবং এভাবে উপনিবেশগুলি শিল্প-বিপ্লবের আওতার বাইরে থাকতে পারে নি। এসেছে ভেতরে, তবে এ আসা অনেকটা যেন উনুনের ভেতর জ্বালানি আনার মতো—যে জ্বালানির প্রধান ভূমিকা হল নিজে জ্বলে পুড়ে উনুনে তাপ সঞ্চার করা।

এই অসম সম্পর্কের একটা অনিবার্য ফল হয়েছে এই যে, উপনিবেশ আর তার পোষক এই দুইয়ের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্যের পাল্লা ক্রমেই এক পাশে ভারি হয়ে উঠেছে। ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লব ঘটবার আগে সে দেশ আর ভারত উপমহাদেশের মধ্যে জীবনযাত্রার মানে এমন কিছু প্রভেদ ছিল না। বিশ শতকের শুরুতে অর্থাৎ বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লবের আগে প্রভেদের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল প্রায় আট গুণ। অথচ আজ বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বিলেতের সাথে মাথাপিছু আয়ের পার্থক্য প্রায় আশি গুণ। বলা বাহুল্য এই প্রভেদ ঘটেছে প্রধানতঃ বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির অগ্রগতি এবং উৎপাদন শক্তি বিকাশের তারতম্যেরই কারণে।

কথাটা একটু ঘুরিয়ে বললে বলা যায়, এই প্রভেদ যদি দূর করতে হয়, অন্ততঃ যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়ে আনতে হয়, তাহলে তাও করতে হবে মূলতঃ বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির শক্তিকে কাজে লাগিয়ে। আজকের বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি বিপ্লবে অংশীদার না হয়ে বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশ জনগণের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য ও সমৃদ্ধি আনবে এবং আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলবে একথা কল্পনা করা যায় না। আমরা এই বিপ্লবে অংশীদার হতে চাই বা না চাই উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলি আমাদের তাতে অংশীদার করবেই আর সে ভূমিকা হবে ওই উনুনে জ্বালানির ভূমিকার মতো।

বিশ শতকের প্রথমার্ধকে ধরা যেতে পারে বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লবের প্রসূতিকাল হিসেবে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে ঘটেছে মূলতঃ এই বিপ্লবের বিকাশ। মনে রাখতে হবে এই বিকাশকালেই এদেশে বড় ধরনের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনেরও সূত্রপাত হয়েছে। উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে লড়াই, মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠা, গণতন্ত্রের সংগ্রাম, জাতীয়তাবোধের বিকাশ, মুক্তিযুদ্ধ ইত্যাকার নানা ঘাত-প্রতিঘাত বয়ে গিয়েছে এদেশের ওপর দিয়ে। কিন্তু এসবের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লবে অংশগ্রহণ বা তার ফলাফল কাজে লাগাবার বিষয়টি কি কখনো প্রাধান্য পেয়েছে? পেয়েছে বলতে পারলে আমরা সুখী হতাম। কিন্তু স্বীকার করতেই হবে, অন্ততঃ সচেতনভাবে কখনো পায় নি।

তবে কি পেয়েছে অচেতনভাবে?—তা খুব সম্ভব পেয়েছে। আমরা ভাষা আন্দোলনের সময় বলেছি মাতৃভাষার মাধ্যমে এদেশের মানুষের সর্বাঙ্গীন বিকাশের কথা, স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আশ্বাস দিয়েছি স্বাধীন দেশে প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধিময় নতুন জীবনের—দেশের সব মানুষের জন্য জুটবে অন্ন, বস্ত্র, স্বাস্থ্য, শান্তি ও আনন্দ। এর কোনটাই লভ্য হবার উপায় নেই বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির প্রয়োগ ছাড়া। কাজেই প্রচ্ছন্নভাবে আমরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কথা ভেবেছি নিশ্চয়ই।

কিন্তু দুনিয়াজোড়া বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিপ্লব আজকের পৃথিবীকে যে পর্যায়ে নিয়ে এসেছে তাতে এক্ষেত্রে এমন প্রচ্ছন্ন চিন্তার কোন স্থান নেই। ভাষা আন্দোলন বা স্বাধীনতা যুদ্ধের সেই উত্তাল দিনগুলোতে এদেশের মানুষের কাছে আমরা যে অঙ্গীকার করেছিলাম তা রক্ষা হতে পারে শুধু বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিকে আমাদের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও ব্যক্তিজীবনে মূল ভূমিকায় বসানোর মধ্য দিয়ে।

বলাই বাহুল্য বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিকে মূল ভূমিকায় বসানো মানে বেদীতে স্থাপন করে পূজো করা নয়, তাদের লাগাতে হবে মানুষের কাজে। মুনাফালোভী পুঁজিতন্ত্র যেমন বিজ্ঞানের বিপুল শক্তিকে কাজে লাগিয়ে মানববিধ্বংসী ধ্বংসযজ্ঞের আয়োজন করছে অথবা বাতিল হয়ে যাওয়া কলকব্জা বা বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য উন্নয়নশীল দেশগুলোতে পাঠিয়ে চারপাশের পরিবেশকে দূষিত করে তুলছে তা-ও নিশ্চয়ই আমাদের লক্ষ্য হবে না। বরং আমরা এ ধরনের মানবতাবিরোধী উদ্যোগকে প্রতিহত করে বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিকে প্রয়োগ করব এ দেশের সব মানুষের জীবন আর পরিবেশকে সমৃদ্ধ, সুন্দর ও আনন্দময় করে তোলার জন্য। শিল্পবিপ্লব আর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লবের অংশীদার না হতে পারার ফলে উন্নত দেশগুলোর সঙ্গে আমাদের জীবনমানের পার্থক্য আজ ক্রমেই বেড়ে উঠছে; আমাদের লক্ষ্য হবে এই প্রক্রিয়াকে ঘুরিয়ে দেওয়া। দেশের সব মানুষের জন্য যথেষ্ট খাদ্য, বস্ত্র, স্বাস্থ্য সুবিধে, যাতায়াত ব্যবস্থা আর আনন্দের উপকরণ যোগানো। তাতে ক্রমে ক্রমে আমাদের জীবনমান উন্নত করে অন্ততঃ উন্নত দেশের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া।

বিজ্ঞান-লেখকদের ভূমিকাকে দেখতে হবে এই পরিপ্রেক্ষিতেই।

বিজ্ঞান-লেখকের ভূমিকা

বিজ্ঞান-লেখকরা সত্যি কি কিছু করতে পারেন এ অবস্থার পরিবর্তনের জন্য? তাঁদের শক্তি কতটুকুই বা। আসলে কি সমগ্র ব্যাপারটি রাষ্ট্রীয় নীতির আওতায় পড়ে না?

পড়ে—একথা কেউ অস্বীকার করবেন না। কিন্তু রাষ্ট্রীয় নীতি অস্পষ্ট রয়েছে বলে কোন দেশে লেখকরা কলম বন্ধ রেখেছেন এমন কথা কখনো শোনা যায় নি। বরং সকল কালে বিজ্ঞানীরা তাঁদের লব্ধ জ্ঞানকে অকৃপণ হাতে মানুষের

মধ্যে প্রসারিত করেছেন। গূঢ় তত্ত্বের উপাসক ঐন্দ্রজালিক আর মধ্যযুগীয় যাজক শ্রেণীর সাথে বিজ্ঞানীদের এখানেই একটা বড় রকম প্রভেদ।

আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে গ্রীক সভ্যতার স্বর্ণযুগের অনেক আগে লিপির আবিষ্কার হলেও তখন পর্যন্ত কাগজের আবিষ্কার হয় নি। লেখা দুঃসাধ্য ছিল বলেই সে কালে কথোপকথনের মাধ্যমে জ্ঞানচর্চারই ছিল প্রাধান্য। কিন্তু তবু অ্যারিস্টটলের (384-322 খ্রীঃ পূঃ) প্রকৃতিবিষয়ক বহু রচনা দীর্ঘকাল সমগ্র মানবসভ্যতার ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে। এমনি বহু শতাব্দী ধরে ব্যাপকভাবে পঠিত হয়েছে দ্বিতীয় শতকের গ্রীক জ্যোতির্বিদ টলেমীর রচনা। এঁদের দুজনেরই অনেক মতামত পরবর্তীকালে ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। তবে অনুগামীদের অজ্ঞতার জন্য এঁদের দায়ী করা সঙ্গত কিনা তা বলা শক্ত।

মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগেও দেখি ইবন সীনা (980-1037), আলবেরুণী (973-1051) প্রমুখ চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, ভূবিদ্যা প্রভৃতি নানা বিষয়ে অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। ইবন সীনা এক-শ'র বেশি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন—তার কোন কোনটি পাঁচ, দশ বা বিশ খণ্ডে সমাপ্ত। পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত তাঁর আল-কানুন ফিত তিব (চিকিৎসা-বিধি) প্রায় সাত-শ বছর ধরে ইউরোপের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠ্য-পুস্তক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আলোক-তত্ত্বের জনক বলে পরিচিত সমসাময়িক পদার্থবিদ ইবনুল হাইসাম (965 1039) যেসব বই লেখেন তা ষোড়শ শতকে ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়ে দা-ভিঞ্চি, কেপলার, নিউটন প্রমুখ বিজ্ঞানীদের গবেষণায় ছাপ ফেলে বলে জানা যায়।

অতীতের বিজ্ঞানীদের এসব লেখালেখি যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশে ঘটেছে তাও নয়। অনেক ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানীদের বক্তব্য প্রচলিত সামাজিক ধ্যান-ধারণার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। খৃস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে অ্যানাক্সাগোরাসের মতামত মনঃপূত হয় নি বলে এথেন্সের নগরপতিরা তাঁর বিচারের ব্যবস্থা করেছিলেন; সুহৃদ পেরিক্লসের চেষ্টায় অল্পের জন্য তাঁর জীবন রক্ষা পায়। দশম শতকের শুরুতে বাগদাদে একদল সত্যসন্ধানী বিজ্ঞানীকে জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের তত্ত্ব প্রচারের জন্য 'ইখওয়ানুস্ সাফা' (পবিত্রতা ও আন্তরিকতার সংঘ) নামে গোপন সংঘ প্রতিষ্ঠা করতে হয়। জোয়ার-ভাটা, ভূমিকম্প, জলবায়ু ও পরিবেশের পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয়ে তাঁরা বহু গ্রন্থ প্রকাশ করেন; এ ধরনের অনেক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বই সে সময়ে প্রকাশ্যে প্রচার করা নিরাপদ ছিল না। খলিফার রোষবহ্নি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ইবনুল হাইসামকে মস্তিষ্কবিকৃতির ভান করতে হয়েছে, ইবন সীনাকে আত্মগোপন করতে হয়েছে বারবার।

আধুনিক কালেও বিজ্ঞানীর সাহসী কণ্ঠস্বর শুনি আমরা কোপার্নিকাস, গ্যালিলিওর কণ্ঠে। গ্যালিলিও তাঁর বক্তব্য শুধু পণ্ডিতী ভাষা ল্যাটিনে প্রকাশ করেন নি, জনগণের কাছে নিয়ে গিয়েছেন তাঁদের বোধ্য ইতালীয় ভাষায়। নির্যাতনের মুখে নতজানু হয়েও বৃদ্ধ বিজ্ঞানীকে উচ্চারণ করতে শুনি, "তবু যে পৃথিবী ঘুরছে"। ধর্মযাজকদের প্রবল বিরোধিতার মুখে ডারউইনকে দেখি লিখে চলেছেন ক্রমাগত। সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন তাঁর ক্রমবিকাশের তত্ত্ব। বিপুল বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও সে তত্ত্ব পৃথিবীর বুকে জীবনের বিকাশ সম্পর্কে জ্ঞানের বহু অন্ধকার গুহাকে ক্রমান্বয়ে আলোকিত করে তুলেছে।

আরো আধুনিক কালে দেখি অ্যালবার্ট আইনস্টাইন ব্যাখ্যা করছেন আপেক্ষিকতার তত্ত্ব, মানুষকে সচেতন করে তুলছেন পরমাণু-যুদ্ধের বিপদ সম্পর্কে; লিখে চলেছেন জেমস জীনস, বারট্রাণ্ড রাসেল, জর্জ গ্যামো, জে বি এস হলডেন, জে ডি বার্নাল, কার্লফন ক্রিল, পি. এম. এস. ব্ল্যাকেট, আর্থার সি ক্লার্ক, ফ্রেড হয়েল, আইজাক আজিমভ, কার্ল সাগান—এমনি অসংখ্য বিজ্ঞানী। তাঁদের কেউ ব্যাখ্যা করেছেন বিজ্ঞানের তত্ত্ব, কেউ সেসব তত্ত্বের সামাজিক গুরুত্ব, আবার কেউ মানুষকে সচেতন করছেন বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগের বিপদ সম্পর্কে।

কোনটা আগে?

এসব বিজ্ঞানীরা স্পষ্টতঃই নানা মেজাজের লেখা লিখছেন। কেউ লিখেছেন গবেষণাধর্মী রচনা; গবেষণাকর্মের বিবরণ দেওয়াই তার প্রধান উদ্দেশ্য। সমমনা বিজ্ঞানীরা সে রচনার উদ্দিষ্ট পাঠক। কেউ লিখেছেন প্রধানতঃ শিক্ষামূলক বই। কেউবা সহজ ভাষায় পৌঁছতে চেষ্টা করেছেন অতি সাধারণ পাঠকের কাছে; বিজ্ঞানের অবদান সম্পর্কে পাঠককে অবহিত করা, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের মাধ্যমে তাঁদের চিন্তা ও দৃষ্টির বিস্তার ঘটানোই তার প্রধান উদ্দেশ্য। বিজ্ঞান সম্পর্কে এই সচেতনতা সৃষ্টির অবলম্বন হিসেবে কেউ হয়তো আশ্রয় নিয়েছেন বৈজ্ঞানিক কল্প-কাহিনীর। আবার কারো রচনায় দেখা যাবে এসব একটি দুটি বৈশিষ্ট্যের মেশামেশি। এর মধ্যে কোন্ ধরনের রচনা আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে সব চাইতে বেশি প্রয়োজন?

খুব সাদামাটা হিসেবে ফেললে বিজ্ঞান বিষয়ক রচনাকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যেতে পারে: (1) গবেষণাধর্মী, (2) সম্প্রচারমূলক ও (3) সাহিত্যধর্মী। বাংলাদেশের মতো একটি দরিদ্র উন্নয়নশীল দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার চর্চা ছাড়া অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির আর কোন সহজ পথ নেই—এ বিষয়ে কেউ আজ তেমন দ্বিমত পোষণ করবেন না। ভাষা আন্দোলনের পরবর্তীকালে এই চর্চার প্রধান বাহন হবে আমাদের মাতৃভাষা বাংলা—এ বিষয়েও

অন্ততঃ প্রকাশ্যে সকলে সায় দেবেন বলে মনে করি। কিন্তু তার পরও লেখকের সুনির্দিষ্ট ভূমিকাটি কি হবে সে প্রশ্ন তবু ওঠে। কোন্‌টার ওপর প্রধান গুরুত্ব দেওয়া হবে : গবেষণা, সম্প্রচার অথবা সাহিত্য?

সন্দেহ নেই যে, গবেষণাই বিজ্ঞানের প্রাণ। কোন বিজ্ঞানী যখন তাঁর গবেষণা থেকে নতুন কোন তত্ত্ব বা তথ্য আবিষ্কার করেন তখন তা বিজ্ঞান পত্রিকাতেই প্রকাশ করেন। পৃথিবীতে প্রথম বিজ্ঞান পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল 1650 খৃস্টাব্দে। তারপর দু'শ বছরে পত্রিকার সংখ্যা বেড়ে প্রায় হাজারের অঙ্কে পৌঁছয়। আজ বৈজ্ঞানিক গবেষণা পত্রিকার সংখ্যা লাখ খানেক। প্রতি বছর এসব পত্রিকায় প্রায় এক কোটি গবেষণা-পত্র প্রকাশিত হচ্ছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইউনেস্কোর হিসেব অনুযায়ী সারা দুনিয়ায় বিজ্ঞানীর সংখ্যা আজ প্রায় চার কোটি। তার মধ্যে মোটামুটি বার শতাংশ সার্বক্ষণিক-ভাবে নিয়োজিত গবেষণায়।

বিজ্ঞান গবেষণার দিক দিয়ে বাংলাদেশ যে দুনিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশ নিচের সারিতে তা না বললেও চলে। তবে এদেশেও আজ বিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে কয়েক ডজন গবেষণা পত্রিকা প্রকাশিত হয়। আমাদের জনসম্পদ সারা দুনিয়ার জনসংখ্যার প্রায় দু'শতাংশ, কিন্তু বিজ্ঞানীর সংখ্যা সারা দুনিয়ার বিজ্ঞানী সংখ্যার মাত্র হাজার ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ মোটামুটি চল্লিশ হাজার। এ'দের মধ্যেও প্রায় বার শতাংশ বা পাঁচ হাজার নিয়োজিত গবেষণায়। তবে সারা বছরে ওঁদের প্রকাশিত গবেষণাপত্রের সংখ্যা হাতের আঙুলে গোনা যায়। স্পষ্টতঃই ভাষা আন্দোলনের আত্মদান বাংলা ভাষায় গবেষণামূলক বৈজ্ঞানিক রচনা প্রকাশের ক্ষেত্রে তেমন কোন অগ্রগতির সূচনা করতে পারে নি।

সে হিসেবে বাংলা সম্প্রচারমূলক রচনার ক্ষেত্রে তৎপরতা অনেক বেশি লক্ষণীয়। ঊনিশ শতকে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের যেটুকু ছিটেফোঁটা স্পর্শ এসে লেগেছিল এদেশের বুদ্ধিজীবী সমাজে তাতেই তাঁদের কেউ কেউ বিজ্ঞান চর্চার প্রয়োজন বুঝতে পেরেছিলেন অন্তর দিয়ে। ঊনিশ শতকের মাঝামাঝি অক্ষয়কুমার দত্ত (1820-86) ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র (1822-91) যথাক্রমে 'তত্ত্ববোধিনী' ও 'বিবিধার্থসংগ্রহ' পত্রিকার মাধ্যমে বিজ্ঞান বিষয়ে নিয়মিত রচনা প্রকাশ করতে থাকেন। এই শতকের শেষে সার্থক বিজ্ঞান লেখক হিসেবে দেখা দেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (1864-1919); তাঁর 'প্রকৃতি' (1896) ও 'জিজ্ঞাসা' (1904) বই দুটি সেকালে রীতিমতো সাড়া জাগায়।

প্রকৃত অর্থে বাংলা ভাষায় প্রথম গবেষক লেখকের মর্যাদা যুগ্মভাবে জগদীশচন্দ্র বসু (1858-1937) আর প্রফুল্লচন্দ্র রায় (1861-1944)-এর প্রাপ্য। বাংলাদেশে কাজী মোতাহার হোসেন (1897-1981) ও মুহাম্মদ কুদরাত এ খুদা (1900-1977)-কে এ পথের পথিকৃৎ বলা যায়। তবে তাঁরাও যে শুধু বৈজ্ঞানিক তথ্যের বর্ণনায় নিজেদের সীমাবদ্ধ রেখেছেন তা নয়। জগদীশচন্দ্রের 'অব্যক্ত' (1921) বা কাজী মোতাহার হোসেনের 'সঞ্চরণ' (1937) বই দু'টির অনেক রচনাতেই সাহিত্য রসের স্বাদ রয়েছে। জিজ্ঞাসার 'নিয়মের রাজত্ব', অব্যক্তের "উদ্ভিদের জন্ম ও মৃত্যু", 'ভাগিরথীর উৎস সন্ধানে' বা সঞ্চরণের 'কবি ও বৈজ্ঞানিক', 'বৈজ্ঞানিকের জ্ঞান-সাধন', 'অসীমের সন্ধানে' এবং এ জাতীয় অনেক রচনা শুধু যে বিজ্ঞানের তত্ত্বপিপাসু পাঠকের জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণ করেছে তা নয়, আরো অনেক বাঙ্গালী পাঠককেই বিজ্ঞানের বিচিত্র জগতের রসাস্বাদনে সহায়তা করেছে।

একই সঙ্গে গভীর বিজ্ঞান রস এবং গভীর সাহিত্যরসের স্বাদ পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বিশ্বপরিচয়' (1937) গ্রন্থে। রবীন্দ্রনাথ আনুষ্ঠানিকভাবে বিজ্ঞানের গবেষণায় অংশগ্রহণ করেন নি; কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে সহজ ভাষায় বিজ্ঞানের তত্ত্ব পৌঁছে দেবার জরুরী তাগিদ অনুভব করেছিলেন। তারই ফলশ্রুতিতে এই আশ্চর্য রসসমৃদ্ধ বইটি তিনি রচনা করেন ছিয়াত্তর বছর বয়সে।

আসলে ভাষার সৌকর্য বিজ্ঞান বিষয়ক সকল রচনারই একটি বিশেষ গুণ বলা যেতে পারে। সেদিক থেকে বিজ্ঞান-লেখকদের জন্য গবেষণা, সম্প্রচার ও সাহিত্যকে পুরোপুরি পৃথক করা শক্ত। বলা যেতে পারে প্রভেদটা মূলতঃ ঝোঁকের। বিজ্ঞান-লেখক মাত্রই সম্ভবতঃ কিছুটা পরিমাণে গবেষক—কতখানি তা প্রধানতঃ তাঁর ব্যক্তিগত প্রস্তুতি, প্রবণতা ও রচনা-ভঙ্গির ওপর নির্ভরশীল। আবার কোন বিজ্ঞান গবেষক যখন তাঁর গবেষণার ফলাফল লিখে বর্ণনা করতে চেষ্টা করেন তখন তাঁকে সাহিত্যের আশ্রয় নিতে হয় বই কি। —কতটা তা নির্ভর করে তিনি কাদের জন্য কি ভঙ্গিতে লিখছেন তার ওপর। যদি রচনাটি হয় সহকর্মী গবেষকদের জন্য তাহলে সচরাচর তাতে সাহিত্যের ভাগ থাকে সামান্য; আর যদি হয় সাধারণ পাঠকের জন্য আর সে পাঠকের প্রতি লেখক যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল হন তাহলে রচনা সুবোধ্য ও চিত্তাকর্ষক করার জন্য তিনি প্রায়শঃ সাহিত্যরসের আশ্রয় নিতে চেষ্টা করেন।

এখানে একটা কথা উঠবে : গবেষণা যদি আগে না এগোয় তাহলে বিজ্ঞানের রচনা কি যথেষ্ট প্রসার লাভ করতে পারে? কিংবা অন্যভাবে বললে, আগে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করে তার পরই কি বিজ্ঞানের তত্ত্ব সম্প্রচারে মনোনিবেশ করা উচিত নয়? এটা সত্যি যে, সার্থক গবেষক—বিজ্ঞানী যদি বিজ্ঞান সম্প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন তাহলে তাঁর রচনায় পাঠকের বিশ্বাস স্থাপন সহজ হবে। আইনস্টাইন, হলডেন বা কার্ল সাগানের রচনার জনপ্রিয়তার পেছনে নিঃসন্দেহে এই সত্যটি অনেকখানি কাজ করেছে। কিন্তু গবেষক—বিজ্ঞানীরা যে সবাই জনপ্রিয় রচনায় এ'দের মতোই সিদ্ধহস্ত হবেন তার নিশ্চয়তা নেই। সেজন্যই রবীন্দ্রনাথের মতো 'অবিজ্ঞানী' যখন

বিজ্ঞান রচনার ক্ষেত্রে কোন উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন তখন তার মূল্য কিছুমাত্র কম মনে হয় না।

এ প্রসঙ্গে আরো একটি কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বাংলাদেশের বিজ্ঞান রচনা স্বভাবতঃই এদেশের জনগণের জীবনের সমস্যার সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এসব রচনা শুধু এদেশের বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে ভিত্তি করে গড়ে উঠবে এমন কোন কথা নেই। আসলে বিজ্ঞান তো কোন দেশ ও জাতির সীমারেখা মেনে চলে না। সারা দুনিয়ার সকল বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির ঐতিহ্যে সব দেশের মানুষের সমান অধিকার। আগুন বা চাকা যাঁরা প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন তাঁরা যদি এসবের প্রয়োগের ওপর একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করতেন তাহলে কি পরিস্থিতির সৃষ্টি হত সেকথা আজ কল্পনা করাও শক্ত।

বিজ্ঞানের অগ্রগতি সৃষ্টিশীল বিজ্ঞানীদের গবেষণা ও উদ্ভাবনের মাধ্যমেই ঘটে থাকে। কিন্তু সেজন্য যথোপযুক্ত পরিবেশ এবং দেশের মানুষের সক্রিয় সমর্থন প্রয়োজন। বিজ্ঞান-সচেতন মানুষই কেবল সমর্থন যোগাতে পারে। বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের আবিষ্কার ও উদ্ভাবনকে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগের জন্যও চাই দেশের মানুষের মধ্যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গীর বিস্তার। সেদিক থেকে দেখলে আমাদের দেশে বিজ্ঞানের গবেষণা এবং সাধারণ মানুষের বিজ্ঞানচেতনা দুর্বল বলেই বরং জনপ্রিয় বিজ্ঞান রচনা আরো বেশি করে প্রয়োজন। এদেশের সকল দেশপ্রেমিক বিজ্ঞানকর্মী এ বিষয়ে সচেতন হলে দেশের অগ্রগতি হয়তো ত্বরান্বিত হত।

অপবিজ্ঞান ও পরাবিজ্ঞান

আসলে বিজ্ঞান-লেখকের দায়িত্ব তো শুধু বিজ্ঞানের বিষয়গুলো আকর্ষণীয় ভাবে পরিবেশন করা নয়, সেই সঙ্গে উন্নয়নের অনুকূল সুস্থ, বিজ্ঞাননিষ্ঠ পরিবেশ সৃষ্টিতে বাধা দেয় যেসব শক্তি তাদের সচেতনভাবে প্রতিহত করাও প্রয়োজন রয়েছে।

একটা প্রতিকূল প্রভাব তো অবশ্যই সনাতন অশিক্ষা ও অজ্ঞতা, সামন্তযুগীয় ধ্যানধারণা ও কুসংস্কার। এসব অতিক্রম করতে হলে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে চাই দেশব্যাপী সাধারণ শিক্ষার বিস্তার। এই শিক্ষা বিস্তার এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত কুশলতার বিকাশ না ঘটলে এদেশের সকল উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হতে বাধ্য।

সেই সঙ্গে রয়েছে নানা মহল থেকে প্রচ্ছন্ন বিজ্ঞান বিরোধী উদ্যোগ। বিজ্ঞান আজ এমন সফল বলেই চতুর্দিকে চলছে নানা স্বার্থে তাকে ব্যবহার করার চেষ্টা। যিনি পাখির ঠোঁটে ভাগ্য গণনা করেন বা হস্তরেখা দেখে ভূত-ভবিষ্যৎ বলে দেন তিনিও দাবি করেন যে, এসব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে করা হয়ে থাকে। ফলিত জ্যোতিষশাস্ত্র যে একটি বিজ্ঞান এই ঘোষণা সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন ও খবরের শিরোনামে ঘন ঘন জানানো হয়ে থাকে এই গোয়েবল্‌সীয় আশায় যে, বারবার বললে লোকের মনে নিশ্চয় বাঞ্ছিত প্রত্যয় জন্মাবে। রাস্তার ধারে নানা জড়িবুটি টোটকা ওষুধ বিক্রি করেন যে ফেরিওয়ালা তিনিও দু-তিন রকম তরল পদার্থের মিশেল দিয়ে রসায়নের ভেল্কি দেখাতে ছাড়েন না। এসবকে বিজ্ঞান বলা যায় না, বড়জোর বলা যেতে পারে অপবিজ্ঞান। এমনি অপবিজ্ঞানের কুজ্ঝটিকায় ছেয়ে আছে সারা দেশ।

এর চেয়ে আরো সূক্ষ্ম উদ্যোগও আছে। বিজ্ঞান মূলতঃ পরীক্ষা ও যুক্তির ভিত্তিতে প্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটনের পদ্ধতি। পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ পাওয়া যায় না এমন বহু বিষয় বিজ্ঞানের আওতায় এনে উদ্যোগী ব্যক্তিরা সৃষ্টি করেন পরাবিজ্ঞানের লীলাক্ষেত্র। চাঁদের আকর্ষণে জোয়ার-ভাটা হয়; কাজেই তাতে চাকরিতে পদোন্নতি যদি নাও হয়, উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে প্রভাব নিশ্চয় পড়বে; পড়বে না যে তার প্রমাণ কি? ইউ. এফ. ও বা উড়ন্ত অজ্ঞাত বস্তুদের নিয়ে গত কয়েক দশক ধরে সারা দুনিয়ায় তোলপাড় সৃষ্টি পরাবিজ্ঞানীদের জন্য পরম লোভনীয় পরিস্থিতি। এরিক ফন দানিকিন নামে একজন জার্মান লেখক মানুষের নানা প্রাচীন সভ্যতার স্থাপত্যকীর্তিকে ভিন্ন গ্রহের আগন্তুকদের পদচিহ্ন বলে দাবি করে প্রায় আধ ডজন বই লিখেছেন এবং নানা ভাষায় সে সব বই বিক্রি করে মুনাফাও করেছেন প্রচুর। অনেক ক্ষেত্রে পরাবিজ্ঞান বিজ্ঞানকে নিয়ে যায় অধ্যাত্মবাদের পথে। পাশ্চাত্যের কোন কোন দেশে 'ক্রিশ্চান সায়েন্স' আজ এক বড় রকম আন্দোলনের রূপ নিয়েছে।

আরো এক ধরনের উদ্যোগ হল আধুনিক সভ্যতার সব সমস্যার জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে দায়ী করা। মুনাফা-শিকারী শিল্পপতিরা চারপাশের পরিবেশে নির্বিচারে বিষাক্ত বস্তু নিক্ষেপের ফলে পরিবেশ দূষিত হয়ে মানুষ বাসের অযোগ্য হয়ে উঠছে—সে দোষ যেন বিজ্ঞানের। উন্নত স্বাস্থ্যবিধির ফলে রোগব্যাধি নির্মূল হয়ে জনসংখ্যা বিস্ফোরণ ঘটছে এবং তাতে পৃথিবীর বস্তুসম্পদে ঘাটতি দেখা দিচ্ছে—তার জন্যও বিজ্ঞানই দায়ী। প্রচণ্ড বিধ্বংসী মারণাস্ত্র উদ্ভাবনের ফলে সমগ্র মানবসভ্যতা ধ্বংসের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে—তার সমাধান হিসেবে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে বর্জন করে সেই প্রাচীন তপোবনে ফিরে যাবার। —এসব তৎপরতা প্রকৃত সমস্যা থেকে মানুষের দৃষ্টি সরিয়ে নিতে চেষ্টা করে; তাদের দৃষ্টি সরিয়ে নিতে চায় প্রকৃত বিজ্ঞান থেকেও।

অনাহার আর অস্বাস্থ্য মানুষের মৃত্যু ঘটায় এ আমরা সবাই জানি। কিন্তু সেই সঙ্গে মানুষের মৃত্যু ঘটায় অজ্ঞানতা, কুসংস্কার আর অন্ধবিশ্বাসও। যারা মরে না তারাও এই অন্ধতার বিষবাষ্পে হয়ে থাকে জীবন্মৃত। এমনি জীবন্মৃত মানুষ কখনো দেশের অর্থনৈতিক বা সামাজিক উন্নয়নের অংশীদার হতে পারে না। একমাত্র প্রকৃত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের আলোকই

মানুষকে দিতে পারে পৃথিবী ও তার পরিবেশ সম্পর্কে স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি, আর এক সমৃদ্ধ নতুন পৃথিবী সৃষ্টির দৃঢ় প্রত্যয়।

পৃথিবীর সেরা বিজ্ঞান-লেখকরা চিরকাল জ্ঞানের জগৎকে প্রসারিত করেছেন; সেই সঙ্গে তাঁরা আলোকিত করেছেন মানুষের চিন্তকে, সংগ্রাম করেছেন সামাজিক অগ্রগতির জন্য, সুগম করেছেন আরো অসংখ্য গবেষক বিজ্ঞানকর্মীর আবির্ভাব, এগিয়ে দিয়েছেন মানুষের সভ্যতার সীমানা। বিজ্ঞানের গবেষণার জগৎ আর ব্যাপক সমাজের সংস্কৃতি-কর্মকাণ্ডের মধ্যে তাঁরা সৃষ্টি করেছেন যোগসূত্র। এই হল বিজ্ঞান-লেখকের ঐতিহ্য।

বিজ্ঞান-লেখক মূলতঃ একই সঙ্গে বিজ্ঞানী ও লেখক—হয়তো কেউ প্রধানতঃ বিজ্ঞানী, কেউ প্রধানতঃ লেখক। পৃথিবীতে সর্বকালে বিবেকবান লেখকরা যে কোন পরিস্থিতিতে মানুষের পক্ষ নিয়েছেন। বাংলাদেশের বিজ্ঞান-লেখকদের সামনেও আজ সেই একই ঐতিহাসিক দায়িত্ব—বিজ্ঞানের তত্ত্ব আর তথ্য দিয়ে অভিষিক্ত করতে হবে দেশের মানুষকে। সেজন্য চাই আরো বেশি বিষয়ক রচনা—নানা ধরনের রচনা। বিজ্ঞানের আলোকধারায় স্নাত মানুষ উদ্যোগী হবে আধুনিক কালের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লবকে আলিঙ্গন জানাতে। আর তার মধ্য দিয়ে এদেশের মানুষের জন্য সূত্রপাত ঘটবে এক নতুন জীবনের।

বাংলাদেশের বিজ্ঞান-লেখকরা আজ এই লক্ষ্যে সংঘবদ্ধ হয়েছেন; এতেই বোঝা যায় তাঁরা তাঁদের ঐতিহাসিক দায়িত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন।*

* 27 এপ্রিল 1985 তারিখে ঢাকায় বাংলা একাডেমীতে (বাংলা একাডেমী ও বিজ্ঞান সংস্কৃতি পরিষদের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত) বিজ্ঞান-লেখক সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণ।

বিজ্ঞান, সাংবাদিকতা, সাহিত্য

বিমল বসু*

একসময় বিজ্ঞান ছিল বিজ্ঞান সাধক ও গবেষকদের অন্তঃপুরের সামগ্রী। গড়পড়তা সাধারণ মানুষ তাঁর নাগাল পেত না। বিজ্ঞান নিয়ে কোনও চেতনা বা মাথাব্যথাও ছিল না তাদের। শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী মহলে বিজ্ঞান সম্পর্কে প্রথম আগ্রহ দেখা দেয় ইউরোপীয় নবজাগরণের সময়। তবে শিল্প বিপ্লবের আগে জনসাধারণের মধ্যে এই আগ্রহের সঞ্চার হয় নি। বিজ্ঞান চর্চা গবেষণা ও আবিষ্কারের প্রত্যক্ষ ফল যখন প্রযুক্তির বিচিত্র বেশে আপামর মানুষের হাতে এসে পৌঁছতে লাগল তখন থেকেই বিজ্ঞানকে নতুন আলোয় দেখা শুরু হল। বিজ্ঞান তখন দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় নানা প্রয়োজনে নানা সমস্যার মুশকিল আসান। তখন থেকেই বিজ্ঞান ক্রমশঃ সাধারণ মানুষের ঘরের জিনিষ। অন্তঃপুরের প্রাচীর ডিঙিয়ে বিজ্ঞান এসে দাঁড়াল খোলা আকাশের নিচে। আর আজ? বিজ্ঞান তো কল্পতরু। আজকের এই সময়টাকে বলা যায় প্রযুক্তি বিস্ফোরণের যুগ। যদিও এই বিস্ফোরণের প্রধান লীলাক্ষেত্র ইউরোপ, আমেরিকা এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর জাপান, ভারতবর্ষ সহ অন্যান্য তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতেও এর ঢেউ এসে পৌঁছেছে।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে একজন বিজ্ঞান লেখক অথবা সাংবাদিককে আজ ঠিক করে নিতে হয় তিনি কী লিখবেন কাদের জন্য লিখবেন এবং কিভাবে লিখবেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা থেকে শুধু করে বঙ্গদর্শন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ আচার্য জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, রামেন্দ্রসুন্দর, জগদানন্দ, চারুচন্দ্র, সত্যেন বসু, গোপালচন্দ্র এবং জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার চেষ্টায় বাংলা-ভাষায় বিজ্ঞান রচনার একটি সুদৃঢ় ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে। সন্দেহ নেই, আজকের দিনের লেখকদের সামনে এটি আদর্শ। কিন্তু এই আদর্শকে ভিত্তি করে নতুন একটি আঙ্গিক সৃষ্টিরও আজ প্রয়োজন। সে আঙ্গিক হল একেবারে আটপৌরে ভাষায় সহজ করে সোজাসুজি বলা। গত দুই দশক ধরে এ আঙ্গিকের ক্রমবিকাশ আমরা দেখতে পাচ্ছি সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র-পত্রিকায়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম চার দশকে, যাকে বলে বাংলাভাষায় বিজ্ঞান রচনার স্বর্ণযুগ, লেখকদের মূল লক্ষ্যটা ছিল প্রধানতঃ অ্যাকাডেমিক অর্থাৎ বিজ্ঞানের শিক্ষা ও প্রসার। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই বিশ্বভারতীর বিশ্ববিদ্যা সিরিজের পুস্তিকাগুচ্ছ এবং বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার প্রকাশনা। আজও এ ধরনের বইপত্রের প্রয়োজন ষোলআনাই আছে। বাংলাভাষায় প্রকাশিত বিজ্ঞান গ্রন্থের তালিকাটি যে বছর বছর দীর্ঘতর হচ্ছে সেটি নিঃসন্দেহে সুলক্ষণ। এইসব বইয়ের বারো-আনাই হল বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিপূরক গ্রন্থ এবং সেটাই বাঞ্ছনীয়। কেননা, এখন স্কুলের মাধ্যমিক স্তরেই বিজ্ঞান শিক্ষার একটা সুষম ভিত্তি

* 8/এল, সময় সরণী, কলিকাতা-700002

তৈরি হয়ে যাচ্ছে। এরপর যারা অ্যাকাডেমিক বিজ্ঞান শিক্ষার পথে আর যাবে না তাদের বিজ্ঞান জ্ঞানকে একটা সম্পূর্ণতা দেওয়া, আরও বিচিত্রমুখী করে তোলার জন্য এ ধরনের পরিপূরক গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন।

এদিক থেকে সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র-পত্রিকারও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তবে উনিশ শতকী 'সমাচার দর্পণে'র বিজ্ঞান সাংবাদিকতা আর আজকের বিজ্ঞান সাংবাদিকতা এক জিনিষ নয়। বিজ্ঞান আজ এক মহাবট, বহু বিচিত্র শাখা-প্রশাখার অতি জটিল তার বিস্তার ও ব্যাপ্তি। ফলে একজন বিজ্ঞান সাংবাদিককে পল্লবগ্রাহী হতেই হয়। একদিন কোনও পদার্থবিদের গবেষণার কথা লিখে পরদিনই হয়ত সাক্ষাৎকার নিতে হয় কোনও রসায়নবিজ্ঞানীর। সপ্তাহ কাটতে না কাটতেই আবার ছুটতে হয় কোনও জেনেটিস্টের আবিষ্কার সম্পর্কে রিপোর্ট করতে। কোনও একটি সংবাদপত্র বা সাময়িক পত্রিকার পক্ষে বিজ্ঞানের একাধিক বিশেষজ্ঞ সাংবাদিক রাখা যেহেতু সম্ভব নয়, তাই একজনকে দিয়েই জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সারতে হয়। এহ বাহ্য। এদেশে অধিকাংশ সংবাদপত্রেই বিজ্ঞান সাংবাদিক বলে কোনও পদ নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত খবর যাদের দিয়ে করানো হয় তাঁরা বিজ্ঞানের ছাত্রই নন। ফলে তাঁদের রিপোর্টিংয়ে প্রায়শই নানা ভুলভ্রান্তি ঘটে, খবরের 'অ্যাপ্রোচ'ও যথাযথ হয় না। এতে বিজ্ঞানী ও গবেষকরা চটে যান। সাংবাদিকদের কাছে আর সহজে মুখ খুলতে চান না। কেউ কেউ মুখের উপরেই যা-তা বলে বসেন। বিগত দুই দশকের বিজ্ঞান লেখালেখি ও সাংবাদিকতার জীবনে এ অভিজ্ঞতা আমার একাধিকবারই হয়েছে। কোনও একজন সাংবাদিক হয়ত ভুল লিখেছেন। তারপর সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞের কাছে যেই গেছি অমনি ফেটে পড়েছেন তিনি। এ জাতীয় অভিজ্ঞতা আমার একার নয়, আরও অনেকেরই।

এই অবস্থার পরিবর্তন হতে পারে যদি সংবাদপত্রগুলিতে বিজ্ঞানের ভিত্তি আছে এমন লোককেই বিজ্ঞান সংক্রান্ত খবর সংগ্রহে পাঠানো হয়। অর্থাৎ বিজ্ঞান সাংবাদিক নিয়োগ। গত বছর দিল্লিতে প্রেস ইনস্টিটিউট অব ইণ্ডিয়ার উদ্যোগে আয়োজিত 'সাউথ এশিয়ান সায়েন্স রাইটিং ওয়ার্কশপ' নামে একটি কর্মশালায় যোগ দেওয়ার সুযোগ হয়েছিল। কর্মশালার শেষে যে প্রস্তাবগুচ্ছ নেওয়া হয় সংবাদপত্রে বিজ্ঞান সাংবাদিক পদ সৃষ্টির প্রস্তাব ছিল তার অন্যতম। এই প্রস্তাব প্রেস ইনস্টিটিউটের সদস্য সমস্ত সংবাদপত্রেই পাঠানো হয়। কিন্তু কাগজগুলির দিক থেকে এখনও পর্যন্ত তেমন সাড়া মেলে নি। তা না মিললেও একটা সুলক্ষণ অবশ্য দেখা যাচ্ছে। তা হল একাধিক সংবাদপত্রে বিজ্ঞানের নিয়মিত পাতা বা কলমের সূচনা। অধিকাংশ সাময়িক পত্র-পত্রিকায় তো একাজ অনেক আগেই শুরু হয়ে গেছে।

এখানে স্বভাবতই একটা প্রশ্ন উঠতে পারে। বিজ্ঞান সাংবাদিক হিসাবে কাকে নিয়োগ করা হবে? তিনি কি কোনও বিষয়ের বিশেষজ্ঞ হবেন? বিশেষজ্ঞ হলে ভালোই। তবে মনে হয় না সেটা অপরিহার্য। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বিজ্ঞান, এমন কি, বর্তমান পাঠক্রমের মাধ্যমিক স্তরের বিজ্ঞানের বিদ্যা নিয়েও যে-কেউ সফল বিজ্ঞান সাংবাদিক হতে পারেন যদি তিনি সেভাবে নিজেকে তৈরি করেন, যদি বিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁর আগ্রহটা খাঁটি হয়। তবে ন্যূনতম ভিত্তি হিসাবে বিজ্ঞানের স্নাতক স্তর পর্যন্ত বিদ্যা থাকাই বাঞ্ছনীয়। বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞ যদি বিজ্ঞান সাংবাদিক হতে চান তাঁরও নিজেকে প্রস্তুত করার প্রশ্ন আছে। কেননা, তিনি হয়ত বিজ্ঞানের কোনও একটি বিভাগের ক্ষুদ্রতম কোনও বিষয়ের বিশেষজ্ঞ। অন্যান্য বিভাগ সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান একজন সাধারণ স্নাতকের থেকে বেশি নয়।

পপুলার সায়েন্স বা জনবিজ্ঞান লেখালেখির ক্ষেত্রেও কথাটা প্রযোজ্য। বিজ্ঞান লেখালেখি অর্থাৎ science writing-এর সঙ্গে science journalism বা বিজ্ঞান সাংবাদিকতার কিছু পার্থক্য আছে। দিল্লির কর্মশালায় এ নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছিল। বিজ্ঞান সাংবাদিকতা মূলত সংবাদ-ভিত্তিক। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে দেশের কোথায় কি হচ্ছে তা নিয়ে খোঁজখবর করে প্রতিবেদন লেখা, বিশিষ্ট বিজ্ঞানী অথবা প্রযুক্তিবিদের সাক্ষাৎকার নেওয়া, রোগ মহামারী বা জনস্বাস্থ্য বিপর্যয়কর ঘটনাবলী সম্পর্কে অনুসন্ধান-মূলক রিপোর্টিং—এ সবই বিজ্ঞান সাংবাদিকতার পর্যায়ে পড়ে। যেখানে সাংবাদিকের দায়িত্ব হল প্রকৃত সত্যের উদ্‌ঘাটন এবং নির্ভুল ও যুক্তিসিদ্ধ উপায়ে তার প্রকাশ। কেউ মিথ্যে বলছেন কিনা, অকারণ বাড়িয়ে বা কমিয়ে বলছেন কিনা সে বিষয়ে সাংবাদিককে সজাগ ও সতর্ক থাকতে হয়। লিখতে গিয়ে নিজের কলম সম্পর্কেও যথেষ্ট সতর্কতার প্রয়োজন। তাঁকে খেয়াল রাখতে হবে তাঁর লেখায় তিল যেন তাল না হয়ে ওঠে—লেখাটা যেন—জনসাধারণের মধ্যে অহেতুক আতঙ্ক না ছড়ায়। সম্প্রতি বিষাক্ত উদ্ভিদ পার্থেনিয়ম নিয়ে খবরের কাগজগুলিতে যেভাবে লেখা হয়েছে তাতে প্রকৃত সত্য উন্মোচনের চেয়ে আতঙ্কই ছড়িয়েছে বেশি। একজন পার্থেনিয়াম বিশেষজ্ঞই একথা বলেছেন। জনসাধারণের প্রতিক্রিয়াতেও এর প্রমাণ মিলেছে। সন্দেহ নেই, এসব ক্ষেত্রে জনসাধারণকে সচেতন ও সতর্ক করার দায়িত্ব সংবাদপত্রের নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু সেটা করতে হবে যথেষ্ট সংযম ও সাবধানতার সঙ্গে। নইলে ফল বিপরীত হয়ে যেতে পারে।

বিজ্ঞানে লেখকদের অবশ্য এ সমস্যা নেই। তাঁদের অ্যাপ্রোচটা মূলত অ্যাকাডেমিক। যথেষ্ট পড়াশুনো করে তাঁরা একটি প্রবন্ধ বা একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তথ্য, তত্ত্ব ভাষা, স্টাইল ইত্যাদি সম্পর্কে সাংবাদিকের চাইতে অনেক বেশি

সচেতন ও সতর্ক থাকতে হয় তাঁদের। কারণ তাঁর কাজটা অনেক বেশি স্থায়ী, গঠনমূলক এবং সাংবাদিক প্রতিবেদনের মতো অব্যবহিত প্রতিক্রিয়ার বদলে তাঁর লেখার আছে একটা সুদূরপ্রসারী প্রভাব। বলাই বাহুল্য, যিনি যে বিষয়ে লিখছেন তিনি সে বিষয়ের বিশেষজ্ঞ হলেই ভালো হয়। তবে বিশেষজ্ঞ মাত্রেই তো আর পপুলার বিজ্ঞান লেখক হতে পারেন না। বিশেষত, বাংলা বা কোনও আঞ্চলিক ভাষায় যদি তাঁকে লিখতে হয় তাহলে সেই ভাষার উপর দখল এবং প্রকাশভঙ্গীর মনোহারিতাও চাই। নচেৎ সাধারণ পাঠক সে লেখায় আকৃষ্ট হবে না। কাজেই অবিশেষজ্ঞদেরও কলম ধরার প্রয়োজন আছে, অন্তত আঞ্চলিক ভাষায় বিজ্ঞান লেখালেখির ক্ষেত্রে। লেখক যদি যথাযথভাবে নিজেকে প্রস্তুত করেন এবং বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম আগ্রহ থাকে তাহলে বিশেষজ্ঞ না হয়েও সফল হওয়া তাঁর পক্ষে খুবই সম্ভব। বিশেষজ্ঞ অথচ পপুলার বিজ্ঞান লেখক হিসাবে জগদীশচন্দ্র, রামেন্দ্রসুন্দর, মেঘনাদ, সত্যেন্দ্রনাথের সাফল্য যেমন অসামান্য তেমনি বিশেষজ্ঞ না হয়েও বিজ্ঞান রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ বা জগদানন্দের কৃতিত্বও বড় কম নয়।

প্রাতঃস্মরণীয় এইসব বিজ্ঞান লেখকদের নামের সঙ্গেই বিজ্ঞান সাহিত্য প্রসঙ্গটি এসে পড়ে। বিজ্ঞান সাহিত্য কাকে বলব? সাহিত্য রসাশ্রিত বিজ্ঞান রচনাই কি বিজ্ঞান সাহিত্য? বঙ্কিমচন্দ্র, জগদীশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান প্রবন্ধের সাহিত্য-গুণ সন্দেহাতীত। ও'দের রীতিই কি আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত? কিন্তু গড়পড়তা লেখক সে ক্ষমতা কোথায় পাবেন? মোটামুটি দু-দশকব্যাপী বিজ্ঞান লেখালেখি ও সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতা থেকে আমার মনে হয়, সহজ সাবলীল ভাষায় কৌতূহল-জাগানো ভঙ্গীতে বিষয়বস্তুকে সহজবোধ্য করে উপস্থিত করতে পারলেই পাঠক সে লেখায় আকৃষ্ট হবেই। সাতের দশকের গোড়ায় 'বিজ্ঞান জিজ্ঞাসু' নামে একটি পত্রিকা মুর্শিদাবাদের বহরমপুর থেকে আমরা কয়েকজনে মিলে বের করেছিলাম। অতি স্বল্পায়ু জীবনে পত্রিকাটির অসামান্য জনপ্রিয়তার পিছনে ছিল বিজ্ঞান লেখায় নতুন একটি আঙ্গিক। যার সার কথা হল সহজ করে সরস ভঙ্গীতে সোজাসুজি বলা। সরল হওয়া মানেই তরল হওয়া নয়। অনেক সময়েই দেখা যায় প্রাঞ্জলতা আনার জন্য লেখক অতি তরল হয়ে পড়ছেন। কেউবা কিঞ্চিৎ গুরুগম্ভীর স্টাইলের পক্ষপাতী। এ দুয়ের মধ্য পন্থাই হল জনবিজ্ঞান রচনার প্রকৃষ্ট পন্থা।

প্রসঙ্গত লেখায় তথ্য সমাবেশের কথাটাও উল্লেখনীয়। কখনও অতিরিক্ত তথ্য দিতে গিয়ে লেখা ভারাক্রান্ত ও নীরস হয়ে পড়ে। কখনও বা তথ্যের অপ্রতুলতা রচনাকে দুর্বল করে দেয়। এক্ষেত্রেও লেখককে সম্ভাব্য পাঠকের কথা ভাবতে হবে। অর্থাৎ কোন্ শ্রেণীর কোন্ বয়সের পাঠকের জন্য তিনি লিখতে যাচ্ছেন। কিশোর পাঠ্য বই বা পত্র-পত্রিকায় লেখা হবে একরকম। বয়স্ক সাধারণ পাঠকের জন্য চাই অন্যরকম ভোজের ব্যবস্থা। আবার বিজ্ঞানের ভিত্তি আছে এমন পাঠককুলকে তৃপ্ত করতে তথ্য ও তত্ত্বে রচনার ওজন কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করলে বোধকরি ক্ষতি নেই। পাঠক যে শ্রেণীরই হোক না কেন, তাকে টানতে লেখায় ব্যঞ্জনা ও সরলতা অবশ্যই আনা চাই। আর তা হলেই যে কোনও বিজ্ঞান রচনাই হয়ে উঠবে সাহিত্য। তার জন্য ভাষায় অনাবশ্যক ঝঙ্কার কিংবা আরোপিত কাব্যময়তার প্রয়োজন হবে না। তবে অন্তর্নিহিত বোধি এবং কাব্যবোধের আলোয় বিজ্ঞানকে যিনি সাহিত্যের সঙ্গে নিঃশেষে মিলিয়ে দিতে পারবেন তাঁর থেকে বড় বিজ্ঞান লেখক আর কে?

"হৃদয়াবেগে যার সীমা পাওয়া যায় না তাকে প্রকাশ করতে গেলে সীমাবদ্ধ ভাষার বেড়া ভেঙে দিতে হয়। কবিত্বে আছে সেই বেড়া ভাঙার কাজ, এই জন্যেই মা তার সন্তানকে যা নয় তাই বলে এককে আর করে জানায়, বলে চাঁদ, বলে মাণিক, বলে সোনা, একদিকে ভাষা স্পষ্ট কথার বাহন, আর একদিকে অস্পষ্ট কথারও, একদিকে বিজ্ঞান চলেছে ভাষার সিঁড়ি বেয়ে ভাষা সীমার প্রত্যন্তে, ঠেকেছে গিয়ে ভাষাতীত সংকেত চিহ্নে; আর একদিকে কাব্যও ভাষার ধাপে ধাপে ভাবনার দূরপ্রান্তে পৌঁছিয়ে অবশেষে আপন ধাঁধা অর্থের অন্যথা করেই ভাবের ইশারা তৈরী করতে বসেছে।"

রবীন্দ্রনাথ

বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্য—অতীত ও বর্তমান

অজয় চক্রবর্তী*

বাংলাভাষায় বিজ্ঞানালোচনাকে বিদ্যার সভা থেকে সাহিত্যের আসরে উন্নীত করতে প্রথম সক্ষম হয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। বাংলায় বিজ্ঞান নিয়ে লেখালেখি অবশ্য বঙ্কিমের আগেই শুরু হয়েছিল। অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদিত 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা, রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ', রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সংবাদ সুধাংশু' ইত্যাদি সাময়িক পত্রে বিভিন্ন লেখকের নানান বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সে-সব রচনার মধ্যে খুব কমই ছিল সাহিত্যরসবাহী। বঙ্কিমের লেখনী-স্পর্শেই প্রথম বাংলাভাষায় লেখা বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধ সাহিত্য-পদবাচ্য হলো। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে 'বিজ্ঞান কৌতুক' শিরোনামায় বঙ্কিমচন্দ্র নানান বৈজ্ঞানিক বিষয় নিয়ে লিখতে শুরু করেন। সুরসিক বঙ্কিমচন্দ্রের রসবোধ এবং রচনা-শৈলীর গুণে বিজ্ঞানের শুষ্ক বিষয়গুলোও সরস এবং কৌতুকাবহ হয়ে উঠেছে। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত বঙ্কিমের এই বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলো পরে 'বিজ্ঞান-রহস্য' নামে গ্রন্থ হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। বঙ্কিম অবশ্য বিজ্ঞান নিয়ে বেশি লেখেন নি। তাঁর 'বিজ্ঞান-রহস্য' গ্রন্থে মাত্র একুশটি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। কিন্তু এই স্বল্প-সংখ্যক প্রবন্ধ লিখেই তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, বিজ্ঞানের দুরূহ বিষয় নিয়েও সরস সাহিত্য সৃষ্টি করা যায়।

বঙ্কিমের পর বিজ্ঞান নিয়ে যাঁরা সার্থক সাহিত্য রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন রামেন্দ্রসুন্দর, আচার্য জগদীশচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য বিজ্ঞান নিয়ে খুব বেশি লেখেন নি। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-সাহিত্যের আদর্শ সৃষ্টি করে যাবার উদ্দেশেই বোধ করি রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বিশ্ব-পরিচয়' গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। আচার্য জগদীশচন্দ্রও বিজ্ঞান নিয়ে বাংলায় লেখার সুযোগ এবং সময় বড়ো একটা পান নি, কেননা বিজ্ঞান-সাধনাকেই তিনি তাঁর 'সুয়োরাণী' করেছিলেন। তবু, তিনিই বোধ করি বাংলাভাষায় প্রথম বিজ্ঞান-ভিত্তিক গল্প লেখার কৃতিত্বের অধিকারী। তাঁর লেখা 'পলাতক তুফান' গল্পটির আগে বাংলাভাষায় আর কোন বিজ্ঞান-ভিত্তিক গল্প রচিত হয়েছিল বলে আমাদের জানা নেই। জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান-ভিত্তিক রচনাগুলো 'অব্যক্ত' শীর্ষক বইটিতে স্থান পেয়েছিল। এ গ্রন্থের প্রবন্ধগুলো পড়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লিখেছিলেন যে, 'যদিও বিজ্ঞান-বাণীকেই তুমি তোমার সুয়োরাণী করিয়াছ, তবু সাহিত্য-সরস্বতী সে-পদ দাবী করিতে পারিত। কেবল তোমার অনবধানেই সে অনাদৃতা হইয়া আছে। যাঁরা 'অব্যক্ত' গ্রন্থটি পড়েছেন তাঁরা নির্দ্বিধায় স্বীকার করবেন যে, রবীন্দ্রনাথের এ উক্তিতে কোন অতিশয়োক্তি ছিল না। আচার্য জগদীশচন্দ্রের লেখার অতিরিক্ত আকর্ষণ ছিল এই যে, তিনি তাঁর প্রবন্ধগুলোতে নিজস্ব বৈজ্ঞানিক গবেষণার কথা, নানান প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে তাঁর নিজস্ব সংগ্রামের কথা প্রকাশ করেছেন সহজ এবং সুন্দর ভাষায়। কাজেই, আচার্য জগদীশচন্দ্রের প্রবন্ধগুলোতে যে কেবল বিজ্ঞানই পাওয়া যায় তা নয়, লেখকের বিরল ব্যক্তিত্বের প্রতিফলনও লক্ষ্য করা যায়।

বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যে সবচেয়ে শক্তিমান লেখক ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, তাঁর রচনা বিজ্ঞান, দর্শন এবং সাহিত্যের আশ্চর্য ত্রিবেণী-সঙ্গম। তিনি শুধু তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন না, তাঁর মন ছিল সাহিত্য-রসে জারিত ; তাই যে বিষয় নিয়েই লিখেছেন তাকেই সাহিত্যের বিষয় করে তুলেছেন। তাঁর লেখায় তত্ত্ব যেমন আছে, তেমনি আছে উপাদেয়তা। রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞান ও দর্শনের গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে আশ্চর্য সুন্দর সাহিত্য সৃষ্টি করে গেছেন। তাঁর লেখা 'বিজ্ঞানে পুতুল পূজা', 'মায়াপুরী', 'নিয়মের রাজত্ব' ইত্যাদি প্রবন্ধের কোন তুলনা আজও বাংলাসাহিত্যে নেই। আমাদের দুর্ভাগ্য রামেন্দ্রসুন্দরের কোন উত্তর-সাধক জুটলো না।

বিজ্ঞানের বিষয় নিয়ে বর্তমানে বাংলায় নানান বই, নানান পত্রপত্রিকা বেরোচ্ছে। কিন্তু সে সব বই ও পত্রপত্রিকায় সাহিত্য ধর্মী লেখার বড়ো অভাব। বিজ্ঞানের একটা স্বতন্ত্র ভাষা আছে। সেখানে পারিভাষিক শব্দ, সূত্রাদির বিবৃতি নানান তত্ত্ব ও তথ্য এমন এক ব্যূহ রচনা করে রাখে যে, একমাত্র যে সব মহারথ সে ব্যূহ ভেদ করার রহস্য জানেন কেবল তারাই তাতে প্রবেশ করতে পারেন। বিজ্ঞানের এ চরিত্র পাঠ্যপুস্তকেই সীমাবদ্ধ থাকা দরকার। যারা বিজ্ঞানের ছাত্র তারা বিজ্ঞানের ভাষা, বিজ্ঞানের সাঙ্কেতিকতা ও তথ্য-পরিবেশনার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিচিত। কাজেই তাদের কাছে সে-সব পাঠ্যপুস্তক বোধগম্য হতে পারে। কিন্তু যারা বিজ্ঞানের ছাত্র নয়, অথচ বিজ্ঞানানুরাগী, বিজ্ঞান যাদের কাছে পেশাগত আবশ্যকতা নয়, অথচ যারা বিজ্ঞানে আগ্রহী তাদের কাছে বিজ্ঞানের কথা পৌঁছে দিতে হলে বিজ্ঞানকে তার সাংকেতিকতার প্রাচীর থেকে মুক্তি দিতে হবে, পারিভাষিক শব্দের আড়াল থেকে বের করে আনতে হবে। বিজ্ঞানের যে-রচনা সাধারণের জন্য রচিত হবে সে-সব রচনায় বিজ্ঞানের তত্ত্ব বিজ্ঞানের তথ্য নিশ্চয়ই থাকবে। কিন্তু তাকে ভিন্ন পোষাক পরিয়ে আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে, হৃদয়গ্রাহী করে তুলতে হবে।

'পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব কত' ? তথ্যনিষ্ঠ বিজ্ঞানী উত্তর দেবেন, 'পৃথিবী থেকে সূর্যের গড় দূরত্ব প্রায় 9 কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল। কিন্তু সাহিত্যনিষ্ঠ বিজ্ঞান-লেখক কখনো একথা এভাবে বলবেন না। দেখা যাক, এ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র কী বলেছেন :

'যদি' পৃথিবী থেকে সূর্য পর্যন্ত রেলগাড়ি হইত, তবে কত

* ফলিত পদার্থবিদ্যা বিভাগ, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-700009

কালে সূর্যলোকে যাইতে পারিতাম ? উত্তর—যদি দিন রাত্রি ট্রেন অবিরত ঘণ্টায় বিশ মাইল চলে, তবে 520 বৎসর 6 মাস 16 দিনে সূর্যলোকে পৌছানো যায় ; অর্থাৎ, যে-ব্যক্তি ট্রেনে চড়িত তাহার সপ্তদশ পুরুষ ঐ ট্রেনে গত হইত।'

বিজ্ঞান-সাহিত্যও সাহিত্য। আর সাহিত্যে বচনের সঙ্গে অনির্বচনীয়তা থাকে। সাহিত্যে রস-সৃষ্টির দায় থাকে লেখকের। সেখানে কল্পনাকে প্রশ্রয় দিতেই হয়। বিজ্ঞান-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও কল্পনার অবকাশ অবশ্যই আছে। কিন্তু সে-কল্পনা বল্গাহীন হলে চলবে না। সত্যনিষ্ঠ কল্পনার গুণেই জুলে ভের্ন বড়ো মাপের বিজ্ঞান-সাহিত্যিক। এইচ. জি. ওয়েলস বড়ো মাপের বিজ্ঞান-সাহিত্যিক। অনিয়ন্ত্রিত কল্পনার ডানা লেখককে প্রায়শই এমন এক জগতে নিয়ে যায় যে-জগৎ ফ্যান্টাসীর জগৎ। বল্গাহীন কল্পনায় বিজ্ঞান-গন্ধী ফ্যান্টাসী রচিত হতে পারে ; কিন্তু সে-সব লেখায় কল্পনার দৌড়ে লেখক অনেক ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের সুপ্রতিষ্ঠিত সত্যকেও অস্বীকার করে বসেন। সে সব রচনাকে বিজ্ঞান-সাহিত্য বলতে আমি নির্দ্বিধ নই। বিজ্ঞানের গন্ধ থাকলেও এ সব ফ্যান্টাসী এক ধরনের রূপকথা। বিজ্ঞান সেখানে লক্ষ্য নয়, উপলক্ষ্য মাত্র। রূপকথার সঙ্গে এসব ফ্যান্টাসীর পার্থক্য হলো এই যে, এসব বিজ্ঞান-গন্ধী ফ্যান্টাসীতে রূপকথার দত্যি-দানারা আসে বিজ্ঞানের পোষাক পরে। অধ্যাপক শঙ্কুর জগৎ রূপকথারই জগৎ। সেখানে স্বপ্নদ্বীপের উদ্ভিদেরা জ্ঞান খেয়ে বাঁচে। বাস্তবে জ্ঞানভুক উদ্ভিদের স্থান নেই। বিজ্ঞানেও না। রূপকথায় অবশ্যই তারা থাকতে পারে। অধ্যাপক শঙ্কু তাই বিজ্ঞানী নন ; বিজ্ঞানীর মুখোশের আড়ালে রূপকথার রাজপুত্তুর। বিজ্ঞান হোক আর না হোক—অধ্যাপক শঙ্কুর অতি প্রাকৃত ক্রিয়াকলাপের বৃত্তান্ত পড়তে ভালই লাগে। আর ভাল লাগে বলেই সাহিত্য হিসেবে তা সমাদৃত হবার যোগ্য। কিন্তু কেউ যদি অধ্যাপক শঙ্কুর ডায়েরীকে বিজ্ঞান-সাহিত্য বলেন তবে তাঁর সঙ্গে আমি একমত নই। সার্থক 'সায়েন্স ফিকসন' লিখতে হলে বৈজ্ঞানিক দূরদৃষ্টি থাকা চাই। আগামী দিনে বিজ্ঞান কেমন রূপ নিতে পারে সে-সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা চাই। বিজ্ঞানে কোন্‌টা সম্ভব, কোন্‌টা সম্ভব নয় বিজ্ঞান-লেখকের সে বোধ অবশ্যই থাকা প্রয়োজন। এ কথার পাল্টা যুক্তি দিয়ে অনেকে হয়তো বলবেন, আজ যা অসম্ভব ঠেকছে, কাল তা সম্ভব হতে পারে। বিজ্ঞান তো অনেক আপাত-অসম্ভবকেই সম্ভব করেছে। তাহলে অসম্ভব কল্পনায় বাধা কোথায় ? বাধা অবশ্যই একটা আছে। ঈশ্বরকে তো আমরা সর্বশক্তিমান বলি। তার ক্ষমতাকেও কিন্তু চ্যালেঞ্জ করা যায়। এক দার্শনিক প্রশ্ন তুলেছিলেন, 'Can your God fashion two hills without an intervening velley ?' প্রশ্ন রেখেছিলেন, 'Can your God add up two and two to make five ?' এর উত্তরে বলতেই হয় এসব ব্যাপার ঈশ্বরেরও সাধ্যাতীত। সায়েন্স ফিকসনের নামে এমন অসম্ভব ব্যাপারও যদি কোন লেখক সম্ভব করে তোলেন তাহলে তাকে বিজ্ঞান-লেখক বলতে কুণ্ঠা জাগে—। বিজ্ঞানের সুপ্রতিষ্ঠিত সত্যকে নস্যাৎ করে কল্পনার ঘোড়া ছুটিয়ে রূপকথার রাজ্যে হয়তো পৌছোনো যায়। সাহিত্যও হয়তো রচিত হয়। কিন্তু সে রাজ্য বিজ্ঞান-সাহিত্যের নয়।

সাহিত্যের সত্য নিয়ে বিতর্ক চলতে পারে। কিন্তু প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানের সত্য নিয়ে বিতর্কের কোন অবকাশ নেই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় সাহিত্যের সত্যের বৈশিষ্ট্যটি তুলে ধরেছেন সুন্দরভাবে। ক্রৌঞ্চ-নিধনের শোকে অভিভূত বাল্মিকী অকস্মাৎ আবিষ্কার করলেন যে, শ্লোক-রচনার এক আশ্চর্য ক্ষমতার অধিকারী হয়েছেন তিনি। এ ক্ষমতা নিয়ে তিনি কি করবেন ? বাল্মিকী যখন এ কথা ভাবছেন তখন নারদমুনি তাঁর কাছে এসে তাঁকে পরামর্শ দিলেন, 'রামের কীর্তিকাহিনী নিয়ে কাব্য-রচনার। তখন বাল্মিকী নারদমুনিকে বললেন, 'আমি রাম সম্পর্কে তো কিছুই জানি না। কিভাবে তাঁর সম্পর্কে কাব্য-রচনা করবো ?' উত্তরে নারদ বললেন, 'সেই সত্য যা রচিবে তুমি, ঘটে যা তা সত্য নহে। তব মনোভূমি রামের জনমস্থান,—অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।' এ কবিতায় রবীন্দ্রনাথ যা বোঝাতে চেয়েছেন তা হলো এই যে, সাহিত্যকে বাস্তব সত্যের দাসত্ব করতে হয় না। সাহিত্যের সত্যাসত্য যাচাই হয় রসের বিচারে। সৎসাহিত্য বাস্তবানুগ হবে সত্য, কিন্তু সাহিত্য বাস্তবের ফটোগ্রাফ হবে এমন কোন কথা নেই। অবাস্তব মিথ্যাও সাহিত্যে সত্যের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তাই একথা বলা যায় যে, 'নিপুনভাবে মিথ্যে বলাই সাহিত্য।' যাঁরা সুসাহিত্যিক তাঁরা সুনিপুণভাবে মিথ্যে বলতে পারেন। সেক্সপীয়ারের ম্যাকব্যাথ ইতিহাসের ম্যাকব্যাথ নয়—তাতে 'ম্যাকবেথ' নাটকের সাহিত্যমূল্য ক্ষুণ্ন হয় নি। বস্তুত, সাহিত্যের প্রয়োজনেই সেক্সপীয়ার ইতিহাসের ঘটনা প্রবাহকে নিজের মতো করে সাজিয়ে নিয়েছেন। সাহিত্য-সমালোচকদের মতে, ম্যাকবেথের ট্রাজেডীকে গভীর এবং মর্মস্পর্শী করার উদ্দেশ্যেই নাট্যকার ইতিহাসের সত্যের উপর স্বাধীনতা নিয়েছিলেন।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে লেখকের যে স্বাধীনতা আছে, বিজ্ঞান-লেখকের সে-স্বাধীনতা নেই। অবশ্য বিজ্ঞান যদি তাঁর লেখার লক্ষ্য হয়। বিজ্ঞান-সাহিত্যে কল্পনার স্থান নেই—এ কথা বলছি না। কল্পনা ছাড়া বিজ্ঞানেও সাফল্য আসে না। আধুনিক বিজ্ঞানের ইতিহাস যাঁরা জানেন তাঁরাই স্বীকার করবেন যে, বুদ্ধিদীপ্ত কল্পনাশক্তিই বিজ্ঞানীদের সাহস জুগিয়েছে কোয়ান্টাম মতবাদ, বোরের পরমাণুতত্ত্ব, ডারুইনের বিবর্তনবাদের মতো যুগান্তকারী মতবাদকে স্বীকার করে নেবার। প্লাঙ্ক যখন কোয়ান্টাম মতবাদের কথা কল্পনা করেন, দ্য ব্রয় (De Broglie) যখন পদার্থের তরঙ্গবাদের কথা কল্পনা করেন তখন তাঁদের কল্পনার মৌলিকত্ব এবং নির্ভীকতা ছিল আকাশচুম্বী। যুগান্তকারী সৃষ্টির মুহূর্তে সাহিত্যিককে কল্পনার যে-স্তরে উঠতে হয় বিজ্ঞানীকেও

কল্পনার সে-স্তরেই উঠতে হয়। কোন কবি যখন 'নিস্তব্ধতা'-কে দেখেন 'উটের গ্রীবার মতো' তখন তিনি কল্পনার যে-স্তরে বিরাজ করেন কোন বিজ্ঞানী যখন'পদার্থের তরঙ্গরূপ দেখতে পান তখন তিনিও বোধকরি কল্পনার সে-স্তরই স্পর্শ করেন। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বা উদ্ভাবনে কল্পনার স্থান থাকলেও প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক সত্য নিয়ে বিজ্ঞান-নিবন্ধ লেখার সময় যথেচ্ছ কল্পনার অবকাশ থাকে না। সেখানে লেখককে বিজ্ঞানের সত্য অবিকৃত রাখার জন্য সদাসতর্ক থাকতে হয়।

বিজ্ঞানের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করতে হলে বিজ্ঞানীর মতো স্বচ্ছ দৃষ্টি নিয়ে এগোতে হবে। ইতিহাসের সত্যকে, বিজ্ঞানের সত্যকে বিকৃত করলে চলবে না। বিজ্ঞানী নিউটনকে নিয়ে যদি কেউ উপন্যাস লেখেন—যেমন লেখা হয়েছে চার্লস ডারুইনের জীবন নিয়ে, কিংবা শিল্পী র‍্যাদার জীবন নিয়ে—তাহলে তিনি নিউটনের জীবনের ঘটনাবলীর উপর স্বাধীনতা নিতে পারেন। যদি আপনারা কেউ সে-বিষয়ে উদ্যোগী হন তাহলে আমি তাকে পরামর্শ দেবো, রবার্ট হুকের সঙ্গে নিউটনের বিবাদটাকে ঘিরে একটা নাটকীয় পরিস্থিতি (dramatic situation) সৃষ্টি করার কথা ভুলবেন না। আমি যদি পাঠ্যপুস্তক ছেড়ে কখনো সে-ব্যাপারে হাত দিই তাহলে আপনারা হয়তো দেখবেন যে, রয়্যাল সোসাইটির অডিটোরিয়ামের সামনে রবার্ট হুক আস্তিন গুটিয়ে নিউটনের দিকে এগিয়ে আসছেন ঘুষি বাগিয়ে; নিউটনও দু'হাতে ক্যারাটের ভঙ্গিমা ফুটিয়ে তুলে রুখে দাঁড়িয়েছেন; আর মিঃ হ্যালী এই দুই যুধ্যমান বিজ্ঞানীকে নিরস্ত করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। বলা বাহুল্য এ ঘটনা কিন্তু বাস্তবে ঘটে নি। কিন্তু হুক-নিউটন সম্পর্ক আদৌ মধুর ছিল না—এ সত্য কাজে লাগিয়ে কোন সাহিত্যিক যদি নিউটনের জীবনে এ ঘটনা আরোপ করেন তাহলে সে-লেখার সাহিত্য মূল্য খর্ব হবে না। দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহান' ইতিহাসের সাজাহান নন। তাতে দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যকর্মের মর্যাদাহানি হয় নি। কিন্তু প্রমাদ ঘটবে তখনই যখন কোন ঐতিহাসিক ইতিহাসের সাজাহানের খোঁজে দ্বিজেন্দ্রলালের দরজায় যাবেন। একই রকম প্রমাদ ঘটবে যদি নিউটনের জীবন নিয়ে লেখা কোন সাহিত্যকর্মের সাক্ষ্য টেনে আমরা নিউটনের জীবনের কোন ঘটনার সত্যাসত্য বিচার করি।

নিউটন সম্পর্কে একটি কিংবদন্তী চালু আছে। তিনি নাকি সৌভাগ্যক্রমে একটি আপেল পড়তে দেখেছিলেন। আর তা দেখেই তিনি আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন মহাকর্ষ সূত্র। এই কিংবদন্তীর সূত্র ধরে আমাদের দেশের অনেক বিজ্ঞানীর মনে এ বিশ্বাস শিকড় গেড়ে বসেছে যে, পতনশীল ঐ আপেলটি যদি নিউটনের চোখ এড়িয়ে যেতো তাহলে নিউটন মহাকর্ষ সূত্র আবিষ্কার করতে পারতেন না। কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানের অগ্রগতির ইতিহাস যাঁরা জানেন তাঁরাই স্বীকার করবেন যে, মহাকর্ষ সূত্র আবিষ্কার কোন তাৎক্ষণিক ব্যাপার নয়। এ আবিষ্কারের প্রেক্ষাপট তৈরি করে গিয়েছিলেন টাইকো ব্রাহে, কেপলার। ঐ প্রেক্ষাপট না থাকলে ঐ আপেলটা আর পাঁচটা আপেলের মতোই কেবল খাদ্যবস্তু থেকে যেতো। আপেলের পতন দেখে নিউটন মহাকর্ষ সূত্র আবিষ্কার করেন নি, চাঁদকে পতনশীল বস্তু হিসেবে সনাক্ত করতে পেরেছিলেন বলেই তিনি মহাকর্ষ সূত্র আবিষ্কারে সক্ষম হয়েছিলেন। মহাকর্ষ সূত্র আবিষ্কারের ইতিহাস যাঁরা জানেন তাঁরা এও জানেন যে, নিউটন যে-সময় মহাকর্ষ সূত্রের ধারণা পান সে-সময় পৃথিবীর ব্যাসার্ধের মান নির্ভুলভাবে জানা ছিল না বলে তিনি তাঁর আবিষ্কৃত গাণিতিক সূত্রের সাহায্যে চাঁদের গতির সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারছিলেন না, কিছুটা ত্রুটি থেকে যাচ্ছিল। এ ত্রুটি লক্ষ্য করেই নিউটন মহাকর্ষ সূত্র আবিষ্কারের পরও বহুকাল তা প্রচার করেন নি। এর পরও কি কোন সচেতন বিজ্ঞান-লেখক বলবেন যে, নিউটনের চোখের সামনে দৈবাৎ আপেলটা পড়েছিল বলেই তিনি মহাকর্ষ সূত্রটি আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন?

বিজ্ঞান-লেখকদের বিজ্ঞান জানা চাই, বিজ্ঞানের অন্তর্দৃষ্টি থাকা চাই। সেই সঙ্গে সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষমতাও থাকা চাই। এ মণি-কাঞ্চন যোগ দুর্লভ। তাই আমাদের দেশে বিজ্ঞান নিয়ে দু'জাতের লেখা হচ্ছে—এক জাতের লেখায় থাকে নিরেট বিজ্ঞান; আর এক জাতের লেখায় থাকে 'অলীক বিজ্ঞান'। যাঁরা বিজ্ঞান জানেন কিন্তু ভাষা জানেন না তাঁরা লিখছেন প্রথম জাতের লেখা, আর যাঁরা ভাষা জানেন কিন্তু বিজ্ঞান জানেন না তাঁরা লিখছেন দ্বিতীয় জাতের লেখা। সাধারণের জন্য বিজ্ঞান লিখতে হলে আলোচ্য বিষয়বস্তু সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা যেমন দরকার তেমনি দরকার সে-ধারণাকে প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশ করা। তা না হলে বিজ্ঞান চিরকাল পাণ্ডিত্যের বিষয়ই থেকে যাবে, আনন্দের বিষয় হৃদয়ের বিষয় হয়ে উঠতে পারবে না। বিজ্ঞান ও সাহিত্যের মিলনেই বিজ্ঞান-সাহিত্য রচিত হতে পারে। লেখকের মনের মধ্যে মিলন না ঘটলে লেখার মধ্যে সে-মিলন ঘটে না। যে-সব লেখকের মন সেভাবে পরিশীলিত নয় তাঁরা যদি সচেতন ভাবে বিজ্ঞান নিয়ে 'সাহিত্য' করতে যান তাহলে অনিবার্যভাবেই বিজ্ঞানের ইতিহাসে 'আপেল'-এর গুরুত্ব বাড়ে, মূষিকও পর্বতরূপে দেখা দেয়।

আমাদের দেশে যাঁরা বিজ্ঞানচর্চা করেন ভাষা-চর্চার সুযোগ তাঁরা তেমন পান না, দর্শন-চর্চাও তাঁরা করেন না। কাজেই যাঁরা বিজ্ঞান জানেন তাঁরা নিজ মাতৃভাষাকেও ভাবপ্রকাশের কাজে লাগাতে পারেন না। দর্শন বিজ্ঞানের ছাত্রদের অবশ্য-পাঠ্য। কেননা দর্শন সম্পর্কে ধারণা না থাকলে বিজ্ঞানের দৃষ্টি সম্পূর্ণ হয় না। দর্শনের চোখ দিয়ে বিশ্বকে দেখা যায় সামগ্রিকভাবে; দর্শনহীন বিজ্ঞানের সে-দৃষ্টি নেই। বিজ্ঞান

জগৎকে দেখে খণ্ড খণ্ড করে। এ খণ্ডগুলো যে একই অখণ্ডতার নানান দিক মাত্র—দর্শনের দৃষ্টি না থাকলে সে বোধ জন্মে না। যাঁরা বিজ্ঞানকে এ দৃষ্টিতে দেখতে অক্ষম তাঁরা লিখতে বসে পথ হারিয়ে ফেলেন এবং প্রায়শই এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হন যা বিজ্ঞানসম্মত নয়।

বিজ্ঞানসাহিত্যই বাংলা সাহিত্যের দুর্বলতম শাখা। বাংলা ভাষায় যুগান্তকারী বিজ্ঞানীদের জীবনকথা এবং বিজ্ঞানে তাঁদের অবদানের কথা বড়ো লেখা হয় নি। আমাদের বিজ্ঞান লেখকরা একজন বিজ্ঞানীকেই তাঁদের লেখার বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছেন। অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের জীবনী বেশ কয়েকটি লেখা হয়েছে। তার মধ্যে অধিকাংশই অবশ্য বিদেশী বই-এর সরাসরি অনুবাদ এবং অনেক ক্ষেত্রেই মূল লেখকের কাছে ঋণস্বীকার না করে। অথচ ম্যাক্স প্লাঙ্ক, ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল, টমাস আলভা এডিসন, এক্স-রে আবিষ্কর্তা ভিলহেলম কোনরাদ রন্টগেন, চার্লস ডারউইন, লুই পাস্তুর, ম্যাণ্ডেল—এসব যুগান্তকারী বিজ্ঞানীর জীবন ও বিজ্ঞান-সাধনার উপর লেখা কোন বই বাংলায় নেই। আমি জীবনীভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থের কথা বলছি, ছোটখাটো নিবন্ধের কথা বলছি না। নিউটনের সমগ্র জীবন নিয়েও বাংলায় কোন বই লেখা হয় নি, লেখা হয় নি গ্যালিলিওকে নিয়েও। বিজ্ঞানীদের জীবনের ইতিহাস না জানলে বিজ্ঞানশিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কাজেই, এ বিষয়ে উদ্যোগ না নিলে বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের অপুষ্টি রোগের কোন আরোগ্য নেই।

বিজ্ঞানের দর্শন বা 'ফিলজফি অফ্ সায়েন্স' নিয়ে বাংলায় কিছুমাত্র লেখা হচ্ছে না। রামেন্দ্রসুন্দর এ বিষয়ে যে-পথনির্দেশ করে গেছেন সে-পথে আর কেউ এগোন নি। যে-দেশে বিজ্ঞানীরাও বিজ্ঞানের দর্শন সম্পর্কে উদাসীন সে-দেশে বিজ্ঞান-চেতনা আশা করা, উচ্চমানের বিজ্ঞান-সাহিত্য আশা করা হাস্যকর। বাংলাভাষায় যে সার্থক বিজ্ঞান-সাহিত্য রচিত হচ্ছে না তার অন্যতম কারণও ভাষা এবং দর্শন সম্পর্কে বিজ্ঞান-লিখিয়েদের ঔদাসীন্য।

বাংলাভাষায় বিজ্ঞান-সাহিত্যের মান উন্নত করতে হলে বিজ্ঞানীদের এবং বিজ্ঞানানুরাগীদের 'এগিয়ে আসতে হবে। পরিশ্রম করে ভাষা এবং দর্শন আয়ত্ত করতে হবে।' বিজ্ঞানের পণ্ডিতকে পাণ্ডিত্যের বেদী ছেড়ে নেমে আসতে হবে সাহিত্যের আঙিনায়। তবেই বিজ্ঞান-সাহিত্য ফলবতী হতে পারে। না হলে আমরা বিজ্ঞান-ভিত্তিক রচনায় কেবল নিরেট বিজ্ঞান আর অলীক বিজ্ঞানেরই দেখা পাবো—বিজ্ঞানের প্রকৃত স্বরূপ ধরা পড়বে না পাঠকদের চোখে।

বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের লক্ষ্য

তারকমোহন দাস*

প্রয়াত গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের বাংলায় বিজ্ঞান প্রবন্ধ রচনার মূল বৈশিষ্ট্যই ছিল তিনি নিজের চোখে যা দেখতেন, নিজের কানে যা শুনতেন তা সহজ করে আকর্ষণীয় করে সাধারণের জন্য প্রকাশ করতেন। আমাদের চারিপাশের জগতের মধ্যেই কতো অজানা জিনিষ আছে, কতো বিস্ময় আছে লুকানো, তাঁর তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টির সামনে সহজেই তা ধরা পড়ত, অনবদ্য লেখনীর ভঙ্গীতে ফুটে উঠত তার খুঁটিনাটি বিবরণ।

অজানাকে জানবার আকাঙ্ক্ষা মানুষের এক সহজাত প্রবৃত্তি। শুধু মানুষ নয়, মানুষ থেকে শুরু করে সকল স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যেই একটি কৌতূহলী মনের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়, এটাই তাদের জীবনধারণের অন্যতম হাতিয়ার। এই কৌতূহলের ওপর নির্ভর করেই তারা তাদের নিজস্ব পরিবেশ থেকে নানারকম তথ্য সংগ্রহ করে, সেগুলি বিচার-বিবেচনা করে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। মানুষ আবার এই অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান সযত্নে রেখে দেয় পরবর্তী প্রজন্মের জন্য।

আমাদের পরিচিত জগৎ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান কিন্তু খুব গভীর নয়। ব্যাপকও নয়। আমাদের চেনা পরিবেশের মধ্যেই কতো অচেনা বিষয় রয়েছে, কতো সামান্য বস্তু রয়েছে,—যার মধ্যে খুঁজলে কতো অসামান্য সত্যের সন্ধান মিলতে পারে, সেগুলি খুঁজে বার করবার জন্য গোপাল ভট্টাচার্যের মত একজোড়া অনুসন্ধিৎসু চোখের দরকার, অযথা অতিরঞ্জিত না করে, মিথ্যার ভেজাল না মিশিয়ে ঐগুলি পরিবেশন করলে অবশ্যই তা সমাদৃত হবে। আজ সারা পৃথিবীতে গল্প-উপন্যাসের থেকে এই জাতীয় বিজ্ঞান প্রবন্ধের সমাদর বেড়েছে এবং তার পাঠক সংখ্যাও বাড়ছে দ্রুত হারে। কিন্তু এই ধরনের প্রবন্ধ লিখতে হলে লেখককে প্রচুর পরিশ্রম করতে হবে। চারিদিকে যথেষ্ট ঘোরাঘুরি করতে হবে এবং বিজ্ঞান সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার। শুধু অনুবাদের মাধ্যমে বিজ্ঞানসাহিত্যের পূর্ণতা কোনদিনই আসবে না, মর্যাদাও বাড়বে না—তার নিজস্ব পরিবেশের সঙ্গে সংযোগ শূণ্যতার জন্যই। বিজ্ঞানসাহিত্যকে স্থায়ীভাবে সমৃদ্ধ করতে হলে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী ও মৌলিক গবেষণালব্ধ ও জ্ঞানের সংযোগ দরকার।

*লাইফ সায়েন্স সেন্টার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, 35, বালিগঞ্জ সারকুলার রোড, কলিকাতা-19

দ্বিতীয়তঃ লেখনী যথেষ্ট সরল ও আকর্ষণীয় হওয়া চাই। একটি লাইন পড়বার পর পাঠকের ইচ্ছা হবে পরের লাইনটি পড়বার, যে ইচ্ছা পাঠকের পক্ষে চেপে রাখা সম্ভব নয়। আমার মনে হয় পৃথিবীতে এমন কোন জ্ঞান নেই যা দুর্বোধ্য ও নীরস। যে লেখা আমাদের কাছে দুর্বোধ্য বা নীরস বলে মনে হয় সেটা মূলত লেখকের ত্রুটিই জনাই ঘটে থাকে। বিজ্ঞানের প্রবন্ধ নীরস হবে কেন? বিজ্ঞানের মধ্যে যা বিস্ময় আছে তা মানুষের অতিবড় কল্পনাশক্তিকে হার মানাবার ক্ষমতা রাখে, তা ছাড়া সত্যের প্রতি মানুষের একটা সহজাত আকর্ষণ তো আছেই। বাস্তবিক পক্ষে বিজ্ঞান, কল্পবিজ্ঞানের থেকে অনেক বেশী চিত্তাকর্ষক যদি তা ঠিক মত পরিবেশিত হয়।

তৃতীয়তঃ বিজ্ঞানকে সাধারণের উপযোগী করে পরিবেশন করার মধ্যে একটা সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য আছে,—এই তাৎপর্য হল একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছনর প্রয়াস। বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্য রচনায় যাঁরা আজ নিমগ্ন—বিজ্ঞানকে সহজ করে, আকর্ষণীয় করে পাঠকের কাছে তুলে ধরা ছাড়াও একটি লক্ষ্য তাঁদের সামনে রয়েছে, তা হল পাঠকের মনে বিজ্ঞান মানসিকতা সৃষ্টি করা। আমরা অধিকাংশই বিজ্ঞানের তথ্য আহরণ করি, কিন্তু চিন্তায়, মেজাজে ও কাজে বিজ্ঞানকে গ্রহণ করতে ব্যর্থ হই। একজন সাধারণ শিক্ষিত নাগরিক,—নাইবা থাকল তার বিজ্ঞানের কোন ডিগ্রী, তবু চিন্তা ও জীবনে বিজ্ঞানকে গ্রহণ করতে অসুবিধা কি? তিনি যদি অনুসন্ধিৎসু হন, অন্ধবিশ্বাসী না হন এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান, তবে তাঁর অনুসন্ধান প্রবৃত্তির সঙ্গে সৃজনী শক্তির সংযোগ ঘটলে জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে তিনি সঠিক পথে এগিয়ে যেতে পারবেন। নূতন পথের সন্ধান দিতে পারবেন। এই ধরণের পাঠক তৈরি এবং তার জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করাও বিজ্ঞান লেখকদের চিন্তা-ভাবনায় মধ্যে থাকা উচিত।

আজ আমাদের সমাজ ও পরিবেশের যে সমস্ত সমস্যায় জড়িত হয়ে আমরা অত্যন্ত বিব্রত বোধ করছি তার অধিকাংশই আমাদের নিজেদের হাতের তৈরি—সেগুলি আমাদের উল্টা-পাল্টা চিন্তা-ভাবনা ও কাজকর্মের ফলশ্রুতি। এক সুষ্ঠু ও স্থায়ী সমাধানের জন্য সমাজের প্রত্যেকটি মানুষের সক্রিয় সাহায্য ও সহযোগিতার প্রয়োজন। এই সহযোগিতা আসতে পারে বিজ্ঞান সচেতন, যুক্তিনির্ভর মানুষের কাছ থেকেই।

পৃথিবীতে সবকিছুই চলছে বিজ্ঞানের নিয়মে। প্রকৃতির সবকিছুর মধ্যেই একটি নিয়ম-শৃঙ্খলায় গ্রথিত রয়েছে। পৃথিবীতে আড়াইশো কোটি বছর ধরে জীবন টিকে আছে বিজ্ঞানের কয়েকটি মৌলনীতি কঠোর ভাবে অনুসরণের মাধ্যমেই,—যেমন জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণ, উদ্ভিদ ও প্রাণীর সুষম অনুপাত, জল ও মৌলিক পদার্থের চক্রাকারে পুনঃ পুনঃ ব্যবহার, নূতন নূতন অঞ্চলে বসতিস্থাপন ইত্যাদি। অতীতে কোনো যুগে, কোনো একটি মৌলনীতি পালনে যদি উদ্ভিদ ও প্রাণীরা ব্যর্থ হত, তাহলে পৃথিবীতে জীবনের চিহ্নমাত্র আজ কোথাও খুঁজে পাওয়া যেত না। আমাদের অধিকাংশ সমস্যারই সৃষ্টি হয়েছে ঐগুলি নানা ভাবে লঙ্ঘনের ফলেই। বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়েই অনেক সময় তা ঘটেছে। বিজ্ঞানের অপব্যবহার ঘটেছে সেখানে। আমরা ক্ষণস্থায়ী সুখের বিনিময়ে আমন্ত্রণ জানিয়েছি ভবিষ্যৎ স্থায়ী, অনন্ত দুঃখকে। কিন্তু এসব বোঝবার জন্যও তো উপযুক্ত মানসিকতা বা বিজ্ঞান মনস্কতার প্রয়োজন, প্রকৃতির ছন্দের সঙ্গে জীবনের ছন্দ মিলিয়ে চলবার জন্যও তো প্রস্তুতির প্রয়োজন। বড় ধরনের কোন আবিষ্কারের সাহায্যে নয়,—বিজ্ঞান সচেতন, যুক্তিনির্ভর, সংস্কার বর্জিত জনসাধারণের সমবেত প্রয়াস ও সহযোগিতার মাধ্যমেই সমাজের মূল সমস্যাগুলির সুষ্ঠু ও স্থায়ী সমাধান, খুঁজে পাওয়া সম্ভব। বিজ্ঞান লেখকদের সামনে এটি একটি চ্যালেঞ্জ হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে, এই সম্ভাবনাকে ফলপ্রসূ করবার জন্য বিজ্ঞান লেখকরাই সব থেকে বেশী সাহায্য করতে পারেন।

বিজ্ঞান সমাজের কঠোর নিগড় ভেঙেচুরে তাকে আপন ঔজ্জ্বল্যে ভাস্বর করে তোলবার ক্ষমতা রাখে। আমাদের দেশে এতো কুসংস্কার, এতো জাতিভেদ, বর্ণভেদ, ধর্ম নিয়ে এতো উন্মত্ত হানাহানি। এগুলি আসলে কতো যে অসার, কতো মিথ্যা, কতো ক্ষতিকর তা মানুষ আপনিই বুঝতে পারবে যদি সে সংস্কারমুক্ত প্রকৃত বিজ্ঞান মানসিকতার অধিকারী হয়; চিন্তায়, মেজাজে, কাজে বিজ্ঞানকে গ্রহণ করতে পারে। এই বিজ্ঞান মানসিকতা সৃষ্টির পেছনে বিজ্ঞান-লেখকদের একটা বড় রকম ভূমিকা আছে সেটা বিজ্ঞান লেখকদের স্মরণ রাখা দরকার।

"মানুষ নির্মাণ করে প্রয়োজনে, সৃষ্টি করে আনন্দে। তাই ভাষার কাজে মানুষের দুটো বিভাগ আছে—একটা তার গরজের, আর একটা তার খুশির, তার খেয়ালের, আশ্চর্যের কথা এই যে, ভাষার জগতে এই খুশির এলেকার মানুষের যত সম্পদ সযত্নে সঞ্চিত এমন আর কোন অংশে নয়। এইখানে মানুষ সৃষ্টিকর্তার গৌরব অনুভব করেছে, সে পেয়েছে দেবতার আসন।"

—রবীন্দ্রনাথ

চিকিৎসা-বিষয়ক রচনার প্রয়াসে প্রায় পঞ্চাশ বছরের অভিজ্ঞতা

রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল*

প্রায় একশতাব্দী আগে আই, সি, এস্ পরীক্ষায় সফল হওয়ার পর সদ্যঃ বিলেত-প্রত্যাগত রমেশচন্দ্র দত্ত মশাই সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বাঙলা ভাষায় রচনা-সম্বন্ধে তাঁর উপদেশ চাইলে তিনি বলেন "যদি মাতৃভাষাকে ভালবাসেন তাহা হইলে আপনার মত ব্যবস্থিতচিত্ত শিক্ষিত যুবক যাহা লিখিবেন, তাহাই একদিন সাহিত্য বলিয়া পরিগণিত হইবে।" বলা বাহুল্য রমেশচন্দ্রের ক্ষেত্রে একদিন এ অমূল্য উপদেশটি অক্ষরে অক্ষরে সফল হয়ে উঠেছিল, যার ফলে বাঙলা সাহিত্যে আমরা ছ'খানা প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস পেয়েছি এবং ঐ সঙ্গে আরো পেয়েছি ভারতবর্ষের ইতিহাস এবং ঋগ্বেদের বহুমূল্য অনুবাদ।

বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুও বলতেন "যদি বাঙলাভাষা ভাল করে জানা থাকে এবং বিষয়বস্তু সম্বন্ধে (সে বিজ্ঞানই হোক, আর দর্শনই হোক) সুস্পষ্ট ধারণা থাকে ও জ্ঞান থাকে তাহলে মাতৃভাষায় রচনা মোটেই দুরূহ কাজ নয়।" তাঁর এ মন্তব্যের সঙ্গে আমিও সম্পূর্ণ একমত। আমাদের প্রিয় "জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার সম্পাদনা-সচিব মশাইর অনুরোধ-ক্রমে তাই বাঙলাভাষায় বিজ্ঞান লেখক হিসেবে আমার দীর্ঘকালের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে আজ লিখতে বসেছি ; আত্মপ্রচারণার জন্য নয় স্মৃতিচারণও আমাদের নিজস্ব ধ্যান-ধারণা হিসেবেই সহৃদয় পাঠক-পাঠিকারা এটিকে গ্রহণ করবেন বলে আশা করি।

1920 খৃস্টাব্দে কলেজ ম্যাগাজিনে গুটি কয়েক গল্প এবং 1921-22 খৃস্টাব্দে বহুবর্ষ আগে লুপ্ত প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকা "ভারতী"তে পারুলকুমার ছদ্মনামে লেখা গোটাদুই প্রবন্ধ লেখার প্রচেষ্টাই আমার বাংলা-সাহিত্যের জগতে প্রথম অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছিল। তখন সবে মাত্র বিজ্ঞানের বিরাট জগতে প্রবেশ করেছি কিন্তু মনে এক দারুণ অনুসন্ধিৎসা কেন মাতৃভাষায় আমরা বিজ্ঞান-শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছিনে ? মেডিক্যাল কলেজের পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীতে (1925) ধাত্রী ও স্ত্রীরোগ-বিদ্যার অধ্যাপক গ্রীন আর্মিটেজ ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল গেজেটে শিশুদের যকৃতের তন্তুময় বিকৃতি (Infantile cirrhosis of liver) সম্বন্ধে সদ্যঃ প্রকাশিত গবেষণা-প্রবন্ধের উল্লেখ করে বললেন "আমি চাই এদেশের প্রত্যেকটি শিশুর মায়ের কাছে প্রচারিত হোক এর বিষয়বস্তু, কিন্তু এ দেশে কি তা সম্ভবপর ?"

"কেন হবে না ?" আচমকা আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়লো। এ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত জবাব তিনি বললেন "আচ্ছা, চেষ্টা করে দেখো"।

পরদিনই ঐ প্রবন্ধটি দেখে এবং বারবার পড়ে মনে হল, একজন খাঁটি ইংরেজ অধ্যাপকের লেখা চিকিৎসা-সম্পর্কিত গবেষণামূলক প্রবন্ধের অনুবাদ মোটেই সহজসাধ্য নয়। তবু আমাকে আত্মসম্মান রক্ষার জন্যেও চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতেই হবে। কয়েকদিন ধরে বার বার পড়ে প্রবন্ধটি অনুধাবন করার চেষ্টা করলাম, তারপর বসলাম রাজশেখর বসু মশাইর চলন্তিকা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কৃত সদ্যঃ প্রস্তুত পরিভাষার তালিকা ও কাগজকলম নিয়ে।

শ্রমসাধ্য বহু অনুসন্ধানের পরও দু'চারটি বাংলা ডাক্তারি শব্দ ছাড়া অসংখ্য শব্দেরই কোন বাংলায় প্রতিশব্দ পাওয়া গেল না। তাই বহুস্থলেই নতুন নতুন বাংলা প্রতিশব্দ সংস্কৃত মূল থেকে তদ্ভব এবং তৎসম, ণিজান্ত যঙন্ত ইত্যাদি প্রয়োগে, অনেক সময়ে শব্দের পরিবর্তে ভাবার্থ (বন্ধনীর মধ্যে আসল ইংরেজী শব্দসহ) লিখে অতি শম্বুকগতিতে চললো ভাষান্তরের কাজ। প্রথমদিনে মাত্র এক পৃষ্ঠা, দ্বিতীয় দিনে দু'পৃষ্ঠা, এমনি করে প্রায় দু'সপ্তাহে অনুবাদের কাজ শেষ হল। তার পরে পরিষ্কার ভাবে লিখে একদিন দুরু দুরু বুকে, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে 'ভারতবর্ষ' অফিসে সম্পাদক শ্রদ্ধেয় জলধর সেন মশাইর সঙ্গে দেখা করে, তাঁর হাতে দিলুম লেখাটি। তিনি একবার আগাগোড়া চোখ বুলিয়ে বললেন, "কঠিন ডাক্তারী বিষয়। তুমি অনুবাদ করেছ ?' আমি বললুম, "আজ্ঞে, হাঁ।' তিনি হেসে বললেন "আমি ত ডাক্তার নই, একজন ভালো ডাক্তারকে দেখিয়ে নিতে হবে, তিনি অনুমোদন করলেই প্রকাশ করা হবে।' প্রণাম করে বেরিয়ে এলুম শঙ্কিত চিত্তে, জানি না কী হবে এই ভেবে। কারণ তখনো বাংলাভাষায় বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশের মাধ্যম একরকম ছিল না বললেই হয়। পরের মাসেই অবাক হলেও আনন্দিত চিত্তে দেখতে পেলুম প্রবন্ধটি ভারতবর্ষের মত প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকায় স্থান পেয়েছে। সেই অনুবাদ দিয়েই বিজ্ঞান বিষয়ে বাংলায় কিছু লেখার আমার হাতেখড়ি। নিজের অধ্যাপক ও সতীর্থদের কাছে প্রশংসা পেয়ে আমার দুঃসাহস বেড়ে গেল এবং পরবর্তী কালে মাঝে মাঝে ভারতবর্ষ, স্বাস্থ্য-সমাচার, মাতৃমঙ্গল প্রভৃতি পত্রিকায় আমার চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ বেরুতে লাগলো, আগের মত হাটি-হাটি-পা-পা করে নয়। অনেকটা কম আয়াসে এবং কতকটা সাবলীল ভাবে।

এর পরে এলো আমার জীবনে 1942 খৃস্টাব্দের একটি স্মরণীয় ঘটনা। আমার অতি শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র মহলানবীশের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, স্নাতকোত্তর শারীরবিদ্যা বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের পদ থেকে বিদায় সম্বর্ধনায় সভা ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে। তিনি তাঁর অভিভাষণে বললেন "বাঙলাভাষায় স্নাতকোত্তর শারীরবিদ্যাবিষয়ে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক একখানি প্রামাণ্য পুস্তক রচনা করে দিন,

*5/4, বালিগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা-700019

আমি তাঁকে অবসর গ্রহণের মুহূর্তে এ সনির্বন্ধ অনুরোধটি জানাই। অধ্যাপক মহলানবিশ জবাব দিতে গিয়ে, ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর, অদূরবর্তী আমাকে কাছে ডেকে এনে বললেন "অনুরোধটি আমি গ্রহণ করিলাম, কিন্তু আমার হয়ে এ কাজের ভার দিলাম আমার এই প্রিয় ছাত্রটির উপর।" ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের প্রশ্ন "উনি কি পারবেন?" আমি নত মস্তকে অধ্যাপকের পায়ের ধূলি মাথায় নিয়ে বললাম "আপনার আশীর্বাদে, আমি নিশ্চই আপনার আদেশ পালন কোরব। কত বড় দুরূহ কাজের ভার নিলাম, তখনো সম্যক্ বুঝতে পারিনি। পারলাম গৃহে ফিরে এসে, কিন্তু তখন আর প্রত্যাবর্তনের কোন পথ নেই। লেখার বিষয়-সম্বন্ধে আমার কোন চিন্তার কারণ নেই, দুশ্চিন্তা পরিভাষার অভাবে এবং বাধাবিপত্তি নতুন নতুন প্রতিশব্দ আহরণে কিংবা রচনায়। লেখা আরম্ভ করে যখনই কোথাও আটকে পড়তাম কিংবা খটকা লাগতো, ছুটে চলে যেতাম পিতৃতুল্য রাজশেখর বসু মশাইর কাছে উপযুক্ত নির্দেশের জন্য। তাঁর অমূল্য উপদেশ ছাড়া কখনই আমার পক্ষে প্রতিজ্ঞাপালন অর্থাৎ বাঙলাভাষায় "শারীরবিদ্যা" লেখার কাজ সম্পূর্ণ করা সম্ভবপর হত না। ইংরেজী 'genu'র পরিবর্তে বাঙলা জানু, ইংরেজী 'uncus'-এর পরিবর্তে বাঙলা অঙ্কুশ প্রভৃতি তাঁর নিকট হতেই পাওয়া সমশাব্দিক অথচ সমার্থক উপযুক্ত পরিভাষা। এমনি আরো অসংখ্য যথাযথ প্রতিশব্দের জন্য আমি তাঁর কাছে চিরঋণী।

তারপর 1948 খৃস্টাব্দে আচার্য বসু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হল বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ। তাঁর উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিলুম আমরা একদল বিজ্ঞান-সাহিত্যপ্রেমী। তিনিই হলেন আমাদের অতি ভাস্বর মধ্যমণি এবং তাঁরই নির্দেশে আমাদের কয়েক জনকে লিখতে হল একখানা করে সহজবোধ্য বাঙলাভাষায় বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় বই। তারই ফলে বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত হল আমার 'হর্মোন বা উত্তেজক রস'-নামক ছোট পুস্তিকাখানি। বছর দুই যেতে না যেতে তার দ্বিতীয় সংস্করণও প্রকাশিত হল। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রচুর চাহিদা সত্ত্বেও, জানি না কেন ঈপ্সিত পরবর্তী সংস্করণ প্রকাশের কাজ বহু বছর ধরে হিমঘরে চাপা পড়ে আছে।

বিজ্ঞান-বিষয়ে কিছু লিখতে বা বলতে যাওয়ার পথে উপযুক্ত পরিভাষার অভাব নিশ্চয়ই একটি অন্তরায়। আমার মনে হয় যে কোন ভাষায় যে সকল প্রতিশব্দ আগেই প্রচলিত আছে সহজবোধ্য ভাবে, সেগুলি অনায়াসে ব্যবহার করা যেতে পারে। অন্যান্য আন্তর্জাতিক শব্দের উদ্ভট কিংবা দুর্বোধ্য প্রতিশব্দের সৃষ্টির চেষ্টা না করে সার্বজনীন আন্তর্জাতিক শব্দই তেমনটি রেখে দেওয়াই উচিত। দৃষ্টান্তস্থলে গন্ধক, তামা, সীসে, পারদ, রূপো, সোনা, দস্তা প্রভৃতি ছাড়া অন্য সব মৌল পদার্থের আন্তর্জাতিক নাম বাঙলায় এবং ঐ সঙ্গে বন্ধনীর মধ্যে ইংরেজী নামও লেখা যায়। উদ্‌জান, অম্লজান, যবক্ষারজান প্রভৃতি অপ্রচলিত পরিভাষার পরিবর্তে যথাক্রমে হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি বললে বর্তমানে সবাই বেশ বুঝতে পারে। এক সময়ে ভাইটামিনের পরিবর্তে খাদ্যপ্রাণ, সেলের পরিবর্তে কোষ, গ্ল্যাণ্ডের পরিবর্তে গ্রন্থি, নিউক্লিয়াসের বিকল্প কেন্দ্রীন, প্রোটিন বুঝাতে আমিষ এবং এনজাইমের বদলে কিণ্ব পদার্থ, নার্ভের প্রতিশব্দ স্নায়ু, থাইরয়েড, প্যারাথাইরয়েড, অ্যাড্রিন্যাল গ্ল্যাণ্ড প্রভৃতির পরিবর্তে যথাক্রমে গলগ্রন্থি, উপগলগ্রন্থি, কটিগ্রন্থি প্রভৃতি ব্যবহৃত হত। আমার মতে ঐ সকল আন্তর্জাতিক শব্দ বাঙলা ভাষায়ও চালু করা উচিত। ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে অনেক বিদেশী শব্দ যেমন চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ, ব্ল্যাক বোর্ড, ট্রেন, এরোপ্লেন, স্টীমার, রেডিও, টেলিভিশন (T.V), সিনেমা, বায়োস্কোপ, টিকেট, বোর্ডিং হাউস, হোটেল প্রভৃতি বাংলাভাষায় আত্তীকরণের ফলে তাকে সমৃদ্ধ করেছে, তেমনি কিছুকাল ধরে ঐ সকল বিজ্ঞান-বিষয়ক আন্তর্জাতিক শব্দ ব্যবহৃত হতে থাকলে তারা নিশ্চয়ই বাঙলাভাষার অন্তর্গত হয়ে যাবে বেমালুম ভাবে। রুশ, জার্মান, স্পেনীশ, ফরাসী, জাপানী প্রভৃতি ভাষাভাষীরা ঐ গুলিকে নিজস্ব করে নিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত কিংবা লজ্জিত হয়নি। এ ভাবে অন্যান্য ভাষার শব্দের আত্তীকরণের ক্ষমতা জীবন্ত ভাষারই পরিচায়ক।

সংস্কৃত ভাষায় যেমন অব্যয় ধাতু কিংবা বিশেষ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ভিন্নার্থের সৃষ্টি করে তেমনি অন্যান্য ভাষায়ও প্রাক্ কিংবা অন্তে ব্যবহৃত হয়ে শব্দের অন্যার্থ বুঝায়। কোন কোন ক্ষেত্রে ঐ ভাবে আগে কিংবা পরে বাংলা অব্যয় যোগ করে ভিন্ন ভিন্ন আন্তর্জাতিক শব্দও সৃষ্টি করা যেতে পারে, যেমন উপথাইরয়েড (parathyroid), অণু-নিউক্লিয়াস্ (nucleolus, পরাসমব্যথী (parasympathetic) প্রভৃতি।

দেহের অংশগুলির মধ্যে মস্তিষ্ক, সুষুম্নাকাণ্ড, ফুসফুস, পাকস্থলী, গ্রহণী, অগ্ন্যাশয়, অন্ত্র, যকৃৎ, প্লীহা, পিত্তাশয়, বৃক্ক, মূত্রাশয়, জরায়ু প্রভৃতি প্রচলিত বাংলা নাম ব্যবহৃত হলেও heart এর প্রতিশব্দ হৃৎপিণ্ড বা হৃদয় নয় হৃদ্‌যন্ত্র, Testis অর্থে পুংগ্ল্যাণ্ড, Sperm অর্থে শুক্রকীট, Ovary অর্থে স্ত্রীগ্ল্যাণ্ড, Ovum অর্থে স্ত্রীবীজ ইত্যাদির ব্যবহারই সমীচীন। অন্তে "tion" যুক্ত ক্রিয়াগুলির পরিভাষা ক্রিয়া হতে 'অন্' সহযোগে বিশেষ্য-সৃষ্টি করেই পরিভাষা তৈরি হয়, যেমন respiration অর্থে শ্বসন, circulation অর্থে রক্ত-সংবহন, secretion অর্থে, ক্ষরণ, excretion অর্থে রেচন, reproduction অর্থে প্রজনন, absorption অর্থে আশোষণ, assimilation অর্থে আত্তীকরণ, saponification অর্থে সাবানীভবন, reduction অর্থে বিজারণ, এমনি অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বাংলাভাষায় সংস্কৃতানুগ বহু রোগের নাম প্রচলিত আছে, যেমন—মধুমেহ, যক্ষ্মা, কুষ্ঠব্যাধি, কামলা বা ন্যাবা রোগ, কর্কট রোগ, বাতব্যাধি, চোখের ছানি, ধনুষ্টঙ্কার, জলাতঙ্ক, উদরী, পিত্তশূল, শূলব্যাথা, বাত, গেঁটেবাত, ধ্বজ-

ভঙ্গ, বাগী, ভগন্দর, উপদংশ, প্রমেহ প্রভৃতি। কিন্তু সাধারণ কতকগুলি ব্যাধি যেমন সান্নিপাতিক জ্বরের পরিবর্তে টাইফয়েড, ফুসফুসের প্রদাহের পরিবর্তে নিউমোনিয়া, মধুমেহের পরিবর্তে ডায়াবিটিস্, পাকস্থলীর ক্ষতের পরিবর্তে গ্যাস্ট্রীক আল্‌সার, পোতার পরিবর্তে হাইড্রোসিল প্রভৃতি অবাধে সর্বজনবোধ্য বলে বাংলাভাষায় ব্যবহৃত হচ্ছে। চিকিৎসা শাস্ত্রের অন্তর্গত অন্যান্য অসংখ্য রোগের পরিভাষা তৈরি করা দুরূহ বলে ইংরেজী নাম ব্যবহারে কোন আপত্তি থাকতে পারে না। কিন্তু ইংরেজীতে 'itis' যুক্ত অনেকগুলি রোগ আছে সংশ্লিষ্ট দেহাংশের সঙ্গে প্রদাহ যুক্ত করে রোগের নাম করা যেতে পারে, যেমন যকৃৎ-প্রদাহ (hepatitis), বৃক্ক-প্রদাহ (nephritis), অস্থিসহ মজ্জার প্রদাহ (osteo-myelitis), অগ্ন্যাশয়-প্রদাহ (pancreatitis), মূত্রাশয়-প্রদাহ (cystitis), পিত্তাশয়-প্রদাহ (cholecystitis), মস্তিষ্কের আবরণের প্রদাহ, (meningitis) প্রভৃতি। একই ভাবে "osis"-যুক্ত ইংরেজী রোগগুলি-বিকৃতি যুক্ত ভাবে বাংলায় নামকরণ করা যেতে পারে, যেমন যকৃৎ-বিকৃতি (cirrhosis), মেরুদণ্ডের অস্থি বেঁকে যাওয়া scoliosis, kyphosis ইত্যাদি), কয়লা-গুঁড়ো পাথরের ধূলিকণা কিংবা তুলোর আঁশঘটিত ফুসফুসের বিকৃতি যথাক্রমে, anthracosis, silicosis, এবং Byssinosis প্রভৃতি তন্তুময় বিকৃতি (fibrosis) ইত্যাদি। "mia" যুক্ত রক্তরোগ সমূহ যেমন anemia, pernicious anemia, leukaemia, polycythaemia প্রভৃতি বোঝাতে যথাক্রমে রক্ত শূন্যতা, দূষিত রক্ত-শূন্যতা, অপরিণত শ্বেত-কণিকা-বৃদ্ধি, লোহিত কণিকার অস্বাভাবিকবৃদ্ধি নামে অভিহিত করার চেষ্টা হয়। অবশ্য চক্ষুরোগ (opthalmia), জীবাণুদূষিত রক্তরোগ (septicaemia) এরকম দু' চারটি নাম এর ব্যতিক্রম। 'ia' যুক্ত মনোরোগগুলি যেমন mania অর্থে বাতিক ছাড়া অন্যান্য রোগগুলি যেমন schizophrenia', 'hysteria' প্রভৃতির পরিভাষা তৈরির চেষ্টা না করাই ভালো। মনোরোগ নয়, এমনি জীবাণুঘটিত রোগ "diphtheria'ও এ পর্যায়েই পড়ে।

চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় কিংবা সম্পর্কিত বিষয়ে লিখতে গিয়ে আমি যে সকল বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হয়েছি এবং যেভাবে কখনো নিজেই কিংবা অন্যের সাহায্য নিয়ে তা অতিক্রম করেছি তারই একটা মোটামুটি বিবরণ এ প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করার প্রয়াস পেয়েছি। কিন্তু আমার কথাই যে এ বিষয়ে শেষ কথা, এরূপ কখনো আমি মনে করি না। আমার মত আরো অনেকেই এ সম্বন্ধে ভাবছেন ও লিখছেন। আমার মনে হয়, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ যদি এ সম্বন্ধে আলোচনার জন্যে একটি ছোট কমিটি করে কোন সর্বজন গ্রাহ্য সিদ্ধান্তে আসেন, তাহলে একটা কাজের কাজ হয়। আশা করি বিজ্ঞান পরিষদ আমার প্রস্তাবটি বিবেচনা করে যথাযথ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

"সত্যকে ক্রমাগত হাতুড়িপেটা করে যেতে হবে তবেই সত্য একদিন সত্যসত্যই অন্তঃকরণে অনুপ্রবিষ্ট হবে"

—গেটে।

কবি ও বিজ্ঞানী উভয়েরই লক্ষ্য এক ; যদিও পন্থা ভিন্ন। উভয়েই চায় অজানাকে জানতে। কবির সন্ধানের ক্ষেত্র ভাবলোক, বিজ্ঞানীর কর্মক্ষেত্র বাস্তবরাজ্য—জড়জগৎ। কবি চান—অরূপকে রূপ দিতে, অব্যক্তকে ব্যক্ত করতে—তাঁর ভাষায়, ছন্দে ও সুরে। আর বিজ্ঞানী রূপকে বিশ্লেষণ করে খোঁজেন অরূপের সন্ধান ; ব্যক্তকে পরীক্ষা করে জানতে চান তার অন্তরালে অব্যক্তের ঠিকানা। এই কারণেই কবি ও বিজ্ঞানীর মধ্যে যোগাযোগ"—প্রিয়দারঞ্জন রায় (জ্ঞান ও বিজ্ঞান, 1961—মে,)

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চা প্রসঙ্গে

অনাদিনাথ দাঁ*

মাতৃভাষা যে শিক্ষার মাধ্যম হওয়া উচিত, একথা আজ সকলেই স্বীকার করেন। বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রেও কথাটি সমানভাবে প্রযোজ্য। এই কারণেই শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চা ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত মাতৃভাষায় বিজ্ঞান-শিক্ষার্থীদের পথে একটি প্রধান অন্তরায় উপযুক্ত গ্রন্থ বা বিজ্ঞান-সাহিত্যের অভাব। উচ্চ শিক্ষাস্তরে এই অভাব বিশেষভাবে অনুভব করা যায়। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্যদ এই কাজে ব্রতী হয়েছেন। আশা করব তাঁদের এই প্রচেষ্টা ব্যাপকতর হবে।

আজকের যুগে শিক্ষালাভ কেবল যে স্কুল-কলেজের মাধ্যমেই করা যায়, তা নয়। বস্তুত, আমাদের মত দেশে, "নন-ফরমাল" অর্থাৎ প্রথা-বহির্ভূত শিক্ষাব্যবস্থার সাহায্য না নিয়ে জনসাধারণের এক বিরাট অংশকে শিক্ষিত করে তোলার চেষ্টা প্রায় অসম্ভব বললেই চলে। এই ধরণের শিক্ষার্থীদের যে বিশেষ ধরনের বই প্রয়োজন, আমাদের দেশে তারও একান্ত অভাব রয়েছে, বিশেষত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে। অর্থাৎ, যাঁরা স্কুল-কলেজে যোগদান না করেও বিজ্ঞান-শিক্ষার ভিত সুদৃঢ় করতে চান, তাঁদের উপযুক্ত বিজ্ঞান বিষয়ক বই যাতে লেখা ও প্রকাশিত হয়, সে বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, এই বইগুলি বর্তমানে বাজারে বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে জনপ্রিয় যেসব বই পাওয়া যায়, তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের।

আরো এক ধরনের বই-এর অভাবের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। আজকের এই বিজ্ঞানের যুগে বিজ্ঞান ও ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগে শিল্পের নতুন নতুন সম্ভাবনার নানা দিক দেখা দিয়েছে। ইলেকট্রনিকস শিল্প এর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই শিল্পে মূলধন লাগে কম—বেশি লাগে হাতের কাজের দক্ষতা ও ইলেকট্রনিক সার্কিট বা বর্তনী সম্বন্ধে উপযুক্ত জ্ঞান। এছাড়া, আরো নানা শিল্প আছে যেখানে কারিগরী দক্ষতার সঙ্গে কিছুটা তত্ত্বগত জ্ঞানের সংমিশ্রণ ঘটাতে পারলে মানুষকে স্বনির্ভর করার পথে অনেক তাড়াতাড়ি, অনেক দূর এগিয়ে দেওয়া যায়। এই সব বিষয়ে কিন্তু আমাদের দেশে উপযুক্ত বই-এর যথেষ্ট অভাব রয়েছে।

আগেই বলেছি, জনসাধারণের বোধগম্য বেশ কিছু বিজ্ঞান বিষয়ক বই কিছুদিন যাবৎ প্রকাশিত হচ্ছে। জনসমাজে বিজ্ঞানের কথা বাংলায় প্রচার করতে হলে তার ভাষা ও প্রকাশভঙ্গী কি রকম হবে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশ্বপরিচয় গ্রন্থে তার বিশেষ নিদর্শন রেখে গেছেন। বিজ্ঞানের তথ্যগুলির এরকম সরল, সুন্দর, সরস ও মনোজ্ঞ বর্ণনা কেবল বাংলা সাহিত্যে কেন, পৃথিবীর অন্য কোন ভাষাতেও সহজে মেলা দুষ্কর।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন। বিজ্ঞানকে জনসাধারণের বোধগম্য করতে হলে ভাষা অবশ্যই সরল করতে হবে, কিন্তু রচনার মধ্যে বিষয়বস্তুর দৈন্য থাকলে চলবে না। সরলীকরণের তাগিদে তত্ত্বের যাথার্থ্য যথাযথ ভাবে প্রকাশ করবার কাজে অল্পমাত্র স্খলনও বাঞ্ছনীয় নয়। স্খলন যে ইচ্ছাকৃত ভাবে হয়, তা নয়। আসলে যেসব শব্দ ব্যবহার করা হয়, তার প্রকৃত অর্থ যাচাই করে তবে লেখায় ব্যবহার করা উচিত।

উপমা ব্যবহারেও সতর্ক হওয়া বিশেষ প্রয়োজন, নচেৎ কোন বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে পাঠকের মনে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হতে পারে। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে—কঠিন পদার্থে তাপ প্রয়োগ করলে ইলেকট্রন নিঃসৃত হয়, এ আমরা জানি। এই বিষয়টি সহজবোধ্য করার জন্য লেখা হল, জলে তাপ প্রয়োগ করলে যেমন বাষ্প নিঃসৃত হয়, এ ব্যাপারটি তার সঙ্গে তুলনীয়। এই উপমা প্রয়োগটি কিন্তু ঠিক হল না। কেননা জল থেকে বাষ্প নিঃসরণ পদার্থের অবস্থার রূপান্তর বোঝায়, পদার্থ থেকে ইলেকট্রন নিঃসৃত হওয়ার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের।

বিজ্ঞান-সংক্রান্ত রচনা প্রণয়নে পরিভাষার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। বিশেষত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার যে সব শাখা সম্প্রতি প্রসার লাভ করছে, তার জন্য নিত্য-নতুন শব্দের উপযুক্ত পরিভাষার অভাব বিজ্ঞান-লেখকরা খুবই অনুভব করে থাকেন। সময়ে পুরানো পরিভাষার পরিবর্তনও প্রয়োজন হতে পারে। সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহলে এই বিষয়টি নিয়ে সম্যক আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়। পত্র-পত্রিকাগুলিও এই বিষয়ে বিশেষ ভূমিকা নিতে পারেন। তাদের মাধ্যমে নতুন পরিভাষা সম্পর্কে পাঠক ও লেখকদের মত আহ্বান করা যেতে পারে এবং সেই সব মত বিবেচনা করে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের মত প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বে আমরা উপযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য পরিভাষা বেছে নিতে পারি।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা উল্লেখযোগ্য। আধুনিক বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটেছে পাশ্চাত্যে এবং স্বভাবতই বিজ্ঞান-সংক্রান্ত তত্ত্ব, তথ্য ও ভাবের প্রকাশ ঘটেছে বিদেশী ভাষায়। বাংলা বা অন্য কোন ভাষায় আক্ষরিক প্রতিশব্দ বা কেবল পরিভাষার সাহায্যে যে সেই ভাব পুরোপুরি ব্যক্ত করা সম্ভব নয়—বিজ্ঞান লেখক মাত্রেরই কম বেশি সেই অভিজ্ঞতা আছে। এই অসুবিধা দূর করার জন্য ভাষা তত্ত্ববিদদের সাহায্য নিয়ে উপযুক্ত শব্দ বিশেষ করে ক্রিয়াপদ চয়ন করা বিশেষ প্রয়োজন। ইংরাজীর মাধ্যমে যাঁরা বিজ্ঞান শিক্ষালাভ করেছেন, এ অসুবিধা তাঁদেরই বেশি হয়। যাঁরা বাংলাভাষায় বিজ্ঞান

* ইনস্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-700009

শিক্ষালাভ করেছেন—তাঁদের পক্ষে বাংলায় বিজ্ঞান বিষয়ে লেখা সহজতর হবে বলে মনে হয়।

বিজ্ঞান-বিষয়ক বই-এর পাঠক যে শ্রেণীর, সাময়িক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞান-বিষয়ক রচনার পাঠক কিছুটা ভিন্ন শ্রেণীর। সাময়িক পত্রিকার পাঠকের সংখ্যা নিঃসন্দেহে অনেক বেশী, কিন্তু রচনা পাঠের সময় তাঁদের খুবই অল্প। অতএব, শেষোক্ত ধরনের পাঠকদের আকর্ষণ করতে পারে, এ রকম লেখা বিশেষ ভাবে রচিত হওয়া প্রয়োজন। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিজ্ঞানের অগ্রগতির যেসব ঘটনা ঘটছে, সাময়িক পত্রের উচিত সেই সব অগ্রগতির খবর পাঠক মহলের কাছে গ্রহণযোগ্য আকারে পৌছে দেওয়া। এই কাজে দুর্ভাগ্যবশত আমাদের দেশে এখনও যথেষ্ট অগ্রগতি হয় নি। মুদ্রণযোগ্য বিষয় নির্বাচনের নীতি এর জন্য দায়ী কিনা জানি না, তবে পত্র-পত্রিকার কর্তৃপক্ষের ধারণা এই যে বিজ্ঞান-বিষয়ক সংবাদ বা রচনা জনসাধারণকে আকৃষ্ট করতে পারে না। বিজ্ঞান লেখকের সামনে এইটিই একটি মস্ত বড় চ্যালেঞ্জ অর্থাৎ তাঁদের লক্ষ্য হওয়া উচিত যে রচনার উৎকর্ষতার সাহায্যে আগ্রহী পাঠকের সংখ্যা বাড়িয়ে তোলা। এই ধরনের রচনা প্রণয়নের জন্য বিশেষ প্রকারের প্রশিক্ষণেরও প্রয়োজন—বিশেষত যাঁরা সবে লিখতে শুরু করেছেন, তাঁদের জন্য। বিজ্ঞান-সাংবাদিকতা বিষয়টি আমাদের দেশে এখনও বিশেষ গুরুত্ব পায় নি। সৌভাগ্যের কথা, সম্প্রতি কলকাতার ইণ্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশন এই ধরনের একটি শিক্ষাক্রম চালু করেছেন। অনুরূপ প্রচেষ্টা যত প্রসার লাভ করবে, পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞান সংক্রান্ত সংবাদ বা রচনার উৎকর্ষতা তত বাড়বে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

"বর্তমান কাল ভবিষ্যৎ ও অতীত কালের সীমান্তে অবস্থান করে, এই নিত্য চলনশীল সীমারেখার উপর দাঁড়িয়ে কে কোন্ দিকে মুখ ফেরায় আসলে সেইটাই লক্ষ্য করবার জিনিস। যারা বর্তমান কালের চূড়ায় দাঁড়িয়ে পিছন দিকেই ফিরে থাকে, তারা কখনও অগ্রগামী হতে পারে না, তাদের পক্ষে মানবজীবনের পুরোবর্তী হবার পথ মিথ্যা হয়ে গেছে। তারা অতীতকেই নিরত দেখে বলে তার মধ্যেই সম্পূর্ণ নিবিষ্ট হয়ে থাকতে তাদের একান্ত আস্থা। তারা পথে চলাকে মানে না। তারা বলে যে, সত্য সুদূর অতীতের মধ্যেই তার সমস্ত ফসল ফলিয়ে শেষ করে ফেলেছে; তারা বলে যে, তাদের ধর্ম-কর্ম বিষয়-ব্যাপারের যা কিছু তত্ত্ব তা ঋষিচিত্ত থেকে পরিপূর্ণ আকারে উদ্ভূত হয়ে চিরকালের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেছে; তারা প্রাণের নিয়ম অনুসারে ক্রমশ বিকাশ লাভ করে নি সুতরাং তাদের পক্ষে ভাবী বিকাশ নেই, অর্থাৎ ভবিষ্যৎ কাল বলে জিনিসটাই তাদের নয়।

এইরূপে সুসম্পূর্ণ সত্যের মধ্যে অর্থাৎ মৃত পদার্থের মধ্যে চিত্তকে অবরুদ্ধ করে তার মধ্যে বিরাজ করা আমাদের দেশের লোকদের মধ্যে সর্বত্র লক্ষ্যগোচর হয়, এমনকি আমাদের দেশের যুবকদের মুখেও এর সমর্থন শোনা যায়। প্রত্যেক দেশের যুবকদের ওপর ভার রয়েছে—সংসারের সত্যকে নূতন করে যাচাই করে নেওয়া, সংসারকে নূতন পথে বহন করে নিয়ে যাওয়া, অসত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা। প্রবীণ ও বিজ্ঞ যাঁরা তাঁরা সত্যের নিত্যনবীন বিকাশের অনুকূলতা করতে ভয় পান, কিন্তু যুবকদের প্রতি ভার আছে তারা সত্যকে পরখ করে নেবে।"

—রবীন্দ্রনাথ

বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের সমস্যা

সিদ্ধার্থ ঘোষ*

দানিকেনের লেখা সব বইগুলিই বাংলায় অনূদিত হয়েছে। হয়ত দানিকেন যা লেখে নি তাও অনুবাদ করার জন্য অনেকে ব্যস্ত। বার্মুডা ট্র্যাঙ্গেল, ইউ-এফ-ও রহস্য ইত্যাদি প্যারাসায়েন্স-এর বিজ্ঞানের বিষয়গুলি নিয়েও চর্চার অভাব নেই, প্রকাশকরাও তাতে মদত দিতে কুণ্ঠা করেন না। অথচ জে. বি. এস. হ্যালডেনে-র কোনো বৈজ্ঞানিক রচনা সঙ্কলন আজ অবধি বাংলায় তর্জমা হল না। হল না জর্জ গ্যামোর কোনো বই।

অনুবাদ সাহিত্যের উদাহরণ দিয়ে শুরু করলাম কিন্তু মৌলিক রচনার ক্ষেত্রেও দৈন্যের চরিত্রটি একই।

বাঙালীর সামাজিক ও সংস্কৃতির সমস্যা ও বাংলা সাহিত্যের সমস্যাগুলি, বলাই বাহুল্য বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যেরও সাধারণ সমস্যা। ভঙ্গ বঙ্গের অর্থনীতি ও রাজনীতিজনিত এর কারণগুলি বহু আলোচিত। সরকারী ও বিচার বিভাগীয় কার্যে এবং উচ্চ শিক্ষায় বাংলাভাষার দাবী স্বীকৃত না হওয়ায় যে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে—তা নিয়েও আলোচনা একেবারে হয় নি তা নয়। এই সমস্যাগুলি আমার আলোচনার মধ্যে আনছি না। আনছি না বাংলা বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তকের কথাও। কিন্তু তার বাইরেও বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের যে-ক্ষেত্র, সেখানেও বহু সংকট।

সাধারণের বোধগম্য 'পপুলার সায়েন্স' জাতীয় বাংলা সাহিত্যের সমস্যাটিকে আমি পর্যালোচনা করার চেষ্টা করব।

বাংলা সাহিত্যের উত্তরাধিকার বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যেরও উত্তরাধিকার। বঙ্কিমচন্দ্র, রামেন্দ্রসুন্দর ও রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের চেষ্টায় বাংলাভাষা সূক্ষ্মতম ভাব প্রকাশের সরলতর রূপটি অর্জন করেছে কালক্রমে। এই ভাষাই লেখকের হাতিয়ার, যার প্রয়োগে গঠিত হবে বক্তব্য। বিজ্ঞানসাহিত্য সাহিত্য রূপেও উপভোগ্য হওয়া দরকার। কথাটা নতুন কিছু নয়। জগদীশচন্দ্র, রামেন্দ্র সুন্দর, ত্রৈলোক্যনাথ, গোপালচন্দ্র ও সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখদের রচনা এ বিষয়ে আমাদের আদর্শ। ইংরাজির মধ্যবর্তিতায় শিক্ষা ও চর্চাকে কারণ দর্শালেও বাঙালী বিজ্ঞানীর বাংলা ভাষায় দখলের অভাবকে সমর্থন করা যায় না। যে-বিজ্ঞানী লিখতে চান, সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছতে চান তাঁকে সাহিত্য বিষয়ে, সাহিত্যের করণকৌশল সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হতে হবে। না হলে তাঁর সৎ উদ্দেশ্যও ব্যর্থ হতে বাধ্য। প্রযুক্তিবিদ রাজশেখর বসু উত্তর চল্লিশ বয়সে সাহিত্য ক্ষেত্রে পদার্পণ করেও বাঙালী মন জয় করতে পারেন—এ উদাহরণ ত রয়েইছে। কাজেই বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদদের পক্ষে কাজটা অসাধ্য বলি কি করে।

এবার কি লিখি ?'—প্রসঙ্গ। 'কি লিখি' প্রশ্নের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি জড়িত 'কেন লিখি' ? —'কাদের জন্য লিখি ?' যদি সাধারণ মানুষের জন্য লিখি, তাদের শুভ-কামনাই যদি লেখার কারণ হয় তবে জানা দরকার সাধারণ মানুষ, আমার দেশের মানুষ আজ কি কি সমস্যা নিয়ে জর্জরিত। বিজ্ঞান জগতের কোন্ খবর তাঁরা জানতে চান বা তাঁদের জানানো প্রয়োজন।

আমার ব্যক্তিগত অনুভব অনুসারে বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের চর্চার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন মনে করছি।

এক। বিজ্ঞান জগতের খবরাখবরমূলক বিজ্ঞান সাংবাদিকতা।

দুই। চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যবিষয়ক শিক্ষাদায়ী রচনা।

তিন। বিজ্ঞান ও সমাজের মধ্যকার সম্পর্ক বিষয়ক রচনা অর্থাৎ মানব সমাজের অগ্রগতির প্রেক্ষিতে বিজ্ঞানের ইতিহাস পর্যালোচনা।

চার। বিজ্ঞান-আশ্রিত কুসংস্কারবিরোধী রচনা।

পাঁচ। বিজ্ঞান জগতের আধুনিকতম গবেষণা সম্বন্ধে জনসাধারণকে ওয়াকিবহাল করা, (মানব-কল্যাণ বিরোধী বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী গবেষণা সম্বন্ধে সতর্ক করার দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাধান্য দিয়ে)।

ছয়। সাধারণ মানুষের কল্পনা ও কৌতূহলকে জাগ্রত করা।

সাত। স্কুল-কলেজের বিজ্ঞান-পাঠের পরিপূরক রচনা যা বিজ্ঞানকে নিরস যান্ত্রিক মুখস্ত-করা কিছু শব্দ ও তথ্যের বাইরে এনে বিজ্ঞানকে জীবনের অঙ্গ, একটি জীবন দর্শন রূপে সজীব করে তুলবে।

আট। বিজ্ঞানকে সামাজিক যাবতীয় সমস্যা থেকে স্বতন্ত্র, স্বয়ম্ভূ, সর্বক্লেশ ও সমস্যা-হর আধুনিক এক দেবতা রূপে উপস্থাপিত করার বিরোধিতামূলক রচনা।

বাংলাভাষার প্রথম সাময়িক পত্রিকা 'দিগদর্শন'-এর (1818) প্রথম সংখ্যাতেই বিজ্ঞান সংবাদ পরিবেশিত হয়েছিল। তারপর থেকে বাংলাভাষার বিভিন্ন পত্রিকাতে নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে বিজ্ঞান জগতের খবরাখবর। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্রবাসী' সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা হলেও বিজ্ঞান সংবাদ পরিবেশনের পারদর্শিতায় ও টাটকা সংবাদ চয়নের সাফল্যে 'প্রবাসী' অধুনা প্রকাশিত প্রায় সব কয়টি বাংলা বিজ্ঞান পত্রিকার পথপ্রদর্শক হতে পারে। অবশ্য গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' স্মরণীয় ব্যতিক্রম।

দারিদ্র বিচারে ভারতের শ্রেণীভুক্ত যে-কোন দেশের পক্ষেই খাদ্য ও স্বাস্থ্য প্রধান সমস্যা। ভারতীয়দের রোগভোগের প্রধান কারণ অপুষ্টির মোকাবিলা করার জন্য বিজ্ঞানসাহিত্যের শরণ নিয়ে লাভ নেই। কারণ অপুষ্টি যেখানে খাদ্যের অভাবে সেখানে কাগজ-কালি অচল। তবু, সীমিত ক্ষেত্রের মধ্যে

---

*26, সেন্ট্রাল রোড, কলিকাতা-700032

হলেও মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত স্তরে বিজ্ঞান সাহিত্য তার সহযোগিতা প্রসারিত করতে পারে এবং করা কর্তব্য। এক ধারে হাতুড়েদের অন্য দিকে মুনাফালোভী বিশেষ করে মাল্টিন্যাশনালদের বিষবড়ির (কিম্বা জোলো বড়ির) বিরুদ্ধে কলম ধরা আজ বোধহয় চিকিৎসকদের নৈতিক কর্তব্যের পর্যায়ে পৌছেছে। বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত 'গণস্বাস্থ্য' ও 'আজকের বিজ্ঞান' এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য প্রয়াস চালাচ্ছে।

কিছু অদ্ভুত প্রতিভাধর মানুষের আকস্মিক কিছু উদ্ভাবন বা আবিষ্কার ও তার সমষ্টি থেকে বিজ্ঞানের আবির্ভাব বা বিকাশ ঘটে নি। মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতিরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বিজ্ঞান। তাই সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতি নিরপেক্ষ ভাবে বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও তার প্রয়োগ অসম্ভব। সাধারণ মানুষের বিজ্ঞানের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের নাড়ির খবর জানার প্রয়োজন নেই কিন্তু সামগ্রিক ভাবে বিজ্ঞান ও সমাজের পারস্পরিক লেনদেনের ইতিহাসের মর্মবস্তু উপলব্ধি করা দরকার। এ ইতিহাস বর্তমানে মানুষকে তার অবস্থা ও পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতন করবে, ভেঙে ফেলবে মানুষ ও বিজ্ঞানীর মধ্যবর্তী গবেষণাগারের বা মানুষও প্রযুক্তিবিদের মধ্যবর্তী পাইলট প্ল্যান্টের উঁচু দেয়াল। বৈজ্ঞানিক গবেষণার অমানবিক দিকগুলি সমালোচনা করার মতো সহজ দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করবে সাধারণ মানুষ। জে. ডি. বার্নাল রচিত 'সায়েন্স ইন হিস্ট্রি' এ-বিষয়ে অবশ্যপাঠ্য। 'অন্বেষা' পত্রিকায় বইটির অংশবিশেষের ধারাবাহিক অনুবাদ প্রকাশ হচ্ছে। কিন্তু আক্ষরিক অনুবাদের চেয়ে বোধহয় ভাল হত ভাবানুবাদ—আরও সংক্ষেপে, সরল ভাষায় যদি বক্তব্য পেশ করা হত। আর তার সঙ্গে ভারতীয় প্রেক্ষিত যুক্ত হলে তা হত বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের একটি অ-পূর্ব সৃষ্টি।

কুসংস্কারের বিরোধিতায় বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্য এখন গর্বের সঙ্গে একটি নাম উচ্চারণ করতে পারে—'উৎস মানুষ'। এই পত্রিকা 1980 থেকে নিয়মিত একক জেহাদ চালিয়ে যাচ্ছে। প্যারাসায়েন্স, জ্যোতিষ, লটারি, ভূত-প্রেত, দৈব, অদৃষ্ট, ঝাড়ফুঁক—কেউ পার পায় নি। আরও উল্লেখযোগ্য, 'উৎস মানুষ' শুধু পত্রিকার পাতায় মধ্যেই আটকা পড়ে নি। 'উৎস মানুষ'-কে কেন্দ্র করে লেখকগোষ্ঠি জনজীবনের মধ্যে প্রত্যক্ষ ভাবে সুযোগ মতো, প্রয়োজন মতো নিজেদের নিক্ষেপ করছেন। বিভিন্ন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মেলাতে তাঁরা অংশগ্রহণ করছেন, প্রচার চালাচ্ছেন, অন্ধবিশ্বাস অথবা উদ্দেশ্যমূলক প্ররোচনায় কুসংস্কার যখন স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে বিপর্যস্ত করে তুলছে, তাঁরা প্রতিনিধি পাঠিয়ে সংবাদ সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করছেন। সুস্থ আবহাওয়া সৃষ্টিতে তাঁদের শারীরিক উপস্থিতির কারণে 'উৎস মানুষ'-এর ছাপা শব্দ ক্রমেই আরও গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠছে মানুষের কাছে। শুধু তাত্ত্বিক আলোচনা নয় ব্যবহারিক প্রয়োগ ছাড়া কাজ হবে না—এই উপলব্ধি নিয়েই তাঁরা কাজ শুরু করেছেন।

সাংবাদিক সাধারণত কিছু ঘটার পরেই প্রতিবেদন পেশ করেন। তবে সতর্কতামূলক সংবাদও পরিবেশিত হয়, তখন সাংবাদিক গ্রহণ করেন অনুসন্ধানীর, তদন্তকারীর ভূমিকা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে এ-ধরনের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন শুধু পেশাদার বিজ্ঞানী বা প্রযুক্তিবিদ। ভূপালের নরমেধ কাণ্ডের কথা আমরা সবাই জানতে পেরেছি কিন্তু প্রযুক্তিবিদ বা বিজ্ঞানীরা সময়মতো কলম ধরলে হয়তো দুর্ঘটনা নিবারণ করা যেত। বর্তমানে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী গবেষণা মাত্রেই স্পেশালাইজেশন—অতি ব্যয়বহুল—যা চালাতে হয় সরকারী অথবা বৃহৎ বাণিজ্যিক সংস্থার আওতায়। ফলে গবেষণার চরিত্র ও দিশা নির্ধারণে ব্যক্তি বিজ্ঞানীর স্বাধীনতা থাকে না। অগণতান্ত্রিক ও জঙ্গী মনোভাবাপন্ন সরকার ও মুনাফালোভী ব্যক্তিগত বা বহুজাতিক সংস্থা কিভাবে বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে প্রভাবিত করছে সে সম্বন্ধে সাধারণ মানুষকে ওয়াকিবহাল করাও বিজ্ঞানসাহিত্যের অন্যতম দায়িত্ব। * * *

"It is a mistake to think that only poets need fantasy. It is a foolish prejudice. Fantasy is needed even in mathematics, even the discovery of differential and integral calculus would have been impossible without fantasy. Fantasy is a most valuable quality."

এই উক্তি ভলাদিমির ইলিচ লেনিনের। যাঁরা বিজ্ঞান-ভিত্তিক গল্প বা কল্প-বিজ্ঞানের গল্পকে বিজ্ঞানসাহিত্যের অঙ্গনে অচ্ছুৎ করে রাখতে চান তাঁদের বোধহয় আরেকবার বিবেচনা করা দরকার। একথা স্বীকার করতেই হবে যে সায়েন্স ফিকশন ও সায়েন্স ফ্যান্টাসী নামে বহু আবর্জনা সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু সাহিত্যের কোন্ শাখাই বা জঞ্জালমুক্ত। জঞ্জাল বিচার না করে মণিমুক্তোর সন্ধান করাই ভাল। মানবতাবাদী, সামরিক উদ্দেশ্য বিরোধী ও শিক্ষামূলক সায়েন্স ফিকশন চর্চাকে স্বাগত জানানো দরকার।

বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তকের পরিপূরক গ্রন্থের অভাব নেই বাংলায়। বহু কৃতী গবেষক, লেখক তাঁদের লেখনী পরিচালনা করেছেন ও করছেন। কিন্তু অধুনা দেখা যাচ্ছে প্রশ্নোত্তর জাতীয়, 'জেনারেল নলেজ' গোত্রের রাশি রাশি বই ছাপা হচ্ছে যা প্রায় পুরোপুরি বিদেশী রচনানির্ভর। এই ধরনের বই নেহাতই সাময়িক কিছু চাহিদা পূরণ করে (যেমন কুইজ কনটেস্টে সাফল্য)। দেশলাই কে আবিষ্কার করেন ? প্রশ্নটি এই ধরনের বই থেকে একটি 'স্যাম্পেল'। এর উত্তরে আবিষ্কারকের নামটি পাঠক জানতে পারেন কিন্তু তার কৌতূহল কি নিবৃত্ত হয় বা আরও প্রশ্ন

কি লাগে ? ভারতে বা বাংলাদেশে কবে কোথায় প্রথম দেশলাই তৈরি শুরু হল, কারা করলেন সেকাজ বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্যের কাছ থেকে বাঙালী পাঠক যদি তা না জানতে পারেন তাহলে কি লাভ ? আর দেশের সাধারণ অর্থনীতিতে দেশলাই-এর কি অসাধারণ প্রভাব।

রচনার সাহিত্যগুণের প্রশ্নও এই সঙ্গে জড়িত। এখন যাঁরা বাংলাভাষায় বিজ্ঞানসাহিত্য চর্চা করছেন তাঁদের মধ্যে একটি উজ্জ্বল নাম অমল দাশগুপ্ত। অনতি আলোচিত বলেই শুধু একজনের নাম উল্লেখ করছি। কোনো পুরস্কারও তাঁর জোটে নি বোধহয় ইত্যাবধি। অথচ অমলবাবু রচিত 'মানুষের ঠিকানা', 'পৃথিবীর ঠিকানা' ও 'মহাকাশের ঠিকানা' ইত্যাদি বইগুলি শুধু বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের নয়, বাংলা সাহিত্যেরও সম্পদ। বিজ্ঞানের নিত্য নতুন জয়যাত্রা আর আবিষ্কারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে লেখক যেভাবে সংস্করণান্তরে বইগুলিকে পরিমার্জিত করে চলেছেন—সেটাও একটা দৃষ্টান্ত।

শেষে বলি, আধুনিক জীবনে বিজ্ঞানের ভূমিকা দিনে দিনে ক্রমেই আরো প্রভাব বিস্তার করছে ঠিকই কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতি সামাজিক অগ্রগতিরই অধীন। বিচ্ছিন্ন ভাবে বিজ্ঞান চর্চা ও বিজ্ঞানের সাফল্য মানুষের সব সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। শুধু উন্নততর কীটনাশক আর সার তৈরি করলেই ভারতের কৃষিজীবী সংখ্যাগরিষ্ঠের খাদ্য সমস্যার সমাধান হবে না। এই দৃষ্টিভঙ্গি না থাকলে 'বিজ্ঞান'-কে আমরা আধুনিক যুগের দেবতার পদে বসিয়ে রাখব, যে-দেবতাকে শুধু বিশ্বাসেই মিলিয়ে দিতে পারে আর যুক্তি নিয়ে আসে শূন্যতা।

বাংলায় বিজ্ঞান লেখা ও লেখক

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়*

1982 খৃস্টাব্দের 6ই আগস্ট কলকাতার মানুষ এক অভিনব মিছিল প্রত্যক্ষ করেছিলেন, করে বিস্মিত হয়েছিলেন।

এটুকু পড়েই পাঠক অবিশ্বাসে ভ্রূ-কোঁচকাবেন জানি। মিছিলনগরী কলকাতার বাসিন্দারা মিছিল দেখে অবাক হবে, এ আবার হয় নাকি ? কিন্তু হয়েছিলো। আসলে সে মিছিলের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য আর অভিনবত্ব ছিল—ওটা বিজ্ঞান মিছিল। বিজ্ঞানের শ্লোগান, গান আর পোস্টার নিয়ে অনেকগুলি সংগঠনের হাজার কয়েক মানুষ রোদে জলে হেঁটে যাচ্ছে উজ্জ্বল উৎসারিত চোখে, এ দৃশ্য কলকাতাবাসী সত্যিই আগে প্রত্যক্ষ করে নি। উগ্রপন্থী রাজনৈতিক দল থেকে শুরু করে গান্ধীবাদী সর্বোদয় সংঘ, খোকা-খুকু গৃহবধূ থেকে শুরু করে ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ার বিজ্ঞানী পর্যন্ত একই সারিতে সামিল। এহেন চমকপ্রদ সমন্বয়ের ঐকামন্ত্র ছিল—6ই আগস্ট, পরমাণু অস্ত্রবিরোধী ধিক্কার দিবস, বিজ্ঞানের ভয়াবহ অপপ্রয়োগে বিচলিত সর্বশ্রেণীর মানুষের সচেতন প্রতিবাদী পদক্ষেপ।

অর্থাৎ সেদিন আমরা দেখেছিলাম বিজ্ঞান শুধুই যন্ত্রপাতি, গবেষণাগারের রুদ্ধ কক্ষ আর বিজ্ঞানীর গম্ভীর বক্তৃতায় আবদ্ধ থাকছে না ; বিজ্ঞান বেরিয়ে আসছে উন্মুক্ত আকাশের নীচে খোলা রাস্তায় লত-ফুল-বিকশিত-সৌরভে।

এবং সেই 'ঐতিহাসিক' মিছিল সেদিন যাত্রা শুরু করেছিলো বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের ঐতিহ্যমণ্ডিত সত্যেন্দ্র ভবন থেকে যে ভবনের ভেতরে পা দিলেই চোখে পড়বে বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ঐকান্তিক স্বপ্ন ও আদর্শের বাণী— বাংলাভাষায় বিজ্ঞানকে পৌঁছে দিতে হবে সাধারণ মানুষের মধ্যে।... আমার বর্তমান রচনার মূল সূত্রটি রয়েছে এই বাক্যের মধ্যে।

আক্ষরিক অর্থে বাংলাভাষায় বিজ্ঞান রচনার সূত্রপাত হয়েছে অনেক আগেই—বাংলার রেনেশাঁ যুগেই। ভূদেব মুখোপাধ্যায়, অক্ষয় দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, রামেন্দ্রসুন্দরের লেখনীতে বিজ্ঞানরচনা ইংরিজির প্রস্তর-আবরণ ভেঙে বেরোতে পেরেছিলো ঠিকই কিন্তু তাঁদের রচনার প্রেরণা ও উদ্দেশ্য যত না ছিলো বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল বাংলা সাহিত্যের পুষ্টিবর্ধন। বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের প্রশ্নে সত্যেন বোসকে পথিকৃৎ বলতে দ্বিধা নেই, যদিও একই সঙ্গে উচ্চারিত হওয়া উচিত সুকুমার রায়, জগদানন্দ রায় ও রাজশেখর বসুর নাম। হয়তো অনেকেই অসন্তুষ্ট হবেন একই পংক্তিতে জগদীশ বোস, মেঘনাদ সাহা, রবীন্দ্রনাথ, প্রিয়দারঞ্জন প্রমুখের নাম করছি না বলে, কিন্তু সাধারণ মানুষের আগ্রহ ও মননের প্রতি মনোযোগ রেখে বিজ্ঞান বিষয়কে বিমূর্ত দার্শনিকতা ও কঠিন যান্ত্রিকতা থেকে মুক্ত করে আনার কাজে প্রথমোক্ত লেখকরাই সফল হয়েছিলেন বলে মনে করি।

বিংশ শতাব্দীর ইতিহাস বিজ্ঞানের দুরন্ত অগ্রগতির ইতিহাস। চল্লিশের দশকের শেষ ভাগে এসে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় নব নব আবিষ্কারগুলির সঙ্গে একাত্ম হয়ে সত্যেন বোস চেয়েছিলেন বিজ্ঞানের একটা স্রোত, একটা ধারা, একটা ব্যাপক বিচ্ছুরণ যা বাংলার সাধারণ জনসমষ্টিকে

* বিডি 494, সল্ট লেক সিটি, কলিকাতা-700064

আপ্লুত করবে আগ্রহী করবে বিজ্ঞানের প্রতি, জীবনমান উন্নয়নে করবে সহায়তা। এই সামগ্রিকতার ধারণাটা মাথায় ছিল বলেই কেবল নিজের লেখনীতে সীমাবদ্ধ না থেকে তিনি গড়েছিলেন বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, জন্ম দিয়েছিলেন 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার, সম্পাদনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের মত আদর্শবাদী সৎ বিজ্ঞানসেবীকে। মনে হয় সে সময়টা জেমস্, জীন্স্, গ্যামো, বার্নাল, কডওয়েল, হলডেনের লেখার প্রভাব কাজ করেছিলো গভীরভাবে।

60-এর দশক থেকে বিশ্ববিজ্ঞানের অগ্রগতি হয়েছে আরো দ্রুত। পদার্থের মৌলিক উপাদান কোয়ার্ক-লেপটন থেকে মহাজাগতিক জীববিজ্ঞান, অন্যদিকে বায়োটেকনলজি থেকে অত্যাধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি—ঝলকে ঝলকে বিজ্ঞানের নতুনতর দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। 60 থেকে 80'-র দশকে তাই জনপ্রিয় বিজ্ঞান রচনায় রসদ এসেছে ভুরি ভুরি। এবং এই তথ্য সম্ভারে আকৃষ্ট হয়েই আধুনিক বিজ্ঞান লেখকেরা আসরে উদিত হয়েছিলেন। এই লেখকেরা বর্তমানে সংখ্যায় যথেষ্ট, রচনার সংখ্যাও প্রচুর। তবে রচনার প্রাঞ্জলতা ও বিশ্লেষণ বুদ্ধির প্রখরতার বিচারে এদের অবস্থান হলডেন, আসিমভ, সাগান প্রমুখ জনপ্রিয় লেখকদের থেকে বেশ দূরে।

জ্ঞান-বিজ্ঞান পত্রিকার পর 70 দশকের শেষ ভাগ পর্যন্ত বিজ্ঞান পত্র-পত্রিকার স্বাস্থ্য খুব কিছু উন্নত ছিল না। সত্যেন বোস যা চেয়েছিলেন তা হয় নি; ছোট-বড় বিজ্ঞান ক্লাব ও সংস্থা ছড়িয়ে ছিটিয়ে কাজ করে বিজ্ঞানের বার্তা চারধারে পৌঁছে দেবে—এ প্রত্যাশা মেটে নি। ক্লাব গড়া হয়েছে অনেক, সক্রিয় হওয়ার আগেই শুকিয়েছে অধিকাংশ। অন্য দিকে বোস-এর উত্তরসূরী কলমচিগণ বিজ্ঞানের প্রতি পাঠক সাধারণের হাই-তোলা অনীহা কাটাতে পারেন নি মূলত রচনার মুনশিয়ানার ঘাটতিতে। কিন্তু চিত্রটা মোচড় দিয়ে পাল্টে গেছে 80-এর দশকের মুখে। পত্র-পত্রিকার সংখ্যা বেড়ে গেছে ঝপ করে, এবং সেই সঙ্গে বিজ্ঞান রচনায় এক নব্য ধারাও আত্মপ্রকাশ করেছে বাঁধভাঙা স্রোতের মত—কি বিষয়বস্তুতে, কি প্রকাশভঙ্গীতে।···আলোচনাটা এখানে দুটি পর্যায়ে ভাগ করে দিচ্ছি, প্রথমে লেখার মাধ্যম, পরে লেখক প্রসঙ্গ।

বিগত ছ'সাত বছরে বিজ্ঞান পত্রিকা দুই শাখায় বিস্তার লাভ করেছে। একটি শাখা বেড়েছে বিজ্ঞান রচনার কনভেনশনাল টাইপ অনুসরণ করেই—তবে অনেক রূপ রং মালমশলায় আকর্ষণীয় হয়ে। কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিজ্ঞান মেলা (সম্প্রতি বন্ধ হয়ে গেছে), বিজ্ঞান জগৎ, জ্ঞান বিচিত্রা (ত্রিপুরা থেকে,) বিজ্ঞান মনীষা (মেদিনীপুর থেকে), অন্বেষা এরা পাঠকদের নজর কেড়েছিলো। অবশ্য তথ্যসম্ভার ও পরিবেশনার ঢং-এ এই পত্রিকাগুলি আধুনিকতার মেজাজ আনলেও চলতি ইংরিজি সাময়িকী Science To-day, Science Reporter, Science Age ইত্যাদির উৎকর্ষের সঙ্গে খুব পাল্লা দিতে পারে না। এ ছাড়া বেশ কিছু বাংলা সাময়িকী নিয়মিত বিজ্ঞানের পাতা চালু করেছে পাঠকদের অনুসন্ধানী আগ্রহকে কিছুটা ধাতস্থ করার জন্য।

দ্বিতীয় শাখাটি এক আওয়াজে সুঠাম হয়ে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে 70-এর শেষ থেকে। মানবমন, আনৃণ্য (তুলনামূলক ভাবে পুরাতো), বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান কর্মী, উৎসমানুষ, অঙ্কুরে শুরু, লোকবিজ্ঞান (সুন্দরবন অঞ্চল থেকে), এরা বহু ঝড় তুফান সামলে মাথা উঁচু রাখছে এই কঠিন "বাজারে"। [দুটি শাখার আরো অনেক ছোটবড় কলেবরের বিজ্ঞান পত্রিকার অঙ্কুর দেখা গেছে মাঝেমধ্যে, কিন্তু শেকড় শক্ত জমি পাওয়ার আগেই এদের অধিকাংশের অপমৃত্যু ঘটেছে।]

এবার শাখা দুটির চরিত্রকে চেনার চেষ্টা করা যাক একটু খুঁটিয়ে।

প্রথম শাখার পত্রিকাগুলির উদ্দেশ্য বলতে ছাত্রছাত্রী ও পড়ুয়া পাঠকদের বিজ্ঞানের তথ্য-তত্ত্ব জানানো (কিছুটা শেখানো), মনোরঞ্জন ও ব্যবসা। আর্থিক সঙ্গতি ও বিজ্ঞাপনের জোর রয়েছে কমবেশী। তবে অনেকটা ব্যবসায়িক লক্ষ্য থাকলেও বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের কাজে এই পত্রিকাগুলির ভালো ভূমিকা রয়েছে, একথা স্বীকার করতেই হয়। ···দ্বিতীয় শাখার পত্র-পত্রিকাগুলির চিত্র পৃথক। আর্থিক অনটন নিত্যসঙ্গী, চরিত্রগতভাবে অব্যবসায়িক, আদর্শে বলিষ্ঠ। নিছক বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ বা মনোরঞ্জন নয়, এদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সমাজনীতি ও রাজনীতির গভীরে নিবদ্ধ। বিজ্ঞানকে সমাজের উপরিকাঠামোর ওপর ভাসিয়ে না রেখে গণচেতনার সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার প্রয়াস রয়েছে এই নতুন ধারার রচনাশৈলীতে। এই ধারাই "গণবিজ্ঞান" শব্দের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটিয়েছে—তার মৌল অর্থ হল বিজ্ঞান জনগণের জন্য, জনগণকে দিয়েই এর প্রয়োগ এবং বিকাশ। এ হেন গণবিজ্ঞান চেতনায় সংপৃক্ত রচনাগুলিই তাই পাঠকের কেতাবী জ্ঞানের ঝুলি ভারী করার (অ) কাজ না করে বিজ্ঞানের সামাজিক প্রয়োগ ও দৈনন্দিন জীবনবোধে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলার কাজে নতুন ভাবনার সূত্রপাত ঘটিয়েছে। গণবিজ্ঞানের এই বলিষ্ঠ আদর্শই 1982তে বিজ্ঞান পরিষদের ঐতিহাসিক মিছিলকে সফল করতে পেরেছিল। ···বিজ্ঞাপনের বদান্যতা নেই, প্রাতিষ্ঠানিক পৃষ্ঠপোষকতা নেই, কিন্তু পাঠক সাধারণের হৃদস্পন্দনের অনুরণন আছে—তাই দৌলতে এই শ্রেণীর পত্রিকাগুলি প্রাণশক্তি পেয়েছে। বর্তমান দশকে বিজ্ঞানচর্চায় এই নব্যধারার প্রধান উদ্দীপক হিসেবে 'উৎসমানুষ' পত্রিকার নাম না করলে অন্যায় হবে।

সাহিত্য সংস্কৃতির প্রচলিত প্রবাহে কোন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উত্তরণ বা বিকাশ কখনই বিচ্ছিন্নভাবে ঘটতে পারে না। বিজ্ঞানের এই জীবনমুখী, সমাজমুখী, সংগ্রামী রচনার স্রোতও বিচ্ছিন্নভাবে আসে নি। একটা পরিমণ্ডল অবশ্যই সৃষ্টি হয়েছিল। গত তিন দশক ধরে দুনিয়া জুড়ে বিজ্ঞানের অগ্রগতি মানুষের জীবনযাত্রার বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্রুত প্রভাব ফেলে

গেছে অথচ চিন্তার জগতে সুবিরত্ব কাটে নি ; এই শূন্যতা পূরণের কোন সফল প্রয়াস দেখা যায় নি প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান লেখকদের মধ্যে। কঠিন বিদেশী প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ আর ফিকশন বা কল্পকাহিনী দিয়ে তাৎক্ষণিক চমক সৃষ্টি করা গেলেও সাধারণের মন স্পর্শ করা যায় নি। অথচ এটা জরুরী ছিল। ...এরপর সত্তর দশকের তোলপাড় করা রাজনৈতিক ঢেউ বিজ্ঞান-সংস্কৃতির অঙ্গনেও তরঙ্গ তুলেছিল অন্তঃস্থল থেকে। অজস্র আত্মত্যাগের রক্তসিঞ্চন ব্যাপক মানুষের চোখের আবরণকে পাতলা করেছে, প্রশ্ন জেগেছে—কী কেন, কিভাবে। এই প্রশ্নমনস্কতাতেই গণবিজ্ঞানের ভ্রূণ লুকোন থাকে। সত্তর-আশি দশকের সন্ধিক্ষণেই কেরালার শাস্ত্র সাহিত্য পরিষদ, মহারাষ্ট্রের লোকবিজ্ঞান সংগঠন, মধ্যপ্রদেশের কিশোর ভারতী, আলমোড়া হিলসের চিপকো আন্দোলন, বাংলাদেশের গণ-স্বাস্থ্য ইত্যাদির নব বিজ্ঞানচিন্তার ও আন্দোলনের সংবাদ আসতে থাকে পশ্চিমবঙ্গে। প্রথাগত দেয়ালবন্দী বিজ্ঞান নয়, মাটির কাছে এসে সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ প্রশ্নমনস্ক বিজ্ঞানকে চিনতে শুরু করে তখন বাংলার কিছু অগ্রবর্তী লেখক ও সংগঠক। বহু ছোট ছোট সমাজবাদী সংস্থা নেমে আসে রাজপথে, হাটে, মাঠে, পাড়ায় পাড়ায়। আগমার্কা কোন পার্টির ফেস্টুন হাতে নয়, মানুষের জন্য বিজ্ঞানের শ্লোগান-প্ল্যাকার্ড-পোস্টার হাতে। এই সক্রিয়তাকে সংহত ও অনুপ্রাণিত করতে উৎসমানুষ, বি ও বি জাতীয় পত্রিকার ভূমিকা রয়েছে বিরাট।

লেখা লেখেন লেখক। তাই নতুন চিন্তার বিজ্ঞান রচনার সঙ্গে লেখকদের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গী ও আদর্শবোধের সামঞ্জস্য না থাকলে গোঁজামিল আসবে। প্রকৃতপক্ষে সেটাই এসেছে। ...পরিবেশনার স্টাইল, যথেষ্ট তথ্যের সংগ্রহ ও ভাষার প্রাঞ্জলতা রয়েছে এমন গুণসমন্বিত লেখক বাংলায় কম নেই। নীরস বিজ্ঞানের বিষয় সরস রচনার চমৎকারিত্বে পাঠককে ধরে রাখতে পারেন বর্তমানের অনেক লেখক, কিন্তু দুঃখ-জনক অভিজ্ঞতা হল গণবিজ্ঞানের আদর্শকে মূল্য দিয়ে সমাজসচেতন আন্দোলনমুখী লেখার এঁদের প্রায় কাউকেই এগিয়ে আসতে দেখা যায় না (নীতি-আদর্শের দিকটাকে প্রধান গুরুত্ব দিয়ে থাকেন এমন নামজাদা লেখকের সংখ্যা নেহাৎ-ই নগণ্য)। ইদানীং বিজ্ঞান নিয়ে পঠন-পাঠন ও নানাবিধ চর্চায় বহু মানুষের আগ্রহ বেড়েছে, বই পত্র-পত্রিকার সংখ্যা বেড়েছে, তবু জনপ্রিয় কুশলী লেখকেরা এই সুযোগটিকে সৎ স্বাস্থ্যকর কাজে লাগাতে পারেন নি —কোথায় যেন বাধে! অথচ লিখছেন এনারা প্রচুর। একের পর এক 'জনপ্রিয়' বিজ্ঞানের বই ছাপছেন, চমক আর অলঙ্করণকে প্রধান উপজীব্য করে বিক্রি বাড়ানোর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত রয়েছেন। অর্থাৎ বিজ্ঞানকে মূলধন করে খ্যাতি আর অর্থলাভের লক্ষ্যে মন-প্রাণ সমর্পণ করছেন এই "বুদ্ধিমান" লেখকগণ—লক্ষ্য দূরে, দিগন্তে ভাস্বর কোন খেতাব, রবীন্দ্রপুরস্কার বা কোন নামী-দামী পদক (অবশ্য পুরস্কার পেলেই যে তাঁর বিশুদ্ধতা বা আদর্শবোধ থাকবে না, একথা কখনোই বলছি না। ব্যতিক্রম তো আছেই!) আত্মপ্রতিষ্ঠার এই উন্মাদনাকেই অস্বাস্থ্যকর প্রবণতা বলছি। অস্বাস্থ্যের লক্ষণ আরো প্রকট হয় যখন কোন সভা-সমিতিতে এইসব কেরিয়ারিস্ট লেখকদের 'বিজ্ঞান-মনস্কতা', 'সমাজমুক্তি', 'আন্দোলন' ইত্যাদি কথা উচ্চারণ করতে শুনি। কথা ও আচরণের তীব্র অসঙ্গতি আমাদের আফসোস ও যন্ত্রণা উৎপাদন করে, কেননা এতে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয় সাধারণ মানুষ। শক্তিধর লেখকদের প্রতি থাকে কিছু মোহ। সেখানে অসঙ্গতি আর অসততার ধোঁয়া উঠলে বিভ্রান্তির শিকার হন পাঠককুল।...এবার কিছু উদাহরণ না দিলে বোধহয় আমার বক্তব্যেও বায়বীয়তা এসে যাবে।

একটি প্রখ্যাত বাংলা সাপ্তাহিক, খুবই জনপ্রিয়। তার নিয়মিত বিজ্ঞান বিভাগের প্রতিষ্ঠিত লেখক বিজ্ঞানমনস্কতা, সমাজ উন্নয়ন, কুসংস্কার বিরোধিতার কথা লেখন বলেন আখচার। আবার তাঁরই কলম থেকে বেরোয়—কোন বিজ্ঞানজানা ব্যক্তি যদি কালীবাড়ীতে পুজো দিয়ে শান্তি পান তাতে আপত্তি কী থাকতে পারে? তিনি অবশ্য লেখেননি যে প্রত্যহ মদ্যপান করে বুঁদ হয়ে থেকে মানসিক যন্ত্রণা উপশমের পদ্ধতিও সামাজিকভাবে গৃহীত হওয়া উচিত, লিখলে মানিয়ে যেত।.. সাধারণ মানুষের সঠিক বিজ্ঞানশিক্ষা ও চেতনাবিকাশের কাজে যেসব লেখকদের প্রচণ্ড সময়াভাব, তাঁদের মধ্যেই দেখা যায় আত্ম-কলহ, জাঁদরেল পাবলিশারের হাতে-পায়ে তৈল মর্দন, এবং রেডিও-টিভিতে অংশ নেওয়ার জন্য কাঙালপনায় অজস্র সময় ব্যয় করতে। এটা অসততা নয়? [লেখকদের নাম উল্লেখ করে আলোচনা করলে বোধ হয় বক্তব্য আরো তথ্যনিষ্ঠ হতো কিন্তু জ্ঞান ও বিজ্ঞান সম্পাদকের তর্জনী সংকেতে গুটিয়ে যেতে হচ্ছে!]

চতুর্দিকে গণবিজ্ঞানচেতনার উন্মেষ যখন সম্ভাবনার অঙ্কুর এনে দিচ্ছে তখন কেবল অখ্যাত লেখকদেরই প্রাণপাত করতে দেখা যাচ্ছে, আর যাঁদের নাম ডাক বেশি, কলমে জোর বেশি দখল বেশি, তাঁরা কেমন নির্বিকার নির্লিপ্ত! ক'জন লেখক বলছেন যে এদেশে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির বিকাশ চূড়ান্ত বৈষম্যমূলক? বিজ্ঞানের প্রসাদ মুষ্টিমেয় সঙ্গতিসম্পন্ন মানুষের ভোগে যায়, ব্যাপক মধ্য-নিম্ন-বিত্ত মানুষ স্বাধীনতার আটত্রিশ বছর পরেও একই অনটন অসন্তোষের অন্ধকারে থেকে যায়, কেন? লক্ষ লক্ষ টাকার চিকিৎসার আধুনিক যন্ত্রপাতির সুযোগ বড় লোকেরা পায় অথচ কুষ্ঠ, যক্ষ্মা, সাপে-কাটা রোগের ওষুধ মেলে না, কেন? অশিক্ষা, কুসংস্কার, ধর্মীয় অনাচার, নারী অবমাননা—এইসব সমাজবিজ্ঞান সংক্রান্ত সমস্যাগুলি নিয়ে ক'জন লেখক সোচ্চার? বিজ্ঞানের মুখোশ এঁটে জালিয়াতি করে বেড়ান এরিক ফন দানিকেন: তিনি কলকাতায় এসে মিথ্যা আর

বিভ্রান্তির ফুলঝুরি ছড়িয়ে গেলেন যখন, ক'জন লেখক প্রতিবাদে মুখর হয়েছিলেন? ভূপালের মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড নিয়ে লেখা হল অনেক কিন্তু কজন "নামকরা জনপ্রিয়" লেখক শিল্পপতিদের হাতের পুতুল কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারকে দায়ী করলেন?...

অবশ্য আত্মপ্রতিষ্ঠাসর্বস্ব লেখকদের এই অনৈতিক ভূমিকাও বোধ হয় বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। এক অসুস্থ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের শিকার হয়েছেন তাঁরা। তা না হলে প্রায় সর্বত্রই এই কদর্য বৈপরীত্য চোখে পড়ে কেন? আই এস আই, সাইন্স কলেজ, মেডিকেল কলেজের কিছু বিজ্ঞানী হয়োস্কোপ দেখেন, হাত গণনা করেন [নাম করতে পারছি না, নিষেধ মানতে হচ্ছে]। বিজ্ঞানের তাবড় গবেষক অধ্যাপক আঙুলে রত্নধারণ করে 'শুভ' তিথিতে গঙ্গাস্নান করেন, এ তো অনেকেই জানেন। সাহা ইনস্টিটিউটের প্রফেসর জ্যোতিষ ব্যবসায়ী অমৃতলালের মেটাল ট্যাবলেটকে সার্টিফিকেট দেন।...উদাহরণ রয়েছে অগুণতি। আমাদের বিকার হয় না। বৈষম্য আর প্রবঞ্চনায় নির্বিকার থাকতে হয় এই দেশে—যেখানে কোটি কোটি ভারতবাসীকে শিক্ষাহীনতা, স্বাস্থ্যহীনতা, অন্নহীনতায় ডুবিয়ে রেখে কোটি কোটি টাকার মিরেজ-2000 বিমান ক্রয় সাড়ম্বরে দেশের গৌরব রচনা করে; যে দেশে নতুন নতুন পারমাণবিক চুল্লী স্থাপনের বিপজ্জনক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় বিদেশী শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে, বিশ্বের অসংখ্য শান্তিকামী মানুষের সোচ্চার 'প্রতিবাদের ঘটনায় দৃক্পাত না করেই।

এরকম পরিস্থিতিতেই বুদ্ধিমান উচ্চাকাঙ্খী বিজ্ঞান লেখকেরা কেরিয়ার করছেন বিবেকের চোখে ঠুলি লাগিয়ে।

তবু সম্ভাবনার অঙ্কুর থেকে কিশলয় উঠে আসছে। বিজ্ঞানকে মানুষের জীবন-সংগ্রামের হাতিয়ার করতে, সুস্থ সুন্দর স্বাভাবিক সমাজ গড়তে—লেখা হচ্ছে, সাংগঠনিক কাজ হচ্ছে, মানুষকে নিয়েই। সামর্থ সীমিত, পদক্ষেপ ক্ষুদ্র, প্রতিকূলতা বিরাট, তাই ছড়িয়ে পড়ার গতিবেগ আপাতত দ্রুত নয় বটে, কিন্তু গতিমুখ বরাবর সামনেই।

"*** পশ্চিম হইতে যা-কিছু শিখিবার আছে জাপান তা দেখিতে দেখিতে সমস্ত দেশে ছড়াইয়া দিল তার প্রধান কারণ, সেই শিক্ষাকে তারা দেশি ভাষায় আধারে বাঁধাই করিতে পারিয়াছে।"

"*** অথচ জাপানি ভাষার ধারণা শক্তি আমাদের ভাষার চেয়ে বেশি নয়। নূতন কথা সৃষ্টি করিবার শক্তি আমাদের ভাষায় অপারিসীম। তাছাড়া য়ুরোপের বুদ্ধিবৃত্তির আকার প্রকার যতটা আমাদের সঙ্গে মেলে এমন জাপানির সঙ্গে নয়। কিন্তু উদ্যোগী পুরুষসিংহ কেবলমাত্র লক্ষ্মীকে পায় না সরস্বতীকেও পায়। জাপান জোর করিয়া বলিল—'য়ুরোপের বিদ্যাকে নিজের বাণীমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিব', যেমন বলা তেমনি করা, তেমনি তার ফললাভ; আমরা ভরসা করিয়া এপর্যন্ত বলিতেই পারিলাম না যে, বাংলা ভাষাতেই আমরা উচ্চশিক্ষা দিব এবং দেওয়া যায় এবং দিলে তবেই বিদ্যা ফসল দেশ জুড়িয়া ফলিবে।"

"*** বাংলাভাষায় বিজ্ঞানশিক্ষা অসম্ভব। ওটা অক্ষমের ভীরুর ওজর। কঠিন বৈকি। সেইজন্য কঠোর সংকল্প চাই। একবার ভাবিয়া দেখুন। একে ইংরাজি তাতে সায়াল, তার উপরে দেশে যে-সকল বিজ্ঞান-বিশারদ আছেন তাঁরা জগদ্বিখ্যাত হইতে পারেন কিন্তু দেশের কোণে এই যে, একটুখানি বিজ্ঞানের নীড় দেশের লোক বাঁধিয়া দিয়াছে এখানে তাঁদের ফলাও জায়গা নাই***।"

রবীন্দ্রনাথ

(শিক্ষার বাহন—পৌষ, 1322 বঙ্গাব্দ)

প্রসঙ্গ ঃ বাংলায় বিজ্ঞানসাহিত্য

অনীশ দেব*

বাংলায় বিজ্ঞানসাহিত্যের স্পষ্টতই দুটি দিক রয়েছে। প্রথমটি, প্রবন্ধ অথবা নিবন্ধ। দ্বিতীয়টি, গল্প-উপন্যাস-কবিতা— সাধারণভাবে যার নাম 'সায়েন্স ফিকশন'। এই দুটি শাখাতেই যে প্রাথমিক শর্ত লেখককে পূরণ করতে হয়, তা হলো সর্বজন বোধ্যতা। অর্থাৎ, বিশেষভাবে বিজ্ঞান শিক্ষিত পাঠক সমাজের মধ্যেই যেন লেখাগুলির আবেদন সীমাবদ্ধ না থাকে।

বাংলাভাষায় বিজ্ঞান-প্রবন্ধ লেখায় ইতিহাস বেশ পুরনো। আমাদের বাঙালী মনীষীরা মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার প্রয়োজনের তাগিদ অনুভব করেছিলেন এবং তাঁদের দূরদর্শিতার গুণে সেই চর্চাকে জাতীয় উন্নতির অন্যতম হাতিয়ার বলে বুঝতে পেরেছিলেন। সেই কারণেই জগদানন্দ রায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে সাধনায় নেমেছিলেন। তখন যে শাখা শীর্ণ ছিলো, আজ তা নদীতে পরিণত না হলেও খুব সহজেই তাকে হয়তো শাখা-নদী বলা যেতে পারে। বাংলাভাষায় বিজ্ঞান-রচনার দুটি দিক রয়েছে ঃ

এক) শিক্ষা, উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে মাতৃভাষা ব্যবহারের প্রচলন।

দুই) সর্বসাধারণের জন্য বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে মাতৃভাষায় সহজ-পাঠ' প্রকাশ।

এই দুটি দিকের প্রথমটি 'বিজ্ঞানসাহিত্যের' আওতায় আসে না। সুতরাং দ্বিতীয় দিকটিই আমাদের পর্যালোচনার বিষয়।

সাধারণ মানুষকে বিজ্ঞানের দিকে আকর্ষণ করাই বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান নিবন্ধ রচনার মূল লক্ষ্য। কারণ একবার আকর্ষণ করে বিজ্ঞানের বিচিত্র রহস্যের স্বাদ-গন্ধ-বর্ণময় দুনিয়ায় পাঠককে নিয়ে যেতে পারলেই কালক্রমে সেই পাঠক হয়ে উঠবেন বিজ্ঞান মনস্ক, যুক্তিবাদী, সংস্কারমুক্ত স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন মানুষ— অন্তত এইরকমই আমাদের প্রত্যাশা। 'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে উদ্দেশ করে লিখেছেন ঃ '···শিক্ষা যারা আরম্ভ করেছে, গোড়া থেকেই বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে না হোক বিজ্ঞানের আঙিনায় তাদের প্রবেশ করা অত্যাবশ্যক। ··· বড়ো অরণ্যে গাছতলায় শুকনো পাতা আপনি খসে পড়ে, তাতেই মাটিকে করে উর্বরা। বিজ্ঞানচর্চার দেশে জ্ঞানের টুকরো জিনিসগুলি কেবলই ঝরে ঝরে ছড়িয়ে পড়ছে। তাতে চিত্তভূমিতে বৈজ্ঞানিক উর্বতার জীবধর্ম জেগে উঠতে থাকে। তারই অভাবে আমাদের মন আছে অবৈজ্ঞানিক হয়ে। এই দৈন্য কেবল বিদ্যার বিভাগে নয়, কাজের ক্ষেত্রে আমাদের অকৃতার্থ করে রাখছে।···' (বিশ্বপরিচয়, পৃঃ 4)

একই উপলব্ধি থেকে বিদেশী সাহিত্যে একদিন জন্ম নিয়েছিলো বিজ্ঞানসাহিত্য বা 'পপুলার সায়েন্স'। আজ বিদেশী শাখাগুলি মহানদীর—হয়তো বা সাগরের—চেহারা নিয়েছে।

'পপুলার সায়েন্স' বা জনপ্রিয় বিজ্ঞানের সাফল্যের প্রধান শর্ত হলো লেখক-পাঠকের আকর্ষণীয় বন্ধন। এই বন্ধন তৈরি হয় দুটো জিনিস থেকে ঃ এক লেখার জন্য আকর্ষণীয় বিষয় নির্বাচন। দুই, লেখার সহজ-সাবলীল ভাষা—লেখাটি পড়ার সময়ে যা ক্রমেই পাঠককে কাছে টানবে, দূরে ঠেলবে না।

শোনা যায়, আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু বলতেন, 'যাঁরা বলেন বাংলাভাষায় বিজ্ঞানচর্চা সম্ভব নয়, তাঁরা হয় বাংলা জানেন না, নয় বিজ্ঞান বোঝেন না।' সন্দেহ নেই, সামান্য রূঢ় শোনালেও কথাটি সত্য। তবে বাংলায় বিজ্ঞানচর্চার প্রাথমিক ধাপ হলো সহজ সাবলীল ভাষায় কোন বিষয়কে প্রকাশ করার ক্ষমতা। কারণ খাদ্য সুপরিবেশনের রীতি যদি আয়ত্ত না থাকে তাহলে অত্যন্ত সুখাদ্যও অতিথির বিরক্তির কারণ হয়। ছিদ্রযুক্ত নৌকোয় যদি সোনা-রুপো বয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয় তাহলে নদী নৌকো এবং সোনা-রুপো দুই-ই গ্রাস করে। অর্থাৎ, বাহন উপযুক্ত না হলে বিজ্ঞানের যে কোন পরমজ্ঞান পাঠকের কাছে আবর্জনার বিতৃষ্ণা তৈরি করবে।

এ-দেশে বিজ্ঞানের বিষয় নিয়ে লেখালিখির চর্চা ক্রমশ ব্যাপক হওয়ায় বেশ কিছু পরিভাষা তৈরি হয়েছে। তবে সফল বিজ্ঞান-নিবন্ধ লিখতে গেলে অসহজ, অস্পষ্ট ও খটমট পরিভাষা বর্জন করাই উচিত। লেখার গতি সাবলীল রাখতে প্রয়োজন হলে নতুন পরিভাষা তৈরি করে নিতে হবে। তারপর ক্রমশ চর্চায় সময়ের কষ্টিপাথরে যে পরিভাষাগুলি টিকে যাবে সেগুলিই হয়ে উঠবে 'সত্যিকারের পরিভাষা'। এই ধারণা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে সচেতন তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর কথায় ঃ '···বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ শিক্ষার জন্যে পারিভাষিকের প্রয়োজন আছে। কিন্তু পারিভাষিক চর্ব্যজাতের জিনিস। দাঁত ওঠার পরে সেটা পথ্য। সেই কথা মনে করে যত দূর পারি পরিভাষা এড়িয়ে সহজ ভাষার দিকে মন দিয়েছি।···' (বিশ্বপরিচয়, পৃঃ 7)

বিজ্ঞান-নিবন্ধ লেখার ভাষাকে স্বচ্ছন্দ গতিময় করার আর একটি আপাত-তুচ্ছ অথচ উল্লেখযোগ্য পথ হচ্ছে ইংরেজী অক্ষর ও শব্দের যথাসম্ভব কম ব্যবহার। বাংলাভাষার সাবলীলতার মাঝে ঐ ভিনদেশী অক্ষরগুলি অনভিপ্রেত হোঁচট সৃষ্টি করে। হয়তো সেই কারণেই 'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ মোট ছিয়াশি পৃষ্ঠায় ইংরেজী হরফে ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করেছেন মাত্র পনেরো বার! অথচ বহু ক্ষেত্রেই ইংরেজী শব্দগুলিকে বাংলা হরফে প্রকাশ করেছেন। এতে পাঠকের সঙ্গে ভাষার দূরত্ব অনেক

*3/4, গৌরীবাড়ী লেন, কলিকাতা-70004

কমে যায়। আজকাল 'অনেকে' পরামর্শ দেন, বিজ্ঞান-নিবন্ধের মধ্যে প্রয়োজন হলেই বন্ধনীর মধ্যে ইংরিজী শব্দ ব্যবহার করতে। কিন্তু এই যথেচ্ছ ব্যবহারে উৎসাহ না দিয়ে তাকে নিরুৎসাহ করলেই বোধহয় জনপ্রিয় বিজ্ঞান সত্যিসত্যিই জনপ্রিয় হয়ে উঠবে। আচার্য জগদীশচন্দ্রের 'অব্যক্ত' বইটিতে এই ইংরিজী-বর্জন রীতি লক্ষ্য করা যায়। যেমন 'নির্বাক জীবন' নিবন্ধে এক জায়গায় তিনি লিখেছেন : '...ইংরিজি ভাষে এই সময়টুকু "লেটেন্ট পিরিয়ড"। "অননুভূতি-সময়" ইহার প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহৃত হইল...' (অব্যক্ত, পৃঃ 105)

এখানে লক্ষণীয় বিষয়, 'লেটেন্ট পিরিয়ড' শব্দটি লেখার সময়ে জগদীশচন্দ্র বাংলা হরফই ব্যবহার করেছেন এবং পরিভাষা অর্থাৎ 'প্রতি শব্দ' তৈরি করে নিয়ে 'নির্বাক জীবনের পরবর্তী সর্বত্র এ পরিভাষা গ্রহণ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও একই ধরনের উদাহরণ লক্ষ্য করা যায়। বিশ্বপরিচয় গ্রন্থের 89 পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন : '...সহজ বাতাসের দুটো স্তর আছে। এর যে প্রথম থাকটা পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে, তার বৈজ্ঞানিক নাম ট্রোপোস্ফিয়ার (Troposphere), বাংলায় একে ক্ষুব্ধস্তর বলা যেতে পারে। ...এর আরো উপরে যে স্তর, পৃথিবীর তাপ সেখানে ঝড়তুফান চালান করতে পারে না। তাই সেখানকার হাওয়া শান্ত। পণ্ডিতেরা এ স্তরের নাম দিয়েছেন স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার (Stratosphere), বাংলায় আমরা বলব শুব্ধস্তর।...'

স্পষ্টই বোঝা যায়, দুই মনীষীর উদ্দেশ্য ছিলো একই। তবে প্রকাশভঙ্গীর তফাৎ শুধু রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী হরফে ইংরেজী শব্দ ব্যবহারে। হয়তো নিজে বিজ্ঞানী নন বলেই বিজ্ঞানী-সমাজকে আহত করার আশঙ্কায় রবীন্দ্রনাথ ইংরিজী বর্জনের সম্পূর্ণ স্পর্ধা দেখাতে পারেন নি। অথচ জগদীশচন্দ্র নিজ বিজ্ঞানী হওয়ায় আত্মবিশ্বাসে অটল থেকে নিঃসঙ্কোচে সঠিক পথটি নির্দেশ করে দিয়েছেন 'বিশ্ব পরিচয়' প্রকাশের অন্ততঃ ষোলো বছর আগেই।

ভাষা-পরিভাষার প্রসঙ্গ শেষ করে এবারে বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্যের নির্ভুলতার প্রসঙ্গে আসা যাক।

যে কোন জনপ্রিয়-বিজ্ঞান রচনায় তত্ত্ব ও তথ্য একই সঙ্গে নির্ভুল ও সাম্প্রতিক হওয়া দরকার। এছাড়া তত্ত্ব ও তথ্যের পরিমাণ কমিয়ে পাঠককে বঞ্চিত করাটাও অনুচিত। বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথের উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথ এ-প্রসঙ্গে বলেছেন : '...এই বইখানিতে একটি কথা লক্ষ্য করবে—এর নৌকোটা অর্থাৎ এর ভাষাটা যাতে সহজে চলে সে চেষ্টা এতে আছে, কিন্তু মাল খুব বেশি কমিয়ে দিয়ে একে হালকা করা কর্তব্য বোধ করি নি। দয়া করে বঞ্চিত করাকে দয়া বলে না।...' (বিশ্বপরিচয়, পৃঃ 7)

ইদানীং প্রকাশিত বেশির ভাগ জনপ্রিয়-বিজ্ঞান নিবন্ধে ভাষা-পরিভাষা ও ইংরেজী শব্দ সংক্রান্ত জটিলতা চোখে পড়ে। লেখকরা 'নৌকোটা সহজে চালানোর' চেষ্টা করেন না। বাহনের গুরুত্ব আগেই আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং খঞ্জ বাহনের উপযুক্ত শুশ্রূষা ও চিকিৎসা প্রয়োজন। এই চিকিৎসার দায়িত্ব নিতে হবে সম্পাদকদের। আবার একই সঙ্গে সমর্থ ও সাবলীল বাহনে চড়িয়ে ত্রুটিপূর্ণ বা অসম্পূর্ণ বিজ্ঞান পাঠকের দরবারে পৌঁছে দেওয়াটাও মারাত্মক অপরাধ। সেই অপরাধ থেকে লেখকদের মুক্তি দিতে প্রয়োজন বিজ্ঞান-সম্পাদকের। বিদেশে স্বাভাবিক ভাবেই সাহিত্য ও বিজ্ঞান-সম্পাদকের চল রয়েছে। কিন্তু বাংলাভাষায় বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে পত্র-পত্রিকায় যদি বা সাহিত্য কিংবা বিজ্ঞান সম্পাদকের দেখা মেলে, পুস্তক প্রকাশনার ক্ষেত্রে বরং প্রকাশকই হারকিউলিসের শক্তিতে সকল দায়-দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নেন। এতে পয়সার সাশ্রয় হয় বটে তবে বিজ্ঞান জনপ্রিয় হয় না। কারণ জনপ্রিয়-বিজ্ঞানের প্রচার-প্রসার এক মিলিত যজ্ঞ। লেখক-সম্পাদক-প্রকাশক-পাঠক এই চারটি মেধার সমন্বয়ে সেখানে প্রজ্বলিত হয় বিজ্ঞান-প্রদীপ— যার আলো ছড়িয়ে পড়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে।

বাংলাভাষায় বিজ্ঞান-নিবন্ধ লেখার সময়ে লেখককে নিজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কেও নিশ্চিত হতে হবে। একথা বলার কারণ, পাঠ্যপুস্তকের ভাষা ও ভঙ্গী জনপ্রিয় বিজ্ঞানের অঙ্গ হওয়া উচিত নয়। পাঠ্যপুস্তক সব সময়েই নিজেকে নির্দিষ্ট পাঠক্রমের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে। আর তার মূল লক্ষ্য হলো সচেতনভাবে শিক্ষা দেওয়া। অথচ জনপ্রিয়-বিজ্ঞানের ভূমি অনেক সরস, আর সেখানে প্রয়োজন মতো মূল বিষয়কে ঘিরে থাকে অনেক চিত্তগ্রাহী উপ-বিষয়। জনপ্রিয়-বিজ্ঞানের লক্ষ্য সচেতনভাবে শিক্ষা দেওয়া নয়, বরং পাঠকের অজান্তেই সে পাঠককে জ্ঞানী করে তোলে। সুতরাং জনপ্রিয়-বিজ্ঞানের নিবন্ধ নির্বাচনের ক্ষেত্রে এ জাতীয় 'পাঠ্যপুস্তকসুলভ রচনা' সম্পর্কেও সম্পাদক বা প্রকাশককে সতর্ক হতে হবে।

জনপ্রিয়-বিজ্ঞান জনসাধারণের মধ্যে যতোই ছড়িয়ে পড়বে, বাংলায় বিজ্ঞানচর্চা ততোই এগিয়ে যাবে সাফল্যের শিখরে। একই সঙ্গে পরিভাষায় সমৃদ্ধ হবে বাংলাভাষা এবং কালক্রমে উচ্চতর শিক্ষায় গবেষণাপত্রও হয়তো প্রকাশ করা যাবে মাতৃভাষায়।

বাংলার বিজ্ঞানসাহিত্যের অন্য দিকটি হলো 'সায়েন্স ফিকশন'। বিদেশে এই শিরোনামে গল্প-উপন্যাস-কবিতা নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। তবে বাংলাভাষায় 'সায়েন্স ফিকশন শাখায় এতাবৎ শুধুমাত্র গল্প এবং উপন্যাসেরই দেখা মিলেছে। কবিতাকে উল্লেখযোগ্যভাবে আমরা পাই নি। বাংলায় 'সায়েন্স ফিকশন'-এর প্রতিশব্দ হিসেবে 'বিজ্ঞানভিত্তিক কাহিনী' নামটি ব্যবহার করা হয়। আবার 'ফ্যানটাসি' নামে 'সায়েন্স ফিকশন'-এর যে উপধারাটি রয়েছে তার বিকল্প হিসেবে আমরা 'কল্পগল্প' অথবা 'কল্পবিজ্ঞানের গল্প' কিংবা

বিজ্ঞান সুবাসিত কাহিনী' এই নামগুলি ব্যবহার করি। নামগুলি কতোটা যথাযথ তা বলতে পারি না, তবে গল্পগুলির ধারার মূল চরিত্রের সঙ্গে এদের অনেকটাই সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায়। বিভিন্ন নামের তর্কবিতর্কে না গিয়ে, সায়েন্স ফিকশন' গল্পের শ্রেণী বিচারে না গিয়ে, বিজ্ঞানসাহিত্যের এই শাখাটিকে আমরা সামগ্রিকভাবে 'সায়েন্স ফিকশন' অথবা 'বিজ্ঞানভিত্তিক কাহিনী' এই নামে অভিহিত করবো।

স্পষ্টভাবে বলে রাখা ভালো, সায়েন্স ফিকশন গল্পের কোন চুলচেরা সংজ্ঞা নেই। নেই তার কারণ, এ-জাতীয় কোন সংজ্ঞা নির্দিষ্ট করা সম্ভব হয় নি। যখনই কোন সংজ্ঞা পাণ্ডতেরা স্থির করেছেন, তখনই দেখা গেছে, সেই সংজ্ঞার 'বাইরে' থেকেও একটি গল্প বা উপন্যাস সার্থক সায়েন্স ফিকশন হয়ে উঠেছে—অর্থাৎ, সংজ্ঞা নিরূপণকারী পাণ্ডতেরাই সেই লেখাটিকে এক বাক্যে সার্থক সায়েন্স ফিকশন বলে মেনে নিচ্ছেন। সোজা কথায়, সায়েন্স ফিকশনের ব্যাপকতা সংজ্ঞা-সন্ধানী পণ্ডিতদের বিপাকে ফেলে দিয়েছে। সেই কারণেই, 'সায়েন্স ফিকশন কাকে বলে ?' এই প্রশ্নের উত্তরে বিভিন্ন উদাহরণ তুলে ধরা ছাড়া কোন উপায় নেই। এ যেন ঠিক 'আম খেতে কেমন ? 'না আমের মতো'। আমের প্রসঙ্গ নিয়ে আসার কারণ, সায়েন্স ফিকশনকে আমের মতোই (বা, অন্য কোন সুস্বাদু ফলের মতোই) তার স্বাদ, বর্ণ ও গন্ধ থেকে চিনে নিতে হবে। বর্ণকে ভাষায় প্রকাশ করা যায়, কিন্তু স্বাদ ও গন্ধ বর্ণনা করতে গেলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আমাদের অন্য কোন স্বাদ ও গন্ধের উদাহরণের সাহায্য নিতে হয়। সায়েন্স ফিকশন গল্পের স্বাদ-বর্ণ-গন্ধ এতো বিচিত্র, এতো ব্যাপক, যে তাকে সংজ্ঞার বেড়াজালে বেঁধে ফেলা কোন ভাষার কর্ম নয়।

এতো সমস্যা সত্ত্বেও আগ্রহী পাঠকদের জন্য একটি 'অক্ষম' সংজ্ঞা তুলে ধরছি। 'সায়েন্স ফিকশন' হচ্ছে একটি এমন ধরনের কাহিনী, যার গল্পটি বলা হয় একটি বৈজ্ঞানিক অথবা ভবিষ্যৎ-দর্শনের ভিত্তির ওপর ভর করে, এবং গল্পের ঘটনা, ফলাফল, সবকিছুই ঐ বৈজ্ঞানিক অথবা ভবিষ্যৎ-দর্শনের ভিত্তির ওপরে পুরোপুরি নির্ভরশীল।' (মাইকেল স্টেপল্‌টন, ভূমিকা : দি বেস্ট সায়েন্স ফিকশন স্টোরিজ ; হ্যামলিন, 1977)

[স্বাভাবিকভাবে মাইকেল স্টেপল্‌টন নিজেই এই সংজ্ঞাটিকে 'সংজ্ঞা লেখার প্রচেষ্টা' বলে স্বীকার করে নিয়েছেন।

সায়েন্স ফিকশনের সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনার কারণ বাংলা ভাষায় যাঁরা সায়েন্স ফিকশন চর্চা করছেন তাঁদের অনেকেই সংজ্ঞা নিয়ে মাথা ঘামান না। ফল হিসেবে পাঠকরা হাতে পান কিছু অসংলগ্ন কল্পনার মোড়া আজগুবি কাহিনী। কোন্‌টা সায়েন্স ফিকশন আর কোন্‌টা নয় এ-বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা তৈরির জন্য সার্থক সায়েন্স ফিকশনের উদাহরণগুলিকেই সংজ্ঞা হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। একমাত্র তখনই অপদার্থ আজগুবি গল্পের হাত থেকে সায়েন্স ফিকশন পিপাসু পাঠকদের রেহাই দেওয়া সম্ভব হবে।

বাংলাভাষায় প্রথম সায়েন্স ফিকশন লিখেছেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। গল্পটির নাম 'নিরুদ্দেশের কাহিনী', রচনা-কাল বাংলা 1303 বঙ্গাব্দ। এই গল্পটিই প্রথম হেমেন্দ্রমোহন বসু প্রবর্তিত 'কুন্তলীন' পুরস্কার পায়। লেখক হিসেবে জগদীশচন্দ্র নিজের নাম গোপন রেখেছিলেন। পরে, বাংলা 1328 বঙ্গাব্দে গল্পটি যথেষ্ট সংস্কার করে 'পলাতক তুফান' নামে 'অব্যক্ত' গ্রন্থে প্রকাশ করেন। 'সারফেস টেনশন' বা 'পৃষ্ঠটান' এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ওপরে ভিত্তি করে জগদীশচন্দ্র গল্পটি লিখেছিলেন এবং এই তত্ত্বটিকে বাদ দিলে গল্পটির পক্ষে গল্প হয়ে ওঠাই অসম্ভব ছিলো (মাইকেল স্টেপলটনের সংজ্ঞা দ্রষ্টব্য), সেই কারণেই 'পলাতক তুফান' সায়েন্স ফিকশন। এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ-যোগ্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বেনের মেয়ে' উপন্যাসটি। 'বেনের মেয়ে' উপন্যাসে পৃষ্ঠটান তত্ত্বের প্রয়োগ ছিলো—অর্থাৎ, পিপে পিপে তেল ঢেলে ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রকে শান্ত করা—কিন্তু তাই বলে 'বেনের মেয়ে' সায়েন্স ফিকশন নয়। কারণ উপন্যাসের 'ঘটনা ও ফলাফল' ঐ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ওপরে 'পুরোপুরি নির্ভরশীল' নয়।

বাংলায় সায়েন্স ফিকশনের ভাষা নিয়ে নতুন করে কোন আলোচনা করছি না। কারণ বাহন হিসেবে ভাষার গুরুত্ব আগেই আমরা উল্লেখ করেছি। উপযুক্ত ভাষাই হচ্ছে যে-কোন লেখার প্রাথমিক শর্ত। সুতরাং সায়েন্স ফিকশনের উদ্দেশ্যও বিষয় নিয়ে আমরা এবারে সামান্য পর্যালোচনা করবো।

আচার্য জগদীশচন্দ্র উননব্বই বছর আগে বাংলা সায়েন্স ফিকশনের সূচনা করেছিলেন। পরবর্তীকালে সর্বশ্রী প্রেমেন্দ্র মিত্র, ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, সত্যজিৎ রায়, সমরজিৎ কর, অদ্রীশ বর্ধন প্রমুখ সেই সূচনার শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছেন। বর্তমানে সায়েন্স ফিকশন সাহিত্য বহু লেখকের নিষ্ঠা, পরিশ্রম ও সাধনার মহাযজ্ঞ। সেই কারণেই লেখকদের দায়িত্ব অনেক বেড়েছে। মনে রাখতে হবে, তাঁদের লেখায় শিক্ষিত হয়েই তৈরি হবে আগামী দিনের সায়েন্স ফিকশন পাঠক।

পাঠক সাধারণের মনের খোরাক জোগানো ছাড়াও সায়েন্স ফিকশনের একটা বড় ভূমিকা রয়েছে। সেটা হলো বিজ্ঞান মনস্কতা তৈরি করা। বিজ্ঞানের দিকে পাঠককে আকর্ষণ করা। জনপ্রিয় বিজ্ঞান গ্রন্থ বা নিবন্ধ পাঠের জন্য পাঠককে প্রস্তুত করা। বিদেশী লেখকদের ক্ষেত্রে এই শেষোক্ত দায়িত্বটি প্রায় নেই বললেই চলে। অথচ আমাদের দেশে এই দায়িত্বটিই প্রধান দায়িত্ব। পাঠক ও জনপ্রিয়-বিজ্ঞানের মাঝে সায়েন্স ফিকশন এক সেতুবন্ধন।

কিছুদিন আগে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ আয়োজিত এক

সান্ধ্য বৈঠকে বিজ্ঞান-সাহিত্য নিয়ে আলোচনায় শ্রদ্ধেয়া সাহিত্যিক শ্রীমতী লীলা মজুমদারের একটি মন্তব্য আমাকে যথেষ্ট অবাক করেছে। তিনি বলেছেন, প্রায় একশো বিদেশী সায়েন্স ফিকশন পড়ে তার মধ্যে একটিও মানবিক গল্প তিনি খুঁজে পান নি। বাংলার সায়েন্স ফিকশনকে মানবিক হতে হবে।

সন্দেহ নেই, মানবিক না হলে কোন গল্প-উপন্যাসই কালজয়ী হওয়ার দাবীদার হতে পারে না এবং সায়েন্স ফিকশনের সবচেয়ে বড় সাফল্য মানবিক হয়ে ওঠার মধ্যে। কিন্তু একথা কি আমরা ভুলতে পারি, ইংরিজী ভাষায় রচিত প্রথম প্রকৃত সায়েন্স ফিকশন উপন্যাসটিই সর্বার্থে মানবিক! উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় 1818 খৃষ্টাব্দে। লেখিকা পি. বি. শেলির স্ত্রী মেরি ওলস্টোন ক্র্যাফট শেলি। নাম, 'ফ্র্যাঙ্কেন-স্টাইন, অর দি মডার্ন প্রমিথিউস', যা শুধু 'ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন নামেই পাঠক সমাজে পরিচিত। এই উপন্যাসটি যে কালজয়ী তা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত। কিন্তু শুধুমাত্র ইতিহাস রক্ষার তাগিদেই আচার্য জগদীশচন্দ্রের 'পলাতক তুফান' আমরা পড়ি, আলোচনা করি। সন্দেহ নেই জগদীশচন্দ্রের গল্পটি সার্থক সায়েন্স ফিকশান হলেও মানবিক নয়। তাই ইতিহাস বহু আগেই 'পলাতক তুফান' কে বন্দী করেছে। আমার বিশ্বাস শ্রীমতী মজুমদারের মন্তব্য বাংলা সায়েন্স ফিকশানে যতোটা প্রযোজ্য বিদেশী সায়েন্স ফিকশনের ক্ষেত্রে তার শতাংশের একাংশও নয়। আজ বিদেশী সায়েন্স ফিকশন বলতে যাঁদের লেখা প্রথমেই আমাদের মনে জায়গা করে নেয় তাঁদের অধিকাংশ গল্পই যে মানবিকতার প্রমাণ রবার্ট লুই স্টিভেনসন, এইচ. জি. ওয়েলস, রে ব্র্যাডবেরি, আর্থার সি. ক্লার্ক, আইজ্যাক অ্যাসিমভ, ক্লিফোর্ড ডি. সিম্যাক, হ্যারি হ্যারিসন, জেমস্ ব্লিশ, ফেডরিক ব্রাউন, গ্যারি কিলওয়ার্থ (অপেক্ষাকৃত কম নামী) প্রভৃতির প্রতিনিধি স্থানীয় গল্প-সংকলন। আগ্রহী পাঠকের জন্য কয়েকটি 'মানবিক' গল্পের উল্লেখ করলাম: দি স্ট্রেঞ্জ কেস অফ ডঃ জেকিল অ্যাণ্ড মিঃ হাইড লেখক: রবার্ট লুই স্টিভেনসন; দি ইনভিজিবল্ ম্যান, দি ওয়ার অফ দি ওয়ার্ল্ড'স,, দি ডায়মণ্ডমেকার (লেখক: এইচ. জি. ওয়েল্‌স্); দি গিফ্‌ট্, ক্যালিডোস্কোপ, দি প্রে গ্রাউণ্ড, দি লাস্ট নাইট অফ দি ওয়ার্ল্ড' (লেখক: রে ব্র্যাডবেরি); নাইটফল, দি ফান দে হ্যাড, দি লাস্ট কোশ্চেন (লেখক: আইজ্যাক অ্যাসিমভ); দি টিন য়ু লাভ টু মাচ (লেখক: রবার্ট রুচ); লেট আস গো টু গোলগোথা (লেখক: গ্যারি কিলওয়ার্থ); দি মর্টাল ইমমর্টাল (লেখক: মেরি শেলি)। খুব সহজেই যে এরকম আরও কয়েক শো গল্পের নাম খুঁজে পাওয়া যাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। অর্থাৎ, র‍্যাণ্ডম সিলেকশান পদ্ধতিতে যদি একশো বিদেশী সায়েন্স ফিকশন পড়ে ফেলা যায় তাহলে তার মধ্যে 'একটিও' মানবিক গল্প না পাওয়াটা এক বিরলতম দুর্ঘটনা। তবে শ্রীমতী মজুমদারের এই বক্তব্যের সঙ্গে আমি একমত যে বাংলা সায়েন্স ফিকশন লেখকের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত মানবিক গল্প লেখা। তবে পাঠকের মনোরঞ্জনের জন্য যেসব সায়েন্স ফিকশন দেশে-বিদেশে রচিত হয়েছে সেগুলির প্রয়োজনও একেবারে নস্যাৎ করা যায় না। অন্তত বাংলা সায়েন্স ফিকশনের সাম্প্রতিক 'শৈশব' পর্যায়ে সবরকমের যোগ্য সায়েন্স ফিকশনকেই আমাদের সাদরে স্বাগত জানাতে হবে।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের একই আলোচনা সভায় খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ ও সায়েন্স ফিকশন লেখক শ্রীবিমলেন্দু মিত্র যে বক্তব্য রাখেন তার একটি অংশে বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। শ্রীমিত্র বলেন, 'বিজ্ঞানের সঠিক ও দৃঢ় ভিত্তি ছাড়া সায়েন্স ফিকশন লেখা 'চলবে না'। যেমন, আলোর-চেয়ে-দ্রুতগামী রকেটের ব্যবহার, কিংবা ভিন্ গ্রহের প্রাণী ইত্যাদি নিয়ে লিখলে সে লেখা আজগুবি বলে বিবেচিত হবে'।

এটা ঠিক যে, 'আজগুবি' গল্পের হাত থেকে অবশ্যই বাংলা সায়েন্স ফিকশনকে বাঁচাতে হবে। কিন্তু তাই বলে আলোর-চেয়ে দ্রুতগামী মহাকাশ যান অথবা ভিন্ গ্রহের প্রাণীর ওপরে নিষেধাজ্ঞা জানালে চলবে না। সায়েন্স ফিকশনে বিজ্ঞানের ভিত্তির পাশাপাশি থাকে কল্পনা। যা এখনও বিজ্ঞানের বাইরে তাই নিয়েই বিজ্ঞানমনস্ক কল্পনা করেন সায়েন্স ফিকশন লেখক।

এক নক্ষত্র থেকে অন্য নক্ষত্রে ভ্রমণের জন্য একদিন লেখকের কল্পনা উন্মুখ হয়েছিলো। তখন সে দেখলো সবচেয়ে দ্রুতগামী মহাকাশযান তৈরি করলেও খুব দূরের নক্ষত্রে যাওয়া সম্ভব নয়। কারণ সবচেয়ে 'দ্রুতগামী' অর্থে আলোর সমান গতিবেগ সম্পন্ন মহাকাশযান, আর বেশির ভাগ নক্ষত্রই পৃথিবী থেকে শ', লক্ষ, কোটি কোটি কিংবা তারও বেশি আলোকবর্ষ দূরে। অতএব মানুষকে এক আয়ুষ্কালের মধ্যে আন্তঃনক্ষত্র ভ্রমণ করতে হলে এমন এক মহাকাশযান প্রয়োজন, যার গতিবেগ হবে আলোর চেয়ে অনেক বেশি দ্রুতগামী। আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের মধ্যে আলোর চেয়ে দ্রুতগামী হাইপোথেটিক্যাল বা কাল্পনিক কণা 'ট্যাকিয়ন'-এর হদিশ দেওয়াই ছিলো, সুতরাং সায়েন্স ফিকশন লেখকরা সেই সূত্রকে আঁকড়ে ধরে তৈরি করলেন 'ট্যাকিয়ন রকেট'। আইজ্যাক অ্যাসিমভ হাইপার স্পেসের সাহায্য নিয়ে আবিষ্কার করলেন 'স্পেস জাম্প'। কেউ বা বেশি দূরত্বকে কম করার জন্য ব্যবহার করলেন আইনস্টাইনের তত্ত্ব-আহরিত 'কার্ভেচার অফ স্পেস'। এইভাবে প্রথম বইয়ের পৃষ্ঠায় সম্ভব হয়েছিলো আন্তঃনক্ষত্র ভ্রমণ। একেই বোধহয় বলা যায় 'পোয়েটিক লাইসেন্স' বা শিল্পীর স্বাধীনতা।

একই বক্তব্য রাখা যায় 'ভিন গ্রহের প্রাণীদের' সম্পর্কে। আজ সন্দেহাতীত ভাবে বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে, পৃথিবী ছাড়া

সূর্যের যে অন্যান্য গ্রহগুলি রয়েছে তার কোনটিতেই উন্নত প্রাণের চিহ্ন নেই। ফলে কোন 'সচেতন' সায়েন্স ফিকশন লেখকের পক্ষে এই বৈজ্ঞানিক তথ্যকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। তবুও কেউ যদি এই প্রমাণিত সত্য-বিরোধী সায়েন্স ফিকশন লেখেন তাহলে সেই লেখাকে নিশ্চয়ই অভিযুক্ত করতে হবে। কিন্তু তাই বলে সাধারণভাবে সব ভিন্‌গ্রহের প্রাণীকেই বাতিল করা যায় না। কারণ আমেরিকার কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞানের অধ্যাপক ফ্র্যাঙ্ক ড্রেক গবেষণা করে যে বিশ্ববিখ্যাত 'ড্রেক সমীকরণ' আবিষ্কার করেছেন, তার সাহায্য নিয়ে বলা যায়, আমাদের ছায়াপথে মোট এক কোটি কুড়ি লক্ষ গ্রহে বুদ্ধিমান প্রাণী থাকা সম্ভব। সন্দেহ নেই, এই সম্ভাবনাটি পরীক্ষিত সত্য নয়, কিন্তু তাই বলে— একে উড়িয়ে দেবার মতো কোন প্রমাণও বিরোধী শিবিরের বিজ্ঞানীরা দাখিল করতে পারেন নি। সুতরাং এতোবড় একটা সম্ভাবনাময় পথ খোলা থাকতেও সায়েন্স ফিকশন লেখকরা যে কেন ভিন্‌গ্রহের প্রাণীদের নির্বাসন দেবেন তা আমার কাছে স্পষ্ট নয় এবং একই সঙ্গে দেশী ও বিদেশী লেখকদের ধন্যবাদ যে তাঁরা এখনও নিয়মিতভাবে ভিন্‌গ্রহের প্রাণীদের নিয়ে গল্প-উপন্যাস লিখছেন—লিখবেনও।

একথা একশো বার সত্যি যে কোন 'সচেতন' সায়েন্স ফিকশন লেখকেরই প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক সত্যকে নস্যাৎ করে গল্প-উপন্যাস লেখা উচিত নয়। একই সঙ্গে তাঁদের গল্পে থাকা উচিত বিজ্ঞানের সাম্প্রতিকতম তথ্য। কোন সায়েন্স ফিকশনের বৈজ্ঞানিক তথ্য অথবা তত্ত্বগত ত্রুটি অপসারণ করার জন্য আবারও আমরা বিজ্ঞান সম্পাদকদের দ্বারস্থ হবো। দুঃখের বিষয় পত্রিকা সম্পাদক অথবা প্রকাশকেরা এখনও বিজ্ঞান সম্পাদকের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তেমন সচেতন হন নি।

সায়েন্স ফিকশনের বিষয়ের কোন নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই—সীমারেখা টানা যায় না। সেরকম ভাবে যদি বিজ্ঞানীরা সীমারেখা টেনে দিতেন তাহলে টাইম মেশিন, রোবট, দূর-নক্ষত্রে মহাকাশ অভিযান, সবই হয়ে যেতো বিষয়বস্তু হিসেবে নিষিদ্ধ। শুধুমাত্র রোবট ও মহাকাশ অভিযান বাতিল করলেই পৃথিবীর অন্তত শতকরা আশি ভাগ সায়েন্স ফিকশন যে বাতিল হয়ে যাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর টাইম মেশিন? এইচ. জি. ওয়েল্‌স্ টাইম মেশিনের প্রবর্তন করার পর 'যন্ত্রটি' তো সায়েন্স ফিকশন লেখকদের অস্ত্রশালার অন্যতম অস্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বৈজ্ঞানিক তথ্য বা তত্ত্বে নির্ভুল না হয়েও কোন সায়েন্স ফিকশন যে পাঠকের প্রিয় হয়ে উঠতে পারে তার সবচেয়ে উদাহরণ এইচ. জি. ওয়েল্‌স-এর 'দি ইনভিজিবল্ ম্যান।' এই উপন্যাস বর্ণনা করা হয়েছে, গল্পের নায়ক অদৃশ্য হয়েও সবকিছু পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু উচ্চমাধ্যমিকের বিজ্ঞানের ছাত্র মাত্রেই জানেন কোন অদৃশ্য মানুষের দৃষ্টিশক্তি থাকা সম্ভব নয়। সে অদৃশ্য হলেই হয়ে যাবে সম্পূর্ণ অন্ধ কারণ তার শরীরের প্রতিসরাঙ্ক তখন বায়ুতে আলোর প্রতিসরাঙ্কের সমান হয়ে যাবে (প্রতিসরাঙ্কের মান = 1·00)। ফলে দৃশ্যমান জগতের আলো থেকে তার চোখ কোন প্রতিবিম্বই তৈরি করতে পারবে না।

প্রতিসরণের এই সূত্রগুলি ওলন্দাজ অঙ্কবিদ উইলব্রর্ড স্নেল আবিষ্কার করেন 1621 খৃস্টাব্দে। এইচ. জি. ওয়েলস জন্মগ্রহণ করেন 1866 খৃস্টাব্দে এবং তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতক হন। সুতরাং আমরা ধরে নিতে পারি 'দি ইনভিজিবল্ ম্যান'-এর বিজ্ঞানের গলদটুকু সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। কিন্তু যেহেতু নায়ক অন্ধ হয়ে গেলে তাঁর গোটা উপন্যাসটিই মাটি হয়ে যায়, সেই কারণে বিজ্ঞানের ঐ গলদটিকে তিনি প্রশ্রয় দিয়েছিলেন। এই ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও 'দি ইনভিজিবল্ ম্যান' মানবিক সায়েন্স ফিকশন হয়ে উঠেছে, হয়ে উঠেছে কালজয়ী। এতো সত্ত্বেও, এই উপন্যাসটিকে 'ব্যতিক্রম' ধরে নিয়ে সায়েন্স ফিকশন লেখকদের উচিত 'সচেতন হয়ে লেখা।

সব আলোচনার সার কথা হিসেবে বলা যায়, সায়েন্স ফিকশন গল্পে যে তিনটি চারিত্রিক উপাদান থাকলে গল্পটি সার্থক গল্প হয়ে উঠতে পারে সেগুলি হলো : বিজ্ঞান সচেতনতা, ভাষার প্রসাদগুণ ও মানবিকতা।

আমরা আশা করি, আচার্য জগদীশচন্দ্র একার হাতে যে দুটি শাখাকে যুগ্মভাবে পত্তন করে গেছেন সেই বিজ্ঞান নিবন্ধ ও সায়েন্স ফিকশন আজকের ও আগামীকালের বিজ্ঞান-সাহিত্যিকদের হাতে আরো শতগুণে সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। তখন বাংলা-বিজ্ঞান সাহিত্য নিশ্চয়ই বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে উল্লেখযোগ্য আসনেই দাবীদার হবে মাথা উঁচু করে।

বিজ্ঞান সাহিত্য ও কল্পবিজ্ঞান

রতন মোহন খাঁ*

দার্শনিক, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী সবাই এই জড়রাজ্যে মনের কারবারী। পৃথিবীতে মানুষই মনোজগতের অধিকারী। সুখ-দুঃখ, স্নেহ-ভালবাসা, আনন্দ বেদনা প্রভৃতি অনুভূতির সঙ্গে জানা-অজানা নানা ঘটনা মিলেমিশে প্রতিটি মানুষের মনের রাজ্যে যে রূপ পরিগ্রহ করে, সেটিই হচ্ছে তার নিজস্ব অর্জিত জ্ঞান। এ জ্ঞানকে অপরের কাছে বিতরণ করাই মানবিক ধর্ম। এই ধর্মই মানুষকে করে সৃজনশীল, শিল্পকর্মে তাকে করে উদ্বুদ্ধ। সাহিত্যও এই জ্ঞানেরই বহিঃপ্রকাশ। তবে সব বলা বা লেখাই সাহিত্য নয়। সাহিত শব্দ থেকে সাহিত্য, তাই সাহিত্যের সঙ্গে আছে মিলনের সম্পর্ক। আমার মনের নিজস্ব অভিব্যক্তিগুলি বলা বা লেখার মধ্য দিয়ে যখন যুক্তি ও ভাষার নৈপুণ্যের রূপ, রস ও সৌন্দর্যের ডালি বেয়ে অপরের চেতনার সঙ্গে সহজে ও স্বচ্ছন্দে মিলিত হয়, তখনি ঐ প্রকাশ হয় সাহিত্য। বাস্তবতার সিঁড়ি বেয়ে কল্পলোকে যথেচ্ছ পাড়ি জমাতে যে সাহিত্যে বাঁধা নেই, সমালোচকের বিচারে সেটি ভাবাত্মক সাহিত্য। বিজ্ঞানও বিশেষ জ্ঞান, তবে যে কোন বিশেষ জ্ঞানই বিজ্ঞান নয়। যুক্তি ও পরীক্ষার মধ্যে সেতুবন্ধনের মাধ্যমে সীম ও অসীমের নানা কার্য্যের সঙ্গে কারণের সংহতি স্থাপনই বিজ্ঞান। তাই বিজ্ঞান চিন্তায় কল্পনার স্থান থাকলেও সেখানে আছে বাঁধন, আছে নিয়ম-শৃঙ্খলার কড়া অনুশাসন। বিজ্ঞানের এক নিজস্ব ভাষা আছে, সেটা নাকি গাণিতিক ভাষা। এ ভাষায় বিজ্ঞানের পঠন-পাঠন বা গবেষণার কাজ চলে, এ ভাষায় বিজ্ঞানীর মন ভোলে। কিন্তু বিজ্ঞানীও সমাজের একজন এবং বিজ্ঞানের কথা জানবার ও এর ফল ভোগ করবার অধিকার সমাজের সবার। এছাড়া যা সত্য তার শিক্ষা সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে, দেশের সর্বাঙ্গীন কল্যাণে এটি অবশ্য কর্তব্য কর্ম। সাধারণের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য, সত্যকে উপলব্ধি করানোর জন্য; অজ্ঞানতাকে দূর করার জন্য বহু বিজ্ঞানীর সাধনালব্ধ ফলগুলিকে প্রকাশ করতে যে সাহিত্যের সমাহার সেটি বিজ্ঞানসাহিত্য। সমালোচকের বিচারে এটি জ্ঞানাত্মক সাহিত্য।

দেখা যাচ্ছে বিজ্ঞানকে সাহিত্যে প্রকাশ হলো বিজ্ঞান সাহিত্য। বিজ্ঞানের ঘটনাবলী এখানে যথাযথ প্রকাশিত হবে, সত্যের অপলাপ ঘটবে না, কল্পনায় অতিরঞ্জিত হবে না, অথচ লেখা হবে সুখপাঠ্য, সহজবোধ্য (কাব্যিক ও গতিশীল হলে নিঃসন্দেহে ভাল রচনা)। এ সাহিত্য সৃষ্টির জন্য লেখককে হতে হবে বিজ্ঞানী ও সাহিত্যিক। যে সাহিত্যে এসব নিয়মের শৈথিল্য ঘটে; অর্থাৎ কৌতুকে ও কল্পনায় সত্যের অপলাপ ঘটে, আসল তত্ত্ব ও তথ্য তলিয়ে যায়, সেটি কি বিজ্ঞানসাহিত্য? বিজ্ঞানের কোন ঘটনা বা আবিষ্কারের অবমূল্যায়ন করে বা অপব্যাখ্যা করে যা বিজ্ঞানের সামান্য ছোঁয়া লাগিয়ে যথেচ্ছ কল্পনার রঙে রাঙিয়ে আজকাল যে এক শ্রেণীর সাহিত্য গড়ে উঠছে, সেটি বাংলাসাহিত্যে কল্প-বিজ্ঞান নামে পরিচিত। বলা হচ্ছে এটাও বিজ্ঞানসাহিত্য। সমালোচকের নিক্তিতে বিজ্ঞান সাহিত্য হলো জ্ঞানাত্মক, এ সাহিত্যে কল্পনার প্রাধান্য বা স্থানই প্রায় নেই। তাহলে তথাকথিত কল্পবিজ্ঞানকে কি বিজ্ঞানসাহিত্য বলা যাবে?

কল্পবিজ্ঞান, বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প ও রূপকথার প্রকৃতি কেমন হবে, কল্পনার রথ কোথায় থামবে—এই সীমারেখা নিয়েই প্রশ্ন, এই সীমারেখা নিয়েই দ্বন্দ্ব। তার উপর এ অবিচারের দায়িত্বই পালন করবে কে? লেখক আপন খেয়ালে তার মনোজগতের নিজস্ব অভিব্যক্তিগুলিকে ভাষার রূপ দেয়। যখন ঐ রূপ অনেকের মনে রেখাপাত করে তখন ঐ প্রকাশ হয় সার্থক সাহিত্য। ফরমাস মত প্রবন্ধ লেখা যায়, সংবাদ সরবরাহ করা যায়, কিন্তু সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি হয় না। সাহিত্য-স্রষ্টার নিজস্ব আকুতি, নিজস্ব অনুভূতি, নিজস্ব চিন্তার ফসল। ফসলের গুণাগুণ বিচার বা শ্রেণীবিভাগের দায়িত্ব পাঠক ও সমালোচকের। বিপদ হলে বিচারের জন্য কোন আইনীআকবরী নেই। ফলে কল্পবিজ্ঞান না রূপকথা বা রূপকথা না কল্পবিজ্ঞান-এর পার্থক্য বোঝা ভার।

ইংরাজী science fiction-এর বাংলা পরিভাষা কল্পবিজ্ঞান। 1865 খৃস্টাব্দে জুলভার্নের 'পৃথিবী থেকে চাঁদে' এবং এর পাঁচ বছর পরে 'চাঁদের চারদিকে' প্রকাশিত বই দুটিতে ঐ সময় পর্যন্ত অর্জিত বৈজ্ঞানিক তথ্যকে এমন সুন্দর ভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে সমসাময়িক পাঠকদের অধিকাংশই কাল্পনিক চান্দ্রকাহিনী বলে ভাবতেই পারে নি। এমনকি কিছুটা এদিক ওদিক করে নিলে মনে হয় অ্যাপেলো অভিযানের বাস্তব অভিজ্ঞতার কাহিনী। জুলভার্নের কামানের গোলার প্রাথমিক বেগ ছিল সেকেণ্ডে 12,000 গজ, অ্যাপেলোর ঐ বেগ ছিল সেকেণ্ডে 12,300 গজ। জুল ভার্নের গোলা ছুটেছিল ফ্লোরিডার স্টোনহিল থেকে আর অ্যাপেলোর উৎক্ষেপণ মঞ্চ এরই কাছে কেপ কেনেডিতে। যান্ত্রিক কৌশলে ধাক্কা সামলান ও গতিপথ পরিবর্তনের উল্লেখ আছে জুল ভার্নের কাহিনীতে, অ্যাপেলো যানেও অনুরূপ ব্যবস্থা ছিল। জুলভার্ন পাঠিয়েছিলেন তিনজন অভিযাত্রীকে, অ্যাপেলো অভিযানেও অভিযাত্রীর সংখ্যা ছিল তিন। জুল ভার্নের অভিযাত্রীরা চাঁদের তন্দ্রা সাগরের ছবি তুলেছিল, অ্যাপেলো—11 এর অভিযাত্রীরা ঐ সাগরের একটি অংশে অবতরণ করেছিল। জুল ভার্নের যাত্রীরা নেমেছিল প্রশান্ত মহাসাগরে আর অ্যাপেলো

* সিটি কলেজ, কলিকাতা-700009

শেষ যাত্রীরাও নেমেছিল প্রশান্ত মহাসাগরে। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্য এবং কল্পনাশক্তির এ এক অপূর্ব সমন্বয়। এরূপ কাহিনীতে বিজ্ঞান মানসিকতা বা সচেতনতা বিন্দুমাত্র বিঘ্নিত হচ্ছে না বরং বিজ্ঞানের প্রতি সাধারণ মানুষের আকর্ষণ বাড়ছে, বিজ্ঞানের সম্ভাবনা বিশেষ করে প্রযুক্তিবিজ্ঞানের উৎকর্ষতা সম্বন্ধে মানুষকে আশাবাদী করছে। কিন্তু আমাদের দেশে বিজ্ঞান ঔৎসুক্যতার সুযোগ নিয়ে সস্তায় বাজিমাত করার জন্য কল্পবিজ্ঞানের নামে অপবিজ্ঞান, আজগুবি, ভোজবাজী আরো কত কিনা চলছে। রূপকথার রাজকুমারের মত আলাদীনের প্রদীপের দৈত্যের মত কল্পবিজ্ঞানে বিজ্ঞানী বা নায়ক সহজে পাতালে প্রবেশ করছে, না হয় কোন অদৃশ্য যানে শূন্যে বিলীন হচ্ছে (যেহেতু গ্রহান্তরে রকেট যাচ্ছে)। শক্তির রূপান্তর যখন বৈজ্ঞানিক সত্য, তাই যে কোন পার্থিব বস্তুর রূপান্তর হামেশাই ঘটতে পারে। এ কারণেই তন্ত্রসাধকের মন্ত্রে মানুষ হয়ে যায় সাপ, গাছের পাতা বা শিকড়ের গুণে মানুষ হয় অমিত শক্তির অধিকারী। এ ধরণের উদ্ভট কাহিনী কল্পবিজ্ঞান নামে চললে তাতে অরণ্যদেবের কাহিনীকে আজগুবি বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, দানিকেনের মতবাদকে ধিক্কার দেবার অধিকার থাকে না।

পাঠকের মনে হতে পারে লেখক কল্পবিজ্ঞানের ঘোরতর বিরোধী। কথাটা ঠিক তা নয়। কাক কাকই থাকুক, কিছু ময়ূরের পালক পরিয়ে তাকে ময়ূর বানান শুধু হাস্যকর নয়, কাকের পক্ষেও ক্ষতিকর। বিজ্ঞানের ঘটনা, তত্ত্ব, তথ্য আবিষ্কার প্রযুক্তিবিজ্ঞানের নানা কলাকৌশল প্রভৃতি নিয়ে সাহিত্য গড়ে উঠছে এবং গড়ে উঠবে। এটা কাম্য ও সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর। বিজ্ঞান সচেতনতা বাড়াতে, বিজ্ঞান মানসিকতা গড়তে, সুস্থ পরিবেশে বেঁচে থাকতে বৈজ্ঞানিক সত্যগুলিকে অবশ্যই বিজ্ঞানসাহিত্যের মাধ্যমে সবার মধ্যে প্রচার করতেই হবে। কিন্তু বিজ্ঞানের নামে ধোঁকা দেওয়া সমাজের অগ্রগতির পরিপন্থী, বিশেষ করে কিশোর মনে এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী। কল্পকাহিনী বলে প্রচারিত না হয়ে কল্পবিজ্ঞান নামে বিজ্ঞান বলে প্রচারিত হওয়ায় বিভ্রান্তি ঘটছে, মিরাক্‌লের জয়জয়কার ঘটছে। এটা কি বাঞ্ছনীয় ?

ভালো বিজ্ঞান-সাহিত্যের জন্য চাই বিজ্ঞানী ও সাহিত্যিকের মিলিত প্রয়াস

অমিত চক্রবর্তী*

প্রথমেই জানিয়ে রাখি, যাঁরা মনে করেন বাংলাভাষায় বিজ্ঞান-সাহিত্যের মান নিতান্তই অনুজ্জ্বল আমি তাঁদের দলে নেই। সুতরাং, যেসব প্রবীণ মানুষেরা বলেন—অক্ষয় দত্ত, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য বা জগদানন্দ রায়ের পর বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্যের ধারা আর তেমনভাবে পুষ্ট হয় নি—হয় তাঁরা এখনকার বিজ্ঞান লেখকদের লেখালেখির সঙ্গে তেমনভাবে পরিচিত নন, আর নয়তো 'নস্টালজিয়া' নামক ব্যাধিতে আক্রান্ত। বরং যত দিন যাচ্ছে, বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে সাধারণ মানুষের আগ্রহ যেমন বাড়ছে—তেমনি সেই আগ্রহ মেটানোর মতো সরস লেখাও ক্রমশঃ বেশি করে চোখে পড়ছে। বাংলা খবরের কাগজগুলির রবিবারের পাতায় বিনোদন মূলক প্রবন্ধ-গল্পের পাশাপাশি বিজ্ঞানের বিষয় নিয়মিত জায়গা করে নিচ্ছে; সাময়িক পত্র পত্রিকা—তা সে কিশোর-কিশোরী কিংবা বয়স্ক পাঠক, যার জন্যই হোক না কেন বিজ্ঞান-ভিত্তিক গল্প-ছড়া-প্রবন্ধ ছাপতে আগ্রহী; বাংলাভাষায় বিজ্ঞান-পত্রিকার সংখ্যা এক থেকে দেড় ডজন, যার কিছু কিছুর প্রকাশ অবশ্য অনিয়মিত। তাছাড়া, পপুলার সায়েন্সের বই (বিশেষ করে কুইজ-জাতীয় বই) প্রকাশে বইপাড়ার প্রকাশকদের নিদারুণ উৎসাহের কথা এখন কারোরই অজানা নয়।

এ তো গেল এপার-বাংলার কথা। ওপার-বাংলার অবস্থা তুলনায় আরো ভাল। ওখানকার বই কিংবা পত্র-পত্রিকার বাহ্যিক রূপটা তেমন আকর্ষণীয় না হলেও—বিজ্ঞানের নানা দুরূহ বিষয়কে বাঙালী পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার অনায়াস ভাষা-ভঙ্গি রীতিমতো চমক জোগায়। মোট কথা, বাংলায় বিজ্ঞান-ভিত্তিক গল্প প্রবন্ধের চাহিদা যে ক্রমশঃ ভাল জাতের বিজ্ঞান লেখকের জন্ম দিচ্ছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

বইপত্রের জগৎ ছেড়ে এবারে আরও দুটো শক্তিশালী গণ-মাধ্যমের দিকে সপ্তাহে প্রায় ঘণ্টা তিনেকের মতো বিজ্ঞান-বিষয়ক অনুষ্ঠান শুরু করার সময় মনে হয়েছিল—সহজ বাংলায় বিজ্ঞানের নানা বিষয় নিয়ে বলার মতো 'ট্যালেণ্ট' পাওয়া রীতিমতো দুষ্কর হবে। আশঙ্কাটা যে অমূলক তা ইতিমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে। বেতারে বিজ্ঞান বিষয়ক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা এখন বছরে গড়ে পাঁচশো। এঁদের মধ্যে অনেকেই আছেন যাঁদের কাছে ঝরঝরে বাংলায় বিজ্ঞানের দুরূহ বিষয় নিয়ে আলোচনা করাটা আজ আর কঠিন না হলেও, একসময় তাঁরা মনে করতেন—ইংরাজী ছাড়া দেশীয় কোনও ভাষায় বিজ্ঞানের কোনও বিষয় বোঝানো আদৌ সম্ভব নয়। এই মুহূর্তে প্রায় জোর দিয়েই বলা যায়—কলকাতা বেতার কেন্দ্রের কথক-তালিকায় শতাধিক বিশেষজ্ঞ আছেন যাঁদের কথা বা লেখায় প্রসাদগুণের ঘাটতি নেই। সম্ভবতঃ সেই কারণেই বিবিধ ভারতী এবং দূরদর্শনের সঙ্গে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও আকাশবাণীর বিজ্ঞান বিষয়ক অনুষ্ঠানের শ্রোতার সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়ছে, অন্ততঃ শ্রোতাদের কাছ থেকে পাওয়া চিঠির সংখ্যা তা-ই প্রমাণ করে। অবশ্য শহরাঞ্চলের তুলনায় এখন স্বভাবতঃই গ্রাম-মফঃস্বলেই রেডিওর শ্রোতার সংখ্যা বেশী, গান-নাটক কিংবা বিজ্ঞান-অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে সে ব্যাপারে বিশেষ ফারাক নেই।

টেলিভিসনের ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। যেহেতু এটি মূলতঃ 'ভিস্যুয়াল মাধ্যম', এখানে কথার থেকে ছবির উপর জোরটা দেওয়া হয় বেশী। তাছাড়া কলকাতা দূরদর্শনের 'বিজ্ঞান-প্রসঙ্গে' বা 'সুস্বাস্থ্য' সাধারণভাবে তথ্যমূলক সাক্ষাৎকার ভিত্তিক অনুষ্ঠান—অনেকটা বেতারের আলোচনা বা প্রশ্নোত্তরের আসরের মতো। এ জাতীয় অনুষ্ঠানে আকর্ষণীয় ভাষা ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না; আর সেজন্যই যদিও এগুলির শ্রোতা বা দর্শকের সংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়ছে তবু তাকে বিজ্ঞান-সাহিত্যের জনপ্রিয়তার মাপকাঠি বলে ধরা যাবে না। প্রসঙ্গতঃ ব্রাউনস্কির 'অ্যাসেণ্ট অফ্ ম্যান' জাতীয় বিজ্ঞানের বই নিয়ে ইংরাজীতে যে টেলিভিসন-সিরিয়াল তৈরি হয়েছে—বাংলায় সে জাতীয় প্রচেষ্টা থেকে আমরা যে এখনও অনেক দূরে রয়েছি তা স্বীকার করে নেওয়া ভাল। তবে দূরদর্শনের পর্দায় বিজ্ঞানের জটিল তত্ত্বকে সহজ মনোরম ভঙ্গীতে দর্শকের সামনে উপস্থাপিত করার মতো মানুষের যে অভাব নেই—সেটা মানতেই হবে।

বিজ্ঞান-সাহিত্য নিয়ে এতসব ভাল ভাল কথার পর দু'চারটে সমস্যার দিকে এবারে নজর ফেরানো যাক। এখন থেকে প্রায় দেড়শো বছর আগে বাংলাভাষায় বিজ্ঞান-সাহিত্যের সূচনা হলেও, বিজ্ঞান-লেখকের কোনও বিশেষ শ্রেণী এখনও পর্যন্ত যে গড়ে ওঠে নি—সেকথা স্বীকার করে নেওয়া ভাল। বিজ্ঞান বিষয়ে বই-প্রবন্ধের জন্য এখনও আমরা মূলত: বিজ্ঞানীদের উপর নির্ভরশীল। বিজ্ঞানীরা লেখালেখির ব্যাপারে তথ্যনিষ্ঠ হলেও, যে কোনও বিষয়ে লেখা শুরু এবং শেষ করার কায়দাটা তাঁদের প্রায়শঃই জানা থাকে না—প্রসাদগুণের কথাটা না হয় বাদই দেওয়া গেল। ফলে, সাধারণ মানুষের কাছে সময়ে সময়ে প্রবন্ধগুলো দুর্বোধ্য ঠেকে। লেখকদের একটা বিশেষ শ্রেণী—যাঁদের সাহিত্য নিয়ে পড়াশুনো এবং বিজ্ঞানে আগ্রহ আছে—তাঁরা যদি বিজ্ঞানের বইপত্র পড়ে এবং বিজ্ঞানীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে বিজ্ঞানের নানা বিষয় নিয়ে লেখা শুরু করেন তবেই আমাদের বিজ্ঞান-সাহিত্যে সত্যিকারের জোয়ার আসবে। এমন লেখক যে এখন একেবারেই নেই তা নয়, তবে এঁদের সংখ্যাটা অনেক অনেক গুণ বাড়া দরকার।

*আকাশবাণী বিজ্ঞান বিভাগ, আকাশবাণী ভবন ইডেন গার্ডেন, কলিকাতা-700001

সেদিক থেকে, পশ্চিমবাংলার অন্ততঃ একটা বিশ্ববিদ্যালয়েও যদি বিজ্ঞান সাংবাদিকতার আলাদা কোর্স চালু হয় তবে এ জাতীয় লেখক তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে।

বিজ্ঞানের নানা বিষয় নিয়ে না হলেও, বাঙালী সাহিত্যিকদের অনেকেই অবশ্য এখন কল্পবিজ্ঞানের গল্প লিখতে রীতিমতো আগ্রহী—যদিও আধুনিক বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনো না থাকার দরুণ ওঁদের গল্প-উপন্যাসগুলি সাধারণতঃ ফ্যান্টাসীর পর্যায়ে রয়ে যায়। সায়েন্স-ফিকসনের নামে পত্রপত্রিকায় এখন যেসব উদ্ভুতুড়ে কল্পকাহিনী লেখা হয় তা সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান মানসিকতা জাগাতে কতটা সক্ষম তা নিয়ে সন্দেহ আছে। এই প্রসঙ্গে, সাম্প্রতিক একটা বাংলা গল্পের কথা মনে পড়ছে যেখানে ভিনগ্রহ থেকে আগন্তুকরা এসে পৃথিবীর খাল-বিল-নদীর জল চুরি করে নিয়ে যাওয়ার বর্ণনা দিয়েছেন লেখক। বিজ্ঞানকে ম্যাজিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার এ জাতীয় প্রচেষ্টার ভূরি ভূরি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

এইসব কল্পবিজ্ঞান পড়েই বেঁধে হয় বেশ কিছু মানুষ এখন সায়েন্স-ফিকসনের নামেই খড়্গহস্ত। অথচ, সায়েন্স-ফিকসন বিজ্ঞান-সাহিত্যেরই অঙ্গ, এবং কম্যুনিকেশনের ক্ষেত্রে ভারি ভারি তথ্য-তত্ত্ব ভরা প্রবন্ধ যা পারে না, একটা সার্থক সায়েন্স ফিকসন তা অনায়াসেই পৌঁছে দেয় পাঠকের মনের মণিকোঠায়। উদাহরণ হিসেবে আইজ্যাক অ্যাসিমভের লেখা 'Silly Asses' গল্পের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ দিলাম। গল্পটা এই রকম:—

আন্তর্নক্ষত্রীয় মহাসংঘের সদর দপ্তরে বসে আছে নারোন—সামনে একটা জাবদা খাতা যার পাতায় পাতায় লেখা রয়েছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সেইসব গ্রহের নাম-ঠিকানা যেখানে ইতিমধ্যেই বুদ্ধিমান প্রাণীর আবির্ভাব ঘটেছে। নারোন-এর কাজ হল—যে সব গ্রহের বুদ্ধিমান প্রাণীর পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছে তাদের নামগুলোকে বড় জাবদা খাতা থেকে পাশের ছোট খাতাটায় তোলা।

ঘরে ঢুকলো জনৈক বার্তাবহ। বলল—এই মাত্র আমাদের পরিদর্শকরা জানালেন মধ্য ছায়াপথের আর একটি গ্রহের নাগরিকরা সাবালকত্বে পৌঁছেছে।

—কি নাম বলতো গ্রহটার? কোন্ নক্ষত্রলোকের সদস্য? জাবদা খাতাটা কাছে টেনে নিয়ে জিজ্ঞাসা করে নারোন।

—গ্রহটির বাসিন্দাদের দেওয়া নামটা হল 'পৃথিবী'; যে নক্ষত্রকে ঘিরে গ্রহটি ঘুরে চলেছে। পৃথিবীর নাগরিকরা তাকে 'সূর্য' নামে ডেকে থাকে।

—বাঃ বাঃ, এতো রীতিমতো আশ্চর্যজনক হে। খাতার পাতা উল্টে পৃথিবীকে খুঁজে পায় নারোন। অ্যাতো কম সময়ে অন্য কোনও গ্রহে বিজ্ঞানের এমন অগ্রগতি দেখা যায় নি।

জাবদা খাতাটা থেকে গ্রহের নাম ছোট খাতাটায় তুলে নেয় নারোন। বলে—পৃথিবীর মানুষের কৃতিত্বের কথা শোনা যাক। ওরা নিশ্চয়ই পারমাণবিক শক্তির সন্ধান পেয়েছে?

বার্তাবহ ঘাড় নেড়ে সম্মত জানায়। নারোন বলে—তা তো হবেই। ওটাই তো বুদ্ধির দিক থেকে সাবালক হওয়ার লক্ষণ। তা মহাকাশেও নিশ্চয়ই অনেক দিন আগেই পাড়ি জমিয়েছে ওরা। আমাদের পরিদর্শকরা কি বলছে—ওরা কি আমাদের মহাসংঘের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা শুরু করেছে?

—আজ্ঞে না। মহাকাশ অভিযান ওরা শুরু করেছে পারমাণবিক শক্তিকে জানার অনেক পরে।

—সেকি?, নারোন বিস্মিত—তুমি বলছো, পৃথিবীর লোকেরা এখনও কোনও মহাকাশ স্টেশন বানিয়ে উঠতে পারে নি? কিংবা প্রাণহীন কোনও উপগ্রহে ঘাঁটি তৈরি করে নি? তবে ওরা পারমাণবিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায় কোথায়? —ওদের নিজেদের গ্রহের জল-মাটি-হাওয়ায়। ধীরে ধীরে শব্দগুলো বলতে থাকে বার্তাবহ মানুষটি।

চমকে উঠে ছোট খাতাটাকে আবার কাছে টেনে নেয় নারোন। যেন ওর চোখের সামনেই ভেসে ওঠে পৃথিবীর অদূর ভবিষ্যতের চেহারাটা। খাতা থেকে সদ্য তোলা নামটা কেটে দেওয়ার সময় অস্ফুটে বলে ওঠে—গাধার দল!

এই হল গল্প। পার্থিব পরিবেশে পারমাণবিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোর ভয়াবহতা নিয়ে জনসাধারণকে সচেতন করার ব্যাপারে এই কল্পবিজ্ঞানের সার্থকতা কতটা—পাঠকরা তা বিচার করে দেখতে পারেন। তবে সায়েন্স-ফিকসন লেখার ক্ষেত্রেও বিজ্ঞানীর গবেষণার সঙ্গে সাহিত্যিকের কল্পনা যদি যুক্ত হয় তবেই তা সার্থক রূপ পাবে—এতে বোধ হয় দ্বিমত নেই।

বিজ্ঞান-সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে এই যৌথ প্রয়াসের দিকটাই বেশী করে ভেবে দেখা দরকার।

"...জ্ঞানে মনুষ্যমাত্রেরই তুল্যাধিকার। যদি সর্বজনের প্রাপ্য ধনকে তুমি এমত দুরূহ ভাষায় নিবদ্ধ রাখ যে, কেবল কয়েকজন পরিশ্রম করিয়া সেই ভাষা শিখিয়াছে, তাহারা ভিন্ন আর কেহ তাহা পাইতে পারিবে না, তবে তুমি অধিকাংশ মনুষ্যকে তাহাদিগের স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিলে। তুমি সেখানে বঞ্চকমাত্র।"

—বঙ্কিমচন্দ্র

বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যের ঐতিহ্য ও বর্তমান

দিবাকর সেন*

আমাদের দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার প্রথম উপলব্ধি সম্ভবতঃ রাজা রামমোহন রায়ের। 1823 খৃস্টাব্দে বিদ্যালয় শিক্ষাসূচী সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি লর্ড আমহার্স্ট'কে এক চিঠিতে লিখেছিলেন, "সরকার দেশে বিদ্যাবিস্তারকল্পে যে অর্থব্যয় করিবেন তাহা গণিত, রসায়ন-শাস্ত্র প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানের শিক্ষাদানে ব্যয়িত হইলে উপকার হইবে।"

রামমোহনের এই উক্তির সময় থেকেই বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার আর একটি প্রচেষ্টারও সূত্রপাত দেখা যায়। তা হলো বিজ্ঞানকে মাতৃভাষায় জনপ্রিয় করা। 1822 খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে "পশ্বাবলী" নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির উদ্যোক্তা ছিলেন সেকালের "স্কুল বুক সোসাইটি"। তাতে জন্তু-জানোয়ারের ছবিসহ নানা তথ্য পরিবেশিত হত। পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল সিংহের বৃত্তান্ত, দ্বিতীয় সংখ্যায় ভাল্লুকের বৃত্তান্ত। তৃতীয় সংখ্যায় হস্তীর বৃত্তান্ত। চতুর্থ সংখ্যায় দুটি জানোয়ার সম্পর্কে (গণ্ডার ও হিপোপটেমাস) তথ্য পরিবেশিত হয়েছিল। পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ নির্বাচন করতেন পাদরী লসন। বাংলাভাষায় সেইসব প্রবন্ধ লিখতেন ডারিউ, এইচ পিয়ার্স। পত্রিকাটি বছর পাঁচেক চলার পর পাদরী লসন মারা যান। সাময়িকভাবে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। তারপর 1833 খৃস্টাব্দে রামচন্দ্র মিত্র আবার পত্রিকাটি চালু করেছিলেন।

আমাদের দেশে এসময়টি ছিল বাংলা গদ্য সাহিত্যের প্রথম যুগ। এ সময়ে ক্রমশ প্রকাশিত হয়েছিল নানা পত্র-পত্রিকা। বর্তমান প্রবন্ধে সে সময়ে প্রকাশিত কিছু উল্লেখযোগ্য পত্র-পত্রিকার নাম উল্লেখ করছি। 1831 খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয় "সংবাদ ভাস্কর"। এই পত্রিকায় সে যুগের বহু বিতর্কিত রক্ষণশীল কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত দেশে আধুনিক বিজ্ঞান বিশেষ করে কৃষিবিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা চর্চার দাবী জানিয়েছিলেন। এই পত্রিকাতেই 1849 খৃস্টাব্দে রেলগাড়ীকে স্বাগত জানিয়ে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। 1828 খৃস্টাব্দে "বিজ্ঞান অনুবাদ সমিতি" গঠিত হয়। প্রতিষ্ঠানটি 1833 খৃস্টাব্দের এপ্রিল মাসে 'বিজ্ঞান সেবধি' নামে একটি মাসিক পত্র প্রকাশ করে। 1843 খৃস্টাব্দের অগাস্ট মাসে 'তত্ত্ববোধিনী' সভার তরফ থেকে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার বিজ্ঞান বিভাগের ভার ছিল অক্ষয়কুমার দত্তের ওপর। দীর্ঘ বারো বছর অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করে বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যকে মজবুত করেন। এর পর কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত "বিদ্যাকল্পদ্রুম" প্রকাশিত হয় 1846 খৃস্টাব্দে। এই পত্রিকার স্থায়িত্ব ছিল দু' বছরের কাছাকাছি। শেষের সংখ্যাগুলোতে বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধের প্রাধান্য ছিল বেশী। 1851 খৃস্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও পাদরি লং-এর প্রচেষ্টায় প্রকাশিত হয়েছিল "বিবিধার্থ সংগ্রহ"। 1868 খৃস্টাব্দের 12ই এপ্রিল তারিখে প্রকাশিত হয় "দিগদর্শন"। পত্রিকাটির উদ্যোক্তা ছিলেন জে.সি. মার্সম্যান। এর পর প্রকাশিত হয় "সমাচার দর্পণ"। 1870 খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয় "বোধবিকাশিনী" নামে একটি পাক্ষিক। এই একটি বছরের প্রকাশিত হয়েছিল 'সাহিত্য সংগ্রহ' ও শিবদয়াল ত্রিবেদী সম্পাদিত "আর্য প্রদীপ"। 1878 খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয় "মাসিক ভারতী"। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এই পত্রিকায় লোকরঞ্জক বিজ্ঞান প্রবন্ধ লিখতেন। 1884 খৃস্টাব্দে দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী সম্পাদিত "নব্যভারত" পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটিতে অন্যান্য গল্প ও প্রবন্ধের সঙ্গে বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ ছাপা হত। এই পত্রিকাতে ডাঃ নীলরতন সরকার সে সময় "ভূ-পৃষ্ঠে পরিবর্তন" শীর্ষক একটি দীর্ঘ মনোরম প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। তাছাড়া অন্যান্য বিষয় যেমন প্রাণীবিদ্যা, শরীরচর্চা, কৃষিবিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, বিবর্তনবাদ প্রভৃতি বিষয়েরও নানা প্রবন্ধ ছাপা হত। 1890 খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয় "জন্মভূমি" ও 1891 খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয় সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত "সাধনা"। এছাড়াও সে সময় অল্পদিনের ব্যবধানে প্রকাশিত হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রের "বঙ্গদর্শন", ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের ভারত সংস্কার সভা কর্তৃক "সুলভ সমাচার", দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত "সোমপ্রকাশ" যোগীন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত "সুরভি", "পতাকা", প্রমদাচরণ সেন সম্পাদিত "সখা", ভুবনমোহন রায় সম্পাদিত "সাথী", রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত "দাসী", শিবনাথ শাস্ত্রী ও যোগীন্দ্রনাথ সরকার সম্পাদিত "মুকুল", কৃষ্ণদাস সম্পাদিত "জ্ঞানাঙ্কুর", কালীপ্রসন্ন ঘোষ সম্পাদিত "বান্ধব" পত্রিকা, সে সময় এই সব নানা পত্র-পত্রিকায় সেকালের বহু বিখ্যাত ব্যক্তিরা সহজবোধ্য ভাষায় বিজ্ঞান প্রবন্ধ লিখতেন।

1882 খৃস্টাব্দে মে মাসে প্রকাশিত হয় 'সচিত্র বিজ্ঞান দর্শন"। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন প্রাণানন্দ কবিভূষণ। পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যার আখ্যাপত্রে মুদ্রিত সম্পাদকের মন্তব্য থেকে মনে হয়, এই পত্রিকাটিই মাতৃভাষায় প্রকাশিত সম্পূর্ণ বিজ্ঞান পত্রিকা। সম্পাদক লিখেছিলেন—

'বর্তমান ভারতবর্ষের এই বিজ্ঞান চর্চার প্রকৃত অবসর উপস্থিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় এপর্যন্ত কেহই ইহাতে হস্তক্ষেপ করিলেন না। শীঘ্রও যে কেহ হস্তক্ষেপ করিবেন, তাহার কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া, আমরা ইহার সোপানমাত্র গঠনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। আমাদের

* বসু বিজ্ঞান মন্দির, কালকাতা-700009

উদ্দেশ্য এই, অপেক্ষাকৃত কৃতবিদ্য ও কৃতচিত্ত লোকেরা আমাদের এই দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া ইহাতে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। যাহা হউক, আমাদের কল্পিত সোপান "বিজ্ঞান দর্শন" নামে আখ্যাত হইল এবং ইহাতে স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভাষায় গ্রথিত ও সমালোচিত বিজ্ঞানশাস্ত্র সকলের সরল বাঙ্গালায় অনুবাদমাত্র সন্নিবিষ্ট হইবে। সেই অনুবাদিত বিষয় যাহাতে বিশদ বা অনায়াসেই হৃৎপ্রতীত হইতে পারে, তজ্জন্য চিত্রাদি প্রভৃতি উপায় সকলও অবলম্বিত হইবে।..." প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই একই বছরের জুন মাসে ঢাকা থেকে সূর্যনারায়ণ ঘোষ সম্পাদিত "রামধনু" নামে আর একটি বিজ্ঞান পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল।

এরপর 1907 খৃস্টাব্দে নরেন্দ্রনাথ বসু নামে এক কিশোর ছাত্রের উদ্যোগে প্রকাশিত হয় বিজ্ঞান পত্রিকা "ছাত্রসখা"। ছাত্রসখা পত্রিকার দপ্তর ছিল কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে, বিপিনচন্দ্র পালের ইংরেজী কাগজ "নিউ ইণ্ডিয়া" পত্রিকার দপ্তরে। পত্রিকাটিকে কম দামে বহুল প্রচারের উদ্দেশ্য তুলোট কাগজের মলাটে ও দেশীয় মিলের সস্তা কাগজে ছাপা শুরু হয়েছিল। কাগজটির দাম ছিল বার্ষিক সডাক এক টাকা। পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যার সম্পাদকের নাম আজ আর জানা যায় না। দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে সম্পাদক ছিলেন অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু। প্রকাশক ছিলেন কিশোর ছাত্র নরেন্দ্রনাথ বসু। এই পত্রিকাটিকে সে সময় লেখা দিয়ে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন সেকালের বহু সুযোগ্য মানুষ। কিন্তু তা সত্ত্বেও কাগজটিকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয় নি। সে সময় কলকাতার চিফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন কুখ্যাত কিংস্ফোর্ড সাহেব। পত্রিকা প্রকাশের পরই কিশোর প্রকাশক নরেন্দ্রনাথের নামে তিনি এক শমন জারি করে বললেন, "বিনা অনুমতিতে পত্রিকা প্রকাশের জন্য কেন তুমি অভিযুক্ত হইবে না—তার কারণ দর্শাও।" এই সমনের পরিপ্রেক্ষিতে কিশোর নরেন্দনাথকে আদালতে হাজির করা হয়। বিব্রত নরেন্দ্রনাথ কিংস্ফোর্ড সাহেবকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন। পত্রিকাটি নিছক একটি বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা। এর সঙ্গে রাজনীতির কোন সম্পর্ক নেই। যুক্তি অকাট্য। তাই কিংস্ফোর্ড সাহেব অন্য যুক্তি খাড়া করে বললেন—পত্রিকার প্রকাশক নাবালক। তাই এই পত্রিকা ছাপা চলবে না। পরদিন বড় হরফে 'অমৃতবাজার', 'বেঙ্গলী', 'বন্দেমাতরম' ও 'সন্ধ্যা' কাগজে ক্ষোভ জানিয়ে খবর প্রকাশিত হল। এরপর অনেক চেষ্টায় এই বাধা অতিক্রম করা সম্ভব হলেও কিছুকাল বাদে কাগজটি বন্ধ হয়ে যায়। পত্রিকাটি এই স্বল্প পরিসর সময়ের মধ্যে সে সময় প্রাণীবিজ্ঞান, রসায়নশিল্পের কাহিনী, অঙ্কের মজা, ভূতত্ত্ব, আকাশের কথা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে নানা চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিল।

এই পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে গেলেও নরেন্দ্রনাথ কিন্তু থেমে রইলেন না। 1908 খৃস্টাব্দের শেষ ভাগ। নরেন্দ্রনাথ তখন ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারি প্রতিষ্ঠিত "বিজ্ঞান সভার" রসায়নের ছাত্র। জানুয়ারী 1909 খৃস্টাব্দে নরেন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় 210নং বৌবাজার স্ট্রীটের বিজ্ঞান সভার দপ্তর থেকে প্রকাশিত হল "বিজ্ঞান দর্পণ", পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যার আখ্যাপত্রে নরেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :

"বর্তমান সময়ে আমাদের সকলের মনে এক নবভাবের উদয় হইয়াছে যে ভারতবর্ষের উন্নতি সাধন করিতে হইবে, কিন্তু কিসে যে প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইবে সে বিষয়ে সকলে একমত হইতে পারিতেছি না। স্বদেশের উন্নতি সাধন করিতে হইলে আমাদিগকে আধুনিক জ্ঞান সঞ্চয় অর্থাৎ বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে হইবে। বিজ্ঞান শিক্ষা ব্যতীত কোন জাতি কখনও উন্নত হইতে পারে না। বিজ্ঞান শিক্ষার বলেই আমেরিকা, ইংলণ্ড, জার্মানী প্রভৃতি দেশ এত উন্নত হইয়াছে এবং জাপান শীঘ্র শীঘ্র উন্নত হইতেছে।...প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে বিজ্ঞানবিৎ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় স্থির বুঝিয়াছিলেন যে দেশবাসী সাধারণের মনে বিজ্ঞান শিক্ষার বীজ বপনই ভারতের উন্নতির প্রধান উপায়। তাঁহার অভিপ্রায় কার্যে পরিণত করিবার জন্য তিনি কিরূপ প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়াছিলেন, "ভারতবর্ষের বিজ্ঞান সভা" সে বিষয়ের সাক্ষ্য প্রমাণ করিতেছে। দেশবাসীর মনে যাহাতে বিজ্ঞানের আদর বৃদ্ধি পায় সেজন্য সকলের সাধ্যমত চেষ্টা করা কর্তব্য।...সাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান প্রচার করিতে হইলে, বিজ্ঞান-বিষয়ক পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশ করা প্রধান উপায়।...সাধারণের মনে বিজ্ঞান শিক্ষার আদর বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত "বিজ্ঞান দর্পণ" মাসিক পত্র প্রকাশ করা হইল। দেশবাশী ইহাকে কি ভাবে গ্রহণ করিবেন জানি না, ইহা যদি পাঠকের মনে বিজ্ঞান শিক্ষার বীজ বপন করিতে সমর্থ হয়। তাহা হইলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হইবে।"

এ ক্ষেত্রেও পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন অন্য ব্যক্তি। নাম হারাধন রায়। পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ সংগ্রহ, প্রয়োজনে প্রবন্ধ লেখা। মুদ্রণ ও প্রচার—এইসবকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব ছিল নরেন্দ্র নাথের ওপর।

পত্রিকাটিতে প্রথম বছরে যে সব প্রবন্ধ স্থান পেয়েছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো শিলাবৃষ্টি নিবারক ব্যোমযান, বিজ্ঞান সভার ইতিহাস, এ্যালুমিনিয়ম ধাতু এবং উহার প্রয়োজনীয়তা, রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস, জীবনীশক্তির মৌলিক উপাদান, ম্যালেরিয়া, আলোকচিত্রণ, উত্তরমেরু, খাদ্যে ভেজাল, খাদ্যের রাসায়নিক বিশ্লেষণ, ভূমিকম্পের পূর্বাভাষ, বিদ্যুৎ পরিচালক দণ্ড, রেডিয়ম, হীরক ও হেলির ধূমকেতু।

পত্রিকাটির স্থায়িত্ব ছিল দু'বছরের কাছাকাছি। সেকালের অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি প্রবন্ধ লিখে নরেন্দ্রনাথকে সাহায্য করলেও কাগজ চালানো সম্ভব হয় নি। এ প্রসঙ্গে নরেন্দ্রনাথ বসু পরবর্তীকালে বলেছিলেন, "বিজ্ঞান সভার রসায়ন বিভাগের

প্রথম ও দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর চতুর্দশজন নিয়মিত ছাত্র মিলিয়া আমরা স্থির করিলাম যে, দেশবাসীর মনে বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগ জন্মাইবার জন্য একখানি বাংলা মাসিক পত্র প্রকাশ করিতে হইবে। বিজ্ঞান সভা কর্তৃপক্ষকে আমাদের সঙ্কল্পের কথা জানাইতে তাঁহারা কোন উৎসাহ দিলেন না বা নিষেধও করিলেন না। দুই-তিন মাস ধরিয়া জল্পনা-কল্পনা ও তোড়-জোড়ের পর 1909 খৃস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে "বিজ্ঞান দর্পণ" পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হইল। অন্তরের প্রবল স্বাদেশিকতা, মাতৃভাষার প্রতি একান্ত অনুরাগ এবং অদম্য উৎসাহ মাত্রই আমার সম্বল ছিল। এতবড় দায়িত্ব লইবার শক্তি যে তখন আমার হয় নাই, তাহা ভাবিয়া দেখি নাই। প্রথম সংখ্যা প্রকাশের পরই বুঝিতে পারিলাম আমাকেই সব ভার লইতে হইবে, আর কোন সহপাঠীর নিকট হইতে সাহায্য পাইবার আশা অতি কম। আমি ছাত্রবন্ধুদের সকলের বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলাম তখনও আমার বয়স আঠার বৎসর পূর্ণ হয় নাই।"

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আজকের দিনেও নানা জায়গা থেকে প্রকাশিত বিজ্ঞান পত্রিকার স্থায়িত্বের প্রশ্নে একথা প্রযোজ্য। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে "কিশোর বিস্ময়" "বীক্ষণ", "গবেষণা" "বিজ্ঞান মেলা", "সবজান্তা সজারু"—এসব প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন পত্র-পত্রিকার অবলুপ্তির একটি প্রধান কারণ এই।

"বিজ্ঞান দর্পণ" কাগজটি উঠে যাওয়ার পর নরেন্দ্রনাথ বাকী জীবনে এধরণের প্রচেষ্টায় আর অগ্রসর হন নি। পরবর্তী সময়ে তিনি গল্প, উপন্যাস ইত্যাদি লেখার চেষ্টা করেছেন। তার কিছু কিছু নিদর্শন পুরোনো পত্র-পত্রিকায় দেখা যায়।

নরেন্দ্রনাথের এই প্রচেষ্টার সময়ে ও পরে নানা পত্র-পত্রিকা, বিশেষ করে ছোটদের সাহিত্যের প্রাধান্য দেখা যায়। এক কথায় এ সময়টা ছিল বাংলা শিশু সাহিত্যের স্বর্ণযুগ। এই সব শিশু পত্রিকার গল্প, ভ্রমণকাহিনী ও ছড়ার প্রাধান্য ছিল বেশী। তবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের খবর বা ছোটখাট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ছাপা হত। আর বড়দের পত্রিকা যেমন 'প্রবাসী', 'বঙ্গশ্রী', 'উদয়ন', 'মোসলেম ভারত', 'ভারতবর্ষ', 'সুবর্ণবণিক সমাচার' ইত্যাদিতে গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অশেষ বসু, ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শশধর রায়, রাধাগোবিন্দ চন্দ্র প্রমুখ আরোও অনেকে বিজ্ঞান বিষয়ক মজার খবর, আবিষ্কারের কাহিনী, জীবজন্তুর কথা ইত্যাদি নানা বিজ্ঞানভিত্তিক প্রবন্ধ চিত্র সহযোগে প্রাঞ্জল ভাষায় পাঠকদের কাছে হাজির করতেন। এছাড়া আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, জগদানন্দ রায়, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য বিভিন্নসময়ে পত্র-পত্রিকায় মাতৃভাষায় বিজ্ঞান প্রবন্ধ লেখেন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তাঁর একক প্রচেষ্টায় বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যের নবযুগের সূচনা করেন। তবে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এঁরা সবাই লিখেছেন একক ভাবে। কোন যৌথ প্রয়াস এসময়ে পরিলক্ষিত হয় নি। এসময়ে কোন বিজ্ঞান পত্রিকা ছাপা হয়েছিল কিনা সঠিক-ভাবে জানা যায় না। এ পর্যায়ে নানা সহজবোধ্য বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ ছাপা হলেও সঠিক অর্থে বিজ্ঞানকে গণমুখী করার যথেষ্ট চেষ্টা হয় নি। তাই সম্ভবত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী কলকাতায় অনুষ্ঠিত (বাংলা 1320) বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের বিজ্ঞান শাখার সভাপতি হিসেবে বলেছিলেন, "নিতান্ত ক্ষোভের বিষয়, পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচারের যে উদ্যম ছিল, সম্প্রতি তাহা যেন দেখিতে পাই না।...তখনকার তুলনায় এখন লেখকের সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে, দেশে জ্ঞান লাভের স্পৃহা প্রচুর বৃদ্ধি পাইয়াছে। জ্ঞান বিতরণে সমর্থ, শিক্ষাদানে সমর্থ পণ্ডিতের সংখ্যা প্রচুরতর বৃদ্ধি পাইয়াছে।... অথচ বাঙ্গালা সাহিত্যের কেন এত অবনতি তাহা আপনাদের চিন্তার বিষয়।...আমি যে কারণ অনুমান করি তাহা স্পষ্টভাষায় বলিতে গেলে—ইহার মুখ্য কারণ—শ্রদ্ধার অভাব, প্রীতির অভাব, অনুরাগের অভাব, প্রেমের অভাব।..."

এর দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে বহু হতাশার মধ্য দিয়ে 1948 খৃস্টাব্দে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর প্রচেষ্টায় ও গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের মত কিছু কর্মী মানুষের কর্মতৎপরতায় আবার মাতৃ-ভাষায় বিজ্ঞান পত্রিকা "জ্ঞান ও বিজ্ঞান" প্রকাশিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পত্রিকাটি তার শৈশবে বসু বিজ্ঞান মন্দির থেকেও অনেক সহযোগিতা পেয়েছিল। বর্তমানে কলকাতার ও বাইরে বেশ কয়েকটি বিজ্ঞান পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। এদের মধ্যে 'অন্বেষা', 'উৎস মানুষ', 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী', 'কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান' ও 'জ্ঞান-বিচিত্রার' কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বর্তমানে অনেক লেখক এগিয়ে এসেছেন। আগের তুলনায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষার সমস্যাও অনেক মিটেছে। মাতৃভাষায় স্কুল-কলেজে পাঠ্যসূচী নির্ধারিত হয়েছে।

ছাত্ররা আজ মাতৃভাষায় বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনো করছেন। তবে কিছু কিছু মননশীল রচনা পাঠকরা উপহার পেলেও—একথা বলতে দ্বিধা নেই যে, বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সরল সরস বর্ণনা আজও কম চোখে পড়ে। অনেক রচনায়ই গুণগতমান আশানুরূপ নয়, অনেক ক্ষেত্রে তথ্যনিষ্ঠতার অভাবও পরি-লক্ষিত হয়। বেশ কিছু লেখা তৈরি হয় বিদেশী রচনার অক্ষম অনুবাদের ভিত্তিতে। তাছাড়া একই ব্যক্তি যখন নানা বিষয়ে লেখেন তখন তথ্যগত ভুলকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। এ ব্যাপারে পত্রিকা সম্পাদককে যথেষ্ট সচেতন হতে হবে। সঠিক তথ্যনিষ্ঠ রচনা ও সেই সঙ্গে নূতন লেখক সম্পাদককে খুঁজে বার করতে হবে। সম্পাদককে পাঠকের জায়গায় দাঁড়িয়ে ও পত্রিকা প্রকাশের মূল উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে অগ্রসর হতে হবে।

এ ব্যাপারে "জ্ঞান ও বিজ্ঞান" পত্রিকার কাছে আমাদের প্রত্যাশা ছিল অনেকখানি। এই পত্রিকায় প্রকাশিত প্রথম দিকের সংখ্যাগুলো বাদ দিলে পরবর্তীকালে প্রকাশিত অনেক রচনা তথ্যভারাক্রান্ত। সাহিত্যধর্মী লেখার উপস্থিতি কম। 'অন্বেষা', 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' ও 'উৎস মানুষের' উদ্যোগ বিজ্ঞান-সাহিত্যের ক্ষেত্রে ও বিজ্ঞান সচেতন সমাজ গড়ার ক্ষেত্রে আশাব্যঞ্জক পদক্ষেপ। তবে এদের স্থায়িত্ব সম্পর্কে চিন্তাশীল পাঠকদের যথেষ্ট দায়িত্ব রয়েছে। "কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান" কয়েক বছর ধরে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। নানা জাতের লেখার সমাবেশে পত্রিকাটি আকর্ষণীয় হয়েছে। তবে সম্পাদকেরা বিষয় নির্বাচনে আরো সতর্ক হলে পত্রিকাটি তার প্রতিশ্রুতি পূরণের দিকে আরো এগিয়ে যেতে পারবে।

বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্যের বর্তমান দৈন্য ঘোচাতে বিজ্ঞান লেখকদের দায়িত্ব অবশ্যই আছে। কিন্তু বিজ্ঞান বিষয়ক পত্র-পত্রিকার সম্পাদকদের দায়িত্ব আরো অনেক বেশী। সার্থক বিজ্ঞান সাহিত্য রচনার পথ নির্দেশ তাঁদেরকেই দিতে হবে। বিজ্ঞান লেখকদের যদি সৈনিক বলি তবে সম্পাদকেরা হলেন সেনাপতি। সৈনিকেরাই যুদ্ধ করে একথা ঠিক, কিন্তু যুদ্ধ জয় হবে কিনা তা অনেকাংশে নির্ভর করে সেনাপতির পরিচালন কুশলতার উপর। বিজ্ঞান পত্রিকার সম্পাদকেরাই পারেন বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যের মান উন্নত করতে। যদি তাঁরা এ কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হন তবে আগামী কোন একদিনে হয়ত আমাদের ব্যর্থতা সম্পর্কে কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে আবার আমাদের রামেন্দ্রসুন্দরের বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে বলতে হবে—নিতান্তই শ্রদ্ধার অভাবে—অনুরাগের অভাবে আমরা কৃতকার্য হতে পারি নি।

বাংলায় বিজ্ঞানসাহিত্য

সুখময় ভট্টাচার্য*

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাস শতাধিক বছরের। প্রথমে বিদেশী সাহেবদের হাতে অপটু সূত্রপাত, তারপর বঙ্গীয় গুণীজনের হাতে তার বিস্তৃতি হয়ে বর্তমানে বাংলায় বিজ্ঞানচর্চা নিঃসন্দেহে অনেকটা ব্যাপকতা পেয়েছে। আশা করার কারণ আছে, ভবিষ্যতে জ্ঞান-বিজ্ঞান তথা মানবমনীষার যাবতীয় ধারার চর্চা বঙ্গজন নিজের মাতৃভাষাতেই করতে পারবে।

আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় "বাংলায় বিজ্ঞানসাহিত্য"। ইংরেজীতে Literature শব্দটির ব্যাপ্তি অনেক বেশী, বিজ্ঞান-গবেষকরা পর্যন্ত তাঁদের গবেষণা-প্রবন্ধসমূহকে এই শব্দে অভিহিত করে থাকেন। বাংলা প্রতিশব্দ 'সাহিত্য'-এর ব্যঞ্জনা কিন্তু অত ব্যাপক নয়। জটিল আলোচনায় না যেয়েও বলা চলে, বাংলা ভাষায় 'সাহিত্য' বলতে সেই ধরনের লেখাকে বোঝান হয়, যা এক ন্যূনতম শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যাপক জনতার বোধগম্য ও গ্রহণীয়। বাংলায় গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক, পালাগান ইত্যাদি সাহিত্য। আর বাদবাকী বিষয়াদির বাংলায় চর্চা হলেও তাদের মধ্যে কেবল সেগুলিই 'সাহিত্য' শব্দ ব্যবহারের অধিকারী, যাদের বিষয়বস্তু হাসিম শেখ-রামা কৈবর্ত না হলেও রাম-শ্যাম-যদু-মধুবাবু, তদীয় গৃহিণীরা ও স্কুলোত্তীর্ণ অঙ্গজবর্গ বুঝতে পারবেন এবং আগ্রহ নিয়ে পড়বেন। তাও কুলীন সাহিত্যকর্ম হিসেবে এগুলি স্বীকৃতি পায় না, এদের বেলায় নিজের নিজের পরিচয়জ্ঞাপক উপসর্গ পূর্বে যুক্ত হতে হয়। এদের পরিচয় হয় 'প্রবন্ধসাহিত্য', 'বিজ্ঞান-সাহিত্য' ইত্যাদি অভিধায়। অর্থাৎ আমাদের কাজ কমে গেল। বাংলাভাষায় বিজ্ঞান-চর্চা সামগ্রিকভাবে আমাদের আলোচ্য নয়, সেই প্রেক্ষাপটের অংশবিশেষ নিয়েই বর্তমান আলোচনা। আমরা বাংলাভাষায় লিখিত সেইসব বিজ্ঞান রচনা নিয়ে আলোচনা করব, যা অজ্ঞজনের জন্য উদ্দিষ্ট, সাবলীল ভাষায় যেগুলি রচিত এবং যাদের মধ্যে সাহিত্যের প্রসাদগুণ পর্যাপ্ত আছে।

প্রথমেই প্রশ্ন উঠবে, 'অজ্ঞজন' বললে আমি কাদের বোঝাতে চাইছি। এককথায় বলা চলে, আমরা সকলেই অজ্ঞজন। আমার বিচারে একজন মাধ্যমিক-উত্তীর্ণ কিশোর যেমন এবং যতটা অজ্ঞ, বিজ্ঞানের কোন দুরূহ বিষয়ের বিশেষজ্ঞ কোন ব্যক্তিও নিজের বিষয়ের পরিধির বাইরে তেমন এবং ততটা অজ্ঞ। অতীতে একটা সময় ছিল যখন কোন ব্যক্তি একই সঙ্গে দর্শন, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, গণিত, রসায়ন এবং পদার্থবিদ্যায় পারদর্শী হতে পারতেন। এর প্রধান কারণ ছিল, সেই সময়ে বিভিন্ন বিষয়গুলিতে জ্ঞাত তত্ত্ব ও তথ্যের পরিধিটাই ছিল অনেক ছোট। বিশ শতকের শেষার্ধে মানব-মনীষার প্রতিটি দিকে জ্ঞানের পরিধি এত বিস্তৃতি পেয়েছে যে এখন আর কোন ব্যক্তির পক্ষে একাধারে এতগুলি বিষয়ে জ্ঞানী হওয়া দূরে থাক, নিজ বিষয়ের অতি ক্ষুদ্র অংশের বিস্তৃত জ্ঞাতব্যগুলি জানতে ও আত্মস্থ করতেই তাঁর উদ্যম নিঃশেষিত হয়ে যায়। তাই নামী রসায়নবিদও আজ দর্শনে অজ্ঞ, অর্থনীতিবিদ পদার্থবিদ্যার সবিশেষ কিছু বোঝেন না এবং জীববিজ্ঞানের গবেষক গণিতবিদ্যায় সড়গড় নন। তাই বিশেষজ্ঞজনকেও আজ নিজের বিষয়ের বাইরের কোন বিষয় সম্পর্কে নিজের ধারণার ব্যাপ্তি ঘটাতে জনপ্রিয় বিজ্ঞানবই বা 'বিজ্ঞানসাহিত্য'-এর শরণাপন্ন হতে হয়। মাধ্যমিক পাশ শ্রীরামচন্দ্র বারিক যেমন জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে কিছু জানতে যে প্রাথমিক বইটি কেনেন, ডাঃ দিগ্‌বিজয় ভরদ্বাজ এফ. আর. সি. এস.-কেও সেই বিষয়ে কিছু জানতে সেই বইটি বা অনুরূপ বই কিনতে হবে। অবশ্য দিগ্‌বিজয়বাবু ইংরেজীতে দক্ষ বলে বাংলা ভাষার বইয়ের বদলে ইংরেজী বই পড়তে পারেন, কিন্তু সেক্ষেত্রেও তাঁকে কিনতে হবে ইংরেজী 'popular science' বা 'বিজ্ঞানসাহিত্য'-এর বইই।

তাহলে বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের উদ্দিষ্ট পাঠকবর্গের সন্ধান মিলল। অবশ্য গৃহশোভাবর্ধনকারী কিছু কিছু সুদৃশ্য গ্রন্থাবলী ছাড়া বঙ্গজনের বই কেনায় তেমন গরজ বা বদঅভ্যাস নেই, মনোযোগী পাঠক হিসেবে দুর্নাম তো আরও অল্পজনের প্রাপ্য, তাহলেও বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্য রচিত হতে হবে এই বিশাল পাঠকগোষ্ঠীর কথা মনে রেখেই। কেবল ইংরেজীতে অদক্ষ জনের জন্য কৃপাভরে বাংলাভাষায় বিজ্ঞানের কিছু বিষয়ের বামহস্তে পরিবেশনা নয়, বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্য হবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোন বিষয়ে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের এবং পরবর্তী পাঠের জন্য পর্যাপ্ত আগ্রহ সঞ্চারের মাধ্যম।

কুলীন সাহিত্যের পাঠক আর বিজ্ঞানসাহিত্যের পাঠকের মানস প্রক্রিয়ায় কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে? কোন পাঠক শরৎচন্দ্রের দু-পাঁচখানা বই পড়েছেন, শরৎচন্দ্রের মোহময়ী রচনাশৈলীর সঙ্গে তিনি পরিচিত। এবার তিনি 'বিন্দুর ছেলে' পড়তে বসলেন এবং অচিরেই দক্ষ শিল্পীর কথাশিল্পে হেসে-কেঁদে অস্থির হলেন, সাহিত্যিক তাকে অজান্তে টেনে নিয়ে গেলেন ঘটনার স্রোতে। কুলীন সাহিত্যের আবেদন মূলতঃ পাঠকের আবেগের কাছে, পাঠকের মানসিক পূর্বপ্রস্তুতির এখানে প্রশ্ন নেই। মৌলিক সাহিত্যও অবশ্য মননশীল হতে পারে, তবে সেক্ষেত্রে তা কদাচিৎ ব্যাপক পাঠকের স্নেহধন্য হয়। বিজ্ঞানসাহিত্যের পাঠককে কিন্তু মানসিকভাবে পূর্বপ্রস্তুতি নিতে হয়, কোন্ বিষয়ে তিনি জানতে চান সে বিষয়ের দু-পাঁচটা বইয়ের মধ্য থেকে এক বা একাধিক বই তাকে বেছে নিতে হয়। তার পাঠ ত্বরিত গতিতে এগিয়ে চলে না, নূতন নূতন তত্ত্ব বা তথ্যাদি পড়ে তাকে তা নিয়ে ভাবতে হয়, আত্মস্থ করতে হয়। এক্ষেত্রে

* ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ মেডিসিন, কলিকাতা-700020

লেখকের প্রয়াস কিছু তত্ত্ব বা তথ্য পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়া, আর পাঠকের প্রয়াস সেগুলি জেনে-বুঝে আত্মস্থ করা। বিজ্ঞানসাহিত্যের আবেদন তাই পাঠকের চিন্তার কাছে, বুদ্ধির কাছে। মৌলিক সাহিত্যের সাবলীলতা তাই বিজ্ঞানসাহিত্যে খুঁজতে যাওয়া বা প্রত্যাশা করা ঠিক নয়।

একথা মনে রেখেও বিজ্ঞানসাহিত্যের ক্ষেত্রেও সাবলীলতার প্রশ্ন আসে, কোন বই পর্যাপ্ত প্রসাদগুণসম্পন্ন কিনা সে বিবেচনা এসে যায়। বিজ্ঞানের প্রথাগত পঠনপাঠনে দেখা যায় কোন শিক্ষকের ক্লাশে নিশ্ছিদ্র নীরবতা বিরাজ করছে, অখণ্ড মনোযোগে ছাত্ররা শিক্ষকের অধ্যাপনা অনুধাবন করছে। অথচ ঐ একই বিষয়েই অন্য শিক্ষকের ক্লাশ মনুষ্যেতর প্রাণীর অনুকৃত কণ্ঠস্বরে সরব। অর্থাৎ একই বিষয়ের ব্যক্তিবিশেষের পরিবেশনা শ্রোতাদের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছে, অপরেরটা সে বিচারে ব্যর্থ প্রতিপন্ন হয়েছে। বিজ্ঞানসাহিত্যের ক্ষেত্রেও সাবলীলতা বা প্রসাদগুণ বলতে একই জিনিষ বোঝায় বলে আমার ধারণা। বইটি পড়তে পড়তে পাঠক মটরভাজা ভক্ষণের অভিজ্ঞতা লাভ করছেন এবং অবশেষে লম্বা হাই তুলে বইটি মুড়ে রাখছেন, না সাবলীল গতিতে চলছে তার পাঠক্রিয়া এবং এক নাগাড়ে বইটি তিনি শেষ করছেন—পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্যতার এই নিরিখেই বিচার হবে—কোন বিজ্ঞানের বই বিজ্ঞানসাহিত্য হয়ে উঠেছে কিনা। ক্লাসের পাঠ্যবই সাবলীল হোক বা না হোক পরীক্ষা পাশের তাগিদে ছাত্র-ছাত্রীকে তা পড়তে হবেই। বিজ্ঞানসাহিত্যের ক্ষেত্রে পাঠকের এই বাধ্যবাধকতা থাকে না। তাই ভালো লাগা মন্দ লাগার প্রশ্ন ওঠে, গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্ন ওঠে, সাবলীলতা ও প্রসাদগুণ যাচাই হয়।

তবে গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্নে পূর্বে উল্লেখিত পাঠকের মানসিক পূর্বপ্রস্তুতির বিষয়টিও সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রাথমিক কিছু না জানলে এবং রসাস্বাদনে পর্যাপ্ত উন্মুখ না হলে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত দুর্বোধ্য ঠেকেই, শিল্পীর চরম পারদর্শিতা সত্ত্বেও শ্রোতা তন্দ্রায় অভিভূত হয়। উৎকৃষ্ট কথার মেশাল দিয়ে কিছু কিছু উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আদলে জনবোধ্য লঘু সঙ্গীতের রূপ দেওয়া যায় বটে, তবে তার জন্য প্রয়োজন হয় রবীন্দ্রনাথের মত যুগন্ধর প্রতিভার। সেটা ব্যতিক্রম। বিজ্ঞানের বিষয়ের সঙ্গে ওপরের উদাহরণটির প্রতিতুলনায় বলা চলে, গণিত, রাশিবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়গুলির সহজবোধ্য পরিবেশনা সবিশেষ কঠিন, পাঠকের পক্ষে কিছু পূর্বজ্ঞান ও প্রস্তুতি না থাকলে লেখকের পর্যাপ্ত নৈপুণ্য সত্ত্বেও আদপেই তা গ্রহণযোগ্য বলে মনে না হওয়ারই সম্ভাবনা। পক্ষান্তরে মোটামুটি দক্ষতায় জীববিজ্ঞানের কোন বিষয়কে অধিকসংখ্যক পাঠকের গ্রহণীয় আকার দেওয়া চলে, কারণ জীববিজ্ঞানের অধিকাংশ বিষয় মূলতঃ বর্ণনাভিত্তিক। তাই রক্তের সঞ্চালন বা অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির ওপরে চিত্তাকর্ষক কিছু লেখা যতটা সহজ, রাশিবিজ্ঞানের বা গণিতের কোন সূত্র নিয়ে অনুরূপ লেখা তার থেকে অনেক কঠিন।

এরপরই পাঠকের তরফে এক প্রশ্ন উঠবে, অর্থ ব্যয় করে এত মাথা ঘামিয়ে সে বিজ্ঞানসাহিত্য আদৌ পড়তে যাবে কেন? মৌলিক সাহিত্য পড়ে আনন্দ পেতে, মানসিক প্রস্তুতি ইত্যাদির চাহিদা তো নেই। প্রশ্নটা বাস্তব। তাই বাংলা ভাষায় জনপ্রিয় লেখকের উপন্যাস যখন একের পর এক সংস্করণ হয়, বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের কোন বইয়ের এক হাজার কপির সংস্করণ নিঃশেষ করতেই প্রকাশকের চুলে পাক ধরে; প্রয়াত সত্যচরণ লাহাকে চৌদ্দ বছর নিজ অর্থে বিজ্ঞান পত্রিকা চালাতে হয়; বাংলায় সাহিত্য পত্রিকা যখন অযুত ছেড়ে লক্ষ পাঠকের আনুকূল্য পায়, তখন বিজ্ঞান বিষয়ক পত্র-পত্রিকার প্রচার অযুত সংখ্যাও স্পর্শ করে না। এ প্রশ্নের উত্তর বর্তমান নিবন্ধ লেখকের অজানা। সম্প্রতি এক খবরে প্রকাশ, ফ্রান্সে পাঠক সাধারণ অধুনা গল্প-উপন্যাসের চাইতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের প্রবন্ধের বইয়ের অনেক বেশী পৃষ্ঠপোষকতা করছেন। সামান্যতম মানসিক প্রচেষ্টায়ও বাঙালী পাঠকের এই অনীহার কারণ পাঠক হিসেবে তাদের অপ্রাপ্তবয়স্কতা না বিজ্ঞানসাহিত্যের লেখকদের ব্যর্থতা, এর মীমাংসা করা দুরূহ।

পাঠক এবং বিষয়ের আলোচনার পর বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের তিনটি প্রধান বিবেচনা বাকী থাকে—বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্য কে লিখবেন, কেন লিখবেন এবং কিভাবে লিখবেন। বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের প্রারম্ভিক সূচনা যাঁদের হাতে, তাঁরা বৈজ্ঞানিক ছিলেন না। মৌলিক সাহিত্য রচনাই ছিল তাঁদের প্রধান উপজীব্য। লেখাকে বিষয়ান্তরে ব্যাপ্তি দিতে, ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ জনকে কিঞ্চিৎ বিজ্ঞানবার্তা পৌঁছে দিতে এবং কারোর কারোর ক্ষেত্রে, পত্রিকার চাহিদা পূরণে এঁরা বিজ্ঞান বিষয়ে লিখেছেন, পরবর্তীকালের বিজ্ঞানসাহিত্যের আঙিনায় যাঁদের আমরা পাই, তাঁদের অনেকেই ছিলেন বিজ্ঞানের পঠন-পাঠনে যুক্ত। বিজ্ঞানের উচ্চতর গবেষণায় যুক্ত এমন লেখক-দেরও ক্রমে আমরা বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের চর্চা করতে দেখতে পাচ্ছি এবং এঁদের ক্রমশ আরও বেশী সংখ্যায় পাব, এ প্রত্যাশা আমাদের রাখতেই হবে। কারণ বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যের চর্চা এঁদের হাতেই ক্রমিক সার্থকতার পথে এগোবে।

বিজ্ঞানসাহিত্যের লেখক যিনি হবেন, তাকে অবশ্যই বিজ্ঞানের বিশেষ বিশেষ শাখার পঠন-পাঠনে, গবেষণায় যুক্ত থাকতে হবে, অর্থাৎ যে বিষয়ে লিখবেন, তাতে তাঁকে ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন হতে হবে। অবিজ্ঞানী কোন ব্যক্তিও অবশ্য পর্যাপ্ত পড়াশুনা করে বিজ্ঞান বিষয়ে জনপ্রিয় লেখা লিখতে পারেন, তবে এমন লোকের সংখ্যা স্বাভাবিক কারণেই অত্যল্প থাকবে। শুধু বিজ্ঞান জানলেই চলবে না, বিজ্ঞানসাহিত্যের লেখককে

অবশ্যই বাংলা ভাষাটাও সম্যক জানতে হবে। সকলেই সার্থক হবেন না, তবে বেশী বেশী সংখ্যায় লেখক লিখতে শুরু করলে তাঁদের মধ্য থেকে ভালো লেখক বেরোনর সম্ভাবনাও বাড়বে।

কোন কবি বা ঔপন্যাসিককে যদি প্রশ্ন করা হয় "কেন লেখেন", অধিকাংশেরই উত্তর মিলবে, "ভেতরে একটা যন্ত্রণা বা প্রেরণা অনুভব করি, যার জন্য লিখতেই হয়।" এই প্রেরণাতেই অভুক্ত থেকেও সাহিত্যিক সাহিত্য রচনা করেন, তরুণ কবি পকেটের শেষ কপর্দকটি পর্যন্ত খরচ করে কবিতার বই ছাপান। বিজ্ঞানীরা বস্তুনিষ্ঠ লোক। তাঁদের লেখার পেছনে এই অনির্দেশ্য, অন্তর্লীন তাগিদ বা যন্ত্রণার থেকে বস্তুগত কোন কারণ থাকাই স্বাভাবিক। জনপ্রিয় বিজ্ঞানের বই লেখার অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে যা বলা হয় তা হল, বিজ্ঞানের বার্তাকে জনগণের মধ্যে পৌঁছে দিতে পারলে জনমনে বিজ্ঞান-চেতনা বাড়বে, যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে উঠবে, কুসংস্কার দূর হবে, এবং এসবের সার্বিক ফল হবে দেশের ও সমাজের উন্নতি। বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্য জানলেই যদি যুক্তিবাদী চিন্তা অর্থাৎ বিজ্ঞান চেতনার উন্মেষ হত, তাহলে আমাদের বিজ্ঞানীকুলের সকলেই বিজ্ঞানমনস্ক হতেন এবং বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম বিজ্ঞানী-সংখ্যার এই দেশের চেহারাটাও অন্যরকম হত। আর বিজ্ঞানের তথ্য জানলেই যদি আচরণে তার প্রতিফলন পড়ত, তাহলে সিগারেটের কুফল সম্পর্কে বক্তৃতা দেওয়ার পরই বক্তাকে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে সিগারেট ধরাতে দেখা যেত না।

অতএব বিজ্ঞানসাহিত্যের চর্চা কেন করি, এই প্রশ্নের সৎ এবং সরল উত্তর হওয়া উচিত এরকম—"আমি বিজ্ঞানের বিশেষ বিষয়ের কিছু তত্ত্ব ও তথ্য জানি। যেহেতু মাতৃভাষায় বিভিন্ন বিষয়ের চর্চা করলে ভাষার উর্বরতা বাড়ে এবং যেহেতু কিছু লোক এ বিষয়ের কিছু জানতে আগ্রহী হতে পারেন, সেজন্যই আমি বাংলায় বিজ্ঞানসাহিত্য রচনার চেষ্টা করি।" বর্তমান নিবন্ধলেখক কিঞ্চিৎ বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের চর্চা করে। সে পেশায় শিক্ষক-চিকিৎসক এবং জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। স্বাস্থ্যের অধিকারের আন্দোলনে বেশী সংখ্যায় মানুষকে সামিল করতে সে স্বাস্থ্য-বিষয়ক কিছু লেখা লিখে থাকে, বিজ্ঞানভিত্তিক প্রচারধর্মী লেখা। সেগুলি সার্থক হয় কিনা তার প্রমাণ বা অপ্রমাণ অবশ্য এখনও তেমন মেলে নি। অনেক লেখকের এরকম উদ্দেশ্যও থাকতে পারে।

কোন লেখক কিভাবে লিখবেন, সেটা তাঁকে নিজেকে খুঁজে নিতে হবে। তাঁর বক্তব্য পাঠক বুঝতে পারলে তাকে গ্রহণ করবে, অন্যথায় বর্জন। আমার ব্যক্তিগত ধারণা, বিজ্ঞানের ভাষারীতি হবে সহজ, সরল, সর্বপ্রকার বাহুল্যবর্জিত, অবশ্য ন্যূনতম কাঠিন্যও তাতে থাকতে হবে। দু-একজন পূর্বসূরী চেষ্টা করেছেন এবং সফলও হয়েছেন বটে, কিন্তু গীতিকবিতার পেলব বাংলাভাষায় বিজ্ঞানসাহিত্য সার্বিকভাবে অদ্যাবধি তার ভাষারীতি খুঁজে পায় নি। 'বেগুনী পারের আলো' বা 'লাল-উজানী আলো'তে কাব্যিক ব্যঞ্জনা যত, দৃঢ়তা বা ঋজুতা ততটা নেই। আমার বিবেচনায়, বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের প্রকাশভঙ্গী হবে "শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠতি অগ্রে", 'নীরসঃ তরুবরঃ পুরতোভাতি" নয়। ভাষারীতির আলোচনায় পরিভাষাগত বিবেচনাও আসে। প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে চর্চার উন্মেষ হয়েছিল বটে, কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে আধুনিক বিজ্ঞান এসেছে পাশ্চাত্য থেকে। তাই বিজ্ঞানের পরিভাষা পেতে সংস্কৃতের ভাণ্ডার খোঁজার প্রয়োজন কি? যেসব তত্ত্ব ও তথ্য অতি সাম্প্রতিক কালের এবং তাদের অভিধা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হয়ে গেছে, তাদের কষ্টকল্পিত ও দুর্বোধ্য ভাষান্তরের প্রয়াসে সংস্কৃত ভাষায় তার প্রতিশব্দ খোঁজা কি যুক্তিযুক্ত? 'অক্সিজেন'কে অক্সিজেন বলেই, 'জীন'কে 'জীন' নামেই গ্রহণ করি, 'অম্লজান' বা 'বংশাণু'র সন্ধানে অতীত গুহায় মাথা খুঁড়ি কেন?

কেবল বিজ্ঞানসাহিত্য নয়, সর্বস্তরের বিজ্ঞানের বাংলাভাষায় প্রকাশ, যে মনীষীর প্রত্যয়ে ও চেষ্টায় ছিল, তিনি সত্যেন্দ্রনাথ বসু। তাঁর পক্ষেই বলা সম্ভব ছিল, "যাঁরা বলেন বাংলাভাষায় বিজ্ঞানচর্চা সম্ভব নয়, তাঁরা হয় বাংলা জানেন না নয় বিজ্ঞান বোঝেন না।" একথা অস্বীকার করার উপায় নেই, মাতৃভাষায় বিজ্ঞানের চর্চা অদ্যাবধি আমাদের অবচেতন মনের কৃপামিশ্রিত অনুকম্পার ফসল, সত্যেন্দ্রনাথের মত দৃঢ় প্রত্যয় ও উপলব্ধি থেকে উদ্ভূত নয়। তাই আজও আমাদের যাবতীয় বিজ্ঞানচর্চা পঠন-পাঠন থেকে গবেষণা, সবই চলে ইংরেজীতে, আর তার পাশে থাকে বিজ্ঞানসাহিত্যের নামে জনগণের জন্য বামহস্তের মুষ্টি ভিক্ষার ব্যবস্থা। এরকম অবস্থায় সার্থক বিজ্ঞানসাহিত্য রচিত হতে পারে না। পাশ্চাত্যের অনেক দেশে দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায় বিজ্ঞানের এক সুদৃঢ় ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে, সে সব দেশের ভাষায় প্রচণ্ড নিষ্ঠায় দশক শতক ধরে চলেছে প্রথাগত 'সিরিয়াস' বিজ্ঞান চর্চা, এবং তারই কিয়দংশ জনবোধ্য ভাষায় বিজ্ঞানীরা পৌঁছে দিচ্ছেন জনতার দরবারে। ফলে বিশুদ্ধ পঠনপাঠন ও চর্চার স্তরে শুরু হয়ে বিজ্ঞানের অনুস্রবণ (percolation) হতে পেরেছে অন্যতর স্তরে, রচিত হতে পেরেছে সার্থক বিজ্ঞান-সাহিত্য। তাই যতদিন না আমাদের বিজ্ঞানীদের নিজেদের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসার লাভ করছে, যতদিন না বাংলাভাষায় শুরু হচ্ছে সর্বস্তরের বিজ্ঞানচর্চা, যতদিন পর্যন্ত পাশ্চাত্যের মত এক "সায়েন্স কালচার" আমাদের দেশে গড়ে না উঠছে, ততদিন বাংলায় সার্থক বিজ্ঞানসাহিত্য পাওয়ার সম্ভাবনা বাস্তব হয়ে উঠবে না। তাবৎ গৌড়জন আমরা সেদিনের প্রত্যাশায় থাকব, সে লক্ষ্যে পৌঁছতে নিজের নিজের সামর্থ্য নিয়ে ব্রতী হব।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা, প্রসঙ্গত গণিতচর্চা

নন্দলাল মাইতি*

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা বিশেষ করে গণিতচর্চার সমস্যাটি জটিল। মূলত লেখক, পাঠক, সম্পাদক ও প্রকাশককে কেন্দ্র করে এই সমস্যা সৃষ্টি হলেও অন্যান্য কারণও কম নয়! হয়তো প্রত্যক্ষ নয়, কিন্তু সমস্যার মাত্রা বৃদ্ধিতে তাদের নগণ্য বলা যায় না। যে-কোন ক্ষেত্রেই সমস্যা থাকে বা আছেও। কিন্তু সমাধান, সক্রিয় উদ্যোগ ও কার্যক্রম ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। বাংলা ভাষায় গণিতচর্চার সমস্যা যথেষ্ট, কিন্তু সে-সবের নিরসন ঘটিয়ে উন্নতির পথ প্রশস্ত করার উদ্যমও নেই, কার্যক্রমও নেই। পাঠক, লেখক, সম্পাদক, প্রকাশক এবং অন্য সব পক্ষ যাঁদের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ ও ভাববিনিময় বিশেষ জরুরী, তাঁরা এ-বিষয়ে নির্বিকার। যেমন, একবার এক ভদ্রলোক বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের নামানুসারে বঙ্গীয় গণিত পরিষদ গঠনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু কোন পক্ষ থেকে একটু সাড়াও পাওয়া যায় নি। আবার বাংলা ভাষায় লেখা গণিতের ওপর গবেষণাপত্র গৃহীত হচ্ছে না। শিক্ষায়, সংযোগের ইত্যাদি বহু ক্ষেত্রেই মাতৃভাষার স্থান নেই। অথচ, বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ এ-বিষয়ে দীর্ঘদিন ধরে শুধু সকলের দৃষ্টি আকর্ষণই করেন নি, সক্রিয় ও সফল কার্যক্রম গ্রহণ করে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ গঠন করেছিলেন এবং 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' আজও প্রকাশিত হচ্ছে। মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার জন্য আচার্যকে বিদ্রূপ করা হতো, এখনো অনেকে সেই কথার পুনরাবৃত্তি করে চলেছেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চ ক্ষেত্রে মাতৃভাষার স্থান নেই, দেবার প্রচেষ্টাও নেই। দুঃখ করে লাভ নেই, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র সমূহের কর্ণধারদের কর্ণই বধির।

কথায় কথায় অনেক কথা এসে পড়েছে। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে আমরা সেই সব সমস্যা নিয়ে আলোচনা করব যাতে অন্তত বাংলায় গণিতচর্চা জনপ্রিয়তা অর্জন করে। অবশ্য এ-বিষয়ে মতবিরোধ থাকতে পারে এবং আরো সুচিন্তিত পথনির্দেশ করা যেতে পারে। তাই, পাঠকদের মতামত আহ্বান না করে পারি না।

1

বিজ্ঞান পত্রিকা সমূহের সম্পাদক মহাশয়রা বাংলা ভাষায় গণিতচর্চার পথটি প্রশস্ত করতে বহুল পরিমাণে সাহায্য করতে পারেন। বর্তমানে প্রকাশিত বিজ্ঞান পত্রিকাগুলির দিকে সামান্য নজর দিলেই দেখা যায়, গণিত বিষয় প্রবন্ধ প্রায় থাকে না। প্রতিটি সংখ্যায় নির্বাচিত প্রবন্ধ সমূহে যেন বোধগম্য গাণিতিক প্রবন্ধ থাকে তার দিকে নজর দেওয়া দরকার। কেবলমাত্র অ্যাকাডেমিক দিক নয়, চিত্তাকর্ষী যে কোন ধরনের প্রবন্ধ প্রকাশ করার নীতি অবলম্বন করলে ভাল হয়। অঙ্ক কষা ছাড়া গণিতের অন্য ভূমিকার ওপর অধিক জোর দিলে আর যাই হোক গণিতে আকর্ষণ ও আগ্রহ বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

দু-একজন সম্পাদককে বলতে শুনেছি, আকর্ষণীয় গাণিতিক প্রবন্ধ দপ্তরে কম আসে। কথাটা সত্য, সন্দেহ নেই। কিন্তু যাঁরা এ নিয়ে লেখেন, তাঁদের প্রবন্ধ লেখার জন্য উৎসাহিত করা উচিত। আলোচনার মাধ্যমে হলে সুফল ফলতে দেরী হয় না, তবে দূরবর্তী লেখকদের পত্র মাধ্যমেও উৎসাহিত করা যেতে পারে কিন্তু খরচের জন্য সম্পাদকদের চিঠি প্রায় লেখা হয়ে ওঠে না।

প্রকাশিত প্রবন্ধের লেখকদের অল্প হলেও সম্মানমূল্য দেওয়া একান্তই জরুরী। এতে লেখার মান উন্নত হয় এবং নানা বিষয়ের ওপর লেখা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

প্রায় সব পত্রিকার লিখিত নিয়ম অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হবে না, বা প্রকাশিত হলো কিনা জানানো হবে না। এমন দেখা যায়, একটি প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য লেখককে প্রায় বছর খানেক অপেক্ষা করতে হয়। এতে নতুন লেখকদের উৎসাহ থাকে না। লেখার অনুশীলন ইত্যাদিতে বাধা সৃষ্টি হয়। সম্পাদকদের এ দিকটি ভেবে দেখা দরকার।

নিয়মিত পত্রিকা প্রকাশ, বিষয়ের সমবণ্টন, লেখকদের সঙ্গে যোগাযোগ, সম্মানমূল্য প্রদান, অমনোনীত ও মনোনীত রচনা সম্পর্কে চিঠি দেওয়া, পাঠকের মতামত সমীক্ষা, লেখক-পাঠক-সম্পাদকের নিবিড় যোগাযোগ হলে বাংলায় বিজ্ঞানচর্চা তথা গণিতচর্চার উন্নতি ঘটবে বলে মনে হয়। পত্রিকা সম্পাদক, পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাবিদ ও লেখকদের, এমনকি পাঠকদের মাতৃভাষায় বিজ্ঞানশিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করার জন্য দাবী জানাতে হবে। সেই সঙ্গে লেখার মানোন্নয়নের জন্য নিজ নিজ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ সমূহের বাৎসরিক বা ষান্মাসিক সমালোচনা প্রকাশ করা একান্ত দরকার।

2

প্রকাশক বই ছাপেন বিক্রির জন্য—ব্যবসার জন্য। সুতরাং যে-ধরনের বই-এর কাটতি বেশী তাই তিনি অধিক পরিমাণে ছাপেন। গল্প-উপন্যাসের চেয়ে বিজ্ঞানের জনপ্রিয় বই-এর কাটতি কম। গণিত সম্পর্কিত বই-এর কথা বলাই বাহুল্য। বাংলায় গণিত বিষয়ক বই পাঠ্যপুস্তকনির্ভর। অঙ্ক বই-এর এই দশা তার জন্মলগ্ন থেকেই চলে আসছে, আজও তার ব্যতিক্রম দেখি না। ক্লাসের বই ছাড়া অন্য রকমের অঙ্কের বই হতে পারে, এ ধারণা বহু প্রকাশক, পাঠক ও অভিভাবকের নেই। সুতরাং জনপ্রিয় গণিতের বই প্রকাশ করা যে কী কঠিন, তা সহজেই অনুমেয়। অবশ্য পাঠকের অনাগ্রহই এর মূল কারণ।

* ঠাকুরাণীচক, হুগলী; 712 613

বহু প্রকাশক বিজ্ঞান পত্রিকা উল্টিয়ে দেখেন না। মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া অন্য লেখকদের নামও শোনেন নি তাঁরা। এ হেন অবস্থায় পাণ্ডুলিপির ভাগ্য উইপোকার হাতেই সমর্পিত হয়। তা ছাড়া কম প্রকাশক বাংলায় বিজ্ঞান বই প্রকাশ করেন বলে উপযুক্ত প্রকাশক পাওয়াও কঠিন। অনেকে ঝুঁকি নিয়ে নতুন লেখকের পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করতে চান না। বহু প্রকাশকের এমন ধারণা হয়েছে যে, বালপাঠ্য ও কিশোরপাঠ্য বিজ্ঞান বই ছাড়া বড়দের জন্য লেখা কোন বই প্রকাশ করলে বিক্রি হবে না। আর গণিত বিষয়ক বই একদম বিক্রি হবে না। অবশ্য ধাঁধা, ম্যাজিক, হেঁয়ালি ইত্যাদি জাতীয় বই ছাড়া।

গ্রন্থাগার ও পাঠক, প্রকাশককে নতুন নতুন বই প্রকাশে উৎসাহিত করতে পারেন। গ্রন্থাগারে সাহিত্য ও বিজ্ঞান বই সমানুপাতে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। স্কুল-কলেজ লাইব্রেরীতে বিভিন্ন বিভাগে ছাত্রসংখ্যার অনুপাতে গ্রন্থ রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। লাইব্রেরীয়ানদের পাঠকদের রুচি গড়ে তোলার কাজে তৎপর হতে হবে। স্কুল-কলেজে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ও অধ্যাপকদের বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর জনপ্রিয় বক্তৃতার আয়োজন করতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীরাই যাতে বক্তৃতা বা আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করে তার জন্য শিক্ষক ও অধ্যাপকদের কার্যক্রম গ্রহণ করে প্রকৃত গাইডলাইন তৈরি করতে হবে। মনে হয়, এতে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা ও গণিতচর্চার উন্নতি হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশকেয় বই বিক্রির দুর্ভাবনা থাকবে না।

অনেকের জানা, বর্তমানে বড় বড় লাইব্রেরীতেও এযুগের লেখকদের বিজ্ঞান ও গণিত সম্পর্কিত বই নাই। তাই আগ্রহী পাঠক যে কত অসুবিধায় পড়েছেন, তা সহজেই অনুমেয়।

3

লেখকদের সঙ্গে পাঠকদের প্রায় যোগাযোগ নেই। লেখকরা বুঝতে পারছেন না তাঁদের লেখা পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করছে কিনা। তাই, লেখক চলেছেন আপন মনে—লিখে চলেছেন নিজের পছন্দ মত। বাধ্য হয়ে কখনো কখনো সম্পাদক কিছু লেখা ছাপাচ্ছেন। কিন্তু এতে বাংলা বিজ্ঞান চর্চা ও গণিতচর্চায় অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির পরিবর্তে প্রতিকূল অবস্থা দেখা দিচ্ছে—বিশেষ করে নামকরা বিজ্ঞানীরা যখন কলম ধরেন। তাঁদের লেখায় সারল্য ও প্রসাদগুণ নেই, পরিবেশনে গৃহিণীপনা নেই, রচনাশৈলী আর যাই হোক বাংলা ভাষার রীতি ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নয়। আর শব্দ ও পরিভাষা নির্বাচনে এঁরা কারুর তোয়াক্কা করেন না। সম্প্রতি দু-একটি গণিত সম্পর্কিত প্রবন্ধ পড়ে এরকম মনে হল।

আবার কোন কোন লেখকের শব্দ নির্বাচন ও উপস্থাপনায় এতই লঘুতা যে, মনে হয় যেন তাঁদের পাঠকের বুদ্ধিবৃত্তিতে আস্থা নেই। অনেকের এমন ধারণা হয়েছে যে, বিজ্ঞানকে সাহিত্যরসে মণ্ডিত করতেই হবে। তা না হলে দুর্বোধ্য হবে, সুবোধ্য হবে না—আকর্ষণীয় হবে না। এই প্রবণতা বিজ্ঞানচর্চা ও গণিতচর্চায় উন্নতি ও সমৃদ্ধি আনবে বলে মনে হয় না।

বর্তমানে কল্পবিজ্ঞান, বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প-উপন্যাস-রহস্য-কাহিনী ও ফ্যান্টাসী বেশ আসর জমিয়ে বসছে বলে মনে হচ্ছে। খুবই দুঃখের বিষয় এধরনের লেখা সৃজনধর্মী লেখা বলে দাবী করা হচ্ছে। বিজ্ঞানে ও গণিতে কল্প—আজগুবী কল্পনা বলে থাকতে পারে ভাবা যায় না; বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প-উপন্যাস আর যাই হোক তাতে বিজ্ঞানের ভিত্তি কতটা দৃঢ় ভেবে দেখা দরকার। এমন 'বিজ্ঞান' শব্দের অপব্যবহার করে পাঠকদের বিভ্রান্ত করা অপসংস্কৃতির নামান্তর। এর বিরুদ্ধে বিজ্ঞানী, লেখক ও বিজ্ঞানমানসিকতাসম্পন্ন পাঠকরা কেন সোচ্চার নয়—বিস্ময়ের কথা।

বিজ্ঞান লেখকদের কোন ক্লাব নেই, সমিতি নেই যেখানে পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সম্ভাবনা থাকে। আলাপ-আলোচনা, পরস্পরের মধ্যে ভাববিনিময় ও লেখার নানা দিক নিয়ে সম্ভাবনার পথ খোলা একমাত্র সম্মিলনের মধ্য দিয়েই হতে পারে। দুঃখের বিষয় এদিকে অগ্রজ লেখক বা বাংলা বিজ্ঞানপ্রেমী কারুর উদ্যোগ নেই। একটি উদ্যোগের কথা দীপক দাঁর চিঠির মাধ্যমে জেনেছিলাম। কিন্তু কতদূর কার্যকর হয়েছে, জানি না।

বিজ্ঞান লেখকদের আর একটি দুর্ভাগ্য তাঁরা বিজ্ঞাপন পাবে না—তাঁদের লেখা বই-এর প্রায় প্রচার নেই। ঔপন্যাসিক, সাহিত্যসমালোচক, কবি ইত্যাদির তুলনায় তাঁদের বিজ্ঞাপন নগণ্য। স্বল্পখ্যাত লেখকদের কথা ছেড়েই দিলাম, বড় লেখকরাও জনপ্রিয় ঔপন্যাসিকদের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর বিজ্ঞাপন পান। এতে লেখকদের পরিচিতি বাড়ে না, আর বইও তেমন বিক্রি হয় না। স্বল্পখ্যাত লেখকরা তাই কোন রকমে দু-একটি বই লিখে আর লেখার উৎসাহ পান না। এতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন গণিত লেখকরা। একে তাঁদের বই বাজারে কাটার চেয়ে পোকায় কাটে বেশী। তার ওপর বিজ্ঞাপনের পরিধি প্রায় বিন্দুবৎ হওয়ায় পাঠকের বিস্মরণ ঘটতে বিলম্ব হয় না। অবশ্য, প্রদীপ মজুমদার খুব কমই আছেন যাঁরা অদম্য উৎসাহে আত্মোৎসর্গ করে চলেছেন। অন্যরা বিষয়ান্তরে গিয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করার চেষ্টা করছেন। বাংলা গণিতচর্চা ব্যাহত হচ্ছে।

4

সব সমস্যার সমাধান করতে পারেন পাঠক-পাঠিকা ও উৎসাহী অভিভাবকরা। তাঁরাই সমালোচনা করে বিভিন্ন লেখকদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন; তাঁরাই প্রকাশকদের নানা স্বাদের বিজ্ঞান ও গণিতগ্রন্থ প্রকাশে উৎসাহিত করতে পারেন; সম্পাদকদের পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশে প্রেরণা দিতে

পারেন ; ভাল-খারাপ বিচার করে বাংলা বিজ্ঞান ও গণিত-চর্চার বন্যা বইয়ে দিতে পারেন। এমন কি, মাতৃভাষায় বিজ্ঞান-শিক্ষাদানে শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত সম্প্রসারিত করায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সক্রিয় দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন। তাঁদের সোচ্চার দাবী অচলায়তন ভেঙ্গে দিতে পারে।

কিন্তু তা কি হবে ? বাঙালী মানস-প্রকৃতি কি যুক্তিন্যায় ও বিজ্ঞানচর্চায় যথার্থ অনুকূল নয় ? কিন্তু তা হবে কি করে ? এদেশেই—তথাকথিত কাব্য-সাহিত্যের—বৈষ্ণবপ্রেমের দেশে জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র সত্যেন্দ্রনাথ, মেঘনাদ প্রমুখ কি জন্মান নি ? জনপ্রিয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের বই পড়ে কি মেঘনাদ সাহা তাঁর বিশ্বখ্যাত 'তাপ-আয়নন তত্ত্ব' আবিষ্কারে প্রেরণা পান নি ? তবু মনে হয়, আমরা বাঙালী পান চিবাব, অফিস যাব, আড্ডা দেব ইত্যাদিই বোধ হয় সত্যি।

অথচ বাঙালী বই কেনে। গল্প-উপন্যাস কেনে, রহস্য কাহিনী কেনে, বেশী করে কেনে 'কঠোর ভাবে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য' বই। এই স্বভাব ও প্রকৃতি অবশ্য বাঙালীর আজকের নয়, সেই ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ দশক থেকেই চলে আসছে। মাঝে বঙ্কিম-মধুসূদন-রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কিঞ্চিৎ অবদমিত করে রেখেছিলেন মাত্র। কিন্তু বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যে তেমন ব্যক্তিত্ব কোথায় যে, অপসংস্কৃতি রোধ করে আপন ব্যক্তিত্ব আপামর জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেবেন ? প্রতিভার অভাব, না সুযোগের অভাব ? এ নিয়ে আলোচনা ও কর্মপন্থা গ্রহণ করা যায় কিনা কে ভেবে দেখবে ? বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ভেবে দেখতে পারেন কি ?

5

বাংলায় বিজ্ঞানচর্চার সবচেয়ে দুর্বল ক্ষেত্র হচ্ছে গণিত। পত্র-পত্রিকায় এ-বিষয়ে স্বল্প-প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। যা হয় তার বেশীর ভাগ আকাডেমিক। তাতে পাঠকের আকর্ষণ কম। তার ওপর প্রায় পৌনে দু-শ' বছরের বিজ্ঞানসাহিত্যের ইতিহাসে বাংলায় পাতে দেওয়ার মত বই কোথায় ? হিন্দীতে গণিতের ইতিহাস আছে, বাংলাদেশেও আছে, কিন্তু এই সংস্কৃতির পীঠস্থান কলকাতা কেন্দ্রিক বাংলাভাষায় নেই ; গ্রীক গণিতের ইতিহাস নেই। এ-নিয়ে প্রবন্ধও তেমন লেখা হয় নি। যা হয়েছে কিশোর পাঠ্য। প্রাচীন ভারতীয় গণিতের ইতিহাস এই কিছুদিন হলো দু-একটি দেখা যাচ্ছে। বাংলাভাষায় উৎকৃষ্ট মানের গণিতের বই নেই। অঙ্ক গণিত নাকি মানবজীবনের সমগ্র ক্ষেত্র অধিকার করে আছে। প্রদীপ মজুমদার মহাশয়কে ধন্যবাদ তিনি দু-তিনটি উৎকৃষ্ট মানের বই প্রকাশ করেছেন। গণিতের অধ্যাপক, শিক্ষক প্রমুখ উৎসাহিত হয়ে যদি ধাঁধা, হেঁয়ালি ইত্যাদিতে বেশী আকৃষ্ট না হয়ে উৎকৃষ্ট মানের গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেন, তা হলে হাওয়া বদল হতে পারে।

আমাদের দেশের কবি-সাহিত্যিকরা সাধারণত বিজ্ঞানের ধার ধারেন না, গণিতের কথা বলাই বাহুল্য। তাঁদের রচনায় কখনো-সখনো বিজ্ঞানী ও গণিতজ্ঞের দেখা মেলে বটে, তবে ক্লাউনের ভূমিকায়। রবীন্দ্রনাথের 'রবিবার' গল্পে এক গণিতপ্রেমীর চরিত্র রক্তমাংসহীন করে অঙ্কিত হয়েছে। তাঁর অনুবর্তন সব লেখকদের রচনায় দেখা যাচ্ছে। বস্তুত বিজ্ঞানী ও গণিতজ্ঞরা কবি-সাহিত্যিকদের হাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অসম্মানজনকভাবে উপেক্ষিত হয়ে আসছেন বলেই মনে হয়।

বিজ্ঞানী ও গণিতজ্ঞদের সম্পর্কে এরূপ ধারণা পরিবর্তন করা বিশেষ দরকার। তাছাড়া কবি-সাহিত্যিকদের লেখায় বৈজ্ঞানিক ও গাণিতিক প্রত্যয়ের কোন স্থান নেই—পরিভাষা দূরের কথা। পাশ্চাত্যে এমন নয়, বলাই বাহুল্য। বস্তুত আমাদের দেশে বিজ্ঞানচর্চা একপেশে, সার্বিক যোগাযোগ না থাকায় এর উন্নতি কি করে সম্ভব ? গণিতে আতঙ্ক ও বিরূপতা ছড়ানোর পেছনে সাহিত্যিকদের জুড়ি মেলা ভার। অঙ্কের স্যারের কথা উঠলেই যেন তিনি বকুনি দেবেন, দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে প্রকাণ্ড কাণ্ড করবেন, এমন ধারণা সৃষ্টি করেই ওঁরা গণিতচর্চায় ও গণিতপ্রেমে বাধা সৃষ্টি করছেন বলে মনে হয়।

বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যে আরো একটি গুরুতর সমস্যা পাহাড়-প্রমাণ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, এদিকে চিন্তাশীল ও চিন্তাবিদদের দৃষ্টি নেই। আমি বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্যের সমালোচনা বিভাগের কথা বলছি। আদর্শ, ভাল-মন্দের যদি বিচার-বিশ্লেষণ না হয়, বিভিন্ন প্রকার রচনার স্বভাব ও প্রকৃতি এবং বৈশিষ্ট্য নিয়ে যদি আলোচনা না থাকে, সার্থক রচনার উপাদান নিয়ে যদি কোন বিবরণ না থাকে, তাহলে বিজ্ঞানসাহিত্য—গণিতসাহিত্যের উন্নতি হবে কি করে ? এই বিষয় নিয়ে বাংলা বা গণিত বিভাগে কোন গবেষণা হয় কিনা, জানি না। না হলে, এ-বিষয়ে আলোচনা করার যোগ্য ব্যক্তির অভাব যে দেখা দেবে, তাতে সন্দেহ নাই। বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের ইতিহাস নিয়ে একটিমাত্র বই বহু কাল আগে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু তারপর ? আর কোন বিস্তারিত গবেষণা হয় নি। অথচ গবেষণা হলে গ্রন্থাগারসমূহ বিজ্ঞান ও গণিত সংক্রান্ত বই রাখার প্রয়োজনীয়তা বোধ করবে। পাঠক বিভিন্ন বই-এর গুণাগুণ পড়ে মূল বই কেনার প্রেরণা বোধ করবে—পত্র-পত্রিকার চাহিদাও বাড়বে, সন্দেহ নেই।

বক্ষ্যমান প্রবন্ধে বিজ্ঞানচর্চা—বিশেষত গণিতচর্চা নিয়ে সামান্য আলোচনা হলো। কিন্তু সমস্যাটি গভীর ও ব্যাপক। পাঠক, সমালোচক ও সুধীমণ্ডলী এ-বিষয়ে আলোচনার দ্বারা নানা সমস্যার উল্লেখ ও সমাধানের ইঙ্গিত দিলে এই নগণ্য লেখক যেমন উপকৃত হবেন, তেমনি সমস্যার নতুন আলোকপাত হবে।

বাংলায় বিজ্ঞানসাহিত্যের চালচিত্র

হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়*

যে যার নিজের মাতৃভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ে চর্চা করবে এতে প্রচারই বা কি গর্ববোধই বা কি? পৃথিবীর সর্বত্রই তো তাই হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারতবর্ষে শতাব্দীর পর শতাব্দী বিদেশী শাসন কায়েম ছিল। স্বভাবতই সাধারণ মানুষ রাজন্যের অনুগ্রহ লাভের আশায় প্রয়োজন ও পরিস্থিতি অনুযায়ী রাজভাষা শেখবার দিকে বেশী আগ্রহী ছিল। সেই আগ্রহ চরমে উঠে শেষ বিদেশী শাসক ইংরেজদের আমলে। তখন নিজেদের ভাষা ও ঐতিহ্যের উপর যথেষ্ট অবহেলা এবং অনীহা দেখা দেয়। দেশের প্রাচীন সাহিত্য বিশেষ করে বিজ্ঞান অনুশীলন নানা কারণে লুপ্ত হয়ে যায়। শোনা যায় গণিত, জ্যামিতি, চিকিৎসাবিদ্যা, রসায়ন, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি এই ভারতেই প্রচুর চর্চা এবং মৌলিক অবদান ছিল। যে সরস্বতী নদীর ওপর দিয়ে এককালে সমুদ্র পাড়ি দেওয়া যেতো তার ধারা যেমন শুকিয়ে গেছে, তেমনি ঐ সময় আমাদের বিজ্ঞানচর্চাও শুকিয়ে গেছে। উত্তরাধিকার সূত্রে সে সম্পদ আমরা পাই নি। বিজ্ঞানের নূতন পাঠ আমরা শুরু করলাম বিদেশীর কাছ থেকে এবং সেটার নাম হল পাশ্চাত্য অথবা আধুনিক বিজ্ঞান। সেই বিজ্ঞানের পাঠ ও চর্চা সুরু হয় স্বভাবতই বিদেশী ভাষায়।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান আহরণ করতে শুরু করেছি ইংরাজ শাসনের শেষের দিকে, ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে। সুতরাং তখন যাঁরা ইংরাজীতে পঠন-পাঠন করতেন তাঁরাই বিজ্ঞানের পারদর্শী হবার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং অনেকেই বিশিষ্ট বিজ্ঞানী হয়ে উঠেছিলেন। ইংরাজীতে বিজ্ঞানের পঠন-পাঠন এবং চর্চা থাকার দরুণ জনসাধারণের বিরাট অংশ বিজ্ঞানের আস্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়। কয়েকজন দূরদর্শী বিজ্ঞানী ও মনীষী এই অভাবটুকু লক্ষ্য করেছিলেন। তাঁরা অনুভব করেছিলেন সমাজের মধ্যে বিজ্ঞানপ্রসূত প্রযুক্তি সুদূরপ্রসারিত হচ্ছে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে সুখস্বাচ্ছন্দ্য এবং অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য প্রতি পদক্ষেপে বিজ্ঞানের সাহায্য, জেনে না জেনে, গ্রহণ করতে হচ্ছে। সুতরাং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে পরিচিত হওয়া সাধারণের পক্ষে অপরিহার্য না হলেও আবশ্যিক বটেই। তাই সাধারণ মানুষের কাছে বিজ্ঞানের প্রাথমিক জ্ঞান প্রচারের চেষ্টা এবং তাদের বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলা প্রয়োজন; আর এ কাজ যে মাতৃভাষার মাধ্যমে করতে হবে তাও তাঁরা অনুধাবন করেছিলেন। সেই উদ্দেশ্যে বাংলা বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা করতে ব্রতী হয়েছিলেন। সে আজ এক শত বছরের উপর হয়ে চলল। মাতৃভাষায় বিজ্ঞান প্রচারের গৌরব তাঁদেরই। তাঁরা পথিকৃৎ, আমরা উত্তরসূরী। এই এক শত বছরে বিজ্ঞানবিদ্যার প্রসার অবশ্যই ঘটেছে কিন্তু বিজ্ঞান মনস্কতা কতটা বেড়েছে বলা শক্ত।

এখন কি ধরণের প্রবন্ধ লিখলে আমাদের উদ্দেশ্য সাধিত হবে সেটাই বিবেচ্য। বিজ্ঞানের দ্রুত অগ্রগতি, পরিবেশের পরিবর্তন, শিক্ষাক্রমের নিত্য নূতন পরিবর্তনের সঙ্গে বিজ্ঞান বিষয়ক রচনার নূতন আঙ্গিক শুরু হয়েছে। শিক্ষাগত সামাজিক পরিবেশ, অর্থনৈতিক এবং সংস্কারগত ভাবে এখন পাঠকের নানা স্তর। উচ্চ শিক্ষিত বা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত যাঁরা তাঁরা অনেকটা অগ্রসর। এঁদের লেখা গবেষণাপ্রসূত উচ্চস্তরের রচনা। এখন অপেক্ষাকৃত অল্প শিক্ষিতদের জন্য মধ্য স্তরের কিছু রচনা করলে বোধ হয় তাড়াতাড়ি বিজ্ঞান প্রসার হবার সম্ভাবনা। তাই :—

(ক) কিশোরদের জন্য গল্পের ছলে বিজ্ঞানের প্রাথমিক জ্ঞানগুলি প্রচার করতে হবে তার সঙ্গে উৎকৃষ্ট চিত্র সংযোজন করা আবশ্যিক বলেই মনে হয়। বিজ্ঞান শেখাচ্ছি বলে বিজ্ঞান শেখানো যাবে না। বিষয়গুলি এমনভাবে পরিবেশন করতে হবে যাতে তারা বিজ্ঞানে আকৃষ্ট হয়ে সে বিষয়ে আরো খবর জানার জন্য আগ্রহী হয়।

(খ) বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য—বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের বহুরকম পাঠ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকের বিষয়গুলি সংক্ষেপে বর্ণনা করা থাকে, ছাত্ররা তথ্যগুলি পাখীপড়ার মত মুখস্থ করছে। পাঠ্যপুস্তকে এই বিষয়গুলি নিয়ে বিস্তারিত এবং মনোজ্ঞ করে আধুনিকতম তথ্যসম্বলিত প্রবন্ধ রচনা করা উচিত।

(গ) বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য বিজ্ঞানের নানা জটিল বিষয়গুলি সরলীকৃত করে আধুনিকতম তথ্য পরিবেশন করতে হবে।

(ঘ) ইতিহাস—দেশীয় এবং অন্যান্য দেশের বিজ্ঞানের উৎস, ক্রমাগত এবং পরিণতির ইতিহাস রচনা করতে হবে।

(ঙ) জীবনী—দেশীয় এবং অন্যান্য দেশের বিজ্ঞানীদের জীবনী প্রচার করতে হবে বিশেষ করে যাঁরা মৌলিক গবেষণায় কৃতী হয়েছেন।

বিজ্ঞান বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা সম্বন্ধে 1892 খৃস্টাব্দে শ্রীপ্রমথনাথ গুপ্ত রচিত প্রবন্ধের একটি অংশ উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না— "বৈজ্ঞানিক বিষয়ে পুস্তক লিখিতে হইলে তৎসম্বন্ধে সম্প্রতি দুই-চারি বৎসরের এমনকি দুই চারি মাসের মধ্যে যেসকল নতুন আবিষ্কার হইয়াছে তা জানা আবশ্যক"। প্রকৃত পক্ষে একটি প্রবন্ধ লিখতে হলে সে বিষয়ে সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। বিষয়বস্তুটি লেখকের সম্পূর্ণ আয়ত্তে (conception) না থাকলে প্রবন্ধের বক্তব্য স্বচ্ছ হয় না। লক্ষ্য রাখতে হবে প্রবন্ধে কোন ভুল তথ্য বা তত্ত্ব না থাকে। প্রায়ই দেখা যায় প্রবন্ধ লেখকের যে বিষয়ে তাঁর জ্ঞানের পরিধি কম অথবা তিনি সেই বিষয়ের উপর প্রবন্ধ লেখার চেষ্টা করেন অথবা ইংরাজীতে লেখা অন্য কারো প্রবন্ধ অবলম্বন করে লিখে থাকেন।

* 25/A, নিমতলাঘাট স্ট্রীট, কলিকাতা-700 006

ফলতঃ বিষয় সম্বন্ধে লেখকের সুষ্ঠু ধারণা না থাকায় পাঠকেরও ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হয়। কখন কখন দেখা যায় পৃথিবীর কোন স্থানে একটি গবেষণামূলক কাজের প্রাথমিক প্রতিবেদন বা আংশিক সংবাদ প্রকাশিত হল, অমনি এখানকার পত্র-পত্রিকায় বিশেষ করে দৈনিক পত্রগুলিতে তা ফলাও করে প্রচার করা হয়। ঐ সব গবেষণামূলক আবিষ্কার যতক্ষণ না সর্ববাদী সম্মতভাবে স্বীকৃত হচ্ছে ততক্ষণ তা প্রকাশে সংযত থাকা উচিত—যাতে পাঠকরা তা থেকে ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত না নিতে পারে।

আর একটি সমস্যা হল পরিভাষা নিয়ে? আমরা ইংরাজি ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শুরু করি। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের প্রযুক্তিগত শব্দগুলিও ইংরাজিতে শিখি। (বর্তমানে অবশ্য ছাত্ররা বাংলা প্রতিশব্দের মাধ্যমে পঠন-পাঠন শুরু করেছে)। বাংলায় বিজ্ঞানের প্রসারের প্রথমাবস্থায় যদি এই বিষয় কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া হত তাহলে এত দিনে আমরা পরিভাষা সমস্যা মিটিয়ে ফেলতে পারতাম। বাংলায় বিজ্ঞান প্রচারের আদি যুগে কেউ কেউ এ নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছিলেন। যেমন ধরুন 1876 খৃষ্টাব্দে ব্রজেন্দ্রনাথ দে উদ্ভিদশাস্ত্রের উপক্রমণিকা গ্রন্থের অনুবাদে প্রত্যেক ইংরাজি বৈজ্ঞানিক শব্দের বাংলায় পরিভাষিক শব্দ যোজন করেছিলেন। 1863 খৃস্টাব্দে গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'শিক্ষা প্রণালী' পুস্তকের শেষে 80টি বৈজ্ঞানিক শব্দের পারিভাষিক বাংলা শব্দের তালিকা দিয়েছেন। শতাধিক বছরের পূর্বে ঐ প্রচেষ্টা শুরু হওয়া সত্বেও 1985 খৃস্টাব্দেও কোন সর্ববাদী সম্মত পরিভাষা তৈরি হল না—অভিধান ত দূরের কথা। যেহেতু ভারতে বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন ভাষা সেহেতু একটি সর্বভারতীয় পরিভাষা প্রণয়ন করলে তো সবচেয়ে ভাল হয়।

ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে কি ধরনের কাজ হচ্ছে, কোন কোন বৈজ্ঞানিক কি কি বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করে মৌলিক গবেষণা করেছেন এইসব তথ্য প্রবন্ধের মাধ্যমে প্রচারিত হওয়া উচিত। ভারতের সর্বপ্রান্তের বিজ্ঞান আন্দোলন ও তার কার্যক্রম সম্বন্ধে বাংলাভাষীরা কতটা ওয়াকেবহাল সেটা বলা শক্ত, আজকাল এত রকমের প্রচার মাধ্যম থাকা সত্বেও। চিন্তা করুন প্রাচীনকালে প্রচার মাধ্যমের অভাব এবং যাতায়াতের অসুবিধা সত্ত্বেও পৃথিবীর একপ্রান্তের বিজ্ঞান অন্য প্রান্তে শেখানো হত। নানা দেশ থেকে বিহারে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রো অধ্যয়ন করতে আসতেন দেশের মধ্যেই দারুন সাহিত্যের প্রচার যেমন করে হত। কালীদাস প্রমুখ কবির রচনার চর্চা সারা ভারতে প্রচলিত ছিল। আমরা অষ্টাদশ পুরাণ আছে জানি। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের পণ্ডিতরা বিভিন্ন সময়ে ঐ পুরাণগুলি রচনা করেছিলেন। অথচ সকল প্রান্তের ভারতবাসী অষ্টাদশ পুরাণের কাহিনী জানেন। লোকসঙ্গীত, লোকগাথা বাংলার যে প্রান্তেই রচিত হোক না কেন বিভিন্ন গ্রামে তার প্রচলন হয়ে যেত। আয়ুর্বেদজ্ঞ কবিরাজরা গ্রামে গ্রামে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এগুলিই কি করে সম্ভব হত। অথচ বর্তমানে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির কল্পনাতীত অগ্রসর হওয়া সত্ত্বেও ভারতে আন্তঃরাজ্য ভাব ও জ্ঞানের আদান-প্রদান সমন্বয়িত হয়েছে বলে মনে হয় না।

সর্বশেষে একটি বাস্তববাদী প্রসঙ্গ তোলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আজকাল বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পত্রিকা প্রচুর পরিমাণে বেড়েছে। বহু সাপ্তাহিক, মাসিক পত্রিকা, এমনকি দৈনিক সংবাদ পত্রেও বিজ্ঞান বিভাগ থাকে। সুতরাং বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধের চাহিদাও প্রচুর পরিমাণে বেড়েছে। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পরিচালিত পত্রিকাগুলি উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়ে প্রবন্ধ ক্রয় করে। সুতরাং যাঁরা তা পারবেন না তাঁদের পক্ষে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ সংগ্রহ করা দুরূহ।

আর একটি কথা গবেষণামূলক মৌলিক প্রবন্ধ যদি বাংলায় প্রকাশিত হয় তাহলে বিজ্ঞান জগতে বাংলাভাষার মর্যাদা বাড়বে। সেইদিকে জোর দিতে হবে।

"আমি জানি তর্ক এই উঠিবে, 'তুমি বাংলাভাষার যোগে উচ্চশিক্ষা চাও কিন্তু বাংলাভাষায় উঁচুদরের শিক্ষাগ্রন্থ কই?" নাই সেকথা মানি, কিন্তু শিক্ষা না চলিলে শিক্ষাগ্রন্থ হয় কী উপায়ে? শিক্ষাগ্রন্থ বাগানের গাছ নয় যে শৌখিন লোকে শখ করিয়া তার কেয়ারি করিবে কিংবা সে আগাছাও নয় যে মাঠে ঘাটে নিজের পুলকে নিজেই কণ্টকিত হইয়া উঠিবে। শিক্ষাকে যদি শিক্ষাগ্রন্থের জন্য বসিয়া থাকিতে হয় তবে পাতার জোগাড় আগে হওয়া চাই তার পরে গাছের পালা, এবং কূলের পথ চাহিয়া নদীকে মাথায় হাত দিয়া পড়িতে হইবে।"

—রবীন্দ্রনাথ

(শিক্ষার বাহন—পৌষ, 1322 বঙ্গাব্দ)

বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক ও বাংলা বৈজ্ঞানিক পরিভাষা

বিমলকান্তি সেন*

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্বে কলিকাতায় কতিপয় ইংরেজী স্কুলের মাধ্যমে ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের সূচনা ও বিস্তার আরম্ভ হয়। ধর্মতলার Drummond School, চিৎপুরের Sherbourne স্কুল প্রভৃতি এ ব্যাপারে অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করে এবং শিক্ষাদানের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক বিদেশ থেকে আমদানী হতে থাকে।

1800 খৃস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ এবং 1817 খৃস্টাব্দে হিন্দু কলেজ স্থাপনার পর ভারতবর্ষেই পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনের প্রয়োজনীয়তা বিশেষ ভাবে অনুভূত হতে থাকে এবং এরই ফল হিসাবে 1817 খৃস্টাব্দের জুলাই মাসে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি স্থাপিত হয়।

সোসাইটি স্থাপনের কিছুকালের মধ্যেই পাঠ্যপুস্তকের প্রকাশনা আরম্ভ হয়। 1817 খৃস্টাব্দেই প্রকাশিত হয় 'মে গণিত', অর্থাৎ মে সাহেবের রচিত গণিত। এই বইটিই বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম বৈজ্ঞানিক পাঠ্যপুস্তক। সোসাইটির প্রকাশিত অন্যান্য বিজ্ঞান-বিষয়ক পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে হার্লে'র গণিতাঙ্ক, পিয়ার্সনের ভূগোল, ইয়েট্‌সের জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতির উল্লেখ করা যেতে পারে। এ ছাড়াও এই সময় রামমোহন রায়ের ভূগোল, যদুনাথ ভট্টাচার্যের বীজগণিত, গিরীশচন্দ্র তর্কালঙ্কারের জীবতত্ত্ব প্রভৃতি পুস্তকও প্রকাশিত হয়।

যে সময়ে বাংলাভাষায় এই সব পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়, সেই সময়কে বাংলাভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনার আদিযুগ বলা চলে। সেই আদিযুগেই বেশ কিছু বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়েছিল সাহেবদের দ্বারা। বাঙ্গালী লেখকরাও এগিয়ে এসেছিলেন পাঠ্যপুস্তক রচনার কাজে। সেদিনের বাংলা ভাষা আজকের মত বিকশিত ছিল না। বৈজ্ঞানিক পরি-ভাষা বলতে বাংলা ভাষার ভাণ্ডার ছিল প্রায় শূন্য। এই অবস্থায় সেদিনের লেখকদের পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে হয়েছিল। কাজেই তখনকার দিনের পাঠ্যপুস্তকের ভাষার আড়ষ্টতা এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি নিতান্ত ভাবেই স্বাভাবিক।

সময় এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার বিস্তার ঘটতে থাকে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপনা হয় (1857), এবং বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তকও রচিত হতে থাকে। বাঙ্গালী মনীষীরা বৈজ্ঞানিক পরিভাষার প্রয়োজনীয়তাও ক্রমেই উপলব্ধি করতে থাকেন। ফলে পরিভাষা বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু হয় এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্রের A scheme for the rendering of European scientific terms into the vernacular of India প্রকাশিত হয় 1877 খৃস্টাব্দে। 1288 বাংলা সনের বঙ্গদর্শন পত্রিকায় জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'নূতন কথা গড়া' নামক রচনা প্রকাশিত হয়। বাংলাভাষায় পরিভাষা বিষয়ক সম্ভবতঃ এটিই প্রথম রচনা।

এর পর বাংলায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা গড়ার কাজে এগিয়ে আসেন অনেকেই, যাঁদের মধ্যে অনঙ্গমোহন সাহা, একেন্দ্রনাথ ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায়, জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী, যোগেশচন্দ্র রায়, রাজশেখর বসু, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

পরিভাষা গড়ে উঠার সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় উৎকৃষ্ট মানের পাঠ্যপুস্তকও রচিত হওয়া শুরু হয়। বর্তমান শতাব্দীতে যাদবচন্দ্রের পাটিগণিত, কে. পি. বসুর বীজগণিত; হল, স্টিভেন্স এবং সেনের জ্যামিতি প্রভৃতি পাঠ্যপুস্তক যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করে এবং দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত থাকে।

বর্তমান শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের শেষ অবধি বাংলাভাষায় বিজ্ঞানের পঠন-পাঠন বিদ্যালয়েই সীমাবদ্ধ ছিল দশম শ্রেণী পর্যন্ত। গণিত ব্যতিরেকে যেটুকু বিজ্ঞান স্কুলে পড়ানো হত তাতে থাকতো পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও জীববিজ্ঞানের কিছু পাঠ। বাংলায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় যেটুকু বিকাশ ঘটেছিল তাতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক রচনায় কাজ মোটামুটিভাবে চলে যেত। কদাচিৎ I. Sc. পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তক বাংলায় দু'একখানি দেখা যেত।

ষাটের দশকে ক্রমেই শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তন ঘটে। উচ্চ মাধ্যমিক অর্থাৎ দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা বিদ্যালয়েই সুরু হয়। একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীতে পূর্বের I. Sc.-র পাঠ্যবস্তু তো আসেই, স্নাতক পর্যায়েরও বেশ কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়। ষাটের দশকপর্যন্ত বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় যে বিকাশ বাংলায় ঘটেছিল, তা দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পাঠপুস্তক রচনায় ক্ষেত্রে আদৌ প্রতুল ছিল না।

একদিকে পাঠ্যপুস্তক রচনায় আশু প্রয়োজনীয়তা, অন্যদিকে পরিভাষার অপ্রতুলতা, এই বৈপরীত্যের মধ্যেই গত দুই দশক ধরে রচিত হচ্ছে বাংলায় বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক।

এই অদ্ভুত অবস্থার মধ্যে পাঠ্যপুস্তক রচনায় পরিভাষা কী ধরণের সমস্যার সৃষ্টি করছে, উপযুক্ত পরিশব্দ গঠন বা বা ব্যবহারের ব্যাপারে লেখকগণ কতটা সচেষ্ট এবং যত্নবান, পরিভাষার জন্য ছাত্রসম্প্রদায় কিরূপ সমস্যায় সম্মুখীন হচ্ছে, ইত্যাদি নিয়েই এই আলোচনা।

এই আলোচনা মোটামুটিভাবে একটি পাঠ্যপুস্তককে কেন্দ্র করেই করা হচ্ছে সময় ও পরিসরের সীমাবদ্ধতার দরুণ। সমস্যার সম্যক পরিচয় এই থেকেই পাওয়া যাবে। যে ধরণের ত্রুটি-

* 80, অলকানন্দ পকেট—'এ' কালকাজি, নূতন দিল্লী-19

বিচ্যুতি আলোচ্য পাঠ্যপুস্তকটিতে বিদ্যমান, অনুরূপ ত্রুটিবিচ্যুতি অন্যান্য বহু পাঠ্যপুস্তকেই রয়েছে।

মুখোপাধ্যায়, মেদ্দা, মেদ্দা ও মুখোপাধ্যায় রচিত 'জীববিজ্ঞান' একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের একটি প্রামাণ্য পাঠ্যপুস্তক। স্পষ্টতঃই বইটি চারজন লেখকের অবদান। অনুমিত হয় বইটির বিভিন্ন অধ্যায় ভাগাভাগি করে চারজনেই লিখেছেন।

বইয়ের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন লেখক কর্তৃক রচিত হলেও, পরিশব্দের ব্যবহারে বইয়ের সর্বত্র সঙ্গতি রক্ষা হবে, এটাই 'কাম্য'। দুঃখের বিষয় এ বইয়ের সর্বত্র তা রক্ষা হয় নি।

Genetics শব্দটিই নেওয়া যাক। পাঠ্যপুস্তকটির (4র্থ সংস্করণ 1978) প্রথম পরিচ্ছেদের বিভিন্ন জায়গায় এর বাংলা পাওয়া যাচ্ছে প্রজননবিদ্যা (পৃঃ 13), সুপ্রজননবিদ্যা (পৃঃ 27), জীনতত্ত্ব (পৃঃ 103), প্রজনন বিজ্ঞান (পৃঃ 272), জেনেটিক্স (পৃঃ 272)। আবার এই বইয়েরই 15শ পৃষ্ঠায় cross breeding এবং selective breeding-এর বাংলা দেখা যাচ্ছে যথাক্রমে শঙ্কর প্রজনন ও নির্বাচিত প্রজনন। স্পষ্টতঃই এখানে breeding-এর বাংলা করা হয়েছে প্রজনন। Breeding-এর বাংলা প্রজনন হলে science of breedingয়ের বাংলা দাঁড়ায় প্রজননবিজ্ঞান। Genetics এবং science of breeding-এর সম্পর্ক কাছাকাছি হলেও বিষয় দুটি অভিন্ন নয়। তাই এদের জন্য আলাদা বাংলা প্রতিশব্দই বাঞ্ছনীয়। এর জন্যই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত 'বৈজ্ঞানিক পরিভাষা'য় genetics এবং breeding-এর বাংলা প্রদত্ত হয়েছে যথাক্রমে সুপ্রজননবিদ্যা এবং প্রজনন। দুঃখের বিষয় আলোচ্য গ্রন্থে এ নীতি কঠোরভাবে অনুসৃত হয় নি।

এবার ecology শব্দটি নেওয়া যাক। Ecology-র বাংলা এ বইয়ের 1ম পরিচ্ছেদে বাস্তব্যবিদ্যা (পৃঃ 13), পরিবেশবিজ্ঞান (পৃঃ 13), বাস্তুসংস্থান (পৃঃ 313, 316 339), পরিবেশ পদ্ধতি (পৃ. 314) এবং ইকোলজি (পৃ. 316) প্রভৃতি পাওয়া যাচ্ছে। Environment-এর বাংলা হিসেবে পরিবেশ কথাটি বহুকাল থেকেই প্রচলিত। কাজেই পরিবেশবিজ্ঞান বলতে environmental scienceই বোঝায়। কিন্তু আলোচ্য বইয়ের এক জায়গায় (1ম পরিচ্ছেদ, পৃ. 13) ecologyর বাংলাও প্রদত্ত হয়েছে পরিবেশবিজ্ঞান। Environment এবং ecology নিকট সম্পর্কযুক্ত হলেও শব্দ দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারণার দ্যোতক। কাজেই এদের জন্যও আলাদা প্রতিশব্দ ব্যবহার করাই বাঞ্ছনীয়। একটি ধারণার সঙ্গে আর একটি ধারণাকে গুলিয়ে ফেলা কোনও মতেই উচিত নয়।

এ ধরণের আরও অনেক উদাহরণ দিয়ে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করা যায়। কিন্তু তার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। উপরের দুটি উদাহরণ থেকেই বাংলা প্রতিশব্দের যদৃচ্ছা ব্যবহারের সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়।

এর ফলে ছাত্ররা শুধু মুস্কিলেই পড়ে না, অনেক সময় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। Genetics-এর বাংলা প্রজননবিজ্ঞান বা প্রজননবিদ্যা আর ecologyর বাংলা পরিবেশবিজ্ঞান লিখলে অনেক পরীক্ষকই ছাত্রের নম্বর কেটে নিতে পারেন। এতে যিনি বই লিখেছেন বা যিনি ছাত্রের খাতা দেখছেন, তাঁদের কিছুই আসে যায় না। ক্ষতিগ্রস্ত হয়, শুধু ছাত্র।

ছাত্ররা আরও একভাবে বেকায়দায় পড়তে পারে। ধরা যাক, কোনও বইয়ে arteriole-এর বাংলা দেওয়া ছিল ধমনিকা, ছাত্র সেটাই শিখেছে। কিন্তু প্রশ্নপত্রে সে পেল উপধমনী। ছাত্র জানে না, উপধমনীও arteriole এর বাংলা। কারণ ছাত্র নিজের বইয়ে এ শব্দটি পায় নি, শিক্ষক মহাশয়ও ক্লাশে এ শব্দটি ব্যবহার করেন নি। আর বাজারে জীববিদ্যার যে কটি পাঠ্যপুস্তক লভ্য, সে সমস্ত কিনে একই ইংরেজী শব্দের যতগুলি বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহৃত হচ্ছে, সে সমস্ত মুখস্থ করা ছাত্রের পক্ষে সম্ভবপর নয়। কাজেই ফল দাঁড়াবে, প্রশ্নের উত্তর জানা থাকা সত্ত্বেও ছাত্র উত্তর লিখতে পারবে না, কেবলমাত্র পরিভাষায় গোলযোগের দরুণ।

স্বভাবতই প্রশ্ন আসে একই ইংরেজী শব্দের কটি করে বাংলা প্রতিশব্দ ছাত্ররা শিখবে। একটু আগেই আমরা দেখেছি আমাদের আলোচ্য বইয়ে genetics এবং ecology উভয়েরই 5টি করে বাংলা প্রতিশব্দ দেওয়া আছে।

একটি করে শব্দ অবশ্য বাংলার লিপ্যন্তরণ। জীববিদ্যার আরও বই বাজারে আছে। তাতে genetics এবং ecology-র জন্য পূর্বোক্ত প্রতিশব্দগুলো ছাড়াও আরও প্রতিশব্দ থাকতে পারে। বস্তুতঃ পরিভাষা সংকলন করতে গিয়ে আমি genetics-এর যে বাংলাগুলো পেয়েছি, তা হল: জীনতত্ত্ব, জেনেটিক্স, প্রজননবিদ্যা, প্রজননশাস্ত্র, প্রজননবিদ্যা, প্রজননবিজ্ঞান, বংশক্রমবিদ্যা, জীনবিদ্যা, বংশাণুবিদ্যা, সুপ্রজননবিদ্যা। এ ছাড়াও আরও দু' চারটি থাকতে পারে, যেগুলো আমার নজর এড়িয়ে গেছে। শুধু যে genetics-এরই এতগুলো বাংলা প্রতিশব্দ এমন নয়। বহু ইংরেজী শব্দেরই অনেকগুলো করে, বাংলা প্রতিশব্দ পাওয়া যাচ্ছে। electromagnatic-এর মোট 18টি বাংলা প্রতিশব্দ পাওয়া গেছে। এতগুলো করে বাংলা প্রতিশব্দ মুখস্থ রাখা ছাত্রদের পক্ষে আদৌ সহজসাধ্য নয়, কাম্যও নয়।

একটি ধারণার জন্য বাংলায় একটি বা দুটি শব্দ থাকলেই যথেষ্ট। তাতে যিনি পড়াবেন তাঁর পক্ষেও শব্দগুলি আয়ত্তে রাখা যেমনি সহজ হবে, তেমনি ছাত্ররাও শব্দগুলি সহজেই মুখস্থ করে নিতে পারবে। অবশ্য কোন বিষয়ের (subject) দ্যোতক ইংরেজী শব্দের অনেকগুলো বাংলা প্রতিশব্দ দাঁড়িয়ে যায়—বিদ্যা —শাস্ত্র, —বিজ্ঞান, —তত্ত্ব প্রভৃতি প্রত্যয়গুলোর জন্য। যেমন genetics-এর বাংলা উপরিউক্ত প্রত্যয়গুলো যোগ করে অনায়াসেই জীনবিদ্যা জীনবিজ্ঞান ও জীনতত্ত্ব তৈরি করে নেওয়া যায়।

প্রত্যয়গুলো জানা এবং মূল শব্দটি একই থাকাতে, এ ধরনের ক্ষেত্রে খুব একটা অসুবিধা হয় না। অসুবিধা তখনই হয় যখন একই ইংরেজী শব্দের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বাংলা প্রতিশব্দ থাকে।

একথা অনস্বীকার্য যে নতুন নতুন শব্দের সৃষ্টি এবং ব্যবহার ভাষাকে সমৃদ্ধ করে। কিন্তু অনর্থক শব্দের সৃষ্টি ভাষাকে অনেক সময় ভারাক্রান্ত করে তুলে। ভূরি ভূরি প্রতিশব্দের সৃজনের জন্য লেখকগণ যতটা দায়ী, তার চেয়ে বেশী দায়ী একটি প্রামাণ্য পরিভাষাকোষের অনুপস্থিতি। পরিভাষার ক্ষেত্রে আজকে যে অরাজকতা বিদ্যমান, একটি প্রামাণ্য পরিভাষাকোষ থাকলে, তার অনেকাংশই আজকে দেখা যেত না।

পরিভাষাকোষ নেই, কিন্তু পরিভাষার সমস্যা আছে। তার সমাধানও প্রয়োজন। সেটা কীভাবে সম্ভব তাই নিয়েই এবারে আলোচনা করা যাক।

পরিভাষাকোষ না থাকলেও বাংলা পরিশব্দের (term) কিন্তু অভাব নেই। আগেও বাংলায় পরিশব্দ তৈরি হয়েছে এবং সেগুলোর অনেকই অভিধান, পরিভাষাকোষে ইত্যাদিতে স্থান পেয়েছে। কিন্তু গত দুই দশক ধরে যে সমস্ত পরিশব্দ তৈরি হয়েছে, সেগুলো কিন্তু ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তকে এবং পত্র-পত্রিকায়। আলোচ্য জীববিজ্ঞানের বইটিতে আমি খুঁজে পেয়েছি পরিশব্দের এক বিপুল সম্ভার। কেবল মাত্র এই বইটিতে ব্যবহৃত পরিশব্দগুলো নির্বিশেষে সংগ্রহ এবং উপযুক্ত সম্পাদন করে জীববিদ্যার একটি পরিভাষাকোষ মোটামুটিভাবে দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায়। আর গত দুই দশকে বাংলায় প্রকাশিত সমগ্র জীববিজ্ঞানের বইয়ের ব্যবহৃত পরিভাষার সংকলন এবং সুসম্পাদন করলে জীববিদ্যার একটি চমৎকার পরিভাষাকোষ তৈরি হতে পারে।

নির্মিত পরিশব্দের ক্রমাগত ব্যবহারই পরিশব্দকে প্রচলিত করে তোলে। পূর্বনির্মিত পরিশব্দ ভালো হয় নি, অমুক লেখকের তৈরী পরিশব্দ আমি কেন ব্যবহার করবো, এই ধরনের মনোবৃত্তি পরিভাষা গড়ে তোলার পথে আদৌ সহায়ক নয়।

আমাদের মনে রাখতে হবে, যখন কোনও বিদেশী ভাষার প্রতিশব্দ নিজের ভাষায় নির্মিত হয়, তখন সর্বক্ষেত্রেই প্রতিশব্দের উপর কিছু অর্থ আরোপ করে বিদেশী শব্দের সমকক্ষ করে নিতে হয়। ইংরেজী শব্দের যে সব প্রতিশব্দ বাংলায় নির্মিত হয়েছে, সে সবের অনেকের বেলাতেই এ কথা প্রযোজ্য।

নির্মিত পরিশব্দের সবই ব্যবহার করতে হবে এ কথা বলা হচ্ছে না। পঙ্গু পরিশব্দ অবশ্যই পরিত্যাজ্য। ব্যবহার-যোগ্যগুলিই ব্যবহৃত হবে এবং প্রচলিত হওয়ার সুযোগ পাবে। নির্মিত পরিশব্দের দিকে নজর না দিয়ে ডজন ডজন পরিশব্দ শুধু তৈরি করে গেলে কোনটাই চালু হবার পথ পাবে না। কাজেই আমার বক্তব্য—নির্মিত পরিশব্দের মধ্যে যেগুলো যথাযথ, সুন্দর এবং চালু সেগুলো অবশ্যই চলবে। যেগুলো চলনসই সেগুলোও চলুক। যেগুলো পঙ্গু, তার জায়গায় নতুন পরিশব্দ নির্মিত হোক। আর যে সব ইংরেজী শব্দের বাংলা নেই, সে সবের ক্ষেত্রেও নতুন পরিশব্দের নির্মাণ হোক।

বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক প্রণেতাদের কাছে আমার নিবেদন, পুস্তক প্রণয়নের আগে বাজারে লভ্য পাঠ্যপুস্তক, অভিধান, পরিভাষাকোষ ইত্যাদি একবার ঘেঁটে নিন। প্রয়োজনীয় প্রতিশব্দের অধিকাংশই পেয়ে যাবেন। খুব কম ক্ষেত্রেই নতুন পরিশব্দ নির্মাণের প্রয়োজন পড়বে।

পাঠ্যপুস্তকের পরিশিষ্টে পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহৃত পরিশব্দের তালিকা যেন সংযুক্ত হয়। এতে পুস্তকের দাম একটু বাড়লেও উপকার সাধিত হবে নানা দিক থেকে। অন্য যে সব লোক ঐ একই বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক রচনা করছেন, তালিকাটি তাঁদের সাহায্য করবে। তাঁরা তালিকাভুক্ত পরিশব্দের ব্যবহার করবে। ফলে পরিশব্দগুলো চালু হবার সুযোগ পাবে। যখন কোনও আভিধানিক বা সংস্থা ঐ বিষয়ের পরিভাষাকোষ প্রণয়ন করবে তখন ঐ তালিকা তাদের সাহায্য করবে। এ ছাড়াও একাধিক লেখক কর্তৃক কোনও বই রচিত হলে, ঐ পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত পরিশব্দের তালিকা সংকলনের সঙ্গে সঙ্গেই বোঝা যাবে—একই ধারণার জন্য কোথায় কোথায় ভিন্ন ভিন্ন পরিশব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এখন সহজেই প্রতিশব্দের ব্যবহারের অসঙ্গতি দূর করা যাবে।

পরিশব্দের তালিকাটি যেন অতি যত্নের সঙ্গে তৈরি করা হয়। দায়সারা গোছের তালিকা উপকারের চেয়ে অপকারই করবে বেশী। তালিকা প্রণয়নের ক্ষেত্রে অনেক সময় লেখকগণ যে চরম উদাসীনতার পরিচয় দেন তার প্রকৃষ্ট নজীর মেলে ডঃ হরিদাস গুপ্তের "জীববিজ্ঞান প্রবেশ" নামক গ্রন্থে। এই পুস্তকের দশম সংস্করণের অন্তর্ভুক্ত পরিশব্দের তালিকার অংশ বিশেষ এখানে তুলে দিচ্ছি। উক্ত পুস্তকের পৃষ্ঠা (i) দ্রষ্টব্য।

Apical—অগ্রমুকুল
Epiblems—ত্বক
Fibrous—গুচ্ছমূল বা শিসামূল
Leaf blade—পত্রমূল
Leaf base—পত্রফলক
Multiple cap—বহুযোগী মূলত্র

apical bud-এর প্রতিশব্দ অগ্রমুকুল, শুধু apical-এর নয়। epiblems-এর জায়গায় epiblema হওয়া উচিত। Fibrous-এর প্রতিশব্দও গুচ্ছমূল হতে পারে না। গুচ্ছমূল fibrous roots-এর প্রতিশব্দ। leaf blade পত্রমূল নয়, পত্রমূল হচ্ছে leaf base, আর leaf blade হচ্ছে পত্রফলক, leaf base নয়। মূলত্র, cap-এর বাংলা নয়, root cap-এর বাংলা। ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে একটি পাঠ্যপুস্তকের দশম সংস্করণেও এই ধরনের ভুল রয়ে গেছে।

অতিরিক্ত ইংরেজী শব্দের ব্যবহার ভাষাকে ভারাক্রান্ত এবং

আড়ষ্ট করে তোলে। যথাসম্ভব ইংরাজী শব্দের ব্যবহার কমানো উচিত। একটি উদাহরণ দিচ্ছি।

"যখন শরীর ঋজুভাবে থাকে তখন এই পথ স্যাকরামের অ্যালা (ala of sacrum) ও ইলিয়ামের (ilium) মধ্য দিয়া অ্যাসিটাবিউলাম (acetabulam) ও উর্বাস্থির মস্তক পর্যন্ত বিস্তৃত" [জীববিজ্ঞান (মুখোপাধ্যায়, মেদ্দা) 2য় পরিচ্ছেদ, পৃ. 348]

একেই যদি আমরা এইভাবে লিখি যখন শরীর খাড়া-ভাবে থাকে তখন এই পথ ত্রিকাস্থির ডানা (ala of sacrum) ও নিতম্বাস্থির (ilium) মধ্য দিয়া অ্যাসিটাবিউলাম (acetabulam) ও উর্বাস্থির শীর্ষ পর্যন্ত বিস্তৃত হয় তাহলেই ভাষার প্রাঞ্জলতা এবং সাবলীলতা অনেকাংশে বেড়ে যায়। [এখানে ব্যবহৃত ala sacrum ও ilium-এর প্রতিশব্দ বাংলাদেশে প্রকাশিত চিকিৎসাবিদ্যা পরিভাষা থেকে নেওয়া হয়েছে]

আর একটি উদাহরণ নেয়া যাক। মস্তিষ্ককে "তিনটি অংশে বিবেচনা করা সাধারণত সুবিধাজনক ; যথা— সেরিব্রাম (cere-burm), সেরিবেলাম (cerebellum) এবং ব্রেনস্টেম (brainstem)" [জীববিজ্ঞান, মুখোপাধ্যায় মেদ্দা] 2য় পরিচ্ছেদ, পৃঃ 319] এখানেও যদি লেখা যায়—মস্তিষ্ককে তিনটি অংশে বিবেচনা করা সাধারণত সুবিধাজনক ; যথা—গুরুমস্তিষ্ক (cere-brum), লঘুমস্তিষ্ক (cerebellum) এবং মস্তিষ্ককাণ্ড (brainstem)। তাহলেই দেখা যায় ভাষার প্রাঞ্জলতা এবং সাবলীলতা তো বাড়েই, সঙ্গে সঙ্গে ভাষার স্বকীয়তাও ফুটে ওঠে। [এখানেও cerebrum, cerebellum ও brainstem-এর প্রতিশব্দ বাংলাদেশে প্রকাশিত চিকিৎসাবিদ্যা পরিভাষা থেকে নেওয়া হয়েছে]

পরিশেষে লেখকদের বলতে চাই। বাংলা প্রতিশব্দের সৃজনে এবং ব্যবহারে যথেচ্ছাচারিতা বর্জন করে গঠনমূলক মনোভাব গ্রহণ করুন, যাতে সুষ্ঠু বাংলা বৈজ্ঞানিক পরিভাষা তৈরির পথ সুগম হয়। বাংলা আমাদেরই মাতৃভাষা। কাজেই আমাদের এমন কিছু করা উচিত নয় যাতে শিক্ষার্থী বিপদগ্রস্ত হয় এবং আমাদের প্রিয় মাতৃভাষার সুষ্ঠু বিকাশের পথ বিঘ্নিত হয়।

[বিঃ দ্রঃ— এই প্রবন্ধে term, terminology এবং equivalent term বোঝাতে যথাক্রমে পরিশব্দ, পরিভাষা এবং প্রতিশব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।]

মাতৃভাষায় শিক্ষা ও বিজ্ঞানচর্চা

সুকুমার গুপ্ত*

শিক্ষাক্ষেত্রে মাতৃভাষা শিক্ষার একমাত্র বাহন হওয়া উচিত—কি বিজ্ঞানে—কি সাধারণ শিক্ষায়—একথা অনেক মনীষী বার বার বলেছেন, আজও অনেকে বলছেন কিন্তু এখনও আমাদের মন থেকে সংশয় ঘুচল না। এদেশে আধুনিক বিজ্ঞানের আমদানী হল ইংরেজ আমলে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে। বিত্তশালীরা এই ভাষায় শিক্ষা নিয়ে সরকারী কর্মস্থলের উচ্চপদে আসীন হয়ে নিজেদের ধন্য মনে করতে শিখল আর নিজের দেশের মানুষদেরকে ইংরেজের ন্যায় ঘৃণা করা শুরু করল। নতুন এক বাবুসংস্কৃতি তথা অপসংস্কৃতির জন্ম হল এই ভারতের মাটিতে এক অশুভ লগ্নে। স্বাধীনতার 38 বছর পরেও দেখা যাচ্ছে এই অপসংস্কৃতির দাপাদাপি একটুও কমে নি।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা পাওয়ার অনেক আগে থেকেই বিভিন্ন মনীষী বলে আসছিলেন—মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন না করলে মানুষকে সত্যিকারের শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হবে না। মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষা ও তার চর্চা শুরু না করলে মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান সচেতনতা আসবে না—একথা কবি রবীন্দ্রনাথ, বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র, আচার্য সত্যেন বসু প্রমুখ মনীষীরা বার বার উচ্চারণ করেছেন।

1917 খৃস্টাব্দে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নতিকল্পে এক কমিশনের সভাপতি ছিলেন লীডস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার মাইকেল স্যাডলার। তাঁকে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—"শিক্ষার উন্নতি করতে হলে সর্বাগ্রে চাই প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত মাতৃভাষা, আর দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে শেখাতে হবে ইংরাজী।" শিক্ষা নীতি নিয়ে বলতে গিয়ে তিনি সবুজপত্রে লিখেছিলেন—"মাতৃভাষা বাংলা বলিয়াই কি বাঙালীকে দণ্ড দিতেই হইবে? ···যে বেচারা বাংলা বলে সে কি আধুনিক মনুসংহিতার শূদ্র? তার কানে উচ্চ শিক্ষার মন্ত্র চলিবে না? মাতৃভাষা হইতে ইংরাজী ভাষার মধ্যে জন্ম লইয়া তবেই আমরা দ্বিজ হইব?"

পাশ্চাত্য দেশগুলি এমন কি চীন, জাপান, রাশিয়া প্রভৃতি দেশে বিজ্ঞানের চর্চা হচ্ছে মাতৃভাষায়। স্বভাবতই সেখানে বিজ্ঞান শিক্ষার সর্বস্তরে মাতৃভাষা প্রচলিত। আর আমাদের দেশে বিজ্ঞানচর্চার অভাবেই এদেশের মানুষকে সর্বক্ষেত্রে পেছিয়ে দিচ্ছে। দেশে ব্যাপক বিজ্ঞানচর্চা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—"বড়ো অরণ্যে গাছতলায় শুকনো পাতা আপনি খসে পড়ে, তাতেই মাটিকে করে উর্বরা। বিজ্ঞানচর্চার দেশে জ্ঞানের টুকরো জিনিষগুলি কেবলই বারে বারে ছড়িয়ে পড়ছে। তাতে চিত্তভূমিতে বৈজ্ঞানিক উর্বরতার জীবধর্ম জেগে উঠতে থাকে। তারই অভাবে আমাদের মন আছে অবৈজ্ঞানিক হয়ে। এই দৈন্য কেবল বিদ্যার বিভাগে নয়, কাজের ক্ষেত্রে আমাদের অকৃতার্থ করে রাখছে।"

রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি হয়েও বিজ্ঞানকে কখনও অস্বীকার করেন নি। বিজ্ঞানে মূল ধারণা না থাকলে লেখকের সৃষ্ট সাহিত্য নানা দোষে দুষ্ট হয়ে পড়ে একথা তিনি জানতেন। তাই বিজ্ঞানকে জানবার তীব্র বাসনাই কবিকে "বিশ্ব পরিচয়" লিখতে অনুপ্রাণিত করেছিল। গল্পে, উপন্যাসে, কবিতায়, প্রবন্ধে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী। সর্বসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানচর্চার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে কবি লিখেছিলেন "বিজ্ঞান যাহাতে দেশের সর্বসাধারণের নিকট সুগম হয় সেই উপায় অবলম্বন করিতে হইলে একেবারে মাতৃভাষায় গোড়া-পত্তন করিয়া দিতে হয়। শিক্ষা যাহারা আরম্ভ করিতেছে গোড়া থেকেই বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে না হোক, বিজ্ঞানের আঙ্গিনায় তাহাদের প্রবেশ আবশ্যক।"

আর মাতৃভাষায় বিজ্ঞান প্রচারের উদ্দেশ্যে আচার্য সত্যেন বসু বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠা করেন এবং মাসিক মুখপত্র 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার প্রকাশ শুরু করেন। বিশ্বের সেরা বিজ্ঞানীদের একজন হয়েও দেশের মঙ্গলের কথা চিন্তা করে তাঁর অমূল্য সময় ব্যয় করেছেন বাংলাভাষায় বিজ্ঞান প্রচারের উদ্দেশ্যে। তাঁর বিভিন্ন ভাষণে ও লেখায় ছড়িয়ে রয়েছে শিক্ষার ও সমাজের চিন্তা। তিনি বলেছেন—"দেশের বিজ্ঞানীদের শুধু বিজ্ঞান জানলেই চলবে না তাঁদের চেষ্টা চাই যারা বিজ্ঞান বোঝে না তাদের বুঝিয়ে দেওয়া।" জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি আকর্ষণই জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিস্বরূপ। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকের সঙ্গে আমাদের মিলন ছিল। বিচ্ছিন্ন মনোভাবকে দূর করে সংহতি সৃষ্টির কাজ মাতৃভাষার মাধ্যমে সহজেই হতে পারে। আমাদের আঞ্চলিক প্রেম ভাষার উপর নির্ভর করে না, সেটা আমাদের মনের কথা, মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন হলে তাড়াতাড়ি কাজ হাসিল হবে।"

ডঃ গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য মাতৃভাষায় একাধিক বিজ্ঞানের বই রচনা করেছেন। প্রকৃতিকে নিয়েই ছিল তাঁর গবেষণা। উদ্ভিদ, কীট-পতঙ্গের উপর গবেষণার ফল [illegible]বাংলাভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান সচেতনতা উন্মেষের উদ্দেশ্যে। আচার্য জগদীশচন্দ্র, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রাজশেখর বসু, জগদানন্দ রায়, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রমুখ মনীষীরাও বিভিন্ন বিজ্ঞান প্রবন্ধ ও বই বাংলাভাষায় রচনা করে গেছেন। আজকের বিজ্ঞানীদেরও এই কাজে ব্রতী হতে হবে। বিভিন্ন বিজ্ঞানসাহিত্য ও এমন কি গবেষণা-পত্রও বাংলায় লিখতে হবে।

মাতৃভাষাকে শুধু শিক্ষার বাহন করলেই হবে না সেই সঙ্গে চাই সরকারী দপ্তর থেকে আদালত পর্যন্ত সর্বস্তরে মাতৃভাষা

* বঙ্গবাসী সান্ধ্য কলেজ, কলিকাতা-700009

চালু করা। তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিজ্ঞান আইন, শিল্প, চিকিৎসা প্রভৃতি স্তরের পুস্তকও মাতৃভাষায় প্রণয়ন ও অনুবাদ করার কাজ খুব তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করা আবশ্যক। পরিভাষার জন্য বিজ্ঞান-বই প্রণয়ন বন্ধ রাখার প্রয়োজন নেই। যেখানে পরিভাষা পাওয়া যাচ্ছে না সেখানে ইংরেজী শব্দ রেখে কাজ চালিয়ে যেতে হবে। এতে আপত্তি থাকার কোন কারণ থাকা উচিত নয়। ইংরাজীতেও বহু প্রাচীন ভাষার শব্দ স্থান পেয়েছে। পরিভাষা প্রয়োজনের তাগিদে ও চর্চার ব্যাপকতার পরে বেরিয়ে আসবে। যত দিন ও কাজ সম্পূর্ণ না হচ্ছে তত দিনই কেবল ইংরেজী ভাষাকে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে রাখতে হবে। আঞ্চলিক মাতৃভাষার উপর গুরুত্ব দেওয়ার সঙ্গে জাতীয় ভাষায়ও শিক্ষা নেওয়া প্রয়োজন। জাতীয় ভাষাই ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের মানুষের সঙ্গে সেতুবন্ধ রচনা করবে।

ইংরেজী না জানলে কুণ্ঠিত হবার কোন কারণ নেই আর ইংরেজী জানলেই গর্বিত হবারও কোন কারণ থাকতে পারে না বরং সেই গর্বিত মনোভাব পরাধীন মনোবৃত্তিরই পরিচায়ক। সাম্প্রতিক কালে ইংরেজী মাধ্যম স্কুলগুলির কদর প্রচণ্ডভাবে বেড়ে চলেছে। এই বিষয়ে শহর-কোলকাতার ছোঁয়াচ গিয়ে পড়েছে অন্যত্র মফঃস্বল শহরেও। সমাজের উপরতলার মানুষের সঙ্গে নিচের তলার মানুষের যে ফারাক, তা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে—কেবল অর্থনৈতিক দিক থেকে নয়, সংস্কৃতির দিক থেকেও। তাই সমাজের সর্বাঙ্গীন মুক্তি ও সার্বিক কল্যাণের জন্য একান্ত প্রয়োজন সর্বস্তরে মাতৃভাষার প্রচলন এবং এরই মাধ্যমে ব্যাপক সুশিক্ষার ব্যবস্থা।

পরিষদ সংবাদ

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য স্মরণসভা

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য বিজ্ঞান প্রসার সমিতি ও কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের যৌথ উদ্যোগে বিজ্ঞান সাধক ডঃ গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের চতুর্থ মৃত্যু-বার্ষিকী উপলক্ষ্যে পরিষদ ভবনে 8ই ও 9ই এপ্রিল (1985) অনুষ্ঠান হয় এবং বাংলায় প্রকাশিত বিজ্ঞান পত্রিকা ও পুস্তকের প্রদর্শনী আয়োজিত হয়।

বলেন গোপাল ভট্টাচার্যের মত কৌতূহলী মন ও প্রকৃতিকে দেখার দৃষ্টি কম লোকের থাকে। মাকড়সা, পিঁপড়ে, প্রজাপতি ও ব্যাঙাচির উপর তাঁর পর্যবেক্ষণের বিষয় তিনি উল্লেখ করেন। এরপর কৃষিবিজ্ঞানী ডঃ শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সর্বশেষে ডঃ অজিত মেদ্দা 'ব্যাঙাচির রূপান্তরে থাইরয়েড হর্মোনের প্রভাব' শীর্ষক 'গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য স্মারক বক্তৃতা' স্লাইড সহযোগে প্রদান করেন। গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য বিজ্ঞান প্রসার

8ই এপ্রিল বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ভবনে অনুষ্ঠিত গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য স্মরণসভায় ডঃ অজিতকুমার মেদ্দা "গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য স্মৃতি-বক্তৃতা" প্রদান করছেন। বাম দিক থেকে—পরিষদের কর্মসচিব ডঃ সুকুমার গুপ্ত, অনুষ্ঠানের ও পরিষদের সভাপতি ডঃ জয়ন্ত বসু এবং ডঃ শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখা যাচ্ছে। ফটো ঃ শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায়

8 এপ্রিলের স্মরণসভায় সভাপতির পদ অলংকৃত করেন বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি ডঃ জয়ন্ত বসু। পরিষদের কর্মসচিব ডঃ সুকুমার গুপ্ত গোপালচন্দ্রের বিভিন্ন দিকগুলি আলোচনা করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। নীহাররঞ্জন ভট্টাচার্য গোপালচন্দ্রের সংসার জীবনের বিভিন্ন ঘটনার কথা আলোচনা করেন। সভাপতি তাঁর ভাষণে গোপালচন্দ্রের গবেষণার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। তিনি সমিতির সম্পাদক ডাঃ অনিলবরণ দাসের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়।

9ই এপ্রিল অনুষ্ঠানের বিষয় ছিল 'বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্য' শীর্ষক আলোচনা সভা। এই সভায় সভাপতি ও প্রধান অতিথির পদ অলংকৃত করেন যথাক্রমে ডঃ সূর্যেন্দুবিকাশ করমহাপাত্র ও খ্যাতনামা সাহিত্যিক লীলা মজুমদার। এছাড়াও জয়ন্ত বসু, সংকর্ষণ রায়, বিমলেন্দু মিত্র, তারকমোহন দাস, পার্থসারথি

চক্রবর্তী, শিশির মজুমদার ও অজয় চক্রবর্তী আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। প্রধান অতিথি তাঁর ভাষণে বলেন সাহিত্য ও বিজ্ঞান যে পরস্পর বিরোধী বলে মনে করা হয় তা ঠিক নয়। তিনি আরও বলেন আন্তর্জাতিক শব্দগুলোর বাংলায় পরিভাষার প্রয়োজন নেই। সবশেষে সভাপতি তাঁর ভাষণ প্রদান করেন।

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য স্মরণ সভা উপলক্ষে 9ই এপ্রিল বিজ্ঞান পরিষদ ভবনে অনুষ্ঠিত "বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্য" শীর্ষক আলোচনা সভায় বাম দিক থেকে ডঃ তারকমোহন দাস (ভাষণ দান রত), অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শ্রীলীলা মজুমদার ও অনুষ্ঠানের সভাপতি ডঃ সূর্যেন্দুবিকাশ করমহাপাত্র এবং বিজ্ঞান পরিষদের কর্মসচিব ডঃ সুকুমার গুপ্তকে দেখা যাচ্ছে।

ফটো—শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায়

প্রতিবেদক—কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ পরিচিতি

বাংলা ভাষার আদিম রূপ থেকে তার ক্রমবিকাশের পথে এদেশে সাধারণ শিক্ষাসহ বিজ্ঞানশিক্ষা, বিজ্ঞান চেতনা ও বিজ্ঞান সাহিত্য প্রকাশের ধারায় কয়েকটি প্রধান ভিত্তিস্তম্ভ এবং গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশ এবার প্রচ্ছদে সূচিত হয়েছে।

খৃস্টীয় দশম শতাব্দী পর্যন্ত প্রাচীন বাংলা ভাষার যথাযথ রূপরেখা সম্পর্কে প্রামাণ্য কোন তথ্য নেই। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কৃত দশম শতাব্দীতে রচিত চর্যাগীতের ভাষাকেই বাংলা ভাষার প্রাচীন বা আদিম রূপ হিসাবে ধরা হয়। বৌদ্ধ সহজিয়া মতের বিশিষ্ট ধর্মগুরু, আদি সিদ্ধাচার্য লুইপাদ (শুধু লুই, লুয়ী বা লুয়ীচরণ নামেও খ্যাত) ঐ চর্যাগান সমূহের প্রথম লেখক। তাই তিনিই প্রথম বাঙ্গালী কবি বা বাংলাসাহিত্যের আদিকবি। তাঁর প্রথম কবিতার প্রথম দুটি লাইন এখানে উদ্ধৃত—যার সঙ্গে আধুনিক বাংলার তফাৎটা সহজেই অনুমেয়। আনুমানিক 950 থেকে 1350 খৃস্টাব্দ পর্যন্ত এই ধরণের প্রাকৃত বাংলাই আমাদের ভাষা ছিল। তারপরে বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পদাবলী ও অন্যান্য কবিদের বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য রচনার মধ্যে ক্রমে প্রাকৃতভাব ছেড়ে বাংলাভাষার মধ্যযুগের নিদর্শন মেলে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত। কিন্তু বাংলায় গদ্য লেখা ও চর্চার অর্থাৎ এই ভাষায় শিক্ষা-চর্চার সুরু হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভ থেকেই। তবে তা শ্রীরামপুরের বিদেশী (ব্যাপ্টিস্ট) মিশনারী প্রতিষ্ঠানের মারফৎ,—প্রথমে কোন বাঙ্গালী প্রেরণায় নয়। এই কাজে

উইলিয়াম কেরি ও জন ক্লার্ক মার্শম্যানের নাম ও অবদান বিশেষ স্মরণীয়। সেই সময় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নবাগত ইংরেজ কর্মচারীদের এদেশের আচার-বিচার, ভাষা ও আইনকানুন সম্পর্কে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়ার জন্য গভর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপন করেন। 9ই জুলাই 1800 খৃস্টাব্দ। সেইখানে ঐ বিদেশী কর্মচারীদের বাংলাভাষা শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রধান পণ্ডিত হিসাবে নিযুক্ত হন মেদিনীপুরের বিশিষ্ট পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার,—1801 খৃস্টাব্দের পয়লা মে; তাঁর সহকারী হিসাবে নিযুক্ত হন রামরাম বসু সহ আরও 6জন। সেইখানে পড়ানোর জন্য কেরির প্রেরণায়ও সরকারী সাহায্যে প্রথম বাংলা গদ্যের বই লেখেন ঐ প্রধান পণ্ডিত বিদ্যালঙ্কার মহাশয়, "বত্রিশ সিংহাসন" 1802 খৃস্টাব্দে এবং রামরাম বসু লেখেন বাংলা "লিপিমালা" ও "প্রতাপাদিত্য চরিত্র"। ইতিমধ্যে 1801 খৃস্টাব্দেই শ্রীরামপুর মিশনারী থেকে প্রথম "বাংলা ব্যাকরণ" বইও ছাপা হয়। এই থেকেই বাংলা ভাষায় প্রকৃত শিক্ষা চর্চার সুরু।

তবে সাধারণের শিক্ষার্থে বাংলা ভাষায় প্রথম গদ্য সাহিত্যের সৃষ্টি ভারত পথিক রামমোহনের হাতে,—বেদ ও উপনিষদের অনুবাদের মাধ্যমে, 1815 খৃস্টাব্দ থেকেই। কিন্তু ব্যাপক বাংলা গদ্য লেখার প্রচেষ্টা ও ধারা তখন মূলতঃ ঐ শ্রীরামপুর মিশনারীদের প্রচেষ্টায় এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রয়োজনে। তারপরেই বাংলা ও বাঙালীর যথার্থ ও প্রধান শিক্ষাগুরুর আবির্ভাব—ঐ "জল পড়ে, পাতা নড়ে"র মাধ্যমে। শ্রদ্ধেয় গোপাল হালদারের ভাষায় "শিক্ষক রূপেই বিদ্যাসাগর জীবন আরম্ভ করেন। আর তিনিই বাঙালির প্রথম ও প্রধান শিক্ষাগুরু।" "আধুনিক জাতীয় শিক্ষার যুগেও আজও তিনি শিক্ষাগুরু"। "আর রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলায় সাহিত্য ভাষার সিংহদ্বার উদ্ঘাটন করেছিলেন। তার পূর্ব থেকেই এই তীর্থাভিমুখে পথ খননের জন্যে বাঙালির মনে আহ্বান এসেছিল এবং তৎকালীন অনেকেই নানাদিক থেকে সে আহ্বান স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তাঁদের অসম্পূর্ণ চেষ্টা বিদ্যাসাগরের সাধনায় পূর্ণতার রূপ ধরেছে। ভাষার একটা প্রকাশ মননের দিকে এবং জ্ঞানের তথ্য সংগ্রহের দিকে, অর্থাৎ বিজ্ঞানে তত্ত্ব জ্ঞানে ইতিহাসে; আর একটা প্রকাশ ভাবের বাহন রূপে রসসৃষ্টিতে; এই শেষোক্ত ভাষাকেই বিশেষ করে বলা যায় সাহিত্যের ভাষা। বাংলায় এই ভাষাই দ্বিধাবিহীন মূর্তিতে প্রথম পরিস্ফুট হয়েছে বিদ্যাসাগরের লেখনীতে। মাইকেল মধুসূদন ধ্বনিহিল্লোলের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিস্তর নূতন সংস্কৃত শব্দ অভিধান থেকে সংকলন করেছিলেন। অসামান্য কবিত্ব শক্তি সত্ত্বেও সেগুলি তাঁর নিজের কাব্যের অলংকৃতিরূপেই রয়ে গেল, বাংলাভাষার জৈব উপাদানরূপে স্বীকৃত হল না। কিন্তু বিদ্যাসাগরের দান বাংলাভাষার প্রাণ পদার্থের সঙ্গে চিরকালের মতো মিলে গেছে, কিছুই ব্যর্থ হয় নি।

শুধু তাই নয়। যে গদ্যভাষা রীতির তিনি প্রবর্তন করেছেন তার ছাঁদটি বাংলাভাষায় সাহিত্য রচনা কার্যের ভূমিকা নির্মাণ করে দিয়েছে।—আজ বিশেষ করে মনে করিয়ে দেবার দিন এসেছে, সৃষ্টিকর্তারূপে বিদ্যাসাগরের যে স্মরণীয়তা আজও বাংলাভাষার মধ্যে সজীব শক্তিতে সঞ্চারিত—তাকে সম্মানের অর্ঘ নিবেদন করা বাঙালির নিত্যকৃত্যের মধ্যে যেন গণ্য হয়।"

শুধু সাধারণ শিক্ষা ও ভাষা সাহিত্যের সৃষ্টিকর্তাও শিক্ষাগুরু নন এদেশের সামগ্রিক কল্যাণে সেই যুগে বিজ্ঞান শিক্ষার বিস্তার ও গণমানসে বিজ্ঞান চেতনা সৃষ্টির জন্য বিদ্যাসাগরের চিন্তায় ও কর্মপ্রচেষ্টায় যে নির্ভীক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ এবং যথার্থ প্রতিভার উজ্জ্বল প্রখর দীপ্তি উদ্ভাসিত হতে দেখা যায় তাও অতুলনীয়। সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাক্রম পুনর্গঠনকালে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গেই ঘোষণা করেছিলেন "হিন্দুদর্শনের অনেক মতামত আধুনিক যুগের প্রগতিশীল ভাবধারার সঙ্গে খাপ খায় না" সেদিনের প্রতাপান্বিত ভারতীয় গোঁড়া পণ্ডিত সমাজের সঙ্গে মহামহিমান্বিত বিলিতী সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত কর্মকর্তা ডঃ ব্যাল্যান্টাইনের মতামতকেও উপেক্ষা করে বলিষ্ঠ ভাবেই তিনিই বলতে পেরেছিলেন—"বেদান্ত ও সাংখ্য ভ্রান্ত দর্শন" (That the Vedanta and Sankhya are false system of Philosophy, are no more a matter of dispute—সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হিসাবে সেদিনের সরকারী শিক্ষাসচিব প্রসিদ্ধ ডঃময়াটকে লেখা বিদ্যাসাগরের চিঠি। তাই সংস্কৃত কলেজে ঐ ভ্রান্ত দর্শনের বিস্তারিত পঠনপাঠন তিনি বন্ধ করেছেন। আর সেখানে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও দর্শন ভালভাবে পড়ানর ব্যবস্থা করলেন যাতে সংস্কৃত কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা অন্ধ সংস্কার মুক্ত হয়ে বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিবাদী জীবনযাপনে এবং অনুরূপ সমাজ গঠনে মনেপ্রাণে ব্রতী হয়। এটি 1853 খৃস্টাব্দের কথা। আজ সেই বিজ্ঞান শিক্ষার যথেষ্ট প্রসার সত্ত্বেও এদেশের কয়জন উচ্চশিক্ষিত চিন্তাবিদ বিজ্ঞানী-সাহিত্যিক বিদ্যাসাগরের উপরিউক্ত কথাগুলি অনুভব করতে পেরেছেন ?

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রিট, কলিকাতা-700 006 থেকে প্রকাশিত
এবং গুপ্তপ্রেশ, 37/7, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-700 009 হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

INDIAN RAILWAYS
EASTERN RAILWAY
পূর্ব রেলওয়ে

লেখকদের প্রতি নিবেদন

1. বিজ্ঞান পরিষদের আদর্শ অনুযায়ী জনসাধারণকে আকৃষ্ট করার মত সমাজের কল্যাণমূলক বিষয়বস্তু সহজবোধ্য ভাষায় সুলিখিত হওয়া প্রয়োজন।
2. মূল প্রতিপাদ্য বিষয় এবং পূর্ণ ঠিকানাসহ লেখকের পরিচিতি পৃথক কাগজে অবশ্যই লিখে দিতে হবে।
3. চলিত ভাষা এবং চলন্তিকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট বানান ও পরিভাষা ব্যবহৃত হবে। উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে আন্তর্জাতিক শব্দটি বাংলা হরফে লিখে ব্র্যাকেটে ইংরাজী শব্দটিও দিতে হবে। আন্তর্জাতিক সংখ্যা এবং মেট্রিক পদ্ধতি ব্যবহৃত হবে।
4. মোটামুটি 2000 শব্দের মধ্যে রচনা সীমাবদ্ধ থাকা বাঞ্ছনীয়।
5. বিভিন্ন ফীচার, সমকালীন বিজ্ঞান গবেষণা ও প্রযুক্তিবিদ্যার সংবাদ এবং বিজ্ঞান বিষয়ক সুন্দর আকর্ষণীয় ফটোগ্রাফীও গ্রহণীয়।
6. রচনার সঙ্গে চিত্র থাকলে আর্ট পেপারে চাইনিজ কালিতে সুঅঙ্কিত হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন।
7. প্রত্যেক চিত্র প্রস্থে 8 সে. মি. কিংবা এর গুনিতকের (16 সে মি 24 সে. মি) মাপে অঙ্কিত হওয়া প্রয়োজন।
8. অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রবন্ধের মৌলিকত্ব বজায় রেখে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জনে সম্পাদক মন্ডলীর অধিকার থাকবে।
9. প্রত্যেক প্রবন্ধ ফীচার এর শেষে গ্রন্থপঞ্জী থাকা বাঞ্ছনীয়।
10. জ্ঞান ও বিজ্ঞানে পুস্তক সমালোচনার জন্য দুই কপি পুস্তক পাঠাতে হবে।
11. ফুলস্কাপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় যথেষ্ট মার্জিন এবং প্রতি লাইনের পর বেশ কিছুটা ফাঁক রেখে পরিস্কার হস্তাক্ষরে প্রবন্ধ লিখতে হবে।
12. প্রতি প্রবন্ধের শুরুতে পৃথকভাবে প্রবন্ধের সংক্ষিসার দেওয়া আবশ্যিক।

সম্পাদনা সচিব

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

জুন—1985
38তম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা

বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের অনুশীলন করে বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ ও সমাজকে বিজ্ঞান-সচেতন করা এবং সমাজের কল্যাণকল্পে বিজ্ঞানের প্রয়োগ করা পরিষদের উদ্দেশ্য।

বিষয় সূচী

প্রচ্ছদ পরিচিতি ঃ পার্থেনিয়াম আগাছার চিত্র ঃ

পার্থেনিয়াম হিস্টারোফরাস ক—আগাছার শাখাপ্রশাখা-পুষ্পমঞ্জরীসহ ; খ-পুষ্প দণ্ড ও মঞ্জরী ; গ—মঞ্জরী (উপর থেকে দেখান) ; ঘ—মঞ্জরীপত্র (ভিতরের দিক) ; ঙ—মঞ্জরীপত্র (বাইরের দিক) ; চ—স্ত্রীপুষ্প (মাঝখানে) ; ছ—স্ত্রীপুষ্পের মঞ্জরীপত্র ; জ দ্বিলিঙ্গ পুষ্প (স্ত্রীস্তবক লুপ্ত) ; ঝ—দ্বিলিঙ্গ পুষ্পের মঞ্জরীপত্র ; ঞ—ফল।

(বিশেষ প্রবন্ধ—পৃষ্ঠা 202)

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ঃ 30·00

মূল্য ঃ 2·50

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

কর্মসচিব

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট,

কলিকাতা-700006

ফোন ঃ 55-0660

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

অষ্টাত্রিংশত্তম বর্ষ | জুন, 1985 | ষষ্ঠ সংখ্যা

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে

সুকুমার গুপ্ত

প্রায় পাঁচশো কোটি বছর আগে প্রকৃতির বিবর্তনে গ্যাসপুঞ্জ থেকে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছিল অন্যান্য গ্রহদের সঙ্গে একই জন্মলগ্নে। তিনশো কোটি বছর ধরে সেই পৃথিবীর তাপ বিকিরিত হয়ে আজকের পৃথিবীর রূপ ধারণ করে। পৃথিবীতে পূর্ণ প্রাণের সঞ্চার হয় প্রথম উদ্ভিদের মাধ্যমে 200 কোটি বছরেরও আগে। তখন পৃথিবীর পরিমণ্ডল ছিল কার্বন ডাইঅক্সাইডে আবৃত। উদ্ভিদই অক্সিজেন মুক্ত করে প্রাণী জগতের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে। তারপরই পৃথিবীতে প্রাণীর আবির্ভাব।

পৃথিবীতে মানুষের জন্মের অনেক আগেই বহু উদ্ভিদ ও প্রাণী পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে না পারায় এখান থেকে বিদায় নিয়েছে। জুরাসিক যুগে অতিকায় প্রাণী ডাইনোসেরাসরা সাড়ে 13 কোটি বছর বাস করে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে মহাবিশ্বের এক প্রাকৃতিক দুর্যোগে। এত বছর ধরে পৃথিবীতে আর কোন স্থলচর প্রাণী রাজত্ব করে যেতে পারে নি। সেই দুর্যোগে পৃথিবীর সমগ্র বায়ুমণ্ডলে এক ঘন ধূলার স্তর ছেয়ে থাকে বহুযুগ ধরে। এই ঘন স্তর ভেদ করে সূর্যের আলো পৃথিবীতে পৌঁছতে পারে নি। ফলে পৃথিবীতে উষ্ণতা ভীষণভাবে কমে যায় এবং শীতল তুষার যুগের আবির্ভাব ঘটে। সেটা ছিল প্লিস্টোসিন যুগ।

বিভিন্ন যুগে বহু প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণীর আবির্ভাব ঘটেছে। দীর্ঘকাল বেঁচে থেকে পরিবেশের সংঘাতে এদের অনেককেই পথিবী থেকে চলে যেতে হয়েছে। সৃষ্টির আদি পর্ব থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় 50 কোটি প্রজাতির জীবের আবির্ভাব ঘটেছে বলা হয় এবং এদের 99 ভাগেরই বিনাশ ঘটেছে ; যে একভাগ বর্তমান রয়েছে আর অধিকাংশই অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের সৃষ্টি।

পরিবেশের সঙ্গে যারা খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছে, তাদের পক্ষেই কেবল দীর্ঘকাল অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে। পরিবেশের অবস্থাগত বিশেষ পরিবর্তন ঘটলেই অনেক প্রজাতির বংশ লুপ্ত হয়ে গেছে। কিছু প্রজাতিকে আবার ফসিল ও জীবন্ত, দুই অবস্থাতেই দেখা যায়। যেমন —সাইকাস বৃক্ষ, রাজ-কাঁকড়া ও নীলাকান্ত মাছ—এদের বলা হয় 'জীবন্ত ফসিল'। প্যালিওজোয়িক যুগের শেষ পর্বে ভূ-প্রকৃতির ব্যাপক পরিবর্তন আরম্ভ হয়। এটা অ্যাপোলেশিয়ান রেভলিউশন। প্রাণীজগতের অস্তিত্ব ছিল তখন সমুদ্রে, স্থলে মাত্র সরীসৃপদের আবির্ভাব ঘটেছিল। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সামুদ্রিক পরিবেশে জলচর প্রাণীরা দারুনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং অচিরেই বহু গোষ্ঠীর অবলুপ্তি ঘটে। কয়েক কোটি বছর পরে মেসোজোয়িক যুগে নতুন পরিবেশে নতুন প্রজাতির আবির্ভাব ঘটে। আশ্চর্যজনক ভাবে সরীসৃপরা কিন্তু এই বিপদ কাটিয়ে ওঠে। 200 কোটি বছর ধরে বিভিন্ন ভাবে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে পরিবেশ তার ভারসাম্য হারিয়েছে এবং এতে যুগে যুগে বহু প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটেছে কিন্তু বিলুপ্তির আগে বিবর্তনের ধারায় নতুন গোষ্ঠীর জন্ম দিয়ে গেছে।

7·5 লক্ষ বছর আগে বিবর্তনের ফলে মানুষের

আদিম গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে এবং মানবসভ্যতার সূচনা হয় মাত্র 7 থেকে 10 হাজার বছর আগে। প্রতিকূল পরিবেশে মানুষ তার বুদ্ধি প্রয়োগ করে অতি সামান্য সময়ের মধ্যেই পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এই আধিপত্য অর্জন করতে গিয়ে মানুষ তার পরম আপনজন উদ্ভিদ ও প্রাণীর অনেকাংশে বিনাশ ঘটিয়েছে। তার লোলুপতা ও দুর্বুদ্ধি আজ তাকেই তার বিনাশেরদিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

আগুন আবিষ্কারের পরেই মানবসভ্যতার যাত্রা শুরু হয় এবং তখন থেকেই সে তার পরিবেশকে দূষিত করে চলেছে। বনজঙ্গল কেটে তাই দিয়ে সে তার আগুনের শিখাকে প্রজ্বলিত করে রেখেছিল নিজের আত্মরক্ষার তাগিদে। এই শিখাতেই বহুউদ্ভিদ ও প্রাণীকূল ধ্বংস হয়েছে। আজ সেই শিখায় সে যেন নিজেই ধ্বংস হতে চলেছে।

মানুষ নিজের স্বার্থেই বহু বনাপ্রাণীকে গৃহপালিত করেছে। যেসব প্রাণীগোষ্ঠী তার বশ্যতা স্বীকার করে নি, তাদের সে হত্যা করেছে নিজের প্রয়োজনে। এই নিধনযজ্ঞ বিশেষ ভাবে শুরু হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র আবিষ্কারের পর থেকে। ইউরোপবাসীরা আমেরিকায় আসার আগে সেখানে কোটি কোটি বাইসন বাস করত। নির্বিচারে এদের নিধনের ফলে 1890 খৃস্টাব্দে এদের সংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র কয়েক ডজনে। তিমি শিকার এক বিরাট লাভজনক ব্যবসা। জাপান, রাশিয়া, নরওয়ে ও হল্যাণ্ডে সুসভ্য মানুষেরা বছরে 10-20 হাজার তিমি শিকার করে চলেছে। এরা শেষ হয়ে গেলে যে পৃথিবীর বুকে এক করুণ বিপর্যয় ঘটবে তা জেনেও তাদের নিবৃত্ত হবার কোন লক্ষণ নেই। ক্রিল নামক ছোট চিংড়িমাছই তিমির খাদ্য। আর এই ক্রিল সামুদ্রিক শৈবালকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। সামুদ্রিক শৈবাল সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় যে বিপুল অক্সিজেন উৎপন্ন করে তারই উপর নির্ভর করে রয়েছে স্থলের সমস্ত প্রাণীকূল। তাই ক্রমবর্ধমান ক্রিলের দ্বারা শৈবাল ধ্বংস হতে থাকলে অক্সিজেন চক্রটি নষ্ট হয়ে প্রাণীজগতের বিপর্যয় ঘটাবে।

বহু প্রজাতিরই অবলুপ্তি ইতিমধ্যে মানুষ ঘটিয়েছে। প্রতি তিন বছরে একটি করে প্রজাতি ধ্বংস হচ্ছে মানুষের সীমাহীন নির্বুদ্ধিতায়। এইভাবে এদের অবলুপ্তি না ঘটলে এরাও পৃথিবীতে দীর্ঘকাল টিঁকে থাকত। এই ক্ষতি তাই কোনদিন কোন মূল্যে পূরণ হবে না।

দ্রুত তালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বনজঙ্গল ধ্বংস হচ্ছে, জলের অভাব ঘটছে, প্রাণীকুল ধ্বংস হচ্ছে, বাতাস ও মাটি বিষাক্ত হচ্ছে। বর্তমান হারে বৃদ্ধি হলে বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে শুধুমাত্র চীন ও ভারত উপমহাদেশের মোট জন-সংখ্যা 199·20 কোটি থেকে বেড়ে 399 কোটিতে পৌঁছবে। সর্বাগ্রে চাই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, সেটা কিনা নির্ভর করছে শিক্ষা, স্বচ্ছলতা ও ধর্মীয় সংস্কারের বাধা অপসারণের ওপর। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে মানুষ যদি প্রকৃতির সম্পদের দিক থেকে তার লোলুপ দৃষ্টি অপসারণ করে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখতে সচেষ্ট হয়, তবে মানুষ আরও দীর্ঘকাল পৃথিবীতে টিঁকে থাকবে।

অতীতে 15টি মানবসভ্যতা অজ্ঞতা নির্বুদ্ধিতার শিকার হয়ে নিজেদের বিনাশ ঘটিয়েছে। প্রকৃতিই প্রকৃতির নিয়ন্তা। বহু উদ্ভিদ, প্রাণী, পরিবেশের উষ্ণতা ও মৃত্তিকার লবণাক্ততা মানুষের পক্ষে ক্ষতিকারক জীবরাই বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণ করে। এদের বিনাশ বা পরিবর্তন ঘটলে এই জীবাণুদের আধিপত্য মানুষের আধিপত্যকে ছাপিয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। উদ্ভিদের মত মানুষ যতদিন পর্যন্ত জল ও বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইড থেকে কার্বহাইড্রেট উৎপন্ন করতে না পারছে এবং সূর্যের তাপশক্তিকে শক্তি হিসাবে কাজে লাগাতে না পারছে, ততদিন মানুষ পরিবেশকে দূষিত করে চলবে। কিন্তু বিজ্ঞানের আলোকে এই দূষণকে কমিয়ে আনতে হবে মানুষকে তার নিজের স্বার্থেই। পরিকল্পিত ভাবে পৃথিবীব্যাপী সবুজের আস্তরণ বিছিয়ে দিয়ে দূষণের মাত্রা কমিয়ে আনতে হবে। কারখানা থেকে নির্গত গ্যাস, তরল ও কঠিন পদার্থকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করে তাকে অন্য কাজে লাগাতে হবে। অনিয়ন্ত্রণের ফলে হাওড়া ও কলকাতায় প্রতিদিন নাইট্রোজেন অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, হাইড্রোকার্বন, সালফার ডাইঅক্সাইড ও কয়লা চূর্ণ বাতাসে বিপুল পরিমাণে জমা হচ্ছে। এদের মিলিত ওজন গড়ে প্রায় 671 মেট্রিক টন। এ থেকেই বোঝা যায় পৃথিবীতে কি প্রচণ্ড হারে বাতাস দূষিত হচ্ছে। এমন সব বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ তৈরি হয়েছে যে তাদের বিয়োজন সহজে হয় না। এরা উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহে প্রবেশ করে তাদের অবলুপ্তির দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। যেমন ডি. ডি. টি.। তেজস্ক্রিয় আবর্জনা থেকে পরিবেশ মুক্ত রাখাও মানুষের কাছে এক বিরাট সমস্যা।

তবু বলা যায়, মানুষ যদি নিউক্লীয় যুদ্ধে না মেতে

নিজেদের আকস্মিক বিলুপ্তি না ঘটায় এবং যদি পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে যথেষ্ট সতর্ক হয়, তবে ক্রমবিবর্তনের ধারায় মানুষের বিলুপ্তি ঘটলেও সে দিয়ে যাবে এই পৃথিবীকে আরও উন্নতমানের এক প্রজাতি। 5ই জুন যে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হয়, এটাই হল তার ভবিষ্যৎ তাৎপর্য।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা

বলরাম মজুমদার*

বর্তমানে যুগটা বিজ্ঞানের। বিজ্ঞান গবেষণা, বিজ্ঞান-চর্চা, বিজ্ঞান পঠন-পাঠনের ধারা সব সময় আলোচিত হচ্ছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চা করার প্রয়োজন দিন দিন বেড়েই চলেছে। বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সম্যকভাবে উপলব্ধি করে আমাদের জীবনযাত্রায় তার প্রয়োগের চেষ্টাও চলছে। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চা যতটা আশা করা যাচ্ছে—ততটা সুফল হচ্ছে না। কিন্তু কেন! বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা—বর্তমানে কি অবস্থায় আছে?—কেন, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা সহজ সরল হয়ে উঠছে না—সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা দরকার।

আড়াই হাজার বছর আগে বাংলা দেশে লোকজনের বসতি কম ছিল। দেশের বেশী জায়গা ছিল জঙ্গলাকীর্ণ ও জলাভূমি। তখন বাংলা ভাষার লিখিত নজীর নেই, যা ছিল সংস্কৃত সাহিত্য। পরে কিছু চর্যাপদ। পুরানো চর্যাপদের যুগ পেরিয়ে লক্ষ্মণ সেনের সময় কবি জয়দেবের কাব্য 'গীতগোবিন্দের' কাল আসে। এই কাব্য সংস্কৃতের ধারা থেকে সরে এসে বাংলা সাহিত্যের যুগ সূচনা করে। পরে বৈষ্ণব সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য পেরিয়ে আধুনিক সাহিত্যের দিকে এগিয়ে এল বাংলাভাষা।

আধুনিক বাংলা সাহিত্য মাত্র 200 বছরের ইতিহাস। তার আগে দলিল-দস্তাবেজ ছাড়া বাংলা গদ্যের প্রচলন ছিল না। তাই বাংলায় বিজ্ঞান চর্চার কোনো ব্যবস্থা গড়ে ওঠে নি। যান্ত্রিক কলাকৌশল ব্যক্তি, পরিবার ও গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। গণিতের কঠিন হিসাব কবিতায় জনগণের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় কোনো জিনিষের এক মনের (35 কেজি) দাম জানা থাকলে কিভাবে আধপোয়ার (110 গ্রাঃ) দাম পাওয়া যায় শুভঙ্করী হিসাবে—

"মনের দামের পাশে ইলেক মাত্র দিলে।
আধপোয়ার দাম শিশু নিমেষেতে মেলে ॥"

বাংলার জাতীয় জীবনের এইরূপ পটভূমিকায় ইংরাজরা আমাদের দেশে এল। 'শিল্প বিপ্লবের" চিন্তাধারায় তারা পুষ্ট। দিনে দিনে ছলে বলে তারা আমাদের দেশের শাসনভার কেড়ে নিল। বিজ্ঞানে তাদের জয় জয়কার। ভারতের জনগণ ইংরাজের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগতর মান দেখে মুগ্ধ। অবাক হল টেমস নদীর উপর—"জাহাজ চলে নিচে চলে নর"। ঘুম ভাঙ্গল। ক্রমশ দেশবাসী অতীতের অন্ধকারময় দিনগুলির থেকে নিজেকে আধুনিকতার দিকে ঠেলে দিল। সুরু হল নতুন যুগ।

1757-এর পলাশী যুদ্ধের পর প্রায় 100 বছরের মধ্যে 1835 খৃস্টাব্দে মেডিকেল কলেজ ও 1857 খৃস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হল। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করে, জনসাধারণের মধ্যে পৌছে দেবার চেষ্টা সুরু হল। সে চেষ্টা নানা কারণে মুষ্টিমেয় জনগণের মধ্যে আবদ্ধ রইল। এর উল্লেখযোগ্য কারণ হল, অর্থাভাব ও মাতৃভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষার অভাব।

1947 খৃস্টাব্দে স্বাধীনতা লাভের পর বাংলা ভাষা প্রাদেশিক ভাষার মর্যাদা পেল। কেন্দ্রীয় সরকার সারা ভারতবর্ষে হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা ও ইংরাজীকে যোগাযোগ-কারী ভাষা হিসাবে বহাল করান। হিন্দি ভাষা রাজানুকূল্যে প্রসার লাভ করছে। তুলনামূলকভাবে এইকালে বাংলাভাষা ধীর গতিতে চলছে। সুতরাং এক দিকে দেখা যাচ্ছে ভারতের ইতিহাসে প্রথমে ছিল সংস্কৃত পরে পালী, আরবী, ফারসী, ইংরাজী ও হিন্দী সর্বভারতীয় ভাষা। বর্তমানে কোনো কোনো প্রদেশ "হিন্দী হঠাও" ও "ইংরাজী কমাও" আন্দোলন চলছে। তখন পশ্চিমবঙ্গে ইংরাজীর প্রচলন পুর্বের মতই। ইরাজী ভাষাজানা শিক্ষিত সম্প্রদায় চান না সমস্ত বিষয় বাংলায় পঠন-পাঠন হোক। সেজন্য বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা ও

* উদ্ভিদ বিজ্ঞাপন বিভাগ, বসু বিজ্ঞান মন্দির কলিকাতা-700 009

বিজ্ঞান সাহিত্য গড়ে উঠছে না।

এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের চিন্তাবিদদের অলসতা নেই। বিজ্ঞানের নানাদিক মানুষের কাছে সহজ মাতৃভাষায় তুলে ধরার জন্য ছোট ছোট পত্র-পত্রিকাগুলি কাজ করে আসছে। এনিয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন উইলিয়াম হপকিন্স পিয়ার্স, জন ক্লাক মার্শম্যান, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, জগদানন্দ রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র বসু, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রমুখ স্মরণীয় মনীষীগণ।

দীর্ঘ ইংরাজ শাসনকালে আমরা হঠাৎ সাহেব হয়ে উঠেছিলুম। শোলার টুপি মাথায় দিয়ে ইংরাজীতে কবিতা লেখা, বক্তৃতা দেওয়া, গ্রন্থলেখা হত, স্কুল-কলেজে বিজ্ঞান বিষয়ের পঠন-পাঠনও হত ইংরাজীতে। কোর্ট-কাচারী, ব্যবসা-বাণিজ্যে একমাত্র ইংরাজীই যোগাযোগের ভাষা ছিল। ফলস্বরূপ দেখি ইংরাজ বিদায় নেবার পর জনগণ ভাবতেই পারতো না—কি করে বিজ্ঞানের দুরুহ বিষয়গুলি বাংলা ভাষায় আলোচনা করা সম্ভব। ফলে বাংলা ভাষা অবহেলিত হচ্ছিল। এমন সময় বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তিরস্কার করেন এই সব সমালোচকদের—"যারা বলেন বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা সম্ভব নয়, তারা হয় বাংলা জানেন না—নয়-বিজ্ঞান বোঝেন না"।

পশ্চিমবঙ্গে বাংলায় বিজ্ঞান চর্চার এ অবস্থার কারণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে উপযুক্ত পরিবেশ এখনো হয়নি। 1757 খৃস্টাব্দের তুলনায় 1957-85-তে বিজ্ঞান চেতনা অনেক বেশী, তবু আশানুরূপ নয়। গ্রামেগঞ্জের মানুষ এখনো বিজ্ঞান শিক্ষার প্রত্যক্ষ প্রভাব থেকে দূরে, কুসংস্কারাচ্ছন্ন। শিক্ষার অভাবে বিজ্ঞান বিষয়ক তথ্যাদির ধারণা কম। যা জানা আছে তার সবটাই অস্পষ্ট। বর্তমানে বিজ্ঞান এত জটিল আকার ধারণ করেছে যে কোন একজন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী নিজ বিষয় ছাড়া অন্য বিষয়ে সমতুল জ্ঞান অর্জন করা যথেষ্ট কষ্ট সাপেক্ষ। সুতরাং সাধারণ মানুষ—যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট ধারায় শিক্ষণপ্রাপ্ত না হন—তাদের বিজ্ঞান শেখা ও শেখানো উভয়ই কষ্টকর। তাদের শেখার উপায় বাংলা ভাষায় বক্তৃতা, রচনা, সিনেমা, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই সম্ভব। তাতে দিনে দিনে কল্পনার অস্পষ্টতা কাটিয়ে ওঠা যাবে। আধুনিক বিজ্ঞান চিন্তা সুস্থ সমাজ ব্যবস্থায় সাহায্য করবে—সবার বিজ্ঞান মানসিকতা গড়ে উঠবে।

বিজ্ঞান মানসিকতার প্রশ্ন উঠলে বলতে হয় আগামী দিনের বিশেষ প্রস্তুতি প্রয়োজন। দেশের শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের মানসিক বিকাশের জন্য বিজ্ঞানের নিত্য নতুন আবিস্কৃত বিষয়গুলি সহজভাবে বাংলা ভাষায় তাদের সামনে তুলে ধরতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলি দূরবীক্ষণ যন্ত্রের কথা। মানুষ চাঁদের মানচিত্র এঁকেছে চাঁদে পৌঁছেছে—মঙ্গলে যাবে। বৃহস্পতি ও শনির অনেক মূল্যবান তথ্য জেনেছে। দেশের নানা স্থানে রেডিও-টেলিস্কোপ বসেছে। কিন্তু দেশের অসংখ্য শ্রমজীবী মানুষ কিশোর-কিশোরীদের এই গ্রহ-উপগ্রহ সম্বন্ধে ধারণা অস্পষ্ট। একটি ছোট্ট দূরবীক্ষণ যন্ত্রের দাম কম। এই যন্ত্র যদি প্রতি স্কুলে একটি করে থাকে ও তৃতীয় শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর সকল ছাত্র-ছাত্রীকে গ্রহ-উপগ্রহ দেখানো হয় তবে তাদের বিজ্ঞান মানসিকতা সহজে গড়ে উঠবে। যদি শনি গ্রহকে চোখে দেখে বুঝতে পারে —তার বায়ুমণ্ডলের কথা জানতে পারে—তাহলে ঐ শনি গ্রহকে সন্তুষ্ট করার জন্য 10 রতি নীলার আংটিন পরার আগে দশবার চিন্তা করবে। জাতীয় কুসংস্কারের ভিত্তি নড়ে উঠবে।

বলতে লজ্জা পাচ্ছি আমি নিজে 33 বছর বিজ্ঞা চর্চার পরও কোনদিন দেখার সুযোগ পাইনি, দূরবীক্ষণযন্ত্রে চাঁদ বা শনিগ্রহের চেহারা কি রকম। নিজের সাধ অপূর্ণ বলেই বলছি কিশোরদের দূরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্যে অদেখাকে দেখার সুযোগ করে দিন। তাতে বাংলা ভাষায় বর্ণনা করে দিন তারা কি দেখছে। ভবিষ্যত ভারতের স্থায়ী বিজ্ঞান মানসিকতা এতে গড়ে উঠবে। গ্রামে-গঞ্জের শ্রমজীবী মানুষকে এই দূরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করুন বিজ্ঞানের তত্ত্ব কথা। বাংলা ভাষায় তাদের মর্মে গেঁথে দিন—কোন্‌টা ভুল—কোন্‌টা ভাল। দেখবেন নীলা পলার ব্যবসা উঠে গেছে।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার একটি নতুন সংযোজন হল 'সায়েন্স ফিকসান' যার অন্য নাম—'কল্পবিজ্ঞান'। ফরাসী লেখক জুলে ভার্ন নানা ধরনের কল্প বিজ্ঞান লিখেছেন, বিখ্যাত হয়েছেন। কল্পনায় বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প খুব জনপ্রিয়। সাবমেরিন বা ডুবো জাহাজ আবিষ্কারের আগেই তিনি তার বিজ্ঞান গল্পে 'নটিলাস' নামে একটি ডুবো জাহাজের কথা উল্লেখ করেন। পরবর্তীকালে যখন বিজ্ঞানীরা সত্যই সাবমেরিন আবিষ্কার করলো তখন ঐ প্রথম প্রস্তুত ডুবো জাহাজের নাম দিল 'নটিলাস'। জুলে ভার্ন সম্মানিত হল। বর্তমানে বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্যে এইরূপ নানা কল্পবিজ্ঞান প্রকাশিত হচ্ছে। সব লেখাই কিশোর-কিশোরীদের মনে গভীর দাগ কাটে। এই কিশোর বয়সেই বিজ্ঞানের ভিত্তিপ্রস্তর

স্থাপন হয়। কিশোররা বুঝতে পারে না এই 'কল্পবিজ্ঞান' প্রকৃত বৈজ্ঞানিক সত্য থেকে কত দূর। তারা ভুলকে ভাল মনে করে। অবাস্তবকে সত্য ভাবে। বিজ্ঞানের নামে কল্পবিজ্ঞানের অসম্ভব ও আজগুবি গল্প ছোটদের সামনে না রাখাই ভাল। থাকলে "উল্টো বুঝলি রাম" হবে। বিজ্ঞান মননশীলতায় বাধা হবে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার জন্য প্রকাশকের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। 'কল্পবিজ্ঞান' ছাপার আগে তাঁকে বুঝতে হবে এ গল্প কতখানি বিজ্ঞানভিত্তিক। প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ দিয়ে লেখার প্রকৃত মূল্যায়ন করতে হবে। প্রকাশকের অন্য কাজ অর্থ বিনিয়োগ করা। সুতরাং বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সমস্ত বিষয়টা চিন্তা করতে হয়। বিজ্ঞানের তত্ত্ব কথার পাঠক কম। তাই অন্যদিকে নজর তাদের। বর্তমানের মূল্যমানে 4.00 টাকার পত্র-পত্রিকা কিনে পড়ার মত মানুষও কম। গ্রামেগঞ্জে নেই। গ্রামগঞ্জের শ্রমজীবী মানুষের জন্য সস্তায় 25-50 পয়সার মধ্যে পাক্ষিক বিজ্ঞান প্রকাশন চাই। সহজ হবে ভাষা। বক্তব্য হবে সরল।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা করতে আর একটি অসুবিধার কথা উল্লেখ করতে চাই। সেটা হল পরিভাষা। বিজ্ঞানের সমস্ত বই এখনো ইংরাজীতে প্রকাশিত। বাংলায় বিজ্ঞান লেখাতে 'টেকনিক্যাল টারম্‌" ইংরাজীতে বলতে হয় নতুবা পরিভাষার প্রতি নজর দিতে হয়। বাংলায় অনেক ইংরাজী শব্দ অনুপ্রবেশ করেছে যেমন, চেয়ার, টেবিল, টিকিট, পেন্ট প্রভৃতি। যদি বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা করতে হয় তাহলে আরো অনেক ইংরাজী শব্দের আগমনকে অভ্যর্থনা জানাতে হবে। বিজ্ঞানের ছাত্রের মানসিক চাপ কমে যাবে। অনেক বিজ্ঞান লেখককে নিজের মনোমত শব্দের ব্যবহার করতে দেখি। ভাল। যদি প্রয়োজন হয় বিশেষজ্ঞ দিয়ে পরিভাষা রচনার করা দরকার। পরিভাষার জটিলতা আছে বলে অনেক বিজ্ঞান লেখক নিরুৎসাহিত হয়।

সার্থক পরিভাষা হলেই চলবে না। বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু বুঝে সহজ সরলভাবে জনসাধারণের মধ্যে পরিবেশন করতে হবে। যোগ্যতা চাই বিজ্ঞান ও সাহিত্যে। দু-হাতে দু-খানি তরবারি ঘুরানো খুব সহজ নয়। যে পারে সে বাহাদুর। সুতরাং বাংলায় বিজ্ঞান চর্চা বাহাদুরের কাজ। বিজ্ঞান লেখকের কাজ হল বিজ্ঞান জানা ও সহজভাবে জানানো সকল স্তরের মানুষকে। আবেগপ্রবণ কিশোর-কিশোরীদের বিজ্ঞান বোঝাতে হবে। নিজের ধারণা যদি অস্পষ্ট হয়—পাঠকের মনেও অস্পষ্ট ছবি উঠবে। যত কঠিন কাজই হোক ভবিষ্যত দিনের কথা ভেবে বাংলা ভাষার বিজ্ঞান চর্চা চালিয়ে যেতে হবে।

সার সংরক্ষণ

ফসলের মত সার সংরক্ষণের জন্য সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। তা না হলে সার নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা। গুদামে সার রাখতে হলে যে সব দিকে দৃষ্টি দিতে হবে তাহল গুদাম ঘরটি ছেদহীন হওয়া দরকার দেয়ালে বা ছাদে কোন গর্ত থাকবে না। মেঝের ওপর রাখলে জমাট বেধে যেতে পারে—তাই খড়, শুকনো পাতা বা ধানের তুষ বিছিয়ে তার ওপর সার রাখতে হবে। বস্তাগুলি একই কারণে দেয়াল থেকে একটু দূরে রাখতে হবে। বস্তাগুলি সাজিয়ে রাখতে হবে এবং সব রকম সার একত্রে রাখা উচিত নয়। বিভিন্ন সার বিভিন্ন জয়গায় রাখতে হবে। সারের গাদার মধ্যে যাতায়াতের রাস্তা থাকা চাই। বস্তার মুখ বন্ধ রাখা উচিত। কোনমতেই যেন সারে জলকণা না পৌঁছায়। বস্তাগুলি শুকনো থাকা চাই এবং এজন্য দরজা জানলাও খোলা রাখা উচিত নয়, প্রয়োজন ছাড়া।

[ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ]

পার্থেনিয়াম মোটেই ভয়ঙ্কর নয়

দেবেন্দ্রবিজয় দেব*

যে আগাছা নিয়ে গত 2/3 মাস এত আলোচনা হয়ে গেল কলিকাতায় তার বৈজ্ঞানিক নাম পার্থেনিয়াম হিস্টারোফরাস (Parthenim hysterophorus L.) মেক্সিকো ও আমেরিকায় আদিবাসী। নিজের দেশে সান্টা মারিয়া (Santa maria) হোয়াইট্ টপ (white top) বা রেগ উইড (Rag weed) নামে পরিচিত হলেও আমাদের দেশে আবার কোন কোন স্থানে কংগ্রেস ঘাস (Congress grass) বা কেরট্ আগাছা (Carrot weed) বলা হয়।

পার্থেনিয়াম বললেই একটা বিষাক্ত আগাছা বুঝায় না। কম্পোজিটি (Compositae) বা এস্টারেসি (Asteraceae) পরিবারভুক্ত পার্থেনিয়াম (Parthenium) নামক গণে (genus) 15টি প্রজাতি (species) আছে। এরা মেক্সিকো ও আমেরিকাবাসী। আমাদের আলোচ্য আগাছাটি ক্ষতিকর হলেও এর সহোদর প্রতিম পার্থেনিয়াম আর্জেন্টেটাম (Parthenium argentatum A. Gray) অর্থকরী উদ্ভিদ হিসাবে সুপরিচিত—গুয়াউল (Guayule), রবারের উৎস। 75 বছর আগে আমাদের দেশে এসেছে।

1972 খৃস্টাব্দে কোন বিজ্ঞানী একদিন সংবাদপত্রে বিবৃতি দেন যে কলিকাতা গড়ের মাঠে এই বিষাক্ত আগাছাকে দেখা গেছে। এরপর সব চুপচাপ। গেল 2/3 মাস এই নিয়ে কয়েকদিন সংবাদপত্রে, আকাশবাণী, দূরদর্শনে, সাপ্তাহিকীতে সংবাদদাতা, অধ্যাপক, বিজ্ঞানী ও গবেষকদের পরস্পরের সহযোগিতায় আলোড়ন সৃষ্টি হয়। গেল গেল, বাঁচাও বাঁচাও এই পরিবেশ। এতে ডাক্তার—এলোপ্যাথ, হোমিওপ্যাথ ও কবিরাজরাও যোগ দেন। এমন কি বিধান সভায়ও আলোচনা হয়। কতজন কত উপায় বাতলান। অথচ এই নিয়ে দেশের অন্যান্য স্থানে একযুগ আগেই কত সব আলোচনা ও গবেষণা হয়েছে। তার ঢেউ কলিকাতা বা পশ্চিমবঙ্গে পৌঁছাতে এতদিন লাগল,—যদিও কলকাতাতেই এই আগাছা প্রথমে আসে অন্যান্য প্রদেশে যাওয়ার আগে।

কর্ণাটক সরকার (Bennet et al. 1978) 1975 খৃস্টাব্দে 23 অক্টোবর বিজ্ঞপ্তি দিয়ে একে ক্ষতিকর আগাছা (Noxious weed) হিসাবে গণ্য করেন (in terms of section 3 read with subsection (7) of Section 2 of Karnataka Agricultural Pest and Diseases Act 1968). 1976 খৃস্টাব্দে একটি বৈজ্ঞানিক আলোচনা (Seminar) হয় বাঙ্গালোর-এ International Cities Relationship Organization এবং অন্যান্য সংস্থার অর্থ সাহায্যে। অনেক বিজ্ঞানী, গবেষক, ডাক্তার-বিজ্ঞানী ও সমাজসেবী তাতে অংশগ্রহণ করেন। কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংস্থা কয়েক লক্ষ টাকার কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন করেন এ বিষয়ে গবেষণার জন্য। ফলে হয়ত কয়েকজন ph. D. ও হয়ে থাকবেন।

প্রকৃত পক্ষে এই আগাছা আমাদের দেশে নবাগত নয়। 175 বছর পূর্বে 1810 খৃস্টাব্দে ভারতীয় উদ্ভিদ উদ্যানে বা তৎকালীন কোম্পানী বাগানে একে প্রথম দেখা যায়। 1843 খৃস্টাব্দেও এর চাষ ছিল এখানে। সম্ভবত শ্রীরামপুর কেরীর বাগানেও। প্রায় 1877 খৃস্টাব্দ নাগাদও (মাইতি 1983) এখানে এর চাষের নজীর আছে। 1880 সালে পশ্চিমবঙ্গের অন্য কোন স্থানেও একে দেখা গেছে। এই সব ইতিহাস পর্যালোচনা করে মনে হয় যে গেল 175 বছর ধরেই এই আগাছা পশ্চিমবঙ্গে আছে এবং ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন প্রদেশে বিস্তার লাভ করে সমস্ত দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। অথবা এও হতে

* বি বি 109, সল্ট লেক সিটি, কলিকাতা-700 064

পারে যে 1950-এর দশকে আবার এসেছে আমেরিকা থেকে আমদানী গমের সঙ্গে। কত আগাছা আমাদের দেশে কত জায়গায় ছড়িয়ে আছে, সন্ধানী দৃষ্টির অগোচরে, তার সমীক্ষা কে করে। এই আগাছা নিয়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। 1956 খৃস্টাব্দে সেই প্রবন্ধে ডাঃ রোলা সেশাগিরি রাও (Rao 1956) বলেন যে এই আগাছা আমাদের দেশে প্রথম দেখা গেছে পুনায়। কয়েক বছরের উদ্ভিদবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন প্রদেশে এর বিস্তার সম্বন্ধে এমনভাবে লেখেন যেন সেই সময়ই ওখানে প্রথম দেখা গেছে। তাই কোন কোন মহলে একটা উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। এতে ইন্ধন যোগায় এর গায়ের লোম ও ফুলের পরাগ। এর লোম আমাদের গায়ে লাগলে চুলকায়। অনেকটা বিছুটির চুলকানির মত। তাই এই নিয়ে নানাভাবে গবেষণা সুরু হয়ে যায়। কেউ কেউ এর বিষক্রিয়া দেখতে পেলেন গবেষণার মাধ্যমে। এর কতটুকু যে ধোপে টিকে তা ভবিতব্যই জানে। বিজ্ঞানের নামে কত অসত্য বা অর্ধসত্য আমরা সহজেই মানিয়ে নিই এবং নানা ভাবে বিকৃত করে প্রচার করি। বাহবা নিই।

আমাদের দেশজ গাছপালা কোনটা কোথায় কি পরিবেশে কি পরিমান আছে তা আমরা এখনও পর্যন্ত ঠিকভাবে জানি না, যদিও এ সম্বন্ধে সমীক্ষা চলেছে অনেক বছর ধরেই। এমতাবস্থায় কোন্ আগাছা আমাদের দেশে কবে এল এবং কিভাবে বিস্তার লাভ করল এই নিয়ে কে মাথা ঘামায়।

পার্থেনিয়াম হিস্টারোফরাস একটি বর্ষজীবী বীরুৎ। প্রচ্ছদে গাছটির চেহারা বিশদ ভাবে দেখান হয়েছে। 1—1½ মিঃ উচু, বহু শাখাপ্রশাখা যুক্ত। প্রায় সব অঙ্গে, লোম আছে। এ লোম চার প্রকারের। পাতা একান্তর 8-15×6-12 সেঃমিঃ, অবৃন্তক বা সবৃন্তক; ফলক পক্ষবৎ অতি খণ্ডিত, লোমশ। মঞ্জরী খুব বেশী, লম্বা ডাটার উপর অনেকগুলি থাকে, প্রত্যেকটি গোলাকার গাঁদা ফুলের মত, 30-50টা করে শাদা ছোট ফুল দুই সারি পত্রাবরণে বেষ্টিত থাকে। পুষ্পাধার চ্যাপ্টা। পত্রাবরণের ভিতর দিকে বাইরের গোলকে পাঁচটি স্ত্রীফুল। এর প্রত্যেকটিতে একটি করে ফল ও বীজ হয়। ভিতরের ফুলগুলি আপাত দৃষ্টিতে উভলিঙ্গ হলেও স্ত্রীস্তবক এগুলিতে সুষ্ঠুভাবে বর্ধিত হয় না। তাই এগুলিতে ফল ধরে না। ফলে, বৃতিখণ্ড, মঞ্জরীপত্র ইত্যাদিতে লোম থাকে। স্ত্রীফুলে দুটি বৃতিখণ্ড বেশ বড়; পুষ্পদল নীচের দিকে নলের মত এবং উপরের দিকে খুবই ছড়ান থাকে যায় মধ্যে গর্ভদণ্ড ও দ্বিধাবিভক্ত গর্ভমুণ্ড দেখা যায়; গর্ভাশয় বেশ বড় ও চ্যাপ্টা। ভিতরের ফুলগুলিতে চারটি করে যুক্ত পাপড়ী ও চারটি পুংকেশর আছে। পরাগকোষ লম্বা। এতে অনেক পরাগ থাকে। পরাগ গোলকাকৃতি ও বহু কন্টকাকীর্ণ। এক গাছে কয়েক হাজার ফুল ধরলেও প্রত্যেক মঞ্জরীতে পাঁচটির বেশী ফল ধরে না।

জানুয়ারী থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত এই গাছে ফুল ও ফল ধরে। কয়েক দিনের মধ্যেই স্ত্রীফুলে ফল ধরে এবং অবিলম্বে ঐ মঞ্জরীর সব ফুল ও ফল ঝরে যায়।

যে কোন পরিবেশে এর বীজ থেকে চারা হয়। যে কোন জায়গায়, যে কোন গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আবহাওয়ায় বৃষ্টিবহুল বা বিরল স্থানেও, বালুভূমি, দোআঁস জমি লবণাক্ত ভূমি, ডাঙ্গা পাথরের উপর, সিমেন্ট বাধানো জমি, গোচারণভূমি, পড়ো জমি, রেল লাইন বা মোটরের রাস্তার পাশে, ঘাসের মধ্যে, পার্কে, পথের ধারে যে কোন গাছের পাশে, ছায়াহীন স্থানে, নর্দমার কাছে, অনাবাদী জায়গায়, পতিত জমিতে কোথাও এর জন্মাতে অসুবিধা হয় বলে মনে হয় না। কোথাও একটি মাত্র গাছ অন্য নানা গাছের পরিবেষ্টনে, আবার কোথাও 2/4টি বা অনেকগুলি গাছ এক সঙ্গে জন্মায়। এক বছর এক জায়গায় একটি গাছ জন্মালে পরের বছর ঐ জায়গায় এই গাছ নাও জন্মাতে পারে। তবে জলের মধ্যে এই গাছ জন্মাতে দেখি নি বা শুনি নি। বর্তমানে এটি ভারতের সব প্রদেশেই বিস্তারিত।

গেল দুই দশকে এই আগাছার বিষক্রিয়া নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। ভারটক্ (Vartak 1968) বলেছেন এরা জমির উর্বরাশক্তি কমিয়ে দেয় এবং 90 ভাগ ঘাসের ফলন কমায়। কৃষ্ণমূর্তি ও সহকর্মীদের (Krishnamurti et al. 1975, 1976) মতে প্রায় সব কৃষিজ পণ্যেরই এরা সমস্যা সৃষ্টি করে। কাঞ্চন (1975) এবং কাঞ্চন ও সহকর্মীরা (1976) বলেন এর বিভিন্ন অংশে জলীয় বৃদ্ধিদোষক রসায়ন আছে। ফুলের পরাগে এলিলপ্যাথিক (Allelopathic) দোষ থাকায় জমির ফলন শক্তি 40 ভাগ কমিয়ে দেয়। রাণাডে (Ranade 1976) বলেছেন যে স্পর্শ ছাড়াও এর ফুলের পরাগ উড়ে গিয়ে চর্মরোগের সৃষ্টি করে। গেল পাঁচ বছর বিধান নগরে ও আশেপাশে বহু জায়গায় এই আগাছার জীবনপ্রণালী ও বিস্তার দেখে উপরিউক্ত পরীক্ষা-লব্ধ গবেষণার ফলের উপর আস্থা রাখা কঠিন। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে এই আগাছা যে কোন গাছের পাশেই এবং যে কোন জায়গায় প্রসার লাভ করে। এর পার্শ্ববর্তী কোন গাছকেই মেরে ফেলতে দেখা যায় না। এই অঞ্চলে যে সব গাছ আছে বা জন্মায় তার যে কোনটির পাশেই

একে কোন না কোন জায়গায় জন্মাতে দেখা যায়। এই সব দেখে মনে হয় এই আগাছা অতি সহজেই অন্যদের পাশে সহবাস (coexistance) করতে পারে। কাউকেও কোনভাবে বঞ্চিত করে না। আবার অন্য কোন গাছ সেখানে না থাকলে এই আগাছা যে বেশী পরিমাণে বিস্তার লাভ করবে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। রানাডের অভিমত সত্য হলে বিধান নগর অঞ্চলে চর্মরোগ হীন কোন লোক দেখা যেতই না। সুব্বারাও ও সহকর্মীরা (Subba Rao et al. 1976) বলেন দিল্লী বিশেষজ্ঞদের মতে ভারত ও অন্যান্য দেশে সামান্য সংখ্যক লোক এই চর্মরোগে আক্রান্ত হয়েছেন। এই আগাছার লোম শরীরে লাগলে সেইস্থানে কিছুক্ষণ চুলকায়। এ ছাড়া অন্য কোন বিষক্রিয়া আমরা দেখি নি। পরাগও গায়ে লাগিয়ে দেখেছি তাতে অ্যালার্জি একজিমা বা অন্য কোন চর্মরোগের কোন সম্ভাবনা দেখা যায় নি।

কেউ কেউ কীটনাশক (Pesticide) দিয়ে একে নিয়ন্ত্রণ করার কথা বলেন। এতে উপকারের চেয়ে মানুষের অপকারই বেশী হওয়ার সম্ভাবনা। সুন্দর রাজলু ও গৌরী (Sundara Rajalu and Gouri 1976) কীটদ্বারা Biological control-এর কথা বলেছেন। কোন কীটদ্বারা একে প্রাকৃতিক পরিবেশে নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে সেই কীট কৃষিজাত বা বনজ অন্য কোন উদ্ভিদকে যে আক্রমণ করবে না বা তার উপর কুফল বর্তাবে না সেকথা বলা কঠিন। ফলে এই আগাছাকে নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে সমুহ বিপদ ডেকে আনা হবে। তাই এই জাতের পরীক্ষা বাঞ্ছনীয় নয়। কোন কোন বিজ্ঞানী বলেন কেসিয়া সেরিসিয়া (Cassia Sericea) এর প্রতিরোধক। এই উদ্ভিদ আমাদের দেশের নয়। এক আগাছা নির্মূল করার জন্য অন্য আগাছা এনে সমস্ত দেশে লাগান সুবুদ্ধির পরিচায়ক নয়।

একটা কথা আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে আদি নিজ দেশে বা জন্মভূমিতে এর কোন উপদ্রব আছে বলে আমরা জানি না। আমাদের দেশেও অনভিপ্রেত উদ্ভিদ অনেক আছে এদের নিয়ে আমরা কিছু ভাবি না।

এই আগাছা যে সমস্ত জায়গা জুড়ে আছে সেখানে কোন না কোন প্রয়োজনীয় গাছ লাগিয়ে দিলে এর উপদ্রব থেকে একদিকে যেমন রেহাই পাওয়া যায় তেমনি অন্য দিকে অর্থকরী উদ্ভিদ ঐ সব জায়গায় অচিরেই সবুজ বন সৃষ্টি করতে পারে। Social forestry-তে সরকার কোটি কোটি টাকা খরচ করছেন। তার একটা অংশ এই ভাবে খরচ করলে এই আগাছা নিরোধের সমাধান হতে পারে। এর সঙ্গে অর্থকরী উদ্ভিদের বন সৃষ্টি করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি করা সম্ভব। একে উপড়িয়ে বা পুড়িয়ে মারা সম্ভব নহে।

[স্বীকৃতিঃ আনুষঙ্গিক ছবিটি এঁকে দিয়েছেন শ্রীদুর্গারচণ মণ্ডল। এই জন্য তাঁকে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই।]

পুস্তক-বিবরণী

Bennet, S.S R, H.B. Naithani and M.B. Raizada (1978) Parthenium L. in India—a review and history : **Indian, J. Forestry** 1 (2) : 42-45

Kanchan, S. D. (1975)-Chemical control of **Parthenium hysterophorus**, Sixty second session, **Indian Sci. Cong. Assn**. Abs. 3 : 100-101.

Kanchan, S. D. & Jayachandra (1976)—Parthenium weed Problem and its chemical control. **Seminar on Parthenium a positive danger** 9-13. Bangalore. Krishnamurthy, K. (1976)—Parthenium weed : The problem of present day, **Pesticides** 10 : 33-35.

Krishnamurthy, K., T. V. Prasad & T. V. Muniyappa (1975) Agicultural and health hazards of Parthenium **Curr. Res.** 4 : 169-171.

Krishnamurthy, K., T. V. Prasad & T. V. Muniyappa (1976)—Ecology and control of Parthenium. **Seminar on Parthenium—a positive danger** : 8-10. Bangalore.

Maiti, G. G. (1983)—An untold study on the occurrence of **Parthenium hysterophorus** Linn. in India. Indian J. Forestry 6(4) : 328-329.

Ranade, S. (1976)—Result of newly synthesised vaccines in case of Parthenium eczema in India, **Seminar on Parthenium—a positive danger** : 15-16. Bangalore

Rao, R. S. (1956)—Parthenium a new record for India. **J. Bombay Nat. Hist. Soc.** 54 : 218-220.

Subba Rao, P. V., M. Seetharamaiah, R. S. Subba Rao & K. M. Prasad (1976)—Parthenium—A allergic weed. **Seminar on parthenium a positive danger** : 17-19. Bangalore.

Sundararajalu, G. & N. Gouri (1976)—Biological control of the poisonous weed Parthenium. **Seminar on Parthenium—a positive danger** : 22-26. Bangalore.

Vartak V. D. (1968)—Weed that threatens crops and grass lands in Maharashtra. **Ind. Fmg.** 18 : 12-24.

পারমাণবিক বিকিরণ ও পরিবেশ

উদয়ন ভট্টাচার্য*

উনিশ শ' বাষট্টি খৃস্টাব্দে।

স্থান ঃ মেক্সিকোর এক জনবহুল রাজপথ। একটি বাচ্চা ছেলে আপন মনে খেলতে খেলতে যাচ্ছিল। হঠাৎ তার পায়ে একটা শক্তমত জিনিষ লাগলো। ছেলেটি কুড়িয়ে নিল। গোলমতো একটি অদ্ভুত জিনিষ। নিতান্তই ছোট। শিশুসুলভ চপলতায় ছেলেটি বস্তুটি রাস্তায় ফেলে না দিয়ে বাড়ীতে নিয়ে আসে। রাস্তা থেকে কুড়িয়ে আনার জন্য পাছে বকুনী খেতে হয় এই ভয়ে বস্তুটি বিস্‌কুটের টিনের মধ্যে লুকিয়ে রাখলো, এক সময় বের করে বন্ধুদের দেখাবে। তারপর লুকানো বস্তুটির কথা একদম ভুলে গেল। ওই ভুলে যাওয়াটাই কাল হলো। ওই টিনের বিস্‌কুট খেয়ে পুরো পরিবার মৃত্যু মুখে পতিত হল, বেঁচে গেল একমাত্র শিশুটির পিতা। তার কর্মস্থল ছিল দূরবর্তী স্থানে। সপ্তাহান্তে বাড়ী এসে দেখেন, বাড়ীতে বিরাজ করছে কবরের নিস্তব্ধতা। কোন জনপ্রাণী নেই। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন দূষিত বিস্‌কুট খাবার ফলে পরিবারের সকলের মৃত্যু ঘটেছে। পরে টিনের বিস্‌কুট পরীক্ষা করার ফলে জানা গেল, বিস্‌কুটগুলো এমনকি টিনের পাত্রটি পর্যন্ত তেজস্ক্রিয় হয়ে গেছে। এর কারণ শিশুটির কুড়িয়ে পাওয়া বস্তুটি। ওই বস্তুটি আর কিছু নয় একটি বিপজ্জনক গামা তেজস্ক্রিয় পদার্থ। আমাদের আজকের আলোচনা এই ধরণের তেজস্ক্রিয় পদার্থের ওপর পরিবেশের প্রতিক্রিয়াকে কেন্দ্র করে।

*পলাশবাড়ী, পোঃ আলিপুরদুয়ার, জেলা জলপাইগুড়ি

আমরা জানি পার্থিব সকল বস্তু বিরানব্বইটি মৌল পদার্থ দিয়ে তৈরী। যে কোন মৌল পদার্থের সব থেকে ছোট একক পরমাণু। এই পরমাণু অতি ক্ষুদ্র। এর এরুশ কোটিটি পর পর জুড়ে দিলে যে সরল রেখা পাওয়া যাবে তার দৈর্ঘ্য হবে মাত্র তিন সে.মি। যে কোন মৌলের পরমাণু ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন, দ্বারা গঠিত। কোন পরমাণুর নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রে মূলত প্রোটন ও নিউট্রন থেকে। পরমাণুর নিউক্লিয়াসে প্রোটন, নিউট্রন এবং অন্যান্য প্রাথমিক কণাগুলি অতি ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে জমাটবদ্ধ। পরমাণুর নিউক্লিয়াসের আয়তন অতি ক্ষুদ্র। এক ঘনফুট মাপের একটি বাক্সে যদি ঠাসাঠাসি করে প্লাটিনাম ভরা যায় তা হলে, বাক্সপূর্ণ প্লাটিনাম পরমাণু সমূহের নিউক্লিয়াসের আয়তন হবে একটি আলপিনের সূচালো মুখের আয়তনের সমান মাত্র। কোন পরমাণুর কেন্দ্র তেজস্ক্রিয় হয়। গুণ ও ক্রিয়া ভেদে তেজস্ক্রিয় পদার্থের রশ্মি চার ধরণের ঃ

(1) আলফা রশ্মি (α-rays) ঃ এই বস্তু হিলিয়ামের কেন্দ্রীন। শক্তিশালী আলফা কণা বায়ুমণ্ডলের কয়েক সেন্টিমিটার এবং জীবদেহের এক দশমাংশ মিলিমিটার পর্যন্ত ভেদ করতে পারে।

(2) বিটা রশ্মি ঃ (β-rays) ইলেকট্রনের সমষ্টি। মানুষের শরীরে কয়েক সেন্টিমিটার ভেদ করতে পারে।

(3) গামা রশ্মি (γ-rays) ঃ আলো, অতিবেগুনী

ও এক্সরশ্মির মতো বিদ্যুৎ-চুম্বক তরঙ্গ। এই রশ্মি এত শক্তিশালী যে কংক্রিট, সীসা ও স্টিলের আবরণ ভেদ করতে পারে।

(4) নিউট্রন রশ্মি ঃ অতি প্রচণ্ড শক্তিশালী নিউট্রন কণিকার স্রোত। এই রশ্মির গতিরোধ করতে পরমাণু বিভাজন কক্ষে দুই থেকে তিন মিটার পুরু কংক্রিটের অবরোধ সৃষ্টি করতে হয়। আলফা, বিটা এবং গামা রশ্মি তেজস্ক্রিয় মৌল থেকে প্রাকৃতিক নিয়মে স্বতঃ বিচ্ছুরিত হয়। কিন্তু কৃত্রিম উপায়ে পরমাণু বিভাজন না ঘটালে নিউট্রন রশ্মি নির্গত হতে পারে না। রেডিয়াম, ইউরেনিয়াম প্রভৃতি তেজস্ক্রিয় মৌল। আবার কতগুলি মৌলের নিউক্লিয়াসে উচ্চশক্তিসম্পন্ন নিউট্রন, আলফা কণিকা প্রভৃতি দিয়ে আঘাত করে তার প্রোটন নিউট্রনের সংখ্যার তারতম্য ঘটিয়ে উত্তেজিত করা যায়। কোবাল্ট-ষাট, ফস্‌ফরাস-বত্রিশ প্রভৃতি এই রকম কৃত্রিম উপায়ে তৈরী তেজস্ক্রিয় মৌল। তেজস্ক্রিয় মৌলের নিউক্লিয়াস থেকে আলফা, বিটা, গামা রশ্মি বিকিরিত হয়। বিকিরিত তরঙ্গের দৈর্ঘ্য কম এবং গতি বেশি হলে জীবকোষ ও অন্যান্য পদার্থ ভেদ করবার ক্ষমতা সেই তরঙ্গের বহু গুণ বেড়ে যায়। কোন তেজস্ক্রিয় মৌলের নিউক্লিয়াস ভাঙতে ভাঙতে কত দিনে শেষ পর্যায়ে পৌঁছুবে তার একটা হিসেব আছে। কোন মৌলের আদি তেজস্ক্রিয় নিউক্লিয়াস সংখ্যা পরিবর্তিত হয়ে যে সময়ে অর্ধেক হবে সেই সময়কে তার আর্ধজীবন কাল বা অর্ধায়ু বলা হয়। যেমন, ফসফরাস-বত্রিশ-এর অর্ধজীবন কাল মাত্র চোদ্দদিন। আবার কার্বন-চোদ্দ-এর অর্ধজীবন কাল প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বছর। রেডিয়ামের প্রায় এক হাজার ছয়'শ বছর। বিভাজিত ইউরেনিরাম পরমাণু থেকে স্থায়ী ও অস্থায়ী মোট দু'শ পঞ্চাশ রকম নিউক্লাইডস উৎপন্ন হয়। এর মধ্যে কুড়ি বছর পরও যেগুলির তেজস্ক্রিয়তা বিপদনজ্জক স্তরে থাকে সেগুলি হলো সিজিয়াম, শতকরা পঞ্চান্ন ভাগ (অর্ধজীবন ত্রিশ বছর), স্ট্রনসিয়াম, শতকরা চুয়াল্লিশ ভাগ (অর্ধজীবন আঠাশ বছর), প্রমেথিয়াম, শতকরা একভাগ (অর্ধজীবন আড়াই বছর), সামারিয়াম (অর্ধজীবন তেয়াত্তর বছর) এবং অ্যান্টিমনি (অর্ধজীবন—দুই দশমিক সাত বছর)। যে সব তেজস্ক্রিয় মৌলের অর্ধজীবন কাল বেশি তারা দীর্ঘ দিন ধরে তেজস্ক্রিয় রশ্মি বিকিরণ করে বলে মানুষ ও উদ্ভিদ জগতের ওপর তাদের ক্ষতিকারক প্রভাবটা বেশি পরিমাণে পড়ে।

মানুষ সাধারণত তিন ধরণের উৎস থেকে তেজস্ক্রিয়তায় আক্রান্ত হয়। পৃথিবীর কঠিন আবরণে ছড়ানো আছে তেজস্ক্রিয় পদার্থ আর বহির্বিশ্ব থেকে আসছে মহাজাগতিক রশ্মি বা কস্‌মিক রশ্মি। এই দুয়ের সমষ্টি স্বাভাবিক প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয়তা। দ্বিতীয় ধরণের তেজস্ক্রিয়া বিকিরিত হচ্ছে চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যবহৃত এক্‌স-রে, রেডিয়োথেরাপী প্রভৃতি থেকে। তৃতীয় ধরণের তেজস্ক্রিয়া মনুষ্যকৃত কর্মের ফলে ছড়িয়ে পড়ছে—পারমাণবিক চুল্লির অপচিত দ্রব্যাদি এবং সর্বোপরি পারমাণবিক বিস্ফোরণজাত ভস্মপাত থেকে এই ধরণের তেজস্ক্রিয়া চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে।

পৃথিবীতে জীবনের আবির্ভাবের অনেক আগে থেকেই প্রাকৃতিক উৎস থেকে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ হতো। পৃথিবীর কঠিন আবরণের অভ্যন্তর ভাগে শিলা ও মৃত্তিকার সঙ্গে আবদ্ধ রয়েছে পটাসিয়াম-চল্লিশ, ইউরেনিয়াম-দু'শ আটত্রিশ, থোরিয়াম-দু'শ বত্রিশ প্রভৃতি তেজস্ক্রিয় মৌল। পৃথিবীর যেসব অঞ্চলে এই ধরনের তেজস্ক্রিয় মৌল ভূত্বকের সঙ্গে মিশে আছে, সেসব অঞ্চলে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের সম্ভাবনা বেশি থাকে। ভারতবর্ষের মাদ্রাজের সমুদ্রোপকূল ভাগে এবং কেরলের আরব সাগরের বেলাভূমে মোনাজাইট আছে বিপুল পরিমাণে। এগুলি তেজস্ক্রিয় পদার্থ। সেখানকার অধিবাসীদের বিশেষ করে ধীবর সম্প্রদায়ের বছরে তের-শ' মিলিরেম (Millirem) পরিমিত বিকিরণ সহ্য করতে হয়। সাধারণ লোকের বিকিরণ সহ্যের মাত্রার চেয়ে এই মাত্রা প্রায় তেরগুণ বেশি। কিন্তু এই পরিবেশে এরা আজন্ম লালিতপালিত বলে বিকিরণজনিত কোন ক্ষতির কথা এতাবৎ কাল শোনা যায় নি। বহির্বিশ্বে দূর-দূরান্তে অবস্থিত ছায়াপথ থেকে নির্গত হচ্ছে মহাজাগতিক রশ্মি বা কসমিক রশ্মি। এই কসমিক রশ্মি অত্যন্ত বলবান তরঙ্গ। প্রতি মিনিটে পৃথিবীতে অগুনতি কসমিক রশ্মি আছড়ে পড়ছে। এর মধ্যে কিছু রশ্মি 10^{9}—মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট (Mev) শক্তি বহন করে। কিন্তু এ বিপুল পরিমাণে তেজস্ক্রিয় শক্তি আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারে না। কারণ, বায়ুমণ্ডলের প্রায় পঁচিশ কিলোমিটার উচ্চতায় যাকে কিনা স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার (Stratosphere) বলা হয়, সেখানে মহাজাগতিক রশ্মি প্রতিরোধের জন্য আছে ওজোনের (O_3) স্তর। পৃথিবী থেকে পঁচিশ কিলোমিটার উচ্চতায় ছাতার মতো মেলে ধরা এই ওজনের স্তর পৃথিবীকে বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় রশ্মির হাত থেকে নিরাপদে রাখে।

মনুষ্যকৃত কৃত্রিম উৎসের অন্যতম হলো পারমাণবিক চুল্লির অপচিত দ্রব্যাদি এবং পারমাণবিক বিস্ফোরণজাত ভস্মপাত। এছাড়া চিকিৎসায় ব্যবহৃত

এক্স-রে, রেডিয়ো-আইসোটোপ প্রভৃতি থেকেও তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ঘটে। কোন স্থানের ওপর কতটা তেজস্ক্রিয় ভস্মপাত হবে তা নির্ভর করে বৃষ্টিপাত, বায়ুস্রোত এবং বিস্ফোরণ স্থান থেকে দূরত্ব ইত্যাদির ওপর। তেজস্ক্রিয় ভস্মপাত কোন স্থানে ব্যাপক ভাবে হলে তা ঐ স্থানের শাক-সব্জী, কৃষিজাত পণ্য, গো-মহিষাদির চারণ ভূমির ঘাসে সঞ্চারিত হবে। এই ভস্মের কিছু অংশ ঘাস, লতা-পাতার গায়ে লেগে থাকবে। বৃষ্টির জলে এই ভস্মের অনেকাংশ ধুয়ে যায় কিন্তু সেই জল মাটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। এর ফলে জল দূষণের যেমন সম্ভাবনা থাকে তেমনি শিকড়ের সাহায্যে ওই জল উদ্ভিদ সালোক-সংশ্লেষণের কাজে লাগিয়ে কিছু তেজস্ক্রিয় পদার্থ গ্রহণ করে। সেই তৃণ-ভূমিতে চারণরত গো-মহিষের দুগ্ধে এবং ছাগ মেষাদির মাংসের মাধ্যমে ঐ তেজস্ক্রিয়তা মানুষের দেহে অতি সহজেই প্রবেশ করতে পারে। এছাড়া খাদ্যবস্তুর মাধ্যমে দেহে প্রবেশ করার সম্ভাবনা থেকে যায়।

মানুষ কি পরিমাণ তেজস্ক্রিয়তার সম্মুখীন এই প্রশ্নের সরাসরি জবাব দেয়া শক্ত। তবে মোটামুটি একটা ধারণা দেয়া যেতে পারে আমেরিকার ন্যাশনাল রিসার্চ কাউন্সিলের 'বিকিরণের জৈবিক প্রভাব' সম্পর্কিত প্রতিবেদন থেকে। একজন আমেরিকার অধিবাসীর প্রজনন গ্রন্থিগুলিতে প্রাপ্ত (এই গ্রন্থিগুলিই সবচেয়ে সংবেদনশীল) ত্রিশ বছরের মিলিত তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা গড়ে নিম্নরূপ :

(1) পারিপার্শ্বিক বিকিরণ—4·3 রোনজেন।

(একটি সাধারণ একস্-রে যন্ত্র রোগীর দেহে একবার এক্স-রে করলে পাঁচ থেকে আট রোনজেন তেজস্ক্রিয় রশ্মি বিকিরিত হয়। কিন্তু দেহের অভ্যন্তর ভাগে যেমন জননকোষগুলিতে—এই মাত্রার হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র রশ্মি বিকিরিত করে।)

(2) তেজস্ক্রিয় ভস্মপাতের দরুণ : তেজস্ক্রিয় ভস্মপাতের দরুণ আমাদের দেহে এক-দশমাংশ থেকে অর্ধাংশ রোনজেন তেজস্ক্রিয় রশ্মি প্রবেশ করতে পারে। এই হিসেব 1956 খৃস্টাব্দের। এখন পারমাণবিক শক্তি বলে আমেরিকা ও রাশিয়া অমিত শক্তিধর। এছাড়া, পারমাণবিক বলে বলীয়ান ফ্রান্স, গ্রেট ব্রিটেন, চীন ভারত (!) এবং আরো কয়েকটি দেশ ব্যাপক ভাবে এগিয়ে গেছে। সুতরাং পারমাণবিক পরীক্ষা যথেষ্ট বেড়ে গেছে, ভবিষ্যতে আরো বহুগুণ বাড়বে। অতএব তেজস্ক্রিয় ভস্মপাতের পরিমাণ আরো বহুগুণ বেড়ে যাবে।

গৃহনির্মাণের প্রচলিত জিনিষপত্রে টান ধরায় ও স্বল্প খরচে গৃহনির্মাণের তাগিদে বিভিন্ন কল-কারখানার বর্জ্য পদার্থ প্রায়শই গৃহনির্মাণের কাজে ব্যবহার করা হয়। তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভস্ম এবং ইস্পাৎ কেন্দ্রের ধাতুমল গৃহনির্মাণের কাজে এখন ব্যাপক হারে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই বর্জ্য পদার্থের দ্বারা নির্মিত ঘরে অবাধে পারমাণবিক বিকিরণ প্রবেশ করতে পারে। এবং করেও। কাঠের তৈরী ঘরবাড়ীতে বিকিরণ-জনিত ভয় নেই বললেই চলে।

তেজস্ক্রিয়তা থেকে মানব জাতির সম্ভাব্য বিপদ তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার্য। প্রথমত, তেজস্ক্রিয়তায় আক্রান্ত ব্যাপক জনগণের দৈহিক ও মানসিক ক্ষতি। দ্বিতীয়ত, আক্রান্ত ব্যক্তিগণের ভবিষ্যৎ বংশধরগণের তথা সমগ্র মানব সমাজের ক্ষতি। তৃতীয়ত, জল, স্থল এবং অন্তরীক্ষ তেজস্ক্রিয় বিষবাষ্পে নিদারুণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে যার ফলে মানব সমাজ তথা জীবজন্তু উদ্ভিদ কুলের অপ্রত্যাশিত মৃত্যুর হাতছানির আশংকা থেকে যায়।

পারমাণবিক বিকিরণ চর্মচোখে বোঝা যায় না। বাতাসে ভেসে আসা বা বৃষ্টিধারায় বিধৌত হয়ে যে ভস্মরাশি পৃথিবীবক্ষে আশ্রয় নেয় তা দেখে বা গন্ধের সাহায্যে বোঝা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তেজস্ক্রিয়তার প্রকাশ কখনো পঁচিশ-ত্রিশ বছর পরেও দেখা দিতে পারে। পারমাণবিক বিকিরণ জীব জগতের ওপর দু'ধরণের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। যথা সোমাটিক (Somatic) এবং জিনেটিক (Genetic)। যারা প্রত্যক্ষ ভাবে পারমাণবিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত তাদের ক্ষেত্রেই সোমাটিক প্রতিক্রিয়া বেশি পরিদৃষ্ট হয়। আর জিনেটিক প্রতিক্রিয়া কয়েক পুরুষ ধরে চলে। পারমাণবিক বিকিরণের ফলে নিঃসৃত তেজরাশি কোষস্থিত জটিল অণুসমূহকে ভেঙ্গে দেয় এবং জীবন্ত কোষগুলিকে মেরে ফেলে। তেজস্ক্রিয় রশ্মি একবারে খুব বেশি পরিমাণে শরীরে প্রবেশ করলে মানুষ তৎক্ষণাৎ মরে যায়। কিন্তু অনেক দিন ধরে ধীরে ধীরে শোষিত হলে ক্যান্সার লিউকোমিয়া, প্রজননকোষের বিকার (জিন মিউটেশান), বন্ধ্যাত্ব, আয়ু হ্রাস, জীবনী শক্তির ক্ষয়, অকাল বার্ধক্য ইত্যাদি নানা রকম রোগ হয়।

পারমাণবিক বিকিরণ আমাদের শরীরের উন্মুক্ত অংশকেই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করে। আলফা, বিটা ইত্যাদি রশ্মির বিকিরণের ফলে জীবদেহে ক্ষতির পরিমাণ সমান নয়। পারমাণবিক বিকিরণের জন্য যে ক্ষতি হয় তা RBE ফ্যাক্টর দিয়ে তুলনা করা হয়। (RBE—

Relative biological effectiveness)। এই ফ্যাক্টর বিভিন্ন ধরনের রশ্মির ক্ষেত্রে বিভিন্ন মানের হয়। বিভিন্ন পারমাণবিক রশ্মির ক্ষেত্রে এই ফ্যাক্টর কত তা নীচের সারণীতে দেয়া হলো।

সারণী এক

বিভিন্ন ধরণের বিকিরণের জন্য R B E ফ্যাক্টর :

(1) একস্ রশ্মি, গামা এবং বিটা রশ্মি—1

(2) উত্তপ্ত নিউট্রন কণা —2 থেকে 5 পর্যন্ত।

(3) দ্রুততর নিউট্রন কণা—10।

(4) আলফা রশ্মি—10 থেকে 20 পর্যন্ত।

মানবদেহে সাধারণত যে পরিমাণ তেজস্ক্রিয়া সহ্য করতে পারে সেই পরিমাণকে তেজস্ক্রিয় মাত্রা বা ডোজ হিসেবে ধরা হয়। তেজস্ক্রিয়া পরিমাপের জন্য যে এককটি ব্যবহার করা হয় তাকে রেম REM (Roentgen Equivalent Man) বলা হয়ে থাকে। এই রেম, রোনজেনের সংক্ষিপ্ত আকার। এক রেম, এক হাজার মিলিরেমের সমান।

তেজস্ক্রিয়তা পরিমাপের বড় একক ক্যুরী (ci)। কোন তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে এক সেকেণ্ডে $3{\cdot}7\times10^{10}$ সংখ্যক পরমাণুর ভাঙ্গনকে বলা হয় এক ক্যুরী। একজন ব্যক্তির পক্ষে তেজস্ক্রিয় গ্রহণসীমা হলো বছরে পাঁচ-শ মিলিরেম। কোন কোন ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে এই মাত্রা বছরে দাঁড়ায় 5×10^{6} রেম। মানবদেহে বিকিরণ-জনিত বিভিন্ন প্রতিকিয়া দুই নং সারণীতে দেওয়া হলো।

সারণী দুই

	মাত্রা/ রেম	মানবদেহে সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া
(1)	0-25	কোন ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না।
(2)	25-100	রক্তকণিকার সামান্য পরিবর্তন দৃষ্ট হয়।
(3)	100-200	তিন ঘন্টার মধ্যে বমন শুরু হয়, ক্লান্তিতে শরীর ভেঙ্গে পড়ে এবং ক্ষিধে কমে যায়।
(4)	200-600	দু'ঘন্টার মধ্যে বমি শুরু হয়, রক্তকণিকার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে এবং কিছু দিনের মধ্যে মাথার চুল উঠতে শুরু করে।
(5)	600-1,000	এক ঘন্টার মধ্যে তীব্র বমি শুরু হতে পারে। দু'সপ্তার মধ্যে মৃত্যু নিশ্চিত।

[সূত্র ঃ Environmental Protection by E, T, Chanlett, Page-444]।

প্রকৃতিতে স্বাভাবিকভাবে যে তেজস্ক্রিয় রশ্মি অনবরত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে তার প্রতিরোধের যেমন কোন প্রশ্ন আসে না, তেমনি কোন কু-প্রভাব আজ পর্যন্ত পরিলক্ষিত হয় নি। বিজ্ঞানীদের মাথাব্যথা কেবলমাত্র কৃত্রিম উপায়ে তৈরী পারমাণবিক প্রকল্প থেকে বিকিরিত তেজস্ক্রিয় রশ্মি সম্পর্কে। নীচের তেজস্ক্রিয় প্রতিরোধের কিছু ব্যবস্থাদি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

(1) পারমাণবিক অস্ত্র বায়ুমণ্ডলে বিস্ফোরণ ঘটানো চলবে না। ভূগর্ভে বিস্ফোরণ ঘটানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

(2) রেডিও-আইসোটোপের উৎপাদন হ্রাস করতে হবে।

(3) পারমাণবিক জঞ্জাল সতর্কতার সঙ্গে সংরক্ষিত করার ব্যবস্থা করতে হবে। তেজস্ক্রিয় জঞ্জাল সাধারণত গঠিত হয় মৃত্যুবৎ ভয়াবহ পদার্থ রেডিয়াম, প্লুটোনিয়াম, থোরিয়াম প্রভৃতির অবশেষ দ্বারা। এই জঞ্জাল যথাযথ নিরাপত্তার সঙ্গে সংরক্ষণ বা নিয়ন্ত্রণে না আনা হলে বায়ুমণ্ডল দূষণ থেকে শুরু করে নানা ব্যাধি পরবর্তী বংশধরগণকে সংক্রামিত করবে। প্লুটোনিয়াম প্রায় পাঁচ লক্ষ বছর এবং থোরিয়াম প্রায় দশ লক্ষ বছর পর্যন্ত ক্ষতি করতে পারে।

(4) পারমাণবিক ওষুধ এবং বিকিরণ থেরাপী কেবলমাত্র অত্যন্ত প্রয়োজনবোধে এবং সুনির্দিষ্ট মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে।

পেট্রলের যুগের অন্তিম লগ্ন আগত। এই যুগটি পরিষ্কার পারমাণবিক শক্তিযুগ। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন সম্ভব হওয়ায় জ্বালানি পুড়িয়ে পরিবেশ দূষিত করার বিপদ নিয়ে আর মাথা ঘামাতে হবে না। সব পরিচিত জ্বালানি যেমন কয়লা, পেট্রল শেষ হয়ে গেলে অফুরন্ত পারমাণবিক শক্তি নিয়ে আমরা সভ্যতার জয়রথ চালিয়ে যাবো, যত ইচ্ছে উৎপাদন বৃদ্ধি করবো, অথচ পরিবেশ থাকবে স্ফটিকশুভ্র অমলিন। এক হাজার মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন তাপ-বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে দৈনিক পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে 406·4 মেট্রিকটন সালফার ডাই-অক্সাইড, 30·51 মেট্রিকটন নাইট্রোজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং বারো টনের মতো ছাই। এই হিসেব 1974 খৃস্টাব্দে এক সোভিয়েট সাময়িক পত্রের। দু-হাজার খৃস্টাব্দে অবস্থাটা কি রকম দাঁড়াবে। তখন লোকসংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় ছয়-শ' কোটি। ঐ সময়ে কয়লা, পেট্রল বা গ্যাস পুড়িয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে মানুষের ব্যক্তিগত চাহিদা মেটাতে হলে প্রতিদিন প্রায়

ষাট কোটি টন সালফার ডাই-অকসাইড ও প্রায় পঁচিশ কোটি টন ছাই বায়ুমণ্ডলকে দূষিত করবে। তখন অবস্থা হবে অসহনীয়। পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনে এরকম অনর্থের আশঙ্কা নেই, এখন থেকে শুধু পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করা হলে দু'হাজার খৃস্টাব্দে পৃথিবীতে তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ হবে অনুমোদিত মাত্রার মাত্র এক শতাংশ।

আমাদের অস্তিত্ব একান্ত পরিবেশ-নির্ভর। এই পৃথিবীর জল, বায়ু এবং মাটি ছাড়া আমাদের বাঁচার আর অন্য কোন উপায় আপাততঃ নেই। মানুষকে বাঁচতে হলে চাই খাদ্য আর সেই খাদ্য প্রত্যক্ষভাবে মেটাবে উদ্ভিদ রাজ্য, অপ্রত্যক্ষভাবে পশু-পাখী। সুতরাং এই সুন্দর পৃথিবীকে আরো সুন্দর করে গড়ে তুলতে আমাদের কার্পণ্য করা উচিত নয়। এক্ষেত্রে আমাদের পথপ্রদর্শক —মহান বিজ্ঞানীরা। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং নিরলস গবেষণার ফলে আজকের এই পৃথিবী। পারমাণবিক মারণাস্ত্রের প্রতিযোগিতা যদি বন্ধ হয়ে না যায় তবে আগামী দিনে পৃথিবীটি একটি প্রকাণ্ড ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে।

বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও পরিবেশ দূষণ**

মিতালী ঘোষ*

ইদানীং বিভিন্ন পত্রিকায় এবং বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক আলোচনা সভা মারফত "পরিবেশ দূষণ" শব্দটির সঙ্গে প্রায় সর্বস্তরের মানুষের পরিচয় ঘটছে। সত্তরের দশক থেকেই পরিবেশ সংক্রান্তবিষয় সমূহের ওপর যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া শুরু হয়েছে। 1972 খৃস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় "সম্মিলিত জাতীয় পরিবেশ প্রকল্প" (UNEP)। এই প্রতিষ্ঠানের সুপারিশক্রমে বিভিন্ন দেশের সরকার পরিবেশ দূষণ সমস্যাটিকে জাতীয় কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং তার সমাধানের উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করছেন।

পৃথিবীর জল, বায়ু ও মাটি নিয়ে তার পরিবেশ। অতীতে মানুষের বাসোপযোগী পরিবেশ ছিল বিশুদ্ধ। কিন্তু যান্ত্রিক সভ্যতা ও শিল্পবিপ্লবের অগ্রগতির ফলে প্রাণী জগতের সকল পরিবেশই আজ কোন না কোন ভাবে দূষিত হয়েছে এবং হচ্ছে। এই দূষণ আজ এক বিশ্ব সমস্যায় পরিণত। তাই বাস্তুবিদগণ তাঁদের সকল গবেষণাকে "পরিবেশ দূষণের" উৎপত্তির কারণ অনুসন্ধানে এবং তার নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীভূত করেছেন। বিভিন্ন বাস্তুবিদ (Ecologist) তাঁদের নিজস্ব ভাষায় "পরিবেশ দূষণের' সংজ্ঞা প্রদান করেছেন! ওডামের সংজ্ঞানুযায়ী "আমাদের পরিবেশের জল, স্থল ও বায়ুর ভৌত রাসায়নিক ও জৈবিক বৈশিষ্ট্যের অবাঞ্ছিত পরিবর্তন যা বিশেষতঃ মানব জীবনের পক্ষে এবং মানুষের কৃষ্টির পক্ষে ক্ষতিকারক, তাকেই দূষণ বলে।" আবার বাস্তুবিজ্ঞানী সাউথ-উইকের সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা হল "মানুষের ক্রিয়াকলাপের ফলে সৃষ্ট অবাঞ্ছিত পরিবেশই হল দূষণ।"

সংজ্ঞা যাই হোক, পরিবেশ যে দূষিত হচ্ছে তা অনস্বীকার্য এবং তার প্রতিকারের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার না দিলে এই বাস্তুতান্ত্রিক সংকটের মুখে যে বর্তমান সভ্যতা ভয়ঙ্কর ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

পৃথিবীর পরিবেশ দূষণের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন বাস্তুবিদ বিভিন্ন মত পোষণ করেন। তথাপি ওডাম কেনডাই, সাউথউইক, স্মিথ প্রমুখ আধুনিক বাস্তুবিদগণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় দূষণের উৎপত্তির কয়েকটি কারণ সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে। যেমনঃ—(1) জনসংখ্যার অপরিমিত বৃদ্ধি। (2) অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নগরী গঠন। (3) বনজ সম্পদের নির্মূলীকরণ এবং (4) শিল্পের অগ্রগতি।

এছাড়া মহাজাগতিক স্বাভাবিক পরিবর্তনকে (eternal change in the universe) একটি কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়। অবশ্য এই পরিবর্তনের উপর মানুষের কোন হাত নেই।

যে সকল পদার্থ পরিবেশকে দূষিত করে তাদেরকে বলে দূষণকারক। গ্রামীণ সমাজ কিম্বা নগর সমাজের প্রত্যেকটি মানুষ ভূ-পরিবেশে কিছু না কিছু বর্জ্য পদার্থ

** বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ আয়োজিত 'অমূল্যধন দেব স্মৃতি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায়' প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত।

* পোঃ আলিপুরদুয়ার কোর্ট, জলপাইগুড়ি

পরিত্যাগ করছে। এই পরিবর্জন অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে হওয়ায় কোথাও কোথাও বর্জ্য পদার্থের পরিমাণ এমন সঞ্চিত হচ্ছে যে বাস্তুতন্ত্রের স্বাভাবিক কাজ বিঘ্নিত হচ্ছে এবং মানুষের, পশুপাখীর কীটপতঙ্গের এবং উদ্ভিদের উপর এর বিষময় প্রভাব পড়ছে। 1971 খৃস্টাব্দে ওডাম বাস্তুতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দূষণকারকদের দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন।—(1) অভঙ্গুর —যে সমস্ত ধাতু বা বিষাক্ত পদার্থ সাধারণ প্রাকৃতিক অবস্থায় ভাঙ্গে না (বা খুবই ধীরে ধীরে ভাঙ্গে) তাদের অভঙ্গুর দূষণকারক পদার্থ বলে। যেমন —অ্যালুমিনিয়াম, মারকিউরিক সল্ট, দীর্ঘ শৃঙ্খল ফেনল যৌগ, DDT ইত্যাদি।

(2) ভঙ্গুর—যে সমস্ত জৈব পদার্থ সহজেই ভেঙ্গে যায় এবং স্বাভাবিক ভাবে চক্রাকারে আবর্তিত হয় (N_2 চক্র, O_2 চক্র এবং Sulphur চক্র ইত্যাদি) এবং পরিবেশকে দূষিত করে, তাদের ভঙ্গুর দূষণ-কারক পদার্থ বলে। এছাড়া কতকগুলি সাধারণ দূষণকারক পদার্থ আছে যেমন ঃ—

(ক) সঞ্চিত পদার্থ—কালিঝুলি, ধোঁয়া আলকাতরা ধুলোময়লা ইত্যাদি।

(খ) বাষ্প—CO_2, SO_2, NH_3, NO, Cl_2, F_2 I_2 ইত্যাদি।

(গ) রাসায়নিক যৌগ ঃ—অ্যালডিহাইড, আর্সাইন, ডিটারজেন্ট, হাইড্রোজেনফ্লোরাইড।

(ঘ) ধাতু—লোহা, সীসা, দস্তা ইত্যাদি।

(ঙ) রাসায়নিক বিষাক্ত পদার্থ ঃ—হার্বিসাইড, পেস্টিসাইড লার্ভিসাইড ইত্যাদি।

(চ) বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক সার—ইউরিয়া, ফসফেট, পটাশ, অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড ইত্যাদি।

(ছ) শহর ও গ্রামের নোংরা আবর্জনা।

(জ) তেজস্ক্রিয় পদার্থ—X Rays, α β, γ রশ্মি, ইউরেনিয়াম, প্লুটোনিয়াম ইত্যাদি।

(ঝ) নানা প্রকার শব্দোত্থিত গোলমাল (অনবরত যানবাহনের শব্দ, এলোমেলো মাইক বাজানোর শব্দ, মেশিনের কর্কশ শব্দ ইত্যাদি) ও তাপ।

দূষণকারক বর্জিত হতে পারে স্বাভাবিকভাবে অথবা কৃত্রিম উপায়ে। তাই দূষণ স্বাভাবিক অথবা কৃত্রিম হতে পারে। কৃত্রিম দূষণ মানুষের বিজ্ঞান সম্বন্ধে অজ্ঞতা-জনিত কার্যের ফলেই সৃষ্টি হয়।

বায়ু দূষণ —যখন মানুষের কার্যের ফলে অথবা অন্য কোন প্রাকৃতিক কারণে বায়ুতে অক্সিজেন (O_2) ছাড়া অন্য সকল অবাঞ্ছিত গ্যাসীয় পদার্থের ঘনত্ব স্বাভাবিক অপেক্ষা বেশী হয়ে পড়ে তখন ঐ বায়ুকে দূষিত বায়ু বলে। বায়ু দূষণ সর্বাপেক্ষা মারাত্মক। কারণ মানুষ পরিবেশ থেকে 24 ঘণ্টায় যত কিছু গ্রহণ করে তার মধ্যে অক্সিজেনের পরিমাণ সর্বাপেক্ষা বেশী প্রায় 80%। মানুষ দিনে 22,000 বার শ্বাস গ্রহণ করে এর ফলে মানুষের দেহে দিনে 16kg ওজনের বাতাস প্রবেশ করে। সুতরাং দূষিত বায়ু দ্বারা শ্বাসকার্য দিনের পর দিন চালাতে থাকলে তা মানুষের ক্ষতিসাধন করতে বাধ্য। প্রধানতঃ কলকারখানার চিমনি থেকে নির্গত কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2), সালফার ডাই-অক্সাইড (SO_2), কার্বনকণা, ধাতবধূলা, নাইট্রোজেনের অক্সাইড সমূহ, রেজিন, এরোসোল, হাইড্রোজেন সিলিকন টেট্রাক্লোরাইড, হ্যালোজেন, গন্ধক যৌগ আরও কত কী—বাতাসের সঙ্গে নিঃসৃত হয় এবং তাকে কলুষিত করে। শিল্পোদ্যোগ এবং প্রাসঙ্গিক পরিবহণ ব্যবস্থায় বাতাস কিভাবে দূষিত হয় তা কেবল ভারতবর্ষ থেকেই সহজে অনুধাবন করা যায়। ভারতবর্ষে শিল্পোদ্যোগগুলির 80 শতাংশ আটটি বা দশটি শিল্প নগরে কেন্দ্রীভূত।

এই সমস্ত শিল্প নগরীর বাতাস বিশ্লেষণ করে এবং দেশের অন্যান্য স্থানের বাতাসের সঙ্গে তার তুলনা করে অনেক তথ্য পাওয়া গেছে।

ন্যাশানাল এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইনস্টিট্যুট [National Environmental Engineering Research Institute, সংক্ষেপে NEERI] প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী ভারতবর্ষের শিল্পনগরীগুলির বাতাসে শিল্পজাত সালফার ডাই-অক্সাইড (SO_2) ও কণাবস্তুর পরিমাণ 211 পৃষ্ঠায় দেওয়া হল।

NEERI প্রদত্ত তথ্য থেকে জানা গেছে বোম্বাই শহরের চেম্বুর ও ট্রম্বে এলাকায় কলকারখানা কেন্দ্রীভূত থাকায় ঐ দুই স্থানের বাতাসে সালফার ডাই-অক্সাইড-এর পরিমাণ শহরের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা তিন থেকে ছয় গুণ বেশী। ভারতবর্ষের মধ্যে কলকাতার বাতাসে পেট্রলজাত কার্বন মনোক্সাইডের (CO) পরিমাণ সর্বাপেক্ষা বেশী। কলকাতায় যানবাহন যখন সর্বোচ্চ সংখ্যায় চলে তখন তার পরিমাণ বা ঘনত্ব প্রতি 10 লক্ষ কিউবিক মিলিলিটারে 36 শতাংশ বেড়ে যায় বলে হিসেব পাওয়া গেছে।

বাতাসের মধ্যে নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড (NO_2) সালফার ডাই-অক্সাইড (SO_2) যৌগ বায়ুকে এত পরিমাণ

শিল্পনগরী	গড়-পরিমাণ (SO_2) মাইক্রোগ্রাম/কিউবিক মিলিমিটার	গড়-পরিমাণ কণাবস্তু মাইক্রোগ্রাম/কিউবিকমিলিমিটার
আমেদাবাদ	10·66	306·6
বোম্বাই	47·11	240·3
কলিকাতা	32·88	[illegible]40·7
নয়াদিল্লী	41·43	601·7
হায়দ্রাবাদ	5·06	146·1
জয়পুর	4·15	146·1
কানপুর	15·97	543·5
মাদ্রাজ	8·38	100 9
নাগপুর	7·71	261·6

দূষিত করছে যার ফলে মানব সমাজ ঐ দূষিত বায়ুকে গ্রহণ করায় ব্রংকাইটিস, হাঁপানী প্রভৃতি রোগের বৃদ্ধি হচ্ছে। বায়ুস্থিত কার্বন মনোক্সাইড (CO) এবং নাইট্রোজেনের অক্সাইড সমূহ দেহে প্রবেশ করে রক্তের অক্সিজেন (O_2) বহন ক্ষমতা হ্রাস করে দেয়। বায়ুস্থিত "বেনজিপাইরেন" (Benzepyrene) প্রভৃতি হাইড্রোকার্বন এত মারাত্মক যে তা দেহে কর্কটরোগও (Cancer) সৃষ্টি করতে সক্ষম।

বায়ুতে যদি কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2)-এর পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তবে ঐ বায়ু অধিক পরিমাণে ইনফ্রারেড রশ্মি শোষণ করতে থাকে, ফলস্বরূপ ভূ-পৃষ্ঠের উত্তাপ বৃদ্ধি পায় এবং উত্তাপে মেরু অঞ্চলের বরফ গলতে আরম্ভ করে এবং সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস ঘটিয়ে মানব জীবনকে বিপন্ন করে তোলে। হিসেব করে দেখা যায় বিগত 109 বছরের মধ্যে (1860 থেকে 1969 পর্যন্ত) বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের (CO_2) পরিমাণ 4 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

নিম্নলিখিত উপায়ে বায়ুকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করা যায়। প্রযুক্তিবিদ্যার জ্ঞানের আলোকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। যেমন ঃ—

(1) অটোমোবাইল থেকে জ্বালানীর দূষিত ধোঁয়া যাতে বায়ুতে মিশতে না পারে সেজন্যে প্রত্যেক অটো-মোবাইল ব্যবহারকারীকে Crankage ventilation এবং Catalytic converter ব্যবহার করতে হবে।

(2) বাতাস থেকে ধূলা ও নানা অপদ্রব্য অপসারণ করতে Electrostatic precipitator ব্যবহার করা যেতে পারে।

(3) Scrubber-এর সাহায্যে জল সিঞ্চন করে বায়ু থেকে অ্যামোনিয়া (NH_3) এবং সালফার ডাই-অক্সাইড (SO_2) দূর করা যেতে পারে।

(4) শোষণ অথবা ফিল্টার পদ্ধতিতে দূষিত বায়ু থেকে ক্ষতিকারক গ্যাসগুলিকে দূরীভূত করা যেতে পারে।

(5) যথেষ্ট পরিমাণে গাছপালা লাগিয়ে দূষিত বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ কমিয়ে স্বাভাবিক করা যেতে পারে। কারণ গাছপালা সালোকসংশ্লেষ পদ্ধতিতে কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করে এবং অক্সিজেন পরিত্যাগ করে। এতে বনজ সম্পদ যেমন রক্ষা পাবে, অপরদিকে পরিবেশও সুস্থ-স্বাভাবিক থাকবে।

(6) বাতাস নির্মল রাখতে হলে কলকারখানাগুলির বিকেন্দ্রীকরণ প্রয়োজন।

(7) কলকারখানায় পর্যাপ্ত ফিল্টারের বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন। ফিল্টারের সাহায্যে দূষিত কণাবস্তু আটকে দিয়ে কলকারখানা থেকে নির্গত ক্ষতিকর গ্যাসগুলিকে যথাসম্ভব পরিস্রুত করা যায়।

জলদূষণ —নদী, পুষ্করিণী, হ্রদ ও সমুদ্র মানুষের ব্যবহার্য জলের প্রধান উৎস। কিন্তু এই উৎসগুলির জল দু-প্রকারে দূষিত হতে পারে। যথা ঃ—

(1) সার বা নোংরা আবর্জনা জলাশয়ে পড়ে অত্যধিক জৈব গোষ্ঠী গঠিত হয় এবং জল দূষিত হয়।

(2) বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ জলাশয়ে পড়লে সকল জৈব গোষ্ঠীকে মেরে ফেলে। এতেও জল দূষিত হয়।

পয়ঃপ্রণালীবাহিত আবর্জনাযুক্ত জল অণুজীবের

(ব্যাক্টেরিয়া ও ভাইরাস) সংখ্যা বৃদ্ধি করে ফলে ঐ জল ব্যবহারে নানা রোগ হয়। এই সমস্ত আবর্জনা ফ্যাইটোপ্লাঙ্কটনের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ হয়। পচনের ফলে দ্রবীভূত অক্সিজেন (O_2)-এর পরিমাণ কমে যায় এবং জলচর প্রাণীরা বিপদের সম্মুখীন হয়।

সুস্বাদু জল এবং উপকূল অঞ্চলের সমুদ্রের জল নর্দমা নিষ্কাশিত আবর্জনা দ্বারা মারাত্মকভাবে দূষিত হয়। এই আর্জনায় মলমূত্র, দ্রবীভূত জৈব ও অজৈব পদার্থ, পচা খাদ্যদ্রব্য, গলিত প্রাণীদেহ, অজৈব লবণ ইত্যাদি অনেক কিছু পদার্থ থাকে। অজ্ঞতাবশতঃ আমরা এই জলকে নানা কাজে ব্যবহার করি, স্নান করি এমন কি পানও করে থাকি, ফলে কলেরা, আমাশয় বা আন্ত্রিক জাতীয় রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ি।

ভারতবর্ষে প্রায় সকল নদীনালা শিল্পজাত বর্জ্য দ্রব্যের মাধ্যমে দূষিত হয়। এই সমস্ত পদার্থ আসে প্রধানত পেট্রোকেমিক্যাল সার ফ্যাক্টরি, তৈল শোধনাগার, কাগজের কল, বস্ত্রকল, চিনি কল, স্টীল ফ্যাক্টরী, চর্মশিল্প, ওষুধের কারখানা প্রভৃতি থেকে। পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুর, আসানসোল সংলগ্ন দামোদর নদীর জলে সমীক্ষা করে দেখা গেছে যে ঐ অঞ্চলের আটটি প্রধান শিল্প সংস্থা থেকে প্রতিদিন প্রায় 1,60,000 কিউবিক লিটার জল বাহিত আবর্জনা নদীর ঐ অঞ্চলে পড়ে। ঐ আবর্জনায় বিষাক্ত সায়ানাইড যৌগ সমূহ, ফেনল, অ্যামোনিয়া, ফসফরাস, ক্লোরিন (Cl_2) ইত্যাদি বিষাক্ত রাসায়নিক থাকে। অনুরূপ ভাবে হুগলী নদীর দুই তীরবর্তী শিল্পাঞ্চলের 100 মাইল দীর্ঘ স্থানে নিরীক্ষা করে দেখা গেছে যে ঐ 100 মাইল অঞ্চলের নদীর জলে 350টি পয়ঃপ্রণালী উন্মুক্ত হয়ে আছে এবং ঐ পয়ঃপ্রণালীবাহিত হয়ে দৈনিক 20×10^4 লিটার জৈব আবর্জনা নদীর ঐ অংশ পড়ছে। শিল্প থেকে সৃষ্ট এই সকল বর্জ্য পদার্থ জলে বসবাসকারী প্রাণীদের পক্ষে বিষতুল্য বলে এরা অধিকাংশ মারা যায়। অনেক সময় ফ্যাক্টরীর গরম জলে হ্রদে বা নদীতে পতিত হয়ে জলের বাস্তুতন্ত্র নষ্ট করে দেয় এবং জল দূষিত হয়ে পড়ে। এই ঘটনাকে তাপ দষণ বলা হয়।

অনেক সময় আমরা একটা বিপদ থেকে বাঁচবার জন্যে রাসায়নিক পদার্থের সাহায্য নিই, কিন্তু এই রাসায়নিক পদার্থটি আমাদের অন্য প্রকারের ক্ষতি সাধন করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ম্যালেরিয়া দমনের জন্যে আমরা D, D. T. স্প্রে করি। এই স্প্রে সাময়িক ভাবে ম্যালেরিয়া দমনের সাহায্য করে বটে, কিন্তু জল তথা পরিবেশ দূষিত হয়ে পড়ে। নিম্নলিখিত উপায়ে জলকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করা যেতে পারে।

(1) জল শুদ্ধ রাখতে কলকারখানা নির্গত রাসায়নিক-যৌগ জলে ফেলা বন্ধ করতে হবে।

(2) আমাদের উচিত নোংরা আবর্জনা, মলমূত্র ব্যবহারযোগ্য জলে না ফেলে কোন সংরক্ষিতস্থানে ফেলা।

(3) পয়ঃপ্রণালীগুলির আধুনিকীকরণ করা প্রয়োজন। নদীতে উন্মুক্ত করার পুর্বে পয়ঃপ্রণালী বাহিত আবর্জনাগুলি ফিল্টার ট্যাঙ্ক ও বিজারণ পুষ্করণী ইত্যাদির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করাতে হবে। ফিল্টার ট্যাঙ্ক ও বিজারণ পুষ্করিণীগুলিতে অণজীব রেখে পয়ঃপ্রণালীবাহিত জৈব আবর্জনাগুলিকে এমনভাবে পরিবর্তিত করতে হবে যে তারা ক্ষতিকর অবস্থায় নদীতে না পড়তে পারে।

(4) নদীগুলির গভীরতা যাতে হ্রাস না পায় তার জন্য সচেষ্ট থাকতে হবে।

মৃত্তিকা দূষণ—রাসায়নিক পদার্থ এবং কঠিন বর্জ্য পদার্থের ফলে মৃত্তিকা দূষিত হয়। দ্রুত এবং অপরিকল্পিত শহর বা নগরীর পত্তন স্থলভাগকে দূষিত করে। দৈনন্দিন ঘরসংসারের কার্যে যে সমস্ত বস্তু লাগে তাদের অবশিষ্টাংশ ও ব্যবহারের অযোগ্য অংশ, যেমন ঃ—পোড়া কয়লা, ছাই, সব্জীর খোসা, মাছের আঁশ, ভাঙ্গাকাঁচ, কাগজ, টিনের কৌটা প্রভৃতির নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত অপসারণ প্রতি শহর বা নগর পরিচালকদের নিকট একটি দুরুহ সমস্যা। সম্মিলিত ভাবে এই আবর্জনাকে কঠিন আবর্জনা বলা হয়। ভারতবর্ষের শহর ও নগরে প্রতি বৎসর 150 লক্ষ টন কঠিন আবর্জনার সৃষ্টি হয়। সারা দেশে ঐ আবর্জনার পরিমাণ আরও বেশী। কারণ শহরগুলিতে যত লোক বাস করে তার অন্তত পাঁচগুণ লোক গ্রামে বাস করে। শুধু কলকাতাতেই দৈনিক 22000 টন কঠিন আবর্জনার সৃষ্টি হয়। এছাড়া D. D. T. D. D. E, D. D. D প্রভৃতি পেস্টিসাইড অভঙ্গুর এবং মৃত্তিকার সঙ্গে মিশ্রিত থাকে। এরা মৃত্তিকাস্থিত বাস্তুতন্ত্রকে ভেঙ্গে খাদ্যশৃঙ্খলে প্রবেশ করে ফলে মানুষ এক সঙ্কটের সম্মুখীন হয়।

মৃত্তিকা দূষণ বন্ধ রাখতে হলে নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি অবম্বন করতে হবে।

(1) স্থলভাগ থেকে কঠিন আবর্জনাগুলিকে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে অপসারণ করতে হবে।

(2) নাইট্রোজেনস্থিতিকারী ব্যাকটিরিয়া ব্যবহার করে আবর্জনাগুলিকে কম্পোস্ট সারে রূপান্তর।

(3) কৃষিক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক সার

ফার্টিলাইজার ইত্যাদির ব্যবহার সম্পর্কে যত্নবান হতে হবে। বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে গোবর গ্যাস প্লান্ট চালু করে গ্রামাঞ্চলের বায়ুকে কিছুটা কলুষমুক্ত করা হয়েছে।

তেজস্ক্রিয় পদার্থ দূষণ —মানব সমাজ তেজস্ক্রিয় মৌল ঔষধ তৈরিতে, রোগ নিরাময়ে এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যবহার করে থাকে। তেজস্ক্রিয় মৌলের বিভিন্ন আইসোটোপগুলি আয়োনাইজিং রেডিয়েশনের ফলে আলফা (α) এবং বিটা (β) কণিকায় ভেঙ্গে যায়। ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম, কার্বন, স্ট্রনসিয়াম প্রভৃতি আইসোটোপগুলি মানব সমাজ তথা সমস্ত জীব সম্প্রদায়ের দারুণ ক্ষতি সাধন করে। স্ট্রনসিয়াম—90 শরীরে প্রবেশ করলে ক্যানসার, লিউকেমিয়া, অস্থিটিউমার, প্রজননিক বিঘ্নতা ঘটায় এমনকি শিশুমৃত্যুর হারও বৃদ্ধি করে। এই কারণে উক্ত তেজস্ক্রিয় মৌলগুলির ব্যবহার ও বর্জন যথার্থ নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে করতে হবে।

মানুষ আত্মরক্ষার তাগিদে এবং নানা প্রয়োজনে নানা ধরনের বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রস্তুত বোমা ব্যবহারে পিছপা হয় না। এই সমস্ত বোমার বিস্ফোরণে যে ভস্মের সৃষ্টি হয় সেগুলি বৃষ্টিপাতের সঙ্গে ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়। তা' প্রত্যক্ষভাবে বা খাদ্য-শৃঙ্খলে অনুপ্রবেশ করে মানব সমাজ এমনকি সমস্ত জীবকুলকে ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে যায়।

তেজস্ক্রিয় পদার্থ কর্তৃক দূষণের হাত থেকে পরিবেশকে রক্ষা করার জন্য মানব সমাজের উচিত উক্ত পদার্থগুলির ব্যবহারে যথেষ্ট সতর্কতা এবং যথাযথ ব্যবহার।

শব্দোত্থিত দূষণ —শহরাঞ্চলে উপদ্রব সমূহের মধ্যে শব্দ অন্যতম। শব্দ বাতাস দ্বারা বাহিত হয় বলে তাকে Pollution-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মূল্যহীন শব্দই গোলমাল। প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আবিষ্কৃত নানা ধরনের যন্ত্রাদি থেকে উৎপন্ন শব্দ প্রকৃতই গোলমাল। কলকারখানা থেকে নানা ধরনের কর্কশ ও বিকট শব্দ উত্থিত হয়, এই বিকট আওয়াজের প্রভাবে মানুষের সংবেদন অঙ্গ, হৃদযন্ত্র, গ্রন্থি এবং নার্ভতন্ত্র প্রভৃতি মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাছাড়া বিকট শব্দের প্রভাবে মানব জাতির বধিরতা, উচ্চ রক্তচাপ, স্নায়বিক বৈকল্য প্রভৃতি রোগের সৃষ্টি হয়।

শব্দ দূষণ মানুষের সৃষ্ট দূষণ। তাই এর যথাযথ প্রতিকারের উপায় হচ্ছে সংযত ভাবে যন্ত্রপাতির ব্যবহার।

দেখা যাচ্ছে, প্রকৃতিকে নিষ্কাশিত করে জীবনকে সহজতর এবং আয়েসী করার বাসনায় মানুষের বিশাল সাধনা। আবার তা করতে গিয়েই প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। তাই মানুষের জীবনধারাকে উন্নততর করার কৃতিত্ব যেমন বিজ্ঞানীদের তেমনি প্রাকৃতিক পরিবেশ দূষণের দায়ভারও তাঁদেরই।

আবেদন

★ নিজের পরিবেশকে দূষণ থেকে মুক্ত রাখুন।
★ সকল প্রকার বন্যপ্রাণী ধ্বংস রোধ করুন।
★ খরা, ভূমিক্ষয় ও পরিবেশ দূষণ রোধে বৃক্ষ রোপণ করুণ।
★ খাদ্য ও ঔষধে ভেজাল দেওয়ার বিরুদ্ধে দুর্বার জনমত গঠন করুণ।
★ সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান মানসিকতা গড়ে তুলুন।

কর্মসচিব

পৃথিবীর আকার

রতনমোহন খাঁ*

যে ধরিত্রীর বুকে আমাদের প্রথম স্ফুরণ ঘটে, যে ধরিত্রী আমাদের বাল্য, কৈশোর, যৌবন ও বার্ধক্যের একমাত্র অবলম্বন, সেই ধরিত্রী সম্বন্ধে কৌতূহল খুবই স্বাভাবিক। কবির কল্পনায় বা সাহিত্যিকের রসসিক্ত রচনায় ধরিত্রী যে রূপ নেয় তাতে আমাদের মন ভোলে, কিন্তু কৌতূহল মেটে না। জ্যোতির্বিজ্ঞানী ভূবিজ্ঞানী কল্পনার সব জাল কেটে ধরিত্রীর স্বরূপ নির্ণয়ে কোন বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ করে আজো কাজ করে চলেছে।

পৃথিবীর আকৃতি নিয়ে চিন্তাভাবনা নানা দেশে হয়েছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানে ব্যাবিলনয়নরাই মনে হয় প্রথম অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে। প্রায় 5700 খৃঃ পূঃ ব্যাবিলয়নরা বর্ষ গণনা করত মহাবিষুবকে কেন্দ্র করে। তবে তাঁদের ধারণা ছিল পৃথিবী থালার মত চ্যাপ্টা।
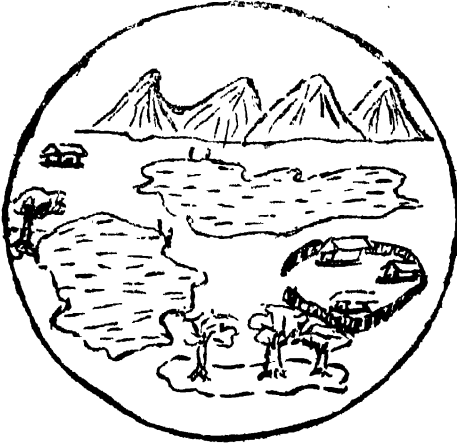
1নং চিত্র

হোমার (900-800 খৃঃপূঃ) বলেছিলেন পৃথিবী উত্তল পাত্রবিশেষ, যার উপরে আছে সাগর, মহাসাগর নদনদী, পাহাড়-পর্বত, স্থলভূমি ও বনাঞ্চল। মিশরে গীজার মহাপিরামিডের প্রযুক্তিবিদদের ধারণা ছিল পৃথিবী গোলাকার। ভারতীয় আর্যঋষিরা পৃথিবী সম্বন্ধে কম কৌতূহলী ছিলেন না। পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ বেদে আছে পৃথিবী বর্তুলাকার অর্থাৎ গোলাকার। পীথাগোরাসই (জন্ম 592 খৃঃ পূঃ) পৃথিবীর গোলাকার গঠনের বলিষ্ঠ প্রবক্তা। অ্যারিস্টটল পীথাগোরাসের সমর্থক ছিলেন
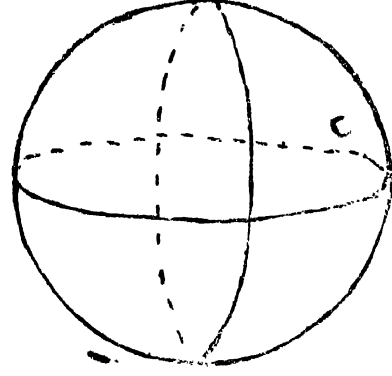
2নং চিত্র

এবং তাঁর মাপায় পৃথিবীর পরিধি 40000 স্টাডিয়া (প্রাচীন গ্রীসে 1 স্টাডিয়াম = 185·2 মিটার)। অ্যারিস্টটলের পরিধির মান প্রকৃত মানের প্রায় দ্বিগুণ হলেও, বিজ্ঞানভিত্তিক পরিধি মাপার এটাই প্রথম প্রচেষ্টা। এরাতোস্থিনেস (300 খৃঃ পূঃ) সুমেরু থেকে কুমেরু পর্যন্ত বৃহৎ বৃত্তের পরিধি $\frac{l}{2\pi R} = \frac{\alpha^\circ}{360^\circ}$ সমীকরণের সাহায্যে নির্ণয় করেন। এখানে L = চাপ, α° = কেন্দ্রে কোণ, R = ব্যাসার্ধ। পরিধির মাপ দাঁড়ায় প্রকৃত মানের চেয়ে 15 % বেশি। ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী আর্যভট্ট পৃথিবীকে কদমফুলের সঙ্গে তুলনা করেছেন। আর্যভট্টের গণনায় পৃথিবীর ব্যাস প্রায় 1050 যোজন। এক যোজন = $9\frac{1}{11}$ মাইল, তবে আর্যভট্ট কৌটিল্য শাস্ত্রের যোজনই গ্রহণ করেছিলেন। ঐ শাস্ত্রে 1 যোজন = $4\frac{6}{11}$ মাইল। এই একক অনুযায়ী পৃথিবীর ব্যাস 4725 মাইল। প্রকৃত মান থেকে এই মান অনেক কম। সূর্যসিদ্ধান্ত মতে পৃথিবীর ব্যাস 7200 মাইল।

ডেনমার্কের জ্যোতির্বিজ্ঞানী টাইকো ব্রাহে ষোড়শ শতকের শেষ দিকে ত্রিভুজীয় পদ্ধতি (triangulation) উদ্ভাবন করেন। ঐ সময় গণিতজ্ঞদের কাছে ছিল একটি সমস্যা। "পৃথিবীর উপর দুই বিন্দুর অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ জানতে পারলে কি ঐ দুই বিন্দুর মধ্যে রৈখিক দূরত্ব জানা যাবে?" গণিতবিদ রোজেন স্নেল ত্রিভুজীয় পদ্ধতিতে ঐ প্রশ্নের সমাধান করেন। তাঁর

* সিটি কলেজ কলিকাতা-700 009

গণনায় পৃথিবীর পরিধি প্রকৃত মানের চেয়ে 3·4% কম হয়। 1669 খৃঃ ফরাসী জ্যোতিবিজ্ঞানী জিন পিকার্ড অক্ষাংশ ও ত্রিভুজীয় পদ্ধতিতে কোণের পরিমাণ নির্ণয়ে প্রথম দূরবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করেন এবং কেন্দ্রে 1° কোণ উৎপাদনকারী চাপের দৈর্ঘ্য নির্ণয়ে সমর্থ হন। পিকার্ডের পর্যবেক্ষণলব্ধ উপাত্ত ও ফলসমূহকে নিউটন চাঁদের উপর পৃথিবীর আকর্ষণই প্রধান বল, এই তত্ত্বের সত্যতা যাচাই করতে প্রয়োগ করেন।

গোলকীয় ধ্যান-ধারণা পরিবর্তিত হলো নিউটন ও হাইগেনের গাণিতিক তত্ত্বে। এল উপবৃত্তীয় যুগ। টলেমীর গোলক ও মহাবিশ্বের কেন্দ্র হিসাবে ভূকেন্দ্র অযৌক্তিক প্রমাণিত হলো, কোপারনিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক প্রকল্প গ্রহণ যোগ্য হলো, লবিদ্যার সূত্র অবলম্বনে নিউটন ও হাইগেনের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা স্বীকৃতি পেল। পৃথিবীর আকার গোলকের স্থলে হলো উপগোলক। দুই মেরু কিছুটা চাপা। 1687 খৃঃ নিউটন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ প্রিন্সিপিয়াতে অঙ্কের জটিল হিসাবে প্রমাণ দিলেন নিরক্ষীয় ব্যাসার্ধ মেরু ব্যাসার্ধের $1/_{230}$ ভাগ বেশি। এই ফল অনেকের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হলো। কিন্তু দেখা গেল প্যারিসে যে ঘড়ি ঠিক সময় দেয়, নিরক্ষীয় অঞ্চলে সেই ঘড়ি 2·5 মিনিট স্লো যায়। নিউটনের অভিকর্ষ তত্ত্বে এর কারণ মিলল। নিরক্ষীয় অঞ্চল থেকে যতই মেরু
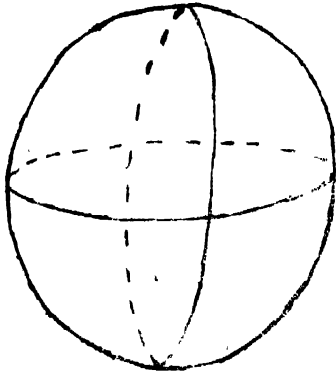
3নং চিত্র

অঞ্চলের দিকে যাওয়া যায়, অভিকর্ষ বল ততই ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে (যদিও এই বৃদ্ধি খুবই কম)। পৃথিবীর ব্যাসার্ধের ক্রমহ্রাসই এই বৃদ্ধির কারণ। এতেও অবিশ্বাস দূর হলো না। প্যারিসের বিজ্ঞান অ্যাকাডেমি সত্যতা যাচাই এর জন্য 1735 খৃঃ পেরুতে (নিরক্ষরেখার 10° দক্ষিণে) এবং 1736 খৃঃ ল্যাপল্যাণ্ডে (70° উত্তর অক্ষাংশে) দুটি পর্যবেক্ষক দল পাঠান দেশান্তর রেখার দৈর্ঘ্য মাপার জন্য। এক ডিগ্রী দেশান্তর রেখার দৈর্ঘ্য ল্যাপল্যাণ্ডে 57,437·9 টয়সী (ফ্রেঞ্চ একক) এবং পেরুতে 57,753 টয়সী। এবার সন্দেহের অবসান ঘটলো।

নিউটনীয় তত্ত্বে পৃথিবীর সমঘনত্ব বিবেচিত হলেও, প্রকৃতপক্ষে সর্বত্র ঘনত্ব সমান নয়। তাই ভূপৃষ্ঠের একই বিন্দুতে ওলন সুতোর দিক ও অভিলম্বের দিক এক হয় না। এই দুই দিকের মধ্যবর্তী কোনই উল্লম্ব রেখার বিক্ষেপ। আবার ভরের অসমতা অভিকর্ষ বলকে অনেকাংশে প্রভাবিত করে। ওলন সুতোর বিক্ষেপ পৃথিবীর সঠিক আকার ও গঠন নির্ণয়ে বিশেষ জটিলতার সৃষ্টি করেছে। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির সাহায্যে পর্যবেক্ষণলব্ধ উপাত্তসমূহের উপর গাণিতিক বিশ্লেষণে পৃথিবীর আকৃতি নির্ণয়ে বিভিন্ন প্যারামিটারগুলির মান অধিকতর নির্ভুলভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হচ্ছে। নিম্নের সারণীতে বিভিন্ন ফলের উত্তরোত্তর পরিবর্তিত মান।

খৃঃ	অর্ধপরাক্ষ	বিপরীত চিপিটন (inverse flatening)
1800	6375653 মিটার	334·00
1910	6378388 ,,	298·00
1956	6378260 ,,	297·00

কৃত্রিম উপগ্রহ যুগ শুরু হবার আগে জ্যোতির্মহাকর্ষ পদ্ধতিই ছিল বিজ্ঞানীদের কাছে পৃথিবীর আকৃতি নির্ণয়ে সবচেয়ে কার্যকরী হাতিয়ার। পরম ও আপেক্ষিক অভিকর্ষ ধ্রুবক কয়েক দশমিক স্থান পর্যন্ত সূক্ষ্মভাবে মাপা সম্ভব হয়েছিল। 1955 খৃঃ পর্যন্ত দোলকের সাহায্যে অভিকর্ষ ধ্রুবক g-এর মান নির্ণয় করা হতো $g = \frac{4\pi^2 l}{T^2}$ সূত্র অবলম্বন করে। নিরক্ষরেখার উপর অভিকর্ষ ধ্রুবক g_0 এবং অন্য একটি স্থানে g_1 হলে, $g_0/g_1 = T_1^2/T_0^2$ । সূত্রে l = দোলন দৈর্ঘ্য, T = পর্যায়কাল। এছাড়াও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় প্রযুক্তিবিদ্যায় যথেষ্ট উন্নতি ঘটায়, ভূবিজ্ঞানের বহু জটিল সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়।

জ্যোতির্মহাকর্ষ পদ্ধতি প্রয়োগের আগে ও পরে বিপরীত চিপিটন সারণী ঃ

খৃঃ	বিপরীত চিপিটন
1884	299·75
1901	298·20
1945	297·80
1957	297.40
1961	298·10

1957 খৃঃ 4ঠা অক্টোবর বিজ্ঞান জগতে এক স্মরণীয় দিন। যা ছিল কল্পনার রাজ্যে, তা রূপ নিল বিজ্ঞানীর হাতে। ঐদিন মহাকাশ যাত্রা শুরু হয় রাশিয়ার কৃত্রিম উপগ্রহ স্পুটনিক-এর পৃথিবী পরিক্রমা দিয়ে। কৃত্রিম উপগ্রহে সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি সাজিয়ে পৃথিবীর খুব কাছ ও দূর থেকে নানাভাবে পর্যবেক্ষণের ফলে অনেক ভ্রান্ত ধারনার নিরসন হলো, পূর্ব নির্ণীত বহুফল নূতনভাবে মূল্যায়িত হলো, উপগ্রহ-কক্ষের বিচলনের (Perturbation) সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব হলো। পৃথিবী যদি আদর্শ সমঘনত্ববিশিষ্ট গোলক হতো, বায়ুমণ্ডল না থাকতো, সূর্য ও চাঁদের আকর্ষণ খুবই ক্ষীণ বলে নাকচ করা যেতো, তাহলে একটি কৃত্রিম উপগ্রহ মাসের পর মাস একই পথে চলত, পথের কোন হেরফের হতো না। কিন্তু পৃথিবী ঠিক গোলক নয়, অভিকর্ষফল অক্ষাংশের উপর নির্ভর করে এবং উপগ্রহের কক্ষপথেও চ্যুতি ঘটে। পৃথিবীর সমবিভবীয় তল গণিতের ভাষায় তরঙ্গরূপে প্রকাশিত হয় এবং গাণিতিক বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণবিন্দুর অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশের উপর নির্ভর করে। [তরঙ্গায়িত অবস্থা N হলে, $N = \frac{W-U}{g} = \frac{T}{g} \cdot W =$ মহাকর্ষীয় বিভব, U = উপবৃত্তীয় ঘনের বিভব, g = অভিকর্ষ ধ্রুবক T = বিঘ্নিত বিভব, g-γ = অনিয়ত অভিকর্ষ।] এই সব ধ্রুবক বা প্যারামিটার দিয়েই বিভবের গাণিতিক রূপ ও সেইসঙ্গে উপগ্রহের কক্ষপথের সমীকরণ নির্ণীত হয়। নিউটনীয় বলবিদ্যার সাহায্যেই উপগ্রহের কক্ষপথের বহু বিষয় বিশ্লেষণ করা যায়। বিজ্ঞানীর চোখে পৃথিবীর পরিচয়ে ছয়টি মৌল বিষয় হলো—(i) কক্ষের নতি (কক্ষতল ও বিষুবতলের মধ্যে কোণ), (ii) কক্ষের পর্যায়কাল (পৃথিবীর একটি কক্ষের অতিবাহিত সময়), (iii) উৎকেন্দ্রতা (বৃত্ত থেকে উপবৃত্তে গমন), (iv) অনুভূর বিস্তার (ক্রান্তিরেখার উপর অনুভূবিন্দু থেকে ভূবিষুবরেখা ও ক্রান্তিরেখার উত্তর ছেদবিন্দুর মধ্যে কোণ), (v) উর্ধ-পাতের দ্রাঘিমাংশ (মহাবিষুব থেকে ক্রান্তিরেখা বরাবর পাত পর্যন্ত কোণ), (vi) অনুভূগমনকাল (The time of perigee passage)।

মহাকর্ষ ধ্রুবক, পৃথিবীর ভর, অর্ধপরাক্ষদৈর্ঘ্য, প্রাথমিক অবস্থান, বেগ, গাণিতিক বিশ্লেষণ থেকে প্রাপ্ত সুসমঞ্জস অপেক্ষক (Harmonics) প্রভৃতির উপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট সময় সীমায় কক্ষপথের প্রকৃতি জানা যায়। মহাকর্ষ বিভব ছাড়াও বায়ু মণ্ডল, সূর্য ও চাঁদের প্রভাবে উপগ্রহের কক্ষপথ বিচলিত হয়। স্পুটনিক-1 এর চেয়ে স্পুটনিক 2 এর কক্ষপথ ছিল অধিকতর স্পষ্ট ও তথ্য-জ্ঞাপক। এক্সপ্লোরার-1 এবং ভ্যানগার্ড-1 (1958) এর কক্ষপথ আমেরিকারবিজ্ঞানীরা চিহ্নিত করেন রেডিও পদ্ধতিতে। কৃত্রিম উপগ্রহের গতি পূর্বাভিমুখী কিন্তু পৃথিবীর চিপিটন ঐ কক্ষপথে পশ্চিমাভিমুখী বিচলন ঘটায়। জ্যামিতিক কৃত্রিম উপগ্রহগুলিতে বিজ্ঞানীদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ভূতলের উপর কতিপয় বিন্দুর ত্রিমাত্রিক অবস্থানের পর্যালোচনা করা। এই পর্যালোচনায় সমগ্রভূতলের উপর ত্রিভুজীয় পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। আমেরিকার ইকো উপগ্রহ এই কাজ সম্পূর্ণ করে। কক্ষীয় পদ্ধতি অনুসারে ভূতলের উপর অভিকর্ষ কেন্দ্রের পরিপ্রেক্ষিতে অবস্থান নির্ণয় করা হয়। এসব পরীক্ষা নিরীক্ষা থেকে পৃথিবীর চিপিটন দাঁড়িয়েছে $\frac{1}{298\cdot258}$। কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে আধুনিক যন্ত্রপাতি সাহায্যে পর্যবেক্ষণের ফলসমূহ বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত হলো পৃথিবীর আকার ঠিক উপগোলক নয়। উত্তর গোলার্ধের চিপিটন দক্ষিণ গোলার্ধের চিপিটন থেকে পৃথক, উত্তর মেরুঅঞ্চল দক্ষিণ মেরুঅঞ্চল থেকে সামান্য স্ফীত। পৃথিবীর চেহারাটা অনেকটা ন্যাসপাতির মত। এই আকার কেবলমাত্র আবর্তিত উপবৃত্তাকায় ঘনবস্তু (ellipsoid of revolution) এর সঙ্গে তুলনা করা যায়।
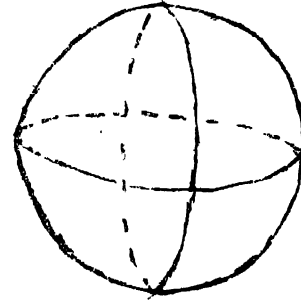
4নং চিত্র

1967 খৃঃ স্বীকৃত পৃথিবীর কতিপয় প্যারামিটারের মান ঃ

অর্ধপরাক্ষের দৈর্ঘ্য = 6,378,180 মিটার
অর্ধউপাক্ষের দৈর্ঘ্য = 6,356,774·5161 মিটার
মেরু বক্রব্যাসার্ধ = 6, 399, 617·4290 মিটার
উৎকেন্দ্রতার বর্গ = 0.00669460532 856
চিপিটন = $\frac{1}{298\cdot247167427}$
দ্রাঘিমারেখার এক চতুর্থাংশ = 10,002,001·2313 মিটার

ভূতলের ক্ষেত্রফল = 510,069,262 বর্গ কিলোমিটার

মহাকর্ষক ধ্রুবক ও ভরের গুণফল (G M) = 398 ,603X10⁹ m³/ sec²

কৌণিক বেগ = 7,29211·151467 রেডিয়ান/সেকেণ্ড

1970 খৃঃ স্বীকৃত অর্ধপরাক্ষের দৈর্ঘ্য = 6,378,140 মিটার এবং চিপিটন = $\frac{1}{298 \cdot 258}$

[ছবি এঁকেছে শুভঙ্কর খাঁ]

ফসল উৎপাদনে ধাতুর প্রভাব

কমল চক্রবর্তী*

প্রকৃতিতে আছে 92টি মৌল এবং তাদের সাহায্যেই গড়ে উঠেছে লক্ষ লক্ষ যৌগিক পদার্থ। 92টি মৌলের মধ্যে ধাতুর সংখ্যাই সব থেকে বেশি। ধাতুগুলি শুধুমাত্র আমাদের প্রয়োজনমত কাজে আসে, তা নয়, এগুলির ব্যবহার আরও ব্যাপক। প্রকৃতিই ধাতুগুলিকে বিভিন্নভাবে সাজিয়ে ছড়িয়ে দিয়েছে নানা যৌগাকারে মাটির মধ্যে। ধাতুর যৌগ তাই মাটির নিজস্ব অঙ্গ।

ফসল উৎপাদানে যে সব ধাতু বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে, তাদের মধ্যে পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, লোহা, তামা, ম্যাঙ্গানীজ ও মলিবডেনাম উল্লেখযোগ্য।

পটাশিয়াম ফসলের ওপর নানাভাবে কাজ করে। পাতায় সবুজ ক্লোরোফিল গঠনে, শর্করার চলাচলে, শিকড়ের বৃদ্ধিতে, বিভিন্ন খাদ্য উপাদানের গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রণে, বিশেষ করে নাইট্রোজেন ও ফসফরাসের কাজে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে পটাশিয়ামের প্রয়োজন হয়। এছাড়া গাছের কাণ্ড শক্ত করা, বিভিন্ন পোকামাকড় থেকে রক্ষায় গাছের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে এবং গাছের দেহে জলের নিয়ন্ত্রণেও এটি প্রয়োজন।

পটাশিয়ামের মত ম্যাগনেসিয়ামেরও প্রয়োজন আছে প্রচুর। এটি পাতার সবুজ ক্লোরোফিল তৈরির কাজে লাগে এবং ক্লোরোফিলের সাহায্যেই পাতার সালোকসংশ্লেষ কাজ হয়। এছাড়া গাছের বংশপরিচায়ক ক্রোমোজোমের একটিউপাদান হচ্ছে এই ধাতু এবং এটি বিভিন্ন এনজাইমের কাজে ও গাছের দেহে তেলজাতীয় পদার্থ তৈরিতে সাহায্য করে।

ফসল উৎপাদনে পটাশিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের পর যে ধাতুটির নাম এসে পড়ে সেটি হলো ক্যালসিয়াম। মানুষের জীবনে এর যেমন অপরিসীম মূল্য আছে, গাছের জীবনেও এর ভূমিকা ঠিক তেমনি। শেকড়ের বৃদ্ধিতে, গাছের দেহকোষ গঠনে, নাইট্রেটে পরিবর্তনে ব্যাকটিরিয়ার কাজকে বাড়াতে, প্রোটিন সৃষ্টির কাজে এবং গাছের ভেতর যে অ্যাসিড থাকে তার অম্লত্ব কমাতে ক্যালসিয়াম প্রয়োজন।

এবার আয়রন বা লোহার কথায় আসা যাক। পরিমাণে এটি গাছ বেশি চায় না ঠিকই, কিন্তু এর প্রয়োজন গাছ কখনও অস্বীকার করতে পারে না। কয়েকটি এনজাইম গঠনে এবং সেগুলির কাজে লোহার প্রয়োজন হয়। বায়ুর নাইট্রোজেনকে বিভিন্ন জীবাণু ও সবুজ শ্যাওলার সাহায্যে মৌলটি বেঁধে ফেলতে পারে গাছে হিমোগ্লোবিন ও প্রোটিনের মধ্যে লোহা থাকে। এছাড়া বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ যেমন সাইটোক্রোম, ফেরোডক্সিনে লোহা থাকে এবং তা সালোকসংশ্লেষে সাহায্য করে। লোহাকে গাছ অণু খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। লোহার মত আরও কয়েকটি গাছের অণুখাদ্য হলো তামা, দস্তা, ম্যাঙ্গানীজ ও মলিবডেনাম।

কপার বা তামার প্রয়োজন কী তা এবার অল্পকথায় জানা থাক। তামাও লোহার মত সালোকসংশ্লেষে সাহায্য করে এবং গাছের দেহে ভিটামিন-এ তৈরিতে এটি প্রয়োজন হয়। এছাড়া গাছের মধ্যে যে সব রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে তাতে যে এনজাইম কাজে আসে, এটি সেই এনজাইমের উপাদান হিসেবে থাকে। তামা ও লোহার মত আরেকটি অতি প্রয়োজনীয় অণুখাদ্য হচ্ছে জিংক বা দস্তা। দস্তা বিভিন্ন প্রয়োজনীয় এনজাইমে উপাদান এবং এটিও সালোকসংশ্লেষে সাহায্য করে। গাছের প্রধান খাদ্য পটাশিয়াম ও ফসফরাস গ্রহণে এটি সাহায্য করে। গাছে ফুল ফোটানো এবং ফলতৈরির কাজে এটি প্রয়োজন হয়। তাই অণুখাদ্য

* কালিন্দী হাউসিং এস্টেট, ফ্লাট সি 39/5 কলিকাতা-700 089

হিসেবে দস্তা অনন্য। দস্তার আর একটি ব্যবহার হচ্ছে উদ্ভিদ হরমোন গঠন। দস্তা ইনডোল অ্যাসিটিক অ্যাসিড গঠনে সাহায্য করে।

দস্তার মত আর একটি প্রয়োজনীয় অণুখাদ্য হচ্ছে ম্যাঙ্গানীজ। এটিও নানাভাবে কাজে আসে। যেমন, এটি গাছের দেহের প্রয়োজনীয় এনজাইমের কর্মক্ষমতা বাড়ায়। এটি বিশেষ একটি প্রয়োজনীয় এনজাইমের উপাদান যে এনজাইম ফসলের নাইট্রোজেন গ্রহণে সাহায্য করে এছাড়া এটিও সালোকসংশ্লেষে সাহায্য করে। এরপর আর একটি অণুখাদ্য ধাতু যা গাছের কাজে লাগে সেটি হলো মলিবডেনাম। এটি অন্যান্য অণুখাদ্যের চেয়েও পরিমাণে অনেক কম লাগে এবং তা হলো দশ লক্ষভাগে 0·0001 থেকে 0·00001 ভাগ মাত্র। পরিমাণে কত কম কিন্তু এই সামান্য পরিমাণের কাজ আছে গাছের কাছে। এটি এক প্রয়োজনীয় এনজাইমের উপাদান এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য এনজাইমের কাজে সাহায্য করে। এটি প্রোটিন সংশ্লেষ এবং মিথোজীবি (Symbiotic) নাইট্রোজেন বন্ধনের কাজে আসে।

এইসব প্রয়োজনীয় ধাতুর অভাব গাছের কি কি ক্ষতি করতে পারে তা এবার জানা যাক। আমাদের জীবনের একটি কাজ যদি একজন দিয়ে পুরণ করা না যায়, তবে তা অন্যকে দিয়ে পুরণ করা সম্ভব হয় এবং খাদ্যের ব্যাপারে আমরা এক ধরনের খাদ্যের অভাব হলে, অন্য খাদ্য গ্রহণ করে তার অভাব মেটাই কিন্তু গাছের ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয় না। গাছের প্রধান খাদ্য তিনটি এবং সেগুলি হল নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশিয়াম। সুতরাং ধাতু হিসেবে পটাশিয়ামই গাছের একমাত্র প্রধান খাদ্য। এর অভাবে গাছের কাণ্ড দুর্বল হয়ে যায়, পাতা শুকিয়ে যায় এবং ডগা থেকে শিরা পর্যন্ত লালচে হয়ে যায়। এক কথায় পটাশিয়ামের অভাবে গাছের বাড় দারুণভাবে কমে যায়।

এরপর দুটি গৌণখাদ্য ম্যাগনেসিয়াম ও ক্যালসিয়ামের অভাবে গাছের কি ক্ষতি হতে পারে জানা যাক। ক্লোরোফিলের উপাদান ম্যাগনেসিয়ামের অভাবে পাতা ক্রমশঃ হলদে হয় এবং শিরা বরাবর এই হলুদ রং এগিয়ে আসে এবং তা পাতার মৃত্যু ঘোষণা করে আর তাই পাতা গাছে থাকতে না পেরে ঝরে পড়ে। কোন কোন গাছের ক্ষেত্রে শিরা সবুজ থাকে যেমন তুলো ও ভুট্টার ক্ষেত্রে। তুলায় বাদামী ডোরা দাগ ও ভুট্টার পাতার ভেতরের শিরায় সাদা ডোরা দাগ দেখা যায় দুটি গৌণখাদ্যের একটির অভাবে গাছের কি অসুবিধা হয় জানা গেল। এবার বাকী গৌণখাদ্য ক্যালসিয়ামের অভাব গাছকে কি অসুবিধায় ফেলে জানা যাক। এটির অভাবে পাতার রং ফ্যাকাশে হয় ও তাতে ছোপ ছোপ দাগ পড়ে ও পাতা কুঁকড়ে ছোট হয়ে যায়। ফুল ও ফলের কুঁড়ি তাড়াতাড়ি ঝরে পড়ে। গাছের শিকড়ও ক্রমে ক্রমে শুকিয়ে যায়।

অণুখাদ্য লোহা, তামা, দস্তা, ম্যাঙ্গানীজ ও মলিবডেনামের অভাব গাছের কি কি ক্ষতি করে সেগুলি আলোচনা করা যাক।

লোহার অভাবে পাতার রং হলদে হয় এবং ফসলের বীজ ও ফল উৎপাদন কম হয়। কোন কোন ফলজাতীয় গাছের পাতায় লালচে দাগ প্রকট হয়ে ওঠে। লোহার মত তামার অভাবে পাতার ধার বরাবর হলদে রং দেখা যায় এবং কাণ্ডের ডগা শুকিয়ে যায়। নতুন কচি পাতার রং নষ্ট হয়ে যায় এবং গাছের সালোকসংশ্লেষের কাজ ব্যাহত হয় ও তামার মত আর একটি অতিপ্রয়োজনীয় অণুখাদ্য হচ্ছে দস্তা। দস্তার অভাবে পাতার অন্তঃশিরা হলদে হয় এবং [illegible] পাতাও হলদে হয়ে যায়। ধান গাছের পাতা শুকিয়ে যায় এবং গমের পাতায় বাদামী দাগ পড়ে। সবথেকে বড় কথা, গাছে ফুল ও ফল ধরতে দেরী হয় এবং গাছের সালোকসংশ্লেষ ব্যাহত হয়।

ম্যাঙ্গানীজ যদিও গাছের খুব কম পরিমাণে লাগে তবু এর অভাব গাছে প্রকট হয়ে ধরা পড়ে। এর অভাবে পাতার রং হলদে বা বাদামী হয়ে যায়, গাছের বাড় কমে যায় এবং ফসলে নানা রোগ দেখা যায়।

সবশেষে মলিবডেনামের কথায় আসা যাক। এটির প্রয়োজন গাছের সবচেয়ে কম অথচ এই সামান্য পরিমাণটুকুরও কত প্রয়োজন গাছের জীবনে। এর অভাবে বিভিন্ন গাছে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া ; যেমন—পুরানো পাতার রং জ্বলে যায় ও পাতা কুঁকড়ে যায়। টমাটো গাছে এই অভাব বেশি করে ধরা পড়ে। এর পাতা খুব তাড়াতাড়ি হলদে হয় ও কুঁকড়ে যায়। ফুলকপির পাতাও এর অভাবে শুকিয়ে যায়। লেবু গাছের পাতাও হলদে হয় এবং অভাব বেশি হলে পাতা ঝরে পড়ে। এছাড়া এর অভাবে গাছের ভেতর যে শ্বেতপদার্থ থাকে তার কাজ দারুণভাবে ব্যাহত হয় এবং তাতে গাছের খাদ্য সরবরাহে ব্যাঘাত ঘটে।

গাছের অণুখাদ্যগুলি সাধারণত খনিজরূপেই থাকে মাটিতে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম এই দুটি গৌণখাদ্যের উৎস হচ্ছে ক্যালসাইট, ডলোমাইট, ফেল্ডস্পার প্রভৃতি খনিজ। বৃষ্টিপ্রধান অঞ্চলের মাটিতে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামেরও অভাব ঘটে, তাই এই দুটি খাদ্য উপযুক্ত পরিমাণে মাটিতে মিশিয়ে দিতে পারলে গাছ

ঠিকভাবে বেড়ে উঠতে পারে। বৃষ্টিপাতের জন্য মাটির ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম জলে ধুয়ে বেরিয়ে যায়।

বিভিন্ন অণুখাদ্য মাটিতে কি পরিমাণে ও কিভাবে থাকবে তা নির্ভর করে খনিজের গঠন ও জলহাওয়ার ওপর। মাটিতে লোহা ও ম্যাঙ্গানীজ সাধারণত ভাল পরিমাণে থাকে, সুতরাং অণুখাদ্য হিসেবে এর অভাব দেখা যায় না। কিন্তু বাকীগুলির বিভিন্ন জমিতে অভাব দেখা দিতে পারে।

এতক্ষণ যে যে ধাতুরগুলির কথা বলা হলো, সেগুলি কিন্তু ধাতু অবস্থায় থাকে না, থাকে তাদের অক্সাইড, সালফাইড, কার্বনেট বা সিলিকেট হিসেবে। পটাশিয়াম k^{+}, ক্যালসিয়াম Ca^{++}, ম্যাগনেসিয়াম Mg^{++}, লোহা বা আয়রন Fe^{++} বা Fe^{+++}, ম্যাঙ্গানিজ Mn^{++} Mn^{++++}, জিংক Zn^{++}, কপার Cu^{+} বা Cu^{++}, এবং মলিবডেনাম MoO^{4-} আয়নরূপে শস্যের খাদ্য হিসেবে কাজে আসে। জলাজমিতে ও বদ্ধ জায়গায় আয়রন Fe^{++}, ম্যাঙ্গানীজ Mn^{++}, কপার Cu^{+} রূপে গাছের খাদ্য হিসেবে মূলতঃ থাকে। সম্প্রতি দেখা গেছে যে, কোন কোন গাছের কোবাল্টের প্রয়োজন আছে এবং তা প্রয়োজন হয় মিথোজীবি নাইট্রোজেন বন্ধনের (Symbiotic fixation of Nitrogen) জন্য। এই মৌলটি হয় ভিটামিন-B_{12} এর একটি উপাদান এবং এটি প্রয়োজন হয় এক বিশেষ ধরনের হিমোগ্লোবিন প্রস্তুতিতে এবং কোষের নাইট্রোজেন বন্ধনে। কোন কোন গাছ আবার দেখা গেছে নাটোজেন বন্ধন ছাড়াই কোবাল্টের প্রয়োজন অনুভব করে, যদিও পরিমাণে তা খুব কম।

সুতরাং মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর খাদ্য হিসেবেই যে ধাতু শুধুমাত্র কাজে আসে তা নয়, এর ভূমিকা গাছেও কত ব্যাপক তা জানা গেল, গাছের ক্ষেত্রে অবশ্য এই পরিমাণ তুলনায় অনেক কম লাগে।

এস্পেরান্তো ভাষা শিক্ষা

প্রবাল দাশগুপ্ত*

পরিচ্ছেদ 3

3-1। 'সর্বনাম' বলে একরকম বিশেষ্য আছে; তাদের বেলা o বিভক্তির প্রয়োগ হয় না। তিনটে সর্বনাম দিয়ে শুরু করি ঃ

mi আমি

ni আমরা

vi তুই, তোরা, তুমি, তোমরা, আপনি, আপনারা

3-2। প্রায়ই দেখবেন, এক‌েকটা কথা বলার স্বাভাবিক ধরণটা দু ভাষায় দু রকম। বাঙলায় বলি, তোমার গায়ে জোর আছে, তোমার বয়স কম। একটু অস্বাভাবিক লাগে যদি বলি, তুমি হচ্ছ বলবান, তুমি হচ্ছ অল্পবয়স্ক। এস্পেরান্তোয় কিন্তু ওই দ্বিতীয় ধরণটাই শুনতে স্বাভাবিক—

Vi estas forta "তুমি হচ্ছ বলবান"

Vi estas juna "তুমি হচ্ছ অল্পবয়স্ক"

অক্ষরে অক্ষরে অনুবাদ করলে এই দাঁড়ায়। Vi তুমি estas হচ্ছ; forta বলবান। কিন্তু আসল অনুবাদের নিয়ম হলো, মূল ভাষায় যেটা স্বাভাবিক তার জায়গায় অনুবাদের ভাষায় যেটা স্বাভাবিক সেইটা বসানো। সেই নিয়ম অনুসারে অনুবাদ করলে—

Vi estas forta তোমার গায়ে জোর আছে

Vi estas juna তোমার বয়স কম

3-3। অবশ্য 'তুমি' লিখছি পুনরাবৃত্তি এড়াতে। 'আপনি' বা 'তুই'ও হতে পারে। তবে একবচন বিশেষণ forta আর juna থাকলে vi মানে 'তোরা, তোমরা, আপনারা' হতে পারে না। ওই মানেগুলো পেতে হলে—

Vi estas fortaj তোমাদের গায়ে জোর আছে (বা ঃ তোদের, আপনাদের)

Vi estas junaj তোমাদের বয়স কম

এর সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন ঃ

Ni estas fortaj আমাদের গায়ে জোর আছে (এখানে 'forta' বারণ)

Ni estas junaj আমাদের বয়স কম ('juna' বারণ)

* ডেক্কান কলেজ, পোস্ট গ্রাজুয়েট অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট, পুনে-411006

Mi estas forta আমার গায়ে জোর আছে ('fortaj' বারণ)

Mi estas juna আমার বয়স কম ('junaj' বারণ) এগুলোর বিকল্প নেই। vi-র বেলায় একবচন আর বহুবচনের মধ্যে বেছে নিতে হয়, কী বলতে চাচ্ছেন সেটা ভেবে নিয়ে।

3-4। কয়েকটা নাম ঃ

Asa আশা, Usa উষা, Esa এষা, Prodip, Sudip সুদীপ, Probir প্রবীর, Subir সুবীর।

3-5। কয়েকটা ক্রিয়া ঃ

sidas বসে আছে
staras দাঁড়িয়ে আছে
kusas শুয়ে আছে
iras যাচ্ছে
venas আসছে

3-6। Asa sidas.
Usa staras.
Esa kusas.
Prodip iras,
Sudip venas.
Probir kaj Subir estas amikoj.

3-7। ক্রিয়া কোনো কিছু প্রতিফলন করে না। Ni sidas. Vi staras. Mi kusas. 'বসে আছ' হলেও sidas (vi sidas), 'বসে আছি' হলেও sidas (mi sidas অথবা ni sidas)।

3-8। laboras কাজ করছে, করছি করছ....
parolas কথা বলছে....
ridas হাসছে ..

Asa kaj Prodip staras kaj laboras.

Usa kaj Sudip sidas kaj parolas.

Esa kaj Probir kusas kaj ridas.

Kaj Subir? Subir iras. Subir estas forta, juna kaj rica.

3-9। Subir iras. Raka venas. Subir parolas. Raka komprenas (বুঝতে পারছে).

এখানে তো গল্প বলার মতো পর পর আসছে ঘটনা। বাঙলায় বলব না "সুবীর যাচ্ছে। রাকা আসছে।...."— বরং বলতে চাইব "সুবীর যায়। (বা, সুবীর চলে; iras-এর এ মানেটাও হয়।) রাকা আসে।" ইত্যাদি। চলছে-আসছে-কথা-বলছে না বলে 'চলে, আসে, কথা বলে' বললেও এস্পেরান্তোর as বিভক্তি একই থাকে। পরিবেশে বোঝা যায় venas মানে 'আসছে' হবে—না 'আসে' হবে।

এরকম ব্যাপার কোনো ভাষায় দেখেন নি বলবেন না। প্রচলিত ভাঙা হিন্দী বা বাজার হিন্দী খানিকটা তো জানেন। 'হাম রুপিয়া দেতা' মানে কী? 'আমি টাকা দিই' না 'আমি টাকা দিচ্ছি'? দুটোই হতে পারে— পরিবেশের উপর নির্ভর করে। 'অভি দেতা' বললে দিচ্ছি', 'হামেশা দেতা' বললে 'দিই'। এটা অবশ্য আপনার-আমার ভাঙা-ভাঙা হিন্দীর ব্যাপার। খুঁতখুঁতে পাঠকের হয়তো আরও বিশুদ্ধ দৃষ্টান্ত লাগবে। তাহলে ইংরাজীর দ্বারস্থ হওয়া যাক। I see the Indian flag মানে কী? 'আমি ভারতীয় পতাকা দেখতে পাচ্ছি' এই মুহূর্তে? না 'আমি ভারতীয় পতাকা দেখতে পাই', যখনই ওদিকে তাকাই তখনই, প্রত্যেক বার? I see the Indian flag right now. I see the Indian whenever I look at that building. দুটো মানের যেকোনো একটা মানে হতে পারে। পরিবেশ থেকে বুঝে নিতে হয়।

এ কথা ইংরিজীতে অল্প কয়েকটা ক্রিয়ার ক্ষেত্রে সত্যি —see, know, hear, understand, feel ইত্যাদি। এস্পেরান্তোয় সাধারণ নিয়ম এটা। ক্রিয়ার গায়ে বর্তমান কালের বিভক্তি as থাকলেই তার মানে 'আসে' যায়, বসে থাকে' হতে পারে, 'আসছে, যাচ্ছে, বসে আছে'ও হতে পারে। পরিবেশ যা বলবে তাই হবে।

3-10। গল্প শেষ হয় নি। Subir estas juna. Ankau Raka (রাকাও) estas juna. বাঙলায় রাকার শেষে 'ও' যোগ হয়; এস্পেরান্তোয় Rakar বাঁদিকে ankau বসে। Raka estas ankau bela (সুন্দরীও বটে). লক্ষ করুন যে ankau Raka estas

bela বললে তার মানে দাঁড়াতো 'রাকাও সুন্দরী', অর্থাৎ কিনা ধরে নেওয়া হচ্ছে যে Subir estas bela, যেটা ধরে নেওয়ার কোনো কারণ নেই।

এর পর কী হবে বুঝে নিন। গল্প শেষ।

3-11। বাঙলা করুন ঃ

Ankau vi estas forta

Vi estas ankau junaj

Asa estas forta kaj bela

Esperanto estas facila

Ni laboras

Esa ridas

3-12। এস্পেরান্তো করুন ঃ

সুরেন শুয়ে আছে

ধনী দেশ শক্তিশালী হয় (সচরাচর)

('সচরাচর'টা অনুবাদ করতে হবে না)

নতুন বন্ধু আর (নতুন) পথ ভালো

বরুণ ভালো বন্ধু (এটা বাংলায় আড়ষ্ট শোনায়, কিন্তু নির্ভরযোগ্য বা প্রীতিপূর্ণ বন্ধু অর্থে 'ভালো বন্ধু' বলে এস্পেরান্তোয়)

সুন্দর সময় আর (সুন্দর) পথ ভালো জিনিস (ভেবে দেখবেন—একটা ভালো জিনিস না একাধিক ?)

আপনাকেও দেখতে ভালো

আপনারও বয়স কম

আমাদের গায়ে জোরও আছে

গবেষণা-পত্র

ইলেকট্রোনেগেটিভিটি

সুকুমার গুপ্ত * ও অমলকুমার গুঁই *

মৌলের ইলেকট্রোনেগেটিভিটির মান নির্ণয়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানী বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। এঁদের মধ্যে লাইনাস পাউলিঙ্, এ্যালরেড-রোকো, মুলিকেন, লিটল্-জোনস্ ও স্যানডারসানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমাদের আলোচ্য এই পদ্ধতিতে হ্যালোজেন পরমাণুর সঠিক ইলেকট্রন আসক্তি বা অ্যাফিনিটির সঙ্গে ঐ গোষ্ঠীর পরমাণুকরণ শক্তি (Atomization energy)-র সম্পর্ক লক্ষ্য করা হয়েছে। দেখা যায়, ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি (E.A) পরমাণুকরণ শক্তির (A.E) সমানুপাতিক।

অর্থাৎ E.A ∝ A E
(ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি) (পরমাণুকরণ শক্তি)

$$\therefore \quad E.A = K.(A.E) \ldots\ldots(1)$$ (যেখানে K একটি আনুপাতিক ধ্রুবক)

অথবা $$\frac{E.A}{K} = A.E \ldots\ldots(2)$$

'K' র মান নির্দিষ্ট মৌলের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট। এই ধ্রুবক 'K'কে লেখকরা মৌলের ইলেকট্রোনেগেটিভিটি হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। হ্যালোজেনের মৌলগুলির ক্ষেত্রে K-র মান অর্থাৎ ইলেকট্রোনেগেটিভিটির মান ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি ও পরমাণুকরণ শক্তির মান থেকে নির্ণয় করা যেতে পারে।

	E.A. (e.v.)	A.E. (e.v.)	E.N
F	3·45	0·82	4·20
Cl	3·61	1·24	2·91
Br	3·36	1·16	2·90
I	3·06	1·10	2·79

অ্যালরেড ও রকোর ইলেকট্রোনেগেটিভিটি স্কেল থেকে আমরা দেখি যে, ইলেকট্রোনেগেটিভিটিকে পরমাণুর নিউক্লিয়াস ও ইলেকট্রনের মধ্যে আকর্ষণ বল মনে করা হয়েছে। অর্থাৎ ইলেকট্রোনেগেটিভিটি,

$$K = \frac{Z_{eff}.e^2}{r^2}$$ যেখানে,

Zeff=কার্যকরী নিউক্লিয় আধান, e=ইলেকট্রনের আধান
r =নিউক্লিয়াস ও ইলেকট্রনের মধ্যবর্তী দূরত্ব।

* বঙ্গবাসী সান্ধ্য কলেজ, কলিকাতা-9
* রসায়ন বিভাগ, সিটি কলেজ, কলিকাতা-9

1নং সমীকরণ থেকে প্রাপ্ত K-র মান হ্যালোজেনগুলির $Zeff/r^2$-র মানের বিপরীতে বসালে একটি সরল রেখাচিত্র পাওয়া যায় (1নং রেখাচিত্র পাশে দেওয়া হল)।

ন্যূনতম বর্গের পদ্ধতির (Least square method) সাহায্যে উক্ত সরলরেখার নতি (slope)=0·343 এবং y অক্ষের ছেদ মান (intercept)=0·925 দেখা যায়।

$$\text{অতএব } K = 0{\cdot}343\ \frac{Zeff}{r^2} + 0{\cdot}925 \quad\ldots\ldots(3)$$

এই সমীকরণটিতে সাম্প্রতিককালে প্রাপ্ত ইলেকট্রনীয় বিন্যাস ও সমযোজী ব্যাসার্ধ সমূহের মানকে ব্যবহার করে 1নং তালিকায় বিভিন্ন মৌলের ইলেকট্রোনেগেটিভিটির মান নির্ণয় করা হয়েছে।

1নং রেখাচিত্র

1নং তালিকা

পরমাণু ক্রমাঙ্ক (Atomic No.)	সংকেত Symbol	(Zeff) মৌল	r °A	ইলেকট্রো নেগেটিভিটি পাউলিং স্কেল	আলোচিত স্কেল	অ্যালরেড-রকো স্কেল	পরমাণু ক্রমাঙ্ক (Atomic No.)	সংকেত Symbol	(Zeff) মৌল	r °A	ইলেকট্রো নেগেটিভিটি পাউলিং স্কেল	আলোচিত স্কেল	অ্যালরেড-রকো স্কেল
1	H	0·7	0·38	2·1	2·59	2·48	39	Y	2·65	1·80	1·2	1·20	1·11
3	Li	0·95	1·52	1·0	1·07	0·97	40	Zr	2·80	1·57	1·4	1·32	
4	Be	1·60	1·11	1·5	1·37	1·47	41	Nb	2·45	1·41	1·6	1·35	
5	B	2·25	0·88	2·0	1·92	2·01	42	Mo	2·60	1·36	1·8	1·41	
6	C	2·90	0·77	2·5	2·60	2·5	43	Tc	2·75	1·30	1·9	1·48	
7	N	3·55	0·75	3·0	3·09	3·07	44	Ru	2·90	1·33	2·2	1·49	
8	O	4·20	0·74	3·5	3·55	3·5	45	Rh	3·05	1·34	2·2	1·51	
9	F	4·85	0·72	4·0	4·13	4·1	46	Pd	2·70	1·38	2·2	1·41	
11	Na	1·85	1·86	0·9	1·11	1·01	47	Ag	3·35	1·44	1·9	1·48	1·42
12	Mg	2·50	1·60	1·2	1·26	1·23	48	Cd	4·00	1·49	1·7	1·54	1·46
13	Al	3·15	1·43	1·5	1·45	1·47	49	In	4·65	1·62	1·7	1·53	1·49
14	Si	3·80	1·17	1·8	1·88	1·74	50	Sn	5·30	1·40	1·8	1·85	1·72
15	P	4·45	1·10	2·1	2·19	2·06	51	Sb	5·95	1·41	1·9	1·95	1·82
16	S	5·10	1·04	2·5	2·54	2·44	52	Te	6·60	1·37	2·1	2·13	2·01
17	Cl	5·75	1·00	3·0	2·90	2·83	53	I	7·25	1·33	2·5	2·33	2·21
19	K	1·85	2·31	0·8	1·04	0·91	55	Cs	1·85	2·62	0·7	1·02	0·86
20	Ca	2·50	1·97	1·0	1·15	1·04	56	Ba	2·50	2·17	0·9	1·11	0·97
21	Sc	2·65	1·60	1·2	1·28	1·20	57	La	2·65	1·88	1·1	1·18	1·08
22	Ti	2·80	1·46	1·5	1·38	1·32	72	Hf	2·80	1·57	1·3	1·32	
23	V	2·95	1·31	1·6	1·52	1·45	73	Ta	2·95	1·43	1·5	1·42	
24	Cr	2·60	1·25	1·6	1·50	1·56	74	W	3·10	1·37	1·7	1·49	
25	Mn	3·25	1·29	1·5	1·60	1·60	75	Re	3·25	1·37	1·9	1·52	
26	Fe	3·40	1·26	1·8	1·66	1·64	76	Os	3·40	1·34	2·2	1·57	
27	Co	3·55	1·25	1·8	1·70	1·70	77	Ir	3·55	1·35	2·2	1·59	
28	Ni	3·70	1·24	1·8	1·75	1·75	78	Pt	3·20	1·38	2·2	1·50	
29	Cu	3·35	1·28	1·9	1·63	1·75	79	Au	3·35	1·44	2·4	1·48	
30	Zn	4·00	1·33	1·6	1·70	1·66	80	Hg	4·00	1·49	1·9	1·54	
31	Ga	4·65	1·22	1·6	2·00	1·82	81	Tl	4·65	1·71	1·8	1·47	
32	Ge	5·30	1·22	1·8	2·15	2·02	82	Pb	5·30	1·75	1·8	1·52	
33	As	5·95	1·21	2·0	2·32	2·20	83	Bi	5·95	1·46	1·9	1·88	
34	Se	6·60	1·17	2·4	2·58	2·48	84	Po	6·60	1·40	2·0	2·08	
35	Br	7·25	1·14	2·8	2·84	2·74	85	At	7·25	1·40	2·2	2·19	
37	Rb	1·85	2·44	0·8	1·03	0·89	87	Fr	1·85	2·70	0·7	1·01	
38	Sr	2·50	2·15	1·0	1·11	0·99	88	Ra	2·50	2·20	0·9	1·10	
							89	Ac	2·65	2·00	1·1	1·15	

উপসংহার

হাইড্রোজেন ও কার্বনের সমান ইলেকট্রোনেগেভিটি মান এদের মধ্যে দুর্বার আকর্ষণ নির্দেশ করে।

পাউলিং-এর পদ্ধতিতে প্রতিটি মৌলের ইলেকট্রো-নেগেটিভিটি অপেক্ষাকৃত দুরুহ গানিতিক পদ্ধতিতে নির্ণয় করতে হয়। অ্যালরেড—রোকো পাউলিং-এর মানগুলির উপর ভিত্তি করে সেগুলিকে আরও পরিমাজিত করেছেন। এই রচনায় ব্যবহৃত সমীকরণ (1নং) অতি সরল ও শুধু পরমাণুকরণ শক্তি ও ইলেকট্রন অ্যাফিনিটির মান জানা থাকলেই ইলেকট্রোনেগেটিভিটি পাওয়া যায়। কিন্তু হ্যালোজেন ছাড়া অন্য মৌলের সঠিক ইলেকট্রন অ্যাফিনিটির মান আজও জানা যায় নি। তাই 3নং সমীকরণ ব্যবহার করে অবশিষ্ট অন্যান্য মৌলের ইলেকট্রোনেগেটিভিটি স্কেল প্রকাশ করা হয়েছে।

কেবলমাত্র দ্বিপরমাণুক অণুর ক্ষেত্রে 1নং সমীকরণ প্রযোজ্য। কিন্তু বেশীর ভাগ মৌল কঠিন ও তরল অবস্থায় থাকে। সেইজন্য ইলেকট্রন অ্যাফিনিটির পরম মান পাওয়া সম্ভব নয়। 2নং সমীকরণে 1নং এবং 2নং তালিকায় দেওয়া লেখকের ইলেকট্রোনেগেটিভিটি ও ইলেকট্রনঅ্যাফিনিটি স্কেল ব্যবহার করে যে কোন মৌলের পরমাণুকরণ শক্তি অতি সহজেই নির্ণয় করা হয়েছে।

2নং তালিকা

মৌলের নীচে প্রথম ইলেকট্রন আসক্তি বা অ্যাফিনিটির স্কেল এবং তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে মৌলের পরমাণুকরণ শক্তির মান।

IA	IIA	IIIA	IVA	VA	VIA	VIIA	VIII			IB	IIB	IIIB	IVB	VB	VIB	VIIB
[2·25] H 5·83																
[1·66] Li 1·78	[3·32] Be 4·55											[6·11] B 11·73	[7·44] C 19·34	[4·85] N 14·99	[2·56] O 9·09	[0·82] F 3·39
[1·12] Na 1·24	[1·54] Mg 1·94											[3·36] Al 4·87	[4·55] Si 8·55	[3·46] P 7·58	[2·47] S 6·27	[1·24] Cl 3·60
[0·93] K 0·97	[1·83] Ca 2·10	[3·58] Se 4·54	[4·88] Ti 6·73	[5·32] V 8·09	[4·17] Cr 6·18	[2·89] Mn 4·62	[illegible] Fe 7·19	[4·40] Co 7·48	[4·39] Ni 7·68	[3·5?] Cu 5·74	[1·35] Zn 2·30	[2·82] Ga 5·64	[3·90] Ge 8·39	[3·01] As 6·98	[2·14] Se 5·52	[1·16] Br 3·29
[0·85] Rb 0·87	[1·69] Sr 1·88	[4·49] Y 5·30	[6·..] Zr 8·35	[7·70] Nb 10·40	[6·83] Mo 9·63	[6·72] Tc 9·95	[6·24] Ru 9·30	[5·77] Rh 8·71	[4·07] Pd 5·74	[2·96] Ag 4·38	[1·16] Cd 1·79	[2·52] In 3·85	[3·12] Sn 5·77	[2·72] Sb 5·30	[2·02] Te 4·30	[1·10] I 2·56
[0·81] Cs 0·83	[1·81] Ba 2·01	[4·32] La 5·10	[7·78] Hf 9·61	[8·10] Ta 11·50	[8·67] W 12·72	[8·05] Re 12·24	[6·94] Os 10·90	[6·50] Ir 10·34	[5·85] Pt 8·78	[3·67] Au 5·43	[0·64] Hg 0·99	[1·86] Tl 2·73	[2·03] Pb 3·09	[2·06] Bi 3·87		

কিশোর বিজ্ঞানীর আসর

অধ্যাপক যতীন্দ্রনাথ ভড়

সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ ও অতনু ঘোষ *

আজ থেকে পাঁচ বছর আগে 1980 খৃস্টাব্দের 20শে জুন অধ্যাপক যতীন্দ্রনাথ ভড়ের দেহাবসান হয়। তাঁর স্মৃতিচারণে প্রথমে একটি ছোট গল্পের কথা মনে পড়ছে। একবার মোটর গাড়ীর আবিষ্কারক হেনরী ফোর্ডের সঙ্গে

অধ্যাপক যতীন্দ্রনাথ ভড়
জন্ম : 20শে জুলাই, 1911 মৃত্যু : 29শে জুন, 1980

ইলেকট্রিক বাল্ব আবিষ্কারক এডিসনের দেখা হয়। অভিনন্দন জানিয়ে ফোর্ড এডিসনের কানের কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন (এডিসন কানে কম শুনতেন), "আপনি পৃথিবীতে আলোর নিশান দেখিয়েছেন।" এডিসন তখন ফোর্ডকে বললেন, "আপনিই বা কম কিসের ? আপনি তো পৃথিবীকে গতি দিয়েছেন।"

এই দুই বিশ্ববন্দিত বিজ্ঞানীর কথাগুলি থেকে যৌথ প্রচেষ্টার সফলতার কথা বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়। এডিসন ও ফোর্ডের উদ্যোগে উদ্ভব হল আলো ও গতি। এনে দিল বিজ্ঞানের মহাসফলতা। পৃথিবী উন্নত হল।

অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র ও অধ্যাপক যতীন্দ্রনাথ ভড়ের যৌথ প্রচেষ্টায় উদ্ভব হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেডিও ফিজিক্স ও ইলেকট্রনিক্স ইনস্টিটিউট। এর পরিকল্পনা করেন অধ্যাপক মিত্র। অধ্যাপক ভড় সেই আলোক প্রজ্বলিত করে এই বিজ্ঞান মন্দির বাস্তবে রূপ দেন। তাঁদের পরিকল্পনা ছিল না পিরামিডের মত বিরাট ন্যাশনাল ফিজিক্যাল লেবরেটরী গড়ে তোলা। ছোট্ট নিখুঁত তাজমহলের মত বিজ্ঞান মন্দির স্থাপনা করাই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন এর উন্নতির জন্যে—তাকে সুন্দর ও আরও ভাল করে তোলার জন্য। এই বিজ্ঞান মন্দির স্থাপনার পর অনেক বছর কেটেছে। স্মৃতির পর্দায় সে সব দিনের ছবি ঝাপ্‌সা হয়ে এসেছে। এখানে গবেষণার ফলে বিজ্ঞানের অনেক রহস্যের উদ্ঘাটন হয়েছে। আমরা সকলেই আশা করব যে ভবিষ্যতে এর আরও উন্নতি হবে। আরও বেশী ও সুদূরপ্রসারী বৈজ্ঞানিক গবেষণার উৎস হবে এই বিজ্ঞান মন্দির। কিন্তু একটা কথা আমাদের সবসময়ই মনে রাখতে হবে—এর স্রষ্টা হলেন অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র ও অধ্যাপক যতীন্দ্রনাথ ভড়।

অধ্যাপক ভড়ের জন্ম হয় চন্দননগরে 1911 খৃস্টাব্দে

* ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

20শে জুলাই। 1934 খৃস্টাব্দে পদার্থ বিষয়ে এম. এস. সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি অধ্যাপক মিত্রের কাছে উচ্চ বায়ুমণ্ডল ও আয়নিত অঞ্চল বিষয়ে গবেষণা করেন। মাত্র 28 বছর বয়সে 1937 খৃস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে D. Sc. ডিগ্রি পান। এর পরে কিছুদিনের জন্য ভারতীয় কাউন্সিল অফ সাইন্টিফিক ও ইনডাস্ট্রিয়াল রিসার্চের রেডিও রিসার্চ কমিটির কর্মসচিব হন। 1938 খৃস্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের লেক্‌চারার হন। 1949 খৃস্টাব্দে রিডার পদে উন্নীত হন। পরের বছর যখন রেডিও ফিজিক্স ও ইলেট্রনিক্স বিভাগ খোলা হয়, তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তাঁকে ঐ বিভাগের শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেন। অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র 1957 খৃস্টাব্দে ফিজিক্সের স্যার রাসবিহারী ঘোষ অধ্যাপক পদ থেকে অবসর নেবার পর অধ্যাপক ভড় ঐ উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি রেডিও ফিজিক্স ও ইলেকট্রনিক্সের প্রধান অধ্যাপক হয়ে ঐ বিজ্ঞান মন্দিরের সকল কাজ—পঠন, পাঠন, গবেষণা ও উন্নতির ভার নেন। 1961 খৃস্টাব্দে তিনি ফ্যাকালটি অফ্ টেকনোলজি-এর ডিন হন। পূর্বে ওয়ারলেস গবেষণাগারে ও পরে রেডিও ফিজিক্স ও ইলেকট্রনিক্স ইনস্টিট্যুটে উচ্চ ধরনের কাজের জন্য 1963 খৃস্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন যখন ঐ বিজ্ঞান মন্দিরকে সেন্টার অফ্ অ্যাডভান্সড্ স্টাডিজ ইন আয়োনোস্ফিয়ার করেন, তখন অধ্যাপক ভড় ঐ সেন্টারের ডিরেক্টার হন। ঐ পদ থেকে 1976 খৃস্টাব্দে 30শে জুন তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

আয়নমণ্ডল বিষয়ে ভারতে যাঁরা প্রথম গবেষণা করেন, অধ্যাপক ভড় ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। গত মহাযুদ্ধের পর অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের কমনওয়েলথ অফ্ সায়েন্টিফিক ও ইনডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ অরগানাইজেশন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ওয়ারলেস গবেষণার জন্য একটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। অধ্যাপক মিত্র এই যন্ত্রের কার্যকলাপ জানবার জন্য ও কলিকাতায় পাঠাবার ব্যবস্থা করতে অধ্যাপক ভড়কে অস্ট্রেলিয়া পাঠান। কাউন্সিল অফ্ সায়েন্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ-এর সহযোগিতায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হরিণঘাটাতে একটি আয়োনোস্ফিয়ার ফিল্ড স্টেশন স্থাপন করেন। এই স্টেশানে 1955 খৃস্টাব্দ থেকে প্রত্যহ ডেটা সংগ্রহ করা হয়। অধ্যাপক ভড় 25 বৎসর ধরে এই ফিল্ড স্টেশনের কাজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

অধ্যাপক ভড় ভারতীয় ন্যাশনাল সায়েন্স অ্যাকাডেমির ফেলো এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ও ভারতীয় সায়েন্স অ্যাসোসিয়েসনের কার্যকরী সভার সভ্য ছিলেন। এছাড়াও তিনি ইনস্টিটিউট অফ ইন্জিনিয়ার (ভারতীয়), ইনস্টিটিউট অফ ইলেকট্রনিক ও রেডিও ইন্জিনিয়ারস্ (লণ্ডন)-এর ফেলো ছিলেন। 1965 খৃস্টাব্দ থেকে 1969 খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতীয় কাউন্সিল অফ আই. ই. আর. ই-এর সভাপতি ও 1970 খৃষ্টাব্দে আই. ই. আর. ইর (লণ্ডন) সহসভাপতি হন। পরে তিনি ভারতীয় ন্যাশনাল কমিটির ও ইন্টার-ন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ রেডিও সায়েন্স-এর সভ্য হন। এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হিসাবে 1972 খৃস্টাব্দে URSI-এর 17 তম জেনারেল অ্যাসেম্লির পরিচালনা করেন। তিনি রেডিও সায়েন্স, ন্যাশনাল ফিজিক্যাল লেবরেটরীর সায়েন্টিফিক অ্যাডভাইসারী কমিটির ও ইলেকট্রনিক মেটিরিয়াল ও কম্পোনেন্ট রিসার্চ-এর সভ্য হন। 1977 খৃস্টাব্দে অধ্যাপক ভড় ভারতীয় সায়েন্স কংগ্রেসের ইন্জিনিয়ারিং শাখার সভাপতি হন। ভারতীয় জার্নাল অফ রেডিও ও স্পেস ফিজিক্স এবং ভারতীয় জার্নাল অফ ফিজিক্স ও আরও অনেক বিজ্ঞান পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

আয়নমণ্ডল ও অধ্যাপক ভড়ের গবেষণা

ডঃ ভড়ের গবেষণার ক্ষেত্র বলতে মুখ্যতঃ উচ্চ বায়ুমণ্ডলে আয়নিত অঞ্চলগুলি বুঝায়। এই অংশগুলিকে একসঙ্গে আয়নমণ্ডল বলা হয়। দূরপাল্লার বেতার সংযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে আয়নমণ্ডল থেকে বেতার তরঙ্গের প্রতিফলন বা প্রতিসরণ ঘটান হয়। ডঃ ভড়ের কাজের সঙ্গে পরিচিত হতে গেলে আমাদের জানতে হবে কিভাবে আয়নমণ্ডলের মাধ্যমে বেতার তরঙ্গ যোগাযোগ করা হয়—নিম্নে এটি সংক্ষেপে বলা হল।

পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তনের কথা ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে স্টুয়ার্ট ও পরে চ্যাপম্যান, ফেরারো ও অন্যান্য বিজ্ঞানিগণ বলেন যে, উচ্চ বায়ুমণ্ডলের মধ্যে আয়নিত অঞ্চল আছে। ঐ বক্তব্যের সূত্র ধরে ম্যাগনিটো-স্পিয়ার, ম্যাগনিটোপস্, সৌরবায়ু ইত্যাদির উপস্থিতির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। 1887 খৃস্টাব্দে হার্জ উচ্চধরণের গবেষণার সাহায্যে প্রমাণ করেন যে, স্পার্কের মধ্যবর্তী ফাঁক দিয়ে উত্তেজিত ডাইপোল থেকে তরঙ্গর সৃষ্টি হয়। সেই তরঙ্গগুলি স্বভাবে তড়িচ্চুম্বকীয় ও এদের সঙ্গে আলোক তরঙ্গের সাদৃশ্য আছে। কিন্তু সংবাদ আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে এই তরঙ্গগুলির প্রয়োজনীয়তার কথা মেনে নেওয়া গেল না। কারণ হার্জের গবেষণা সাধারণভাবে এমন কতকগুলি মাইক্রোতরঙ্গের ($\lambda = 1\text{-}10$ সেমির)

মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল যা আয়নমণ্ডলের মাধ্যমে প্রতিফলিত বা প্রতিসৃত হয় না। এই তরঙ্গগুলি মাটির উপর দিয়ে খুব কম দূর যেতে পারে। এই কারণে এই গবেষণা বেশীদূর এগোল না।

1901 খৃস্টাব্দে এই বিষয়ে এক নতুন আলোড়ন সৃষ্টি করলেন মার্কনি। তিনি মর্স কোডের 'এস' অক্ষরটি ইংলণ্ড থেকে অতলান্তিক মহাসাগরের উপর দিয়ে নিউফাউণ্ডল্যান্ডে পাঠাতে সক্ষম হলেন। পৃথিবীর গোলাকৃত পথের উপর দিয়ে সংযোগ স্থাপনের ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে নানান বিতর্কের সৃষ্টি হল। সমারফিল্ড ও অন্যান্য বিজ্ঞানিগণ পৃথিবীপৃষ্ঠ সংলগ্ন তরঙ্গ গোলাকৃত পথের উপর দিয়ে যাওয়ার এক বিচ্ছুরণ সূত্র দিলেন। কিন্তু 1919 খৃস্টাব্দে ওয়াটসন যুক্তি দিয়ে ভুল প্রমাণ করলেন। তিনি বললেন যে, উচ্চবায়ুমণ্ডলের বিদ্যুতবাহী অঞ্চল থেকে এই তরঙ্গগুলি প্রতিফলিত হয়।

1912 খৃস্টাব্দে, ইক্লিস অপেক্ষাকৃত কমজোর আয়নিত স্থানের প্রতিসরাঙ্ক ও শোষণ সহজ হিসাব করে দেখান যে, আয়নের ঘনত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রতিসরাঙ্ক কমতে থাকে। এইভাবে আয়নমণ্ডলের ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় আয়নের ঘনত্ব উচ্চতার সঙ্গে কমতে থাকার জন্য আপতিত রশ্মি অভিলম্ব থেকে দূরে সরতে থাকে ও পূর্ণ প্রতিফলিত হয়ে আবার পৃথিবীর দিকে ঘুরে আসে।

পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের উপর আয়নিত অঞ্চলের মাধ্যমে বেতার তরঙ্গের সংযোগ হলে যে প্রক্রিয়া হয় সেগুলি এ্যাপলটন ও অন্যান্য বিজ্ঞানিগণ আবিষ্কার করেন। লরেঞ্জের ইলেকট্রন তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে 1932 সালে ম্যাগনিটোআয়নিক তত্ত্ব গড়ে তোলা হয়। এর সাহায্যে দেখা যায় যে স্ফটিকের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক রশ্মির সংঘটনের মত চৌম্বক ক্ষেত্রের উপস্থিতিতে যে তরঙ্গ আয়নিত ক্ষেত্র দিয়ে যায়, তা দু-ভাগে বিভক্ত হয়। এগুলি হল 'সাধারণ' ও 'অসাধারণ' তরঙ্গ। এই দুই-রকমের তরঙ্গের সঞ্চালনের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। আলোক তরঙ্গের ক্ষেত্রে তরঙ্গের অভিলম্ব ও তরঙ্গের দিক সবসময় এক থাকে। সাধারণ তরঙ্গের ক্ষেত্রে এক ও অসাধারণ তরঙ্গের ক্ষেত্রে তফাৎ হয়। কিন্তু ম্যাগনিটোআয়নিক ক্ষেত্রে আলোক তরঙ্গের বেলাতেও দুইদিক সমান নাও হতে পারে। যখন চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের উপস্থিতিতে নিরপেক্ষ বস্তুর সঙ্গে ইলেকট্রনের সংঘর্ষণ হয় তখন লম্বভাবে আপতনের ক্ষেত্রে $mu = 0$ ও তির্যক আপতনের ক্ষেত্রে প্রতিসরাঙ্ক mu-এর সঙ্গে উচ্চতার সম্পর্ক $d_u/d_z = \infty$ কোনটাই প্রযোজ্য নয়। যদি সংঘটনের হারের মান কম হয়, তখন পূর্ণ প্রতিফলনের কোন নিয়মই খাটে না। কিন্তু যদি d_u/d_x বেশ বড় হয়, তাহলে প্রচুর পরিমাণে প্রতিফলন হতে পারে।

এই রশ্মিতত্ত্ব HF, VHF, MF এমনকি LF তরঙ্গের আয়নমণ্ডলের মাধ্যমে সঞ্চালনের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে VLF তরঙ্গের ক্ষেত্রে পুরোপুরি প্রযোজ্য নয়। এর ক্ষেত্রে ওয়েভগাইড মোড সঞ্চালন প্রযোজ্য।

এ্যাপলটন ও হার্ট্রি ধরে নিয়েছিলেন যে, সংঘর্ষণের কম্পাঙ্কের সঙ্গে ইলেকট্রনের গতির কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু ফেল্প ও পার্কের গবেষণার ফলে এটি ভুল প্রমাণিত হয়। তখন দেখা গেল যে ঘর্ষণ কম্পাঙ্ক ইলেকট্রনের শক্তির সঙ্গে সরলভেদে আছে। 1960 খৃস্টাব্দে সেন ও উইলার জটিল প্রতিসরাঙ্ক বার করার জন্যে একটি সাধারণ সমীকরণ দিলেন।

গত বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীর উপরে অবস্থিত যন্ত্রপাতির সাহায্যে আয়নমণ্ডল সম্পর্কিত গবেষণার কাজ অনেকদূর এগিয়ে গেছে। একে বলা হয় ইনকোহেরেন্ট বিচ্ছুরণ। এছাড়া গতযুদ্ধে জার্মানীর তৈরী V-2 রকেটবাহী যন্ত্র ভূপৃষ্ঠ থেকে অনেক উপরে নিয়ে গিয়ে গবেষণা শুরু হল। এর থেকেও আয়নমণ্ডলের গবেষণার অনেক উন্নতি হয়েছে। পরবর্তীকালে মহাকাশযান এই কাজে ব্যবহৃত হয়েছে।

আয়নমণ্ডলের সম্বন্ধে গবেষণা করতে গেলে মূলতঃ দুটি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়—কি উপায়ে আয়নমণ্ডল তৈরি হয় ও কেমন করে বেতার তরঙ্গ আয়নমণ্ডল থেকে প্রতিফলিত হয়ে আবার পৃথিবীপৃষ্ঠে ফিরে আসে ডঃ ভড় এই দুই সমস্যার উপর গবেষণা করেছিলেন। তিনি দেখিয়েছিলেন যে, আয়নমণ্ডলের E-স্তরটিতে সৌরশক্তি পড়ে আয়নিত অক্সিজেন অণু গঠিত হয়। বায়ুমণ্ডলের যে স্থানে এই আয়ন তৈরি হয় ঐ স্থানে সৌরশক্তির পড়ে আবার অক্সিজেন অণু দুটি অক্সিজেনে পরমাণুতে বিভক্ত হয়। এইজন্য উচ্চতার সঙ্গে দ্রুতভাবে কমতে থাকে।

ডঃ ভড় আরও দেখান যে E-স্তরের উপর যে F_1 স্তরটি আছে, সেটি নাইট্রোজেন অণু ও তার উপরে যে F_2 স্তরটি অবস্থিত, তা অক্সিজেন পরমাণু আয়নিত হয়ে গঠিত হয়।

সবচেয়ে নীচে যে D স্তর অবস্থিত সে সম্বন্ধে গবেষণার ফলে তিনি প্রমাণ করেন যে, সেটি সৌরশক্তির উপস্থিতিতে অক্সিজেন আয়নিত হয়ে গঠিত হয়।

বর্তমানে বিজ্ঞানিগণের মত এই স্তরটি সৌর X রশ্মির উপস্থিতিতে অক্সিজেন ও NO আয়নিত হয়ে তৈরি হয়েছে।

বায়ুমণ্ডল আয়নিত হওয়া সম্বন্ধে তিনি আরও অনেক গবেষণা করেন। তিনি দেখান যে উল্কা যখন খুব দ্রুতগতিতে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে তখন অণুগুলি আয়নিত হয়। তার ফলে বেতার তরঙ্গ ঐ অঞ্চল থেকে প্রতিফলিত হয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসতে।

স্বনামধন্য শিক্ষক ও ফরাসীভাষায় দক্ষতা

অধ্যাপক ভড় ছিলেন একজন স্বনামধন্য শিক্ষক। তাঁর বলার ভঙ্গি ছিল সহজ ও সাবলীল। তিনি কোন ভাষণ দেবার আগে বার বার করে লেখার খসড়া করতেন, যাতে সেটি সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত ও সহজবোধ্য হয়। শুধুমাত্র ইংরাজীতে নয় ফরাসী ভাষায়ও তাঁর খুব ভাল দখল ছিল। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে। একবার অধ্যাপক ইরেন কুরি ও অধ্যাপক জোলিও কুরি কলকাতায় এসেছিলেন। আপনারা সকলে জানেন যে এঁরা বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী মাদাম কুরির কন্যা ও জামাই। এঁদের দু-জনকেই নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়। কলিকাতায় এঁদের অভ্যর্থনা করেন তখনকার পদার্থবিভাগের পালিত অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা। । অধ্যাপক সাহার অনুরোধে এঁরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ দিতে রাজী হন। প্রথমে অধ্যাপক ইরেন কুরি নিউক্লিয়ার ফিজিক্স বিষয়ে ইংরাজীতে ভাষণ দিলেন। কিন্তু তাঁর ইংরাজীতে খুব বেশী ফরাসী টান থাকায় বিশেষ কিছু বোঝা গেল না। তারপর জোলিও কুরির ভাষণ দেবার কথা। তিনি জানালেন যে তিনি ফরাসী ভাষায় ভাষণ দিবেন। আস্তে আস্তে বলবেন যাতে ইংরাজীতে অনুবাদ করা সহজ হয়। সকলে অধ্যাপক ভড়ের খোঁজ করতে লাগলেন, কারণ ফরাসী ভাষায় তাঁর জ্ঞানের কথা কারোর অজানা ছিল না। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেদিন তিনি বিশেষ কাজে আটকে পড়ে আসতে পারেন নি। আমরা শ্রোতারন্দ ভাবলাম অধ্যাপক ইরেন কুরির বক্তৃতাতো ফরাসী টানের জন্য বোঝা গেল না। অধ্যাপক জোলিও কুরি ফরাসী ভাষায় ভাষণ দেবেন। অধ্যাপক ভড় উপস্থিত নেই। তাঁর ভাষণ ইংরাজীতে অনূদিত হবে না। সুতরাং তাঁরও ভাষণ বোঝা যাবে না। বক্তৃতা ঘরে একটা থমথমে ভাব এল। এ ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। শেষ পর্যন্ত অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু ফরাসী থেকে ইংরাজীতে অনুবাদ করতে রাজী হন। তিনি অত্যন্ত পটুতার সঙ্গে অনুবাদ করলেন। সকলেই খুব খুশী হল।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

আজ অধ্যাপক ভড়ের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে অনেক ছোট ছোট কথা মনে পড়ছে। হয়ত একদিন এ সব কথার বিশেষ মূল্যই ছিল না। কিন্তু আজ এসবই দুর্লভ স্মৃতিতে দাঁড়িয়েছে। আমার একদিনের কাজের কথা বলছি। এতে স্পষ্ট দেখা যাবে যে, আমাদের কাজের শিক্ষাগুরু ছিলেন অধ্যাপক মিত্র। আর অধ্যাপক ভড় ছিলেন সেই কাজগুলির সংযোজক। প্রতিটি কাজেই আমরা তাঁর কাছ থেকে উৎসাহ পেয়েছি। মনে পড়ে সকালবেলা আমি অধ্যাপক মিত্রের বাড়ী যেতাম। তাঁর বাড়ী ছিল 9নং হিন্দুস্থান রোডে। দু-তিন ঘন্টা ধরে চলত 'আপার অ্যাটমস্ফিয়ার' বই লেখার কাজ। সকালের বই লেখার অংশগুলি অধ্যাপক ভড়কে দিতাম তিনি সেগুলো টাইপ করার ব্যবস্থা করে দিতেন। অধ্যাপক মিত্রের নির্দেশে গবেষণার কাজ চলতো বিকাল পাঁচটা অবধি। তারপর সপ্তাহে 2/3 দিন আয়োনোস্ফিয়ার রেকর্ডারের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ কাজ চলতো। তাই কোন কোন দিন আমাদের সারারাত কলেজে থাকতে হতো। এই কাজে অধ্যাপক ভড় ও ডঃ শংকর বড়াল ছিলেন আমাদের নির্দেশক। রাত্রিতে থাকাকালীন মধ্যে মধ্যে বেশ কয়েকটা মজার ঘটনা ঘটত। এই সময়ের একটা দিনের কথা খুব মনে আছে। সেদিনও রোজকার মতো আমরা রাত্রিতে খাবার তৈরিতে ব্যস্ত ছিলাম। অন্যদিন আমরা যে পরোটা তৈরি করতাম তা ভাল হত না। অনেক চেষ্টা করেও কোন উন্নতি করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় সেদিন খুব ভাল পরোটা তৈরি হল। বৈজ্ঞানিক ধাঁচে গড়া আমাদের মন কোন কিছুকেই সহজে মানতে চায় না। সব কিছুর অনুসন্ধান করতে চায়। ফলে এই সামান্য ব্যাপারও আমাদের চোখ এড়ালো না। একটু ভাল করে নিরীক্ষণ করে আমরা দেখলাম যে ঘনত্ব যদি পুরো উপরভাগে সমান হয়, তবেই পরটা ভাল হয়। স্কেলিপার যন্ত্রের সাহায্যে ঘনত্ব মেপে দেখলাম যে আমাদের ধারণাই ঠিক। এ কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার নয়। কিন্তু এতে যে আমরা আনন্দ পেয়েছিলাম, তা কোন আবিষ্কারের আনন্দের থেকে কোন অংশেই কম ছিল না।

পরের দিন অধ্যাপক ভড়কে গতরাত্রের কাজের বিবৃতি দেবার সময় আমাদের আবিষ্কারের কথাও বললাম। তিনি খুব হাসতে লাগলেন ও বললেন "খুব বড় আবিষ্কার হয়েছে।"

অধ্যাপক ভড়ের চরিত্রে দৃঢ়তা আর নম্রতার এক অদ্ভুত সমন্বয় দেখেছিলাম যা পরবর্তীকালে খুব কম লোকের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছি। তিনি যে কোন অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে বিন্দুমাত্র ইতঃস্তত করতেন না। সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য। তার তাঁর বিচার ছিল সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ।

তাঁর চরিত্রের আর এক বিশেষ দিক, যা তাঁকে সবার থেকে আলাদা করেছিলো সে হলো তাঁর নিরহংকার স্বভাব। একটা ঘটনার কথা বলি। একবার অধ্যাপক ভড় ও আমি সিমলায় গিয়েছিলাম ভারতীয় ন্যাশনাল সায়েন্স অ্যাকাডেমির কাউন্সিলের অধিবেশনে যোগ দিতে। আমরা সিমলায় পেঁছিলাম অধিবেশন শুরু হওয়ার একদিন আগে। যে বাড়ীতে আমাদের অধিবেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল সেই বাড়ী আগে ভাইসরয়ের গ্রীষ্মাবাস ছিল। বসবাসকারীরা চলে গেলেও, এই বিরাট প্রাসাদ দেখলে মনে হয় এ যেন আজও রাজপ্রসাদ—ইতিহাসের কবল থেকে যেন ছিটকে বেরিয়ে গেছে। ঘরের ভিতর চললে, কথা বললে প্রতিধ্বনি ভেসে আসে দূর থেকে। যেদিকেই চাওয়া যায় অতীতের চিহ্নগুলি চোখের সামনে ভাসতে থাকে। সামনে বিরাট বাগান, তাতে নানান রকমের ফুল ফুটে আছে। ডানদিকে আর একটা বড় বাড়ি। শুনলাম এইখানে ছিল ভাইসরয়েরের সঙ্গে যারা দেখা করতে আসতেন তাদের বাসস্থান। আমরা ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়লাম 'ভাইসরয়ের' ও 'ভাইসরীনের' থাকবার ঘরে। ঠিক সেই সময় INSA অফিস থেকে একজন লোক এসে আমাদের থাকবার যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তার তালিকা দেখাল। আমাকে ঘর দেওয়া হয়েছে ডানদিকের বাড়ীতে। আমাদের সভাপতি ডক্টর কোটারী ও অধ্যাপক ভড়ের থাকার ব্যবস্থা হচ্ছিল 'ভাইসরয়র' 'ভাইসরীন'-এর ঘরে। কিন্তু অধ্যাপক ভড় বললেন 'ও ঘরটা তাঁদের জন্যই থাক না, আমি অন্য একটা ঘরে থাকবো'। যে ঘরটা তাঁর পছন্দ হল সে ঘরটা ছিল ঐ প্রসাদের নিতান্ত সাধারণ ও ছোট। পরে শুনেছিলান যে, ডক্টর কোটারীও নাকি ওঘরে থাকেন নি। বলেছিলেন, ও ঘরে থাকলে তাঁর বোধ হয় রাত্রিতে ঘুম হবে না।

পরিষদ সংবাদ

বিশ্বপরিবেশ দিবস উদ্‌যাপন

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে সত্যেন্দ্র ভবনে (পি-23 রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট কলিকাতা-6) 6ই জুন একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানের সভাপতির পদ অলংকৃত করেন বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক ডঃ জয়ন্ত বসু এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন বসু বিজ্ঞান মন্দিরের অধিকর্তা ডঃ বীরেন্দ্রবিজয় বিশ্বাস। পরিষদের কর্মসচিব ডঃ সুকুমার গুপ্ত অনুষ্ঠানের শুরুতে পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করেন। এরপর "সভ্যতার সঙ্কট—পরিবেশ তত্ত্বের প্রেক্ষাপটে" শীর্ষক 'রাজশেখর বসু স্মৃতি বক্তৃতা' প্রদান করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ নরেশচন্দ্র দত্ত।

তাঁর বক্তব্যের মূলকথা ছিল—প্রকৃতি প্রাণীকুলে খাদ্য-খাদক সৃষ্টি করে ও শৈত্য, উত্তাপ, প্লাবন ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে তার ভারসাম্য বজায় রাখছিল। কিন্তু মানুষ তার বুদ্ধিবলে ধ্বংস করেছে তার খাদককে, জয় করেছে প্রাকৃতিক দুর্যোগকে। ফলে কমে গেছে মৃত্যুহার এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হতে চলেছে। মানুষের চাহিদায় গড়ে উঠেছে শিল্পাঞ্চল, যানবাহন, তৈরি হয়েছে রাসায়নিক সার, কীটনাশক ঔষধ যার প্রতিটি পরিবেশের পক্ষে হয়েছে ক্ষতিকর এবং এইভাবেই হতে থাকে পরিবেশ দূষণ। এখন সব মানুষ পরিবেশকে বন্ধু মনে করে পরিবেশের উন্নতি সাধন করতে চাইলে তবেই এর প্রতিকার হতে পারে। প্রধান অতিথি তাঁর ভাষণে বলেন সমগ্র মানব জাতিকে পরিবেশ দূষণের কুফল সম্বন্ধে সচেতন করতে পারলে তবেই এর প্রতিরোধ হওয়া সম্ভব। সভাপতি তাঁর ভাষণে বলেন—সভ্যতার অগ্রগতিকে থামিয়ে রেখে পরিবেশ দূষণ বন্ধ করা যেতে পারে না, যাবে না। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গেই পরিবেশ দূষণের প্রতিকার করতে হবে। অনুষ্ঠানের শেষে অমূল্যধনদেব স্মৃতি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার পুরস্কার এবং টি. ভি. ও ফটোগ্রাফি প্রশিক্ষণে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

প্রতিবেদক—**কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়**

অমূল্যধনদেব স্মৃতি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ফল

প্রতিযোগিতার বিষয়—বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও পরিবেশ দূষণ।

1ম—মিতালী ঘোষ—একাদশ শ্রেণী। রেলওয়ে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, আলিপুর দুয়ার জংশন, জলপাইগুড়ি।

2য়—শুভজিৎ মিত্রমজুমদার, 7/33, বিজয়গড়, কলিকাতা-700 032

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বর্ণানুক্রমিক প্রথম ষাণ্মাসিক লেখকসূচী

জানুয়ারী থেকে জুন—1985

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বর্ণানুক্রমিক প্রথম ষাণ্মাসিক বিষয়সূচী

জানুয়ারী থেকে জুন—1985

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-700006 থেকে প্রকাশিত এবং গুপ্ত প্রেস 37/7, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-700009 থেকে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

আবেদন

1948 সাল থেকে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা বিষয়ে পরিকল্পিত ধ্যান ধারণা পরিষদ পালন করে আসছে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার প্রকাশনের মাধ্যমে। ইতিমধ্যে পরিষদ কিছু অমূল্য রচনা বাংলাভাষায় প্রকাশ করেছে। বর্তমান পত্রিকা প্রকাশনা ছাড়াও পরিষদ বিভিন্ন প্রকল্পে হাতে নিয়েছে যাতে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান মানসিকতার বিকাশ ঘটে। গ্রাম বাংলার পল্লীতে, আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে ও শহরের বস্তিতে, যেখানে বেশীর ভাগ মানুষ জ্ঞানের আলো থেকে এখনও বঞ্চিত, তাদের কাছে বিজ্ঞানের মঙ্গলময় রূপ তুলে ধরতে পরিষদ বদ্ধপরিকর। এইসব বিজ্ঞানভিত্তিক কর্মসূচীর রূপায়নে অর্থের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। অথচ পরিষদের দারুণ অর্থাভাব। তাই পরিষদ সরকার, বেসরকারী সংস্থা, ব্যবসায়ী ও সহৃদয় ব্যক্তির কাছে অর্থসাহায্যের আন্তরিক আবেদন জানাচ্ছে। সাধারণ মানুষের জন্য তৈরী আচার্য্য বসুর পরিষদ যে কোনও সামান্য দানও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করে অবহেলিত মানুষের স্বার্থে ব্যয় করবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে পরিষদে প্রদত্ত সর্বপ্রকার দান আয়করমুক্ত।

কর্মসূচি

1 সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান মানসিকতা সৃষ্টি করা এবং বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন গড়ে তোলা।

2 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকাকে সাধারণের নিকট আরও আকর্ষনীয় করে তোলা।

3. পরিষদের মাধ্যমে গ্রামবাংলার বিজ্ঞান ক্লাবগুলির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা এবং তাদের বিজ্ঞান ভিত্তিক জনহিতকর কাজে উৎসাহিত করা।

4. প্রতি বছরে পশ্চিম বাংলায় অন্ততঃ একবার বিজ্ঞান সম্মেলনের ব্যবস্থা করা।

5 গ্রামবাংলার বিভিন্ন মেলায় বিজ্ঞান ক্লাবগুলিকে নিয়ে পোস্টার প্রদর্শনী, বিজ্ঞানভিত্তিক সিনেমা, আলোচনা চক্র অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে বিজ্ঞান, জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করা।

6. বছরের শেষে বিজ্ঞান মেলার আয়োজন করা।

7. হাতে-কলমে কারীগরী বিদ্যা শিখিয়ে ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রী ও নাগরিকদের স্বনির্ভরশীল করা। ব্যয়ভার বহনের জন্য সামান্য অর্থের বিনিময়ে টি ভি, টেপরেকর্ডার, রেকর্ড-প্লেয়ার, ট্রানজিস্টার, এমারজেন্সি বৈদ্যুতিক আলো, ফটোগ্রাফী বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা দেওয়া।

8. মাটি পরীক্ষার কাজে শিক্ষা দিয়ে গ্রামের বিজ্ঞান ক্লাবগুলিকে সাধারণ চাষীদের সাহায্য করতে উৎসাহিত করা।

9. সাধারণ মানুষের জন্য বিজ্ঞান প্রবন্ধ থেকে মৌলিক গবেষনাপত্র পর্যন্ত বাংলা ভাষায় প্রকাশ এবং জনপ্রিয় বিজ্ঞানের বই ও বিজ্ঞান সাধক চরিতমালা প্রকাশ।

10. যোগব্যায়াম ও তার গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন।

11. পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগারটি সুসমৃদ্ধ করে গড়ে তোলা।

12. পরিষদ ভবনে 'বিজ্ঞান সংগ্রহশালা' স্থাপন করা।

13. নির্বিচারে যথেচ্ছ গাছপালা ও বনজঙ্গল ধ্বংসের ফলে পরিবেশ দূষণ ও আবহাওয়ার মারাত্মক পরিবর্তনের ভয়াবহতা সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সজাগ করা।

14. নির্বিচারে বন্যপ্রাণী ধ্বংসের দরুণ বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্যের বিঘ্ন ঘটার বিপদ সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা।

15. যাবতীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করা।

16. শহর ও গ্রামের প্রতিটি স্কুল, কলেজ ও গ্রন্থাগারে পরিষদের মুখপত্র 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার গ্রাহকীকরণের মাধ্যমে পরিষদের আদর্শ ও উদ্দেশ্য প্রচার।

সুকুমার গুপ্ত
কর্মসচিব

লেখকদের প্রতি নিবেদন

1. বিজ্ঞান পরিষদের আদর্শ অনুযায়ী জনসাধারণকে আকৃষ্ট করার মত সমাজের কল্যাণমূলক বিষয়বস্তু সহজবোধ্য ভাষায় সুলিখিত হওয়া প্রয়োজন।
2. মূল প্রতিপাদ্য বিষয় এবং পূর্ণ ঠিকানাসহ লেখকের পরিচিতি পৃথক কাগজে অবশ্যই লিখে দিতে হবে।
3. চলিত ভাষা এবং চলন্তিকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট বানান ও পরিভাষা ব্যবহৃত হবে। উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে আন্তর্জাতিক শব্দটি বাংলা হরফে লিখে ব্র্যাকেটে ইংরাজী শব্দটিও দিতে হবে। আন্তর্জাতিক সংখ্যা এবং মেট্রিক পদ্ধতি ব্যবহৃত হবে।
4. মোটামুটি 2000 শব্দের মধ্যে রচনা সীমাবদ্ধ থাকা বাঞ্ছনীয়।
5. বিভিন্ন ফীচার, সমকালীন বিজ্ঞান গবেষণা ও প্রযুক্তিবিদ্যার সংবাদ এবং বিজ্ঞান বিষয়ক সুন্দর আকর্ষণীয় ফটোগ্রাফীও গ্রহণীয়।
6. রচনার সঙ্গে চিত্র থাকলে আর্ট পেপারে চাইনিজ কালিতে সুঅঙ্কিত হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন।
7. প্রত্যেক চিত্র প্রস্থে 8 সে. মি. কিংবা এর গুণিতকের (16 সে মি 24 সে. মি.) মাপে অঙ্কিত হওয়া প্রয়োজন।
8. অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রবন্ধের মৌলিকত্ব বজায় রেখে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জনে সম্পাদক মন্ডলীর অধিকার থাকবে।
9. প্রত্যেক প্রবন্ধ ফীচার-এর শেষে গ্রন্থপঞ্জী থাকা বাঞ্ছনীয়।
10. জ্ঞান ও বিজ্ঞানে পুস্তক সমালোচনার জন্য দুই কপি পুস্তক পাঠাতে হবে।
11. ফুলস্ক্যাপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় যথেষ্ট মার্জিন এবং প্রতি লাইনের পর বেশ কিছুটা ফাঁক রেখে পরিস্কার হস্তাক্ষরে প্রবন্ধ লিখতে হবে।
12. প্রতি প্রবন্ধের শুরুতে পৃথকভাবে প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসার দেওয়া আবশ্যিক।

সম্পাদনা সচিব

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

জুলাই, 1985
38তম বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা

বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের অনুশীলন করে বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ ও সমাজকে বিজ্ঞান-সচেতন করা এবং সমাজের কল্যাণকল্পে বিজ্ঞানের প্রয়োগ করা পরিষদের উদ্দেশ্য।

বিভিন্ন লেখকদের স্বাধীন মতামত বা মৌলিক সিদ্ধান্ত সমূহ পরিষদের সম্পাদকমণ্ডলীর চিন্তার প্রতিফলন হিসাবে সাধারণতঃ বিবেচ্য নয়।

বিষয় সূচী

লেখকদের প্রতি নিবেদন

1. বিজ্ঞান পরিষদের আদর্শ অনুযায়ী জনসাধারণকে আকৃষ্ট করার মত সমাজের কল্যাণমূলক বিষয়বস্তু সহজবোধ্য ভাষায় সুলিখিত হওয়া প্রয়োজন।
2. মূল প্রতিপাদ্য বিষয় এবং পূর্ণ ঠিকানাসহ লেখকের পরিচিতি পৃথক কাগজে অবশ্যই লিখে দিতে হবে।
3. চলিত ভাষা এবং চলন্তিকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট বানান ও পরিভাষা ব্যবহৃত হবে। উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে আন্তর্জাতিক শব্দটি বাংলা হরফে লিখে ব্র্যাকেটে ইংরাজী শব্দটিও দিতে হবে। আন্তর্জাতিক সংখ্যা এবং মেট্রিক পদ্ধতি ব্যবহৃত হবে।
4. মোটামুটি 2000 শব্দের মধ্যে রচনা সীমাবদ্ধ থাকা বাঞ্ছনীয়।
5. বিভিন্ন ফীচার, সমকালীন বিজ্ঞান গবেষণা ও প্রযুক্তিবিদ্যার সংবাদ এবং বিজ্ঞান বিষয়ক সুন্দর আকর্ষণীয় ফটোগ্রাফীও গ্রহণীয়।
6. রচনার সঙ্গে চিত্র থাকলে আর্ট পেপারে চাইনিজ কালিতে সুঅঙ্কিত হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন।
7. প্রত্যেক চিত্র প্রস্থে 8 সে. মি. কিংবা এর গুণিতকের (16 সে মি 24 সে. মি.) মাপে অঙ্কিত হওয়া প্রয়োজন।
8 অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রবন্ধের মৌলিকত্ব বজায় রেখে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জনে সম্পাদক মন্ডলীর অধিকার থাকবে।
9. প্রত্যেক প্রবন্ধ ফীচার-এর শেষে গ্রন্থপঞ্জী থাকা বাঞ্ছনীয়।
10. জ্ঞান ও বিজ্ঞানে পুস্তক সমালোচনার জন্য দুই কপি পুস্তক পাঠাতে হবে।
11. ফুলস্ক্যাপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় যথেষ্ট মার্জিন এবং প্রতি লাইনের পর বেশ কিছুটা ফাঁক রেখে পরিস্কার হস্তাক্ষরে প্রবন্ধ লিখতে হবে।
12. প্রতি প্রবন্ধের শুরুতে পৃথকভাবে প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসার দেওয়া আবশ্যক।

সম্পাদনা সচিব

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

জুলাই, 1985
38তম বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা

বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের অনুশীলন করে বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ ও সমাজকে বিজ্ঞান-সচেতন করা এবং সমাজের কল্যাণকল্পে বিজ্ঞানের প্রয়োগ করা পরিষদের উদ্দেশ্য।

বিভিন্ন লেখকদের স্বাধীন মতামত বা মৌলিক সিদ্ধান্ত সমূহ পরিষদের সম্পাদকমণ্ডলীর চিন্তার প্রতিফলন হিসাবে সাধারণতঃ বিবেচ্য নয়।

বিষয় সূচী

কিশোর বিজ্ঞানীর আসর

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ঃ 30·00

মূল্য ঃ 2·50

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

কর্মসচিব

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট,

কলিকাতা-700006

ফোন ঃ 55-0660

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

অষ্টাত্রিংশত্তম বর্ষ | জুলাই, 1985 | সপ্তম সংখ্যা

'সবুজ শক্তি' এবং আমরা

বিশ্বনাথ দাস

মানুষ নিজেকে এই পৃথিবীর মালিক মনে করলেও প্রকৃতপক্ষে সে, অর্থাৎ আমরা সবাই এখানে অতিথি হয়ে আছি। সবুজ উদ্ভিদের অতিথি। কারণ, এই গ্রহে কার্যতঃ কেবলমাত্র ওরাই পারে সরাসরি সৌরশক্তি কাজে লাগিয়ে এমন সব পদার্থ সংশ্লেষণ করতে যেগুলি আমাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাঁচিয়ে রেখেছে।

সূর্য থেকে প্রতিদিন পৃথিবীর বুকে এক হেক্টর জায়গার উপর প্রায় 40×10^6 কিলোক্যালোরি শক্তি আছড়ে পড়ছে। সাধারণভাবে এর মাত্র শতকরা 0·1 থেকে 1·0 ভাগ সবুজ উদ্ভিদের দেহে সঞ্চিত হতে পারে। অবশ্য, যে জায়গায় গাছ লাগানো হয়েছে সেখানেই কেবল এইভাবে সৌরশক্তির আবদ্ধীকরণ সম্ভব। উদ্ভিদদেহে সেলুলোজ, শর্করা, শ্বেতসার, প্রোটিন, লিপিড ইত্যাদি আকারে সঞ্চিত এই শক্তিকেই আমরা বলতে পারি 'সবুজ শক্তি'।

সনাতন কৃষিকার্যের দ্বারা আমরা সবুজ উদ্ভিদকে দিয়ে সালোকসংশ্লেষ ক্রিয়ার মাধ্যমে আপতিত সৌরশক্তির খুবই সামান্য ভগ্নাংশ সবুজ শক্তি হিসাবে ধরে রাখতে পারি। কিন্তু উন্নততর পদ্ধতি অবলম্বন করে এই সঞ্চয়ের পরিমাণ অনায়াসেই দ্বিগুণেরও বেশী করা যায়। ইতিমধ্যেই কোন কোন দেশে আপতিত সৌরশক্তির শতকরা 6-10 ভাগ সবুজ শক্তিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব হচ্ছে।

আমাদের দেশে যে সবুজ বিপ্লব ঘটে গেছে তাতে যে বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল তা হলো: আংশিক ভূমিসংস্কার, ব্যাপকতর সেচ ব্যবস্থা অবলম্বন, অধিক পরিমাণে সার ও উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার এবং নিবিড় চাষ পদ্ধতি অনুসরণ। এর ফলে মোট উৎপাদন যে হারে বেড়েছে একক পরিমিত স্থানে আপতিত সৌর শক্তির সবুজ শক্তিতে রূপান্তরের হার কিন্তু ততটা বাড়েনি। আগামী শতকের শুরুতে অন্ততঃ 100 কোটি মানুষের প্রাণ-ধারণের উপযোগী 22·5 কোটি টন খাদ্যশস্য উৎপাদনের দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের এখন এই শেষোক্ত ব্যাপারটির উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করতে হবে! মনে রাখতে হবে যে বর্তমানে আমাদের দেশে বছরে 72 কোটি মানুষের জন্য 15 কোটি টনের মত খাদ্য উৎপাদিত হয়ে থাকে, যা জনপ্রতি প্রয়োজনীয় 225 কেজির তুলনায় কিছু কমই বলা চলে।

এখন আমাদের সামনে প্রশ্ন, কিভাবে আরো সাড়ে সাত কোটি টন খাদ্য আমরা উৎপাদন করতে সক্ষম হবো? ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞেরা এ বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে যে সব সুপারিশ করেছেন সেগুলি থেকে প্রশ্নটির আংশিক সমাধান আমরা খুঁজে পেতে পারি। এর মধ্যে রয়েছে অতিরিক্ত দশ মিলিয়ন হেক্টর জমি চাষের আওতায় আনার সম্ভাবনা, চাষের নিবিড়তা বর্তমান 118% থেকে বাড়িয়ে 133% করা, সেচব্যবস্থার আধুনিকীকরণ, একই জমিতে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একাধিক ফসলের চাষ (যেমন পাট-ধান-গম বা মুগ-বীন-ধান-গম), বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রয়োজনমত জৈব ও অজৈব সারের ব্যবহার, উপযুক্ত পোকামাকড় ও আগাছা দমন ব্যবস্থা অনুসরণ, ইত্যাদি।

উপরিউক্ত গতানুগতিক সুপারিশ ছাড়া দেশের সবুজ শক্তি সম্পদ বৃদ্ধির জন্য আরও অন্ততঃ তিনটি বিষয়ের উপর

বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। এগুলি হলো ঃ

এক—জমির উৎপাদন বিভব বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা। দেখা গেছে, C_4 ডাইকার্বক্সিলিক অ্যাসিড সালোকসংশ্লেষ বিক্রিয়াপথ অনুসরণকারী উদ্ভিদ (আখ, ভুট্টা, ধান, নেপিয়ের ঘাস, ইত্যাদি) যেখানে প্রতিদিন প্রতি বর্গমিটার স্থানে মোট 67 গ্রাম শুষ্ক পদার্থ উৎপন্ন করে সেখানে C_3 ক্যালভিন চক্র অনুসরণকারী উদ্ভিদ মাত্র 35 গ্রাম শুষ্ক পদার্থ তৈরি করে থাকে। অবশ্য, শেষোক্ত শ্রেণীর তৈলবীজ ও ডাল জাতীয় শস্যের ক্ষেত্রে (হেক্টর প্রতি সরষে 3800 কেজি, ছোলা 4500 কেজি) স্বল্পতর উৎপাদনের কারণ হিসাবে বলা যায় যে 1 গ্রাম গ্লুকোজ থেকে 0·83 গ্রাম শ্বেতসার (স্টার্চ) উৎপন্ন হলেও এর থেকে মাত্র 0·40 গ্রাম প্রোটিন বা 0·33 গ্রাম উদ্ভিজ্জ তৈল (লিপিড) তৈরি হয়। উদ্ভিদ-প্রজননবিদেরা বর্তমানে কিভাবে কোন বিশেষ উদ্ভিদের মধ্যে মোট শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ-ই শুধু নয় মোট প্রকৃত সবুজ শক্তির পরিমাণ কিভাবে বৃদ্ধি করা যায় তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করছেন। সুনির্বাচিত এইরকম উদ্ভিদের সমন্বয়ে মিশ্র ও ত্রি-মাত্রিক বিস্তারবিশিষ্ট (Three dimensional, inter-cropping) চাষ ব্যবস্থা (যাতে মাটির বিভিন্ন স্তর থেকে জল ও পুষ্টিমৌল এবং মাটির উপরকার অনুভূমিক ও উল্লম্ব স্তর থেকে সূর্যালোক গৃহীত হতে পারে) অনুসরণের মাধ্যমেই সর্বোচ্চ উৎপাদন বিভব অর্জন করা সম্ভব।

দুই—টেকনোলজি অর্থাৎ কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তর ও কৃষি সম্প্রসারণ। একথা অনস্বীকার্য যে সবুজ শক্তির সম্পদ বৃদ্ধি করার যে সকল বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী কৌশল আমাদের জানা আছে সেগুলিকে গবেষণাগার বা ফাইলের গাদা থেকে চাষের মাঠে প্রকৃত কৃষকদের হাতে সমর্পণ করলে আমরা ইতিমধ্যেই উদ্বৃত্ত শস্যের ভাণ্ডারী হয়ে উঠতাম। এই সঙ্গে একথাও ঠিক যে আমাদের দেশের ক্ষুদ্র চাষীরা নিবিড় চাষে যথেষ্ট উৎসাহী হলেও অধিকাংশ সময় চাষের ব্যাপারে নগদ টাকা বিনিয়োগে ক্ষতির আশংকা থেকে মুক্ত হতে না পারার জন্য শেষ পর্যন্ত হতোদ্যম হয়ে পড়ে। উপযুক্ত বীমা ব্যবস্থা প্রচলন করে এই সমস্যার কিছুটা সমাধান করা যায়।

তিন—কৃষিকার্য সংশ্লিষ্ট শক্তি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে স্ব-নির্ভরতা অর্জন। কৃষিকার্যের মাধ্যমে সবুজ শক্তি আহরণের জন্য সৌরশক্তি ছাড়াও প্রয়োজন হয় অন্য শক্তির বিনিয়োগ। এক হেক্টর জমি থেকে গড়পড়তা তিন টন দানাশস্য উৎপাদন করতে মোটামুটি চার মিলিয়ন কিলো ক্যালোরি শক্তি অর্থাৎ 0·36 টনের মত পেট্রোলিয়াম জ্বালানী খরচ হয়ে থাকে। এর প্রায় অর্ধেকটাই লাগে প্রয়োজনীয় সার উৎপাদনে আর বাকিটা বিভিন্ন কৃষিযন্ত্র চালনার জন্য। এ বিষয়ে স্ব-নির্ভরতা অর্জনের জন্য অপেক্ষাকৃত সুলভ বায়োগ্যাস ও বায়োম্যাস (biomass), জলস্রোত, বায়ুশক্তি বা সৌরশক্তি চালিত পাম্পসেট এবং অন্যান্য যন্ত্রাদি ও সীমিত ক্ষেত্রে পারমাণবিক শক্তি ব্যবহার করার কথা ভাবা যেতে পারে। এছাড়া, অ্যামোনিয়াভিত্তিক নাইট্রোজেন সারের পরিবর্তে কয়েক ধরণের ব্যাকটিরিয়া, শৈবাল বা জলজ ফার্নের মাধ্যমে নাইট্রোজেন আবদ্ধীকরণ ব্যবস্থা অবলম্বন করে সবুজশক্তি উৎপাদনে মোট শক্তি বিনিয়োগের পরিমাণও আমরা অনেকটা কমিয়ে ফেলতে পারি।
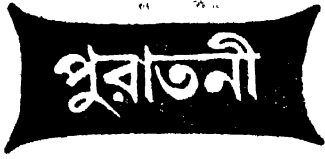
স্নায়ুসূত্রে উত্তেজনা-প্রবাহ

জগদীশচন্দ্র বসু

বাহিরের সংবাদ ভিতরে কি করিয়া পৌঁছায়? আমাদের বাহ্যেন্দ্রিয় চতুর্দ্দিকে প্রসারিত। বিবিধ ধাক্কা অথবা আঘাত তাদের উপর পতিত হইতেছে এবং সংবাদ ভিতরে প্রেরিত হইতেছে। আকাশের ঢেউ দ্বারা আহত হইয়া চক্ষু যে বার্ত্তা প্রেরণ করে তাহা আলো বলিয়া মনে করি। বায়ুর ঢেউ কর্ণে আঘাত করিয়া যে সংবাদ প্রেরণ করে তাহা শব্দ বলিয়া উপলব্ধি হয়। বাহিরের আঘাতের মাত্রা মৃদু হইলে সচরাচর তাহা সুখকর বলিয়াই মনে করি কিন্তু আঘাতের মাত্রা বাড়াইলে অন্যরূপ অনুভূতি হইয়া থাকে। মৃদুস্পর্শ সুখকর, কিন্তু ইষ্টকাঘাত কোনরূপেই সুখজনক নহে।

টেলিগ্রাফের তার দিয়া বৈদ্যুতিক প্রবাহ স্থান হইতে স্থানান্তরে পৌঁছিয়া থাকে এবং এইরূপে দূরদেশে সঙ্কেত প্রেরিত হয়। তার কাটিয়া দিলে সংবাদ বন্ধ হয়। একই বিদ্যুৎ-প্রবাহ বিভিন্ন কলে বিবিধ সঙ্কেত করিয়া থাকে—কাঁটা নাড়ায়, ঘণ্টা বাজায় অথবা আলো জ্বালায়। বিবিধ ইন্দ্রিয় স্নায়ুসূত্র দিয়া যে উত্তেজনা-প্রবাহ প্রেরণ করে তাহা কখন শব্দ, কখন আলো এবং কখনও বা স্পর্শ বলিয়া অনুভব করি। উত্তেজনা-প্রবাহ যদি মাংসপেশীতে পতিত হয় তখন পেশী সঙ্কুচিত হয়। তার কাটিলে যেরূপ খবর বন্ধ হয়, স্নায়ুসূত্র কাটিলে সেইরূপ বাহিরের সংবাদ আর ভিতরে পৌঁছায় না।

স্বতঃস্পন্দন ও ভিতরের শক্তি

বাহিরের আঘাতজনিত সাড়ার কথা বলিয়াছি। তাহা ছাড়া আর এক রকমের সাড়া আছে যাহা আপনা আপনিই হইয়া থাকে। সেই স্বতঃস্পন্দন ভিতরের এক অজ্ঞাত শক্তিদ্বারা ঘটিয়া থাকে। আমাদের হৃদয়ের স্পন্দন ইহারই একটি উদাহরণ। ইহা আপনা আপনিই হইয়া থাকে। উদ্ভিদ-জগতে ইহার উদাহরণ দেখা যায়। বনচাঁড়ালের ছোট দুইটি পাতা আপনা আপনিই নড়িতে থাকে। ভিতরের শক্তিজাত স্বতঃস্পন্দনের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহা বাহিরের শক্তি দ্বারা বিচলিত হয় না; বাহিরের শক্তিকে বরং প্রতিরোধ করে। সুতরাং দেখা যায়, দুই প্রকারের শক্তি দ্বারা জীব উত্তেজিত হয়—বাহিরের শক্তি এবং ভিতরের শক্তি। সচরাচর ভিতরের শক্তি বাহিরের শক্তিকে প্রতিরোধ করে।

ইন্দ্রিয়-অগ্রাহ্য কিরূপে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হইবে?

আঘাতের মাত্রা অনুসারেই উত্তেজনা-প্রবাহের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। এরূপ অনেক ঘটনা ঘটিতেছে যাহা আমাদের ইন্দ্রিয়েরও অগ্রাহ্য। আলো যখন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হয় তখন দৃশ্য অদৃশ্যে মিলিয়া যায়। তখনও চক্ষু আলোক দ্বারা আহত হইতেছে সত্য, কিন্তু অতি ক্ষীণ উত্তেজনা-প্রবাহ স্নায়ুসূত্র দিয়া অধিক দূর যাইতে না পারিয়া নিদ্রিত অনুভূতি-শক্তিকে জাগাইতে পারে না। ইন্দ্রিয়-অগ্রাহ্য কি কোন দিন ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হইবে? ক্ষণিকের জন্য একদিন যাহার সন্ধান পাইয়াছিলাম তাহা ত আর দেখিতে পাইতেছি না! কি করিয়া তবে দৃষ্টি প্রখর হইবে, অনুভূতি শক্তি বৃদ্ধি পাইবে?

অন্য দিকে বাহিরের ভীষণ আঘাতে অনুভূতি-শক্তি বেদনায় মুহ্যমান, সেই যন্ত্রণাদায়ক প্রবাহ কিরূপে প্রশমিত হইবে? হে ভীরু, যদিও তুমি একদিন মরিবে তথাপি অকাল-শঙ্কা হেতু শত শত বার মৃত্যুযাতনা ভোগ করিতেছ। যদিও বহির্জ্জগতের আঘাত তুমি নিবারণ করিতে অসমর্থ, তথাপি অন্তর্জ্জগতের তুমিই একমাত্র অধিপতি। যে পথ দিয়া বাহিরের সংবাদ তোমার নিকট পৌঁছিয়া থাকে, কোনদিন কি সেই পথ তোমার আজ্ঞায় এক সময়ে প্রসারিত এবং অন্য সময়ে একেবারে রুদ্ধ হইবে?

কখন কখন উক্তরূপ ঘটনা ঘটিতে দেখা গিয়াছে। মনের বিক্ষিপ্ত অবস্থায় যাহা দেখি নাই কিম্বা শুনি নাই, চিত্তসংযম করিয়া তাহা দেখিয়াছি অথবা শুনিয়াছি। ইহাতে মনে হয়, ইচ্ছানুক্রমে এবং বহুদিনের অভ্যাসবলে অনুভূতি-শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। যখন স্নায়ুসূত্র দিয়াই বাহিরের খবর ভিতরে পৌঁছায় তখন স্নায়ুসূত্রের কি

পরিবর্ত্তনে অবর্দ্ধ উন্মুক্ত দ্বার একেবারে খুলিয়া যায়? অন্য উপায়ও হয়ত আছে, যাহাতে খোলা দ্বার একেবারে বন্ধ হইয়া যায়।

★ ★ ★

বৃক্ষে স্নায়ুসূত্র

সর্ব্বাগ্রে উদ্ভিদ-জীবন লইয়া পরীক্ষা করিয়াছিলাম ফেফার, হ্যাবারল্যান্ড প্রমুখ ইয়োরোপীয় পন্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, প্রাণীদের ন্যায় উদ্ভিদে কোন স্নায়ুসূত্র নাই; তবে লজ্জাবতী লতার একস্থানে চিমটি কাটিলে দূরস্থিত পাতা কেন পড়িয়া যায়? ইহার উত্তরে তাঁহারা বলেন, চিমটি কাটিলে উদ্ভিদে জল-প্রাহ উৎপন্ন হয় এবং সেই প্রবাহের ধাক্কায় পাতা পতিত হইয়া থাকে। এই নিষ্পত্তি যে ভ্রমাত্মক তাহা আমার পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। প্রথমত চিমটি না কাটিয়া অন্যরূপে লজ্জাবতী লতার উত্তেজনা-প্রবাহ প্রেরণ করা যাইতে পারে, যে সব উপায়ে জল-প্রবাহ একেবারেই উৎপন্ন হয় না। আরও দেখা, যায়, প্রাণীর স্নায়ুতেও যে সব বিশেষত্ব আছে উদ্ভিদ স্নায়ুতেও তাহা বর্ত্তমান। নলের ভিতরে জল-প্রবাহের বেগ শীত কিম্বা উষ্ণতায় হ্রাস-বৃদ্ধি পায় না; কিন্তু স্নায়ুর উত্তেজনার বেগ 9 ডিগ্রি উত্তাপে দ্বিগুণিত হয়। উদ্ভিদে তাহাই হইয়া থাকে। অধিক শৈত্যে উদ্ভিদের স্নায়ুসূত্র অসাড় হইয়া যায়; তখন উত্তেজনা-প্রবাহ স্থগিত হইয়া যায়। উদ্ভিদে যে স্নায়ুসূত্র আছে—আমার এই সিদ্ধান্ত এখন সর্ব্বত্র গৃহীত হইয়াছে।

আণবিক সন্নিবেশে উত্তেজনা-প্রবাহের হ্রাস-বৃদ্ধি

প্রথমে দেখা যাউক, কি উপায়ে স্নায়ুর উত্তেজনা দূরে প্রেরিত হয়। এসম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা হইলে পরে দেখা যাইবে, কিরূপে উত্তেজনা-প্রবাহ বর্দ্ধিত কিম্বা প্রশমিত হইতে পারে। স্নায়ুসূত্র অসংখ্য অণু-গঠিত; প্রত্যেক অণুই স্বাভাবিক অবস্থায় আপেক্ষিক নিশ্চলভাবে স্বীয় স্থানে অবস্থিত। কিন্তু আঘাত পাইলে হেলিতে দুলিতে থাকে; এই হেলা-দোলাই উত্তেজিত অবস্থা। একটি অণু যখন স্পন্দিত হয়, পার্শ্বের অন্য অণুও প্রথম অণুর আঘাত স্পন্দিত হইয়া থাকে এবং এইরূপ ধারাবাহিক রূপে স্নায়ুসূত্র দিয়া উত্তেজনা এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে প্রেরিত হয়। অণুর আঘাতজনিত কম্পন কিরূপে দূরে প্রেরিত হয় তাহার একটা ছবি কল্পনা করিতে পারি। মনে কর, টেবিলের উপর এক সারি পুস্তক সোজাভাবে সাজান আছে। ডান দিকের বইখানাকে বাম দিকে ধাক্কা দিলে প্রথম নম্বরের পুস্তক দ্বিতীয় নম্বরের পুস্তকের উপর পড়িয়া তৃতীয় পুস্তককে ধাক্কা দিবে এবং এইরূপে আঘাতের ধাক্কা এক দিক হইতে অন্য দিকে পৌঁছিবে।

বইগুলি প্রথমে সোজা ছিল এবং প্রথম পুস্তকখানাকে উল্টাইয়া ফেলিতে কিয়ৎপরিমাণ শক্তির আবশ্যক; মনে কর তাহার মাত্রা পাঁচ। ধাক্কার জোর যদি পাঁচ না হইয়া তিন হয় তাহা হইলে বইখানা উল্টাইয়া পড়িবে না; সুতরাং পার্শ্বের বইগুলিও নিশ্চল অবস্থায় থাকিবে। এই কারণে বহিরিন্দ্রিয়ের উপর ধাক্কা যখন অতি ক্ষীণ হয় তখন উত্তেজনা দূরে পৌঁছিতে পারে না এবং এই জন্য বাহিরের আঘাত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় না। মনে কর, বইগুলিকে সোজা অবস্থায় না রাখিয়া বাম দিকে একটু হেলান অবস্থায় রাখা গেল। এবার স্বল্প ধাক্কাতেই বইখানা উল্টাইয়া পড়িবে এবং ধাক্কাটা একদিক হইতে অন্য দিকে পৌঁছিবে। পূর্ব্বের ধাক্কার জোর পাঁচ না হইয়া তিন হইলে আঘাত দূরে পৌঁছিত না, এখন তাহা সহজেই পৌঁছিবে। বইগুলিকে উল্টাদিকে হেলাইলে পাঁচ নম্বরের ধাক্কা প্রথম পুস্তকখানাকে উল্টাইতে পারিবে না। ধাক্কা এবার দূরে পৌঁছিবে না; গন্তব্য পথ যেন একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে। এই উদাহরণ হইতে বুঝা যায় যে, স্নায়ুসূত্রের অণুগুলিকেও দুই প্রকারে সাজান যাইতে পারে। "সমুখ" সন্নিবেশে ইন্দ্রিয়-অগ্রাহ্য শক্তি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হইবে। আর "বিমুখ" সন্নিবেশে বাহিরের ভীষণ আঘাতজনিত উত্তেজনার ধাক্কা ভিতরে পৌঁছিতে পারে না।

পরীক্ষা

উত্তেজনা-প্রবাহ সংযত করিবার সমস্যা কিরূপে পূরণ করিতে সমর্থ হইব তাহা স্থূলভাবে বর্ণনা করিয়াছি। এ সম্বন্ধে যাহা মনে করিয়াছি তাহা পরীক্ষা-সাপেক্ষ। তবে কি উপায়ে আণবিক সন্নিবেশ "সমুখ" অথবা "বিমুখ" হইতে পারে? এরূপ দেখা যায় যে, বিদ্যুৎ-প্রবাহ এক দিকে প্রেরণ করিলে নিকটের চুম্বক শলাকা-গুলি ঘুরিয়া অন্যমুখী হয়। বিদ্যুৎ-বাহক জলীয় পদার্থের ভিতর দিয়া যদি বিদ্যুৎ-স্রোত প্রেরণ করা যায় তবে অণুগুলিও বিচলিত হইয়া যায় এবং অণু-সন্নিবেশ বিদ্যুৎ-স্রোতের দিক অনুসারে নিয়মিত হইয়া থাকে।

স্নায়ুসূত্রে এই উপায়ে দুই প্রকারে আণবিক সন্নিবেশ করা যাইতে পারে। প্রথম পরীক্ষা লজ্জাবতী লইয়া করিয়াছিলাম। আঘাতের মাত্রা এরূপ ক্ষীণ করিলাম

যে, লজ্জাবতী তাহা অনুভব করিতে সমর্থ হইল না। তাহার পর আণবিক সন্নিবেশ "সমুখ" করা হইল। অমনি যে আঘাত লজ্জাবতী কোনদিনও টের পায় নাই এখন তাহা অনুভব করিল এবং সজোরে পাতা নাড়িয়া সাড়া দিল। ইহার পর আণবিক সন্নিবেশ "বিমুখ" করিলাম। এবার লজ্জাবতীর উপর প্রচণ্ড আঘাত করিলেও লজ্জাবতী তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিল না; পাতাগুলি নিস্পন্দিত থাকিয়া উপেক্ষা জানাইল।

তাহার পর ভেক ধরিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পরীক্ষা করিলাম। যে আঘাত ভেক কোনদিনও অনুভব করে নাই স্নায়ুসূত্রে "সমুখ" আণবিক সন্নিবেশে সে তাহা অনুভব করিল এবং গা নাড়িয়া সাড়া দিল। তাহার পর "কাটা ঘায়ে নুন" প্রয়োগ করিলাম। এবার ব্যাঙ ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। কিন্তু যেমনই আণবিক সন্নিবেশ "বিমুখ" করিলাম অমনি বেদনাজনক প্রবাহ যেন পথের মাঝখানে আবদ্ধ হইয়া রহিল এবং ব্যাঙ একেবারে শান্ত হইল।

সুতরাং দেখা যায় যে, স্নায়ুসূত্রে উত্তেজনা-প্রবাহ ইচ্ছানুসারে হ্রাস অথবা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। এই হ্রাস-বৃদ্ধি আণবিক সন্নিবেশের উপর নির্ভর করে। একরূপ সন্নিবেশে উত্তেজনার প্রবাহ বহুগুণ বৃদ্ধি পায়, অন্যরূপ সন্নিবেশে উত্তেজনার প্রবাহ আড়ষ্ট হইয়া যায়। আরও দেখা যায়, এই আণবিক সন্নিবেশ এবং তজ্জনিত উত্তেজনা-প্রবাহের হ্রাস-বৃদ্ধি বাহিরের নির্দ্দিষ্ট শক্তি প্রয়োগে নিয়মিত করা যাইতে পারে। ইহা কোন আকস্মিক কিম্বা দৈব ঘটনা নহে, কিন্তু পরীক্ষিত বৈজ্ঞানিক সত্য। ইহাতে কার্য্য-কারণের সম্বন্ধ অকাট্য।

বাহিরের শক্তি দ্বারা যাহা ঘটিয়া থাকে ভিতরের শক্তি দ্বারাও অনেক সময়ে তাহা সংঘটিত হয়। বাহিরের আঘাতে হস্ত-পেশী যেরূপ সঙ্কুচিত হয়, ভিতরের ইচ্ছায়ও হস্ত সেইরূপ সঙ্কুচিত হয়। উল্টা রকমের হুকুমে হাত শ্লথ হইয়া যায়। ইহাতে দেখা যায় যে, স্নায়ুসূত্রে আণবিক সন্নিবেশ ইচ্ছাশক্তি দ্বারা নিয়মিত হইতে পারে। তাহা হইলে ভিতরের শক্তিবলেও স্নায়ুসূত্রে উত্তেজনা-প্রবাহ বর্দ্ধিত অথবা সংযত হইতে পারিবে। তবে এই দুই প্রকার আণবিক সন্নিবেশ করিবার ক্ষমতা বহু দিনের অভ্যাস ও সাধনা সাপেক্ষ। শিশু প্রথম প্রথম হাটিতে পারে না কিন্তু অনেক দিনের চেষ্টা ও অভ্যাসের ফলে চলাফেরা স্বাভাবিক হইয়া যায়।

সুতরাং মানুষ কেবল অদৃষ্টেরই দাস নহে, তাহারই মধ্যে এক শক্তি নিহিত আছে যাহার দ্বারা সে বহির্জ্জগৎ নিরপেক্ষ হইতে পারে। তাহারই ইচ্ছানুসারে বাহির ও ভিতরের প্রবেশ দ্বার কখনও উদ্ঘাটিত, কখনও অবরুদ্ধ হইতে পারিবে। এইরূপে দৈহিক ও মানসিক দুর্ব্বলতার উপর সে জয়ী হইবে। যে ক্ষীণ বার্ত্তা শুনিতে পায় নাই তাহা শ্রুতিগোচর হইবে, যে লক্ষ্য সে দেখিতে পায় নাই তাহা তাহার নিকট জাজ্জ্বল্যমান হইবে। অন্যপ্রকারে সে বাহিরের সর্ব্ববিভীষিকার অতীত হইবে। অন্তর রাজ্যে স্বেচ্ছাবলে সে বাহিরের ঝঞ্ঝার মধ্যেও অক্ষুব্ধ রহিবে।

ভিতর ও বাহির

ভিতরের শক্তি ত স্বেচ্ছা! তবে জীবনের কোন্ স্তরে এই শক্তির উদ্ভব হইয়াছে? শুষ্ক তৃণ জল-স্রোতে ভাসিয়া যায়। কিন্তু জীব কেবল বাহিরের প্রবাহ দ্বারাই পরিচালিত হয় না, বরং ঢেউয়ের আঘাতে উত্তেজিত হইয়া স্রোতের বিরুদ্ধে সন্তরণ করে। কোন্ স্তরে তবে এই যুঝিবার শক্তি জাগিয়া উঠিয়াছে? ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীব-বিন্দু কখনও বাহিরের শক্তি গ্রহণ করে, কখনও ভিতরের শক্তি দিয়া প্রতিহার করে। গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যান করিবার ক্ষমতাই ত ইচ্ছা-শক্তি।

আর ভিতরের শক্তিই বা কিরূপে উদ্ভূত হইয়াছে! বাহিরের ও ভিতরের শক্তি কি একেবারেই বিভিন্ন? পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, বনচাঁড়ালের পাতা দুইটি ভিতরের শক্তিবলে আপনাআপনিই নড়িতে থাকে। কিন্তু গাছটিকে দুই দিন অন্ধকারে রাখিয়া দেখিলাম যে, পাতা দুইটি একেবারেই নিশ্চল হইয়া গিয়াছে। ইহার কারণ এই যে, ভিতরের শক্তি যাহা সঞ্চিত ছিল তাহা এখন ফুরাইয়া গিয়াছে। এখন পাতা দুইটির উপর ক্ষণিকের জন্য আলো নিক্ষেপ করিলে দেখা যায় যে, পাতা নড়িয়া সাড়া দিতেছে; কিন্তু আলো বন্ধ করিলেই পাতার স্পন্দন থামিয়া যায়। ইহার পর অধিক কাল আলোক নিক্ষেপ করিলে এক অত্যদ্ভুত ঘটনা দেখা যায়। এবার আলো বন্ধ করিবার পরেও পাতা দুইটি বহুক্ষণ ধরিয়া যেন স্বেচ্ছায় নড়িতে থাকে। ইহা অপেক্ষা বিস্ময়কর ঘটনা আর কি হইতে পারে? দেখা যায়, আলোরূপে যাহা বাহিরের শক্তি ছিল গাছ তাহা গ্রহণ করিয়া নিজস্ব করিয়া লইয়াছে এবং বাহির হইতে সঞ্চিত শক্তি এখন ভিতরের শক্তির রূপ ধারণ করিয়াছে। সুতরাং বাহিরের ও ভিতরের শক্তি প্রকৃতপক্ষে একই; সামান্য বিভিন্নতা এই যে, যাহা পর্দ্দার ওপারে ছিল তাহা এপারে আসিয়াছে; যাহা পর ছিল তাহা আপন হইয়াছে। আরও দেখা যায় যে, এইরূপ স্বতঃস্পন্দিত অবস্থায় পাতাটি বাহিরের আঘাতে বিচলিত হয় না। সে এখন

বাহিরের শক্তি নিরপেক্ষ, অর্থাৎ ভিতরের শক্তি দিয়া বাহিরের শক্তি প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইয়াছে। যখন ভিতরের সঞ্চয় ফুরাইবে কেবল তখনই গ্রহণ করিবে এবং পরে স্বেচ্ছাক্রমে প্রত্যাখ্যান করিবে। জীবনের কোন্ স্তরে তবে ভিতরের শক্তি ও স্বেচ্ছা উদ্ভূত হইয়াছে?

জন্মিবার সময় ক্ষুদ্র ও অসহায় হইয়া এই শক্তি-সাগরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলাম। তখন বাহিরের শক্তি ভিতরে প্রবেশ করিয়া আমার শরীর লালিত ও বর্দ্ধিত করিয়াছে। মাতৃস্তন্যের সহিত স্নেহ, মায়া, মমতা অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে এবং বন্ধুজনের প্রেমের দ্বারা জীবন উৎফুল্ল হইয়াছে। দুর্দ্দিন ও বাহিরের আঘাতে ফলে ভিতরে শক্তি সঞ্চিত হইয়াছে এবং তাহারই বলে বাহিরের সহিত বুঝিতে সক্ষম হইয়াছি।

ইহার মধ্যে আমার নিজস্ব কোথায়? এই সবের মূলে আমি না তুমি?

একের জীবনের উচ্ছ্বাসে তুমি অন্য জীবন পূর্ণ করিয়াছ; অনেকে তোমারই নির্দ্দেশে জ্ঞান সন্ধানার্থে জীবনপাত করিয়াছে, মানবের কল্যাণ হেতু রাজ্য-সম্পদ ত্যাগ করিয়া দুঃখ-দারিদ্র্য বরণ করিয়াছে এবং দেশসেবায় অকাতরে বধ্যমঞ্চে আরোহণ করিয়াছে। সেই সব জীবনের বিক্ষিপ্ত শক্তি অন্য জীবন জ্ঞান ও ধর্ম্মে, শৌর্য্য ও বীর্য্যে পরিপূরিত করিয়াছে।

ভিতর ও বাহিরের শক্তি-সংগ্রামেই জীবন বিবিধরূপে পরিস্ফুটিত হইতেছে। উভয়ের মূলে একই মহাশক্তি, যদ্দ্বারা অজীব ও সজীব, অণু ও ব্রহ্মাণ্ড অনুপ্রাণিত। সেই শক্তির উচ্ছ্বাসেই জীবনের অভিব্যক্তি। সেই শক্তিতেই মানব দানবত্ব পরিহার করিয়া দেবত্বে উন্নীত হইবে।

গত কয়েক বৎসর যাবৎ আমাদের দেশের ছাত্রগণ বহুবিধ রূপে লোকসেবায় আশ্চর্য্য পারদর্শিতা দেখাইয়াছে। ইহা দ্বারা তাহারা দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে। "পতিতের সেবা" অথবা 'ডিপ্রেস্ট মিশনে'ও অনেকের ঐকান্তিক উৎসাহ দেখা যাইতেছে। ইহা বিশেষ শুভ লক্ষণ। এই সম্বন্ধেও কিছু ভাবিবার আছে। শৈশবকালে পিতৃদেব আমাকে বাঙ্গলা স্কুলে প্রেরণ করেন। তখন সন্তানদিগকে ইংরাজী স্কুলে প্রেরণ আভিজাত্যের লক্ষণ বলিয়া গণ্য হইত। স্কুলে দক্ষিণ দিকে আমার পিতার মুসলমান চাপরাশীর পুত্র এবং বামে এক ধীবরপুত্র আমার সহচর ছিল। তাহাদের নিকট আমি পশুপক্ষী ও জলজন্তুর জীবনবৃত্তান্ত স্তব্ধ হইয়া শুনিতাম। সম্ভবতঃ প্রকৃতির কার্য্য অনুসন্ধানে অনুরাগ এই সব ঘটন হইতেই আমার মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল। ছুটির পর যখন বয়স্যদের সহিত আমি বাড়ী ফিরিতাম তখন মাতা আমাদের আহার্য্য বণ্টন করিয়া দিতেন। যদিও তিনি সেকেলে এবং একান্ত নিষ্ঠাবতী ছিলেন, কিন্তু এই কার্য্যে যে তাঁহার নিষ্ঠার ব্যতিক্রম হয় তাহা কখনও মনে করিতেন না। ছেলেবেলায় সখ্যতা হেতু ছোট জাতি বলিয়া যে এক স্বতন্ত্র শ্রেণীর প্রাণী আছে এবং হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যে এক সমস্যা আছে তাহা বুঝিতেও পারি নাই। সেদিন বাঁকুড়ায় "পতিত অস্পৃশ্য" জাতির অনেকে ঘোরতর দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত হইতেছিল। যাঁহারা যৎসামান্য আহার্য্য লইয়া সাহায্য করিতে গিয়াছিলেন তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে; অনশনে শীর্ণ পুরুষেরা সাহায্য অস্বীকার করিয়া মুমূর্ষ স্ত্রীলোকদিগকে দেখাইয়া দিল। শিশুরাও মুষ্টিমেয় আহার্য্য পাইয়া তাহা দশজনের মধ্যে বণ্টন করিল। ইহার পর প্রচলিত ভাষার অর্থ করা কঠিন হইয়াছে। বাস্তবপক্ষে কাহারা পতিত, উহারা না আমরা?

আর এক কথা। তুমি ও আমি যে শিক্ষালাভ করিয়া নিজেকে উন্নত করিতে পারিয়াছি এবং দেশের জন্য ভাবিবার অবকাশ পাইয়াছি, ইহা কাহার অনুগ্রহে? এই বিস্তৃত রাজ্যরক্ষার ভার প্রকৃতপক্ষে কে বহন করিতেছে? তাহা জানিতে সমৃদ্ধিশালী নগর হইতে তোমাদের দৃষ্টি অপসারিত করিয়া দুঃস্থ পল্লীগ্রামে স্থাপন কর। সেখানে দেখিতে পাইবে পঙ্কে অর্দ্ধনিমজ্জিত, অনশনক্লিষ্ট, রোগে শীর্ণ, অস্থিচর্ম্মসার এই "পতিত" শ্রেণীরাই ধন-ধান্য দ্বারা সমগ্র জাতিকে পোষণ করিতেছে। অস্থিচূর্ণ দ্বারা নাকি ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি পায়। অস্থিচূর্ণের বোধশক্তি নাই; কিন্তু যে জীবন্ত অস্থির কথা বলিলাম, তাহার মজ্জায় চির-বেদনা নিহিত আছে।"

—জগদীশচন্দ্র বসু

অফুরন্ত শক্তির উৎস সন্ধানে

দিলীপকুমার সরকার*

আজকাল আমরা মোট যত পরিমাণ শক্তি ব্যবহার করে থাকি তার শতকরা 90 ভাগই আসে তেল, কয়লা এবং প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে আর 5 ভাগ আসে জল-বিদ্যুৎ থেকে—বাকিটা আসে কেন্দ্রিন শক্তি, সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, বায়ো-গ্যাস থেকে পাওয়া শক্তি, সমুদ্রের ঢেউ থেকে পাওয়া শক্তি এবং ভূগর্ভের তাপ শক্তি থেকে।

তেল ও গ্যাস এই দুই সহজলভ্য এবং সস্তা শক্তি হাতে থাকার ফলেই বিংশ শতাব্দীতে মানব-সমাজের অভূতপূর্ব উন্নতি সম্ভব হয়েছে। অবশ্য, 1973 খৃস্টাব্দে তেল রপ্তানীকারী আরব দেশগুলি তেলের দাম বাড়িয়ে দেওয়ার ফলে পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশের সামনেই শক্তি-সঙ্কট দেখা দিয়েছে।

তেলের দাম বাড়ার পরিপ্রেক্ষিতে অনেকে তেলের বদলে কয়লা ব্যবহার করার কথা ভাবছেন অথবা কয়লাকে তেলে রূপান্তরিত করার জন্য বারজিয়াস পদ্ধতির সাহায্য নেওয়ার কথা ভাবছেন। কিন্তু মাটির নীচে সঞ্চিত কয়লার পরিমাণও (663 বিলিয়ন মেট্রিক টন) তো এমন কিছু বেশী নয়। এখন যে হারে কয়লা খরচ হচ্ছে তাতে আর মাত্র 240 বছরের মধ্যে সমস্ত কয়লা ফুরিয়ে যাবে। দেরিতে হলেও মানুষ বুঝতে শিখেছে যে পৃথিবীর বুকে তেল এবং কয়লা মাতৃস্তনের মত অফুরন্ত নয়, ফলে মানুষ এখন অফুরন্ত শক্তির উৎস সন্ধানে ব্যস্ত। এ ব্যাপারে যে কটি উৎসের কথা ভাবা হয়েছে নীচে সেগুলির আলোচনা করলাম।

সৌরশক্তি

ভারতসহ ক্রান্তীয় অঞ্চলের দেশগুলিতে সৌরশক্তি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। হিসাব থেকে দেখা গেছে যে পৃথিবী সূর্য থেকে বছরে প্রায় $1 \cdot 78 \times 10^{8}$ মিলিয়ন কিলোওয়াট-আওয়ার শক্তি পেয়ে থাকে। ভারতের স্থলভাগ বছরে যে পরিমাণ সৌরশক্তি পেয়ে থাকে তা হল প্রায় 60×10^{13} মেগাওয়াট আওয়ার। দেশের বেশির ভাগ অংশই বছরে 250 থেকে 300 দিন সূর্যের মুখ দেখে থাকে। এ ব্যাপারে ব্যতিক্রম হচ্ছে গিয়ে আসাম, কাশ্মীর, কেরালা এবং মেঘালয়। গুজরাট, উত্তর মহারাষ্ট্র, রাজস্থান এবং পশ্চিম মধ্যপ্রদেশ বছরে 3000 থেকে 3200 ঘণ্টা রোদ পেয়ে থাকে। বাকি রাজ্যগুলি বছরে 2600 থেকে 2800 ঘণ্টা রোদ পেয়ে থাকে।

সৌরশক্তির কতকগুলি সুবিধা আছে। যেমন,

1) সূর্যের আয়ু প্রায় 5×10^{12} বছর। কাজেই ধরে নেওয়া যেতে পারে যে সূর্য আমাদের কাছে অমর। সুতরাং সৌরশক্তি ফুরিয়ে যাওয়ার নয়।

2) সৌরশক্তি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

3) এই শক্তি তাপশক্তি, যান্ত্রিক শক্তি এবং বৈদ্যুতিক শক্তিতে সরাসরি রূপান্তরিত হতে পারে।

4) পৃথিবীর প্রায় সব জনবসতিতেই কম-বেশী সূর্যের আলো পড়ে।

5) শক্তি সংগ্রহ এবং রূপান্তর যদি একই জায়গায় ঘটান যায় তাহলে পরিবহন খরচ বাঁচান যেতে পারে।

6) পরিশেষে বলা যায় সৌরশক্তির রূপান্তরে কোন রকম পরিবেশ দূষণ ঘটে না এবং সৌরশক্তি ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির রক্ষণা-বেক্ষণ খরচ প্রায় নগণ্য।

সৌরশক্তিকে সরাসরি কাজে লাগানোর যে প্রযুক্তি তা তুলনামূলকভাবে নতুন; কিন্তু সৌরশক্তির পরোক্ষ ব্যবহার ধারণা হিসাবে নতুন কিছু নয়। সালোক-সংশ্লেষের মাধ্যমে গাছপালারা পৃথিবীপৃষ্ঠে উদ্ভিদ সৃষ্টির প্রথম

* রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, পশ্চিম বঙ্গ, কলিকাতা-700 019

থেকেই সূর্যালোককে খাবার এবং জ্বালানিতে পরিণত করেছে। পৃথিবীপৃষ্ঠে রোদ কোথাও কম কোথাও বা বেশি পড়ে। এর ফলে বায়ু প্রবাহের সৃষ্টি হয়। তাছাড়া জল ও ডাঙ্গার রোদ থেকে সংগ্রহ করা তাপ ধরে রাখার ক্ষমতার তারতম্যের জন্য স্থলবায়ু ও জলবায়ু সৃষ্টি হয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই বাতাসই বায়ুচালিত কল চালিয়েছে এবং এই বাতাসে ভর করেই পালতোলা নৌকো ও জাহাজ জলপথে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় গেছে। সৌরশক্তির সাহায্যে সমুদ্রের নোনা জল বাষ্পীভূত হয়। বাষ্প থেকে মেঘের সৃষ্টি। ঐ মেঘই পাহাড়ের তুষারের সংস্পর্শে এসে ঘনীভূত হয়ে মিষ্টি জলে রূপান্তরিত হয়। কখনও বা রুদ্ধতাপ সম্প্রসারণের (ailiabatic expansion) ফলে মেঘ ঠাণ্ডা হয়ে বৃষ্টিরূপে পৃথিবীর বুকে নেমে আসে। এই মিষ্টি জল খেয়েই মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী বেঁচে থাকে এবং জল প্রবাহ থেকে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়। রোদে শুকিয়ে মানুষ নুন তৈরি করেছে ও ফল সংরক্ষণ করেছে, কার্পাসের কাপড় শুকিয়েছে এবং রোদের জীবাণু ধ্বংস করার ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়েছে।

ভারতে সৌরশক্তিকে ঠিক মত কাজে লাগাবার জন্য 1973 খৃস্টাব্দ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সৌরসেল, সংগ্রাহক, সৌরকুকার, মোটর, পাম্প, নলকূপ, রাস্তার বাতি ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রায় 40টি প্রকল্পে অর্থ বিনিয়োগ করেছেন। দিল্লী এবং কলকাতায় সৌরকুকার ইতিমধ্যেই বাজারে ছাড়া হয়েছে। আমেদাবাদে জাহাঙ্গীর টেক্সটাইল মিল জল এবং বাতাস গরম করার ব্যাপারে সৌরশক্তিকে কাজে লাগিয়েছে। মুরখালে হারিয়ানা ব্রিউয়ারী সৌরশক্তির সাহায্যে জল ফুটাচ্ছে। এতে জল জীবাণু-মুক্ত হচ্ছে এবং বছরে ষাট হাজার টাকার জ্বালানি বেঁচে যাচ্ছে। কানপুরের কাছাকাছি সালের স্টেশনে সৌরশক্তি চালিত সিগন্যাল সিস্টেম চালু করা হয়েছে। কোলার স্বর্ণখনির কাছাকাছি বিশ্বনাথম রেল রেল স্টেশন পুরোপুরি সৌরশক্তি চালিত। লুধিয়ানায় শস্যের দানা শুকানোর জন্য সৌরশক্তি চালিত ড্রায়ার বসান হয়েছে। এই ড্রায়ারের সাহায্যে প্রতিদিন 10 টন শস্য শুকানো যায়। আন্নামালাই নগরেও এই ধরনের একটি ড্রায়ার আছে। এতে প্রতিদিন 1 টন শস্য শুকানো যায়। উত্তর প্রদেশের বালিয়া গ্রামে 31 টন ধারণ-ক্ষমতাবিশিষ্ট হীমঘরটি ভারতের বৃহত্তম হীমঘর। কেরালার আলামুরে সৌরশক্তি চালিত ড্রায়ার ও লাগোয়া গুদাম ঘর ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এই যন্ত্রে প্রতিদিন 30 টন শস্য শুকানো চলে।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে সৌরশক্তিকে কাজে লাগানোর ব্যাপারে ভারত পেছিয়ে নেই—আবার সেই সঙ্গে এও বোঝা যায় যে, সৌরশক্তিকে কাজে লাগানোর জন্য সুসংবদ্ধ কোনও ব্যবস্থা এখনও আমাদের দেশে গড়ে ওঠে নি।

গরম করা এবং ঠাণ্ডা করার কাজে লাগান ছাড়াও ফটো-ভোল্টেইকস্ বা সৌর সেলের মাধ্যমে সৌরশক্তিকে সরাসরি বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা সম্ভবপর। আশা করা যায় যে ভবিষ্যতে এটাই হবে শক্তির অন্যতম প্রধান উৎস। এই বিষয়ে গবেষণা এবং শিল্প উৎপাদনের ওপর জোর দেওয়া দরকার। 1981 খৃস্টাব্দে ভারত সরকার এই উদ্দেশ্যে কমিশন ফর এডিশন্যাল সোরসেস অব এনার্জি গঠন করেছেন। সম্প্রতি ডিপারমেণ্ট অব নন কনভেন-শন্যাল সোরসেস অব এনার্জি আহূত এক আলোচনা চক্রে ফটো-ভোল্টেইক কেন্দ্র গঠনের প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে। গবেষক, প্রস্তুতকারক এবং ব্যবহারকারীদের মধ্যে সমন্বয় সাধনই হবে এই কেন্দ্রের কাজ।

ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে স্থাপিত সেন্ট্রাল ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড (সি. ই. এল) 1982-83 খৃস্টাব্দে অয়েল এণ্ড ন্যাচারাল গ্যাস কমিশন স্থাপিত বোম্বে হাইয়ের সমুদ্র থেকে তেল তোলার স্বয়ংক্রিয় প্লাটফর্মের প্রয়োজনীয় সমস্ত শক্তি সরবরাহ করছে সৌর সেলের সাহায্যে। এই সাফল্যের পর আন্তর্জাতিক বাজার থেকেও সি. ই. এল. 5টি অর্ডার পেয়েছে। আণ্টার্টিকা, ভারতীয় রেল, সীমান্ত রক্ষী বাহিনী, ডাক ও তার বিভাগ এবং গ্রামে নলকূপ ও রাস্তায় বাতি দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই সংস্থা সৌর ফটোভোল্টেইক সিস্টেম সরবরাহ করে চলেছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সৌর শক্তির প্রয়োগ এবং ব্যবহারকে এই সংস্থা বাস্তবায়িত করেছে।

কেন্দ্রিন শক্তি

ইউরেনিয়াম^{235} ও থোরিয়াম^{232}-র কেন্দ্রিন বিভাজনে উদ্ভূত তাপশক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা গেছে। এ দুটি কাঁচামাল পৃথিবীতে এত বেশি পরিমাণে মজুত আছে যে এই পদ্ধতিতে যুগ যুগ ধরে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা যাবে। আমাদের দেশে ট্রম্বে, তারাপুর, রাণ-প্রতাপ সাগর এবং কলপক্কম কেন্দ্রিন পাওয়ার-রিঅ্যাকটর কাজ করছে। ফ্রান্স আশা রাখে, 1990 খৃস্টাব্দ নাগাদ তার উৎপন্ন মোট বিদ্যুতের শতকরা 73 ভাগই আসবে কেন্দ্রিন শক্তি থেকে।

আশা করা যায় কেন্দ্রিন সংযোজন বিক্রিয়া থেকে

পাওয়া শক্তিই আগামী দিনে শক্তির প্রধান উৎস হবে। এর কাঁচামাল সস্তা, পদ্ধতিটি পরিচ্ছন্ন আর জ্বালানি হাইড্রোজেন কিংবা তার সমঘর ডয়টেরিয়াম সমুদ্রের জলে এত বেশি আছে যে তা দিয়ে লক্ষ লক্ষ বছর শক্তি যোগানো যাবে। এযাবৎ যতগুলি পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা হয়েছে, তাদের মধ্যে তথাকথিত টোকাসাক সংযোজন রিঅ্যাক্টর ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন। এ ধরণের রিঅ্যাক্টর নিয়ে প্রিন্সটনে, রাশিয়ায় এবং জাপানে পরীক্ষা চলছে। এ ছাড়া ইউরোপের কয়েকটি দেশ যৌথভাবে পরীক্ষা চালাচ্ছে। যে কটি দেশ এই ধরণের রিঅ্যাক্টর নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছে মনে হয় তাদের সকলের চেষ্টায় 1990 খৃস্টাব্দে এই পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ তৈরি করা যাবে। বিজ্ঞানীরা আশা করেন যে 2000 খৃস্টাব্দে নাগাদ এই পদ্ধতি বর্তমান বিদ্যুৎ উৎপাদন পদ্ধতিগুলোর সঙ্গে পাল্লা দেবে।

অন্যান্য উৎস

শক্তি উৎপাদনে হাইড্রোজেনকে কাজে লাগানও শুরু হয়েছে। আমেরিকার সরকারী বিমান গবেষণা সংস্থা হাইড্রোজেনকে জ্বালানি করে বিমান চালিয়ে সফল হয়েছে। এখন একটা অসুবিধা—তা হল এ ধরণের বিমানের জ্বালানির আধার মাপে প্রথাগত পেট্রোল আধারের চেয়ে বড়। হাইড্রোজেনের বড় সুবিধা হল, এর দহনে সৃষ্ট জল, কোনমতেই পরিবেশ দূষণ করে না। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যায় এমন কিছু সামুদ্রিক আগাছার ভাইট্যাল অ্যাকটিভিটিকে কাজে লাগিয়ে মানে সৌরশক্তিকে কাজে লাগিয়ে জীব-বিজ্ঞানীরা হাইড্রোজেন উৎপাদনের এক নয়া পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। প্রাথমিক হিসাবে দেখা গেছে, এই ধরণের আগাছাকে যদি বড় হ্রদের জলে বিপুল সংখ্যায় বাড়তে দেওয়া যায় তাহলে এরাই সারা পৃথিবীর প্রয়োজনীয় শক্তি যুগিয়ে যাবে।

বায়ুকল এবং জলের পাম্প চালাতে বাতাসকে কাজে লাগানো হয়েছে বহু যুগ আগেই। 1984 খৃস্টাব্দে শুধু আমেরিকাতেই বায়ুকলের সংখ্যা ছিল দেড় লক্ষ।

শক্তির আরেক উৎস হল ভূগর্ভস্থ উত্তাপ। ইটালী আর রাশিয়ায় বেশ কয়টি শহরকে গরম রাখতে 'মাটির বুকের মাঝে বন্দী যে জল' তাকে কাজে লাগান হয়েছে।

ক্রান্তীয় অঞ্চলের সমুদ্রে জলের উপর আর 15-20 কিলোমিটার গভীরে-উষ্ণতার তারতম্যকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কথাও ভাবা হচ্ছে।

রাশিয়া ও ফ্রান্সে সমুদ্রের ঢেউ থেকে পরীক্ষামূলক-ভাবে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করবার চেষ্টা চলছে।

মানুষের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান মানুষই করেছে—বিজ্ঞানের ইতিহাস থেকে আমরা এই শিক্ষাই পেয়েছি। কাজেই আজ বিশ্ববাসীর সামনে যে শক্তি-সঙ্কট দেখা দিয়েছে, মানুষ তা অচিরে কাটিয়ে উঠবে—এটাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

বিশ্ব সৃষ্টির সময় সন্ধানে

সলিলকুমার চক্রবর্তী*

সৃষ্টি সম্বন্ধে মানুষের সীমাহীন কৌতূহল অনেক দিনের। বৈদিক ঋষির বিশ্ববন্দনার সুরেও দেখি সেই চিরন্তণ প্রশ্নের অনুরনণ।

"কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রোবচৎ। কুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টি ঃ।"

কোথা থেকে এলো এই সৃষ্টি? কোথায় এর জন্ম হ'লো? এর প্রথম প্রকাশ কোথায়? কে তা সঠিক জানে এবং দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা ক'রতে পারে?

সেই আর্যভট্ট গ্যালিলিও, কোপানিকাস, কেপলার, নিউটন প্রভৃতির সময় থেকে শুরু ক'রে আজকের দিনের নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখরের আমল পর্যন্ত সংখ্যাতীত বিজ্ঞানী নিজ নিজ প্রতিভার আলোকে গবেষণা লব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে সৃষ্টি রহস্য উদ্ঘাটনে তৎপর হ'য়েছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে রেডিও স্পেক্ট্রোমিটার, শক্তিশালী দূরবীণ, রকেট প্রভৃতির আবিষ্কার, জ্যোতিপদার্থবিদ্যার অগ্রগতিকে ক'রেছে ত্বরান্বিত। পারমাণবিক বিজ্ঞানের প্রতিভা স্পর্শে সঞ্জীবিত হ'য়েছে জ্যোতিবিদ্যা। মাউন্ট পালামোরে শক্তিশালী 200 ইঞ্চি দূরবীনে চোখ লাগিয়ে কোটী কোটী আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত নীহারিকা এবং নক্ষত্রজগতের চমৎকার ও স্পষ্ট চিত্র গ্রহণ সম্ভব হ'য়েছে। তাদের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ, সহায়তা ক'রেছে বিশ্ব সৃষ্টির নানা রহস্য সন্ধানে।

* ইউ. কো. ব্যাঙ্ক, দমদম ক্যান্টনমেন্ট

এ সম্পর্কে জন্ম নিয়েছে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ—

ক) লেমাইটার (Laymiter) প্রবর্তিত বিশাল বিস্ফোরণ (Big Bang Theory)

খ) স্যাণ্ডেজ (Sandase) প্রদত্ত বিবর্তনশীল বিশ্ব তত্ত্ব (Pulsating Universe Theory) এবং

গ) টি. গোল্ড (T. Gold) এবং এফ. হয়েল (F. Hoyle) প্রদত্ত স্থিতাবস্থা তত্ত্ব (steady state Theory)। এদের মধ্যে কোন তত্ত্বটি নির্ভুল এবং সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য তা বিতর্কের বিষয়-বস্তু। আমাদের প্রবন্ধ সীমাবদ্ধ থাকবে কেবলমাত্র ব্রহ্মাণ্ডের বয়স সম্পর্কিত আলোচনায়। এ পর্যন্ত নানা জনে নানা ভাবে বিশ্ব-সৃষ্টির সময় সন্ধানে তৎপর হ'য়েছেন। তার মধ্যে প্রধান প্রধান পদ্ধতিগুলো হ'চ্ছে—

1) নানারূপ প্রাকৃতিক ঘটনা অনুধাবন।

2) বিশ্বসৃষ্টির সময়ে উৎপন্ন ভারী মৌল পদার্থ-সমূহের তেজস্ক্রিয়তার (Radio activity) পরিমাপ।

3) গোলাকার তারাগুচ্ছের (Globular Cluster of stars) অন্তর্ভুক্ত তারকাদের বয়স নির্দ্ধারণ।

4) সম্প্রসারণবাদের (Theory of expanding Universe) ভিত্তিতে সঠিকভাবে হাবল্ ধ্রুবকের (Hubble's constant) মান নির্ণয়।

প্রাকৃতিক ঘটনাবলী থেকে বিশ্বের বয়স

বেদ, পুরাণ, বাইবেল প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থসমূহে বিশ্বসৃষ্টির যে সময় নির্ধারণ করা হ'য়েছে তার কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায় না।

অতি প্রাচীনকালেও নানা প্রাকৃতিক ঘটনা থেকে অনেকে বিশ্বের বয়স অনুমানে সচেষ্ট হয়েছিলেন বটে, তবে পরবর্ত্তী কালে তাদের অধিকাংশই ভুল প্রমাণিত হ'য়েছে। 1715 খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞানী হ্যাডাল (Hadal) সর্বপ্রথম পৃথিবীর প্রামাণ্য বয়সের হিসাবদানে সক্ষম হ'ন। তাঁর মতে সৃষ্টির আদিতে সব জলই ছিল মিষ্ট। লবণাক্ততার লেশ ছিল না তাতে। নানা দিক্ দিয়ে দেশের উপর প্রবাহিত নদীসমূহ বছরের পর বছর ধ'রে যে পলিমাটি সমুদ্রে সঞ্চিত করে, তাতে বিভিন্ন ধাতব লবণ সমুদ্র জলে মিশে গিয়ে সমুদ্রের জলকে করেছে লবণাক্ত। আবার সূর্যের তাপে বছরের পর বছর বাষ্পীভবনের ফলে বিশুদ্ধ জল সমুদ্র থেকে যতই অপসারিত হ'চ্ছে, সমুদ্র জলে লবণের ঘনত্বও ততই বাড়ছে। বিশুদ্ধ জলের সাথে তুলনা করলে দেখা যায় সমুদ্রজলে বর্ত্তমানে উপস্থিত লবণের পরিমাণ শতকরা তিনভাগ। হ্যাডাল নানা হিসাব নিকাশ ক'রে দেখিয়েছেন এই শতকরা তিনভাগ লবণাক্ততা বৃদ্ধির জন্য সময়ের প্রয়োজন প্রায় 100 কোটী বছর। অতএব পৃথিবীর মহাবারিধিগুলির বয়স নিশ্চয়ই তার কম হ'তে পারে না।

জীববিজ্ঞানীরা প্রথমে পৃথিবীতে জীবের অভিব্যক্তি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এবং ভূ-তাত্ত্বিকেরা প্রাচীন জীবাশ্ম থেকে পাঠ গ্রহণ করে পৃথিবীর যে বয়স অনুমান করেন তা মোটামুটিভাবে হ্যাডালের সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করে।

বিশ্বের বয়সের এই হিসাব নিয়ে সর্বপ্রথমে আপত্তি তুললেন বিজ্ঞানী হেল্‌মোজ্ (Helmholtz)। 1854 খৃষ্টাব্দে সূর্যের শক্তির উৎস এবং শক্তির নিত্যতাবাদের উপর ভিত্তি ক'রে বিশ্বের বয়সের যে হিসাব তিনি দিলেন, হ্যাডালের হিসাবের সাথে তার বিস্তর ফারাক। হেলমোজের সূত্র ধ'রে লর্ড কেলভিন (Lord Kelvin) প্রমাণ করতে চাইলেন যে আদিতে গলিত বস্তুপিণ্ড থেকে পৃথিবীর বর্ত্তমান উষ্ণতায় পৌঁছতে সময় লেগেছে কম করে 200 কোটী বছর।

কেলভিনের সিদ্ধান্ত হেলমোজের হিসাবকে মোটামটি সমর্থন করলেও, 1904 খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড (Rutherford) তাঁর তথ্যপূর্ণ জ্বালাময়ী বক্তৃতায় কেলভিনের উপস্থিতিতেই কেলভিন-তত্ত্বের অসত্যতা প্রমাণ করেন।

এর প্রায় 26 বছর বাদে এডিংটন (Edington) অনুমান করলেন যে সূর্যের অভ্যন্তরস্থ হাইড্রোজেন পরমাণুগুলি কেন্দ্রীন সংযোজনের (Neuclear Fusion) ফলে হিলিয়াম পরমাণুতে রূপান্তরিত হচ্ছে। সে সময়ে যে পরিমাণ তাপশক্তি উৎপন্ন হচ্ছে, সেই তাপই সূর্যকে এমন একটা প্রচণ্ড শক্তি উৎসে পরিণত করছে। 4টি হাইড্রোজেন পরমাণু সংযোজিত হয়ে যখন একটা হিলিয়াম পরমাণু উৎপন্ন করে, তখন উৎপন্ন হিলিয়াম পরমাণুর ভর হাইড্রোজেন পরমাণুগুলির মোট ভরের চেয়ে কিছু কম হয়। আইনষ্টাইনের (Einstein) বিশেষ আপেক্ষিকতা-বাদ তত্ত্ব-সঞ্জাত বিখ্যাত $E=mc^2$ সূত্র অনুযায়ী, ঐ পরিমাণ ভর শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। 1938 খৃষ্টাব্দে বেথে (Bethe) হিসাব করে দেখালেন যে এই সংযোজন প্রক্রিয়ার দরুণ প্রতি সেকেণ্ডে সূর্য প্রায় 4 কোটী

20 লক্ষ টন ভর হারিয়ে ফেলছে। তিনি আরও দেখালেন 600 কোটী বছর আগে সূর্যের জন্ম হয়েছে ধরে নিলে, সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত সূর্যের মূল ভরের 40 হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র এই পদ্ধতিতে নষ্ট হয়েছে। আরও কোটী কোটী বছর ধরে সূর্য এই হারে শক্তি বিকিরণ করে চললেও সহজে তার আয়তন বা ভরের উল্লেখযোগ্য হ্রাস ধরা যাবে না।

ভারী মৌলের তেজস্ক্রিয়তা থেকে বিশ্বের বয়স

সীসার চেয়ে ভারী মৌলপদার্থসমূহ সর্বদা, স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে, সর্ববাধাবিনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় এক রকমের অদৃশ্য তেজস্ক্রিয় রশ্মি নির্গত করে এবং ধীরে ধীরে নিম্নভরের মৌলিক পদার্থে রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে অবশেষে স্থায়ী সীসায় পরিণত হয়। এই ঘটনাকে বলে তেজস্ক্রিয়তা (Radio activity) আর যে সকল মৌল পদার্থে এই ঘটনা পরিলক্ষিত হয়, তাদের বলে তেজস্ক্রিয় মৌল।

বিশ্বসৃষ্টির সময় নির্ণয়ের জন্য বিজ্ঞানীরা বেছে নিয়েছেন চারটি তেজস্ক্রিয় মৌল—থোরিয়াম-232, ইউরেনিয়াম-235, ইউরেনিয়াম-238 এবং প্লুটোনিয়াম-244, এদের বলা হয় কেন্দ্রীণ কালমাপক (Nuclear Chronometer) এ ধরণের ভারী মৌল থেকে বিশ্বের বয়স হিসাবের পদ্ধতিটা রীতিমত জটিল। ধরা যাক ইউরেনিয়ামের কোনও আকরিক ঘনীভূত হওয়ার পর থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত অতিবাহিত সময়কে (t) চিহ্ন দ্বারা সূচিত করা হ'লো; এবং সেই আকরিকের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের মধ্যে আদিতে N_0 সংখ্যক ইউরেনিয়াম পরমাণু ছিল ব'লে মনে করা হলো।

যদি বর্তমানে ঐ আকরিকের মধ্যে উপস্থিত ইউরেনিয়াম পরমাণুর সংখ্যা N হয়, তবে স্পষ্টতই $(N_0\text{-}N)$ সংখ্যক সীসার পরমাণু উপস্থিত থাকবে ঐ আকরিকে। আর তেজস্ক্রিয় ভাঙ্গনের নীতি প্রয়োগ ক'রে ঘনীভূত আকরিকের বয়স অর্থাৎ বিশ্বের আণুমানিক বয়স পাওয়া যাবে নীচের সূত্র থেকে।

$$t = \frac{1}{\lambda} \log_e \frac{N_0}{N}$$

যেখানে λ হ'চ্ছে ইউরেনিয়াম মৌলের ভাঙ্গন ধ্রুবক (Disintegration Constant),

ভর বর্ণালীবীক্ষণযন্ত্রের (Mass Spectrometer) সাহায্যে সীসার পরমাণু সংখ্যা $(N_0\text{-}N)$ এবং বর্তমানে উপস্থিত ইউরেনিয়াম পরমাণুর সংখ্যা N মেপে নিয়ে বিশ্বের বয়স t উপরের সমীকরণ থেকে পাওয়া যেতে পারে। ইউরেনিয়াম্-238 এর উৎপাদন ও প্রাচুর্য্যের অনুপাত থেকে এই সব মৌলের বয়স পাওয়া গেছে 6 থেকে 7 বিলিয়ান বছর (1 বিলিয়ান $= 10^9$)।

সম্প্রসারণবাদ থেকে বিশ্বের বয়স

1929 খৃস্টাব্দে নীহারিকার বর্ণালীতে লাল-সরণ (Red-Stift) লক্ষ্য ক'রে আমেরিকার বিজ্ঞানী হাবল্ তাঁর সম্প্রসারণ তত্ত্ব আবিষ্কার করার সাথে সাথেই জ্যোতিপদার্থবিদ্যার এক বিরাট দিগন্ত খুলে গেলো।

হুইসেল্ দিতে দিতে এগিয়ে আসতে থাকা কোনও চলন্ত রেলগাড়ীর হুইসেলের শব্দ, স্টেশনের প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা কোনও ব্যক্তির কাছে ক্রমশঃ তীক্ষ্ণতর মনে হয়। আবার ট্রেনটা প্লাটফর্ম ছাড়িয়ে চলে যেতে থাকলে হুইসেলের তীক্ষ্ণতা ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে বলে মনে হয় ঐ ব্যক্তির কাছে।

তরঙ্গ-উৎস এবং পর্যবেক্ষকের মধ্যে আপেক্ষিক গতি বজায় থাকার দরুণ, তরঙ্গ কম্পাঙ্কের এই আপাত পরিবর্তনের ঘটনা, বিজ্ঞানী ডপলার আবিষ্কার করেন ব'লে এর নাম ডপলারের নীতি (Doppler effcet)। আলোক-তরঙ্গের বেলাতেও এ নীতি সমভাবে প্রযোজ্য। দূরের নীহারিকার আলোকে বার্ণালী বীক্ষণযন্ত্রে পরীক্ষা ক'রে হাবল দেখলেন যে বর্ণালী রেখা অপেক্ষাকৃত বড় তরঙ্গের দিকে অর্থাৎ লাল আলোর দিকে ক্রমশঃ সরে যাচ্ছে। এ ধরনের লাল সরণ নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে ঐ নীহারিকা আমাদের পৃথিবী থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছে। দীর্ঘ 10 বছর ধ'রে হাবল্ এ ঘটনা নিয়ে নানা পরীক্ষা করে সম্প্রসারণশীল বিশ্ব তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা ক'রেন এবং দেখান যে নক্ষত্র, নীহারিকা, প্রভৃতি জ্যোতি-পদার্থগুলি আমাদের থেকে যত দূরে যাচ্ছে, তাদের অপসারণ বেগও তত বাড়ছে। এ সম্পর্কে তাঁর সমীকরণটি হ'লো—

$$r = \frac{C\text{-}Z\text{-}}{H}$$

যেখানে r = জ্যোতিষ্কটির দূরত্ব, C = আলোর বেগ -Z- = লাল সরণের মান এবং H = হাবল্-ধ্রুবক। আবার ডপলারের নীতি অনুযায়ী—

$$V = \frac{C\,(\lambda^1 - \lambda)}{\lambda}$$

যেখানে V = জ্যোতিষ্কের দূরাপসারণ বেগ

λ^1 = আলোকের আপাত-তরঙ্গ দৈর্ঘ্য।

λ = আলোকের প্রকৃত তরঙ্গ দৈর্ঘ্য।

$$-Z- = \frac{\lambda^1 - \lambda}{\lambda} = \text{লাল সরণের মান}$$

অতএব, $t = \frac{r}{V} = \frac{I}{H}$ = হাবল্-কাল বা বিশ্ব সম্প্রসারণের বয়স।

উপরের সূত্রটির দিকে তাকালেই বোঝা যায় যে কোনও জ্যোতিষ্কের অপসরণ বেগ (V) এবং আমাদের পৃথিবী থেকে তার দূরত্ব (r) সঠিকভাবে মাপতে পারলেই, হাবল্-ধ্রুবকের নির্ভরযোগ্য মান নির্ণয় করা যাবে আর তাহলেই জানা যাবে বিশ্বের বয়স।

জ্যোতিষ্কের উল্লেখযোগ্য লালসরণ থাকলে, তার বর্ণালীরেখা পরীক্ষা করে যথেষ্ট নির্ভুলভাবে তার অপসরণ বেগ মাপা চলে। কিন্তু তার দূরত্ব নির্ণয় ঠিক ততটা সহজ নয়। জ্যোতিষ্কটি অপেক্ষাকৃত কাছের বস্তু হ'লে লম্বণ (Parallax) বা ত্রিকোণমিতির সাহায্যে তার দূরত্ব মাপা যায়। দূরবর্তী জ্যোতিষ্কের দূরত্ব মাপা হয় তার আপাত ঔজ্জ্বল্যের পরিমাণ নির্ণয় করে। দূরত্বের বর্গের ব্যস্ত অনুপাতে বদলায় জ্যোতিষ্কের ঔজ্জ্বল্য। নির্ভরযোগ্যভাবে হাবল্-ধ্রুবক মাপার জন্য যথেষ্ট অপসরণ বেগ সম্পন্ন রীতিমত দূরবর্তী একটা নক্ষত্র জগৎ বেছে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত। নীচের তালিকায় সম্প্রতি নির্ণীত হাবল্‌ধ্রুবকের কয়েকটা মান ও বিশ্বের বয়স সম্পর্কিত তথ্য দেওয়া হ'লো—

সারণী

আবিষ্কারের সাল	আবিষ্কর্তার নাম	লক্ষ্য বস্তু	হাবল্ ধ্রুবক কিমি/সেকেণ্ড/মিলিয়ন পারসেক এককে	বিশ্বের বয়স বিলিয়ন বছর এককে
1936	হাবল্	নিকটবর্তী নক্ষত্র জগৎ	526	1·86
1950	বাডে	হাবল্ ত্রুটি সংশোধন ক'রে	200	4·89
1958	স্যানডেজ	ঐ	50.100	19.58 থেকে 9.79
1968	রাসিন ও স্যানডেজ	ভির্গো নীহারিকাপুঞ্জ	77	12.7
1969	ভোদুলয়র	ঐ	50	19.58
1970	ভ্যান ডেনবার্গ	অতিনোভা	95	10.3
1975	স্যানডেজ ও টাম্‌মান	ঐ	55	17.8

তালিকায় যে সব মান দেওয়া হ'লো তাদের মধ্যে গোড়ার দিকে নির্ণীত হাবল্ ধ্রুবকের মান রয়েছে 50 থেকে 100 কি.মি./সেকেণ্ড/মিলিয়ন পারসেক সীমার মধ্যে। অতএব মাঝামাঝি মান 75 কি. মি/. সেকেণ্ড/মিলিয়ন পারসেক হাবল ধ্রুবক হিসাবে মেনে নিলে বিশ্বের বয়স দাঁড়াচ্ছে প্রায় 13 বিলিয়ন বছর। এ পর্য্যন্ত এইরকম মানটিই বিজ্ঞানীদের কাছে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য। হয়তো বা অদূর ভবিষ্যতে আবিষ্কৃত হবে নতুন কোনও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি যার সাহায্যে আমরা আরও নির্ভুলভাবে জানতে পারবো বিশ্বের প্রকৃত বয়স। মানুষের চেষ্টাও তো আর থেমে নেই।

কৃত্রিম রেশম—ভিস্কোজ রেয়ন

সুব্রত সরকার*

1891 খৃস্টাব্দে সি. এফ. ক্রশ এবং ই. জে. বেভান (C.-F. CROSS & E. J. BEVAN) নামে দুই বিজ্ঞানী সেলুলোজ থেকে অদ্ভুত রকমের চাকচিক্যময় এক ফাইবার (Fibre) বা তন্তু আবিষ্কার করলেন, যা দেখতে অবিকল রেশমের মত। প্রথম দিকে এই নবজাত তন্তুটিকে বস্ত্রশিল্প জগতে আসন লাভ করতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। তারপর যখন এর আচার-ব্যবহারে শিল্পমালিকেরা সন্তোষ প্রকাশ করলেন এবং দেখতে পেলেন এত সস্তায় এতবেশি সেবায় নিয়োজিত হতে পারে, তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে এই নবজাত তন্তুটি কৃত্রিম রেশম (Artificial Silk) উপাধি নিয়ে ক্রেতা জগতে নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করে ফেলল। বয়নশিল্প জগতে এই নবজাত তন্তুটির নাম দেওয়া হয়েছে ভিস্কোজ ফাইবার (VISCOSE FIBRE) বা ভিস্কোজ রেয়ন।

শুধুমাত্র পোশাকেই নয়, পর্দা, চেয়ার ও কুশনের ঢাকা, লেপ-তোশক-বালিশের ওয়াড়, গাড়ির আসন, বিভিন্ন ধরণের আবরণী হিসাবে ও আরো নানা কাজে এই অত্যন্ত সস্তা ও সুন্দর তন্তুটির ব্যবহার আজ সুপ্রসিদ্ধ। বিশেষতঃ সুতি বস্ত্রের দাম যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে তার পরিপূরক হিসেবে ভারতের মত গরীব দেশে আজ পলিয়েস্টার-কটন্ (পলিবস্ত্র) এর পরিবর্তে পলিয়েস্টার ভিস্কোজ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে এবং সেইমত বিভিন্ন কাপড়ের কলে উৎপাদনও শুরু হয়েছে।

এই কৃত্রিম রেশম বা ভিস্কোজ তন্তু কিভাবে তৈরী হয় এবার সে প্রসঙ্গে আসি।

ভিস্কোজ তন্তু উৎপাদনের মূল উপাদান সেলুলোজ। তাই এই তন্তুটিকে কখনো কখনো 'পুনরুৎপাদিত সেলুলোজ তন্তু' (Regenerated Cellulose Fibre) বলে। সবচেয়ে সস্তায় প্রচুর সেলুলোজ পাওয়া যায় বনে-জঙ্গলে-গাছে। কাঠ কেটে আনা হয় পাতলা চাকতির মত করে। শুকনো ছালগুলো ছাড়িয়ে ফেলা হয়। এবার ক্যালসিয়াম বাইসালফাইটে ভিজিয়ে রাখা হয় কিছুক্ষণ। সেই অবস্থাতেই বারো-চোদ্দ ঘন্টা ফোটানো হয় বাষ্পে। এতে শক্ত কাঠ তার মূল উপাদান সেলুলোজ ও অন্যান্য উপাদানে ভেঙ্গে যায়। ফলে সেলুলোজ বিশুদ্ধ অবস্থায় বের করে আনা সহজ হয়। এইভাবে ফোটানোর পর সেলুলোজের ছিবড়েগুলো জলে ধুয়ে ফেলা হয় এবং প্রয়োজন বোধে বিরঞ্জিত করা হয়। সেলুলোজ ছিবড়েগুলো চাপ দিয়ে পাতলা পাতের আকৃতি দেওয়া হয়। এতে প্রায় নব্বই থেকে পঁচানব্বই শতাংশ সেলুলোজ থাকে। (বিভিন্ন পর্যায়ের রাসায়নিক বিক্রিয়ার সমীকরণ চিত্র নং 1 এ দেখানো হয়েছে)।

1. $(C_6H_{10}O_5)_n + nNaOH \rightarrow (C_6H_9O_4ONa)_n + nH_2O$

সেলুলোজ কস্টিকসোডা সোডাসেলুলোজ

2. $(C_6H_9O_4ONa)_n + nCS_2 \rightarrow$

সোডাসেলুলোজ কার্বন-ডাই সালফাইড

3.
```
            CHOH·CHO·CS·SNa
           /               \
   —O—CH                    HC—    + ½H2SO4
           \               /
            CH——————O
            |
            CH2OH
```

সোডিয়াম সেলুলোজ জ্যানথেট

↓

4.
```
       CHOHCHOH
      /        \
 —O—CH          HC—    + CS2 + ½Na2SO4
      \        /
       CH————O
       |
       CH2OH
```

ভিস্কোজ
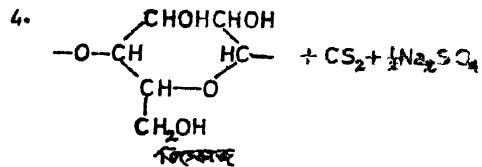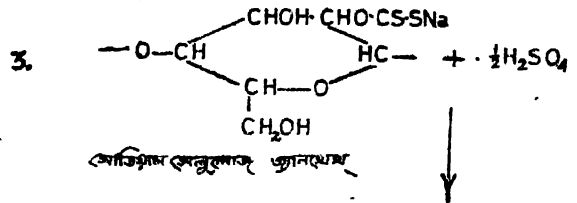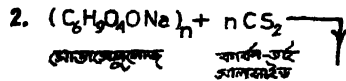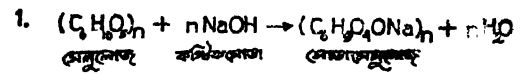
1নং চিত্র

এই সেলুলোজের পাতগুলো একটা নিয়ন্ত্রিত আবহকক্ষে নির্দিষ্ট আদ্রতা ও তাপমাত্রায় দুদিন রাখা হয়। তারপর 17.5% কস্টিকসোডার সঙ্গে তিন থেকে চার ঘন্টা বিক্রিয়া ঘটানো হয়। সেলুলোজ ফুলে ফেঁপে ওঠে। হেমিসেলুলোজ দ্রবীভূত হয়ে বাদামী বর্ণের তরল সৃষ্টি করে বিশুদ্ধ সোডাসেলুলোজ অদ্রবীভূত অবস্থায় থেকে যায়। এবং তাকে পৃথক করা হয় এবং হাইড্রলিক প্রেসে চাপ দিয়ে অতিরিক্ত ক্ষার নিংড়ে বের করে দেওয়া হয়। (এই অতিরিক্ত ক্ষার পার্চমেন্ট কাগজের ভেতর দিয়ে ছেঁকে পুনরায় ব্যবহার করা হয়, তাতে খরচ কমে)।

* ডিপার্টমেন্ট অব টেকসটাইল টেকনলজী, আই. আই. টি. দিল্লী, নতুন দিল্লী-1100

সোডাসেলুলোজের পাতগুলো এবার টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলা হয়। পরবর্তী পর্যায়ের নাম এজিং (Ageing)। এখানে একটি ঢাকনাওলা গ্যালভ্যানাইসড পাত্রে টুকরোগুলো রেখে ঢাকনা চাপা দিয়ে দেওয়া হয়। ঢাকনার মাথায় একটি ছিদ্র থাকে। সেই ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে বায়ুর অক্সিজেনের সঙ্গে সোডাসেলুলোজ বিক্রিয়া করে। সেলুলোজ অণুর মধ্যে অবস্থানরত ও গ্লুকোজ একক কমতে থাকে (800 থেকে কমে প্রায় 350) এই ভাঙ্গন তাপমাত্রা ও সময়ের ওপর নির্ভর করে। সাধারণত 22°C তাপমাত্রায় সাড়ে তিন দিন রাখা হয়। এই জারণ প্রক্রিয়ার ওপর উৎপাদিত ভিস্কোজ তন্তুর গুণ-ধর্ম বিশেষভাবে নির্ভরশীল।

এজিং পদ্ধতির পর সেই সোডাসেলুলোজের টুকরোগুলো একটি বায়ুনিরুদ্ধ ষড়ভুজ চোঙের পাত্রে রেখে তার সঙ্গে মোট সোডাসেলুলোজের ওজনের দশ-শতাংশ কার্বন-ডাই-সালফাইড মেশানো হয়। এরপর বায়ুনিরুদ্ধ পাত্রটি প্রায় তিনঘন্টা ঘোরানো হয়; বিক্রিয়ার ফলে কমলা রঙের একটি ঘন থক্‌থকে পদার্থ তৈরী হয় যার নাম সোডা-সেলুলোজ জ্যানথেথ (Soda-Cellulose-Xanthate)। সেইজন্য এই বিক্রিয়াটিকে জ্যানথেশন (Xanthation) বলে। বিক্রিয়ার পর উৎপাদিত পদার্থটি একটি মিশ্চশারে লঘু কস্টিক সোডার সঙ্গে চার-পাঁচ ঘন্টা মিশ্রিত করা হয়। সোডাসেলুলোজ জ্যানথেথ্‌ মধুর মত বাদামী রঙের গাঢ় তরলে পরিণত হয়। উৎপন্ন পদার্থটির এই গাঢ়তার জন্যই একে "ভিস্কোজ" (Viscose) নাম দেওয়া হয়েছে। এই ভিস্কোজ কিন্তু বিশুদ্ধ নয়। তাই সুতো তৈরী করার আগে এটিকে বিশুদ্ধ করা প্রয়োজন। এই ভিস্কোজ এরপর আরেকটি বড় পাত্রে রেখে নাড়া হয়। তখনও এমন কিছু অবিক্রিত সেলুলোজ থেকে যায়, যা থেকে ভিস্কোজটিকে পরিশুদ্ধ করার জন্য ছাঁকা (Filter) প্রয়োজন। প্রথমে একটি পশম ও তুলোর তৈরী ছাঁকনি এবং দ্বিতীয়বার শুধুমাত্র সুতিবস্ত্রের ছাঁকনি (Cotton Filter cloth) ব্যবহার করা হয়।

এই বিশুদ্ধ ভিস্কোজ দ্রবণটিকে চার থেকে পাঁচ দিন 10-18°C এ রাখা হয়; গাছে যেমন ফল ধরার পর পেকে পরিপুষ্ট খাদ্যপযোগী হতে কয়েকদিন সময় লাগে, তেমনি ভিস্কোজ দ্রবণ থেকে সুতো তৈরীর আগে তাকে পরিপুষ্ট হতে কয়েকদিন সময় দেওয়া হয়। তাই এই পদ্ধতির নাম রাখা হয়েছে রাইপেনিং (Ripening)। রাইপেনিং একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়; সুতো তৈরীর আগে দেখে নেওয়া হয় দ্রবণটি পরিপুষ্ট হয়েছে কিনা। সবচেয়ে সহজ পরীক্ষা হ'ল 40% অ্যাসিডে অ্যাসেটিক ভিস্কোজ দ্রবণটিকে দ্রবীভূত করার চেষ্টা করা। দ্রবণটি অপরিপুষ্ট থাকলে দ্রবীভূত হয়ে যাবে, কিন্তু যদি দ্রবণটি পরিপুষ্ট হয় তবে পাত্রের তলায় থিতিয়ে পড়বে, বুঝতে হবে রাইপেনিং পর্যায় সমাপ্ত হয়েছে। তবে বর্তমানে অ্যামনিয়াম ক্লোরাইড (আবিষ্কর্তার নামানুসারে একে 'হটনুরথ্‌' পরীক্ষাও বলা হয়) পরীক্ষাটি বেশী জনপ্রিয়। এই পরীক্ষায় ভিস্কোজ দ্রবণ কতখানি পরিপুষ্ট হয়েছে তা সরাসরি বোঝা যায়।

পরিপুষ্ট ভিস্কোজ দ্রবণ একটি পাত্রে চব্বিশ ঘন্টা রেখে দেওয়া হয় যাতে দ্রবীভূত সমস্ত বায়ু বেরিয়ে যেতে পারে। এই ভিস্কোজ দ্রবণ আরো একবার ফিল্টার করে পাম্পের সাহায্যে উচ্চ চাপে (2 6 থেকে 5 বায়ু চাপ) একটি অসংখ্য সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত ছোট পাত্রের মধ্যে দিয়ে পাঠানো হয়। এই অসংখ্য সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত পাত্রটিকে বলা হয় 'স্পিনারেট' (Spinneret); (চিত্র নং 2)
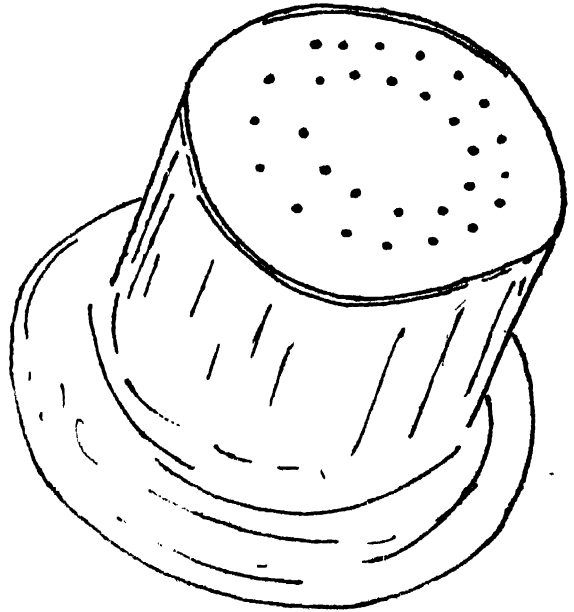
2 নং চিত্র

স্পিনারেটটি একটি অ্যাসিডপূর্ণ পাত্রে ডুবিয়ে রাখা হয়। স্পিনারেটের এক একটি ছিদ্রের ব্যাস 0·05-0·1 মি. মি.। অর্থাৎ এই একটি ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে যে ফিলামেন্ট (Filament) বা লম্বা তন্তুটি বেরিয়ে আসবে তার ব্যাস ওই ছিদ্রের ব্যাসের সমান। এই রকম সব ছিদ্র দিয়ে যে অসংখ্য ফিলামেন্ট বেরিয়ে আসে (তাকে মাল্টি-ফিলামেন্ট (Multifilament) বলে) তা একটি ববিনে

জড়ানো হয়। বিভিন্ন আকৃতি ও পরিমাপের ছিদ্রযুক্ত স্পিনারেট প্রয়োজনমত ব্যবহার করা হয়। স্পিনারেট থেকে সুতো বেরনো মাত্র অ্যাসিডপূর্ণ স্পিনিংবাথের অ্যাসিড ও অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে বিক্রিয়া করে তরল ভিস্কোজকে শক্ত সুতোয় পরিণত করে।

স্পিনারেটটি নিমজ্জিত রাখা হয়—

10 শতাংশ সালফিউরিক অ্যাসিড
18 শতাংশ সোডিয়াম সালফেট
2 শতাংশ গ্লুকোজ
1 শতাংশ জিঙ্ক সালফেট

ও 69 শতাংশ জলের একটি মিশ্রণ পূর্ণ পাত্রে, যাকে স্পিনিং পাত্র (Spinning bath) বলে।
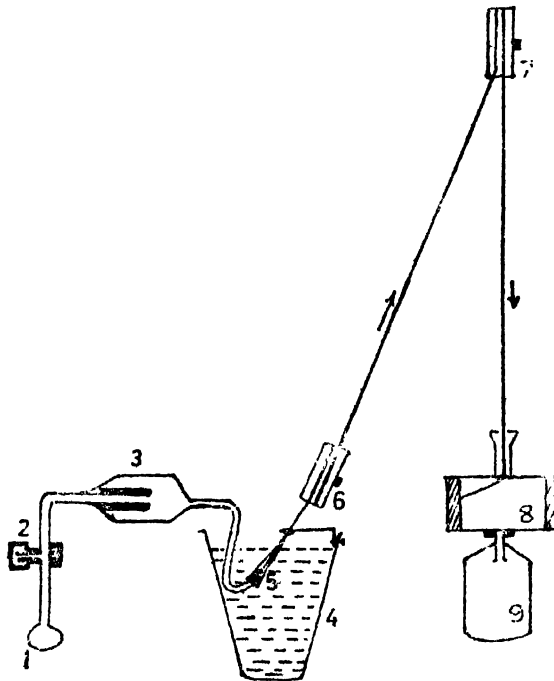
3 নং চিত্র

3নং চিত্রের সাহায্যে কৃত্রিম রেশম-সুতো তৈরির মূল অংশটি দেখানো হয়েছে। পাম্প (2), ফিল্টারের (3) মধ্য দিয়ে অ্যাসিড পূর্ণ পাত্রে (4) নিমজ্জিত স্পিনারেটের (5) মাধ্যমে ভিস্কোজ সুতো তৈরি করছে। এই স্পিনিং পাত্রটি (4) 40-55°C তাপমাত্রায় রাখা হয়। স্পিনিং বাথের উপাদানগুলি ও তার আনুপাতিক পরিমাণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সোডিয়াম সালফেট—সোডিয়াম সেলুলোজ জ্যানথেথকে গাঢ় ভিস্কোজ দ্রবণে, পরে ভিস্কোজ ফিলামেন্টে পরিণত করে। সালফিউরিক অ্যাসিড সেই জ্যানথেথকে পুনরায় সেলুলোজে পরিণত করে। সেলুলোজ থেকে পুনরায় সেলুলোজে (কিন্তু ভিন্ন আকারে) পরিণত করা হয় বলে এই তন্তুটিকে পুনরুৎপাদিত সেলুলোজ-তন্তু (Regenerated Cellulose fibre) বলে। স্পিনিং-বাথের অন্যান্য উপাদানের মধ্যে গ্লুকোজ প্রস্তুত ফিলামেন্টটিকে নমনীয়তা দান করে, এবং জিঙ্ক সালফেট উৎপাদিত সুতোর শক্তি (strength) বাড়ায়। স্পিনিং-বাথের তাপমাত্রা, বিক্রিয়ার হার, কতক্ষণ নিমজ্জিত রাখা হচ্ছে। কি হারে সুতো তৈরী হচ্ছে, তার ওপর উৎপাদিত সুতোর গুণ ধর্ম অনেকাংশে নির্ভরশীল।

স্পিনারেট থেকে বেরিয়ে আসা ফিলামেন্টগুলি অতঃপর প্রথমে নিম্ন গোডেট (Bottom Godet) রোলার (6) ও পরে উচ্চ গোডেট (top Godet) রোলারের (7) ওপর জড়িয়ে আবার নীচের দিকে একটি চৌকান বাক্সে (Topham Box) (8) আনা হয়। উচ্চ গোডেট রোলারের ঘূর্ণন বেগ (speed) নিম্ন গোডেট রোলারের চেয়ে বেশী রাখা হয় যাতে ফিলামেন্টগুলো সর্বোচ্চ শক্তির (Maximum strength) অধিকারী হতে পারে। চৌকাম্ বাক্স জোরে ঘোরার ফলে প্রস্তুত ভিস্কোজ রেয়ন (Viscose Rayon) সুতো cake-আকারে জমা হয়। সেই সঙ্গে প্রয়োজন মত সুতোতে কিছু পাক (Twist) দেয়।

চৌকাম বাক্স থেকে ভিস্কোজ কেকের আকারে যে সুতো পাওয়া যায় তা বিশুদ্ধ নয়। তাকে প্রথমে ভালো করে জলে ধোওয়া হয়, তারপর ডি সালফুরাইজিং ও বিরঞ্জন করে আবার পরিষ্কার জলে ধোওয়া হয়।

প্রস্তুত কৃত্রিম রেশম বা ভিস্কোজ রেয়ন লম্বা সুতোর আকারে বা কেটে কেটে ছোট তন্তুর আকারে বিক্রি করা হয়। বর্তমানে অবশ্য উচ্চশক্তি সম্পন্ন (High tenacity) ভিস্কোজ তৈরী হচ্ছে যেখানে প্রাথমিক সেলুলোজ দ্রবীকরণের জন্য বেশী পরিমাণ কার্বনডাই সালফাইড ব্যবহার করা হয় এবং এজিং ও রাইপেনিং পর্যায় তুলে দেওয়া হয়েছে।

সাধারণ ভিস্কোজ রেয়নের শুকনো অবস্থায় শক্তি ভিজে অবস্থার চেয়ে বেশি। 12-13% জল ধারণ ক্ষমতা আছে। স্থিতিস্থাপকতা অনেক কম। একবার টেনে ছেড়ে দিলে পুরোপুরি আগের অবস্থায় ফিরে আসতে পারে না। আপেক্ষিক গুরুত্ব 1·52। শুষ্ক অবস্থায় তড়িৎ অপরিবাহী রোদে রেখে দিলে শক্তি হ্রাস পায়। অনেকক্ষণ উচ্চতাপমাত্রায় রেখে দিলে হলুদ বর্ণ ধারণ করে। অ্যাসিড সহজেই ভিস্কোজ রেয়ন নষ্ট করে দেয়। সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড-এর সবচেয়ে ভালো বিরঞ্জক। একে সহজেই রঙ করা যায়।

ভিস্কোজ রেয়ন ছাড়াও অ্যাসিটেট রেয়ন (Acetate Rayon) বা কিউপ্রোঅ্যামোনিয়াম রেয়ন (Cupro Amonium Rayon) ও কৃত্রিম রেশম পর্যায়ভুক্ত। এগুলো নিয়ে পরে আলোচনা করা যাবে।

পরিবেশ দূষণ ও অ্যাসিড বৃষ্টি

অম্বরীষ গোস্বামী*

প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে মানুষের অস্তিত্ব কল্পনাই করা যায় না। চিন্তা করবার এবং তাকে কাজে লাগাবার সহজাত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে মানুষ আজ পৃথিবীর অধিপতি হিসেবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেও প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীলতা তার আজও রয়ে গেছে। আমাদের মানসিক তৃপ্তি প্রদানকারী যূঁই-গন্ধরাজের গা ছোঁয়া ভারী বাতাস যেমন প্রকৃতির দান তেমনই আমাদের অতি প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের একচেটিয়া কারবারীও হলেন প্রকৃতি দেবী। ঝড়, বন্যা ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রকৃতির বিধ্বংসী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে যেমন আমরা লড়াই করি তেমনই আমরা প্রকৃতির মঙ্গলময় দিকগুলির প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে পারি না।

সাম্প্রতিক কালে শিল্প-কল-কারখানার অভাবনীয় উন্নতি এবং বিস্তার এবং তৎসহ বিবেকহীন স্বার্থলোভী কিছু মানুষের ক্ষতিকর কার্যকলাপের ফলে সমগ্র পৃথিবী এক দুর্বিসহ অবস্থায় এসে পড়েছে।

পিতামাতার স্নেহের মত যেইসব জিনিষ পেতে আমাদের কষ্ট করতে হয় না, তাদের সম্যক মূল্য আমরা বুঝি না। জল এবং বায়ু এই পৃথিবীর এমন দুটি বস্তু যার জন্য এই দুর্মূল্যের বাজারেও আমাদের পয়সা খরচ করতে হয় না। অথচ দূরদর্শিতার অভাবে এবং অতিরিক্ত লাভের পেছনে ছুটতে ছুটতে আমরা এই দুই অতিপ্রয়োজনীয় বস্তুকেই অত্যন্ত দূষিত করে ফেলেছি। এর ফলে আমরা যে কেবল এই সুজলা সবুজ গ্রহের অন্যান্য বাসিন্দাদের অবলুপ্তির দিকে ঠেলে দিচ্ছি তা নয়, আমরা নিজেরাও পায়ে পায়ে এসে দাঁড়াচ্ছি এক অতলান্ত খাদের সামনে—যে খাদ আমাদের নিজেদেরই সৃষ্ট।

বিংশ শতাব্দীর বয়স যতই বাড়ছে আমরা ততই বায়ু দূষণ এবং জল দূষণের বিচিত্র সব ভয়ংকর পরিণতির সঙ্গে পরিচিত হচ্ছি। বায়ুদূষণের এমনই এক রূপ হল "অ্যাসিড বৃষ্টি"। প্রাকৃতিক জলের বিশুদ্ধতম অবস্থা বৃষ্টির জলে বাসা বাঁধছে ক্ষতিকর সব অ্যাসিড এবং ঐ অ্যাসিডবাহী বৃষ্টি ভূপৃষ্ঠে নেমে আসছে আশীর্বাদ হয়ে নয়—অভিশাপ হয়ে।

অ্যাসিড বৃষ্টির কারণ অনুসন্ধান করতে হলে আমাদের কোন দ্রবণের অম্লত্ব বা ক্ষারত্ব সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। রসায়নবিদ্যার গভীরে প্রবেশ না করে মোটামুটি এইটুকু বলা যায় যে, দ্রবণকে সাধারণভাবে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—আম্লিক, ক্ষারীয় এবং নিরপেক্ষ (Neutral)। নিরপেক্ষ দ্রবণে H^+ আয়ন এবং OH^- আয়নের পরিমাণ থাকে সমান সমান। আম্লিক দ্রবণে H^+ আয়নের পরিমাণ অধিক এবং ক্ষারীয় দ্রবণে OH^- আয়নের পরিমাণ অধিক (অর্থাৎ H^+ আয়নের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম)। কোন দ্রবণের অম্লত্ব বা ক্ষারত্ব প্রকাশ করতে আমরা pH স্কেলের সাহায্য নিই। একটি দ্রবণের H^+ আয়নের তীব্রতাকে ঋণাত্মক লগারিদমিক স্কেলে প্রকাশ করলে আমরা সেই দ্রবণের pH পাই।

সাধারণত বৃষ্টির জলে, বায়ুমণ্ডলীয় CO_2 দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে এবং এই কারণে বৃষ্টির জল কিঞ্চিৎ আম্লিক। অম্লত্বের মান pH 5·8 বা তার কাছাকাছি হলে আমরা তাকে "স্বাভাবিক" বলি। অম্লত্ব এর চাইতে বেশী হলে অর্থাৎ pH এর মান 5·8-এর কম হলে আমরা তাকে "অ্যাসিড বৃষ্টি" আখ্যা দেব। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে আজ অবধি যে সব অ্যাসিড বৃষ্টির তীব্রতা মাপা হয়েছে, তাদের মধ্যে তীব্রতম বৃষ্টি হয়েছিল পশ্চিম ভার্জিনিয়াতে এবং ঐ বৃষ্টির pH মান ছিল 1·50।

এখন প্রশ্ন হল বৃষ্টির জলে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী অ্যাসিড আসে কি করে এবং কি কি ধরণের অ্যাসিড আমরা দেখতে পাই?

প্রতিদিন পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ টন তেল, কয়লা এবং অন্যান্য জ্বালানী পোড়ানো হচ্ছে প্রধানত শিল্পের চাকাকে গতিময় করতে। এই সমস্ত জ্বালানীতে রয়েছে নাইট্রোজেন এবং সালফার ঘটিত যৌগ যেগুলি দহনকার্যের সময় অক্সাইডে পরিণত হয়। বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেনও সূর্যালোক এবং তড়িৎ মোক্ষণে সংশ্লিষ্ট হয়ে অক্সাইডে পরিণত হয়। বৃষ্টির জলে দ্রবীভূত হয়ে অক্সাইডগুলি অ্যাসিড তৈরি করে।

* পি-27 মেট্রোপলিটন হাউজিং সোসাইটি, পোস্ট : ধাপা ; কলিকাতা-700 039

1. নাইট্রোজেন $\xrightarrow[\text{(দহন)}]{\text{(তড়িৎ মোক্ষণ)}}$ নাইট্রোজেনের বিভিন্ন অক্সাইড $\xrightarrow{\text{(বায়ুমণ্ডলীয় জারণ ক্রিয়া)}}$ নাইট্রোজেন-ডাই অক্সাইড $\xrightarrow{\text{(জলীয় দ্রবণ)}}$ নাইট্রিক অ্যাসিড (HNO_3)

2. সালফার (গন্ধক) $\xrightarrow{\text{(দহন)}}$ সালফার-ডাই-অক্সাইড $\xrightarrow{\text{(জলীয় দ্রবণ)}}$ সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4)

পৃথিবীর ওপর ঝরে পড়া এইসব মারাত্মক রাসায়নিক পদার্থগুলির ক্রিয়া বিভিন্ন রকম ঃ

খনিজ সম্পদ

গাছের প্রয়োজনীয় লবণ সমূহ "গ্রহণীয়" রূপে মিশ্রিত থাকে মৃত্তিকায় এবং মূল দ্বারা ঐ লবণ শোষণ করে গাছ নিজের পুষ্টিসাধন করে। পরীক্ষায় দেখা গেছে বৃষ্টির জলের pH-এর মাত্রা বেশী কমে গেলে গাছের প্রয়োজনীয় বেশ কিছু লবণ (Ca, Mg ঘটিত) দ্রবীভূত হয়ে মাটির অত্যন্ত গভীরে মূলের নাগালের বাইরে চলে যায়। এর ফলে গাছের পুষ্টিসাধন ব্যাহত হয়।

এছাড়া মৃত্তিকায় কিছু অপ্রয়োজনীয় এবং বিষাক্ত লবণ (যেমন Al-ঘটিত) থাকে যেগুলি সাধারণ জলে অদ্রাব্য। বৃষ্টিতে অ্যাসিড থাকলে ঐ সমস্ত লবণ দ্রবীভূত হয়ে যায় এবং গাছের দেহে প্রবেশ করে বিষ ক্রিয়া ঘটায়।

অ্যাসিড বৃষ্টির এই ক্ষতিকর প্রভাব পৃথিবীর বিস্তীর্ণ বনভূমি অঞ্চলে প্রত্যক্ষ করা গেছে। দেখা গেছে মাইলের পর মাইল জুড়ে অবস্থিত ব্যাপক বনভূমির সুবৃহৎ বৃক্ষদানবেরা আপাত অজ্ঞাত কারণে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে। কানাডার ভারমণ্ট অঞ্চলের "ক্যামেলস হাম্প" নামক চিরহরিৎ অরণ্যের রেড স্প্রুস নামক মূল্যবান গাছের বংশ লোপ পেতে বসেছে কেবলমাত্র বায়ুদূষণ এবং অ্যাসিড বৃষ্টির কারণে। হত্যাকারী এক্ষেত্রে বুদ্ধিমান মানুষজাতি যারা কিনা চিন্তা করবার ক্ষমতা রাখে।

জলজ প্রাণী

বৃষ্টির জলে অ্যাসিডের তীব্রতা মাত্র এক বছরে আড়াই-শ'গুণ বেড়ে যাবার ফলে আমেরিকার কোন এক হ্রদে পরীক্ষামূলক ভাবে ছেড়ে রাখা 4000 স্যামন মাছের এক ঝাঁক পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল।

যে সমস্ত হ্রদের তলা চুনাপাথর জাতীয় পদার্থ দিয়ে তৈরী, সেগুলি অ্যাসিড বৃষ্টির প্রকোপ কিছুটা নিষ্ক্রিয় করতে পারে। বিপদ হয় অন্য হ্রদগুলির। এই সব হ্রদগুলির স্বাভাবিক জলজ উদ্ভিদ এবং যাবতীয় জীবন্ত প্রাণীর মৃত্যু ঘটে বৃষ্টির জলে অ্যাসিডের পরিমাণ মাত্রা ছড়ালে। পরিবর্তে গড়ে ওঠে অ্যাসিড-প্রতিরোধক এক শ্রেণীর শ্যাওলার সংসার—হ্রদের একদম নীচতলায়। জল থাকে পরিষ্কার ও শান্ত, তাতে উঁকি দিয়ে যাবার মত এ টি মাছও অবশিষ্ট থাকে না।

বৃষ্টির জলের pH মাত্রা 5-এর নীচে নামলে মাছ ডিম পাড়তে পারে না—পারলেও বিকৃত সব মৎস্য শিশুর জন্ম হয় ঐ ডিম থেকে। দেহের হাড়ের কাঠামো দুর্বল হয়ে যাবার জন্য বড় বড় মাছেরও দৈহিক বিকৃতি ঘটতে পারে। অ্যালুমিনিয়াম ঘটিত বিবিধ বিষাক্ত যৌগ অ্যাসিডে দ্রবীভূত হয়ে জমা হয় মাছের শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রধান অঙ্গ ফুলকোয়। পরিণতি—মৃত্যু।

আমাদের দেশে বহুদিন পর্যন্ত বৃষ্টির জলে অম্লত্ব পরিমাপের কোন ব্যবস্থা ছিল না। সুখের কথা ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টার (BARC) এবং আরও কিছু সংস্থা এই ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছেন। পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে যে অত্যন্ত শিল্প সমৃদ্ধ এবং তৎসন্নিহিত স্থান ছাড়া, ভারতে অ্যাসিড বৃষ্টির সমস্যা খুব একটা গুরুতর নয়। আত্মসন্তুষ্টিতে না ভুগে আমাদের এখনই সচেতন হতে হবে। শিল্পোন্নত দেশগুলির এই অনিবার্য সমস্যা যাতে আমাদের কব্জা করতে না পারে তার জন্য আশু ব্যবস্থা নেওয়া একান্ত কর্তব্য। মনে রাখতে হবে "Prevention is better than cure."

অ্যাসিড বৃষ্টির অ্যাসিডের মুখ্য উপাদান হল সালফিরিক অ্যাসিড এবং এর উৎপত্তি সালফার ঘটিত জ্বালানীর দহন কার্য থেকে। অ্যাসিড বৃষ্টি রোধ করতে আমাদের সালফার ঘটিত জ্বালানী ব্যবহার কমাতে হবে। সৌভাগ্যের কথা আমাদের দেশের কয়লায় সালফারের পরিমাণ অত্যন্ত কম (0·4—0·5% মাত্র)। জলবিদ্যুৎ ব্যবহারের কথা আরও বেশী করে ভাবা দরকার এবং এ ব্যাপারেও ভারতবর্ষের ভূমির গঠন প্রকৃতি অত্যন্ত সহায়ক। তবে সবদিক বিচার করলে মোটামুটি সবাই একমত হবেন এই বিষয়ে যে সম্ভবতঃ পরমাণবিক শক্তি উৎপাদনই অ্যাসিড বৃষ্টির যথার্থ উত্তর।

মৃত্যু তত সহজ নয়

রুহিদাস সাহা*

বেসিলাস, কক্কাস আর ভাইরাসের মতো খালি চোখে অদৃশ্য অসংখ্য শত্রুর সঙ্গে প্রতিনিয়ত বাস করে মানুষের বেঁচে থাকাটা আশ্চর্য ঠিকই, তবুও কিন্তু মানুষ বেঁচে থাকে ; অধিকাংশ মানুষ একটা বিশেষ বয়স পর্যন্ত বাঁচে, পুত্র-পরিজন এমন কি নাতি-পুতি নিয়ে ঘর সংসার করে। এর অন্যতম কারণ অবশ্য বিভিন্ন ধারার উন্নত চিকিৎসা পদ্ধতি, আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি। কিন্তু এমন উদাহরণের তো অভাব নেই যাতে আধুনিক চিকিৎসক চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাঁচে ফেলে বলেন রোগীর সম্পর্কে আর করার কিছু নেই, সেই রোগী যখন চিকিৎসকের ভবিষ্যৎ-বাণী মিথ্যা প্রমাণ করে সুস্থ হয়ে ওঠে তখন চিকিৎসকগণ তার সহজ ব্যাখ্যা খুঁজে পান না। তবে কারণ তো কিছু আছেই। অজ্ঞাত বলেই যে তা নেই এমন হতে পারে না।

এমনও দেখা গিয়েছে রাতে পরিবারের সকলে একই খাবার খেলেও কাউকে মাঝ রাতে বারে বারে ছুটতে হয়েছে পায়খানায়, কেউ কেউ আবার নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে কাটিয়েছে। একই পরিবারের সকলের ভয়ংকর ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত হওয়া এক বিরল ঘটনা। অন্যদিকে এমন নজীরের অভাব নেই যাতে ভয়ংকর ছোঁয়াচে রোগে পরিবারের সকলেই অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

তিন দশক পেরিয়ে চার দশকের মাঝামাঝি হতে চলেছে—ভারত স্বাধীন হয়েছে। এখন ভারতের শতকরা সত্তর জন দারিদ সীমার নীচে। তাদের পেট-ভরা আহার জোটে না। রোগ হলে দু'ফোঁটা ওষুধ তো তাদের কাছে বিলাসিতা। তবুও কিন্তু মৃত্যু বলতে যা বুঝায় তারা তার কবলে পড়ে নি। চরম দারিদ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করেও তারা বেঁচে রয়েছে।

প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, এ অবস্থা কি করে সম্ভব হচ্ছে ? এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করার পূর্বে সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে কিছু জানা দরকার। শীত-গ্রীষ্ম থেকে রক্ষা পেতেই পশুদের গায়ে পযন্ত লোম রয়েছে। প্রাকৃতিক প্রতিরোধক ও অভিযোজন শক্তির বলেই জীব-জগৎ রক্ষা পায়। সেই নিয়মের রাজত্ব থেকে মনুষ্যজাতিও ব্যতিক্রম নয়। মাতৃ-গর্ভে জরায়ুতে 'Liquor Amni' নামক এক ধরণের তরল পদার্থের মধ্যে ভ্রূণ এমনভাবে থাকে যে মায়ের তলপেটে সাধারণ আঘাতেও ভ্রূণের কোন ক্ষতি হয় না। শিশুর জন্মের পূর্বেই প্রথম সন্তানবতী গর্ভিনী মায়ের গর্ভধারণের তৃতীয় মাসেই স্তন্যে দুগ্ধের সঞ্চার হয় শিশুর জন্মের পরে তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে। মানব-দেহ গঠন প্রণালীতেও রয়েছে মানুষকে রক্ষা করার ইঙ্গিত। দুশ ছ'খানি অস্থির সমন্বয়ে এই মানব-দেহ এমনভাবে তৈরী যে সে সহজেই চলাফেরা করতে পারে, ডানে বামে সামনে পিছনে বাঁকতে পারে, আক্রমণ প্রতিহত করতে পারে, আক্রমণ করতে পারে। প্রয়োজনে দৌড়িয়ে নিরাপদ স্থানে যেয়ে সে আত্মরক্ষা করতে পারে। ছোট একটি মশা শরীরের কোন স্থানে কামড়ে দিলে যন্ত্রণার অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে মশাটাকে হাত দিয়ে মেরে ফেলে। যন্ত্রণার অনুভূতি ও মশাটাকে মেরে ফেলার নির্দেশিকার উৎপত্তিস্থল মস্তিষ্ক। প্রকৃতপক্ষে মস্তিষ্কের বলেই মানুষ চলাফেরা করে, দৌড়াতে পারে। মস্তিষ্ক ভিতরে আসা স্নায়ু স্পন্দনকে (Nerve impulses) গ্রহণ করে, ওগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান এবং একত্রিত করার মধ্য দিয়ে দেহের প্রয়োজনীয় প্রতিক্রিয়ার জন্য গতি বিধায়ক স্পন্দন (Motor impulses) উদ্রেক করে। মস্তিষ্কের সাহায্যে পারিপার্শ্বিক শীতাতপ অনুভূত হয়। বুদ্ধি, জ্ঞান, চিন্তা, উপলব্ধি বিচক্ষণতার উৎপত্তিস্থলও এই মস্তিষ্ক। মস্তিষ্কের প্রয়োজনীয়তা দেহের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের তুলনায় শতগুণে বেশী। হাত-পা কেটে বাদ দিয়ে আধুনিক চিকিৎসায় মানুষকে বাঁচিয়ে রাখা যায়। কিন্তু মাথা কেটে ফেললে হৃদস্পন্দন স্তব্ধ হয়ে যায়, ফুস-ফুস, পাকস্থলী, লিভার, কিডনীর ক্রিয়া যায় থেমে, দেহের সমস্ত মাংস-পেশী হয়ে যায় শিথিল, এক কথায় দেহের মৃত্যু ঘটে। এমন অতুল্য প্রয়োজনীয় মস্তিষ্ককে রক্ষা করতে সে কি প্রচেষ্টা! বহু আবরণে আচ্ছাদিত এই মস্তিষ্ক। প্রথমে তিনটি পাতলা আবরণ রয়েছে মস্তিষ্কের—বাইরে থেকে ভেতরে যথাক্রমে ডুরামেটার, এরাকনয়েড মেটার, এবং পায়ামেটার। তার উপর বেশ পুরু অস্থিতে মস্তিষ্ক আচ্ছাদিত। অস্থিগুলির নাম অক্সিপিটাল, প্যারাইটাল, ফ্রন্টাল, টেম্পোরাল প্রভৃতি। অস্থির উপর রয়েছে মাংসপেশী, তার উপর চর্ম, তা চুল দিয়ে আচ্ছাদিত। বাইরের আঘাত থেকে মস্তিষ্ককে

* 310, শরৎ বোস রোড, সুভাষ নগর, কলিকাতা-700 065

রক্ষা করে মানবদেহকে বাঁচিয়ে রাখাই এত প্রচেষ্টার একমাত্র উদ্দেশ্য ছাড়া আর কি !

বিশেষ বিশেষ টিস্যুর উপর বিশেষ বিশেষ রোগ-জীবাণুর ঝোঁক থাকে এবং সেই অনুযায়ী ঐগুলি বিশেষ বিশেষ পথে মানবদেহে প্রবেশ করে আক্রমণ ঘটায়। মানবদেহে প্রবেশের সেই পথগুলো হলো— (এক) চর্ম (দুই) শ্বাস-নালী (তিন) অন্ননালী (চার) মূত্রনালী (পাঁচ) জননেন্দ্রিয় নালী এবং (ছয়) চক্ষুবলয় (conjunctival sac)।

মানবদেহ চর্মের দ্বারা আচ্ছাদিত। চর্মের দুটো স্তর —উপরের স্তরের নাম 'এপিডামিস', নীচের স্তরের নাম 'ডামিস'। 'এপিডার্মিসে'র আবার রয়েছে চারটি স্তর। 'ডার্মিস' আবার কয়েকটি অংশ দিয়ে গঠিত। চর্ম বাইরের আঘাত থেকে দেহকে রক্ষা করে এবং জীবাণু আক্রমণকে প্রতিহত করে। 'ডার্মিস' স্তরের ঘর্ম-গ্রন্থি যে ঘর্ম নিঃসৃত করে তার মধ্য দিয়ে শরীরের কিছু কিছু অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকারক পদার্থ বের করে দেয়। ঘর্মের অন্তর্গত ল্যাক্‌টিক অম্ল (Lactikc acid) জীবাণু ধ্বংস করে আর তাতে আক্রমণ প্রতিহত হয়। চর্ম ও চর্মের নিম্নস্থ টিস্যুতে রক্ষিত চর্বি দেহের তাপকে রক্ষা করে। চর্মের স্পর্শানুভূতি দেহ রক্ষায় নিয়োজিত হয়। 'ডামিস' স্তরে সঞ্চিত চর্বি, জল, লবণ ও গ্লুকোজ অসময়ে দেহের প্রয়োজন আসে।

চর্মের মত শ্বাস-নালীও দ্বাররক্ষকের কাজ করে। অবাঞ্ছিত কাউকে যেমন দ্বাররক্ষক প্রবেশ করতে দেয় না, অবাঞ্ছিত ব্যক্তি জোর করে প্রবেশের চেষ্টা করলে যেমন তার সঙ্গে দ্বাররক্ষক সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এখানেও ঠিক তেমন ঘটনাই ঘটে। দেহের দ্বাররক্ষক যেন আরও বিশ্বস্ত, তার কাজে যেন কোন ত্রুটি নেই। দেহের পক্ষে ক্ষতিকারক পাদার্থগুলিকে দেহ সহজে প্রবেশ করতে দেয় না। নাসিকার অভ্যন্তরস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে সেগুলি আটকে পরে। নাসিকার গঠন বিশেষত্বেও সেই কাজ সমাধা হয়। নাসিকা প্রবেশ পথের চুলগুলোর সৃষ্টিও দেহ রক্ষার জন্যে। নাসিকা নিঃসৃত তরল পদার্থ ব্যাক্টেরিয়া ও ভাইরাসকে ধ্বংস করে। হাঁচি ও কাশিও জীবাণু বিতরণে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে।

মানব দেহকে রোগমুক্ত রাখতে অন্ননালীর ভূমিকাও নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। মুখগহ্বরে প্রবেশ লাভ করার পর মুহূর্তে যে সমস্ত জীবাণুকে গিলে ফেলা হয় না সেগুলি মুখের অভ্যন্তরে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে আটকে থাকে এবং পরে থুথর সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে আসে। লালাস্রাবী গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত লালা কতকটা জীবাণু-নাশক, এর কারণ এতে রয়েছে মিউসিন, লাইসোজাইম এবং অ্যান্টিবডি। জীবাণু মুখ-গহ্বরে প্রবেশ করে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির সান্নিধ্যে এসে মাত্র কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে, যদি না ইতিমধ্যে ওরা একটি কলোনী গড়ে তুলতে সমর্থ হয়। যে সমস্ত জীবাণু মুখ-গহ্বর অতিক্রম করতে সমর্থ হয় সেগুলি পাকস্থলীতে পৌঁছে যায়। সেখানে যেয়ে সেইসব জীবাণু বমির উদ্রেক করে এবং সেগুলির কতকাংশ বমির সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে যায়। অনেক জীবাণু পাকস্থলীর গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রসের সংস্পর্শে এসে মরে যায়।

অবিরাম মূত্র-প্রবাহের ফলে মূত্রনালী জীবাণু মুক্ত থাকে। তাছাড়া, মূত্রতে অম্ল থাকায় সেই অম্ল জীবাণুর মৃত্যু ঘটিয়ে থাকে।

জননেন্দ্রিয় নালীর চর্মেও দেহের অপর অংশের চর্মের মতো জীবাণু নাশ হয়ে থাকে। প্রজননশীলা মহিলাদের যোনি এক ধরনের বেসিলাস কর্তৃক নিঃসৃত অম্লের দ্বারা জীবাণু মুক্ত থাকে।

চোখের জলে প্রচুর লাইসোজাইম থাকে। এই লাইসোজাইম এবং চোখের জল জীবাণুর আক্রমণ থেকে চোখকে অনেকটা রক্ষা করে।

অসংখ্য জীবাণুর দ্বারা প্রতিনিয়ত আক্রমণ এইভাবে প্রতিহত হয় বলেই মানব-দেহ অনেকাংশে রক্ষা পায়। এভাবে মানবদেহ বহুলাংশে রক্ষা পেলেও সর্বক্ষেত্রেই তা সম্ভব হয় না, একটি অংশ আক্রান্ত হয়ে পরে। প্রশ্ন জাগে, সে-সব ক্ষেত্রে কি ঘটে? এসব ক্ষেত্রে জীবাণু দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, কিন্তু একটা বিশেষ অংশে এরা রোগ সৃষ্টি করতে পারে না তার কারণ 'ইমিউনিটি' যার অর্থ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। এই প্রতিরোধ ক্ষমতা জীবাণু, জীবাণু কর্তৃক প্রস্তুত টক্সিন এবং বহিরাগত প্রোটিনের বিরুদ্ধে। এই প্রতিরোধ ক্ষমতা আজকাল সৃষ্টি করা হয় কৃত্রিমভাবে প্রস্তুত প্রতিষেধক মানবদেহে প্রবেশ করিয়ে। দেহকে রোগমুক্ত রাখতে কৃত্রিমভাবে প্রস্তুত প্রতিরোধ ক্ষমতার একটি বিশাল ভূমিকা অবশ্যই রয়েছে। তবে তা লাভ করার সুযোগ ঘটে খুব কম লোকেরই, বিশেষ করে আমাদের দেশে। তাছাড়া, তুলনা-মূলকভাবে প্রাকৃতিক প্রতিরোধ ক্ষমতার বিস্তৃতি অনেক বেশী। তাই প্রাকৃতিক প্রতিরোধ ক্ষমতা নিয়েই আলোচনা করা যাক। অনেকের বিশেষ বিশেষ রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা আপনা আপনিই দেহে বর্তমান থাকে।

এই প্রতিরোধ ক্ষমতার নামই প্রাকৃতিক প্রতিরোধ ক্ষমতা। জন্মের পরে কয়েক মাস শিশু যে ডিফথিরিয়া রোগে আক্রান্ত হয় না তার কারণ তার মায়ের কাছ থেকে পাওয়া প্রতিরোধ ক্ষমতা। একেই বলে প্রাকৃতিক প্যাসিভ প্রতিরোধ ক্ষমতা। আবার কতকগুলো রোগের আক্রমণের পর সেই রোগের বিরুদ্ধেই মানবদেহে প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মে। গুটি বসন্ত তার উদাহরণ। কোন কোন রোগ-জীবাণু অল্প পরিমাণে মানবদেহে প্রবেশ করলে তাতে কোন রোগ সৃষ্টি হয় না, কিন্তু সেই রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মে যায়। এরই নাম প্রাকৃতিক অ্যাক্টিভ প্রতিরোধ ক্ষমতা। এই প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টিতে রক্তের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা থাকে। রক্তের দুটি অংশ—তরলাংশের নাম প্লাজ্মা, অন্য অংশ কোষেরা সমন্বয়ে গঠিত। রক্তের পঞ্চান্ন শতাংশ প্লাজ্মা, পঁয়তাল্লিশ শতাংশ কোষ। কোষ তিন ধরণের—লোহিত কণিকা, শ্বেত কণিকা এবং প্লেটলেটস্ বা থ্রম্বোসাইটস। প্লাজ্মার একানব্বুই থেকে নিরানব্বই শতাংশ জল, সাড়ে শতাংশ প্রোটিন। অন্যান্যদের মধ্যে রয়েছে সোডিয়াম, পটাসিয়াম ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস, ইউরিয়া, ইউরকি অ্যাসিড, চর্বি, শ্বেতসার ও শর্করাজাতীয় পদার্থ, গ্লুকোজ প্রভৃতি। জীবাণুজাত প্রোটিন বা অন্য কোন বহিরাগত প্রোটিন রক্তে যখন প্রবেশ করে তখন তাকে বলে অ্যান্টিজেন। অ্যান্টিজেনে সাধারণতঃ রয়েছে প্রোটিন। এই অ্যান্টিজেনের ফলে প্লাজ্মায় যে বিশেষ ধরণের প্রোটিন সৃষ্টি হয় তাকে বলে অ্যান্টিবডি। এই অ্যান্টি-বডিতেই রোগ-প্রতিরোই ক্ষমতা জন্মায়।

রক্ত মানবদেহকে নানাভাবে রক্ষা করছে। রক্তের মধ্যে যে কোষ রয়েছে তার একটির নাম প্লেটলেট্স। দেহের কোন অংশে রক্ত-ক্ষরণ হলে রক্ত জমাট বেধে অল্প সময়ের মধ্যেই রক্ত-ক্ষরণ বন্ধ হয়ে যায়। প্লেটলেটস-এর সাহায্যেই রক্ত জমাট বাঁধে।

শ্বেত-কণিকা আবার বিভিন্ন ধরণের—(এক) নিউট্রিফিল, (দুই) ইওসিনোফিল, (তিন) বেসোফিল, (চার) লিম্ফোসাইট, (পাঁচ) মনোসাইট। আগেই দেখেছি, অ্যান্টিবডির দ্বারা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মায়। এই অ্যান্টিবডি তৈরি করতে সাহায্য করে কিন্তু লিম্ফোসাইট। শরীরের কোন অংশ কেটে ছিড়ে গেলে তার মেরামতিতে লিম্ফোসাইটের ভূমিকা যথেষ্ট।

আজকাল 'থ্রম্বোসিস রোগটা আতংক সৃষ্টি করছে। মস্তিষ্ক ও হৃৎপিণ্ডে যে সকল ধমনী রক্ত বহন করে নিয়ে যায় তার কোথাও কোন কারণে রক্ত জমাট বেঁধে গেলে এই রোগের সৃষ্টি হয়। এই রোগের বলি আরও অনেক মানুষ হতে পারতো। তা যে হয় না তার কারণ বেসোফিল শ্বেত কণিকা। থেকে এই শ্বেতকণিকা নিঃসৃত 'হেপারিন' ধমনীতে রক্ত যাতে জমাট না বাঁধে তার জন্যে সারাক্ষণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

জীবাণু দেহে প্রবেশ করলে রক্তের কাছে তারা প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে দুই ধরণের শ্বেত-কণিকা নিউট্রিফিল ও মনোসাইট আগত জীবাণুকে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরে এবং শেষ পর্যন্ত আত্মস্থ করে নেয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিভাষায় এই প্রক্রিয়ার নাম ফ্যাগোসাইটোসিস। এই প্রক্রিয়ার ফলে মানবদেহের ভয়াবহ পরিণতির হাত থেকে রক্ষা পায়।

মানবদেহকে কেন্দ্র করে নীরবে নিঃশব্দে এই যে অসীম কার্য-প্রবাহ প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে সংগতভাবেই বলা যায়, মৃত্যু তত সহজ নয়।

ঝলসানো ও গজানো শস্য-ডাল, সীমবীজ বেশী পুষ্টিকর

ডালশস্য, সীম, গম, ভুট্টা, ইত্যাদি ঝলসিয়ে বা জলে ভিজিয়ে গজিয়ে খেলে বেশী পুষ্টিকর হয়। গম, ভুট্টা এবং ডাল জলে ভিজিয়ে পরে শুকিয়ে নিয়ে ঝলসে খেলে বা সেদ্ধ করে খেলে তাড়াতাড়ি হজম হয় ও পুষ্টিকর হয়। শস্য বা ডাল 10/12 ঘণ্টা জলে ভিজিয়ে একটি পাতলা ন্যাকড়ায় বেঁধে 12 থেকে 24 ঘণ্টা একটি পাত্রে রেখে দিতে হয়। ন্যাকড়া সর্বদা ভেজা থাকা চাই। এর ফলে দানা গজিয়ে যাবে। এই দানা এবার ভেজে বা কাঁচা খাওয়া যায়।

[ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ।]

নোবেল বিজ্ঞানী কার্লো রুব্বিয়া

প্রশান্ত প্রামাণিক*

আইনস্টাইন বলতেন, "প্রকৃতির অসংখ্য লীলার মূলে আছে অল্প কয়েকটি কারণ। আসল লক্ষ্য হল যথাসম্ভব ক্ষুদ্র সংখ্যক সিদ্ধান্ত বা তত্ত্ব থেকে যুক্তিপূর্ণ বিচার দ্বারা বৃহত্তম সংখ্যক অভিজ্ঞতা লব্ধ ব্যাপারের নিষ্পত্তিসাধন"। তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন 'প্রাকৃতিক জগতে সম্ভাব্যতা বলে কিছুই নেই'। প্রকৃতির সমস্ত ঘটনাবলী কার্যকারণ সম্পর্কযুক্ত, এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী আইনস্টাইন তাঁর জীবনের শেষ চল্লিশ বছর ধরে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র (Gravitational Field) ও তড়িচ্চুম্বক ক্ষেত্র (Electro magnetic Field), এই দুই প্রধান ক্ষেত্রকে একীভূত করে একটি গাণিতিক সূত্রে প্রকাশ করতে চেষ্টা চালিয়েছেন অক্লান্তভাবে। শুধু তাই নয়, পরমাণুর অভ্যন্তরে যে দুটি মৌল বল বা ক্ষেত্র রয়েছে, তাদেরও এক সূত্রে বাঁধতে চেয়েছিলেন তিনি। পরমাণুর অভ্যন্তরের এই বল দুটি 'Weak and strong Interactions of the sub-atomic domain' অর্থাৎ দুর্বল বল বা দুর্বল মিথষ্ক্রিয়া (Weak Interaction) এবং সবল বল বা সবল মিথষ্ক্রিয়া (Strong Interaction)। এই দুই বল বা ক্ষেত্রকেও তিনি তড়িচ্চুম্বকীয় এবং মহাকর্ষ বল দুইটির সঙ্গে এক সূত্রে বাঁধতে চেয়েছিলেন তাঁর জীবনের শেষ চল্লিশটা বছর ধরে। কিন্তু তিনি সেই যোগসূত্র খুঁজে পান নি।

আইনস্টাইন যে তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, সেটি একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব (Unified Field Theory) নামে বিখ্যাত। 1955 খৃস্টাব্দের পর অর্থাৎ আইনস্টাইনের মৃত্যুর পর এই তত্ত্বটিকে অনেক বিজ্ঞানীই 'মৃত বিষয়' বলে ভাবতে শুরু করেন এবং অধিকাংশ বিজ্ঞানীই এর থেকে চোখ ফিরিয়ে নেন। এই সময় পদার্থবিজ্ঞানে তথা সমগ্র বিশ্বে চারটি মৌল বলের ধারণা থেকে যায়; এগুলি হলো, তড়িচ্চুম্বকীয় বল, মহাকর্ষ বল, দুর্বল বল বা দুর্বল মিথষ্ক্রিয়া এবং সবল বল বা সবল মিথষ্ক্রিয়া।

1979 খৃস্টাব্দে আবদুস সালাম, স্টিভেন ভিনবার্গ ও শেলডন গ্লাসহোকে তাঁদের ইলেকট্রোউইক তত্ত্বের [Electro-Weak Theory] জন্য পদার্থবিজ্ঞানের নোবেল পুরস্কার দেওয়া হল। সঙ্গে সঙ্গে একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বের দিকে চোখ ফিরিয়ে তাকাবার তাগিদ অনুভব করলেন বিজ্ঞানীরা। এঁরা এঁদের ইলেকট্রোউইক তত্ত্ব [Electro-weak Theory] দিয়ে প্রমাণ করলেন, তড়িচ্চৌম্বক বল ও দুর্বল বল (বা দুর্বল মিথষ্ক্রিয়া) যা নানা ধরনের নিউক্লিয় ক্ষয় বা তেজস্ক্রিয়তার (বিটাক্ষয়) জন্য দায়ী—এক ও অভিন্ন। তাঁরা এই বলের নাম দিলেন 'ইলেকট্রোউইক বল' (Electro-weak Force)। কোনও নিউক্লিয়াস যেমন একটি বিশেষ অবস্থায় গামারশ্মি বা উচ্চশক্তিসম্পন্ন ফোটন বের করতে পারে যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলে 'গামাক্ষয়', তেমনি আরেক অবস্থায় ইলেকট্রন বা পজিট্রন বের করে থাকে যাকে বলা হয় 'বিটাক্ষয়'। প্রথমটি ঘটে তড়িচ্চৌম্বক বলের প্রভাবে আর দ্বিতীয়টি ঘটে দুর্বল মিথষ্ক্রিয়ার প্রভাবে। সালাম-ভিনবার্গ-গ্লাসহো বললেন এ দুটি ঘটনা একই বলের প্রকাশ মাত্র, আলাদা কিছু নয়।

ইলেকট্রোউইক তত্ত্বে আপেক্ষাকৃত বিপুল ভর সম্পন্ন ডবলিউ (W) কণা ছাড়াও আরেক ধরনের তড়িৎ-নিরপেক্ষ কণার কথা ভাবা হলো। তার নাম দেওয়া হল Z কণা। 1973 খৃঃ নিউট্র্যাল কারেন্ট (Nutral Current) বা নিরপেক্ষ স্রোতের আবিষ্কারের পর Z-এর ধারণা পদার্থবিদ্যায় সুদৃঢ় হয়। এই $W^{\pm}$ কণা ও নিরপেক্ষ Z° কণার অস্তিত্ব প্রমাণের উপরই ইলেকট্রোউইক তত্ত্বের সত্যতা নির্ভর করছিলো। ঐ নিরপেক্ষ স্রোতের আবিষ্কার ও পরবর্তী কয়েকটি অনুকূল পরীক্ষার ফল দেখেই 1979 খৃস্টাব্দে সালাম-ভিনবার্গ গ্লাসহো-কে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়—অনেকটা দুঃসাহসিক ভাবে। কারণ তখনও Z কিংবা W কণার অস্তিত্ব অপ্রমাণিত। W-কণা পরীক্ষাগারে পেতে হলে যে প্রচণ্ড শক্তিশালী কণা-ত্বরায়ক যন্ত্রের প্রয়োজন ছিল, তা তখন ছিল না। এই কারণে গ্লাসহো ইন্টারন্যাশন্যাল হেরাল্ড ট্রিবিউনে 16 অক্টোবর, (1979) বলেই ফেললেন, "নোবেল কমিটি আমাদের পুরস্কার দিয়ে একটা চান্স নিয়েছেন। কেন না, আমাদের প্রস্তাবিত কণিকাগুলি পরীক্ষা করে দেখবার মতো কোন যন্ত্র এখনও কেউ তৈরি করতে পারেন নি।" কিন্তু তাঁদের পাঁচ বছরও অপেক্ষা করতে হলো না। কার্লো রুব্বিয়া ও সাইমন ভ্যানডার মীর দু-জনে মিলে ওঁদের স্বপ্নকে সত্যরূপ দিলেন। এঁরা দুজন $W^{\pm}$ ও Z কণার অস্তিত্ব পরীক্ষাগারে

* বিশেষ ভূমিগ্রহণ আধিকারিক [সাধারণ], মেদিনীপুর

ভালোভাবেই প্রমাণ করে দিলেন। ইলেকট্রোউইক তত্ত্বের সত্যতা প্রমাণ হলো সব দিক দিয়েই। ফলে মৌল বল রইলো তিনটি—মহাকর্ষ বল, সবল বল এবং তড়িচ্চুম্বকীয় ও দুর্বল বলের মিলিত রূপ ইলেকট্রোউইক বল।

কার্লো রুব্বিয়া (Carlo Rubbia) 1934 খৃস্টাব্দে ইটালীর বিখ্যাত পিসা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানেই পড়াশুনা শেষ করে 1960 খৃস্টাব্দে রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টিতে যোগ দেন। 1967 থেকে 1970 খৃঃ অবধি সুইজারল্যাণ্ডে সার্ন [CERN]-এর পরীক্ষাগারে পদার্থবিজ্ঞানে গবেষণার জন্য নিজেকে নিয়োজিত করেন। এরপর হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রূপে যোগ দেন। 1976 খৃস্টাব্দে আবার তিনি সার্ন-এর পরীক্ষাগারের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন এবং এখন অবধি দু-জায়গাতেই ভাগাভাগি করে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। 1984 খৃস্টাব্দে পদার্থ বিজ্ঞানের নোবেল পুরস্কার তিনি ও তাঁর সহকর্মী সাইমন ভ্যানডার মীর দুজনে মিলে পান ওই W ও Z কণার অস্তিত্ব পরীক্ষাগারে প্রমাণ করবার জন্য। সাইমন 1925 খৃস্টাব্দে ডাচ শহর গুয়েলফ [Guelph]-এ জন্মান। শহরটি বিখ্যাত হেগ শহরের কাছাকাছি। গুয়েলফ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হয়ে 1956 খৃস্টাব্দে সার্ন-এ যোগ দেন। এখানেই তিনি কণা-ত্বরায়ক যন্ত্রের উপর বিশেষ প্রশিক্ষণ লাভ করেন। এই মহান আবিষ্কারে শুধু ঐ দুজনের নামই যথেষ্ট নয়, বিভিন্ন-দেশের 13টি রিসার্চ সেন্টারের 130 জন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী একত্রে অক্লান্ত সহযোগিতায় যে অপূর্ব-সমন্বয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তাও এক গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞান সামাজিকতার বিষয়। পরীক্ষাগারে তাঁদের আবিষ্কার বিপুল ভরসম্পন্ন W^+ ও W^- এবং Z° কণিকাগুলি, যাদের বলা হয় ভেকটর বোসনস [Vector Bosons] এদের সামগ্রিকভাবে নাম দেওয়া হয়েছে 'উইকনস্' (Weakons)। এদের আবিষ্কার করা হয়েছে সুইজারল্যাণ্ডের সার্নে অবস্থিত প্রোটন ও পরা-প্রোটন [Anti-proton] সংঘর্ষকারী কণা-ত্বরায়কে। আগেই বলেছি এই আবিষ্কার সালাম-ভিনবার্গ-গ্লাসহোর ইলেকট্রোউইক তত্ত্বকে যেমন প্রতিষ্ঠা করলো, তেমনি এটা প্রমাণ করলো তড়িচ্চৌম্বক বল ও দুর্বল বল বা দুর্বল মিথস্ক্রিয়া একই ধরনের বল। তড়িদাহিত $W^\pm$ কণা ও নিরপেক্ষ Z°-কণা উভয়েরই ভর খুব বেশী। দেখা গেল এদের ভর 80 থেকে 95 Gev, যেখানে একটা প্রোটনের ভর 0·931 Gev। এই কণাগুলিই ইলেকট্রোউইক বলের বাহক। যদিও 1967 খৃস্টাব্দে ইলেকট্রোউইক তত্ত্ব এই দুই ভেক্টর বোসনের অস্তিত্বের কথা বলেছিল, তব এই বিপুল ভর সম্পন্ন কণাদের অস্তিত্ব বিভিন্ন শক্তিশালী কণা-ত্বরায়ক যন্ত্রে ধরা পড়ে নি এমন কি সার্নও সে সময় এই কণাগুলি আবিষ্কার করতে ব্যর্থ হয়েছিল। রুব্বিয়ার পরিকল্পনা মত সার্নের যন্ত্রপাতিকে কাজে লাগিয়েই এই কণাগুলির আবিষ্কার সম্ভব হয়।

সার্নের দৈত্যাকৃতি 400 Gev Super Proton-Synchrotron [SPS]-কে তিনি একটি প্রোটন সংঘর্ষক বা Proton collider-এ রূপান্তরিত করেন। এতে এমন ব্যবস্থা নিলেন যাতে 270 Gev প্রোটনরশ্মির সঙ্গে 270 Gev-র পরা-প্রোটনগুলির সংঘর্ষ ঘটানো হলো। এই সংঘর্ষ হলো এক সেকেণ্ডে কয়েক হাজার বার। এরই ফলে উৎপন্ন হলো $W^\pm$ ও Z° কণিকারা। সাইমনের এখানে অবদান হলো তিনি 'stochastic cooling'—পদ্ধতি অবলম্বন করে 'mono-energetic' পরা-প্রোটন রশ্মিগুচ্ছ একত্র করে প্রোটন রশ্মির সঙ্গে সংঘর্ষের ব্যবস্থা করেন।

একটা কণা ত্বরায়ক যন্ত্রকে একটা Collider-এ রূপান্তরিত করার ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত কার্য। নীতিগতভাবে সনাতন কণা-ত্বরায়ক যন্ত্রে $W^\pm$ ও Z° কণাগুলি অন্যান্য পাঁচটা কণার মত উৎপন্ন করা যেত—হ্যাড্রন, ভারী মেসন কণা ইত্যাদি যেমনভাবে তৈরি করা হয়, সেইভাবে কোনও একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুতে শক্তির আঘাত হেনে। এতে যে শক্তি মুক্ত হয়, তার অধিকাংশই অপ্রয়োজনীয় কণাগুলির গতিশক্তি উৎপন্ন করতে ব্যয়িত হয়। খুব সামান্য ভগ্নাংশই প্রয়োজনীয় কণাগুলি তৈরির কাজে লাগে। সনাতন কণা ত্বরায়ক-এর সাহায্যে তাই সেই সমস্ত কণা উৎপাদন সম্ভব, যেগুলির ভর 10 Gev-এর চেয়ে কম। কিন্তু একটা Collider-এ যেহেতু কণা দুটিকে মুখোমুখি সংঘর্ষের সময় ক্ষণিকের জন্যও স্থির অবস্থায় আনা হয়, সেইজন্য এক্ষেত্রে অনেকবেশী শক্তি পাওয়া যায় নতন ধরণের কণা উৎপাদনের জন্য। যখন প্রোটন (p) কণা পরা-প্রোটন বা অ্যান্টি-প্রোটন (p^-) কণার সংগে মুখোমুখি সংঘর্ষে আসে, তখন উভয়েই বিনষ্ট হয় কিন্তু প্রচুর পরিমাণে শক্তিও উৎপন্ন হয় যা $W^\pm$ বা Z° কণা তৈরি করতে পারে যাদের ভর 80 থেকে 95 Gev। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেল, মাত্র পাঁচ থেকে কুড়িটি $W^\pm$ কণা উৎপন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই hadron, meson, lepton এবং neutrino প্রচুর পরিমাণে তৈরি হচ্ছে। রুব্বিয়া দেখালেন যে, ভেকটর বোসনগুলির উৎপাদন সবচেয়ে বেশী তখনই সম্ভব যখন প্রোটন ও পরা-প্রোটন রশ্মির উভয়ের প্রত্যেকের শক্তি 270 Gev-এর সমান। সনাতন কণা ত্বরায়কের সাহায্যে এত শক্তির প্রোটন বা পরা-প্রোটন রশ্মি উৎপন্ন করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু কণা-সংঘর্ষকে

(Collider) তা সম্ভব ছিল, কারণ এতে ঘূর্ণায়মান প্রোটন রশ্মিকে প্রয়োজন মত জায়গায় পরা-প্রোটন রশ্মির সঙ্গে মুখোমখি সংঘর্ষে আনা যায়।

ভেকটর বোসনদের সঠিকভাবে জানতে অন্ততঃ বিলিয়ন খানেক প্রোটন-পরা-প্রোটন সংঘর্ষের প্রয়োজন। আবার সংঘর্ষ সম্ভাব্যতা (Collision Probability) হাজারে এক। সুতরাং 10^{12} বা লক্ষ কোটি প্রোটন ও পরা-প্রোটন কণার রশ্মির মুখোমুখি সংঘর্ষে মোটামুটি কিছু W কণিকা উৎপন্ন হয় যেগুলি দিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে পারে। আবার পরা-প্রোটন তৈরি করাও খুব মুশকিল। নির্দিষ্ট ধাতব লক্ষ্য বস্তুতে প্রোটনআঘাত করেই পরা-প্রোটন উৎপন্ন করা হয়। লক্ষ লক্ষ প্রোটন আঘাত করিয়ে হয়ত দু-তিনটি পরা-প্রোটন পাওয়া সম্ভব হয়। তাই পরা-প্রোটন রশ্মি তৈরির জন্য ওদের আগেভাগে তৈরি করিয়ে জমিয়ে রাখতে হয়। পরা-প্রোটনরা প্রচণ্ড গতিসম্পন্ন ও গ্যাসের মতই চতুর্দিকে অক্রম গতিযুক্ত। সুতরাং এই কণার রশ্মি তৈরি করতে এবং সেই রশ্মিকে একই শক্তি সম্পন্ন [270 Gev] করতে সাইমন ভ্যানডার মীর 'precooled' বা 'Stochastic Cooling' পদ্ধতি অবলম্বন করেন। অর্থাৎ কণাগুলির বিচ্ছিন্ন (random) বহুমুখী গতিঘকেনীভূত একমুখী রশ্মিতে রূপান্তরিত করেন।

সার্নে এই সব পরীক্ষার প্রথম স্তরে একটা 26 Gev শক্তি সম্পন্ন প্রোটন রশ্মিকে তামার লক্ষ্য বস্তুর উপর আঘাত করিয়ে 3·5 Gev শক্তিসম্পন্ন পরা-প্রোটন তৈরি করা হয়। এর জন্য প্রোটন-সিনক্রোট্রন (Proton Synchrotron) ব্যবহৃত হয়। এই পরা-প্রোটনদের চৌম্বক ক্ষেত্রের সাহায্যে 'Anti-Proton Accumulator (AA)'-এ জমা করা হয়। এরপর এদের 'Precooled' করে ছোট কক্ষ পথে ঘুরিয়ে নিয়ে একটা ঘনীভূত রশ্মি বানানো হয়। এই রশ্মিতে কয়েকশো বিলিয়ন পরা-প্রোটন থাকে। পরা-প্রোটনকে রশ্মিতে রূপান্তরিক করতে প্রায় 24-ঘন্টা সময় লাগে। এই রশ্মিকে আবার Synchrotron-এ পাঠানো হয়, এর শক্তি মাত্রা 26 Gev করতে। এরপর একে 400 Gev-র Super Proton Synchrotron-এ পাঠানো হয়। সংগে সংগে 26 Gev শক্তিসম্পন্ন প্রোটন রশ্মিও ঐ Synchrotron-এ ঢোকানো হয় এবং উভয় রশ্মিকে প্রায় একই কক্ষপথে কিন্তু আলাদা আলাদাভাবে ঘোরানো হয় পরস্পরের বিপরীত অভিমুখে, যতক্ষণ না উভয়ের শক্তি 270 Gev-তে পৌছায়। 270 Gev শক্তি সম্পন্ন হলেই নির্দিষ্ট জায়গায় এদের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটানো হয় এবং ভেকটর বোসন কণাগুলি অর্থাৎ $W^{\pm}$ ও Z^{0} কণারা উৎপন্ন হলে তাদের যথাবিহিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়।

কার্লো, সাইমন, ও তাঁদের সহকর্মীরা এক বিলিয়নের চেয়েও বেশী সংখ্যক প্রোটন-অ্যান্টিপ্রোটন সংঘর্ষ ঘটিয়ে এবং যথাবিহিত পরীক্ষা করে মাত্র শ'খানেক $W^{\pm}$ বা Z^{0} কণার ঘটনা নথিবদ্ধ করেছেন। দেখা গেছে এই ভেকটর বোসনরা পরে ক্ষয় পেয়ে লেপটন ও নিউট্রিনোতে রূপান্তরিত হচ্ছে।

এঁদের এই আবিষ্কারের ফলেই বিশ্বে তিনটি মৌল বলের অস্তিত্ব রইলো। এক, তড়িচ্চৌম্বক ও দুর্বল বলের মিলিত রূপ ইলেকট্রোউইক বল; দুই, সবল বল এবং তিন, মহাকর্ষ বল। অদূর ভবিষ্যতে এই তিনটি বলও সম্ভবত তাদের মৌলিকত্ব হারাবে কারণ যে 'কসমিক এগ' (Cosmic Egg) বা 'মহাজাগতিক অণ্ড' থেকে এই বিশ্ব নিঃসৃত, সেই মহাডিম্বে একটি মাত্র মৌলিক বলই ছিল, তিনটি নয়—আজকের বিজ্ঞানীদের তাই বিশ্বাস।

এস্পেরান্তো ভাষাশিক্ষা

প্রবাল দাসগুপ্ত*

পরিচ্ছেদ 4

4-1। infano বাচ্চা

Broĝo kaj Ila estas infanoj

ludas খেলছে

Broĝo kaj Ila ludas

kie কোথায়

Kie Broĝo ludas ?

en ভিতর

Broĝo ludas en ĉambro (ঘরের ভিতর)

Kie Ila ludas ?

sur উপর

Ila ludas sur vojo (রাস্তার উপর)

'রাস্তায়' বা 'ঘরে' বলি বাঙলায়; সারাক্ষণ 'ভিতর' আর 'উপর' আলাদা রাখি না। এস্পেরান্তোয় আলাদা রাখা হয়।

4-2। nombras গুনছে

Ila nombras : ses ছয়
sep সাত
ok আট
naŭ নয়
dek দশ

diras বলছে

Broĝo diras, 'Du kaj kvin !'
Ila diras, 'sep.'
Ila diras, 'Tri Kaj tri kaj tri !'
Broĝo diras, 'Naŭ.'
Ankaŭ vi ludas. kaj mi ludas.'
Mi diras, 'Unu kaj kvar kaj tri !'
Vi diras.... ?

4-3। Broĝo estas en ĉambro.

একবার ঘরটার কথা উঠল এই বাক্যে। আবার যদি একই ঘরের কথা উঠে, তাহলে la থাকে; la-কে বলে 'নির্দেশক'।

Ankaŭ Ila estas en la ĉambro.

যদি বলতাম ankaŭ Ila estas en ĉambro, তাহলে মনে হতে পারত ব্রজ যে ঘরে আছে ইলা সেই ঘরে নেই, অন্য একটা ঘরে আছে। En ĉambro-র বাঙলা, ঠিক 'ঘরে' নয়, 'একটা ঘরে'। বাঙলায় যখন বলি 'ব্রজ ঘরে আছে' তখন যেন ধরেই নিই যে শ্রোতা জানে কোন ঘরের কথা হচ্ছে। এই ধরে নেওয়াটার এস্পোরান্তো 'la' ঃ Broĝo estas en la ĉambro. বরঞ্চ Broĝo estas en ĉambro বাক্যে ওই-যে ধরে নিচ্ছি না যে আপনি জানেন কোন ঘরের কথা হচ্ছে, ওই ধরে না নেওয়াটাই বাঙলায় প্রকাশ করতে হয় অনির্দেশক 'একটা' ব্যবহার করে—'ব্রজ একটা ঘরে আছে'। এখানে 'একটার'-কাজ স্পষ্টতই গণনা নয়। একটা ঘরে থাকবে না তো কি চারটে ঘরে থাকবে ?। এখানে 'একটা'-র কাজ হচ্ছে এস্পোরান্তে la-র উলটো। La বলে, 'আপনি জানেন কোনটার কথা হচ্ছে'। 'একটা' বলে, আপনি জানেন না কোনটার কথা হচ্ছে'।

বহুবচনেও তথৈবচ। একটা শব্দ শিখুন; tiu 'ওই' ঃ

নির্দিষ্ট ঃ La infanoj estas en tiu ĉambro
বাচ্চারা ওই ঘরে আছে

অনির্দিষ্ট ঃ Infanoj estas en tiu ĉambro
কয়েকটা/কিছু বাচ্চা ওই ঘরে আছে

আবার বাঙলায় অনির্দেশকের ব্যবহার, এস্পেরান্তোয়

* ডেক্‌কান কলেজ, পুনে-411006

নির্দেশকের। খেয়াল করা ভালো যে La infanoj বলা হয়; Laj infanoj নয়; নির্দেশক কোনো কিছু প্রতিফলন করে না।

4-4। Du ĉambroj estas bonaj
দুটো ঘর = ভালো

La du ĉambroj estas bonaj
ঘর দুটো = ভালো

Tri ĉambroj
তিনটে ঘর

La tri ĉambroj
ঘর-তিনটে

(Unu ĉambro
একটা ঘর

La ĉambro
ঘরটা

তুলনা করলেই দেখবেন, 'ঘর-টা' যেন 'ঘর-একটা', ওর 'এক' অংশটা লুপ্ত বা উহ্য। বাংলায় বিশেষ্যের ডানদিকে সংখ্যা আর 'টা'-কে চালিয়ে দিয়ে ('ঘর-দুটো, ঘর-তিনটে') নির্দিষ্টতা প্রকাশ করা যায়; 'ঘর-টা' তারই দৃষ্টান্ত. এখানে সংখ্যাটা 'এক', তবে 'এক' কথাটা উহ্য থাকে, আমরা 'ঘর-দুটো'-র মতো 'ঘর-একটা' না বলে বলি 'ঘরটা'। ঠিক যেমন এস্পেরান্তোতেও La unu ĉambro না বলে' La ĉambro বলে।

এস্পেরান্তো La-র মতো কোনো নির্দেশক শব্দ নেই বাঙলায়। তবে 'দুটো ঘর' du ĉambroj আর 'ঘর-দুটো' La du ĉambroj মিলিয়ে দেখলে বুঝবেন যে আমরা অন্য জিনিস এপাশ-ওপাশ চালাচালি করে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নির্দিষ্টতা বোঝাতে পারি।

4-5। Bela tempo. Kie vi estas? Ha! Vi sidas en ĉambro! Mi staras sur vojo. La vojo estas granda. La vojo ridas. Mi iras sur la vojo. Ankaŭ mi ridas. La bela tempo ridas.

4-6। 'এই কথাটা চাই; এস্পেরান্তোয় কী করে বলব?'— এ ধরনের প্রশ্ন করার করার সময় আসেনি; আসতে দেরী আছে। বরং উলটো প্রশ্নটা করুন আরো কয়েক পরিচ্ছেদ ধরে। 'যেটুকু এস্পেরান্তো জানি তাতেই অনেক কথা বলা যায়। কী কী বলা যায়?'

যে শব্দগুলো শিখেছেন সেগুলো টুকরো কাগজে—অথবা, সম্ভব হলে, টুকরো কার্ডে—লিখুন; প্রত্যেকটা শব্দ অন্তত দুটো করে কার্ডে লিখুন, কারণ একইসঙ্গে হয়তো দু-তিনটে tiu বা la ব্যবহার করতে চাইবেন একটা বাক্যে। তারপর পাশাপাশি নানাভাবে সাজিয়ে দেখুন কত রকম বাক্য তৈরি করতে পারছেন যা এ বইয়ে দেখেন নি। যে বাক্যগুলো দাঁড়াল সেগুলো লিখে রাখুন, পছন্দ হলে। La vojo ridas বাক্যটা কি 'দাঁড়িয়েছে'? রাস্তা কি হাসে? হাসে বইকি—তেমন তেমন রাস্তা যদি হয়, সময় যদি ততটা bela tempo হয়। এইভাবেই বিচার করবেন আপনার বাক্যগুলোর বেলাতেও।

কয়েকটা শব্দ ঃ

skribas লিখছে, লিখছি....
legas পড়ছে, পড়ছ....
domo বাড়ী
muro দেওয়াল
alta উঁচু (জিনিস), লম্বা (লোক)
ruĝa লাল
pura পরিষ্কার

এই pura-য় এসে অনেকে ভাববেন, এটা তো ইংরেজী পিওর, মানে 'বিশুদ্ধ'।—ও মানেটাও হয়, কিন্তু ওটা প্রধান অর্থ নয়, এবং ওটাকে স্পষ্ট করতে হলে এস্পেরান্তোয় অন্যভাবে বলতে হয় ('অবিমিশ্র' বলতে হয়)। ইংরেজী pure আর এস্পেরান্তো pura একই রকম দেখতে কিন্তু সমার্থক নয়; এ ধরনের দৃষ্টান্তকে বলা হয় 'কপট বন্ধু' বা 'ফল্‌স্ ফ্রেণ্ড্‌জ্', falsaj amikoj—এক্ষেত্রে pura হচ্ছে পিওর-এর falsa amiko. Pura মানে পরিষ্কার। এস্পেরান্তোয় বলতে পারি pura ĉambro অথবা pura vojo; ইংরেজীতে পিওর রুম বা পিওর রোড বললে লোকে হাসবে না?

কিশোর বিজ্ঞানীর আসর
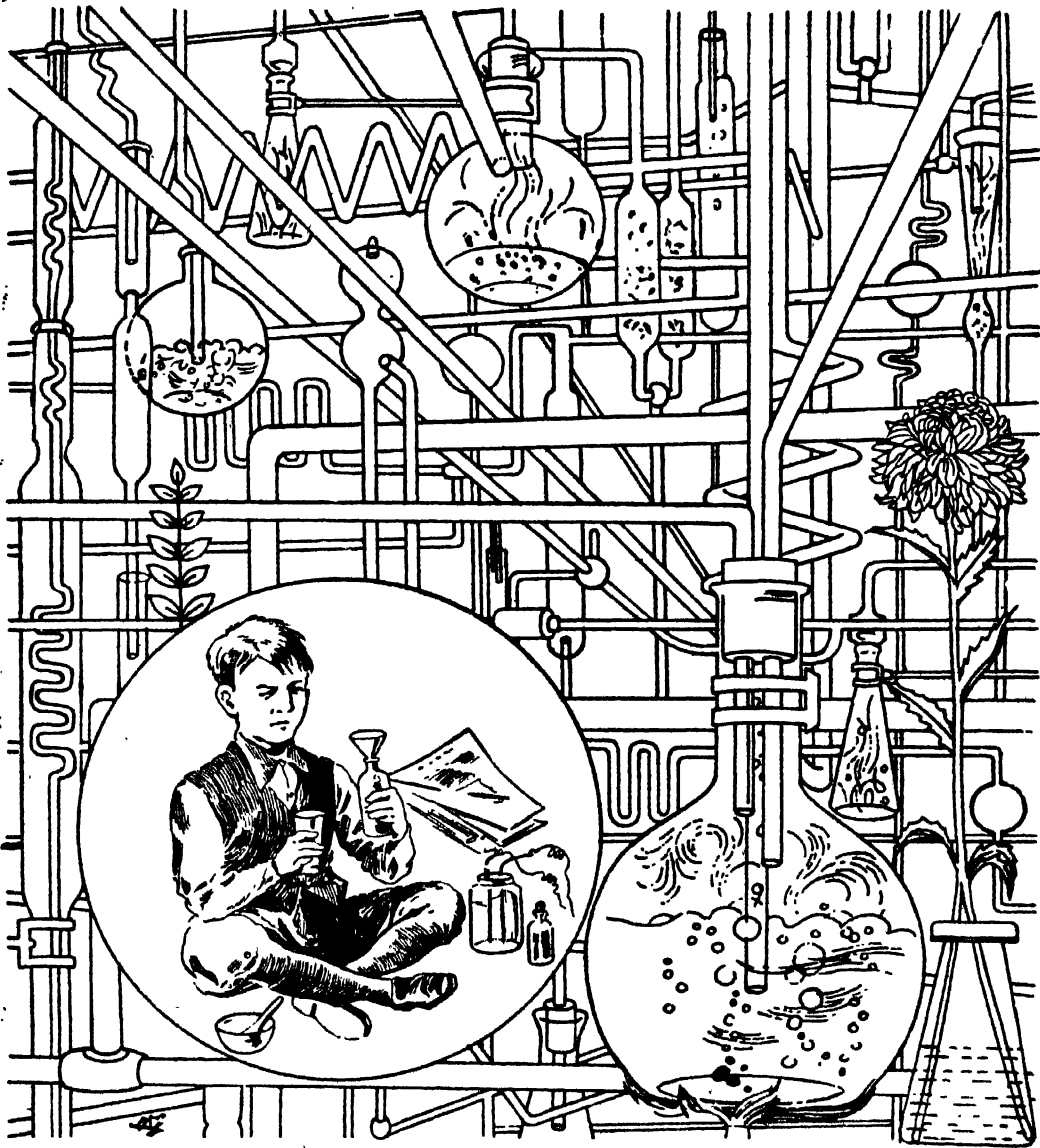
অবিস্মরণীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানী জীবক-কোমারভৃত্য

শ্রীশচীনন্দন আঢ্য*

আড়াই হাজার বছর আগের কথা। তখনো ইউরোপ সভ্যতার আলো দেখেনি, তখনো সে পৌঁছায় নি প্রজ্ঞালোকের ছোঁয়াতে। কিন্তু ভারতবর্ষ তারও আগে থেকে যে জ্ঞানে—বিজ্ঞানে মহীয়ান ছিল, তা পাশ্চাত্যাভিমানীরা অনেকে না জানলেও পৃথিবীর জ্ঞানীগুণীরা জানে ও স্বীকার করে।

বুদ্ধদেব যখন তাঁর ধর্মাদর্শ বিলা'তে প্রকট, তক্ষশিলায় তখন চলছে মহা মহা বিদ্যার আরাধনা। বহুতর বিদ্যার মধ্যে চিকিৎসাবিদ্যাও পঠিত হচ্ছে ঐ মহাবিদ্যালয়ে। সেখানেরই একজন মহান মেধাবী ছাত্র ছিলেন চিকিৎসা বিজ্ঞানী জীবক-কোমারভৃত্য। যিনি কায় চিকিৎসায় পারদর্শিতা দেখিয়ে সে যুগের চিকিৎসা বিজ্ঞান সাধনায় আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানকেও হার মানিয়ে ছিলেন।

আচার্য আত্রেয়ের নিকট দীর্ঘ 7 বৎসরকাল কঠিন চিকিৎসা বিদ্যার অধ্যায়ন ও অনুসন্ধিৎসায় তিনি সফলতা প্রদর্শন করে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন, সসম্মানে।

মহামতি জীবক ছিলেন স্বয়ং বুদ্ধদেবের চিকিৎসক। নূতন নূতন চিকিৎসা তথ্যে তিনি এত পারদর্শী ছিলেন যে সেযুগের পক্ষে তা ছিল অবিশ্বাস্য। একবার কোষ্ঠ কাঠিন্যে আক্রান্ত হয়ে বুদ্ধদেব অত্যধিক ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। শীর্ণ দেহে তখন তাঁর স্বাস্থ্যের এমনই অবস্থা যে চিকিৎসকরা তাঁকে রেচক বা জোলাপ দিতেও ভয় পাচ্ছেন। তথাগত ক্রমে ক্রমে অবসন্ন হয়ে পড়ছেন। ঠিক এই সময় চিকিৎসক জীবক তিনটি প্রস্ফুটিত পদ্ম হাতে নিয়ে যেন তথাগতের শ্রীচরণে নিবেদনের অছিলায় গৃহে প্রবেশ করলেন। আশ্চর্যের ব্যাপার তার আঘ্রাণে আস্তে আস্তে বুদ্ধদেব সুস্থ হয়ে উঠলেন। উঠে বসে জীবককে আশীর্বাণী দিলেন। জীবক যে এক অভিনব চিকিৎসায় বুদ্ধদেবকে সারিয়ে তুললেন তা পরিজ্ঞাত হতে আর বাকি রইলনা। জীবক এই অভিনব চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, মহামতি বুদ্ধের যখন দেখা গেল ঔষধ গলাধকরণের ক্ষমতাও থাকছে না তখন তিনি এই অভিনব চিকিৎসা পদ্ধতির আশ্রয় নিলেন। অর্থাৎ ঐ পদ্ম-কোরক মধ্যে তিনি মৃদু বীর্য্য উদ্বায়ী ঔষধ নিষিক্ত করে এনেছিলেন যার ঘ্রাণেই তথাগত সুস্থ হয়ে উঠলেন।

উজ্জয়নীরাজ চণ্ডপ্রদ্যোৎ কামলারোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু মুখী হয়ে পড়েন। রোগের প্রাদুর্ভাবে তিনি তেল, ঘি অর্থাৎ স্নেহ জাতীয় পদার্থের ঘ্রাণ পর্যন্ত সহ্য করতে পারছিলেন না। কিন্তু জীবক তাঁকে ভেষজ মিশ্রিত ঘৃতের সাহায্যেই আরোগ্য করেছিলেন।

জীবক ছিলেন কায় চিকিৎসায় পারদর্শী। তিনি রোগের সূত্র আবিষ্কার করতেন খুব বুদ্ধিমত্তার সহিত। চিকিৎসার স্বরূপ নির্ধারনে তিনি জানতে চেষ্টা করতেন যে রোগটি রুগীর মানসিক কিনা? যে জন্য তাঁর চিকিৎসাবিদ্যার অন্যতম অঙ্গই ছিল রুগীর প্রতি ভালবাসা ও প্রেম।

তিনি অতি সাধারণ মানুষ থেকে রাজা মহারাজার পর্যন্ত সবার সেবা করতেন তাঁর চিকিৎসাপ্রজ্ঞার ছত্র ছায়ায়। যেজন্য সেযুগে তিনি ছিলেন প্রকৃতই এক পরিত্রাতা বিশেষ।

অজাতশত্রু কঠিন বৌদ্ধ বিদ্বেষী হয়েও জীবককে রাজবৈদ্যের পদে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। তাঁর নিজগুণে বুদ্ধদ্রোহী রাজাকে বুদ্ধমখী করে তোলেন। পরবর্তীকালে তিনি অজাতশত্রুর মন্ত্রী ও প্রধান উপদেষ্টা রূপে খ্যাতি অর্জন করেন।

বুদ্ধদেবের "চত্বারি আর্য্য সত্যানী" চার মহাসত্যের কথা তাঁর কাছে ছিল জীবনের মহামন্ত্র বিশেষ। অধ্যয়ন কালে গুরু আত্রেয়ের নির্দেশে এক যোজনের মধ্যে ভেষজ-গুণ বর্জিত কোন বৃক্ষ বা লতাগুল্ম আছে কিনা, স্বল্পকাল মধ্যে অনুসন্ধান করে বাহির করার আদেশ শিরোধার্য্য করে সে পরীক্ষায় তিনি সগৌরবে উত্তীর্ণ হয়ে ছিলেন। তরুণ ছাত্র জীবকের সেদিনের ঘোষণাবানী আজও সবাই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে যে, এমন কোন

* 72 শরৎ চ্যাটার্জী রোড, হাওড়া-4

উদ্ভিদ নাই যার কোন ভেষজ গুণ নাই।

তিনি যে দুখানি যুগান্তকারী চিকিৎসা শাস্ত্র প্রণয়ন করে ছিলেন, তা হচ্ছে "কশ্যপ সংহিতা" ও "বুদ্ধ জীবনতন্ত্র"। সুত্র স্থান, নিদান স্থান, ইন্দ্রিয় স্থান, সিদ্ধি স্থান, কল্পস্থান প্রভৃতি বর্ণনায় সমতুল্য কোন পাশ্চাত্য গ্রন্থ আছে কিনা জানা নেই।

জীবক ছিলেন বৈদিক ও বৌদ্ধ যুগের মিলন সেতু। কেননা আয়ুর্বেদ চিকিৎসাবিদ্যাকে বিদ্যাগ্রহণের শ্রেষ্ঠ পথ বলে বেছে নিয়ে ছিলেন। শুনলে খুবই আশ্চর্য লাগে যে তিনি চৌদ্দ বৎসরের শিক্ষা মাত্র সাত বৎসরের মধ্যে শেষ করে ছিলেন। তরুণ বয়সে অষ্টাদশ বিদ্যাস্থান, চতুষষ্টি কলা বিদ্যা, পর্যালোচনা করেই তিনি আয়ুর্বেদ অধ্যয়নে প্রেরণা পান ও তক্ষশিলায় প্রবৃষ্ট হন। আর বিদ্যাবত্তার গুণেই গুরু আত্রেয়ের যথার্থ কৃপাধন্য হন।

মগধরাজ বিম্বিসারের রাজধানী রাজগৃহের নগর নটী শালবতীর গর্ভেই এই মহান প্রতিভাধর জীবকের জন্ম। অসহায়া জননী নগরপ্রান্তে এক আবর্জনা স্তূপে সদ্যোজাত সন্তানকে পরিত্যাগ করেছিলেন। মহারাজা বিম্বিসার পুত্র রাজকুমার অভয়ই তাকে উদ্ধার ও পুত্রস্নেহে লালন পালন করেন। এই জন্যই জীবককে কুমারভৃত্য বা কোমারভচ্চ বলা হয়। অন্যমতে কুমারতন্ত্র বা কৌমারভৃত্য হচ্ছে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে শিশু চিকিৎসার ও পরিচর্যার বিশেষ অধ্যায়। জীবক প্রথমে এই চিকিৎসায় পারদর্শিতা লাভ করেন বলেই তাঁর ঐ নাম।

সেই আমলটি ছিল ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের এক সুবর্ণ যুগ। কেননা সে সময় এই সব চিকিৎসা বিজ্ঞানী ভারতের প্রাকৃতিক অনুকুলে ঔষধ ও পথ্যের আবিষ্কার করতেন। যে জন্য মহামতি চরক ও সুশ্রুতের ন্যায় চিকিসাবিদদের মধ্যে জীবকও ভারতীয় ভেষজ বিজ্ঞানে অমর হয়ে আছেন। তিনি শল্য চিকিৎসায়ও পারদর্শী ছিলেন। পালি ও সংস্কৃতভাষায় লিখিত বৌদ্ধ গ্রন্থে জীবকের বহুমুখী প্রতিভার উল্লেখ আছে।

"পেস্ট" নিয়ন্ত্রণে হরমোন

ঋতিংকর দত্ত*

সাধারণভাবে পেস্ট (Pest) বলতে আমরা বুঝি সেই সমস্ত পতঙ্গদের যারা ফসল ও গুদামজাত খাদ্যশস্য ধ্বংস করে মানুষের প্রভূত ক্ষতি সাধন করে। প্রতি বছরে পৃথিবীর প্রায় 14-15 শতাংশ ফসল এরা নষ্ট করে। তাই সমগ্র পৃথিবী জুড়ে আজ চলেছে পেস্ট ধ্বংস করার কৌশল আবিষ্কারের পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

পৃথিবীতে পতঙ্গরা আবির্ভূত হয়েছিল 225-270 মিলিয়ান বছর আগে পামিয়ান যুগে (permiun) যুগে কিন্তু এখনও তারা পৃথিবীর অন্য প্রাণীদের উপর কর্তৃত্ব করে চলেছে। উন্নত কারিগরী ও রাসায়নিক মারণাস্ত্র প্রয়োগ করেও মানুষ আজও তাদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেনি। দুঃখের বিষয় বিভিন্ন রোগের জীবাণু বহনকারী মশা ও মাছিকেই মানুষ আজও সম্পূর্ণভাবে দমন করতে সক্ষম হয়নি।

পৃথিবীর যে সমস্ত প্রাণীদের আমরা চিনি তার প্রায় শতকরা আশি ভাগই হলো এই পতঙ্গ শ্রেণীর। পতঙ্গের সকল সদস্যই যে আমাদের ক্ষতি করে তা নয়, বেশ কিছু সদস্যের দ্বারা নানা ভাবে উপকৃতও হই। সুতরাং আমাদের সচেষ্ট হতে হবে কিভাবে উপকারী পতঙ্গদের কাছ থেকে আমরা আরও বেশী উপকার পেতে পারি ও অপকারী পতঙ্গ বা পেস্ট ধ্বংস করে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমাতে পারি।

পেস্ট ধ্বংসের জন্য আমরা বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করি। এর মধ্যে প্রধান হলো বিভিন্ন কীটনাশক পদার্থ প্রয়োগ। ক্রিয়ার প্রকৃতি অনুযায়ী এই কীটনাশক পদার্থগুলিকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়, যথা— পাকস্থলীয় কীটনাশক (Stomach poison), সিস্টেমিক কীটনাশক (Systemic insecticides), স্পর্শ কীটনাশক (Contact insecticides) প্রভৃতি। এছাড়া আলোর ফাঁদ ব্যবহার করে এবং পেস্টের শত্রু এমন ব্যাক্টেরিয়া, ভাইরাস প্রভৃতি প্রয়োগ করে পেস্ট মেরে ফেলার পদ্ধতিও প্রচলিত আছে। পেস্ট নিয়ন্ত্রণে হরমোন প্রয়োগও বিশেষভাবে কার্যকরী হতে পারে। যদিও এব্যাপারে

* যশোর রোড, মোতিগঞ্জ, বনগাঁ, 24 পরগণা

হরমোনের ব্যবহার আমাদের দেশে তত প্রচলিত নয়।

পতঙ্গদের জীবন চক্র সম্পন্ন হয় চারটি দশার মাধ্যমে—ডিম, লার্ভা, পিউপা, ও পূর্ণাঙ্গ দশা। এদের দেহের রূপান্তরটাও বেশ লক্ষণীয়। লার্ভা থেকে পিউপা ও পিউপা থেকে পূর্ণাঙ্গ পতঙ্গ সৃষ্টি—দুটি হরমোনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। দেখা গেছে রেশম মথের লার্ভার মস্তিষ্ক অপসারিত করা হলে পিউপা দশা সম্পন্ন হতে পারে না। যদি মস্তিষ্ক কোষগুচ্ছ লার্ভার দেহের কোন স্থানে প্রতিস্থাপিত করা হয় তবে আবার স্বাভাবিক ভাবে পিউপা দশা শুরু হয়ে যায়। মস্তিষ্ক অস্ত্রোপচারের জন্য প্রাপ্ত আঘাতে তার দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয় না। প্রকৃতপক্ষে মস্তিষ্কের কোষগুলি প্রোথোরাসিকোট্রপিক হরমোন (Prothoracicotropic hormone) নামক পদার্থ ক্ষরণ করে যা এদের বক্ষ দেশে অবস্থিত একজোড়া প্রোথোরাসিক গ্রন্থিকে (Prothoracic glands) উদ্দীপিত করে। ফলে, প্রোথোরাসিক গ্রন্থি থেকে দ্বিতীয় হরমোন ecdysone ক্ষরিত হয়। এই একডাইসোন প্রত্যক্ষভাবে পিউপা গঠনে সাহায্য করে।

এদের মস্তিষ্কের পিছনে করপোরা-অ্যালাটা (Corpora allata) নামক একজোড়া ক্ষুদ্র গ্রন্থি আছে। এই গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয় জুভেনাইল হরমোন (Juvenile hormone)। দেখা গেছে পর্যাপ্ত জুভেনাইল হরমোনের উপস্থিতিতে একডাইসন হরমোন লার্ভার বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে এবং জুভেনাইল হরমোনের মাত্রা হ্রাস পেলে একডাইসন পিউপার বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে ও জুভেনাইল হরমোনের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি পূর্ণাঙ্গের বৃদ্ধি ঘটায়।

মজার ব্যাপার হলো পতঙ্গের জীবন চক্রের কোন কোন দশায় জুভেনাইল হরমোনের প্রয়োগ তাদের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাতে পারে। দেখা গেছে যে রেশম মথের শককীটের গায়ে বা তারা যে পাতা খেয়ে বড় হয় সেখানে যদি জুভেনাইল হরমোনের প্রবণ প্রয়োগ করা হয় তবে তাদের পিউপা দশা আর সম্পন্ন হতে পারে না। পরন্ত তার মৃত্যু ঘটে। রেশম কীটের ডিম যদি এই হরমোনের সংস্পর্শে আসে তবে ভ্রূণের বৃদ্ধিও ব্যাহত হয়। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে হরমোনটি পতঙ্গের জীবনে কীটনাশক দ্রব্যের কাজ করে। আবার যেহেতু এই হরমোনটি প্রাণীটির দেহেই সংশ্লেষিত হয়, সুতরাং এই হরমোনের কার্যকারিতার প্রতিরোধ ব্যবস্থাও তাদের দেহে উৎপন্ন হতে পারে না। পরন্তু লেড আরসিনেট ডি. ডি. টি. প্রভৃতি কীটনাশকের মত এটী আমাদের কাছে তত ক্ষতিকারক নয়। সুতরাং এই জুভেনাইল হরমোন প্রয়োগ করে ফসলের ক্ষতিকারক পতঙ্গ অনায়াসে ধ্বংস করা যেতে পারে।

এখন প্রশ্ন হলো এই জুভেনাইল হরমোন কিভাবে পতঙ্গের দেহ থেকে সংগ্রহ করা হবে। স্বাভাবিক ভাবে পতঙ্গদেহ থেকে এই হরমোন সংগ্রহ করা সম্ভব নয়, কারণ এই হরমোনের উৎস করপোরা-অ্যালাটা গ্রন্থি আকারে অতি ক্ষুদ্র। কিন্তু সৌভাগ্যের কথা হলো অনেক পতঙ্গই পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় জুভেনাইল হরমোন ক্ষরণ করে। বিশেষতঃ স্ত্রী পতঙ্গরা পরিণত অবস্থায় এই হরমোন অত্যধিক মাত্রায় ক্ষরণ করে, কারণ তাদের ডিম্বাশয়-এর বিকাশের জন্য এই হরমোনটি অপরিহার্য। তাছাড়া বেশ কিছু পুরুষ পতঙ্গও তাদের উদরে বেশ কিছু পরিমাণ জুভেনাইল হরমোন সঞ্চিত করে। সুতরাং জীববিজ্ঞানীদের পক্ষে এই হরমোন পতঙ্গের দেহ থেকে সংগ্রহ করে তার রাসায়নিক বিশ্লেষণের দ্বারা অনুরূপ পদার্থ কৃত্রিমভাবে তৈরী করা সম্ভব।

পেস্ট, অর্থাৎ ফসলের ক্ষতিকারক পতঙ্গ ধ্বংসে এই হরমোন ব্যবহারের অসুবিধা হলো এই যে এটি ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু কৃত্রিমভাবে এই হরমোনের অনুরূপ গঠনযুক্ত অথচ স্থায়ী এমন পদার্থ উৎপন্ন করা সম্ভবপর হয়েছে। এরূপ একটি পদার্থ হলো 'JH-mimics'। বর্তমানে এটি মশা ও মাছি ধ্বংসে ব্যবহার করা হচ্ছে।

অমানুষিক সমরসজ্জা

অতসি সেন*

জীবন ধারণের জন্যে প্রত্যেক প্রাণীকেই আত্মরক্ষা আর আক্রমণের উপায় উদ্ভাবন করতে হয়। মানুষ তার জন্ম লগ্ন থেকেই অস্ত্র-অনুসন্ধানে উদগ্রীব। গুহা-মানবেরাও ব্যবহার করেছে পাথরের কুঠার, বল্লম আর পশুচর্মের ঢাল। আমাদের এই অস্ত্র-প্রতিযোগিতারও বহু যুগ আগে থেকে শুরু হয়েছে জীবজগতের সমরসজ্জা। সত্যিকথা বলতে কি, 'ক্যামফ্লেজ' বা ছদ্মবেশের আড়ালে আত্মগোপন পদ্ধতিটি এরাই শিখিয়েছে।

'স্কুইড' বলে এক ধরণের সামুদ্রিক জীবকে তাড়া করলেই, সে পিচকারীর মতন একরাশ কালি ছিটিয়ে তার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়। ধাক্কা খেয়ে 'জেট'-এর মত ছুটতে থাকে 'কাটল্ ফিস্'। এছাড়া 'ভয় দেখানো' রঙের বাহারের আর ত অন্ত নেই। কিছু কিছু নিরীহ প্রজাপতিদের দেখতে হুলওলা ভীমরুলদের মত হয়, কোন কোন নির্বিষ মাকড়সারা আবার তাদের সামনের পা দুটিকে যোদ্ধা পিঁপড়েদের শুঁড়ের মতন নাড়তে থাকে। কিন্তু এত করেও যদি শিকারীদের হাত এড়ানো না যায়। তাহলে তখন সেই 'যঃ পলায়তে' পন্থাটিই অবলম্বন করতে হয়। কেউ দৌড় লাগায় (খরগোস, হরিণ) কেউ বা সাঁতরায় (মাছ), কেউ বা উড়ে (পাখি; প্রজাপতি) আবার কেউ কেউ লাফায় (ফড়িং)। যারা পালিয়ে বাঁচে তাদের আবার গন্ধ শোঁকার ক্ষমতা (স্তন্যপায়ী) আর দৃষ্টিশক্তিটা (পাখি) খুব প্রখর হয়। যাতে শত্রু-আক্রমণ সংবাদটি বেশ কিছুটা আগে থেকেই জানতে পারে।

যারা অমন পালাতে পারে না। তাদের কেউ কেউ আত্ম-রক্ষা করে বর্মের আড়ালে। সব বর্মই আবার একধরণের হয় না। কোনটি স্রেফ মোটা চামড়ার (গণ্ডার, সিন্ধু-ঘোটক, কুমীর) কারো বা হাড়ের খোলস (কচ্ছপ, কাছিম থেকে শামুক, গেঁড়ি, গুগলী)। তিমি, হাঙ্গরের 22 সেন্টিমিটার মোটা চামড়ায়ও অনেক সময় হার্পুণ কি বুলেটও প্রবেশ করতে পারে না। হাড়ের বর্মগুলির মধ্যেও সবগুলি একটা গোটা হাড়ের হয় না। কোন কোনটিতে হাত, পা, মাথার জন্যে আলাদা আলাদা অংশ থাকে। আর সেইজন্যেই প্যাঙ্গোলিন, আর্মাডিল্লোরা কুণ্ডলী পাকিয়ে লোহার বলের আকৃতি ধারণ করতে পারে। অনেক জাতের বর্মধারী মাছও আছে। কয়েকটির সারা দেহটাই বর্মে ঢাকা থাকে, কারোর বা শুধু মাথাটাই। কোন কোন বর্মের গায়ে আবার চটচটে আঠা মাখানো থাকে (উডলাউস). কারোর বা লাগানো থাকে ছুঁচালো কাঁটা (সজারু, সজারু মাছ)। সজারুদের গায়ে ত প্রায় পঁচিশ হাজার কাঁটা থাকে, আর প্রত্যেকটি কাঁটার মধ্যে থাকে প্রায় হাজার খানেক বিষাক্ত বঁড়শী। ফুটে গেলেই সেগুলি সজারুর গা থেকে খসে শত্রুদেহে প্রবেশ করতে থাকে।

জীবজগতে সকলেই যে কেবল ভয়ে পালিয়ে বেড়ায় কি বর্মের আড়ালে লুকিয়ে থাকে, একথা ভাবলে কিন্তু ভুল হবে। অস্ত্র শানিয়ে যুদ্ধ করতেও তাদের অনেকেই পেছপা নয়। সাধারণ ভাবে, মাংসাশীদের অস্ত্র হল তাদের সুতীক্ষ্ণ দাঁত আর জোরালো থাবা (বাঘ, সিংহ)। পাখিদের বাঁকানো ঠোঁট আর সুচাগ্র নখর (প্যাঁচা, ঈগল) আর মাছেদের ধারালো দাঁত আর পাখনার কাঁটা। 'পিরাণহা' মাছেদের দাঁতের ধার তো এমনই যে; কুমীরের চামড়াও টুকরো টুকরো করে ফেলে। চিংড়ী আর ক্যাঁকড়ার ক্ষেত্রে দাঁতের অভাবটা পুরণ হয় সাঁড়াশীর মত ধারালো দাড়া দিয়ে। কামড় লাগালেই দাড়াজোড়া সজারুর কাঁটার মতই ক্ষত-মুখে আটকে থাকে। শক্ত চোয়াল আর কামড়ানোয় কীট পতঙ্গরাও কম যায় না। হুল বিহীন মৌমাছি, উইপোকা আর যোদ্ধা-পিঁপড়েদের-ত এবিষয়ে বেশ সুনামই আছে। মুণ্ডু ছিঁড়ে দিলেও তাদের কামড় ছাড়ানো যায় না।

গণ্ডারের খড়্গের কথা তো আমাদের সকলেরই জানা। বুনো শুয়োরের গজদন্তটিও নেহাৎ ফেলনা নয়। 'তরোয়াল' মাছেদেরও এমন খড়্গ আছে।—যা দিয়ে তারা গতযুগের কাঠের জাহাজ পঞ্চাশ ষাট সেন্টিমিটার পর্যন্ত ফুটো করে ফেলত। হরিণ মোষের শিং আর ঘোড়া; জেব্রার খুরগুলিও অস্ত্র হিসাবে মোটেই তুচ্ছ নয়। চিড়িয়াখানার হাতি শুঁড় তুলে সেলাম করলেও ওটি অনেক সময় তুলে আছাড় মারার অস্ত্র।

* সেন্ট্রাল ফুড লেবরেটরী 3 কীড স্ট্রীট, কলিকাতা-700 016

এতো গেল সাধারণ সব অস্ত্র-শস্ত্রের কথা। এবারে বিষাক্ত গ্যাস যুদ্ধের কথায় আসা যাক্। বিষাক্ত গ্যাসের প্রয়োগ মাত্র 'প্রথম বিশ্বযুদ্ধ' থেকে সুরু হলেও প্রাণীজগতে এর প্রবর্তন বহুযুগের। বিষাক্ত গ্যাসই শুধু নয়। বিষেরও বহু বিভিন্ন বিনিয়োগ তারা করে আসছে যুগ'যুগ ধরে। বোলতা, ভীমরুল, মৌমাছিই শুধু নয়। কিছু কিছু জোনাকী আর গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আমেরিকার পিঁপড়েরাও বিষাক্ত হুল ফোটানোয় সমান পারদর্শী। প্রয়োজন না হওয়া পর্যন্ত হুলগুলিকে এরা খাপেই ভরে রাখে। বড় বড় কাঠপিঁপড়েদের অনেকেই আবার কামড়ানোর চেয়ে বিষাক্ত ধোঁয়া ছুঁড়তেই ভালবাসে। দূরত্বটা কখনও কখনও 30 সেন্টিমিটার অবধি হয়ে থাকে। গোখরো সাপের আত্মীয় 'রিঙ্গাল' আততায়ীর চোখ লক্ষ্য করে বিষ নিক্ষেপ করে। দূরত্ব সীমাটি 4 মিটার পর্যন্ত হয়। 'ব্ল্যাক উইডো' আর 'ট্যারান্টুলা' মাকড়সা কিম্বা 'গিলা মনস্টার' নামক গিরগিটীদের বিষাক্ত কামড় তো পৃথিবী বিখ্যাত। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 'কিংকোবরা', সাহারা মরুভূমির 'মাম্বা' বা নিউগিনীর 'তাইপান'-এর বিষাক্ত ছোবলের সুনামও কম নয়। ছোবলের চাপে বিষটা থলি থেকে বেরিয়ে দাঁতের ফুটো দিয়ে ক্ষতের রক্তে মেশে, ঠিক ইনজেকশানের ওষুধের মত। 'ভাইপার আর 'র‍্যাটল' সাপের এক ইঞ্চি লম্বা বিষ দাঁতটি আবার তালুর গায়ে ভাঁজ করা থাকে। ছোবল মারার সময়ই শুধু খাড়া হয়ে দাঁড়ায়। আমেরিকায় বেঁড়ে-লেজ ছুঁচোদের লালাটিও গোখরো সাপের বিষের মতই প্রাণঘাতী। লোহিত সাগরের 'ব্লেনী' মাছেদেরও সাপেদের মত ফাঁপা দাঁত আর বিষের থলি আছে। অস্ট্রেলিয়াবাসী পুরুষ 'প্ল্যাটিপাস'দের পিছনের পায়ের কাঁটাটিও এই একই কাজে ব্যবহৃত হয়। বিছাদের কামড়ে সবসময় প্রাণ সংশয় না ঘটলেও, সাহারা মরুভূমির 'অ্যানড্রুকটোনাস' জাতের বিছাদের কামড়ে ছঘণ্টার মধ্যেই মানুষ মারা যায়! বিছাদের বাঁকানো হুলটি থাকে আবার লেজের ডগায়। তাঁতীমাছ, বিড়ালমাছ, বিছামাছ, ব্যাঙমাছ প্রভৃতি চল্লিশ জাতের অস্থিময় মাছেদের কাঁটাও খুব বিষাক্ত। কাঁটাগুলি পৃষ্ঠপাখা, বক্ষপাখনা আর মাথার হাড়ের সঙ্গে যুক্ত থাকে। বিষটি বেরিয়ে আসে ফাঁপা কাঁটাগুলির মধ্য থেকে। প্রবালপ্রাচীরবাসী 'স্টোনফিস্'দের ক্ষেত্রে দুঘণ্টার মধ্যেই মৃত্যু ঘটতে পারে। তারামাচ, সীঅ্যানিমোনদের শুঁড়গুলি হয় বিছুটীর মত কাঁটা তোলা। শুঁড়গুলির ভেতরে থাকে এক ঝাঁক বর্শা, এক বাণ্ডিল দড়ি আর এক রাশ বর্শা ছোঁড়ার সরঞ্জাম। অন্য প্রাণীর গন্ধ পেলেই যন্ত্রগুলি বর্শা ছুঁড়তে সুরু করে। 'পর্তুগীজ ম্যান অব ওয়ার' নামক জেলীফিসদের পঞ্চাশ ফুট লম্বা কর্ষিকাগুলি স্পর্শ করলেই হাজার হাজার বিষাক্ত কাঁটা ফুটে যায়, যেগুলি মানুষদেরও প্রাণ সংশয় ঘটাতে পারে। আশ্চর্যের কথা, প্রাণীটি মারা যাবার পরও সেগুলি দিনকয়েক কার্যক্ষম থাকে। শুঁয়োপোকার কাঁটার জ্বালা তো অনেকেরই জানা। শুধু কাঁটাই নয়, কারো কারো সারা দেহটাই এমন বিষাক্ত যে, আফ্রিকার অসভ্যেরা এক সময় তাদের তীরের ফলায় রসটাকে মাখিয়ে নিত।

ব্যাঙেদের আমরা যতটা নিরীহ ভাবি, ততটা নিরীহ কিন্তু তারা নয়। আক্রান্ত হলেই পিঠের আবগুলি থেকে এমন একটা ঝাঁঝালো রস ছিটোয়, যাতে আক্রমণকারীদের চোখ, মুখ, নাক জ্বলে অস্থির। 'ডেনড্রোবেটস্' জাতের ব্যাঙেদের বিষ তো ভুবনবিখ্যাত! দক্ষিণ আমেরিকার আদিবাসীরা তাদের তীরধনুকে এই বিষই ব্যবহার করত। ব্যাঙেদের ভাঁজ করা জিভটিকেও তাদের অস্ত্রের মধ্যে ধরা উচিত, সেগুলির সাহায্যে তারা পোকামাকড় ধরে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া আর উত্তর অস্ট্রেলিয়ার 'তীরন্দাজ মাছেদের' জলের পিচকারীটিও এই জাতের। মাছগুলি আকারে 18 সে. মি. হলে হবে কি, জিভ আর তালুর ফাঁক দিয়ে এমন জলের ধারা ছিটোয় যে, 90 সে. মি. দূরের অসতর্ক শিকারটিও জলে এসে পড়ে। 'পিস্তল চিংড়ী'রা জল ছোঁড়ে দাড়ার ফুটো দিয়ে। ছোঁড়ার সময় দাড়াটিকে বাগিয়ে ধরে ঠিক পিস্তলের মত। বিস্ফোরণের কম্পনে কাঁচের পাত্র ফেটে যাবার ঘটনাও জানা গেছে। 'লামা' বলে উটেদের এক জাতভাই আবার এক রাশ দুর্গন্ধময় থুতু ছিটিয়ে দেয় আক্রমণকারীর চোখে মুখে। গোবরে পোকা গন্ধপোকাদের গন্ধ তো আমাদের সকলেরই জানা। এটা কিন্তু ওদের গায়ের গন্ধ নয়, গন্ধটা ওদের ছড়ানো গ্যাসের। 'বোম্বাডিয়ার বীটল' যখন তার গ্যাস ছোঁড়ে, তখন বেশ কিছুটা দূর থেকেও তার আওয়াজ পাওয়া যায়। অনেকটা টিয়ার গ্যাসের শেল ফাটার মত। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে তারা বার কুড়ি এরকম করতে পারে। বেজী, খট্টাসরাও দুর্গন্ধ ছড়ায়। তবে এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা পারদর্শী 'স্কাঙ্ক'রা। রিভলবারের মত উপর্যুপরি বার ছয়েক নির্ভুল নিশানায় ঝাঁঝালো গ্যাসের ঝলক ছুঁড়তে পারে তারা। যার দূরত্ব 16 ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে আর গন্ধটি পাওয়া যায় 0·8 কিলোমিটার দূর থেকেও। রসটি সালফিউরিক অ্যাসিডের মতই উগ্র, চোখে লাগলে চোখ তো যাবেই, এমনকি গন্ধটি নাকে গেলেও রক্তপাত ঘটতে পারে। 'ব্লিস্টারিং বীটল' ছোঁড়ে বিষবস্তু রক্ত ধারা, যার ছোঁয়া লাগলেই ঘা হয়।

সমর সরঞ্জামে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 'টরপেডো' জাতীয় কিছু কিছু বিশেষ জাতের মাছ, যারা নিজেদের দেহে

বৈদ্যুতিক তরঙ্গ সৃষ্টি করতে পারে। 'শক' দিয়েই তারা মেরে ফেলে তাদের শিকার আর শিকারীদের।

সকলেই যে জন্মগত সম্পদ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে, তা কিন্তু নয়। কেউ কেউ আবার অপরের অস্ত্রগুলিকেও নিজে-দের কাজে লাগায়। 'ইওলিড' বলে এক জাতের সামুদ্রিক কেঁচোরা 'জেলীফিস' ধরে খায়, আর তাদের শুঁড়ের বিছুটীগুলিকে অস্ত্র হিসাবে জমিয়ে রাখে।

অনেকে আবার তাদের বাসস্থানগুলিকেই দুর্গের মত দুর্ভেদ্য করে তোলে। আমেরিকায় এক জাতের মরু ইঁদুর তাদের বাসার চারিপাশে কাঁটাওলা 'ক্যাকটাসে'র বেড়া দেয়। ইঁদুরগুলির ওজন কম হওয়ায়, কাঁটাগুলি তাদের পায়ে বেঁধে না, কিন্তু আক্রমণকারীরা পায়ের যন্ত্রণায় আর ভুলেও দ্বিতীয় বার ওদিকে পা বাড়ায় না।

মডেল তৈরী

ব্যাটারীবিহীন রেডিও

দীপেন ভট্টাচার্য*

এই রেডিও সেটটির ক্ষমতা খুব কম হলেও এর কতগুলি সুবিধা আছে। এটি তৈরি করতে যেমন অনেক কম খরচ পড়বে, চালাবার জন্য কোন খরচা পড়বে না।

নীচে উল্লেখ করা পার্টসগুলি যোগাড় কর। তারপর ঐগুলি ট্যাগ-স্টিপে (Tag-Stip) চিত্রের সারকিট (Circuit) দেখে ঝালাই কর। এমন ট্যাগ-স্টিপটিকে একটি ছোট চেচিজ (Chasis) এর গায়ে সুবিধা মত সেট কর।
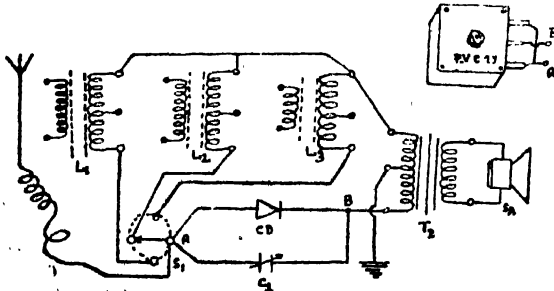
ব্যাটারীবিহীন রেডিও

পার্টসগুলি হয় ঃ—

(1) একটা স্পিকার (Speaker)—আট ওহম্‌সের (8 Ω), (2) একটি ক্রিস্টাল ডায়ড (Crystal diode—CD→OA79), (3) একটি আউটপুট ট্রান্সফরমার (Output transformer—T_2), (4) একটি কনডেনসার (Condenser—C_1 →P.V.C. 2J), (5) তিনটি অসিলেটর কয়েল (Oscillator coil—L_1, L_2, L_3) একটি S.W এবং দুটি M.W. 2J (L_1, L_2), (6) একটি ব্যান্ড সুইচ (Band-Tripole←S_1), (7) একটি ছোট চেচিজ (Chasis), (8) এরিয়াল (Ariel) এবং আর্থ (Earth)। সব 25-30 টাকার মত খরচ হবে।

অ্যালুমিনিয়াম পাত অথবা স্টিক এরিয়ালকে এরিয়াল হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই রকম এরিয়াল-এর উচ্চতা 30 ফুটের বেশী হলেই ভাল হয়।

তবে 20-22 ফুট উচ্চতায় 40-50 ফুট দীর্ঘ মোটা তামার তার আড়াআড়িভাবে টানিয়েও এরিয়াল তৈরি করা যেতে পারে। কোন পরিবাহী দন্ডকে মাটিতে পুঁতে আর্থ করতে হবে।

বলা যায় কোন স্থানে এই সেটের স্পিকার থেকে পাওয়া আওয়াজের তীব্রতা (Intensity) যদি I হয় এবং এরিয়াল-এর উচ্চতা ও আর্থের গভীরতা যথাক্রমে a এবং e হয় এবং ট্রান্সমিটার থেকে ঐ স্থানের দূরত্ব d হলে—

$$I \propto \frac{a-e}{d}$$

বিঃ দ্রঃ—কোন একটি মাত্র রেডিও সেন্টার ভাল ভাবে শোনার জন্য কেবল মাত্র একটি অসিলেটর কয়েল ব্যবহার করা যায়, তাহলে ব্যান্ড সুইচের কোন প্রয়োজন হয় না। একাধিক রেডিও সেন্টার ধরার জন্য ব্যান্ড সুইচ এবং তিনটি কয়েল এখানে ব্যবহার করা হয়েছে।

সারকিট ঠিক ঠিক ভাবে করে L_1, L_2, L_3 কয়েল-গুলির টিউনিং কোরগুলিকে (Tuning Core) বিভিন্ন মানে রেখে ব্যান্ড-এর সাহায্যে একটি কয়েল-এর বর্তনী গঠন করে C_1 কনডেনসারটিকে ঘুরিয়ে রেডিও সেন্টার স্পষ্টতম কর।

* তালদি, 24 পরগণা-743376

আসলে রেডিওটির অবস্থান অনুযায়ী এরিয়াল-এর উচ্চতা এবং আর্থের গভীরতা নির্ভর করে। কোন রেডিও ট্রান্সমিটারের (Transmitter) কাছাকাছি অঞ্চলে খুব কম উচ্চতায় এরিয়ালটি রেখেও বেশ ভাল ভাবে রেডিও শোনা যায়। আবার ট্রান্সমিটার থেকে অনেক দূরবর্তী অঞ্চলে এর এরিয়ালের উচ্চতা একটু বেশী হওয়া প্রয়োজন।

'ভেবে কর'

মনোজ কুমার সিংহ রায়*

সঠিক উত্তরটির পাশে ✓ চিহ্ন বসাতে হবে —:

1. ইঞ্জিনের ক্ষমতা 10 H. p. বলিতে বুঝায়—
   (a) মিনিটে 10×550 ফুট পাউণ্ড কার্য করিতে পারে।
   (b) সেকেণ্ডে 10×550 ফুট পাউণ্ড কার্য করিতে পারে।
   (c) ঘণ্টায় 10×550 ফুট পাউণ্ড কার্য করিতে পারে।

2. ন্যূনতম কত বেগে উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইলে একটি বস্তু পৃথিবীর অভিকর্ষের বাইরে চলিয়া যাইতে সক্ষম হইবে? (পৃথিবীর ব্যাসার্ধ, R=6400 কিমি)।
   (a) 11·2 কিমি/সেকেণ্ড, (b) 10·5 কিমি/সেকেণ্ড, (c) 7·2 কিমি/সেকেণ্ড।

3. একটি ভারী ও একটি হাল্কা বস্তু উভয়ের সমান ভরবেগ। কোনটি অধিক গতিশক্তি সম্পন্ন?
   (a) হাল্কা বস্তুটি, (b) দুইটিই সমান, (c) ভারী বস্তুটি।

4. সান্ট (Shunt) হইল—
   (a) উচ্চমানের রোধ, (b) নিম্নমানের রোধ, (c) আভ্যন্তরীণ রোধ।

5. কোনটির মধ্য দিয়া তড়িৎপ্রবাহ সক্ষম—
   (a) p. V. C. (b) V. I.·R. (c) Graphite, (d) Glosses.

6. হার্জ (Hertg) কিসের একক—
   (a) তড়িৎ আধান (Electric charge), (b) কম্পাঙ্ক (Frequency) (c) চৌম্বক বল (Magnetic force.)

7. ইলেকট্রন ভালভ (Electron valve) ও ট্রানজিস্টারের (Transistor) মধ্যে কোনটির সুবিধা বেশী?
   (a) সমান, (b) ইলেকট্রন ভালভ, (c) ট্রানজিস্টার।

8. বিরঞ্জনগুনবিশিষ্ট এবং জীবানুনাশক গ্যাস হইল—
   (a) ক্লোরিন, (b) নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড, (c) হাইড্রোজেন-সালফাইড।

9. যে সকল যৌগের আনবিক সংকেত এক (অভিন্ন) কিন্তু আনবিক গঠন ও ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন তাদেরকে বলা হয়—
   (a) আইসোবার (isobar), (b) আইসোটোপ (isotope) (c) আইসোমার (isomer)।

10. কপারের একটি আকরিকের নাম—
   (a) ম্যালাকাইট, (b) কার্নেলাইট, (c) ক্যালামাইন, (d) ক্রায়োলাইট।

11. পিচ (Pitch)-এ শতকরা কত কার্বন আছে?
   (a) 92%, (b) 80%, (c) 30·5%, (d) 53%.

12. খাদ্য প্রস্তুত করতে সক্ষম—এমন একটি প্রাণীর নাম হলো—
   (a) অ্যাসকারিস, (b) ইউগ্লিনা, (c) মনোসিসটিস।

13. মানুষের রক্তে লোহিত কণিকায় নিউক্লীয়াসের সংখ্যা—
   (a) এক, (b) অসংখ্য, (c) শূন্য।

14. কোন ভিটামিনের অভাবে রাতকানা রোগ হয়?
   (a) D, (b) A, (c) B_{12}, (d) C.

15. নিম্নলিখিত কোনটি প্রতিষেধক (antibiotic)?

* ইলেকট্রিকের ছাত্র, ২য় বর্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণ শিল্প বিদ্যাপীঠ, সিউড়ি, বীরভূম।

(a) Aspirin, (b) Paracetamol, (c) Penicillin, (d) Sulphadizine.

16. বাঘের বৈজ্ঞানিক নাম—
(a) ফেলিস টাইগ্রিস (Felis tigris)
(b) ফেলিস লিও (Felis leo)
(c) পিসিয়াম স্যাটিভাম (Pisium sativum)
(d) ওরাইজা স্যাটিভা (Oryga sativa)

17. ডিনামাইট কে আবিষ্কার করেন ?
(a) মাইকেল ফ্যারাডে, (b) টমাস আলভা এডিসন, (c) অ্যালফ্রেড নোবেল।

18. ট্রাকটার আবিষ্কার করেন যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানী
(a) কোল্ট, (b) হাল্ট, (c) হোল্ট।

19. নীচের প্রশ্নটি উপযুক্ত স্থানে কোনসংখ্যা বসবে বল—
81, 69, 58, 48, 39, ?, ?
(a) (31, 24); (b) (30, 21); (c) (21, 12).

20. নিম্নে সম্পর্কটি শুদ্ধ বল—
log 2 log 2 log 2 16 = 1
(a) অশুদ্ধ, (b) শুদ্ধ, (c) সহজে বলা যাবে না।

'ভেবে কর' সমাধান—

1. (b), 2. (a), 3. (a), 4. (b), 5. (c), 6. (b), 7. (c), 8. (a), 9. (c), 10. (a), 11. (a), 12. (b), 13. (c), 14. (b), 15. (c), 16. (a), 17. (c), 18. (c), 19. (a), 20. (b).

ডিটারজেণ্ট বনাম সাবান

সুব্রত শীল*

মানুষের ঘরে ঘরে ডিটারজেণ্ট আজ একটি সম্ভ্রান্ত অথচ দৈনন্দিন ব্যবহারের বস্তু। গরমে বা ঠাণ্ডায়, খর বা মৃদুজলে, এমনকি কাপড়-চোপড়কে বিরঞ্জন ও নীল করে তুলতে ডিটারজেণ্ট পাউডারের তুলনা নেই। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, এর প্রচুর ফেনা আমাদেরকে এই ধারণা দেয় যে পরিষ্কার করার কাজটা খুব ভালই হচ্ছে। এর দাম বাড়লেও আমাদের তেমন মাথাব্যথা নেই। কারণ, তখন আমাদের ধারণা এই হয় যে, অশোধিত খনিজ তেল বা পেট্রোলিয়াম (যার থেকে ডিটারজেণ্টের মূল উপাদান তৈরি করা হয়)-এর দাম বৃদ্ধির জন্যই এই সমস্যা এবং এটা সারা বিশ্বেরই সমস্যা। কিন্তু তাহলেও বলি ডিটারজেণ্ট ব্যবহার করবেন না বা করলেও যতটা সম্ভব কম ব্যবহার করবেন। অবাক হয়ে যাচ্ছেন—তাই না ? কেন বলছি—

প্রথমতঃ, ডিটারজেণ্ট প্রস্তুতকারকরা জানেন যে এটা একটা আকর্ষণীয় ব্যবসা কারণ এতে যে সমস্ত বিল্ডার (Builder) এবং ফিলার (Filler) (যেমন সোডিয়াম সিলিকেট, সোডিয়াম ক্লোরাইড, সোডিয়াম সালফেট) ইত্যাদি) থাকে তাদের অনুপাত ও প্রকৃতি ইচ্ছামত পরিবর্তন করা যায়। সোডিয়াম সালফেট ডিটারজেণ্ট প্রস্তুতির উপজাত পদার্থ বলে নুতন করে এটা যোগ করার প্রয়োজন হয় না। দ্বিতীয়তঃ, ডিটারজেণ্টের মূল উপাদান অ্যালকিল বেনজিন সালফোনেট বা সংক্ষেপে এ. বি. এস (ভারতীয় প্রস্তুতিতে ব্যবহার করা হয়) বায়োডিগ্রেডেবল (Bio-degredable) নয় অর্থাৎ প্রকৃতিতে নিরাপদ পদার্থে ভেঙ্গে যায় না। যুক্তরাজ্যে আইনই রয়েছে যে, কোন ডিটারজেণ্ট 90%-এর চেয়ে কম বায়োডিগ্রেডেবল (Bio-degradable) হওয়া চলবে না। আমাদের দেশেও এ. বি. এস-এর দূষণ সম্বন্ধে অবহিত হয়ে প্রস্তুতকারকরা লিনিয়ার অ্যালকিল বেনজিন সালফোনেট (যেটা বায়োডিগ্রেডেবল) ব্যবহার করার চেষ্টা করছেন। তবে তাতেও অসুবিধা আছে—জানা গেছে এটি নাকি ভেঙ্গে গিয়ে ফেনলের মত বিষাক্ত যৌগ তৈরী করে। সবরকমভাবেই প্রমাণিত হয়েছে যে ডিটারজেণ্ট পরিবেশকে দূষিত করে।

তৃতীয়তঃ, ডিটারজেণ্টে যে সোডিয়াম ট্রাই-পলিফসফেট বা এস. টি. পি. পি. (যেটি ডিটারজেণ্টের পরিষ্কার করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং জলকে মৃদু করে) রয়েছে সেটি জলের সঙ্গে বেরিয়ে চলে যায়। কিন্তু জল মৃদু হলে সাবান নিজেই এই কাজ করতে পারে। এই ফসফেট ডিটারজেণ্টের অন্যতম প্রধান উপাদান—35% থেকে 40% থাকে। জলের সঙ্গে মিশে নদী হ্রদ এবং সাগরে চলে যায়। নদী বা হ্রদে, এই ফসফেট জলজ উদ্ভিদের খাদ্য

---

* এফ্-৭/৮, লাবণী এস্টেট, সল্ট লেক্, কলিকাতা-৭০০০৬৪

হিসাবে উদ্ভিদের বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে এবং ফলে অ্যালগি (আনুবীক্ষণীক উদ্ভিদ) জন্মায়। খুব দ্রুত জন্মায় এরা কিন্তু শীঘ্রই মারা যায়—সঙ্গে টেনে নেয় জল থেকে প্রচুর পরিমাণে মুক্ত অক্সিজেন। সৃষ্টি করে অক্সিজেনের অভাব —মারা যায় অন্যান্য জলজ প্রাণীরা। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, ডিটারজেন্টের ফস্‌ফেট জল দূষণ করে।

চতুর্থতঃ, বিশুদ্ধ সাবানের চেয়ে ডিটারজেন্ট অপেক্ষাকৃত বেশী হাতকে অমসৃন ও বিরঞ্জিত করে। কয়েক-বছর আগে ইংলণ্ডে সমীক্ষা চালিয়ে ডিটারজেন্ট ব্যবহারের খারাপ ফল দেখা গেছে। কিন্তু সাবানে এরূপ কোন প্রতিক্রিয়া (একমাত্র অ্যালার্জী ছাড়া) দেখা যায়নি।

ডিটারজেন্ট যেমন কাপড়-চোপড়কে ধবধবে সাদা করতে অতুলনীয় তেমনি হাতের চামড়া নষ্ট ও বিরঞ্জিতও করে। এই বিরঞ্জন প্রতিক্রিয়া কেবলমাত্র অতিবেগুণী-রশ্মির প্রভাবে দেখা যায়। কাজেই ডিটারজেন্টের এই ক্ষতিকারক ক্রিয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়—বিশেষ করে হাতে যদি কোন ঘা থাকে তবে আরোগ্যে বিলম্ব হবে।

পঞ্চমতঃ, ডিটারজেন্টের পর্বতপ্রমান ফেনা নর্দমার জল পরিশোধনে বাঁধার সৃষ্টি করে। নোংরা জলের সঙ্গে সহজেই বেরিয়ে যায় কিন্তু নর্দমার জল যখন বায়ু দ্বারা বাহিত হয় কিংবা নদী বা সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে পড়ে তখন এরা ফেনায়িত হয়ে ওঠে। সাবানে এরকম হয় না—কেননা, সাবান শীঘ্রই সরলতর পদার্থে ভেঙ্গে যায় বা নিরাপদ পদার্থে রূপান্তরিত হয়।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, ডিটারজেন্টের যতই গুণ থাকুক না কেন, সাবানের তুলনায় এটি অনেক বেশী ক্ষতি-কারক। তাহলেও এটি সাধারণ মধ্যবিত্তের ঘরে কেন এত বেশী জনপ্রিয়? কারণটা সম্ভবতঃ "বিজ্ঞাপনের গরু গাছে চড়ে" এই যুক্তির সত্যতায়।

কাজেই ডিটারজেন্ট থেকে কোন বেশী উপকার পাওয়া যাচ্ছে কি? না। বরং দীর্ঘদিন ব্যবহার করলে ডিটারজেন্ট আমাদের পরিবেশকে আরো দূষিত করে তুলবে। কাজেই, ডিটারজেন্টের ব্যবহার কমিয়ে সাবান বেশী করে ব্যবহার করার চেষ্টা করুন। এতে যেমন অর্থ সাশ্রয় হবে তেমনি কাজও হবে।

বিজ্ঞান বিচিত্রা

সত্যরঞ্জন পাণ্ডা*

লুপ্তপ্রায় একটি প্রাণী ও উদ্ভিদ

প্রতিটি উদ্ভিদ ও প্রাণী আমাদের পরিবেশের অমূল্য সম্পদ, বিংশ শতাব্দীর আগে অনেকে চিন্তা করেন নি। বিংশ শতাব্দীর পর বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদ এরও সুস্থ ভাবে বেঁচে থাকার এবং বসবাস করার সমান অধিকার আছে। স্বীকারও করেছেন উদ্ভিদ ও প্রাণী সম্পদের সংরক্ষণ প্রয়োজনীয়তার বিষয়। কিন্তু মানুষের খাদ্য, বাসস্থান, যানবাহন, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রভৃতির চাহিদা মেটাতে গিয়ে প্রতি তিন বছর অন্তর একটি করে প্রজাতি প্রাণী পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে চলেছে। মানুষের বিভিন্ন চাহিদা ও তার বংশবৃদ্ধির এবং লুপ্ত হওয়া প্রাণী ও উদ্ভিদ সব মিলিয়ে পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। বিভিন্ন সময় অনেক বিজ্ঞানীরা প্রাণী ও উদ্ভিদকে রক্ষা করার কথা মনুষ্য সমাজের কাছে আবেদন জানিয়েও চলেছেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনেকে সাড়া দিচ্ছেন আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাঁরা সে আবেদনের সাড়া পান নি।

সমীক্ষায় জানা গেছে বর্তমান পৃথিবীতে প্রায় তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজারের মত উদ্ভিদ আছে। তার আগে বেশ কয়েকশ প্রাণী ও উদ্ভিদ ধ্বংস হয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির বন্য প্রাণী প্রভৃতির অবলুপ্তিও ঘটেছে। তা হলেও কিছু কিছু লুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ ও প্রাণীর বৃদ্ধি পেয়েছে বর্তমানে। এখানে উল্লেখ করা হল একটি উদ্ভিদ ও একটি পাখির সম্বন্ধে।

বিবর্তনবাদের যুক্তি তর্ককে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বিশকোটি বছর ধরে পৃথিবীতে বেঁচে আছে কয়েকটি উদ্ভিদ, এদের সংখ্যা খুবই কম। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে জিঙ্কগো বাইবোলা (Ginkgo Bibola), বিজ্ঞানীদের আজ অবাক করে দিয়েছে কি করে এরা পৃথিবীর বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে বেঁচে আছে। এই গাছের একমাত্র প্রজাতি বাইবোলা। অনেকে মনে

* ১নং ভোলা ময়রা লেন, কলিকাতা।

করেন জাপান ও চীন দেশের বৌদ্ধ মন্দিরের পুরোহিতেরা একে সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবে খুব যত্নে লালন পালন করতেন। তাঁদের বাগানে খুবই যত্নের সঙ্গে যদি বাঁচিয়ে না রাখতেন তা হলে এদের অবলুপ্তি ঘটে যেতো। এই গাছ পর্ণ মাচী, শীতকালে পাতা ঝরে যায় এবং গরমের সময় নতুন পাতা বেরোয়, ডালপালা এই সবুজ পাতায় ঢাকা থাকে। আমেরিকা, চীন, এশিয়া ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে এদের দেখা যায়। সমীক্ষায় জানা গেছে দেরাদুন, মুসৌরি, দার্জিলিং-এর বোটানিক্যাল গার্ডেন প্রভৃতি স্থানে এদের এখন দেখা যায়। সম্প্রতি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে এই বৃক্ষরোপন করে, এর উল্লেখযোগ্যভাবে বংশবৃদ্ধি হয়েছে। এভাবে এই গাছটি বর্তমানে রক্ষা পেয়েছে অবলুপ্তির হাত থেকে।

পাখির জগতেও কিছু কিছু অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে বর্তমানে। তার মধ্যে একটি পাখি হচ্ছে গ্রেট ইণ্ডিয়ান বাস্টার্ড। এই পাখি অনেকটা অস্ট্রিচ পাখির মত দেখতে। রাজস্থানের মরুঅঞ্চল থেকে আরম্ভ করে মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটক পযন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে বাস্টর্ড বসবাস করে। বর্তমান এই পাখির সংখ্যা বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। জুওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে 1978 সালে এই পাখির সংখ্যা ছিল প্রায় 700 টির মত। বর্তমানে এই অধুনা লুপ্তপ্রায় বাস্টার্ড পাখির সংখ্যা 800 থেকে 900 পর্য্যন্ত বেড়েছে। অর্থাৎ আগের তুলনায় 100 থেকে 200 বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে এই পাখি মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রে বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে। মহারাষ্ট্রে এই পাখির সংখ্যা প্রায় 150 এর মত। বর্তমানেএরা ঐ সব অঞ্চলের খোলা ঘাসের মাঠেযে সব জায়গায় ঝোপ রয়েছে তাদের মধ্যেও থাকতে ভালবাসে।

বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে বেশীর ভাগ প্রাণী ও উদ্ভিদের অবলুপ্তি ঘটেছে মানুষের হাতে। ফলে যে ক্ষতি হয়েছে তা পুরণ কোন দিন হবে কিনা সন্দেহ। তবে এই ক্ষতি ভবিষ্যতে আর না হয় তার দিকে নজর রেখে এই সব লুপ্তপ্রায় উদ্ভিদের চাষ এবং প্রাণী সংরক্ষণ নিঃসন্দেহে অবলুপ্তির হাত থেকে বাঁচানের শুভ সঙ্কেত।

ভূতাপ থেকে শক্তি

বিজ্ঞানীদের মতে আমাদের এই পৃথিবী প্রথমে গ্যাসীয় অবস্থায় ছিল। পরে ক্রমশঃ শীতল ও ঘভূনীত হয়ে প্রথমে হয় তরল এবং তার পরে আরও শীতল হয়ে বর্তমান এই পৃথিবী হয়েছে। উপরিভাগ শীতল হলেও এর অভ্যন্তরে তাপ খুব বেশী। যতই অভ্যন্তরে যাওয়া যাবে ততই তাপ বাড়িবে। সাধারণতঃ পৃথিবীর উপরভাগা থেকে অভ্যন্তরের দিকে গড়ে প্রতি 15-18 মিটারে 1 ডিগ্রী হিসেবে তাপ বেশী। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে পৃথিবীর মধ্যভাগে বিভিন্ন পদার্থ উত্তপ্ত এবং তরল হলেও উপর ও পাশের বিভিন্ন শীলা প্রভৃতির চাপে এগুলো প্রায় স্থির থাকে, এবং এসব জায়গায় তাপ অনেক বেশী। পৃথিবীর অভ্যন্তরে এই তাপকে বলা চলে ভূ-তাপ শক্তি।

এই ভূতাপ শক্তি পৃথিবীর আদিমতম শক্তির উৎস, ভূপৃষ্ঠের এইসব অঞ্চলে পৃথিবীর গঠনের সময় থেকে এই ভূ-তাপ সঞ্চিত হয়ে রয়েছে। পৃথিবীর ঠিকমাঝ-ভাগে আছে সব থেকে ভারী উপাদান লোহা ও নিকেল। এই স্তরের গভীরতা প্রায় 3,200 কিমি একে বলা হয় কেন্দ্র মণ্ডল, কেন্দ্রমণ্ডলের উপরে প্রায় 1600 কিমি—2880 কিমি পর্যন্ত স্তরটির নাম গুরুমণ্ডল এবং 1,300 কিমি—1600 কিমি—পর্য্যন্ত স্তরটির নাম অশ্বমণ্ডল সবশেষে অশ্বমণ্ডলের উপরের স্তরটির নাম ভূত্বক। বিজ্ঞানীরা মনে করেন এই ভূত্বকের প্রায় মাইল তিনেক নীচে এই ভূতাপ সঞ্চিত রয়েছে। স্থানে স্থানে রয়েছে সছিদ্র "হটরক" এই "হটরকের" মধ্যে ছড়িয়ে আছে ব্রাইন বা লবণ সম্পৃক্ত উষ্ণজল।

পৃথিবীর বিভিন্ন ভূতাত্ত্বিকেরা এই হটরক বেডের উপর বিভিন্ন সমীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন ভূ-পৃষ্ঠের নীচে এই সঞ্চিত ভূতাপকে কাজে লাগানোর জন্য। তাঁর মধ্যে কিন্তু কিছু বিজ্ঞানীও সফল হয়েছেন। সম্প্রতি দক্ষিন ইংলণ্ডের সাদাম্পটনে ভূতাত্ত্বিকেরা এই ধরনের হটরক বেডের উপর এক বিরাট কূপ খনন করেছেন। ভূপৃষ্ঠের নীচে এই ধরনের সঞ্চিত তাপকে কাজে লাগানোর জন্য এটাই তাঁদের প্রথম পদক্ষেপ। তাঁদের সাদাম্পটনে ভূপৃষ্ঠের প্রায় 1700 মাইল নীচ থেকে এই শক্তি ভাণ্ডারের সন্ধান পাওয়ার সম্ভাবনা।

সমীক্ষায় দেখা যায় যে তাঁদের এই পরীক্ষামূলক কূপটি সফল হলে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সুচনা হবে। এখানে 'হিট এক্সচেঞ্জার' বসিয়ে ঐ ভূ-তাপ থেকে উৎপাদন হবে প্রচুর বিদ্যুৎ নতুন নতুন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাবে ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন মণ্ডলের। ভূ-তাপ থেকে শক্তি আরোহণ করে এ-ভাবে মানুষের প্রচুর উপকার করতে সক্ষম হবেন বিজ্ঞানীরা।

শোক সংবাদ
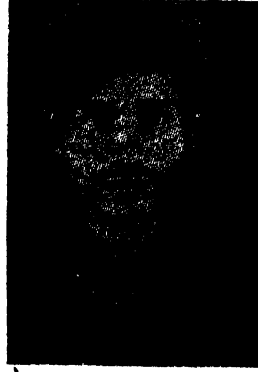
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের ফটোগ্রাফি বিভাগের দ্বিতীয় কোর্সের শিক্ষার্থী "দিব্যেন্দু পালিত" গত 6. 5. 85 তারিখ সোমবার মাত্র 22 বৎসর 4 মাস বয়সে শারীরিক অসুস্থ হয়ে পরলোকগমন করেন। গত 13. 5. 85 তারিখে উক্ত বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, প্রশিক্ষক ও পরিষদের কর্মচারীবৃন্দ শোক সভায় মিলিত হয়ে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং তাঁর পরিবার বর্গকে সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

পরিষদ সংবাদ

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ

27শে জুলাই 85 শনিবার বিকাল 3 টায় গোয়াবাগান সি. আই. টি পার্কে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পরিষদের কর্মসচিব ডঃ সুকুমার গুপ্ত, কোষাধ্যক্ষ শ্রীশিবচন্দ্র ঘোষ, অন্যতম সহ-সভাপতি শ্রীকালিদাস সমাজদার, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সম্পাদনাসচিব ডঃ গুণধর বর্মন, অন্যতম সহযোগী কর্মসচিব শ্রীতপন বন্দ্যোপাধ্যায় কার্যকরীসমিতির সদস্য শ্রীভোলানাথ দত্ত, শ্রীমলিনকৃষ্ণ রায় এবং পরিষদের কর্মীবৃন্দ এই উৎসবে অংশ নেন।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-700 006 থেকে প্রকাশিত এবং গুপ্ত প্রেস 37/7, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-700 009 থেকে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

আবেদন

1948 সাল থেকে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা বিষয়ে পরিকল্পিত ধ্যান ধারণা পরিষদ পালন করে আসছে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার প্রকাশনের মাধ্যমে। ইতিমধ্যে পরিষদ কিছু অমূল্য রচনা বাংলাভাষায় প্রকাশ করেছে। বর্তমান পত্রিকা প্রকাশনা ছাড়াও পরিষদ বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে যাতে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান মানসিকতার বিকাশ ঘটে। গ্রাম বাংলার পল্লীতে, আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে ও শহরের বস্তিতে, যেখানে বেশীর ভাগ মানুষ জ্ঞানের আলো থেকে এখনও বঞ্চিত, তাদের কাছে বিজ্ঞানের মঙ্গলময় রূপ তুলে ধরতে পরিষদ বদ্ধপরিকর। এইসব বিজ্ঞানভিত্তিক কর্মসূচীর রূপায়নে অর্থের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। অথচ পরিষদের দারুণ অর্থাভাব। তাই পরিষদ সরকার, বেসরকারী সংস্থা, ব্যবসায়ী ও সহৃদয় ব্যক্তির কাছে অর্থসাহায্যের আন্তরিক আবেদন জানাচ্ছে। সাধারণ মানুষের জন্য তৈরী আচার্য্য বসুর পরিষদ যে কোনও সামান্য দানও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করে অবহেলিত মানুষের স্বার্থে ব্যয় করবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে পরিষদে প্রদত্ত সর্বপ্রকার দান আয়করমুক্ত।

কর্মসূচি

1 সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান মানসিকতা সৃষ্টি করা এবং বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন গড়ে তোলা।

2 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকাকে সাধারণের নিকট আরও আকর্ষনীয় করে তোলা।

3. পরিষদের মাধ্যমে গ্রামবাংলার বিজ্ঞান ক্লাবগুলির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা এবং তাদের বিজ্ঞান ভিত্তিক জনহিতকর কাজে উৎসাহিত করা।

4. প্রতি বছরে পশ্চিম বাংলায় অন্ততঃ একবার বিজ্ঞান সম্মেলনের ব্যবস্থা করা।

5 গ্রামবাংলার বিভিন্ন মেলায় বিজ্ঞান ক্লাবগুলিকে নিয়ে পোস্টার প্রদর্শনী, বিজ্ঞানভিত্তিক চলচ্চিত্র, আলোচনা-চক্র অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে বিজ্ঞান, জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করা।

6. বছরের শেষে বিজ্ঞান মেলার আয়োজন করা।

7. হাতে-কলমে কারীগরী বিদ্যা শিখিয়ে ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রী ও নাগরিকদের স্বনির্ভরশীল করা। ব্যয়ভার বহনের জন্য সামান্য অর্থের বিনিময়ে টি. ভি, টেপরেকর্ডার, রেকর্ড-প্লেয়ার, ট্রানজিস্টার, এমারজেন্সি বৈদ্যুতিক আলো, ফটোগ্রাফী বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা দেওয়া।

8. মাটি পরীক্ষার কাজে শিক্ষা দিয়ে গ্রামের বিজ্ঞান ক্লাবগুলিকে সাধারণ চাষীদের সাহায্য করতে উৎসাহিত করা।

9. সাধারণ মানুষের জন্য বিজ্ঞান প্রবন্ধ থেকে মৌলিক গবেষনাপত্র পর্যন্ত বাংলা ভাষায় প্রকাশ এবং জনপ্রিয় বিজ্ঞানের বই ও বিজ্ঞান সাধক চরিতমালা প্রকাশ।

10. যোগব্যায়াম ও তার গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন।

11. পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগারটি সুসমৃদ্ধ করে গড়ে তোলা।

12. পরিষদ ভবনে 'বিজ্ঞান সংগ্রহশালা' স্থাপন করা।

13. নির্বিচারে যথেচ্ছ গাছপালা ও বনজঙ্গল ধ্বংসের ফলে পরিবেশ দূষণ ও আবহাওয়ার মারাত্মক পরিবর্তনের ভয়াবহতা সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সজাগ করা।

14. নির্বিচারে বন্যপ্রাণী ধ্বংসের দরুণ বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্যে বিঘ্ন ঘটার বিপদ সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা।

15. যাবতীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করা।

16. শহর ও গ্রামের প্রতিটি স্কুল, কলেজ ও গ্রন্থাগারে পরিষদের মুখপত্র 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার গ্রাহকীকরণের মাধ্যমে পরিষদের আদর্শ ও উদ্দেশ্য প্রচার।

সুকুমার গুপ্ত
কর্মসচিব

লেখকদের প্রতি নিবেদন

1. বিজ্ঞান পরিষদের আদর্শ অনুযায়ী জনসাধারণকে আকৃষ্ট করার মত সমাজের কল্যাণমূলক বিষয়বস্তু সহজবোধ্য ভাষায় সুলিখিত হওয়া প্রয়োজন।
2. মূল প্রতিপাদ্য বিষয় এবং পূর্ণ ঠিকানাসহ লেখকের পরিচিতি পৃথক কাগজে অবশ্যই লিখে দিতে হবে।
3. চলিত ভাষা এবং চলন্তিকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট বানান ও পরিভাষা ব্যবহৃত হবে। উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে আন্তর্জাতিক শব্দটি বাংলা হরফে লিখে ব্র্যাকেটে ইংরাজী শব্দটিও দিতে হবে। আন্তর্জাতিক সংখ্যা এবং মেট্রিক পদ্ধতি ব্যবহৃত হবে।
4. মোটামুটি 2000 শব্দের মধ্যে রচনা সীমাবদ্ধ থাকা বাঞ্ছনীয়।
5. বিভিন্ন ফীচার, সমকালীন বিজ্ঞান গবেষণা ও প্রযুক্তিবিদ্যার সংবাদ এবং বিজ্ঞান বিষয়ক সুন্দর আকর্ষণীয় ফটোগ্রাফীও গ্রহণীয়।
6. রচনার সঙ্গে চিত্র থাকলে আর্ট পেপারে চাইনিজ কালিতে সুঅঙ্কিত হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন।
7. প্রত্যেক চিত্র প্রস্থে 8 সে. মি. কিংবা এর গুনিতকের (16 সে মি 24 সে. মি.) মাপে অঙ্কিত হওয়া প্রয়োজন।
8. অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রবন্ধের মৌলিকত্ব বজায় রেখে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জনে সম্পাদক মন্ডলীর অধিকার থাকবে।
9. প্রত্যেক প্রবন্ধ ফীচার-এর শেষে গ্রন্থপঞ্জী থাকা বাঞ্ছনীয়।
10. জ্ঞান ও বিজ্ঞানে পুস্তক সমালোচনার জন্য দুই কপি পুস্তক পাঠাতে হবে।
11. ফুলস্ক্যাপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় যথেষ্ট মার্জিন এবং প্রতি লাইনের পর বেশ কিছুটা ফাঁক রেখে পরিস্কার হস্তাক্ষরে প্রবন্ধ লিখতে হবে।
12. প্রতি প্রবন্ধের শুরুতে পৃথকভাবে প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসার দেওয়া আবশ্যিক।

সম্পাদনা সচিব

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

শারদীয় জ্ঞান ও বিজ্ঞান

অগাস্ট-সেপ্টেম্বর, 1985
৩৮তম বর্ষ, অষ্টম-নবম সংখ্যা

বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের অনুশীলন করে বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ ও সমাজকে বিজ্ঞান-সচেতন করা এবং সমাজের কল্যাণকল্পে বিজ্ঞানের প্রয়োগ করা পরিষদের উদ্দেশ্য।

বিভিন্ন লেখকদের স্বাধীন মতামত বা মৌলিক সিদ্ধান্তসমূহ পরিষদের বা সম্পাদকমণ্ডলীর চিন্তার প্রতিফলন হিসাবে সাধারণতঃ বিবেচ্য নয়।

বিষয় সূচী

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

মূল্য : 8.00
(আট টাকা)

যোগাযোগের ঠিকানা :

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট
কলিকাতা-700006
ফোন : 55-0660

শারদীয়

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

অষ্টাত্রিংশত্তম বর্ষ | অগাস্ট-সেপ্টেম্বর, 1985 | অষ্টম-নবম সংখ্যা

আমাদের কথা

শারদীয় প্রকৃতির পরিবেশে বাংলার ঘরে ঘরে এখন ছুটির আমেজ। এই আনন্দের অংশ নিয়ে আমরা আপনাদের হাতে জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার শারদীয় সংখ্যা পৌঁছে দিতে পেরে আনন্দিত। শারদীয় পত্র-পত্রিকা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদ। আবহমান কাল থেকে সংস্কৃতিমনা বাঙালীর ঘরে ঘরে সবাই কোন না কোন শারদীয় সংকলনের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকেন। বর্তমান যুগে বাংলায় বিজ্ঞান সাহিত্য সাহিত্যের আসরে নবাগত না হলেও উল্লেখযোগ্য সংযোজন। আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মাতৃভাষায় বিজ্ঞান প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে। পরিষদের মুখপত্র জ্ঞান ও বিজ্ঞান এই উদ্দেশ্য সাধনে বাংলায় বিজ্ঞান সাহিত্যের পুরোধা হিসেবে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের সেবা করে এসেছে। সম্প্রতি বিভিন্ন লেখকের বিজ্ঞান সাহিত্য নিয়ে আলোচনা সংকলন করে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিশেষ বিজ্ঞান সাহিত্য সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। বিজ্ঞান সাহিত্যের বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক মানের উৎকর্ষ সাধনেই এই প্রয়াস। বর্তমান শারদীয় সংখ্যার বিভিন্ন রচনায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় পাঠকদের কাছে উপস্থিত করার চেষ্টা করেছি যাতে সাহিত্য পাঠের আনন্দ ও বিজ্ঞান চর্চার সুযোগ—দুই-ই একত্র পাওয়া যেতে পারে। জ্ঞান ও আনন্দের এই সমীকরণ আপনাদের শারদীয় অবকাশ পূর্ণ করুক—এই আশাই করব।

1985 বৎসরটি বিজ্ঞানের জগতে এইজন্যই উল্লেখযোগ্য যে এবছর আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জন্মের 125তম বর্ষ। আচার্য রায় ভারতে রসায়ন গবেষণার শুধু পথিকৃৎই নন, বিশ্বের দরবারে তিনি দেশের মুখোজ্জ্বল করেছেন। তাছাড়া স্বদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠা ও প্রচারে তিনি ছিলেন পুরোধা। তাছাড়া এবছর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী নীলস্ বোরের জন্মের শতবর্ষ পূর্ণ হল। ইলেকট্রন প্রোটন নিয়ে পরমাণুর সৌরজগতের মত প্রতিরূপটী তিনিই 1913 খৃস্টাব্দে আবিষ্কার করেন। এই সুযোগে আমরা এই দুই বিজ্ঞানীর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

বর্তমান বছর দেশ এক চরম সংকটের ভেতর দিয়ে চলেছে। অস্থির সমাজের হিংস্র আস্ফালনের মুখে সংস্কৃতি ও মানবতার মূল্যবোধ যেন অবসিত। এর মূলে রয়েছে বহুযুগ সঞ্চিত ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কার। শুধু বিজ্ঞানই পারে তমসা থেকে আলোয় উত্তরণের পথ দেখাতে। যে দারিদ্র্য ভারতের সমাজে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে তার হাত থেকে মুক্তির উপায় হল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রসার। একথা মনে রেখেই সাধারণের কাছে বিজ্ঞানের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার প্রয়োজন আছে। সার্বিক সমাজের বিজ্ঞান চেতনার উন্মেষ থেকেই সমস্যা সমাধানের বীজ অঙ্কুরিত হবে। আগামী দিনের সেই সাফল্যের আশা নিয়ে আমাদের পাঠক, গ্রাহক, অনুগ্রাহক, পৃষ্ঠপোষকদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি।

শিক্ষা ও সেবা

প্রফুল্লচন্দ্র রায়

শিক্ষাই মানুষকে প্রকৃত মনুষ্যপদবাচ্য করে। কেবল সন্তানকে খাওয়া পরা দেওয়া পিতার কার্য্য নয়, তাদের মানুষ করে গড়ে তোলাই প্রকৃত পিতার কাজ। রঘুবংশে এক জায়গায় আছে—

প্রজানাং বিনয়াধানাৎ রক্ষণাদ্ভরণাদপি
স পিতা পিতরস্তাসাং কেবলং জন্মহেতবঃ ।।

কিন্তু শিক্ষা বলতে গেলে জগতের নূতন নূতন তথ্য সংগ্রহ করে জ্ঞানের উৎকর্ষসাধনকে বুঝায়; তর্কশাস্ত্রের কূট প্রশ্নের সমাধান করা নয়, সে সব অসার বিষয় নিয়ে মাথা ঘামিয়ে শুধু কেবল অমূল্য মস্তিষ্কের অপব্যবহার করা হয় মাত্র। কিরূপে বাঙ্গালীর মস্তিষ্কের অপকর্ষ ঘটেছে তা আমি আমার 'বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার' নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকায় বিশদভাবে দেখিয়েছি, এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। শিক্ষার কথা উঠিলেই অনেকে হয়তো দর্শন উপনিষদের কথা তুলবেন। অতীতের গৌরব-কাহিনী নিয়ে থাকলে চলবে না। বর্ত্তমানে আমাদের অবস্থা কতদূর হীন হয়েছে তা সহজেই অনুমেয়; তাহার প্রতিকার সাধনকল্পে আমাদের যথেষ্ট পরিশ্রম করা চাই। আমরা সর্বস্ব হারাতে বসেছি, ভিটে মাটি বিকিয়ে যেতে বসেছে, এখন শুধু আমরা অমুক রাজা উজিরের ছেলে ছিলাম বলে লোকের কাছে অসার আভিজাত্য-গৌরব রক্ষায় যত্নবান হলে কিছু ফল হবে না। অতীতের কথা ভাবতে ভাবতে আমাদের জড়ভরত হলে চলবে না; আলস্য পরিত্যাগ করতেই হবে। সারা জগৎ যখন কর্মে ব্যাপৃত তখন নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকা আমাদের সাজে কি? বাঙ্গালী জাতিও মানুষ, আমাদেরও সমস্ত শ্রেষ্ঠ বৃত্তি আছে, কেবল যথাযথ অনুশীলন অভাবে আমরা জগতের কাছে হেয়, নগণ্য ও সকলের নিম্নে অবস্থিত। কোন গ্রন্থকার বাঙ্গালীদের সম্বন্ধে বলেছিলেন,—"এদের সমস্ত গুণই আছে, কেবল সেইগুলির যথাযথ অনুশীলন করাবার জন্য তাদের মধ্যে একজন ঠিকমত চালকের দরকার।"

ডাঃ মেঘনাদ সাহা, জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি আমার ছাত্রেরা, আমা অপেক্ষা ন্যূন নন। এত অল্প বয়সে তাঁরা যে সম্মানের অধিকারী হয়েছেন এতে আমার প্রাণ যে কিরূপ আনন্দিত হয়েছে তা ভাষায় ব্যক্ত করা আমার সাধ্যাতীত। জার্মানীতে পৌঁছিলে বড় বড় শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণ যেরূপভাবে তাঁদের সম্বর্দ্ধনা করেন তা তাঁদের লিখিত চিঠি হইতে বিশেষভাবে অবগত হয়েছি। নিউটনের 'ল-অফ্-গ্র্যাভিটেশনের' মত 'ঘোষের ল'-বলে একটা নিয়ম জগতে শীঘ্রই প্রচারিত হবে। তা এখন জার্মান ভাষায় লিখিত শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। তারপর জ্ঞানেন্দ্রনাথের একটা গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লণ্ডনে ফ্যারাডে সোসাইটিতে পঠিত হলে তথাকার শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণ তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেন। অনেকে মনে করতে পারেন যে এ প্রকার কৃতিত্বলাভ কেবল ইউরোপের জল হাওয়ার গুণে হয়েছে; কিন্তু তা নয়, তাঁরা এখান থেকে শিক্ষালাভ করে বিদেশে গিয়েছেন, বাংলার জল হাওয়ায় তাঁরা মানুষ হয়েছেন। যখন তাঁরা কলকাতায় ছিলেন, এখানকার সায়ান্স কলেজের নাম দিয়ে লণ্ডন ও আমেরিকার বিখ্যাত মাসিক পত্রে অনেকগুলি গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধও পাঠিয়েছিলেন। বাঙ্গালীরও মস্তিষ্ক আছে, তারা শুধু পরের চিন্তিত বিষয় নিয়েই নাড়াচাড়া করে না, স্বাধীনভাবে ভাবতেও জানে।

যাক্, এখন সেবা সম্বন্ধে দু'চার কথা বলি। সেবার কথা উঠলেই আমাদের সময়কার ছাত্রজীবনের কথা মনে পড়ে। এখনকার ছেলেরা সেবা বিষয়ে তখনকার ছেলেদের চেয়ে অধিকতর অগ্রসর। আমাদের সময় দেখেছি যদি কোন ছাত্র ছাত্রাবাসে বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হত তবে সকল ছাত্র তাকে ত্যাগ করত, কিম্বা মেথর মুদ্দফরাসের জিম্মায় তাকে হাসপাতালে বাস করতে হত। আর এখনকার ছাত্রেরা পীড়িতের সেবার্থে পালা করে রাত্রি যাপন করে, বন্যাপীড়িত দুঃস্থ নরনারীর সেবায় প্রাণ দিয়ে পরিশ্রম করতে শিখেছে। এ সব দৃশ্য দেখলে সত্যই প্রাণে কেমন একটা আনন্দ হয়। সেই সব সেবাপরায়ণ ছাত্রদের দেবতা জ্ঞানে পূজা করতে ইচ্ছা হয়।

আজকাল একটা সুর উঠেছে ইউরোপের যা কিছু সবই পরিত্যাজ্য। কথাটা একটু তলিয়ে বুঝলেই আমাদের ভুলটা ধরা পড়ে। তাদের মধ্যে অনেক সৎকাজ দেখতে পাই যা আমাদের সর্বতোভাবে শিক্ষা করা উচিত। এক লণ্ডন সহরে 60/70টি হাসপাতাল আছে; সবগুলিই দেশের স্বেচ্ছাকৃত দানের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর কলিকাতায় ত মোটে ছয়টি কি সাতটি হাসপাতাল, তাও আবার গভর্ণমেন্টের সাহায্য (state grant) দ্বারা চলে। আমাদের দেশে কত অনাথ বালক প্রতি বৎসরে হয় অকালে বিনষ্ট হচ্ছে, নয়তো পশুর মত জীবন যাপন করছে। লণ্ডনেই তো কয়টা কুড়িয়ে পাওয়া শিশুদের আশ্রম রয়েছে (Home for Foundlings)।

এদের কেবল পালন করা নয়, যাতে কুপথে না যায় তার জন্ত শিক্ষারও ব্যবস্থা আছে। ব্যবসা বাণিজ্যাদির দ্বারা এই সব বালকেরা যাতে নিজেদের ও জাতিকে সমৃদ্ধিশালী করতে পারে তারও বিপুল আয়োজন। মূকবধিরদের শিক্ষা দিবার তো কথাই নাই, এমন কি কুকুরদের জন্তও সেবাশ্রম আছে। তারপর দেখুন শিলং, পুরুলিয়া প্রভৃতি স্থানের কুষ্ঠাশ্রমের কথা সে সকলগুলিই তো খৃষ্টান মিশনারিদের। ফাদার ডেমিএন্ (Father Damien) সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করলেন। কুষ্ঠরোগীরা আমাদের জাত ভাই, তাদের সেবার ভার নিলেন বিদেশী শ্বেতাঙ্গরা। আর আমরা কি করেছি? পরিচয় দিতে হলে তো এক দেওঘরে যোগেন্দ্র বসু প্রভৃতির প্রযত্নে একটি মাত্র কুষ্ঠাশ্রমের কথা মনে পড়ে। আর আমাদের দেশে স্বেচ্ছাকৃত দানের উপর প্রতিষ্ঠিত একটিও হাসপাতাল বা সেবাশ্রম নাই, বললেও অত্যুক্তি হয় না। আর ওদের প্রায় সবগুলিই—Public charity বা সাধারণের দান দ্বারা পরিচালিত। যখন তাদের অর্থের অনটন হয়, তখন তারা খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়, আর অমনি এক তাড়া অজ্ঞাত হস্তের নোট কিম্বা চেক এসে হাজির হয় কিম্বা কোন ছদ্ম ভিক্ষুক বেশধারী লোক এসে টাকা দিয়ে ছুটে পালায়, পাছে লোকে তার নাম জানতে পারে এই ভয়ে। এইরূপে নিঃস্বার্থ ভাবে অর্থদান করতে আমরা কয়জন শিখেছি আর কয়জনই বা মানব সেবায় জীবন উৎসর্গ করতে শিখেছি। বিবেকানন্দ ঠিক বলেছিলেন—আমাদের এমন একদল স্বেচ্ছাসেবক দরকার যারা আত্মসুখ জলাঞ্জলি দিয়ে প্রাণভরে সকলের ও দেশের সেবা করবে। শ্বেতাঙ্গরা জড়বাদী হোক, কিন্তু তাদের কাছে শেখবার অনেক জিনিষ আছে। মানুষ যদি মানুষকে প্রেম বন্ধনে না বাঁধল, যদি তার সেবা করে ধন্য না হল—তবে শুধু প্রাণহীন আধ্যাত্মিকতার আলোচনায় ফল কি?

[আন্দুল সেবা সমিতির প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বক্তৃতার সারাংশ। 20শে এপ্রিল, 1921]

ভারত পথিকৃৎ—প্রফুল্লচন্দ্র

রতনমোহন খাঁ*

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় পরাধীন ভারতে এক বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ। বিদেশী শাসনে শোষিত, বঞ্চিত, আত্ম-বিস্মৃত ভারতবাসী তাঁর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ফিরে পেয়েছিল আত্মবিশ্বাস, পেয়েছিল চলার পথ, তরুণ সমাজ উপলব্ধি করেছিল আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা। এহেন এক কর্মনিষ্ঠ মহান অবধূত 125 বছর আগে বর্তমানে বাংলা দেশের খুলনা জেলার রাড়ুলি গ্রামে 1861 খৃস্টাব্দে 2রা অগাষ্ট রায় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা হরিশচন্দ্র যুগোপযোগী অনেক গুণের অধিকারী ছিলেন। মাতা ভুবনমোহিনী ছিলেন বিদুষী, কোমল হৃদয়া, সেবাপরায়ণা। ঐ সময় ছিল ডিরোজিও যুগ। বাংলার শিক্ষিত নবীন সম্প্রদায় হিন্দুধর্মের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাতে থাকে। হরিশচন্দ্রও জাতিভেদ, বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা প্রভৃতি সামাজিক অনিয়মের বিরোধী ছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের জন্য নিজ গ্রামে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং সবাইকে উৎসাহিত করতে স্ত্রী ও মেয়েকে ঐ বিদ্যালয়ে ভর্তি করেন। পরবর্তী-কালে প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনে পিতা-মাতার এসব কাজের প্রভাব প্রতিফলিত হতে দেখা যায়।

চার বছর বয়সে গ্রামের পাঠশালায় প্রফুল্লচন্দ্রের হাতে খড়ি হয়। ফুনু (শৈশবের ডাক নাম) মোটেই সুবোধ বালক ছিল না। গুরুমশায়ের নানা অভিযোগ হরিশচন্দ্র খুব বড় করে দেখতেন না। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ফুনু বড় হয়ে শান্ত হবে, স্থির হবে, প্রজ্ঞায় ভাস্বর হবে। হরিশচন্দ্রের পাঁচ ছেলে জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র, নলিনীকান্ত, প্রফুল্লচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র, গোপালচন্দ্র আর এক মেয়ে ইন্দুমতী। গোপালচন্দ্র অল্প বয়সেই মারা যায়। হরিশচন্দ্র তাঁর সন্তানদের ভালোভাবে শিক্ষিত করার জন্য অনেক ক্ষতি স্বীকার করেও কলকাতায় চলে আসেন। 1870 খৃস্টাব্দে। 132নং আমহার্ষ্ট স্ট্রীটের বাড়ীতে তিনি ভাড়া ছিলেন। প্রফুল্লচন্দ্র ঐ সময় হেয়ার স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হয়। গুরুতর আমাশয় রোগে আক্রান্ত হলে পড়া বন্ধ করে প্রায় দু-বছর গ্রামের বাড়ীতে বসে থাকতে হয়। এই পীড়া ছিল তাঁর জীবনের আমরণ সঙ্গী। কিন্তু মনের জোরে দুর্বল দেহকে অগ্রাহ্য করে তিনি নানা সাফল্যের পথে এগিয়ে গিয়েছিলেন। গ্রামের বাড়ীতে নিছক স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য সময় না কাটিয়ে নিজের চেষ্টায় ল্যাটিন ও ফরাসী ভাষা আয়ত্ত করেন। পিতার সংগৃহীত বহু মূল্যবান পত্র-পত্রিকা ও

* সিটি কলেজ, কলিকাতা-700009

পুস্তকাদি পড়ে শিশু মনেই অঙ্কুরিত হয় সাহিত্যপ্রীতি, দেশ বিদেশের ইতিহাস সম্বন্ধে কৌতূহল। কলকাতায় ফিরে এসে কেশবচন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠিত অ্যালবার্ট স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হন। এই স্কুলের শিক্ষকদের সংস্পর্শে এসে, বিশেষ করে কেশবচন্দ্র সেনের বাগ্মিতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মে। মেধাবী ছাত্র হিসাবে যথেষ্ট সুনাম থাকলেও 1879 খৃস্টাব্দে তিনি কেবলমাত্র প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। 1880 খৃস্টাব্দে স্বনামধন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রোপলিটান কলেজ (বর্তমানে বিদ্যাসাগর কলেজ) থেকে এফ, এ, পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করেন। ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাণ্ডিত্য তাঁকে মুগ্ধ করলেও যে বিজ্ঞান পাশ্চাত্য দেশগুলির উন্নতির সোপান সেই বিজ্ঞানকে জানার আকুলতা তাঁকে নিয়ে যায় প্রেসিডেন্সী কলেজে জন এলিয়ট ও স্যার আলেকজাণ্ডার পেডলারের ক্লাসে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের পাঠ নিতে। খ্যাতিমান অধ্যাপক পেডলারের অধ্যাপনার গুণে রসায়নের প্রতি অনুরাগবশতঃ পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও অনেক রসায়নের বই পড়ে বাড়ীতে [illegible]টারী বানিয়ে প্রফুল্লচন্দ্র ছোটখাট পরীক্ষা করতে আরম্ভ করেন। বিজ্ঞান পড়ার জন্যই তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে বি. এ. ক্লাসের বি. কোর্সে ভর্তি হন, কারণ বি কোর্সেই তখন কেবলমাত্র বিজ্ঞান পড়ান হতো। হরিশচন্দ্রের ইচ্ছা ছিল ছেলেদের বিলেত পাঠিয়ে উচ্চশিক্ষিত করবেন, কিন্তু অর্থাভাবে ইচ্ছাপূরণ করতে পারছিলেন না। প্রফুল্লচন্দ্র পিতার মানসিক অবস্থা উপলব্ধি করে বি এ. পড়তে পড়তেই সবার অজ্ঞাতে গিলক্রাইষ্ট বৃত্তি পরীক্ষা দেন। ঐ বৎসর কেবলমাত্র বোম্বাইয়ের বাহাদুরজী নামে এক পার্শী যুবক এবং কোলকাতার প্রফুল্লচন্দ্র বৃত্তি লাভ করেন। ফলে বিলেত যাবার সুযোগ এল। বি.এ. পরীক্ষা না দিয়ে 1832 খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে প্রফুল্লচন্দ্র জাহাজে লণ্ডন যাত্রা করেন। অক্টোবরে লণ্ডনে পৌঁছলে জগদীশচন্দ্র বসু ও সত্যরঞ্জন দাশ তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। প্রবাসেই দুই ভাবী মহা-বিজ্ঞানীর মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। সাহিত্য ও ইতিহাসে স্বাভাবিক অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও তিনি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন। এখানে বি. এস-সি ক্লাসে রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা ও উদ্ভিদ-বিদ্যা পড়ান হতো। সুপণ্ডিত অধ্যাপক ক্রাম ব্রাউনের জ্ঞানে ও সহৃদতায় রসায়নই হয়ে ওঠে তাঁর কাছে সব থেকে প্রিয়। প্রফুল্লচন্দ্র ঐ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 1885 খৃস্টাব্দে বি এস-সি, এবং 1887 খৃস্টাব্দে ডি. এস-সি ডিগ্রী লাভ করেন। মৌলের পর্যায় শ্রেণী বিভাগের উপর তাঁর থিসিস সব থেকে ভাল বিবেচিত হওয়ায় 50 পাউণ্ডের হোপ প্রাইজ লাভ করেন এবং এক বছরের জন্য এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিক্যাল সোসাইটির সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। এডিনবরায় থাকাকালে দু একটি ছোট ঘটনায় তাঁর স্বদেশপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। 1885 খৃস্টাব্দে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য 'সিপাহী বিদ্রোহের আগে ও পরে ভারতের অবস্থা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। প্রফুল্লচন্দ্রের প্রবন্ধ সর্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হলে বৃটিশ সরকারের

প্রফুল্লচন্দ্র রায়

দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রবন্ধটিতে ভারতে বৃটিশ সরকারের প্রতি ছিল সুতীব্র কশাঘাত আর ভারতের স্বাধীনতার যৌক্তিকতা। এছাড়া ভারতে বৃটিশ শাসনের সর্বনাশা নীতির সমালোচনা করে 'ভারত বিষয়ক প্রবন্ধ' নামে একটি পুস্তিকাও তিনি প্রকাশ করেন। খাস বিলেতের মাটিতে বৃটিশ সরকারের বৃত্তিপ্রাপ্ত পরাধীন ভারতের এক ছাত্রের পক্ষে এ কাজ যে কি নির্ভীকতার পরিচয় তা আজ উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

1888 খৃস্টাব্দে অগাস্ট মাসে কলকাতার জাহাজঘাটে প্রফুল্লচন্দ্র নামেন কপর্দকহীন অবস্থায়। সঙ্গের সামান্য জিনিষ-পত্রগুলি মাত্র আট টাকায় জাহাজে বিক্রী করে ওঠেন জগদীশচন্দ্র বসুর বাড়ীতে। সাহেবী পোষাক ফেলে দিয়ে ধুতি-পাঞ্জাবী পরে গ্রামের বাড়ীতে যান মা বাবার সঙ্গে দেখা করতে। হরিশচন্দ্রের তখন শোচনীয় দৈন্যাবস্থা। প্রফুল্লচন্দ্র

ফিরে এলেন কলকাতায় চাকুরীর খোঁজে। অনেক কষ্টে 1889 খৃস্টাব্দে প্রেসিডেন্সী কলেজে রসায়ন বিভাগে মাত্র মাসিক 250 টাকা মাহিনায় অস্থায়ী সহকারী অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হলেন। যোগ্যতা অনুযায়ী পদ না দেওয়ায় এবং ইংরেজ অধ্যাপকের চেয়ে মাহিনা কম হওয়ায় তিনি এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান। দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার পরিবেশ তখনও গড়ে ওঠে নি। ভারতীয় হিন্দুরা বিজ্ঞান চর্চার যে ধারা বহন করে আসছিলেন, মুঘলযুগে তা একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়। বিজ্ঞানই হলো দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকে সুদৃঢ় করার হাতিয়ার। পাশ্চাত্য দেশগুলিই তার প্রমাণ। প্রফুল্লচন্দ্র ও জগদীশচন্দ্র একথা মনেপ্রাণে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই বিজ্ঞান শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তুলতে এই দুই বিজ্ঞানী হয়েছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

প্রফুল্লচন্দ্রের রসায়নের প্রতি অনুরাগ ত্রিধারায় বিভক্ত, যথা—রসায়নের আদর্শ শিক্ষক ও গবেষক, শিল্পে রসায়নের প্রয়োগ আর ছিল রসায়নের ইতিহাস প্রণয়ন। প্রেসিডেন্সী কলেজে তাঁরাই প্রচেষ্টায় 1894 খৃস্টাব্দে নূতন রসায়নাগারে পরীক্ষা ও গবেষণার কাজ শুরু হয়। ভারতে রসায়ন বিজ্ঞানের তিনিই হলেন আদিগুরু ও গবেষক। শতাধিক গবেষণাপত্র তাঁর নানা বিষয়ে মৌল গবেষণার সাক্ষ্য বহন করছে। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় 1916 খৃস্টাব্দে 92, আপার সারকুলার রোডে (বর্তমানে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড) বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠীত হয়। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে অবসর গ্রহণ করে নবপ্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান কলেজে রসায়ন বিভাগে প্রথম পালিত অধ্যাপক পদ তিনি গ্রহণ করেন। তার সাংগঠনিক ক্ষমতায় নূতন নূতন গবেষণার ক্ষেত্র গড়ে ওঠে। তাঁরই নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল ভারতীয় রাসায়নিক গোষ্ঠী, উদ্দেশ্য ছিল এই গোষ্ঠী ভারতে রাসায়নিক গবেষণার ধারা অক্ষুন্ন রাখবে। তাঁর পরিচালনায় ও অর্থানুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ভারতীয় রসায়ন সমিতি (Indian Chemical Society) যার মুখপত্র The Journal of the Indian Chemical Society. 1935 খৃস্টাব্দে তাঁর উৎসাহে ও পরামর্শে ভারতীয় বিজ্ঞান সংবাদ সমিতি (Indian Science News Association গঠিত হয় এবং তিনি প্রথম সভাপতি হয়। সমাজ, সংস্কৃতি, জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের তথ্যাদি স.জ সরলভাবে সাধারণের মধ্যে প্রচারের উদ্দেশ্যে এই সংস্থা আজো প্রকাশ করে চলেছে সায়েন্স এণ্ড কালচার নামে মাসিক পত্রিকা। পাশ্চাত্যের রাসায়নের নানা কাজের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্ত 1904 খৃস্টাব্দে তিনি ইউরোপ ভ্রমণ করেন এবং বহু খ্যাতনামা রসায়নবিদের সংস্পর্শে আসেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিশ্ববিত্যালয়গুলির প্রথম কংগ্রেস অধিবেশনে কলিকাতা বিশ্ববিত্যালয়ের প্রতিনিধি হিসাবে বিলেত যান 1912 খৃস্টাব্দে।

ভারতে রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্টার ক্ষেত্রে প্রফুল্লচন্দ্র হলেন পথিকৃৎ। প্রেসিডেন্সী কলেজে কাজ করার সময় তাঁর বাসা ছিল 91নং আপার সারকুলার রোডে। ঐখানে তাঁর দু-একজন অনুগত সহকর্মী কিছু কিছু ওষুধ প্রস্তুত প্রণালী নিয়ে পরীক্ষা চালাতে থাকেন। পিতৃঋণ শোধ করে, দৈনন্দিন ব্যয় কমিয়ে 800 টাকা সঞ্চিত হয়েছিল। ঐ টাকা দিয়ে নিজের বাসাতেই 1893 খৃস্টাব্দে বেঙ্গল কেমিক্যাল নামে একটি কারখানা খোলেন। সারা ভারতে রসায়ন শিল্পে এই হলো প্রথম প্রচেষ্টা। 1901 খৃস্টাব্দে 17ই এপ্রিল যৌথ প্রতিষ্ঠান হিসাবে এর নাম হয় বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ। 1905 খৃস্টাব্দে সমগ্র কারখানা উঠে আসে মানিকতলায়। 1920 খৃস্টাব্দে পানিহাটিতে কারখানা সম্প্রসারিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানে ত্রিশ বছর ম্যানেজার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন রাজশেখর বসু। 1937 খৃস্টাব্দে শিল্পগবেষণার জন্য 'স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রিসার্চ লেবরেটারি' নামে বেঙ্গল কেমিক্যালের নিজস্ব গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। চাকুরী-বিলাসী, কর্মবিমুখ বাঙ্গালী যুবকদের কর্মনিষ্ঠ, স্বাবলম্বী ও ব্যবসায়মুখী করে তোলার উদ্দেশ্যেই আচার্যদেবের অধ্যাপক জীবনের বিপরীতমুখী এই প্রচেষ্টা। বেঙ্গল পটারি ওয়ার্কস, কলিকাতা সোপ ওয়ার্কস, বেঙ্গল এনামেল ওয়ার্কস, বেঙ্গল স্টীম নেভিগেশন, এরকম অনেক সংস্থার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন, বাংলার বেকার সমস্যা দূর করার জন্য। শেষ বয়সে তিনি গান্ধিজীর চরকায় বিশ্বাসী হয়েছিলেন। তাঁর অভিমত হলো—দেশের লক্ষ লক্ষ দুঃস্থ নরনারীর পক্ষে চরকা হচ্ছে দুর্ভিক্ষ ও বেকার অবস্থার প্রতিকারের বীমা।

প্রত্নতত্ত্ব ও ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে বাল্যেই তাঁর জন্মে ছিল অনুরাগ। ভারত যে একদিন বিজ্ঞান চর্চায় অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, চরক, সুশ্রুত, কণাদ, বরাহমিহির, নাগার্জুন প্রমুখ মনীষীদের অবদান যে মোটেই তুচ্ছ নয় এসব ইতিকথা বিশ্বের দরবারে তুলে ধরবার জন্য প্রফুল্লচন্দ্র দৃঢ়সংকল্প হন। দীর্ঘ পনেরো বছর কঠোর পরিশ্রম করে বহু বিরল ও দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি থেকে বিজ্ঞানের বিক্ষিপ্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করে 'হিন্দু রসায়নের ইতিহাস' (History of Hindu Chemistry) নামে দুটি খণ্ড প্রকাশ করেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় 1902 খৃস্টাব্দে এবং দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় 1909 [illegible] কালের অন্ধকার গুহা থেকে প্রাচীন ভারতের লুপ্তপ্রায় গৌরবের পুনরুদ্ধার তাঁর এক সুমহান কীর্তি। সারা বিশ্ব জানল ভারতেই প্রথম ইস্পাত তৈরি হয়েছিল এবং ইস্পাত দিয়েই

তৈরি হতো আমাসৃকাসের তলোয়ারের ফলক। খনিজ থেকে বহু ধাতুর নিষ্কাশন, বহু যৌগের প্রস্তুত প্রণালী ভারতীয় বিজ্ঞানীদের জানা ছিল।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র জাতীয় শিক্ষায় বিশ্বাসী ছিলেন। বিদেশী ভাষায় শিক্ষাদানে তিনি ছিলেন বিরোধী। বহু প্রবন্ধ ও বক্তৃতায় তিনি এই মতই প্রকাশ করেছেন। 1910 খৃস্টাব্দে রাজসাহীতে বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে মূল সভাপতি ও 1926 খৃস্টাব্দে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সম্মিলনীর সভাপতি হিসাবে শিক্ষার বাহন মাতৃভাষাই ছিল তাঁর বক্তব্যের প্রধান বিষয়। তবে ইংরাজীকে একেবারে বর্জন না করে বেশি বয়সে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে শেখা উচিত বলে তিনি মনে করতেন। তাঁর কাছে শিক্ষার আদর্শ ছিল জ্ঞানার্জন, ডিগ্রীর মোহকে তিনি ঘৃণা করতেন। শিক্ষা ও কর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য শিক্ষা ও শিল্প-বাণিজ্য হবে পরস্পর পরিপূরক।

আচার্যদেব শুধু বিজ্ঞানী ছিলেন না, তিনি ছিলেন ছাত্র-বৎসল, মানবপ্রেমিক, সত্যিকারের ত্যাগী পুরুষ। অকৃতদার এই মানুষটি বিজ্ঞান কলেজে যোগ দেবার পর ঐ বাড়ীরই একটি ঘরে আজীবন কাটিয়ে গেছেন অত্যন্ত সাধারণভাবে। তাঁর আয়ের প্রায় সব টাকাই তিনি অভাবগ্রস্ত ছাত্র, জন-কল্যাণ প্রতিষ্ঠান, স্কুল-কলেজ, ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করে গেছেন। 1921 খৃস্টাব্দের পর তিনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁর অবশিষ্ট কার্যকালের জন্য বেতন গ্রহণ করেন নি। ঐ অর্থে রসায়ন বিভাগে দুটি গবেষণাবৃত্তির ব্যবস্থা আছে। তাঁর জীবিতকালেই ঐ অর্থের পরিমাণ হয়েছিল 1 80,000 টাকা। 1922 খৃস্টাব্দে নাগার্জুনের নামে গবেষণা পুরস্কার দানের জন্য .0,0C0 টাকা এবং 1936 খৃস্টাব্দে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় নামে প্রাণীবিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যায় গবেষণা পুরস্কারের জন্য 10,C00 টাকা বিশ্ব-বদ্যালয়কে দান করেন। কেমিক্যাল সোসাইটির গৃহ নির্মাণের জন্য এককালীন দশহাজার টাকা দেন। দেশবন্ধুর সহধর্মিণী বাসন্তী দেবীকে এক পত্রের শেষে লিখেছিলেন—'যখন আমি বিজ্ঞান চর্চা করি, তখন বিজ্ঞানের মধ্য দিয়া দেশকেই সেবা করি।' এই দেশসেবাই তাঁর জীবনের মূল মন্ত্র, সমস্ত কর্মের প্রেরণা উৎস। 1921 খৃস্টাব্দে সুন্দরবন অঞ্চলে ঘোরতর দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এসব অবস্থা পরিদর্শন করে, সরকারী সাহায্যের কোন বন্দোবস্ত করতে না পেরে দেশবাসীর কাছে সাহায্য প্রার্থনা ক[illegible] দেশবাসী সর্বান্তঃকরণে তাঁকে সাহায্য করে। 1922 খৃস্টাব্দে উত্তরবঙ্গে সর্বনাশা বন্যায় দুর্গত, আর্ত হাজার হাজার মানুষের পাশে এসে দাঁড়ান স্থির বিশ্বাস ও অটল আশ্রয়ের মত। তাঁরই নেতৃত্বে সেদিন সমস্ত দল ও সংগঠন একত্রিত হয়ে বেঙ্গল রিলিফ কমিটি গঠন করে। তাঁর নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, সহৃদয়তা মানবসেবার মধ্য দিয়ে জাতির বৃহত্তর স্বার্থে দেশবাসীকে ত্যাগ ও ঐক্যের মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিল। 1931 খৃস্টাব্দে ব্রহ্মপুত্র নদীর ভীষণ বন্যায় বিশ লক্ষ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং প্রায় 4 লক্ষ গৃহ বিধ্বস্ত হয়। আচার্যদেবের বয়স তখন সত্তর বছর। অশক্ত শরীর, তবু তিনি এসে দাঁড়ালেন লক্ষ লক্ষ বন্যার্তের পাশে, নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন ত্রাণ-কার্যের। বিপদে বাংলার যুবকদের নিয়মানুবর্তিতা ও দৃঢ়তার দৃষ্টান্ত হল স্থাপিত। জনহিতকর কাজে তিনি যেমন ছিলেন অগ্রণী, তেমনি সমাজে যে সব অনাচার, অবিচার, কুসংস্কার আছে তার বিরুদ্ধে আজীবন ছিলেন সংগ্রামী। জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, পণপ্রথা, বাল্যবিবাহ, খাদ্যবিচার, পর্দাপ্রথা প্রভৃতির বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ ছিল তীব্র এবং কঠোর।

অধ্যাপনা, গবেষণা, সমাজসেবার মধ্যেও বাল্যে অঙ্কুরিত সাহিত্যপ্রীতি বয়ঃকালে সাহিত্য সাধনায় পর্যবসিত হয়েছিল। ছোটদের বিজ্ঞানে উৎসাহিত করার জন্য 1890 খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর রচিত 'সরল প্রাণী বিজ্ঞান'। দুই খণ্ডে প্রকাশিত Life and Experiences of a Bengali Chemist' তাঁরই আত্মচরিত। এই জীবনী গ্রন্থে তাঁর সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দু রসায়নের ইতিহাস তো তাঁর এক অমর কীর্তি। সমাজ, সাহিত্য, ইতিহাস, জীবন-চরিত, শিল্প, শিক্ষা, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে বহু রচনা ও বক্তৃতা পুস্তিকাকারে বা প্রবাসী, বসুমতী, ভারতবর্ষ, বঙ্গবাণী, মানসী এরূপ নানা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর বাংলা রচনা ও বক্তৃতা একত্রিত করে দুটি খণ্ডও প্রকাশিত হয়েছিল। ইংরাজীতে রচিত পুস্তক-পুস্তিকাগুলি তাঁর প্রতিভার আর একটি দিক।

এই স্বল্প পরিসরে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনালেখ্য তুলে ধরা বাতুলতা মাত্র। আচার্যদেব একের মধ্যে বহু, তাঁর খণ্ড স্বার্থ ও স্বাতন্ত্র্য সর্বসাধারণের এক অখণ্ড ও বিরাট স্বার্থের মধ্যে বিলীন। এই সর্বত্যাগী, সংসার সন্ন্যাসী, আদর্শ গুরুর জীবনের শেষ কবছর বড়ই করুণ। স্মৃতিশক্তি, দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে তাঁর জীবনদীপ নিভে যায় 1944 খৃস্টাব্দের 16ই জুন।

জিন নিয়ে কারিগরী

অমিয়কুমার হাটি*

গ্রীক ভাষায় জেনোস (genos) মানে বংশ। এর থেকে এসেছে জিন (gene) শব্দটি। জিন হচ্ছে জীবের বংশানুক্রমের মূল কণিকা—বংশপরম্পরার অন্যতম নিয়ন্ত্রক। জীবদেহ গঠিত কোষ দিয়ে—ঐ কোষের ভিতরের যে নিউক্লিয়াস—তাতে আছে সরু সুতার মত ক্রোমোজোম। এসব খালি চোখে কিছুই দেখা যায় না। ক্রোমোজোমের সংখ্যা ও গঠন-বিন্যাস এক এক জীবের এক এক রকম। খুব সরু সরু দানার মত জিন কণিকা নির্দিষ্ট পরম্পরায় মালার মতো গেঁথে তৈরি হয়েছে এক একটি ক্রোমোজোম। এগুলো ডি এন এ (DNA—deoxyribonucleic acid—ডি অক্সি রাইবো নিয়ক্লিয়িক অ্যাসিড) অণু, বহন করছে বড় হবার, বিকশিত হবার আদেশ বা নির্দেশ। দেখতে আগেই বলেছি, মালার বা শেকলের মত, প্রতিটি গাঁটে থরে থরে সাজানো থাকে কয়েকশো বা কয়েক হাজার জিন—সংখ্যাটা নির্ভর করে কোন্ প্রাণীর জিন—তার উপরে। খালি চোখে দেখা যায় না, এমন প্রতিটি কোষের ভিতর প্রকৃতির এত কারিগরী!

মানুষ চাষবাস এবং পশুপালন শুরু করেছে তা প্রায় 10 হাজার বছর আগে। তখন থেকে জিন বদলাবার, তার উপর কারিগরী করার চেষ্টা করে আসছে। প্রকৃতি থেকে সে এমন গোরু বেছে নেয়, যে দেয় অনেক দুধ। এমন ভেড়া পালন করে, যার কাছ থেকে পায় অনেক পশম, এমন ধান চাষ করে, যার ফলন বেশি।

এখন গবেষণাগারে জৈব প্রযুক্তিবিদরা প্রতিদিনই ঐ ধরণের বাছাই করছেন জিন পর্যায়ে। গাছ বা জন্তু-জানোয়ার বেছে নেওয়ার বদলে তাঁরা বেছে নিচ্ছেন বিশেষ বিশেষ জিন।

একটি জিন হয়তো কোন একটা রাসায়নিক পদার্থ—যেমন বড় হওয়ার হরমোন তৈরির জন্যে দায়ী। সেই ধরনের জিনকে টুকরো টুকরো করে কাটা যায় এবং একটা টুকরো ঢুকিয়ে দিতে পারা যায় একেবারে অন্য কারুর একটা কোষের ভিতর। সেখানে, সেই পরের ঘরে নিজের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সে তখন তৈরি করতে থাকবে বড় হওয়ার ঐ হরমোন।

প্রতি জিন একটি বিশেষ প্রোটিন তৈরি করতে ভূমিকা নেয়। দু-ধরণের উৎসেচক (বা এনজাইম) আছে যারা বিভিন্ন জিন-এর মধ্যে যে সম্পর্ক, সেটা বদলে দিতে পারে। এক ধরনের এনজাইমকে বলা হয় সীমিতকারী বা বাধাদানকারী এনজাইম—এটা কাঁচি দিয়ে কাটার মত ডি এন এ শিকলটার আগে থেকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া জায়গাগুলো কাটতে পারে (restriction enzymes); অন্য ধরণের এনজাইমগুলো আঠার মত; আগে পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক ছিল না, এমন কতকগুলো টুকরো টুকরো ডি এন এ-কে জোড়া লাগাতে পারে (DNA-ligase)। দু-ধরণের এনজাইম দিয়ে ডি এন এ-র উপর এই জৈব রাসায়নিক সীবনকার্যের ফলে জিনগুলো পুনঃসংযুক্ত হয় (recombined genes)।

এই ধরনের পুনঃসংযুক্তি ঘটানো হয় বেশির ভাগ সময়েই একটি বীজাণু (bacteria)-র প্লাসমিড (plasmid-র সঙ্গে। প্লাসমিড হল ছোট শিকলওয়ালা অপ্রয়োজনীয় (non-essential) ডি এন এ—থাকে বেশির ভাগ—বীজাণুর কোষের ভিতর ভাসমান অবস্থায়। এরাই বহিরাগত জিন-এর আদর্শ বাহক। প্লাসমিড এর সঙ্গে যুক্ত হবার পর একটি বীজাণুকে একটি কারখানা বানিয়ে ফেলে—একটি রাসায়নিক কারখানা, বীজাণুটির ভিতর তখন তৈরি হতে থাকে শুধু সেই প্রোটিন—যার নির্দেশ বহন করে এনেছে ঐ বিশেষ জিনটি।

একটা উদাহরণ দিই। বীজাণুতো আর ইনসুলিন তৈরি করতে পারে না! কিন্তু ইনসুলিনের বার্তাবহ বিশেষ একটা জিন ঐ বীজাণুর প্লাসমিড-এর সঙ্গে জোড়া লাগিয়ে দিলে বীজাণুর কোষের ভিতর তখন শুধু ইনসুলিন তৈরি হতে অর্থাৎ সংশ্লেষিত হতে থাকবে—বীজাণুটি যেন তখন ইনসুলিন পাবার কারখানা। অতি সম্প্রতি এর জন্যে অনেক জটিল সব পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। স্পেকট্রোস্কোপি (spectroscopy)-র সাহায্যে মানুষের মূল্যবান জিন-এর সঠিক, নির্ভুল কাঠামো বিশ্লেষণ করা যায়। বিজ্ঞানীরা তখন বীজাণুর মধ্যে প্রায় অনুরূপ একটা জিন খুঁজে বের করেন এবং জৈব প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগ করে ওটাকে দরকার মতো একটু বদলে মানুষের মূল্যবান জিনটির মতো নিখুঁত নকল জিন সৃষ্টি করতে পারেন। আরও একটা বিকল্প আছে। কোন কোন গবেষক কোন নির্দিষ্ট জিন তৈরির কাজে যন্ত্রগণক বা কমপিউটার ব্যবহার করেছেন, পরে সেই জিনকে যোগ করে দেওয়া হয়েছে প্লাসমিড-এর সঙ্গে।

এইভাবে যে ছোট, কারখানা সৃষ্টি হল, সেটা জিনটির পুনরুৎপাদন শুরু করে। বীজাণু বিভাজিত হয়, সংখ্যায় বাড়তে থাকে—সেই সঙ্গে প্লাসমিড এবং বহিরাগত জিনও।

* স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন, কলিকাতা-700073

এই ধরনের জৈব কারখানায় নির্দিষ্ট যে কোন ওষুধ উৎপাদনের সম্ভাবনাও অসীম।

ইনসুলিনের কথা ধরা যাক। ইনসুলিন একটা হরমোন। ডায়াবেটিস (মধুমেহ) রোগীকে এ ওষুধ ইঞ্জেকশন করতে হয় রোজই। ডায়াবেটিস রোগীর জন্যে এখন পর্যন্ত ইনসুলিনের উৎস হল গোরু বা শূকরের অগ্ন্যাশয় (প্যানক্রিয়াস) গ্রন্থি—গোরু বা শূকর কাটলে তাদের অগ্ন্যাশয় এনে ইনসুলিন নিষ্কাশিত করা হয়। ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা কিন্তু বাড়ছে। যে সব জন্তু থেকে অগ্ন্যাশয় নেওয়া হয়, তাদের সংখ্যা তুলনামূলক ভাবে কমছে। ইনসুলিনে ঘাটতি হচ্ছে তাই। আরও—জন্তুর ইনসুলিন মানুষের ইনসুলিনের সমান কখনও নয়—কাছাকাছি, বদলী হিসাবে নিখুঁত নয়, জন্তুর ইনসুলিন শরীরে গেলে এটা বহিরাগত প্রোটিন বলে অনেক রোগীর শরীরে বিরূপ প্রতিক্রিয়াও হয়। বিশেষভাবে বিশোধিত শূকরের ইনসুলিন নিলে এরকম প্রতিক্রিয়া অবশ্য কদাচিৎ দেখা যায়, কিন্তু গোরুর ইনসুলিনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে হামেশাই।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ডি এন এ সংযুক্তি প্রক্রিয়ায় (recombinant DNA technique) Eli Lilly & Co নামে একটি সংস্থা ইনসুলিন সংশ্লেষণ করেছে যার নাম দেওয়া হয়েছে হিউমিলিন (Humilin)। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন এই ইনসুলিনে জন্তু থেকে পাওয়া ইনসুলিনের দোষগুলো আর থাকবে না। মানুষের ইনসুলিনের একটা জিন বীজাণুর কোষে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে—বীজাণু তখন সৃষ্টি করে চলেছে হিউমিলিন মানুষের শরীরে যে ইনসুলিন তৈরি হয় এটা তারই অনুরূপ। এই ইনসুলিন দিলে রোগীর শরীরে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবার সম্ভাবনা কমবে, বাড়তি সুবিধা হবে এই যে, মানুষের ইনসুলিন জন্তুর ইনসুলিনের তুলনায় বেশি তাড়াতাড়ি আরও ভালোভাবে কাজ করবে। তা ছাড়া শেষ অবধি এর দামও তুলনামূলক ভাবে কম হবে। এখন অবশ্য হিউমিলিন-এর দাম শূকরের অগ্ন্যাশয় থেকে তৈরি ইনসুলিনের থেকে অনেক বেশি। কিন্তু বীজাণুর শরীরেই তো হিউমিলিন অর্থাৎ মানুষের অনুরূপ ইনসুলিন তৈরির কারখানা—তার শরীর তৈরি করেই যাবে অঢেল হিউমিলিন।

মানুষের অনুরূপ ইনসুলিন জিন প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্য বীজাণু থেকে তৈরী প্রথম ওষুধ—যা বাজারে বিক্রি হচ্ছে। অবশ্য এদেশে নয়। এরকম আরো অনেক ওষুধ একই পদ্ধতিতে তৈরি হয়ে বাজারে ঢোকার অপেক্ষায় আছে শুধু।

ইনটারফেরন এরকম আরেকটা রাসায়নিক বস্তু। একদল অণু নিয়ে ইনটারফেরন গঠিত—আছে মানুষের শরীরে ভিতরেই খুব অল্প পরিমাণে। ইনটারফেরন, অনেকের মতে ভাইরাস সংক্রমণের বিরুদ্ধে শরীরে প্রথম প্রতিরোধ গড়ে তোলে। পাওয়া যায় শ্বেত রক্তকণিকায়। তার থেকে নিষ্কাশন করাও শক্ত—খরচও পড়ে খুব বেশি। প্রাকৃতিক অবস্থায় খুব অল্পই সংগৃহীত হতে পারে। কিন্তু অনেক রোগীর অনেক ধরণের চিকিৎসার জন্যে অনেক ইনটারফেরন দরকার। বিশেষতঃ স্তন ও কিডনীর ক্যানসারে, যকৃতের প্রদাহে, মস্তিষ্কের টিউমারে, দীর্ঘস্থায়ী লিউকিমিয়া, এমনকি সাধারণ সর্দি প্রভৃতি রোগে প্রাকৃতিক ইনটারফেরন ব্যবহার করে খুব ভাল ফল পাওয়া গেছে। অনেক রোগীর জন্যে অত ইনটারফেরন কোথায় কীভাবে পাওয়া যাবে? বিজ্ঞানীরা ভাবছেন, ভাইরাস থেকে যা কিছু রোগ হয়, ইনটারফেরন দিয়ে তার চিকিৎসা করলে সে সব রোগের প্রতিরোধ বা চিকিৎসা করাও সম্ভব। তা, অত ইনটারফেরন কোথায়?

ডি এন এ পুনঃসংযোজন করে অঢেল উন্নত ধরণের ইনটারফেরন উৎপাদন করা যায় কীনা, সে চেষ্টা চলেছে। খবর আছে, জৈব প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে পুনঃসংযুক্তি পদ্ধতিতে বীজাণুর বদলে ঈস্ট থেকে ইতোমধ্যেই ইনটারফেরন তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। এখানে তাহলে বিজ্ঞান আরও এক ধাপ এগুলো। বীজাণুর বদলে ঈস্ট-এ বহন করে নিয়ে যাওয়া হল মানুষের জিনকে। মদ চোলাই-এর জন্যে ঈস্ট (yeast) ব্যবহার করা হয়। এখানে সুবিধাটা আরও এককাঠি বাড়ল। ঈস্ট-কোষের ভিতর মানুষের জিন সংযোজনের ফলে যে ইনটারফেরন তৈরি হচ্ছে, সেটা কিন্তু কোষের ভিতরে না থেকে কোষ-প্রাচীর ভেদ করে বেরিয়ে আসছে তার চারপাশের আধার (media)টাতে। কিন্তু বীজাণু [ই, কোলাই (E. coli) বীজাণুটাকেই জিন সংযুক্তির জন্যে সাধারণতঃ বেছে নেওয়া হয়] তার কোষের ভিতরেই রাখে ইনটারফেরনকে, সেটা কোষপ্রাচীরের বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে না। কাজেই কোষপ্রাচীরের আবরণটা সরিয়ে নিতে হয়, এর ফলে অনেক সময় বীজাণুর কোষটি ভেঙে যায় বা গলে যায়। তখন মৃত বীজাণু ও ইনটারফেরন মিশে থাকে একসঙ্গে—তার থেকে আবার বিশেষ প্রক্রিয়ায় বিশুদ্ধ ইনটারফেরন আলাদা করে নিতে হয়। ঈস্টের বেলায় এটা আর দরকার হচ্ছে না—ঈস্টের দেহকোষ থেকে ইনটারফেরন বেরিয়ে আসছে বলে সরাসরি এটা পাওয়া যাচ্ছে।

ডি এন এ সংযুক্তি গবেষণাগার থেকে আর একটা হরমোন তৈরি করা সম্ভব হয়েছে—মানুষের বেড়ে ওঠার জন্যে দরকার যে হরমোন, সেটা। স্বাভাবিকভাবে ঐ হরমোন নিঃসৃত হয় পিটুইটারি নামে অনালগ্রন্থি (ductless gland) থেকে। হরমোনটার ঘাটতি পড়লে মানুষ আর বাড়ে না—বামন হয়ে

থাকে। এরকম রোগীকে ছোটবেলায় যদি হরমোনটা দেওয়া যায়, তাহলে সে ঠিকমত বাড়তে পারবে স্বাভাবিকভাবে। যারা হরমোনটার স্বাভাবিক ঘাটতিতে বাড়তে পারছিল না, এমন 22 জন শিশুর 1 বছর ধরে চিকিৎসা করেছে ডি এন এ সংযুক্তি প্রক্রিয়ায় কৃত্রিমভাবে যে বেড়ে ওঠা হরমোন তৈরি হয়েছে, তাই দিয়ে। তারা এখন আগের আড়াই গুণ হারে বাড়ছে। আরও কিছুদিন হয়ত সময় লাগবে গবেষণার পুরো ফলাফল যাচাই করতে, কিন্তু দ্বিধাহীনভাবে বলা যেতে পারে যে, পুনঃসংযুক্তি প্রক্রিয়ায় বেড়ে ওঠার যে হরমোন পাওয়া গেছে, তা স্বাভাবিক হরমোনের মতই কার্যকর।

বেড়ে ওঠার হরমোন (growth hormone) শারীরবৃত্তীয় আরও অনেক কাজে লাগে। যাদের হাড় ক্ষণভঙ্গুর, তাদের বেলায় হাড় তৈরিতে এই হরমোন সাহায্য করে, তাদের হাড় শক্ত করে। সাংঘাতিক পুড়ে গেলে হরমোনটি শরীরে নাইট্রোজেন ধরে রাখতে এবং প্রোটিন বিপাকে সাহায্য করে। এ ধরণের রোগীর উপরও ঐ হরমোন দিয়ে চিকিৎসা করে ভাল ফল পাওয়া গেছে। তবে দশগুণ বেশি মাত্রায় লাগে। কেউ কেউ আবার বলছেন, বুড়োদের বেলায় এই হরমোন উপকারী। তবে এটা নিয়ে এখনো কোন পরীক্ষানিরীক্ষা হয় নি—তাই এখনই কিছু বলা যায় না।

ওষুধ কারখানায় গতানুগতিক যান্ত্রিক পদ্ধতি ব্যবহার করে কোন কোন হরমোন তৈরি করতে সময় লাগে বেশি, পরিমাণেও পাওয়া যায় খুব কম। ধরা যাক ইউরোকাইনেজ এবং টি পি এ (TPA)-র কথা। দুটি হরমোনই রক্তের দলা ভাঙতে সাহায্য করে ফলে হার্ট এ্যাটাক ও ফুসফুসে রক্ত দলা বাঁধলে এসবের চিকিৎসায় দরকার হয়। শিরায় রক্ত দলা বাঁধলে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ইউরোকাইনেজ দিয়ে চিকিৎসা করা হয়। ওষুধটির অনেক দাম, কারণ এটা নিষ্কাশন করতে হয় মানুষের মূত্র অথবা কিডনী কোষের কালচার থেকে। পাওয়া যায় খুব কম পরিমাণে। অথচ জিন প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে সহজেই অনেক বেশি পরিমাণে ইউরোকাইনেজ পাওয়া যেতে পারে অল্প সময়ে।

পুনঃসংযুক্তি প্রক্রিয়ায় পাওয়া গোরুর বেড়ে ওঠা হরমোন দিয়ে গোরুর দুধ অন্ততঃ 12 শতাংশ বাড়ানো যেতে পারে। এমনকি এধরণের গোরু খাবে কম, অথচ দুধ দেবে বেশি। দুধের গুণাগুণও একই থাকবে। অবশ্য এটা পরীক্ষা করে দেখতে হবে পুনঃসংযুক্তি প্রক্রিয়ায় তৈরি এই হরমোন গোরুর পক্ষে অথবা যারা ঐ গোরুর দুধ খাবে তাদের পক্ষে নিরাপদ কি না?

আরও কল্পনা করা যেতে পারে, বীজাণুগুলোর ভিতর এমন জিন আমরা ঢুকিয়ে দিতে পারব, যার ফলে তারা কোন বিশেষ ধরনের মাংস—প্রোটিন তৈরি করেই চলবে। তখন একদলা বীজাণু খেলে পাওয়া যাবে মাংসের স্বাদ এবং পুষ্টি। অনেক তাড়াতাড়ি এ অদ্ভুত মাংস তৈরি করতে পারবে বীজাণুরা—একেবারে অবিকল নকল খাসির বা মুর্গির মাংস—বলাবাহুল্য, দামও হবে যৎকিঞ্চিৎ মাত্র।

শুধু আমিষ খাবারই বা কেন, গাছের কোষের ভিতর জিন যোগ করে আমরা ফল ও তরিতরকারীর খাদ্যগুণ এবং খাদ্যমূল্য দুই-ই বাড়িয়ে দিতে পারব। এমনকি, আলুর মধ্যে প্রোটিনের ভাগ অনেক—অনেক বাড়িয়ে দেওয়া যাবে খেয়াল-খুশিমত, ব্যক্তি, সমাজ বা ব্যক্তির রুচি ও চাহিদা অনুযায়ী।

জিন সংযুক্তির সফল প্রয়োগের ফলে বিজ্ঞানের বিস্ময়কর দিগন্ত আরো বিস্তৃত হতে পারে। এটা সম্ভব যে, বীজাণু শুধু মিথেন তৈরি করে চলবে—যেটা প্রাকৃতিক গ্যাসের চাবিকাঠি। এমনকি বিশেষ ধরণের বীজাণু পাথর ফাটিয়ে তেল বের করবে এবং এইভাবে তেলের কূপগুলো থেকে এখনকার তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণ তেল পাওয়া যাবে। ইউরোপে একটা তেলকোম্পানী তেলের কূপগুলো থেকে স্বাভাবিক চাপে তেল তোলা হয়ে গেলে পর ভিতরে পাম্প করে ঢুকিয়ে দেয় লবণজল—তারপর তেলমিশ্রিত লবণজল বের করে এনে তার থেকে আবার কিছুটা তেল পায়। ঐ কোম্পানী ভাবছে এমন একটা বীজাণুর কথা যেটা লবণজলের সঙ্গে মিশিয়ে দিলে বেঁচে থাকবে, বংশ বিস্তার করবে। তাহলে লবণজল যখন ঢুকিয়ে দেওয়া হবে, তখন বীজাণুর বংশবিস্তারের ফলে পাথরের উপর চাপ পড়বে, গুঁড়ো হবে পাথর—আরও বেশি পরিমাণ তেল বেরিয়ে আসবে। জিনসংযুক্তি প্রক্রিয়ায় এমন বীজাণু সৃষ্টি করা সম্ভব।

সম্ভব এমন শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদ (algae) সৃষ্টি করা যা সহজে সঠিক ভাবে জল ভেঙে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন তৈরি করবে। হাইড্রোজেন একটা গ্যাস—পাইপ লাইন দিয়ে যে-কোন জায়গায় নিয়ে যাওয়া যাবে—ঐ হাইড্রোজেন পোড়ালেই পাওয়া যাবে জল। কত সহজে জলের সমস্যা (এমনকি শক্তির সমস্যাও মিটতে পারে) পৃথিবীতে। ঐ জল ভেঙে আবার তৈরি করে নেওয়া যাবে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন। জিন প্রযুক্তিবিদ্যার কল্যাণে যতখুশি হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন উৎপাদন সম্ভব—সেদিনও; বিজ্ঞানীদের মতে বেশি দূরে নেই।

ভবিষ্যতে পরিবেশ দূষণ থেকেও মানুষ হয়ত সহজেই মুক্তি পেতে পারবে। সম্ভব হবে এমন কোন বীজাণু বা জীবাণুর সৃষ্টি করা, যা প্রকৃতির দূষিত পদার্থগুলোকে বদলে দেবে, সেগুলো হয়ত মানুষ তখন অন্য কাজে ব্যবহার করবে।

এতো গেল উপকারের দিক। কিন্তু কোন বিপদ এবং ঝুঁকিও তো ডেকে আনতে পারে বিজ্ঞানের এই বিস্ময়কর অগ্রগতি! ঘটতে পারে কোন ভয়াবহ দুর্ঘটনা!

এখন পর্যন্ত দেখা গেছে, ডি এন এ সংযুক্তির কারিগরী করা যে বীজাণু-কোষ, সেটা বাঁচিয়ে রাখতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়, সেই জন্যে তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখাও সোজা। সহজে মানুষের নাগালের বাইরে তাই যেতে পারবে না।

দুর্ঘটনার ভয়ের চেয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে জিন প্রযুক্তিবিদ্যাকে খারাপ কাজে লাগানোর ভয়টাই বেশি। সম্প্রতি এই নিয়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে আন্দোলনও হয়েছে। একদল গবেষক সঙ্গত মানবিক কারণেই দাবি তুলেছেন, ডি এন এ প্রযুক্তিবিদ্যা জৈবিক অস্ত্র (biological weapon) হিসাবে ব্যবহারের গবেষণার জন্য ন্যাশানাল ইনস্টিটিউট অব হেল্‌থ যে সব টাকা-পয়সা অনুদান দিচ্ছে, সেগুলো বন্ধ করতে হবে। কিন্তু আমেরিকার প্রতিক্রিয়াশীল সরকার এতে কান দেন নি। আসল বিপদ এইখানেই।

তবে বিজ্ঞান তো থেমে থাকে না। আর প্রকৃত বিজ্ঞানী কখনো দাসত্ব করে না পশুদের। যুদ্ধবাজদের। মানুষের ইতিহাস এগিয়ে যাবারই ইতিহাস।

জৈব ও রাসায়নিক যুদ্ধ

প্রদীপকুমার দত্ত*

যে কোনও দেশের সাধারণ মানুষ শান্তিপ্রিয়, তারা যুদ্ধ চায় না কারণ দেশ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে জনসাধারণের দুর্দশা বাড়ে। কিন্তু তবুও অনেক সময় ধুরন্ধর রাষ্ট্রনেতাদের জন্য সাধারণ মানুষকে যুদ্ধের বলি হতে হয়। কখনও একাধিক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের বাজার দখলের প্রতিযোগিতার ফলে, কখনও পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে মূল সমস্যা থেকে জনসাধারণের দৃষ্টি অন্যত্র সরিয়ে দিয়ে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে তাদের বিক্ষোভকে চাপা দিতে ও তার দ্বারা পুঁজিবাদী শাসন-শোষণ দীর্ঘস্থায়ী করতে, এরকম নানা কারণে যুদ্ধ বাধে। প্রাচীনকালে রাজায় রাজায় যখন যুদ্ধ হতো তখন দু-দলের সৈন্যবাহিনী পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করত, সাধারণ মানুষের উপর তার প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষভাবে পড়ত না। কিন্তু আধুনিক যুগে যুদ্ধে বিবদমান দেশগুলির সাধারণ মানুষ আর নিরাপদ নয়। মানবসভ্যতার অগ্রগতির ফলে যেমন মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বেড়েছে তেমনই যুদ্ধে সাধারণ মানুষের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও বেড়েছে। বিভিন্ন রাষ্ট্র নানা নতুন নতুন অস্ত্র নির্মাণ ও মজুদ করে চলেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষ চায় এই অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ হোক।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপের বিষময় পরিণাম লক্ষ্য করে মানুষ পারমাণবিক যুদ্ধের ভয়াবহতা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছে। কিন্তু পারমাণবিক যুদ্ধের চেয়ে কোন অংশেই কম ভয়াবহ নয় এমন বিধ্বংসী যুদ্ধ সম্বন্ধে আজও অনেকেই সচেতন নয়। বলতে চাইছি জৈব ও রাসায়নিক যুদ্ধের কথা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যখন জার্মানরা ফরাসী সৈন্যদের ওপর ক্লোরিন, ফসজেন ও মাস্টার্ড গ্যাস প্রয়োগ করে বলা যায় তখন থেকেই রাসায়নিক যুদ্ধের সূচনা হয়। এরপর উভয় পক্ষই যুদ্ধে গ্যাস ব্যবহার করতে থাকে। প্রথম দুটি গ্যাস ফুসফুসে অসহ্য জ্বালা সৃষ্টি করে, কণ্ঠনালী ও শ্বাসনালীর ভিতরের আবরণের ক্ষতি করে এবং শ্বাসরোধ ঘটায়। এই দুটির মধ্যে ফসজেন গ্যাস তুলনামূলকভাবে বেশী মারাত্মক কারণ স্বল্প মাত্রাতেই তা উপরিউক্ত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে এবং তা দীর্ঘস্থায়ী হয়। এর থেকেও মারাত্মক হলো মাস্টার্ড গ্যাস। এই গ্যাস ফুসফুস ও শ্বাসনালীকে আক্রমণ তো করেই, তাছাড়াও গাত্রত্বক ঝলসে দেয় ও গাত্রত্বকে অসহ্য জ্বালা সৃষ্টি করে। এর ফলে অনেকের মৃত্যু ঘটে। আর যারা কোনভাবে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পায় তারা চিরদিনের জন্য দৃষ্টিশক্তি হারায়।

যুদ্ধে গ্যাস ব্যবহারে এইসব ভয়াবহ পরিণতি দেখে জনমত এত বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে যে 1925 খৃস্টাব্দে 'জেনেভা প্রোটকল' রচিত হয়। বিশ্বের বেশীর ভাগ দেশ এই সনদে সম্মতি জ্ঞাপন করে। এই প্রোটকল অনুযায়ী যুদ্ধে কোনরকম শ্বাসরোধকারী বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার করা চলবে না, চলবে না অনুরূপ কোন তরল পদার্থ বা বস্তুর ব্যবহার; চলবে না জীবাণুর ব্যবহার। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই এই ধরণের আন্তর্জাতিক চুক্তির যে পরিণতি ঘটে এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হলো না। জার্মানি,

* পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, কৃষ্ণনগর সরকারী কলেজ, কৃষ্ণনগর 741101 নদীয়া

ব্রিটেন, জাপান, আমেরিকা, রাশিয়া, ফ্রান্সসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ যুদ্ধে ব্যবহারের উপযোগী রাসায়নিক পদার্থ আবিষ্কারের জন্য গবেষণা চালাতে থাকে এবং রাসায়নিক অস্ত্র মজুদ করতে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে এইসব অস্ত্র ব্যবহারও হতে থাকে। যেমন জাপানীরা চীনাদের উপর, ইটালী ইথোপীয়ায় রাসায়নিক অস্ত্র প্রয়োগ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এই অস্ত্রের ব্যবহার না হলেও, নতুন নতুন জৈব রাসায়নিক মারণাস্ত্র নিয়ে গবেষণা কিন্তু অব্যাহত থাকে। জার্মানীতে প্রথম নার্ভ গ্যাস নামে পরিচিত তিনটি গ্যাস—টাবুন, সারিন ও সোমান—আবিষ্কৃত হয় যথাক্রমে 1936, 1937, 1944 খৃস্টাব্দে। জার্মানী প্রচুর পরিমাণে এই গ্যাসগুলি (বিশেষতঃ টাবুন) তৈরি ও সঞ্চয় করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ই ব্রিটিশ গবেষকরা জৈব অস্ত্রহিসাবে অ্যানথ্রাক্স (ANTHRAX)-এর কার্যকারিতা নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে Gruinard দ্বীপকে কলুষিত করে ফেলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরও ব্রিটেন ও আমেরিকা জৈব ও রাসায়নিক যুদ্ধের উপযোগী নতুন নতুন পদার্থ আবিষ্কারের জন্য গবেষণা চালাতে থাকে। একে একে আবিষ্কৃত হতে থাকে নানা রাসায়নিক পদার্থ যেগুলির কিছু মানব শরীরে অত্যন্ত বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, কিছু বা শস্যহানি ঘটায় বা গাছের পাতা ঝড়িয়ে দেয়, কিছু বা জমির উর্বরতা নষ্ট করে। এ পর্যন্ত যুদ্ধে ব্যবহার্য যে সব রাসায়নিক পদার্থ আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলিকে প্রধানতঃ পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

1. **নার্ভ গ্যাসসমূহ**—এই গ্যাসের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। নার্ভ গ্যাসগুলি ফসফরাসযুক্ত জৈব যৌগ। এগুলি ত্বক, মুখ, ও শ্বাস-প্রশ্বাসের সাহায্যে দেহ কর্তৃক শোষিত হয়ে স্নায়ুতন্ত্রের (Nervous system) কার্যক্ষমতা নষ্ট করে। কারণ স্নায়বিক কাজকর্ম ঠিকমত চলার জন্য প্রয়োজন হয় অ্যাসেটাইলকোলিন-এসটারেজ নামক একটি এনজাইম; আর নার্ভ গ্যাস স্নায়ুতন্ত্রে এই এনজাইমটির উৎপাদন ব্যাহত করে। এর ফলে দেহে নানা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। যেমন, অতিরিক্ত ঘাম দেয়, শ্বাসনালীগুলি সংকুচিত (constricted) হয়, ফুসফুস মিউকাসে পূর্ণ হয়, বমি হয়, হাত পায়ে খিল ধরে, খিঁচুনী হয় এবং অবশেষে পক্ষাঘাত ও মৃত্যু ঘটে। মাত্র এক মিলিগ্রাম নার্ভ গ্যাস কয়েক মিনিটের মধ্যে মৃত্যু ঘটানোর পক্ষে যথেষ্ট। খুব অল্প সময় অল্প পরিমাণ নার্ভ গ্যাস শরীরে প্রবেশ করলেও মৃত্যু ঘটে, মৃত্যু কিছুটা বিলম্বিত হয় মাত্র, কারণ লিভার নার্ভ গ্যাসগুলি বিয়োজন করতে অনেক সময় নেয়।

মানব দেহে অনুরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এখন শত শত ফসফরাসযুক্ত জৈব যৌগ আবিষ্কৃত হয়েছে যা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যায়। বর্তমানকালে এগুলির মধ্যে তিনটি—সারিন ও সোমান (যাদের বলা হয় G-agent) এবং ব্রিটেনে আবিষ্কৃত V× (এটি V-agent-গুলির একটি)—বিপুল পরিমাণে সঞ্চয় করা হয়েছে। এই তিনটির মধ্যে V× সবচেয়ে মারাত্মক কারণ এটি G-এজেন্ট অপেক্ষা অন্ততঃ পাঁচগুণ বিষাক্ত এবং G-এজেন্টগুলির তুলনায় এর প্রতিক্রিয়া অনেক বেশী দিন স্থায়ী হয়।

নার্ভগ্যাসগুলিকে তরল অবস্থায় রাখা হয় এবং বোমা বা শেলের সাহায্যে গ্যাসে পরিণত করে বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরলকণা রূপে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। উদ্বায়ী সারিন ও সোমান বাতাসকে কলুষিত করতে ব্যবহার করা হয়। V× স্প্রে হিসাবে ব্যবহার করা হয় যাতে তা ভূমি ও অন্যান্য বস্তুগুলিকে, যার সংস্পর্শে মানুষকে আসতে হয়, বিষাক্ত করে তোলে। অনেক সময় আবার নার্ভ গ্যাসগুলি সরাসরি শেলের মধ্যে না রেখে গ্যাসগুলি তৈরি করার উপাদানগুলি শেলের মধ্যে কয়েকটি চাকতির সাহায্যে পৃথক করে রাখা হয়। শেলটি নিক্ষিপ্ত হলে আঘাতের ফলে এই চাকতিগুলি ভেঙে যায় এবং নার্ভ গ্যাসের উপাদানগুলি মিশ্রিত হয়ে পরস্পর বিক্রিয়া করে বাতাসে নার্ভ গ্যাস তৈরি করে। এগুলিকে বলা হয় বাইনারি (Binary) অস্ত্র।

2. **বৈক্লব্যসৃষ্টিকারক** (Incapacitants)—এই শ্রেণীর পদার্থগুলি নার্ভ গ্যাসের মত সম্পূর্ণ স্নায়ুতন্ত্রকে আক্রমণ না করে স্নায়ুতন্ত্রের বিশেষ কোন অংশকে নিষ্ক্রিয় করে। এইগুলি নানা ধরণের ঔষধের উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু যুদ্ধাস্ত্র হিসাবেও যে এগুলি ব্যবহৃত হতে পারে তা সামরিক কর্তাদের দৃষ্টি এড়ায় নি। এগুলি মস্তিষ্কের বা স্পাইনাল কর্ডের প্রধান প্রধান স্নায়ুগুলিকে আক্রমণ করে সেগুলির কার্যক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। ফলে মানুষ দীর্ঘ সময় ধরে বিকল হয়ে পড়ে। যতক্ষণ না শরীর এগুলির ক্রিয়া নষ্ট করতে পারে ততক্ষণ পর্যন্ত এই বৈক্লব্য চলতে থাকে। BZ (যার রাসায়নিক নাম 3-কুইনুক্লিডিনাইল বেনজাইলেট) হলো এরূপ একটি কঠিন পদার্থ। 1960-এর দশকে আমেরিকায় এটি আবিষ্কৃত হয় এবং আমেরিকার সামরিক বাহিনী দীর্ঘদিন ধরে এটি সঞ্চয় করতে থাকে। এটি একটি কঠিন পদার্থ। একে বাতাসে aerosol রূপে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। BZ হৃৎপিণ্ডের পেশীগুলির সংকোচন ব্যাহত করে এবং হৃৎপিণ্ডের পেশীগুলিকে বিকল করে দেয়। ফলে হৃৎপিণ্ডের গতি (heart rate) বৃদ্ধি পায়, ত্বক শুষ্ক হয়ে যায়, চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায়, স্মৃতিভ্রংশ হয় ও মানুষ হতচেতন হয়ে পড়ে। অবশ্য এইসব প্রতিক্রিয়ার সবগুলিই সকলের এক সঙ্গে হয় না। ব্যক্তি বিশেষে এক একজনের ক্ষেত্রে এক বা

একাধিক প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। এই প্রতিক্রিয়া সাধারণতঃ 2 থেকে 4 দিন স্থায়ী হয়। LSD, অ্যামফিটামাইন (amphitamine), সাইলোসাইবিন (psilocybin) এবং মেসকালিন (mescalin) মানসিক অবসাদ ও হ্যালুসিনেশন (hallucination) সৃষ্টি করে।

3. অস্বস্তি সৃষ্টিকারী—অস্বস্তি সৃষ্টিকারী গ্যাস হিসাবে টিয়ার গ্যাসের নাম সকলেরই জানা। বিভিন্ন দেশে পুলিশ ও সামরিক বাহিনী জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে, দাঙ্গা থামাতে, ধর্মঘট ভাঙতে টিয়ার গ্যাস ব্যবহার করে। এসব ক্ষেত্রে টিয়ার গ্যাসের ব্যবহার এত ব্যাপক যে তা মানুষ স্বাভাবিক বলেই ধরে নিয়েছে। কিন্তু এই গ্যাসটি যে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাতে পারে তা অনেকেই জানে না। অল্প পরিমাণ টিয়ার গ্যাসের প্রয়োগে চোখ, নাক, জ্বালা করে, কিন্তু বেশী পরিমাণে প্রয়োগ করলে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। ঠিক কি পরিমাণ টিয়ার গ্যাসে মৃত্যু ঘটবে তা নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব না হলেও সুস্থ, সবল, যুবক ও পূর্ণবয়স্ক সৈন্যদের ক্ষেত্রে এই গ্যাসের একটা নিরাপদ মাত্রা বিজ্ঞানীরা স্থির করেছেন। কিন্তু বদ্ধ স্থানে এই মাত্রাতেও সৈন্যদের মৃত্যু ঘটতে পারে। বৃদ্ধ, শিশু ও অসুস্থ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এর চেয়ে কম মাত্রাতেই মৃত্যু ঘটতে পারে।

টিয়ার গ্যাস যে মৃত্যু ঘটাতে পারে ভিয়েৎনাম যুদ্ধেই তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। হত্যালীলা চালানোর উদ্দেশ্যে বহুবার আমেরিকা ভিয়েৎনামে এই গ্যাস প্রয়োগ করেছে বাড়ি ঘরে স্প্রে করে ও সুড়ঙ্গের মধ্যে পাম্প করে। ফলে বাড়ি বা সুড়ঙ্গের মধ্যে অনেকের মৃত্যু ঘটে। আবার গ্যাসের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য বাইরে এলে তাদের নাপাম বা অনুরূপ বোমার শিকার হতে হতো। সুতরাং আপাতদৃষ্টে টিয়ার গ্যাসকে নিরীহ বলে মনে হলেও বাস্তবে তা মারাত্মক হতে পারে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে ভিয়েৎনাম যুদ্ধে টিয়ার গ্যাস প্রয়োগ করে আমেরিকা জেনেভা প্রোটকল ভঙ্গ করেছে—এ অভিযোগ তারা অস্বীকার করেছে। তাদের যুক্তি যেহেতু এই গ্যাসটি মৃত্যু ঘটানোর উদ্দেশ্যে আবিষ্কৃত হয় নি তাই এর প্রয়োগ জেনেভা প্রোটকলে আটকায় না। কি সীমাহীন ভণ্ডামী! যে উদ্দেশ্যেই আবিষ্কৃত হোক না কেন, আমেরিকা তো তা প্রয়োগ করেছিল মৃত্যু ঘটানোর উদ্দেশ্যেই।

বর্তমানে টিয়ার গ্যাস হিসাবে যে সব রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহৃত হয় তাদের মধ্যে প্রধান হলো CN, CS. এবং CR। 1918 খৃস্টাব্দে আমেরিকায় CN আবিষ্কৃত হয় এবং গত 50 বছরের বেশী এটি ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রতি ঘনমিটার বাতাসের সঙ্গে শরীরে মাত্র 0.3 মিলিগ্রাম CN প্রবেশ করলে চোখ, নাক, গলা জ্বালা করে। আর প্রতি ঘনমিটার বাতাসের সঙ্গে 550 মিলিগ্রাম CN শরীরে প্রবেশ করলে মৃত্যু ঘটে 1950-এর দশকে ব্রিটেনে আবিষ্কৃত হয় CS—এর ব্যবহার সবচেয়ে বেশী। একটি শেলের মধ্যে ভরে শেলটি নিক্ষেপ করলেই aerosol বা ধূলির আকারে তা বেরিয়ে আসে। খুব অল্প মাত্রাতেই এটি চোখ, নাক, গলায় জ্বালা ধরায়। 0.1 থেকে 1.0 পি, পি, এম (ppm) পরিমাণ CS মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই নানা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, যেমন চোখ ও নাক দিয়ে জল পড়ে, অত্যধিক লালা নিঃসরণ হয়, বমি হয়, মুখ ও গলা পুড়ে যায়, বুকে এমন ব্যথা ধরে যে নিঃশ্বাস নেওয়া কষ্টকর হয়। 1960-এর দশকে ব্রিটেনে CR আবিষ্কার হয়। এটি শেলে ভরে বা জলে দ্রবীভূত করে ছড়ানো হয়। এর আক্রমণে চোখ, নাক, গলা ও ত্বক প্রচণ্ডভাবে জ্বলতে থাকে ও এসব স্থানে ক্ষতের সৃষ্টি হতে পারে, এমন কি হিস্টিরিয়াও হতে পারে।

4. **হারবিসাইডসমূহ (Herbicides)**—এগুলি ফসল ও শস্যহানি ঘটায়, জমির উর্বরতা হ্রাস করে, অরণ্য ধ্বংস করে। ব্রিটেন যুদ্ধে এই ধরণের পদার্থের প্রথম ব্যবহার করে। তারা 2, 4, 5—tricholorophenoxy acetic acid নামক পদার্থটি মালয়েসিয়াতে ব্যবহার করে। ফলে সেখানে গাছপালার বৃদ্ধি ব্যাহত হয় ও শস্যহানি ঘটে। Trioxene ও diesolene শস্যহানি ঘটানো ছাড়াও জমির উর্বরতা হ্রাস করে। ব্যাপক ভাবে শস্য ও ফসল হানির উদ্দেশ্যে ভিয়েৎনাম যুদ্ধে প্রথম হারবিসাইড ব্যবহার করা হয়। আমেরিকার বিমান বাহিনীর একটি বিশেষ স্কোয়াড্রন লক্ষ লক্ষ লিটার হারবিসাইড ভিয়েৎনামে ছড়ায়। এর ফলে 1962 থেকে 1971 খৃস্টাব্দের মধ্যে ঐ দেশের মোট বনভূমির 46%, কৃষিজমির 3% ও অন্যান্য জমির 5% ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমেরিকা দাবি করে যে তারা বনভূমি ধ্বংস করার জন্যই এগুলি ব্যবহার করেছে যাতে গেরিলারা সেখানে আত্মগোপনের সুযোগ না পায়। কিন্তু এটাই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না। খাদ্যের অভাব সৃষ্টি করাও তাদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল, যা যথেষ্ট অমানবিক ও নিন্দনীয়। কিন্তু হারবিসাইড প্রয়োগের ফল আরও সুদূরপ্রসারী ও ভয়াবহ। এর ফলে অনেক মানুষকে মৃত্যুবরণ করতে হয়। অনেকে ক্যানসারে আক্রান্ত হয় এবং গর্ভস্থ সন্তানের ক্ষতি হয়। ভিয়েৎনামে আজও হাজার হাজার মানুষ এই যুদ্ধের ফল ভোগ করছেন। জনস্বাস্থ্যের সবচেয়ে ক্ষতি করেছে এজেন্ট অরেঞ্জ (Agent Orange যা 2, 4, 5-T এবং 2, 4-dichlorophenoxy acetic acid-এর মিশ্রণ)। দক্ষিণ ভিয়েৎনামে 17 লক্ষ হেক্টর জমিতে মোট যে 750 লক্ষ লিটার হারবিসাইড ছড়ানো হয় তার মধ্যে 440 লিটারই ছিল এজেন্ট অরেঞ্জ।

1983 খৃস্টাব্দের প্রথম দিকে হো চি মিন শহরে একটি আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এই সেমিনারে হারবিসাইড প্রয়োগের সুদূরপ্রসারী ফল নিয়ে আলোচনা করেন 20টি দেশের প্রায় 70 জন চিকিৎসাবিজ্ঞানী ও ইকোলজিস্ট (Ecologist)। ভিয়েৎনামী ডাক্তাররা দেখেছেন যে সব জায়গায় হারবিসাইড ছড়ানো হয়েছে সেখানকার বাসিন্দাদের লিভারে ক্যানসার হবার সম্ভাবনা অন্য জায়গার বাসিন্দাদের তুলনায় পাঁচ গুণ বেশি। তাছাড়া উত্তর ভিয়েৎনামের যে সব পুরুষ দক্ষিণ ভিয়েৎনামে ছিলেন তাঁদের স্ত্রীদের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক সন্তান জন্মের হার অপেক্ষাকৃতভাবে বেশি। অতএব দেখা যাচ্ছে হারবিসাইডের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ছাড়াও সুদূর প্রসারী প্রতিক্রিয়া রয়েছে।

5. **প্রাণীজ ও উদ্ভিজ্জ বিষ**—এই সব বিষ শ্বাসগ্রহণের সঙ্গে, খাদ্য বা পানীয়ের সঙ্গে বা ইঞ্জেকসন (injection) দিয়ে শরীরে প্রবেশ করালে এদের বিষক্রিয়া দেখা যায়। নানা কারণে খাদ্যে বিষক্রিয়ায় মৃত্যুর সংবাদ অনেক সময় শোনা যায়। সুতরাং যুদ্ধে প্রাণীজ ও উদ্ভিজ্জ বিষ প্রয়োগের ফলে মৃত্যু হলেও তা স্বাভাবিক বিষক্রিয়া বলে চালানোর সুযোগ থাকায় যুদ্ধবিশারদরা এগুলির ব্যবহারের পক্ষপাতী কারণ ইচ্ছাকৃত ভাবে বিষক্রিয়া ঘটানো হয়েছে কিনা তা প্রমাণ করা কঠিন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মিত্রপক্ষ বটুলিনাস টক্সিন (Botulinus toxin) মজুদ করে। এটির 5 কিলোগ্রাম একটি 50 লক্ষ লিটার জলাধারে প্রয়োগে সেই জল এত বিষাক্ত হয়ে পড়ে যে মাত্র 0·1 লিটার পরিমাণে ঐ জল পান করলে শরীরে বিষক্রিয়া দেখা যায়। এই শ্রেণীর আর একটি রাসায়নিক হলো TRICHOTHECENES যার বিষক্রিয়ার প্রচুর পরিমাণে রক্তপাত ও রক্ত বমি হয় এবং পরিণামে মানুষের মৃত্যু ঘটে।

উপসংহার—দেখা যাচ্ছে জেনেভা প্রোটকল সত্ত্বেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ (বিশেষতঃ আমেরিকা, ব্রিটেন, জার্মানী প্রভৃতি) এমন সব নতুন নতুন রাসায়নিক পদার্থ আবিষ্কার করেছে এবং সেজন্য গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে মানব কল্যাণে যার কোন ভূমিকা নেই। যুদ্ধে ব্যবহারের উদ্দেশ্যেই তারা যে এ কাজ করছে তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। তাই 1972 খৃস্টাব্দের জুন মাসে আবার একটি আন্তর্জাতিক সমাবেশ হয় যা 'বাইওলজিক্যাল ওয়েপন্স কনভেনসন' নামে পরিচিত। পৃথিবীর বহু দেশ আবার একটি সনদে সই করলেন। সনদে বলা হলো পৃথিবীর কোন দেশ মানব কল্যাণে কোন ভূমিকা নেই এমন কোন জীবাণু এবং প্রাণী ও উদ্ভিদের ক্ষতি করে এমন কোন বস্তু তৈরি ও সংরক্ষণ করতে পারবে না। কিন্তু এই সনদ কতটা কার্যকর হয়েছে? পেন্টাগণের বক্তব্য পৃথিবীর 40% রাসায়নিক মারণাস্ত্র তাঁদের ভাণ্ডারে রয়েছে আর অবশিষ্ট 60% রয়েছে রাশিয়ার। অনেকের ধারণা আমেরিকা 500 টনের মত রাসায়নিক অস্ত্র পশ্চিম জার্মানীতে মজুদ রয়েছে। আমেরিকার সামরিক কর্তৃপক্ষের হিসাবে সে দেশে মজুদ রাসায়নিক অস্ত্রের পরিমাণ বর্তমানে 42000 টন আর রাশিয়ায় রয়েছে 30000 থেকে 70000 টন আবার রাশিয়ার বক্তব্য আমেরিকার রাসায়নিক অস্ত্রের পরিমাণ 300000 টন, নিজেদের শূন্য। দাবী পাল্টা দাবী যাই হোক না কেন, রাশিয়া ও আমেরিকা উভয়েই যে যথেষ্ট পরিমাণে রাসায়নিক অস্ত্র মজুদ করেছে এ বিষয়ে অনেকেরই কোন সন্দেহ নেই। তা ছাড়া প্রেসিডেন্ট রেগান 1984 খৃস্টাব্দে বাজেটে মার্কিন কংগ্রেসের কাছে 1 বিলিয়ন ডলার দাবী করেছিলেন রাসায়নিক ও জীবাণুঘটিত অস্ত্র তৈরির জন্য আর 105 মিলিয়ন ডলার দাবী করেছিলেন বাইনারি নার্ভ গ্যাস অস্ত্র নির্মাণের জন্য। সরকারী ভাবে বলা না হলেও অনেকের ধারণা ফ্রান্সে 5 লক্ষ নার্ভ গ্যাসের শেল মজুদ আছে। উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। একথা আজ পরিষ্কার হয়ে উঠেছে যে নিরস্ত্রীকরণ চুক্তিগুলি বাস্তবে কোন অর্থ বহন করে না। বিভিন্ন দেশ যে অস্ত্র প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছে তাকে জনসাধারণ আর নিছক 'প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে অস্ত্র সংগ্রহ' বলে মনে করে না। যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিশ্বজনমত গড়ে উঠেছে। তাই দাবী উঠেছে 'যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই।' তাই নিরস্ত্রীকরণ চুক্তিগুলির মাধ্যমে বিভিন্ন রাষ্ট্র দেখাতে চায় যে তারাও শান্তি চায়; অস্ত্র মজুদ করলেও দেশ রক্ষায় প্রয়োজন ছাড়া তারা সে অস্ত্র ব্যবহার করবে না। কিন্তু মানুষের অভিজ্ঞতা অন্য রকম। তাই যদি বলা হয় যে নিরস্ত্রীকরণ চুক্তিগুলি কাগজে-চুক্তি তাহলে ভুল হবে কি? তাই দেশে দেশে ঐক্যবদ্ধ গণ আন্দোলন গড়ে তুলে দেশের সরকারকে চুক্তিগুলি মেনে চলতে বাধ্য করা ছাড়া বাঁচবার পথ নেই।

তথ্যসূত্র : 1. New Sci. 93 (11 March, 82) p. 630
2. New Sci. (10th May, 84) p. 39
3. দেশ (4th Aug, 84) p. 59

রবীন্দ্র-মানসে বিজ্ঞান ও আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ

শ্রীকুমার রায়*

প্রখ্যাত গণিতজ্ঞ ওয়ারেন উইভার বিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে একবার বলেছিলেন—"Activity by which man gains in his understanding and control of Nature"। এর থেকেই বোঝা যায় বিজ্ঞানের দুটি সুনির্দিষ্ট বিভাগ আছে—যে জ্ঞান দিয়ে মানুষ প্রকৃতির রহস্য উপলব্ধির চেষ্টা করে তাকে বলে শুদ্ধ বিজ্ঞান এবং যা দিয়ে সেই প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়াস পায় তার নাম ফলিত বিজ্ঞান। আবার শুদ্ধ বিজ্ঞান সম্বন্ধে বিদগ্ধ সমাজে একটা প্রচলিত প্রবাদ—where science ends, philosophy begins; দর্শনের শুরু বিজ্ঞানের শেষে। কিন্তু প্রকৃতির রহস্য ভাণ্ডার অফুরন্ত, অতএব বিজ্ঞানের শেষ নেই; জ্ঞান থেকে জ্ঞানান্তরে, from Chaos to Cosmos, সীমাহীন পরিক্রমাই বিজ্ঞান। স্বতই প্রশ্ন জাগে, তা হলে বিজ্ঞান এবং দর্শনের সম্বন্ধটা কি? অথবা দুয়ের মধ্যে আদৌ কোন সম্বন্ধ থাকা উচিত কিনা, সে সম্বন্ধ কষ্টকল্পিত কিনা। পারম্পর্যটা একটু পালটে নিলে অবশ্য দর্শন এবং বিজ্ঞানে একটা সমন্বয় ঘটানো যায়, নোবেল পুরস্কার জয়ী পদার্থবিজ্ঞানী ম্যাক্স বর্ণ যেমন বলেছিলেন—There is philosophy behind every science। দার্শনিকের দৃষ্টিতে প্রকৃতির যে রহস্য ধরা পড়ে, বিজ্ঞানী সেই অরূপকে বুদ্ধিগ্রাহ্য রূপ (আইনস্টাইনের ভাষায় sensuous impression) দেন। গ্যালিলিও-নিউটন-আইনস্টাইনরা যুগে যুগে সে কথাই প্রমাণ করেছেন।

এবার রবীন্দ্রনাথের দিকে দৃষ্টি ফেরান। তিনি শুধু বিশ্বকবি নন, দার্শনিকও। অরূপের সন্ধানে তিনি রূপসাগরের ডুবুরী। অতএব আপাতদৃষ্টিতে তাঁর এবং একজন বিজ্ঞানীর পথ অপসারী নিশ্চয়ই। উনি বিশ্বাস করেন কবির মনোভূমি বাস্তবের চেয়ে সত্য। কথাটা শুনে আঁতকে ওঠার কথা। তবে নিলস্ বোহ্‌র-এর তুল্য বিজ্ঞানী, যাঁরা প্রকৃতির রহস্য সন্ধানে নিমগ্ন, তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে সমর্থন করেন। বোহ্‌র একবার হাইসেনবার্গকে বলেছিলেন, "when it comes to atoms, language can be used only as in poetry. The poet, too, is note marly so concerned with describing facts, as with creating images." পরমাণুর ভাষা হল কবিতা; এ দিয়ে সত্যাসত্য যাচাই যত না হোক, তবে ছবি আঁকা যায়। কিম্বা রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন কবির সৃষ্টির মধ্যে প্রকৃতির জ্যোতিষ্ক যে পথ দেখায় সেটা তার অন্তরের পথ, তিনি সমর্থন পান আইনস্টাইনের। Evolution of Physics বইতে বলা হয়েছে—Physical concepts are free creation of human mind, and are not, however it may seem, uniquely determined by this external world।

তবে দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানচিন্তা বোধ হয় ওই রকম কিছু উদ্ধৃতি দিয়েই শেষ করা যায়। কবির প্রদর্শিত পথ সাধারণ মানুষের সহজ বিশ্বাসে চির সমুজ্জ্বল। সে পথে নোটিশ লটকান নাই—tresspassers will be prosecuted। গাছ থেকে আপেল পড়া দেখে তিনি দর্শনকে ক্যালকুলাসের জটিল অঙ্কে ধরে রাখতে মাতেন না; অঙ্কের কয়েকটা স্টেপ লিখে তিনি আমাদের বোঝাতে পারেন না কেন $S=K \log W$ অথবা $E=mc^2$। কবির অঙ্ক কষা দেখলেই মনে হয় প্রকৃতির সব রহস্যই বুঝি হঠাৎ Q.E.D-তে শেষ হয়ে গেছে; মধ্যের স্টেপগুলি উহ্য। এর একটা ভাল উদাহরণ পেয়ে যাবেন রবীন্দ্রনাথের "আমার জগৎ" প্রবন্ধে।

কবি বা দার্শনিকের এ জাতীয় চিন্তাকে বলা যায় বিজ্ঞানের ঘরে চুরি! ভুলে গেলে চলবে না, একটা দেশ বা জাতীর জীবনে ওই স্টেপগুলি অত্যন্ত প্রয়োজন। বাঙালী তথা ভারতবাসীর বরাবরই একটা বদনাম ছিল বা আছে, দর্শনের ধূম্রজালে তাদের বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি চিরকালই আচ্ছন্ন। রবীন্দ্রনাথ তার সমর্থনে যুক্তিও দিয়েছেন—"মাঝে মাঝে গাণিতিক দুর্গমতায় পথ বন্ধুর হয়ে উঠেছে; তার কৃচ্ছ্রতার ওপর দিয়ে মনটাকে ঠেলে নিয়ে গিয়েছি। তার থেকে একটা শিক্ষা লাভ করেছি যে, জীবনে প্রথম অভিজ্ঞতার পথে সবই যে আমরা বুঝি তাও নয়, আর সবই সুস্পষ্ট না বুঝলে আমাদের পথ এগোয় না, এ কথাও বলা চলে না। জল স্থল বিভাগের মতোই আমরা যা বুঝি, তার চেয়ে না বুঝি অনেক বেশি; তবুও চলে যাচ্ছে।" কিন্তু সত্যই কি চলে যাচ্ছে? প্রকৃতির রহস্যগুলিকে গণিতের উপলকীর্ণ রাস্তায় উপলব্ধি করার চেষ্টা না করে দর্শনের কুসুমাস্তীর্ণ পথে বিচরণ করলে যে একটা জাতি কত পেছিয়ে পড়তে পারে ভারতবর্ষ তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। জীবনের একেবারে সায়াহ্নে রবীন্দ্রনাথও বিজ্ঞানের গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়েছিলেন, তবে রবীন্দ্রমানসে এ বিবর্তন হয়েছিল ধাপে ধাপে।

বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথের প্রিয় বিষয় ছিল বিজ্ঞান। তিনি লিখেছেন—"বাল্যকাল থেকে বিজ্ঞানের রস আস্বাদনে আমার লোভের অন্ত ছিল না। আমার বয়স বোধ করি তখন দশ

* BF 118, সল্ট লেক, কলিকাতা-64

বছর; মাঝে মাঝে রবিবার হঠাৎ আসতেন সতীনাথ দত্ত (ঘোষ) মহাশয়। আজ জানি তাঁর পুঁজি বেশি ছিল না, কিন্তু বিজ্ঞানের অতিসাধারণ দু-একটি তত্ত্ব যখন দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দিতেন, আমার মন বিস্ফারিত হয়ে যেত।" সেটা খুবই স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথ যে যুগে জন্মেছিলেন সেটা বিজ্ঞানের যুগ। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ভারত যখন এক কুয়াশাচ্ছন্ন দার্শনিক জগতে পরম নিশ্চিন্তে নিদ্রারত, প্রতীচী তখন একমনে ডারউইনের বিবর্তনবাদ, মেনডেলিভের আত্মবস্তু সংক্রান্ত গবেষণা, মাইকেলসন-মোরলের আলোক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ইত্যাদিতে উত্তাল। তারপর বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই এল পরমাণু বিজ্ঞানে যুগান্তর। এতদিন মানুষ জানত বস্তুজগতের শেষ কথা ওই পরমাণু। ক্রমশ টমসন, রাদারফোর্ড, চ্যাডউইক, কুরি দম্পতি, বোহ্‌র, ফার্মি প্রমুখ বিজ্ঞানীদের চোখে ধরা পড়ল প্রকৃতি কেমন করে নিজের বিরাটত্বকে "সহজ শক্তির কাঠামোর মধ্যে ধরতে পারে"। কিন্তু ভৌত জ্ঞানের সেই উত্তাল তরঙ্গ তখনও ভারত মহাসাগরে পৌঁছয় নি। রবীন্দ্রনাথও ধীরে ধীরে বিজ্ঞানের জগৎ থেকে সরে পুরোপুরি ভাবের জগতে বিচরণ শুরু করলেন। ইতিমধ্যে সভ্যতার ইতিহাসে এক অ-সভ্যতা ঘটে গেল; আমি বলছি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কথা। ততদিনে রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমবাসীদের দরজায় ভারতের মর্মবাণী পৌঁছে দিয়ে ওদের হতবাক করেছেন, কিন্তু ওদের মনে দাগ কাটতে পারেন নি। ওরা গীতাঞ্জলি পড়ার প্রায় পর পরই ওখানে বেজে উঠল রণদামামা। হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বীর নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্বে বেদনাহত কবি। 16 এপ্রিল, 1918 শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে এক চিঠিতে লিখেছেন—"পৃথিবীর চতুর্দিকে প্রলয়বহ্নি জ্বলে উঠেছে। ইতিহাস আবার নতুন করে গড়ে উঠবে। এই সময় আমারও কিছু কাজ আছে বলে মনে হয়; এখন ঘরের কোণে বসে থাকতে পারলুম না।" কবির সে কাজ হল হিংসাকে ধিক্কার জানান। "পলাতকা"তে লিখলেন—

"তারি মধ্যে জীবন যখন শুকিয়ে আসে ধীরে ধীরে,
পায় না আলো, পায় না বাতাস, পায় না ফাঁকা, পায় না কোনো রস,
তখন সে কোন্ মোহের পাকে
মরণদশা ঘটেছে তার সেই কথাটাই ভুলে থাকে।"

হয়ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সংঘাতেই হবে, কবির মন এর পর থেকে বস্তুতান্ত্রিক জগৎ, তথা বিজ্ঞানের প্রতি বিমুখ হয়ে উঠল। বিশের দশকে তিনি পূরবী (1924), মহুয়া (1928) ইত্যাদি যত কাব্যগ্রন্থ লিখেছেন তাতে চড়া সুরের দৃষ্টান্ত ছাড়া আর কিছুই খুঁজে পাই না। বরঞ্চ 1933-34 খৃস্টাব্দে "সাহিত্যের স্বরূপ" লিখতে গিয়ে তিনি পশ্চিমী বিজ্ঞান জগতের বিরুদ্ধে সরাসরি বিষোদ্গারণ করেছেন—"বিজ্ঞানের প্রসাদে আধুনিক বাণিজ্য পদ্ধতিতে চলছে প্রভূত পণ্য উৎপাদন।...এই বিরাট যন্ত্রশক্তি উদ্গার করছে অপরিমিত বস্তুপিণ্ড; অন্যদিকে মলিনতা ও কঠোরতা শব্দে, গন্ধে, দৃশ্যে স্তূপে স্তূপে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে। ...বিজ্ঞানের সাহায্যে ইউরোপের বিষয়বুদ্ধি বৈশ্যযুগের অবতারণা করলে।...সেই বৈজ্ঞানিক শক্তি হঠাৎ সকল বাধা বিদীর্ণ করে আগ্নেয় স্রাবে ইউরোপকে ভাসিয়ে দিলে। এই যুদ্ধের মূলে ছিল সমাজ ধ্বংসকারী রিপু, উদার মানুষের প্রতি অবিশ্বাস। সেই জন্যে এই যুদ্ধের যে দান (ফলিত বিজ্ঞানের অগ্রগতি?) তা দানবের দান; তার বিষ কিছুতেই মরতে চায় না, তা শান্তি আনে না।" আনেও নি; 1939 খৃস্টাব্দে ওখানে শুরু হয়েছিল আর এক ভয়ঙ্করতর যুদ্ধ।

ফলিত বিজ্ঞানের এই দানবীয় রূপ কিন্তু কবি অন্যায় ভাবেই কল্পনা করেছিলেন। বিজ্ঞানকে যদি কেউ ধ্বংসের কাজে ব্যবহার করে সে দোষ বিজ্ঞানের নয়। হিরোসিমায় পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের খবর শুনে আইনস্টাইনের চোখে নাকি জল দেখা গেছল। 1933 খৃস্টাব্দে ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশন ফর কালটিভেশন অফ সায়েন্স-এর এক সভায় লর্ড রাদারফোর্ড ঘোষণা করলেন যে পরমাণুর অন্তর্নিহিত শক্তিকে মানুষ কোন দিন ভাল মন্দ কোন কাজেই লাগাতে পারবে না। সেই শুনে তরুণ বিজ্ঞানী ৎজিলার্ড উঠে পড়ে লাগলেন ওঁকে ভুল প্রমাণিত করতে এবং পরের বছরই "চেন-রিঅ্যাকশনের" পেটেন্ট-এর জন্য দরখাস্ত করলেন ব্রিটিশ অ্যাডমিরালটির কাছে। যুদ্ধের চাপে পড়ে তারা আবার সেটা কাজে লাগাল। ম্যানহাটন প্রজেক্ট"-এ। সে দোষ ৎজিলার্ডের নয়, তিনি কখনই তাঁর আবিষ্কারের এ জাতীয় "বৈজ্ঞানিক" ব্যবহার চায় নি এবং যখন সে সম্ভাবনা দেখা দিল তিনি পাগলের মতো রাজনীতিবিদদের দ্বারে দ্বারে ধর্ণা দিয়েছেন অ্যাটম বোমা যাতে না বানান হয়, তার জন্যে।

যাই হোক, তিরিশের দশকের শেষার্ধ থেকে আবার রবীন্দ্রমানসে বিজ্ঞান চিন্তার অনুপ্রবেশ দেখতে পাওয়া যায় এবং প্রধানত সেটা ঘটেছিল আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বোস-এর প্রভাবে। সারা জীবনে কবি নিছক বিজ্ঞানের বই পড়েছেন কিছু যেমন, রবার্ট বল, নিউকোম্বস্, ফ্যামরিয়াঁর লেখা জ্যোতির্বিজ্ঞান, বা হাক্সলের লেখা প্রাণীবিজ্ঞানের বই। বহু প্রথিতযশা বিজ্ঞানীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শেও এসেছেন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (যাঁর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—ওহে রামেন্দ্রসুন্দর, তোমার সকলি সুন্দর) এবং আচার্য জগদীশচন্দ্র ছিলেন কবির বন্ধুস্থানীয়। জগদীশচন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে তিনি যে কবিতাটি লিখেছেন, সেটা পড়লে মনে হয় বিজ্ঞানে বন্ধুর অবদান

সম্বন্ধে উনি ভাল রকম খোঁজ-খবরও রাখতেন। পদার্থবিদ এবং ভারতে পরিসংখ্যানবিদ্যার পথিকৃৎ প্রশান্ত মহলানবিশ (যাঁকে রবীন্দ্রনাথ "সায়েন্টিস্ট" বলেই সম্বোধন করতেন) কিম্বা রাজশেখর বোস ছিলেন ওঁর বিলক্ষণ স্নেহের পাত্র। কিন্তু বয়সে কবির চেয়ে অনেক ছোট হলেও কবির মনে সত্যেন্দ্রনাথের আসন ছিল শ্রদ্ধার। উনত্রিশ খণ্ডের রবীন্দ্র রচনাবলী ঘেঁটে আমি কবির নিছক বিজ্ঞান নিয়ে লেখা একট মাত্র বই দেখতে পেয়েছি—বিশ্বপরিচয়। সেটি উৎসর্গ করেছেন সত্যেন্দ্রনাথকে এবং উৎসর্গ করতে গিয়ে বলেছেন—"এর মধ্যে এমন বিজ্ঞান সম্পদ নেই যা বিনা সংকোচে তোমার হাতে দেবার যোগ্য। তা ছাড়া অনধিকার প্রবেশে ভুলের আশংকা করে লজ্জা বোধ করছি, হয়ত তোমার সম্মান রক্ষা করাই হল না।"

1930 খৃস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ যখন জার্মানী ভ্রমণে যান, বার্লিনের কাছে ক্যাপুথে আইনস্টাইনের নিজস্ব বাসভবনে 14ই জুলাই মহাবিজ্ঞানী আর বিশ্বকবির ঐতিহাসিক সাক্ষাৎ ঘটে। সেই সময় উনি আইনস্টাইনের কাছেই প্রথম সত্যেন্দ্রনাথের নাম শুনে থাকবেন কারণ সেই 1924 খৃস্টাব্দেই "Planks Theory and LightQuantao"প্রবন্ধ লিখে সত্যেন্দ্রনাথ আইনস্টাইনকে গভীর ভাবে প্রভাবান্বিত করেছিলেন। দেশে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের চাক্ষুষ আলাপ করিয়েদেন সম্ভবত মহলানবীশ দম্পতি। তবে দু-জনের মধ্যে যোগাযোগ থাকলেও দেখা-সাক্ষাৎ বড় একটা ঘটে উঠত না কারণ, সত্যেন্দ্রনাথ তখন অধ্যাপনা করতেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু বিজ্ঞান সংক্রান্ত কোনো সমস্যা দেখা দিলেই রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথকে স্মরণ করতেন। যখন স্থির হল যে, শান্তিনিকেতনে সাহিত্য, দর্শন, চারুকলার পাশাপাশি আশ্রমিকদের কিছু বিজ্ঞান শিক্ষারও প্রয়োজন, কবি সতেন্দ্রনাথের সাহায্য চেয়ে পাঠালেন এবং সত্যেন্দ্রনাথও ওঁর অন্যতম ছাত্র শ্রীপ্রমথ সেনগুপ্তের নাম সুপারিশ করে পাঠালেন। তারপর 1941 খৃস্টাব্দে যখন শান্তিনিকেতনে একটি বিজ্ঞান ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠার কথা হয়, গুরুদেবের ইচ্ছা ছিল ওই বছর দোলের সময় সত্যেন্দ্রনাথকে দিয়ে তার দ্বারোদ্ঘাটন করানোর। সেটা দোলের সময়, অবশ্য হয়ে ওঠে নি কারণ, ঐ সময় ঢাকার সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বাধায় সত্যেন্দ্রনাথের পক্ষে ঢাকা ত্যাগ করা সম্ভব হয় নি। এপ্রিল মাসে অবশ্য উনি কবির অনুরোধ রেখেছিলেন।

শুধু বিজ্ঞান প্রতিভা নয়, বিজ্ঞানীর চরিত্র চিনতেও কবি ভুল করেন নি। 1941 খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে রবীন্দ্রনাথ "বিজ্ঞানী" নামে একটি হাসির গল্প লেখেন (যেটা পরে "গল্পসল্প" গ্রন্থে সংযোজিত হয়)। গল্পটির নায়ক নীলমণি বাবুর চরিত্রটি বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ এঁকেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথকে দেখেই। নীলমণিবাবু বৈজ্ঞানিক, "একটা দুটো তিনটে করে যখন প্রমাণ বের করতে থাকবে, নাওয়া খাওয়া যাবে ঘুচে"। তাছাড়া অঙ্কশাস্ত্রেও পণ্ডিত। অঙ্ক কষে ওর বুদ্ধি এত সূক্ষ্ম হয়েছে যে সাধারণ লোকের চোখে পড়ে না। সত্যি কথাই, বোস-আইনস্টাইন পরিসংখ্যানের যিনি সূত্রধর, তিনি অঙ্কে পণ্ডিত তো বটেই, আর জনসাধারণ সেখানে দন্তস্ফুটই বা করে কি করে? শুধু তাই নয়, নীলমণিবাবুর দারুণ ভোলা মন, কখনও কলম হারান; কখনও বা মানিব্যাগ, কখনও বা নিজের বাড়ির ঠিকানা ভুলে যান। যাঁরা সত্যেন্দ্রনাথের সংস্পর্শে এসেছেন তাঁরাই জানেন, ওঁর মনটাও ছিল পার্থিব জগৎ ছাড়া। তদুপরি নীলমণিবাবুর মতো সত্যেন্দ্রনাথেরও এক পোষা কুকুর ছিল এবং সে বৈজ্ঞানিকের চটি মুখে নিয়ে মাঝে মাঝে উধাও হত এবং শেষ পর্যন্ত খাটের তলা থেকে সেটি উদ্ধার করা হত চর্বিত অবস্থায়! সবচেয়ে মজার কথা, রবীন্দ্রনাথের জীবিতাবস্থায় শেষ জন্মোৎসবে (পঁচিশে বৈশাখ, 1941) যোগ দেবার জন্যে যখন সত্যেন্দ্রনাথ স-কন্যা ঢাকা থেকে শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন, কবি ওঁকে দস্তখত করা একখানি সদ্য প্রকাশিত "গল্পসল্প" উপহার দিয়েছিলেন এবং যথারীতি অগোছাল বিজ্ঞানী সেটি প্রায় তৎক্ষণাৎ কোথায় হারিয়ে বসেছিলেন।

ব্যক্তিগত জীবনে যে একজন কবি এবং একজন বিজ্ঞানী পরস্পরের এত কাছাকাছি আসতে পেরেছিলেন তার কারণ উভয়ের মানসিকতায় একটা যোগসূত্র ছিল। দু-জনেই মনে করতেন এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অলস দার্শনিক চিন্তায় নিমগ্ন জাতটার মধ্যে বিজ্ঞান চেতনা আনার আশু প্রয়োজন। সত্যেন্দ্রনাথকে এক চিঠিতে কবি লিখেছিলেন—"বড়ো অরণ্যে গাছতলায় শুকনো পাতা আপনি খসে পড়ে, তাতেই মাটি করে উর্বরা। বিজ্ঞান চর্চার দেশে জ্ঞানের টুকরো জিনিষগুলো কেবলই ঝরে ঝরে ছড়িয়ে পড়ছে। তাতে চিত্তভূমিতে বৈজ্ঞানিক উর্বরতার জীবধর্ম জেগে উঠতে থাকে। তারই অভাবে আমাদের মন আছে অবৈজ্ঞানিক হয়ে। এই দৈন্য কেবল বিদ্যার বিভাগে নয়, কাজের ক্ষেত্রে আমাদের অকৃতার্থ করে রেখেছে।" আর সত্যেন্দ্রনাথ বাঙালীকে বিজ্ঞান-চেতন করতে 1948 খৃস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করলেন বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ।

তাছাড়া, উভয়েই মনে করতেন বিজ্ঞান, তথা যে কোনো শিক্ষার বাহনই হওয়া উচিত মাতৃভাষা। এই সূত্রে "পরিচয়" গ্রন্থে "শিক্ষার বাহন" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য—"আমাদের ভরসা এতই কম যে, ইস্কুল-কলেজের বাহিরে আমরা যে সব লোকশিক্ষার আয়োজন করিয়াছি সেখানেও বাংলা

ভাষার প্রবেশ নিষেধ। বিজ্ঞান শিক্ষার বিস্তারের জন্য দেশের লোকের চাঁদায় বহুকাল হইতে শহরে এক বিজ্ঞান সভা খাড়া দাঁড়াইয়া আছে।...বরং অচল হইয়া থাকিবে তবু কিছুতেই সে বাঙলা বলিবে না। ও যেন বাঙালির চাঁদা দিয়া বাঁধানো পাকা ভিতের উপর বাঙালির অক্ষমতা ও ঔদাসীন্যের স্মরণস্তম্ভের মতো স্থাণু হইয়া আছে। কথাও বলে না, নড়েও না। ...ওজর এই যে, বাংলাভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা অসম্ভব। ওটা অক্ষমের, ভীরুর ওজর।" বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথও ঠিক একই সুরে একই কথা বলতেন—"যাঁরা বলেন বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা সম্ভব নয়, তাঁরা হয় বাংলা জানেন না, নয় বিজ্ঞান বোঝেন না।"

বাংলায় বিজ্ঞান চর্চা "কঠিন বইকি, সেই জন্যেই কঠোর সঙ্কল্প চাই।" "বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ শিক্ষার জন্যে পারিভাষিকের প্রয়োজন আছে"। তা ছাড়া "তথ্যের যাথার্থ্যে এবং সেটাকে প্রকাশের যথাযথ্যে বিজ্ঞান অল্পমাত্রও স্খলন ক্ষমা করে না।" সুতরাং "জ্ঞানের ভাষা যতদূর সম্ভব পরিষ্কার হওয়া চাই। তাতে ঠিক কথাটার ঠিক মানে থাকা দরকার; সাজসজ্জার বাহুল্যে সে যেন আচ্ছন্ন না হয়"। তাই বোধ হয় কবি রবীন্দ্রনাথের চাপে পড়ে ওঁর বিজ্ঞান রচনা কোনো দিনই তেমন করে ফুটে ওঠে নি। আর বিশ্বভারতীতে আজও সায়েন্স ফ্যাকালটি হল না, যতই কবি বলুন—"বুদ্ধিকে মোহমুক্ত ও সতর্ক করার জন্য প্রধান প্রয়োজন বিজ্ঞান চর্চার"। এদিকে সত্যেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত "বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের যে আদর্শ—মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষা ও বিজ্ঞানের প্রসার—বর্তমান পরিস্থিতিতে তার তলা থেকে যেন মাটি সরে যাচ্ছে।" (সম্পাদকীয়, শারদীয় জ্ঞান ও বিজ্ঞান 1980)। এ সবের কোনোটাই শুভ লক্ষণ নিশ্চয়ই নয়।

প্রগতির চাবিকাঠি—সিলিকন চিপ্‌স

শুভব্রত রায়চৌধুরী*

পৃথিবীতে কমপিউটারের বিস্তার ঘটতে শুরু করে 1950 খৃস্টাব্দের পর থেকে। ব্রিটেনে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল বিজ্ঞানী ডঃ এম ভি. ওয়াইস্-এর দ্বারা পরিচালিত হয়ে 'এডস্যাক' (EDSAC) নামে একটি কমপিউটার সর্বপ্রথম গাণিতিক ও ব্যবসাভিত্তিক কাজের জন্য বাজারে ছাড়েন। এ ধরনের কমপিউটারগুলোতে থাকতো থার্মোআয়োনিক ভালব্ বা ডায়ড (Diode)। এগুলো ভিতরে থাকবার ফলে কমপিউটারের ভেতরে প্রচুর তাপের সৃষ্টি হতো এবং প্রায় ক্ষেত্রেই কমপিউটারগুলো বিকল হয়ে পড়ত। এ কমপিউটার-গুলোকে কমপিউটারের প্রথম পুরুষ বলা হয়। এরপর 1956—1965 খৃস্টাব্দে সিলিকন ট্রানজিস্টারের জন্ম হলো এবং সেগুলো কমপিউটারের ভালবের পরিবর্তে ব্যবহার করে অনেক সুবিধাজনক ফল পাওয়া গেল। এদের গতি আরও বাড়ল এবং যেহেতু বিকল হওয়ার অবস্থা খুব কম সেহেতু এই কমপিউটারগুলো আরও অনেক বেশী আস্থাবান হলো। এ-গুলোকে বলা হত কমপিউটারের দ্বিতীয় পুরুষ। এই কমপিউটারগুলো আকারেও অনেক ছোট হল। এরপর 1965 খৃস্টাব্দে এক ধরনের সিলিকন ধাতব চিপ্‌সের জন্ম হলো যার ফলে কমপিউটার আরও ক্ষমতাসম্পন্ন ও গতিশীল হয়ে উঠল। আকার আরও ছোট হয়ে উঠল এবং 1970 খৃস্টাব্দে মিনিকমপিউটারের জন্ম হল। এ ধরনের কমপিউটারকে বলা হত কমপিউটারের তৃতীয় পুরুষ। এই সিলিকন চিপ্‌স পরবর্তী-কালে আরও অনেক বেশী উন্নত হলো এবং এম. ও. এস. টেকনলজীকে প্রয়োগ করে মাইক্রো-কমপিউটারের জন্ম হল।

তাহলে লক্ষ্য করে দেখা যাচ্ছে যে কমপিউটারের ধাপে ধাপে উন্নতির পর ব্যাপকভাবে যে প্রগতি; সেই প্রগতির চাবিকাঠি হল চিপ্‌স।

1959 খৃস্টাব্দে পৃথিবীতে ইলেকট্রনিক গবেষকদের হাতে এর জন্ম। মানুষের হাতের কোড়াআঙুলের ডগার মতো একে দেখতে, অত্যন্ত হালকা। কাঠামোটা সিলিকন ধাতু দিয়ে তৈরী। সিলিকন যেহেতু সমুদ্রের বালি থেকে অজস্র পাওয়া যায়। এ জন্য এই চিপ্‌সের দাম খুব সস্তা।

চিপ্‌স-এ কি থাকে? এতে থাকে অসংখ্য ইলেকট্রনিক সার্কিটের সমন্বয় এবং বেশ কিছু ইলেকট্রনিক সুইচ যেগুলো ইলেকট্রিক কারেন্টকে কনট্রোল করতে পারে এবং এগুলো সিলিকনের উপর বেষ্টন করা থাকে।

এই চিপ্‌সের ক্ষমতা অসীম। একটি এক ইঞ্চির সিকি ভাগ আকারের ইলেকট্রনিক চিপ্‌স প্রায় এক লক্ষ ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশকে কনট্রোল করতে পারে। এক সেকেণ্ডে এক লক্ষ গণনার কাজ করতে পারে এবং 1950 খৃস্টাব্দে যে সমস্ত কমপিউটার আবিষ্কৃত হয়, সেই কমপিউটারের থেকে এই চিপ্‌স প্রয়োগ করা কমপিউটারগুলো প্রায় 200 গুণ গতিময়।

কি ভাবে এই চিপ্‌স তৈরি হয় সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক। নীচের চিত্র দেখুন।

পৃথিবীতে যেমন অফুরন্ত অক্সিজেন পাওয়া যায়—তেমন অফুরন্ত সিলিকন পাওয়া যায়। তবে এই সিলিকন কোয়ার্টজ্ রক (Quartz rock) থেকে সাধারণত সংগ্রহ করা হয় সাধারণত দক্ষিণ ক্যারোলিনাতে এই কোয়ার্টজ্ পাওয়া যায়।
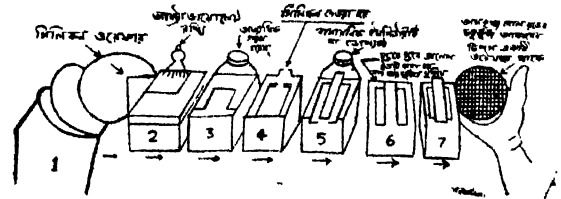
সিলিকন ওয়েফার থেকে কিভাবে চিপ্‌স তৈরি হয়।

গলিত অবস্থায় এগুলোকে গোলগোল করে টুকরো করা হয়, যাদের বলা হয় ওয়েফার (WAFER)।

1. এই ওয়েফারের উপর হাজার হাজার অণুবীক্ষণ আকারের ট্রানজিস্টার ফটোরেজিষ্ট (Photoresist) নামক এক প্রকার প্লাস্টিক ধরনের রাসায়নিক প্রলেপ দেওয়া হয়।

2. এরপর এটিকে স্টেনসিল কাগজে জড়িয়ে তার উপর আলট্রা ভায়লেট রশ্মি (Ultra violet rays) লাগান হয়।

3. সেখান থেকে আর একটি চেম্বারে নিয়ে গিয়ে তার মধ্যে দিয়ে এক ধরনের ব্যাপক গরম গ্যাস (Super heat gas) প্রয়োগ করা হয়। এর ফলে 'অ্যাসিড', 'সলভেন্ট' বা অতিরিক্ত 'ফটোরেজিস্ট' এসব কিছু নষ্ট হয়ে যায়।

4 আরও সিলিকনের মধ্যে এগুলো বারবার লাগান হয়।

5. এরপর রাসায়নিক পদার্থ সংমিশ্রণ করে ধনাত্মক (Positive) এবং ঋণাত্মক (Negative) পরিবাহক কেন্দ্র তৈরি করা হয়।

6. উপরের পদ্ধতি বারংবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে করার ফলে বিভিন্ন স্তর তৈরি হয়।

* দি সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল, 104 ডায়মণ্ড হারবার রোড কলিকাতা 700008

7. এরপর অ্যালুমিনিয়াম এদের মধ্যে প্রয়োগ করা হয় কারণ কোন ভেতরকার গ্যাপ বা ফাঁক থাকলে সেগুলো পূরণ হয়ে যায়।

8. ছবিতে দেখা যাচ্ছে ওয়েফারগুলোতে অসংখ্য লালরঙের চিপ তৈরি হয়ে বেরিয়ে আসে।

এই চিপস্ সারা পৃথিবীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যাপক উন্নতি করতে সাহায্য করেছে।

আমেরিকাতে ইটটা বিশ্ববিদ্যালয়ে (Utata University) এই চিপ্‌সকে মানুষের নার্ভ-এর মত তৈরি করা হয়েছে। যদি কোন ব্যক্তির আঘাত লাগে এবং দেহের অঙ্গ হানি হয় বা মস্তিস্ক ভেঙে যায়, সে ক্ষেত্রে এই চিপস্ নার্ভগুলো প্রয়োগ করে মানুষের স্বাভাবিক জীবনকে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। পেসমেকার, রেডিও, রোবট, গাড়ীর ইঞ্জিনে এই চিপ্‌স ব্যবহার করা হচ্ছে।

ব্রিটেন, আমেরিকা ও জার্মানীতে প্রতিটি ঘরে ঘরে পারসোন্যাল কমপিউটার সাড়া জাগিয়েছে। 200টি 100 পৃষ্ঠার সাহিত্য পুস্তকে যা তথ্য থাকে একটি সিলিকন চিপ্‌স সেই তথ্য ধরে রাখতে পারে।

আধুনিক ইলেকট্রনিক শিল্পে প্রয়োগ হিসেবে এই চিপ্‌ স্থপতিদের কমপিউটারে নক্সা, প্ল্যান, কোয়ার্ট্‌জ্ ইলেকট্রনিক ঘড়ি প্রভৃতি হাজার রকমের কাজ করে দিতে পারে। চিপ্‌সকে সঠিক ভাবে প্রয়োগ করে আমেরিকাতে এক ধরনের রোবট তৈরি করা হয়েছে; সেগুলো মারাত্মক শক্তিশালী। 30টি রোবট মিলে একটি গাড়ীর কোম্পানীতে অতি দক্ষতার সঙ্গে অত্যন্ত অল্প সময়ে গাড়ী তৈরি করে দিচ্ছে। হাসপাতালে রোগ নির্ণয় করার যন্ত্র থেকে আরম্ভ করে মহাকাশ এবং সমুদ্রের নীচে ইলেকট্রনিক্স এর সর্বক্ষেত্রে চিপ্‌স একমাত্র অবলম্বন।

জাপানে এমন এক ধরনের কমপিউটার তৈরি করার কথা ভাবা হচ্ছে যে কমপিউটার চিন্তা করতে পারে (Thinking Computers), কৃত্রিম বুদ্ধি (Artificial Intelligence)-কে প্রয়োগ করে এক ধরনের কমপিউটার জাপানীরা পৃথিবীর বুকে ফেলছেন, যে কমপিউটার কথা বুঝতে পারে, প্রশ্ন করতে পারে, মানুষকে নির্দেশ দিয়ে কাজও করিয়ে নিতে পারে এবং মানুষের সাহায্য ছাড়াই কোন কোন ক্ষেত্রে নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

জাপানে প্রতিটি ঘরে ঘরে ইলেকট্রনিক্স শিল্পের ব্যাপক অগ্রগতি। ছোট ছোট দোকানে কাঁচের জারের মধ্যে রং বে-রং-এর চিপস্ সাজানো থাকে; দেখে মনে হবে লজেন্স, টফি ইত্যাদি। মনে হয় চকলেট, লজেন্স বা টফির থেকে এই চিপ্‌সের চাহিদা অনেক বেশী।

খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য ঘাটতি ও পুষ্টিহীনতা দরিদ্র দেশগুলিতে লেগেই আছে। আমরা ভিটামিনযুক্ত ফল বলতে এখনও আপেল বা কমলাকে প্রাধান্য দিই। আর প্রোটিন বলতে মাছ-মাংসকেই বুঝি। এভাবে অজ্ঞতার জন্য আমরা দেশী ফল বা সব্জিকে যথেষ্ট দাম দিই না।

কয়েকটি পরিচিত ফল ও খাদ্যদ্রব্যে প্রতি 100 গ্রামে কত ভিটামিন, খনিজ উপাদান, খাদ্যশক্তি এবং প্রোটিন আছে তা নীচে উল্লেখ করা হল :

পাকা আমে ক্যারোটিন রয়েছে 2,743 মাইক্রোগ্রাম, আনারসে 1.830 মাইক্রোগ্রাম, কমলায় 1.100 মাইক্রো-গ্রাম এবং আপেলে নগণ্য পরিমাণ।

ভিটামিন 'সি' পাকা আমে আছে 16 মিঃ গ্রাঃ, আনারসে 21 মিঃ গ্রাঃ, কমলায় 30 মিঃ গ্রাঃ এবং আপেলে মাত্র 1 মিঃ গ্রাঃ। অবশ্য ভিটামিন 'সি'-র ব্যাপারে আমলকি আছে সবার আগে 600 মিঃ গ্রাঃ), এর পরই নাম করতে হয় পেয়ারা 212 মিঃ গ্রাঃ ও তেঁতুলের 108 মিঃ গ্রাঃ।

তেমনিভাবে আমরা প্রোটিন এবং অন্যান্য খনিজ উপাদানের হিসেব দিতে পারি। ডালজাতীয় খাবারের সঙ্গে মাছ-মাংসের তুলনা করা যায়—যেমন সয়াবিনে রয়েছে 43·2 গ্রাম প্রোটিন, মসুর ডালে 25·1 গ্রাম, মুগডালে 24·5 গ্রাম, এসকল ডালে ফসফরাস ও লৌহ জাতীয় উপাদান ছাড়াও আছে ভিটামিন বি-1, বি-2 এবং নায়াসিন।

অপরদিকে মাছ-মাংসে প্রোটিন ও ফসফরাস ছাড়া অন্যান্য উপাদান যেমন লৌহ বা ভিটামিন—নেই। কাজেই আমাদের খাদ্যাভ্যাসে যদি ডালজাতীয় খাবারের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বাড়াই তাহলে আমাদের দেশের দরিদ্র জনসাধারণ পুষ্টিহীনতার হাত থেকে রক্ষা পাবে। [আজকের বিজ্ঞান, ঢাকা—বাংলাদেশ]

সিঙ্গাপুর শহরের পরিবেশ উন্নয়নের মূল চারিটি নীতি

তারকমোহন দাস*

পরিবেশ উন্নয়নে সিঙ্গাপুরের সাফল্য পৃথিবীর সকল দেশেরই আজ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এই সাফল্যের মূল কারণগুলি কি তা সরেজমিনে দেখবার সম্প্রতি আমার সুযোগ হয়েছিল। পৃথিবীর অন্যতম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন শহর সিঙ্গাপুর। গত কয়েক দশকের মধ্যে এই ছোট দ্বীপময় দেশের শহরটি প্রায় অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে নিজের অবস্থা পাল্টে বর্তমান কালের যে কোন উন্নত দেশের সবচেয়ে সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন শহরের পাশাপাশি দাঁড়াবার গৌরব অর্জন করেছে।

পরিবেশ উন্নয়নে সিঙ্গাপুরের এই সাফল্য বলা হয়ে থাকে চারিটি থাম বা স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। এই চারিটি স্তম্ভের প্রথমটি হল দূষিত পদার্থ যেখানে সৃষ্টি হচ্ছে উৎস স্থানেই যথাসম্ভব তাকে নিয়ন্ত্রিত করা এবং দূষণ মুক্ত করা। মোটর গাড়ীর ধোঁয়া, কলকারখানায় উৎপন্ন দূষিত পদার্থের নিয়ন্ত্রণ এর মধ্যেই পড়ে। দ্বিতীয় স্তম্ভটি হল শহরের বাতাসে যে সব দূষিত পদার্থ অনিবার্য ভাবে এসে মিশছে তা থেকে শহরের মানুষকে বাঁচাবার জন্য প্রচুর গাছপালা লাগান ও বড় বড় সবুজ সুন্দর পার্ক সৃষ্টি করা। তৃতীয় স্তম্ভটি হল শহরের পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যরক্ষায় প্রতিটি নাগরিকেরই যে একটা নির্দিষ্ট ভূমিকা আছে, সেই ভূমিকাটি পরিষ্কার ভাবে তাদের বুঝিয়ে দেওয়া এবং সেই ভূমিকা পালনে তাদের নানাভাবে উৎসাহিত করা, এই ভূমিকা পালনে কেউ যদি গাফিলতী করে অর্থাৎ শহরকে নোংরা করে অথবা প্রতিবেশীর কোন রকম অসুবিধা সৃষ্টি করে তাহলে বেশ মোটারকম জরিমানারও ব্যবস্থা আছে। কোনরকম বে-আইনী কাজ—যেমন ফুটপাথ দখলকারী হকার বা ভিখারীর পালকে আদৌ পথের ওপর বসতে দেওয়া হয় না। চতুর্থ স্তম্ভটি হল শহরের প্রশাসনের সঙ্গে রাজনীতিকে মিশিয়ে না ফেলা। প্রশাসনের কোন ব্যাপারেই রাজনৈতিক নেতাদের নাকগলাতে না দেওয়া এবং রাজনীতির নামে মাস্তানী বন্ধ করা, অর্থাৎ—রাজনীতির ছত্রচ্ছায়ায় যাবতীয় বেআইনী কাজের সম্প্রসারণ বন্ধ করা।

বলা বাহুল্য এই নীতি বা principleগুলি আমাদের কলকাতা শহরের পক্ষেও প্রযোজ্য এবং এইগুলি কঠোর ভাবে অনুসরণ করলে এই শহরেরও ক্রমোন্নতি সম্ভব।

সিঙ্গাপুর যাবার আগে আমাদের কতকগুলি ভুল ধারণা ছিল, যেমন এখানকার সব মোটর গাড়ির ইঞ্জিনের সঙ্গেই বুঝি 'স্মোক অ্যাবসরবার' লাগান থাকে যাতে পেট্রল বা ডিজেলের ধোঁয়ায় বাতাস কলুষিত না হয়। ভাবতাম রাস্তার মোড়ে মোড়ে লাঠি হাতে পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে, রাস্তায় সিগারেটের টুকরো, দেশলাই-এর কাঠি বা কেউ থুথু ফেললেই 250 সিঙ্গাপুর ডলার (12শ টাকার মত) ফাইন করে দেবে, কিম্বা হলদে দাগের বাইরে দিয়ে রাস্তা পেরলেই থানায় ধরে নিয়ে যাবে। সিঙ্গাপুরে পৌঁছে কিন্তু সেরকম কিছু দেখলাম না।

খোঁজ-খবর নিয়ে দেখলাম গাড়ির ইঞ্জিনের সঙ্গে স্মোক অ্যাবসরবার লাগান এখানে বাধ্যতামূলক নয়, ঐ ধরনের কোন আইনও এখানে নেই। তবে গাড়ি থেকে যাতে সবচেয়ে কম ধোঁয়া বেরয় তার জন্য নানারকম প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা ও আইনকানুন আছে এবং সেগুলি অত্যন্ত কঠোর ভাবে পালন করা হয়। যেমন প্রতিটি গাড়ির ইঞ্জিন নিয়মিত ভাবে পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলেই রাস্তায় চলবার ছাড়পত্র পায়। গাড়ি একটু পুরান হলেই এই পরীক্ষা পর্বটি ঘনঘন চলে এবং 'রোড লাইসেন্স' দেবার বেলায় আরও কড়াকড়ি করা হয়। নতুন গাড়ির চেয়ে পুরান গাড়ি থেকে ধোঁয়া বেরয় অনেক বেশি, সে জন্য রাস্তায় যাতে বেশি সংখ্যায় নতুন গাড়ি চলে এবং সেইজন্য বিশেষ কয়েকটি ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে। যেমন গাড়ি বিক্রয় করা হয় দু-রকম দামে, একটি হল PARF স্কিম, অন্যটি হল ARF স্কিম। PARF স্কিম এর গাড়ি কিনলে দাম পড়ে অনেক কম, বছর বছর রোড লাইসেন্স-এর খরচাও পড়ে কম, কিন্তু দশ বছর পর ঐ গাড়ি আর ব্যবহার করা যাবে না, সেটা ফেরত দিয়ে দিতে হবে। ARF স্কিমে গাড়ি কিনলে দশ বছর পরেও ঐ গাড়ি ব্যবহার করা যাবে। তবে দাম দিতে হবে অনেক বেশি এবং ইঞ্জিন পরীক্ষার ব্যাপারটাও দশ বছর পর খুব কড়াকড়ি ভাবে করা হবে। তাই অধিকাংশ ব্যক্তিই দশ বছরের স্কিমে সস্তায় গাড়ি চালান। দশ বছর পর আবার নতুন গাড়ি কেনেন, পুরান গাড়ির ভিড় কমে যায়।

গাড়ির দাম সম্প্রতি খুব বেড়েছে, তবে আমাদের দেশের থেকে কম। PARF স্কিমে একটি সর্বাধুনিক মডেলের টয়োটা জাপানী গাড়ি দাম 85 হাজার টাকার মত। আমাদের দেশের গাড়ির থেকে এটি সর্ববিষয়ে ভাল এবং ইঞ্জিন থেকে ধোঁয়াও বেরয় খুব কম। রাস্তায় যদি অতি দ্রুত গতিতে গাড়ি চলে তাহলে এই ধোঁয়ার পরিমাণ হয় আরও কম। তাই সিঙ্গাপুরের অধিকাংশ রাস্তা ওয়ান ওয়ে, নয়ত ডবল লেন হাইওয়ে। অনেক জায়গায় যাত্রীবাহী বাস

* লাইফ সায়েন্স সেন্টার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

রাস্তার ওপর না থেমে একটি সরু রাস্তা ধরে যাত্রী তোলার জন্য ফুটপাতের ভেতর ঢুকে যায়। তার ফলে পেছনের গাড়িগুলির গতি একটুও কমাতে হয় না। রাস্তা পারাপার হবার জন্য বহু জায়গায় ফ্লাইওভার আছে। যেখানে নেই সেখানে নির্দিষ্ট হলদে দাগের মধ্য দিয়ে রাস্তা পেরতে হয়। এই দাগের বাইরে দিয়ে এলোমেলো ভাবে রাস্তা পার হলে বা রাস্তায় কোন রকম নোংরা ফেললে অবশ্যই মোটা জরিমানা দিতে হয়, কিন্তু তার জন্য রাস্তায় মোড়ে মোড়ে লাঠি উচিয়ে পুলিশ দাঁড়িয়ে নেই। রাস্তায় কোন হকার নেই বললেই চলে, নেই কোন ভিক্ষুক বা বালখিল্যের দল। শহরে জন সংখ্যার ঘনত্ব আমাদের শহরগুলির থেকে খুবই কম এবং সকলেই শিক্ষিত। তার ওপর নগর অধিকর্তাদের বার বার সতর্কবাণী। এইসব মিলিয়েই সিঙ্গাপুরের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন। সেই সঙ্গে সবুজ গাছপালার সঘন সমারোহ শহরকে মুক্ত রেখেছে দূষণ থেকে।

শহরকে পরিষ্কার রাখতে হলে শহরের রাস্তা থেকে হকার ও ভিখারিদের অন্যত্র সরাতে হবে। শহরবাসীদের জন্য তো বটেই, হকার ও ভিখারিদের কল্যাণের জন্যও এই সমস্যার অবশ্যই একটি স্থায়ী সমাধান খুঁজতে হবে। আজও দেখা যায় কলকাতা শহরের যে সব রাস্তায় হকার ও ভিখারিদের ভিড় নেই, যেমন গড়ের গড়ে মাঠের ডাফরিন রোড, দমদমের ভি-আই-পি রোড, লর্ড সিনা রোড, লাউডন স্ট্রীট, বালিগঞ্জ সারকুলার রোড, সেই সব রাস্তা অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার এবং তার জন্য বিশেষ কোন ব্যবস্থা নিতে হয় না। হকারদের জন্য সুপার মার্কেট ও ভিখারিদের জন্য কাজের বিনিময় স্থায়ী আশ্রয়স্থলের কথা আমরা ভাবতে পারি।

ট্যুরিজমই এদেশের প্রধান আয়ের উৎস, পৃথিবীর সমস্ত দেশ থেকে সারা বছর ধরেই এখানে দলে দলে পর্যটকরা আসেন। পর্যটকদের মনোরঞ্জনের জন্য সারা দেশটাই সুন্দর বাগানের মত সাজান। সিঙ্গাপুর শহরের পরিবেশ দূষণের পরিমাণ বিস্ময়কর মাত্রায় হ্রাস পাবার প্রধান কারণই হল রাস্তার দু-পাশে তৃণ ও বৃক্ষরাজির সঘন অবস্থান। সবুজ গাছপালার এমন ব্যাপক ও সুষম ব্যবহার আর অন্য কোন শহরে আমার চোখে পড়ে নি। পথের দু-পাশেই ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষরাজি ও তৃণাচ্ছাদিত বিস্তৃত আস্তরণ, তারপর বাড়ি ঘর, বহুতল সপিং সেণ্টার আধুনিক হোটেল, অফিস। এই গাছপালাগুলিকে নিয়মিত ভাবে দেখাশুনা করা হয়, দু-বেলা ফোয়ারার সাহায্যে চলন্ত জলের গাড়ি থেকে জল দেওয়া হয়। বহু মনোরম অর্কিডের আবাসস্থল এই সিঙ্গাপুর। গাছ ছাড়াও দু-পাশে ঘাসের আস্তরণ বিছিয়ে রাখাও এখানকার রাস্তাগুলির বৈশিষ্ট্য। রাস্তাগুলি অটোমোবাইলের ধোঁয়ার গন্ধের বদলে সবুজ গাছপালার স্নিগ্ধ গন্ধে ভরপুর থাকে।

সিঙ্গাপুর ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে অনুষ্ঠিত যে আন্তর্জাতিক জীববিজ্ঞানের কনফারেন্সে নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলাম সেখানে আমার বক্তব্য বিষয়ই ছিল কি ধরনের গাছ রাস্তার দু-পাশে লাগালে বায়ুদূষণ প্রতিরোধে আমরা সবচেয়ে সাফল্য অর্জন করতে পারি। গাছ ছাড়াও ঘাসঢাকা জমি ঐ বিষয়ে কিভাবে আমাদের সাহায্য করতে পারে তাও বর্ণনা করেছিলাম আমাদের পরীক্ষার ফলাফলগুলি তুলে ধরে। এই তথ্যগুলি পৃথিবীর বহু দেশের বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সিঙ্গাপুরের দূষণমুক্ত ঘন সবুজ পরিবেশ আমাকে এই বক্তব্য বোঝাতে যে সাহায্য করেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

সিঙ্গাপুর ছোট একটি দ্বীপ, 240 বর্গ মাইলের মত এর আয়তন, লম্বায় 60, চওড়ায় 40 মাইল। নিরক্ষরেখা থেকে মাত্র এক ডিগ্রি উত্তরে অবস্থিত, সুতরাং নভেম্বর মাসের দুপুরেও 32-34 ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতা ওঠে। অধিকাংশ হোটেল, ট্যাক্সি, বাস শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। বছরের কোন সময়ই গরম জামা কাপড় দরকার হয় না। সিঙ্গাপুর দ্বীপ এবং আশেপাশের ছোট আরও 54টি দ্বীপ নিয়ে 1965 খৃস্টাব্দে স্বাধীন সিঙ্গাপুর রিপাবলিক গঠিত হয়। সারা দেশের লোক সংখ্যা মাত্র 25 লক্ষ, তবু এটি পৃথিবীর তৃতীয় ব্যস্ততম বন্দর। এখানকার অধিকাংশ অধিবাসী চীনা এবং মালয়েশীয়। তবে ভারতীয় আছে বিস্তর। সিঙ্গাপুরের নামই হয়েছে এখানকার কিংবদন্তী অনুসারে আমাদের বিজয় সিংহ লঙ্কা জয়ের পর এখানে এসেছিলেন এবং এখানে সিংহের মত দেখতে এক জন্তু দেখতে পান সেই দেখেই তিনি এই দেশের নাম দিয়েছিলেন সিংহপুর বা সিঙ্গাপুর— সেখানকার সরকারি গাইডেও প্রথমেই এই গল্পের উল্লেখ আছে।

এখানকার স্কুল-কলেজে দুটি ভাষা শিখতে হয়, ইংরেজী অবশ্য পাঠ্য। সেই সঙ্গে তামিল, চীনা অথবা মালয়েশীয় ভাষা শিখতে হয়। এখানে বিভিন্ন ধর্ম ও বিভিন্ন ভাষাভাষী লোকেরা বেশ শান্তিতেই মিলেমিশে বসবাস করছেন। কোন জাতিগত, ধর্মীয় বা রাজনৈতিক তিক্ততা নেই। এখানকার রাষ্ট্রনায়ক লিকুয়ানিউ-এর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা প্রায় বাতিকের পর্যায়ে পৌঁছেছে। এজন্য পৃথিবীর অন্যান্য দেশে তাঁকে বলা হয় 'মিস্টার ক্লিন'। সিঙ্গাপুর আমাদের এত কাছে অথচ আমাদের থেকে কত দূরে। শহর যে কিভাবে পরিচ্ছন্ন

রাখা যেতে পারে এ দেশ না দেখলে ভাবাই যাবে না।

সিঙ্গাপুর শহরের পরিবেশ উন্নয়নের যে চারিটি নীতির কথা প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি পালনের জন্য যে খুব বেশী সরকারী বা জনসাধারণের পকেট থেকে খরচ হচ্ছে তা নয়, বরং শহর নোংরা কম হচ্ছে বলে এই খরচা কিছুটা কমেই গেছে। এই শহরের প্রধান শ্লোগানই হল Cleanliness is not expensive. কলকাতার অধিবাসীদের সামনে এই শ্লোগানের মূল বক্তব্যটি হাতে-কলমে পরীক্ষা করবার আজ সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে।

হিরোসিমা ও নাগাসাকি—চল্লিশ বছর আগে ও পরে

অমরনাথ রায়*

চল্লিশ বছর আগে জাপানের দুটি শহরের ইতিহাসে যে ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটে গিয়েছিল তা কি কোনদিন বিশ্ববাসী ভুলতে পারবে? আমি বলব, 'না'। ইতিহাসের পাতায় সেই বর্বরোচিত ঘটনা এক কলঙ্কময় অধ্যায়রূপে চিহ্নিত হয়ে আছে এবং থাকবেও চিরকাল।

হ্যাঁ, জাপানের 'হিরোসিমা' ও 'নাগাসাকি' শহর দুটির কথাই বলছি। 1945 খৃস্টাব্দের 6ই অগাস্ট। সময় সকাল আটটা বেজে পনের মিনিট। একটি আমেরিকান বোমারু বিমান হঠাৎ উড়ে এসে ঠিক ঐ সময়টিতে হিরোসিমা নগরে ফেলে গেল বিশ্বের প্রথম পারমাণবিক বোমা। হতচকিত হলো গোটা জাপান। প্রথম বোমার প্রচণ্ড ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার আগে, মাত্র তিনদিন পরেই অর্থাৎ 9ই অগাস্ট বেলা এগারোটা বেজে দু-মিনিট আরও শক্তিশালী একটি পারমাণবিক বোমা ফেলে গেল আরেকটি আমেরিকান জঙ্গী বিমান। এবারকার বোমাটি ফেলা হলো হিরোসিমায় নয়, জাপানেরই অপর একটি শহর নাগাসাকিতে। এবার স্তম্ভিত হলো গোটা বিশ্ব। বিশ্বের ইতিহাসে সেই প্রথম সূচনা ঘটলো পারমাণবিক অস্ত্র যুদ্ধের। ধিক্কৃত হলো আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, তার এই বর্বরোচিত কাজের জন্যে। প্রথম বোমাটির ক্ষমতা ছিল সাড়ে বারো কিলোটন 'ট্রাই নাইট্রোটলুইন' নামক প্রচণ্ড বিস্ফোরক পদার্থের সমতুল। আর দ্বিতীয় বোমাটির ক্ষমতা ছিল বাইশ কিলোটন ট্রাইনাট্রো টলুইন-এর সমতুল।

প্রচণ্ড বিধ্বংসী ক্ষমতাসম্পন্ন ঐ বোম দুটি ঐ জাপানী শহর দুটি এবং তার অধিবাসীদের কি রকম ক্ষতিসাধন করলো তার হিসাবনিকাশ করা যাক এবার।

বোমা দুটি বিস্ফোরণের পর মোট যে শক্তি নির্গত হলো, তার পঁয়ত্রিশ শতাংশ প্রকাশ পেল তাপশক্তিরূপে এবং পনের শতাংশ প্রকাশ পেল পারমাণবিক বিকিরণ শক্তিরূপে। বোমা বিস্ফোরিত হওয়ার পর আশেপাশের সব কিছুই গেল ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে জলে উঠলো আগুন, শুরু হলো প্রচণ্ড ঝড়। ধোঁয়া ও ধূলো দিয়ে গড়া ব্যাঙের ছাতা আকৃতির বিরাট মেঘ ছেয়ে ফেললো শহর দুটির আকাশ। ছত্রিশ ঘণ্টা যাবৎ সেই মেঘ শহর দুটির আকাশকে রাখলো ঢেকে। বোমা বিস্ফোরণের ফলে তেজস্ক্রিয় বাষ্প ছড়িয়ে পড়লো দূর থেকে দূরান্তরে—শহর দুস্তর আকাশে বাতাসে। প্রচণ্ড তাপ শক্তি ও তেজস্ক্রিয় বাষ্পের প্রভাবে অগণিত মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর দেহবিকৃতি ও মৃত্যু ঘটলো।

বোমা দুটি ভূপৃষ্ঠের যে যে জায়গায় পড়েছিল, সেই সব জায়গার সাড়ে তিন থেকে চার কিলোমিটার দূরে যে সব মানুষ ছিল, প্রচণ্ড তাপে তাদের গায়ের চামড়া পুড়ে ও ঝলসে গেলো। বোমা পড়ার স্থানগুলির 1020 মিটার থেকে 1200 মিটার দূরত্বের মধ্যে যে সব মানুষের ছিল বাস, তারা 400 'র‍্যাড' (তেজস্ক্রিয় বিকিরণ, যা দেহকলায় শোষিত হয় – তা পরিমাপের একক হলো 'র‍্যাড')। পরিমাণ তেজস্ক্রিয় রশ্মির প্রভাবে মারা গেল। শহর দুটির রাস্তায় রাস্তায় পড়ে রইলো শত সহস্র মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মৃতদেহ। কারুর দেহ পুড়ে কালো হয়ে গেছে, কারুর চোখ থেকে অক্ষি-গোলক পড়েছে খসে, কারুর বা মাথা ও দেহ থেকে লোম গেছে ঝরে। ওদিকে শহরের অট্টালিকাগুলি ভেঙ্গেচুরে ভূমিসাৎ হয়ে গেছে, রেলস্টেশনগুলি পরিণত হয়েছে কড়ি-কাঠের কঙ্কালে, বাড়ির দরজা জানালাগুলি ভেঙ্গে চুরে উড়ে গিয়ে ছিটকে পড়েছে দূরে, গাছপালা মাটিতে উপড়ে পড়েছে মুখ থুবড়ে। সেই ভয়াবহ দিনগুলিতে শহর দুটিতে না ছিল বিদ্যুৎ, গ্যাসের আলো অথবা জল। ছিল না কোন চিকিৎসা

* T-99A, সিটি ট্রাফিক, পোঃ—ইন্ডা, খড়্গপুর, মেদিনীপুর

ব্যবস্থা। থাকবেই বা কি করে? সবই তো ভেঙ্গেচুরে তছনছ হয়ে গেছে। কে কাকে দেখে! তবুও কিছু কিছু আহত মানুষের চিকিৎসা হয়েছিল, মসৃণ কাপড় টিংচার আয়োডিনে ভিজিয়ে তা ক্ষতস্থানে লাগিয়ে। ব্যাস্, এইটুকুই। বোমা পড়ার চার মাসের মধ্যে হিরোসিমায় একলক্ষ চল্লিশ হাজার মানুষ এবং নাগাসাকিতে ষাট হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল। পরবর্তী পাঁচ বছরের মধ্যে সর্বসাকুল্যে মারা গিয়েছিল ঐ দুই শহরের আরও এক লক্ষ মানুষ!

তেজস্ক্রিয় রশ্মির গৌণ প্রভাব দেখা দিয়েছিল শহর দুটির অধিকাংশ মানুষের উপর। অনেকেই হারিয়েছিল মাথার চুল, অনেকের সারা দেহে ফুটে উঠেছিল রক্তের ফোঁটা ফোঁটা লাল দাগ, কারুর হয়েছিল প্রচণ্ড জ্বর, কেউ কেউ বা রক্তবমি করেছিল। কারুর কারুর আবার আঙুলের নখের ডগা দিয়ে ঝরেছিল রক্ত। বোমা পড়ার পর জাপানী শহর দুটির বাসিন্দাদের প্রথম পুরুষের অনেকেই হারিয়েছিল দৃষ্টিশক্তি, কারুর কারুর দেহের হাত-পায়ের হাড়ের জোড়গুলি গিয়েছিল খুলে, আবার কারুর কারুর বা দেখা দিয়েছিল 'মঙ্গোলিসম' ও অন্যান্য সংক্রামক রোগ। কিন্তু যে সব শিশু তখনও ভূমিষ্ঠ হয় নি, তাদের উপর তেজস্ক্রিয় রশ্মির প্রভাব পড়েছিল কতটা?— পরবর্তীকালে দেখা গিয়েছিল যে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর ঐ সব শিশুদের মাথাগুলি হলো অস্বাভাবিক রকম ছোট, আবার অধিকাংশই আক্রান্ত হলো দুরারোগ্য লিউকেমিয়া রোগে। জাপানের স্বাস্থ্য দপ্তরের এক প্রতিবেদনে প্রকাশ পেল যে, পারমাণবিক বিস্ফোরণের পর হিরোসিমা ও নাগাসাকির নাগরিকদের তিন পুরুষের মানুষদের প্রতি পাঁচজনের মধ্যে কম পক্ষে একজন করে তেজস্ক্রিয় রশ্মির প্রভাবজনিত অস্বাভাবিক রোগে ভুগছে। তেজস্ক্রিয় রশ্মির কবলে যারা পড়েছিল আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে, তাদের বংশধরেরা এখনও ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে জীবন কাটাচ্ছে—না জানি তাদের বংশধরেরাও যদি বা বিকলাঙ্গ বা পূর্বপুরুষদের মত অস্বাভাবিক কোন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে!

পারমাণবিক বোমার আঘাতে বিধ্বস্ত শহর দুটির ক্ষতস্থানগুলি বিগত চল্লিশ বছর সময়ের মধ্যে গেছে শুকিয়ে। চূর্ণবিচূর্ণ ঘরবাড়ি, পথঘাট, সেতু, দোকানপাট, রেলস্টেশন, মন্দির— সবই পুনর্নির্মিত হয়েছে। এখন শহর দুটিকে দেখলে কে বলবে, আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে এই শহর দুটিই পরিণত হয়েছিল ধ্বংসস্তূপে।

শহর দুটির ক্ষতস্থান নিরাময় হলেও শহরবাসীদের দৈহিক ও মানসিক ক্ষতের সম্পূর্ণ নিরাময় আজও হয় নি। পরবর্তীকালের হিরোসিমা ও নাগাসাকিবাসীদের উপর তেজস্ক্রিয় রশ্মির প্রভাব আর কতটা প্রকট হয়ে উঠবে তা এখনও অজানা।

শল্যচিকিৎসায় নতুন দিগন্ত

মনে করুন হঠাৎ এক দুর্ঘটনায় আপনার ডান হাতটি সম্পূর্ণ থেঁতলে গেল ডাক্তার বললেন এটি কেটে বাদ দেয়া ছাড়া উপায় নেই। হাত কেটে ফেলা হলো, তারপর তিনি সেখানে জুড়ে দিলেন আরেকটি নতুন হাত। এই নতুন হাত আগের হাতের মতোই সব কাজ করতে লাগল।

শুনে অসম্ভব মনে হচ্ছে। শল্যবিদরা কিন্তু এমনি ধরনের চিকিৎসা খুব শীঘ্রই শুরু হবে— মনে করছেন। একমাত্র অসুবিধা হলো আমাদের দেহ অন্য লোকের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অনেক সময় গ্রহণ করতে চায় না। দেহের অনাক্রম ব্যবস্থা ভিন্ন দেহের কোষ প্রত্যাখ্যান করতে পারে। আজকাল এর প্রতিষেধক হিসাবে সাইক্লোস্পোরিন জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করে সাফল্যের সঙ্গে হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস প্রভৃতি অঙ্গ প্রতিস্থাপন করা সম্ভব হয়েছে।

গত এক দশকের মধ্যে দুটি নতুন ক্ষেত্রে শল্যচিকিৎসা বিপুল অগ্রগতি লাভ করেছে। তার একটি হল মাংসপেশীসুদ্ধ দেহের কোন অংশ থেকে চামড়া তুলে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তা অন্য কোন অংশে লাগিয়ে দেয়া। আরেকটি হল অতি সূক্ষ্ম অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেমন রক্তনালী, টেণ্ডন বা পেশী জোড়া লাগানো। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য নিয়ে এমন সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্থানান্তর করে অন্য জায়গায় সেলাই করে বসিয়ে দেয়া সম্ভব হচ্ছে যা আগে ছিল কল্পনারও অতীত।

আগামী দিনে যে শল্যচিকিৎসার আরো বিস্ময়কর অগ্রগতি ঘটবে তা আজ নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে।

[আজকের বিজ্ঞান, ঢাকা, বাংলাদেশ]

মহাকাশ যুদ্ধ

জয়ন্ত বসু*

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার আশ্চর্য অগ্রগতির ফলে মানুষের মহাকাশ অভিযান সম্ভব হয়েছে, যুগ যুগ সঞ্চিত কল্পনা রূপায়িত হয়েছে বাস্তবে। 1957 খৃস্টাব্দের 4 অক্টোবর তারিখে যখন মানুষের তৈরি প্রথম উপগ্রহ 'স্পুটনিক' মহাকাশ যুগের সূচনা করল, তখন থেকে 30 বছরেরও কম সময়ে মহাকাশ অভিযানে বহু নতুন উন্নততর পর্ব সংযোজিত হয়েছে, মানুষের কল্যাণে মহাকাশ বিজ্ঞানকে কাজে লাগানোর নানান পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়েছে। 1961 খৃস্টাব্দে মানুষ মহাকাশ থেকে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছে, 1969 খৃস্টাব্দে চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করে সগৌরবে ফিরে এসেছে পৃথিবীতে, মহাকাশের পরিবেশে বহুবার গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে সুদীর্ঘ কাল ধরে। মানুষের তৈরি মহাকাশযান শুক্র ও মঙ্গল গ্রহে অবতরণ করেছে, উড়ে গেছে বৃহস্পতি ও শনির কাছ দিয়ে, মানুষকে নানান তথ্য জানিয়েছে ঐ সব গ্রহ সম্বন্ধে। মহাকাশ বিজ্ঞানের সাহায্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধেও অনেক নতুন কথা জানা গেছে—যেমন, ব্রহ্মাণ্ডের কোথা থেকে কতখানি এক্স্-রশ্মি পৃথিবীর দিকে আসছে, মহাকাশযানে যন্ত্র পাঠিয়ে তা জানা সম্ভব হয়েছে; ভূপৃষ্ঠে তা জানা সম্ভব নয় বায়ুমণ্ডলের কল্যাণকর আবরণের জন্য। যোগাযোগের ক্ষেত্রে কৃত্রিম উপগ্রহ যুগান্তর এনেছে, বহুসংখ্যক টেলিফোন, টেলিভিসন ইত্যাদির সংকেত যোগাযোগ উপগ্রহের মাধ্যমে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পাঠানো যাচ্ছে। আবহাওয়া উপগ্রহের সাহায্যে আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনেকখানি সঠিক ভাবে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। ভূসম্পদ অনুসন্ধানের কাজেও কৃত্রিম উপগ্রহের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে।

এ সমস্তই হলো মহাকাশ বিজ্ঞানের উজ্জ্বল দিক, যার সম্পর্কে অল্পবিস্তর আমরা প্রায়ই শুনে থাকি। কিন্তু এই বিজ্ঞানের একটি অন্ধকার দিক আছে, যা বহুলাংশে জনসাধারণের অগোচরে। বস্তুত মহাকাশ বিজ্ঞান যেন হিমশৈলের মতন—এর যে অংশ দেখতে পাওয়া যায়, তার চেয়ে অনেক বড় অংশ আছে দৃষ্টির বাইরে; এই অংশটি সামরিক আয়োজনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, আজ পর্যন্ত যে প্রায় 2 হাজার কৃত্রিম উপগ্রহকে মহাকাশে পাঠানো হয়েছে, সেগুলির শতকরা 70 ভাগ বা তারও বেশি তৈরি হয়েছে কোন না কোন সামরিক উদ্দেশ্যে এবং যতখানি সম্ভব গোপনীয়তার অন্তরালে।

মহাকাশ বিজ্ঞানের সামরিক প্রয়োগ

যুদ্ধের প্রস্তুতিতে মহাকাশ বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রয়োগ সম্বন্ধে সাধারণ মানুষ সর্বপ্রথম কিছুটা সচেতন হন বছর আড়াই আগে—23 মার্চ 1983 তারিখে যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগন 'কৌশলগত রক্ষণাত্মক কর্মসূচনা' (Strategic Defence Initiative) বিষয়ে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন, যে বক্তৃতার বিষয়বস্তু 'Star Wars' বা নক্ষত্র যুদ্ধ নামে বিখ্যাত (সঠিকভাবে বলতে গেলে কুখ্যাত) হয়েছে। এই যুদ্ধ আসলে মহাকাশে ক্ষেপণাস্ত্র, কৃত্রিম উপগ্রহ ইত্যাদি ধ্বংস করবার লড়াই; যদি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেধে যায়, তবে এই মহাকাশ যুদ্ধ হবে তার একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। তবে 1983 খৃস্টাব্দের অনেক আগে—প্রকৃতপক্ষে মহাকাশ অভিযানের স্বল্প কাল পর থেকেই বিভিন্ন সামরিক ব্যবস্থায় মহাকাশ বিজ্ঞানকে কাজে লাগানো শুরু হয়েছিল। 1969 খৃস্টাব্দে মানুষের চাঁদে যাওয়া নিয়ে যখন আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল, তখন এই 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যায় (জুলাই, 1969) বর্তমান লেখকের 'মহাকাশ অভিযানের অন্ধকার দিক' নামক প্রবন্ধে মহাকাশ বিজ্ঞানের সম্ভাব্য অপপ্রয়োগ সম্বন্ধেও পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল। সেই প্রবন্ধে যে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছিল, তাই ক্রমশ বাস্তবে রূপ নিচ্ছে—যুদ্ধের প্রস্তুতিতে মহাকাশ বিজ্ঞানকে ক্রমশই বেশি করে ব্যবহার করা হচ্ছে।

প্রথমে ধরা যাক সেই সব উপগ্রহের কথা, যেগুলি পরোক্ষ ভাবে বহু দিন থেকে সামরিক প্রস্তুতির সঙ্গে যুক্ত। এমন অনেক উপগ্রহ মহাকাশে রয়েছে, যেগুলি গুপ্তচরবৃত্তিতে নিয়োজিত; বিপক্ষের ক্ষেপণাস্ত্র কেন্দ্র ও অন্যান্য সামরিক ঘাঁটির ছবি তুলে তারা যথাস্থানে পৌঁছে দিচ্ছে। আবার, কতকগুলি উপগ্রহ সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে বিপক্ষের ক্ষেপণাস্ত্রগুলির উপর; যদি এক বা একাধিক ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষিপ্ত হয়, তাহলে তারা যাতে তৎক্ষণাৎ স্বদেশের সামরিক কেন্দ্রকে সাবধান করে দিতে পারে তাদের মধ্যে সেইরকম ব্যবস্থা রয়েছে। কতকগুলি উপগ্রহের কাজ হল স্বপক্ষের ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষিপ্ত হলে তার দিগনির্ণয়ে সাহায্য করা। কয়েকটি যোগাযোগ উপগ্রহের উপর দায়িত্ব রয়েছে কেবলমাত্র সামরিক প্রয়োজনের চাহিদা মেটানোর।

মহাকাশে সরাসরি ভাবে ধ্বংসাত্মক কাজে যে সব ব্যবস্থা নিযুক্ত হতে পারে, সেগুলিকে মূলত দু-ভাবে ভাগ করা যায়—

* সাহা ইন্‌স্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা

এক, উপগ্রহ-বিরোধী ব্যবস্থা ; দুই, মহাকাশ-ভিত্তিক ক্ষেপণাস্ত্র বিরোধী ব্যবস্থা।

উপগ্রহ-বিরোধী ব্যবস্থা

এই ব্যবস্থাকে ইংরেজিতে বলা হয় 'Anti Satellite System', সংক্ষেপে ASAT (অ্যাস্যাট)। বর্তমানে অ্যাস্যাট-এর তৃতীয় প্রজন্ম চলেছে।

অ্যাস্যাট-এর প্রথম প্রজন্মের শুরু ষাটের দশকের গোড়ার দিকে। ক্ষেপণাস্ত্রের মাথায় নিউক্লীয় বোমা বসিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এমন ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিল, যার ক্ষমতা ছিল মহাকাশে বোমার বিস্ফোরণের মাধ্যমে বিপক্ষের উপগ্রহকে ধ্বংস করে দেবার। তবে এর অসুবিধা ছিল এই যে, ব্যবস্থাটি কার্যকর হতে পারতো অপেক্ষাকৃত অল্প দূরত্বে; তাছাড়া নিউক্লীয় বোমার বিস্ফোরণে মিত্রপক্ষের উপগ্রহেরও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

কয়েক বছরের মধ্যেই দ্বিতীয় প্রজন্মের অ্যাস্যাট-এর আবির্ভাব হল। ততদিনে রাশিয়াও আমেরিকার সঙ্গে পাল্লা দিতে শুরু করেছে। আমেরিকা ও রাশিয়া দু' পক্ষই এমন অ্যাস্যাট-এর সৃষ্টি করলো, যাতে বিস্ফোরক দ্রব্যে পূর্ণ উপগ্রহকে কাজে লাগানোর ব্যবস্থা ছিল। এই উপগ্রহকে বলা হত খুনী উপগ্রহ। যখন বিপক্ষের কোন উপগ্রহকে ধ্বংস করবার দরকার হবে, তখন ভূপৃষ্ঠ থেকে পাঠান নির্দেশ অনুযায়ী খুনী উপগ্রহ তার দিকে ধাবিত হবে এবং সংঘাতের মাধ্যমে তার ধ্বংস ঘটাবে, এই ছিল পরিকল্পনা। খুনী উপগ্রহ ব্যবস্থাকে ইংরাজীতে বলা হয় Killer Satellite System ; প্রথম অক্ষরগুলিকে নিয়ে আমরা সংক্ষেপে বলতে পারি KISS অর্থাৎ চুম্বন। এই উপগ্রহ এমন মরণ-চুম্বন দেয় যে, যাকে চুম্বন করে, তার তাৎক্ষণিক ধ্বংস অনিবার্য; আবার যে চুম্বন করে, তারও বিনাশ ঘটে সেই সঙ্গে।

তৃতীয় প্রজন্মের অ্যাস্যাট নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে। ব্যবস্থাটা হবে এই রকম :—F-15 নামক জঙ্গী বিমানের সঙ্গে সংলগ্ন থাকবে একটি দ্বি-পর্যায় রকেট এবং সেই রকেটের মাথায় বসান থাকবে একটি লক্ষ্য-ভেদকারী মহাকাশযান। বিপক্ষের যে উপগ্রহকে ধ্বংস করতে হবে, তার গতিবিধি অনুযায়ী সামরিক ঘাঁটি থেকে যে নির্দেশ পাঠানো হবে, সেই নির্দেশ অনুসারে বিমান আকাশে উঠবে এবং তাই থেকে যথা সময়ে রকেট উৎক্ষিপ্ত হবে। রকেট থেকে নিক্ষিপ্ত মহাকাশযান স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার লক্ষ্য স্থলে পৌঁছবে ও সংঘাতের মাধ্যমে উপগ্রহটিকে বিনষ্ট করবে।

গত বছর দু' বার উপরি-উক্ত উপগ্রহ-বিরোধী ব্যবস্থার প্রাথমিক পরীক্ষা হয়ে গেছে। এ বছর 13ই সেপ্টেম্বর এই অ্যাস্যাট-এর চূড়ান্ত পর্যায়ের পরীক্ষা সফল হয়েছে—মহাকাশে স্বদেশের একটি পুরনো বৈজ্ঞানিক উপগ্রহকে আমেরিকা অ্যাস্যাট ব্যবহার করে খণ্ড খণ্ড করে ফেলেছে। ঘটনাটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেওয়া হল :—

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার এডওয়ার্ডস সামরিক বিমানঘাঁটি থেকে উড়ে একটি F-15 বিমান প্রায় 12.3 কিলোমিটার (বা 40,000 ফুট) উচ্চতায় ওঠে এবং সেখানে বিমান থেকে উৎক্ষিপ্ত হয় 18 ফুট দীর্ঘ দ্বি-পর্যায় রকেট। সেই রকেট এক ফুট দীর্ঘ একটি ক্ষুদ্র মহাকাশযান রূপ বিধ্বংসী অস্ত্রকে মহাকাশের প্রয়োজনীয় উচ্চতায় পৌঁছে দেয়। অস্ত্রটিতে যে বহু অবলোহিত সংবেদক (Infrared sensor) ছিল, সেগুলির সাহায্যে লক্ষ্য উপগ্রহ থেকে আগত তাপ-রশ্মিকে ধরতে পেরে উপগ্রহটির অবস্থানের দিক জানা সম্ভব হয় এবং 56টি ক্ষুদে রকেটের সাহায্যে অস্ত্রটির গতি তার দিকে পরিচালিত হতে থাকে। অবশেষে প্রশান্ত মহাসাগরের উপর ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 550 কিলোমিটার উচ্চতায় সেই অস্ত্র উপগ্রহটিতে আঘাত হেনে তাকে ধ্বংস করে ফেলে। বিমান ঘাঁটি থেকে F-15 বিমানের ওড়া থেকে আরম্ভ করে অস্ত্রের আঘাতে উপগ্রহকে ধ্বংস করে ফেলা, এই সম্পূর্ণ ঘটনার জন্য কয়েক ঘণ্টা সময় লেগেছিল।

শোনা যাচ্ছে, আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র অ্যাস্যাট নিয়ে আর একটি পরীক্ষা করবে। কয়েক-বার পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর 1987 খৃস্টাব্দ থেকে ব্যবস্থাটি কার্যকর হবে বলে স্থির আছে। প্রায় 50টি F-15 বিমানে এজন্যে প্রয়োজনীয় সংস্কারাদি করা হচ্ছে। যেহেতু ভারত মহাসাগরে দিয়েগো গার্সিয়া, অস্ট্রেলিয়ার উত্তর-পশ্চিম অন্তরীপ প্রভৃতি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের সামরিক ঘাঁটি আছে, যেখান থেকে F-15 বিমান উড়তে পারে এবং যেহেতু জ্বালানী ফুরিয়ে এলে এ বিমানকে মাটিতে না নামলেও চলে, আকাশ-পথেই পেট্রোলবাহী বিমান থেকে এতে জ্বালানী ভরে দেওয়া যায়, সেজন্যে এই অ্যাস্যাট ব্যবহার করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে 2 হাজার কিলোমিটার উচ্চতার মধ্যে যে কোন স্থানেই বিপক্ষের উপগ্রহকে ধ্বংস করা সম্ভব।

এই অ্যাস্যাট-এর সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে বলতে হয়, এটি 2 হাজার কিলোমিটারের বেশি উচ্চতায় কার্যকর নয়। রাশিয়ার অ্যাস্যাট সম্বন্ধেও যতখানি খোঁজখবর পাওয়া গেছে, তাতে তারও এইরকম সীমাবদ্ধতা আছে বলে মনে হয়। কিন্তু বর্তমানে এমন বহু গুরুত্বপূর্ণ উপগ্রহ রয়েছে, যেগুলির অবস্থান অনেক বেশি উচ্চতায়—যেমন, ভূ-সমলয় (Geo-

synchronous) উপগ্রহগুলি থাকে 35,000 কিলোমিটার (বা 22,400 মাইল) উচ্চতায়। ভূপৃষ্ঠ থেকে শক্তিশালী রকেটের সাহায্যে লক্ষ্যভেদকারী মহাকাশযান পাঠিয়ে এরকম উপগ্রহকে হয়তো ধ্বংস করা যায় কিন্তু এভাবে উপগ্রহের কাছে পৌঁছতে যে কয়েক ঘণ্টা সময় লাগবে, সেই সময়ের মধ্যে বিপদের কথা জানতে পেরে এমন অবস্থানে উপগ্রহটির সরে যাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকবে, যাতে মহাকাশযান আর তার নাগাল পাবে না। এ ধরনের উপগ্রহের ধ্বংস নিশ্চিত করতে এমন অস্ত্রের প্রয়োজন, যার বিধ্বংসী উপাদান অত্যন্ত অল্প সময়ে ভূপৃষ্ঠ থেকে তার কাছে পৌঁছে যাবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে লেসার (Laser) অস্ত্রের কথা চিন্তা করা হচ্ছে। লেসার হলো এক বিশেষ ধরনের আলোর উৎস। এর আলো অত্যন্ত শক্তিশালী হতে পারে এবং বহু দূরেও সেই আলো সামান্য জায়গায় সংহত থাকে বলে তার তীব্র তেজে উপগ্রহকে ধ্বংস করে ফেলা সম্ভব। আমরা জানি, আলোর গতিবেগ বিপুল—এক সেকেণ্ডে 3 লক্ষ কিলোমিটার। সুতরাং উপগ্রহ 35 হাজার কিলোমিটার উচ্চতায় থাকলেও ভূপৃষ্ঠ থেকে তার কাছে পৌঁছতে লেসারের আলোর এক সেকেণ্ডের ভগ্নাংশ মাত্র সময় লাগবে। খবরে প্রকাশ, বর্তমান দশকের শেষের দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভূ-সমলয় উপগ্রহকে ধ্বংস করবার উপযোগী লেসার অস্ত্রের পরীক্ষা শুরু করবে।

ক্ষেপণাস্ত্র বিরোধী ব্যবস্থা

এই যে লেসার অস্ত্রের কথা বলা হল, ক্ষেপণাস্ত্রকে বিনষ্ট করবার জন্য তাকে ব্যবহারের প্রচেষ্টা ইতিমধ্যে অনেকখানি এগিয়ে গেছে। এই অস্ত্রকে সাধারণত কৃত্রিম উপগ্রহ, মহাকাশ-কেন্দ্র (Space Station) মহাকাশফেরীতে (Space Shuttle) রাখা হবে, যাতে সেখান থেকেই সরাসরি লেসার-রশ্মি নিক্ষেপ করা যায় বিপক্ষের ক্ষেপণাস্ত্রের দিকে। তবে এমন ব্যবস্থার কথাও প্রস্তাবিত হয়েছে, যাতে শক্তিশালী লেসার উৎস থাকবে ভূ-পৃষ্ঠে, তাই থেকে নির্গত রশ্মিকে পাঠানো হবে কক্ষপথে প্রদক্ষিণরত একটি 'রিলে দর্পণের' (Relay Mirror) দিকে, সেই দর্পণ আবার তাকে পাঠিয়ে দেবে কয়েকটি 'যুযুধান দর্পণে'র (Fighting Mirror) দিকে, যেগুলি সেই তীব্র রশ্মিকে নিক্ষেপ করবে বিপক্ষের ক্ষেপণাস্ত্রের উপর। এই ভাবে বহু ক্ষেপণাস্ত্রকে পর পর ধ্বংস করা যাবে।

মহাকাশ যুদ্ধের উপযোগী লেসার বিভিন্ন ধরনের হতে পারে—যেমন, হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড লেসার, ডিউটেরিয়াম ফ্লোরাইড লেসার, এক্সাইমার লেসার, মুক্ত ইলেকট্রন লেসার ইত্যাদি। এই সব লেসার থেকে দৃশ্য, অবলোহিত বা অতি-বেগুনি রশ্মি নির্গত হতে পারে। তা ছাড়া লেসারের পরবর্তী সংস্করণ হিসাবে এক্স্রেসার (Xrayser) তৈরি করবার চেষ্টা চলেছে। এই যন্ত্র থেকে অত্যন্ত শক্তিশালী মারাত্মক এক্স্-রশ্মি নির্গত হবে।

লেসারের দৃশ্য বা অদৃশ্য আলো নিরবচ্ছিন্ন হতে পারে অথবা নির্গত হতে পারে ঝলকে ঝলকে। লেসারের নিরবচ্ছিন্ন আলো কোন ক্ষেপণাস্ত্রের উপর নিক্ষিপ্ত হলে সেখানে স্বল্প সময়ের মধ্যে ছিদ্রের সৃষ্টি করে ক্ষেপণাস্ত্রটির বিনাশ সাধন করে। লেসারের আলো যদি ঝলকে ঝলকে নির্গত হয়, তবে তার আঘাতেই ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে পারে; যদি না হয়, তাহলে ক্ষেপণাস্ত্রের দেহে নিমেষের মধ্যে যে ছিদ্র উৎপন্ন হয়, তাতেই ক্ষেপণাস্ত্র বিনষ্ট হয়ে যায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র খবর দিয়েছে যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন শীঘ্রই একটি বিশাল লেসার অস্ত্রকে পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপন করবে। অপর পক্ষে আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঘোষণা অনুযায়ী 1983 খৃস্টাব্দে সেদেশের সামরিক কর্তৃপক্ষ নিজেরাই একটি লেসার অস্ত্র পরীক্ষা করেছেন। C-135 বিমানে রক্ষিত একটি লেসার অস্ত্র ব্যবহার করে 5টি বিমানবিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্রকে ধ্বংস করে ফেলা সম্ভব হয়েছিল বলে শোনা যায়। খোদ মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরের খবর অনুযায়ী এ বছর 6 সেপ্টেম্বর তারিখে নিউ মেক্সিকোর হোয়াইট স্যাণ্ডস ক্ষেপণাস্ত্র কেন্দ্রে একটি উচ্চশক্তিসম্পন্ন লেসার ব্যবহার করে 1 কিলোমিটার দূরে একটি বৃহৎ ক্ষেপণাস্ত্রকে বিধ্বস্ত করে দেওয়ার পরীক্ষা সফল হয়েছে।

লেসারের আলোর পরিবর্তে গতিশীল কণাগুচ্ছকে ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংসের কাজে ব্যবহার করবার কথাও চিন্তা করা হয়েছে। এই ব্যবস্থায় একটি বিশেষ যন্ত্র থেকে অত্যন্ত দ্রুতগামী বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ কণাগুচ্ছ নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বেরিয়ে আসবে এবং কোন ক্ষেপণাস্ত্রের উপর তা নিক্ষিপ্ত হলে ক্ষেপণাস্ত্রের দেহ ভেদ করে ভিতরে প্রবিষ্ট হয়ে আভ্যন্তরীণ যন্ত্রপাতি নষ্ট করে দেবে।

এসব ছাড়াও বিপক্ষের ক্ষেপণাস্ত্রকে ধ্বংস করবার জন্য খুনী মহাকাশযানকে ব্যবহার করা যেতে পারে। কৃত্রিম উপগ্রহ, মহাকাশ-কেন্দ্র বা মহাকাশফেরীতে রক্ষিত বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে ঐ যানকে অত্যন্ত দ্রুতগতিসম্পন্ন করে ক্ষেপণাস্ত্রের দিকে নিক্ষেপ করলে তার আঘাতে ক্ষেপণাস্ত্র বিনষ্ট হয়। অন্য একটি ব্যবস্থায় ঐ যানের পরিবর্তে স্বয়ংচালিত এমন রকেট নিক্ষেপ করা যেতে পারে, যা হয়তো নিজেই গিয়ে আঘাত করবে বিপক্ষের ক্ষেপণাস্ত্রকে বা যার মাথায় চাপানো থাকবে খুনী মহাকাশযান। ঐ যানকে তার লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব থাকবে রকেটের উপর।

প্রসঙ্গত বলা যায় যে, মহাকাশ যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিককালে উদ্ভাবিত মহাকাশফেরীর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে, কেননা এই ফেরী মানুষের নির্দেশ অনুসারে সহজেই মহাকাশে যাতায়াত করতে পারে—রকেটের সাহায্যে সে মহাকাশে যায় আর ভূপৃষ্ঠে নেমে আসে সাধারণ বিমানের মতন। এই ফেরীর সাহায্যে একদিকে যেমন ক্ষেপণাস্ত্র বিরোধী অস্ত্র মহাকাশে পাঠানো যায়, অন্যদিকে আবার মহাকাশে রক্ষিত অস্ত্রকে মেরামতি, উন্নয়ন ইত্যাদির জন্য পৃথিবীতে নিয়ে আসা সম্ভব। মহাকাশে এই ফেরী থেকে অপেক্ষাকৃত সহজে উপগ্রহের উৎক্ষেপণ সম্ভব হতে পারে, আবার এর সাহায্যে মহাকাশ থেকে উপগ্রহ সংগ্রহ করে পৃথিবীতে ফেরত নিয়ে আসা যায়। মহাকাশফেরী বিপক্ষের একাধিক উপগ্রহকে বন্দী করে কেবল অকেজো করেই দিতে পারে, তা নয়, তাদের সব গোপন রহস্য উদ্ঘাটনে সাহায্য করে অথবা বিশদ অনুসন্ধানের জন্য ভূপৃষ্ঠে স্বদেশের সামরিক ঘাঁটিতে তাদের নিয়ে আসতে পারে।

ক্ষেপণাস্ত্র-বিরোধী ব্যবস্থাকে সার্থক করতে হলে মহাকাশে বিপক্ষের সব ক্ষেপণাস্ত্র ও আক্রমণাত্মক বস্তুগুলির উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে। এ কাজ সম্ভব হতে পারে একমাত্র বিশাল কম্পিউটার যন্ত্রের সাহায্যে। এই ধরনের কম্পিউটারকে বলা হয় সুপার-কম্পিউটার বা অতি-কম্পিউটার। কম্পিউটারকে নির্দেশ দেবার জন্য যে কোড (Code) ব্যবহার করতে হয়, এক্ষেত্রে সেই কোডে থাকবে 10 কোটি লাইন ধরে পর পর নির্দেশ। বর্তমানে কম্পিউটারের জন্য যে বৃহত্তম কর্মসূচী (Programme) আছে, অতি-কম্পিউটারের কর্মসূচী হবে তার অন্তত 100 গুণ।

মহাকাশ যুদ্ধের প্রস্তুতি কেন

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রেগন যে Star Wars বা মহাকাশ যুদ্ধের কথা বলেছিলেন, তাতে ক্ষেপণাস্ত্র-বিরোধী ব্যবস্থাগুলির গুরুত্বের বিশেষ উল্লেখ ছিল। এই সব ব্যবস্থায় আমেরিকার অত্যধিক আগ্রহের প্রকৃত কারণ কী, তা একটু আলোচনা করা যেতে পারে। পৃথিবীর দুই বৃহৎ শক্তিধর রাষ্ট্র আমেরিকা ও রাশিয়ার হাতে যত নিউক্লীয় বোমা, ক্ষেপণাস্ত্র ইত্যাদি আছে এবং যেকোন মুহূর্তে যুদ্ধের জন্য সেগুলিকে যে ভাবে প্রস্তুত রাখা হয়েছে, তাতে বিশ্বযুদ্ধ বাধলে উভয় পক্ষেরই ধ্বংস যে অনিবার্য, তা নিশ্চিত করে বলা যায়। এই অবস্থাকে ইংরেজিতে বলা হচ্ছে 'Mutually Assured Destruction' সংক্ষেপে MAD। এখানে সংক্ষিপ্তকরণ ছাড়াও MAD শব্দটির তাৎপর্য এই যে, বর্তমান অবস্থায় কোন পক্ষ যদি যুদ্ধ বাধাতে চায়, তা হবে সম্পূর্ণ উন্মত্ততা।

আমেরিকা চাইছে এই অবস্থার পরিবর্তন করতে। ক্ষেপণাস্ত্র-বিরোধী ব্যবস্থাগুলির যদি সে সার্থক রূপ দিতে পারে, তাহলে সে তার ক্ষেপণাস্ত্রাদি দিয়ে রাশিয়াকে ধ্বংস করে দিলেও রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্রগুলি তার কাছে পৌঁছতে পারবে না। ফলে যুদ্ধের পরেও আমেরিকার বেঁচে থাকার ব্যাপারটা বেশ নিরাপদেই সম্পন্ন হবে—অর্থাৎ অবস্থা যা দাঁড়াবে, তাকে ইংরেজিতে বলা যেতে পারে 'American Secured Survival', সংক্ষেপে ASS। বস্তুত এই অবস্থার পক্ষে যাঁরা সওয়াল করেছেন, তাঁরা দম্ভসুলভ চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিচ্ছেন (হয়তো বা জেনেশুনেই, সাময়িক স্বার্থের খাতিরে)। কারণ প্রথমত, ক্ষেপণাস্ত্র-বিরোধী ব্যবস্থার আবার বিরোধী ব্যবস্থাও ইতিমধ্যে গড়ে উঠবে—বর্তমানে তার চেষ্টাও শুরু হয়েছে; দ্বিতীয়ত, সহজ হিসাব থেকে দেখানো যায় যে, বিশ্ব-যুদ্ধ বাধলে তার ফলাফল সীমিত থাকবে না, পৃথিবী জুড়ে ভয়াবহ প্রলয়ের সৃষ্টি হবে, কোটি কোটি মানুষের তাৎক্ষণিক মৃত্যু ও সুবিপুল ধ্বংস ছাড়াও তেজস্ক্রিয়তার বিষে সমস্ত পৃথিবীর জল-স্থল-অন্তরীক্ষ বিষময় হয়ে যাবে।

এখানে আমেরিকার কথা বিশেষভাবে বলা হচ্ছে এই কারণে যে, যুদ্ধের জন্য মহাকাশ বিজ্ঞানকে কাজে লাগানোর বিষয়ে আমেরিকা যে অগ্রণী, নানান বিশ্বস্ত সূত্রের খবর থেকে তা প্রমাণ করা যায়। এইরকম একটি সূত্র হচ্ছে আমেরিকা থেকে নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত 'Bulletin of the Atomic Scientists' নামক পত্রিকা। অস্ত্র পরীক্ষা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে এ বছর 19 সেপ্টেম্বর তারিখে জেনিভায় আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে যে আলোচনা শুরু হওয়ার কথা, তার মাত্র 6 দিন আগে আমেরিকা বিশ্বের জনমতকে উপেক্ষা করে মহাকাশ যুদ্ধের মহড়া হিসাবে অ্যাসাট-এর এক চূড়ান্ত পর্যায়ের পরীক্ষা সম্পন্ন করল। (এই পরীক্ষার কথা আগেই বলা হয়েছে)। আসন্ন আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিন কংগ্রেসের 98 জন সদস্যও প্রেসিডেন্ট রেগনকে একটি পত্র দিয়ে ঐ পরীক্ষা স্থগিত রাখবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা! প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মহাকাশে ও মহাকাশ থেকে অস্ত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ করবার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন 1983 খৃস্টাব্দের অগাস্ট মাসে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভায় একটি খসড়া চুক্তি পেশ করেছিল। ঐ বছরই নভেম্বর মাসে সেই খসড়া চুক্তির ভিত্তিতে মহাকাশে অস্ত্র প্রতিযোগিতা প্রতিরোধকল্পে সাধারণ সভায় যখন একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়, তখন 121টি দেশ সেই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয়, বিপক্ষে ভোট দেয় একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

পরোক্ষ কুফল

মহাকাশ যুদ্ধ যদি নাও হয়, এই যুদ্ধের প্রস্তুতির পরোক্ষ ফলগুলি যথেষ্ট ক্ষতিকারক হতে পারে। মহাকাশে কোন যান থেকে যদি লেসার বা ঐ ধরনের শক্তিশালী অস্ত্র চালনা করতে হয়, তাহলে তার জন্য সেখানে প্রয়োজনীয় শক্তির উৎস থাকা দরকার। সাধারণত যে বিপুল পরিমাণ শক্তির দরকার হয়—সামান্য সময়ের জন্য হলেও—সেই শক্তির যোগান দেবার প্রকৃষ্ট উৎস হচ্ছে নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টর বা নিউক্লীয় চুল্লী। মহাকাশ যুদ্ধের প্রস্তুতি যত বাড়বে, ততই বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন ও বেশি সংখ্যক নিউক্লীয় চুল্লীকে মহাকাশে পাঠান হবে। মহাকাশে নিউক্লীয় চুল্লী সম্পর্কিত গবেষণার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গত বছর (1984) দেড় কোটি ডলার বরাদ্দ ছিল। এখন যেখানে এইসব চুল্লীর ক্ষমতা 1 থেকে 25 কিলোওয়াট পর্যন্ত হতে পারে, আগামী 4/5 বছরে তাকে বাড়িয়ে 100 কিলোওয়াট করা হবে এবং তারপর বেশ কয়েক মেগাওয়াট পর্যন্ত করবার পরিকল্পনাও রয়েছে।

মহাকাশ নিউক্লীয় চুল্লী সমেত উপগ্রহে যদি দুর্ঘটনা ঘটে এবং সেই উপগ্রহ যদি বিনষ্ট হয়, তবে নিউক্লীয় চুল্লী থেকে তেজস্ক্রিয় পদার্থ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ে তাকে দূষিত করবে। এই রকম অন্তত 7টি উপগ্রহের ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে দুর্ঘটনা ঘটেছে। এগুলির কয়েকটি আমেরিকার, অন্যগুলি রাশিয়ার। প্রথম যে দুর্ঘটনার কথা জানা যায়, তা ঘটেছিল 1964 খৃস্টাব্দে। নিউক্লীয় চুল্লী সমেত আমেরিকার একটি কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে ভেঙে যায় এবং তার ধ্বংসাবশেষ ভারত মহাসাগরে পড়ে। এই দুর্ঘটনার ফলে বেশ কিছু প্লুটোনিয়াম-238 (মারাত্মক তেজস্ক্রিয় পদার্থ) বায়ুমণ্ডলে মিশে যায়। সমস্ত পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে সাধারণ ভাবে যে প্লুটোনিয়াম আছে, তা তিন গুণ বেড়ে যায় এর ফলে। মহাকাশ যুদ্ধের প্রস্তুতি চলতে থাকলে যুদ্ধ ছাড়াই বায়ুমণ্ডল কলুষিত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

মহাকাশ যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জামের জন্য কী বিপুল পরিমাণ অর্থের অপচয় হতে পারে, তা প্রায় আমাদের কল্পনার বাইরে। ক্ষেপণাস্ত্র বিরোধী ব্যবস্থা সম্পর্কিত গবেষণার জন্য প্রেসিডেন্ট রেগন আগামী 5 বছরে 26 বিলিয়ন অর্থাৎ 2,600 কোটি ডলার ব্যয়ের কথা বলেছেন। কেবল এই ব্যবস্থাকে যথাসম্ভব স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যয় হবে আনুমানিক একট্রিলিয়ন ডলার বা এক লক্ষ কোটি ডলার। টাকার হিসাবে প্রায় 12 লক্ষ কোটি টাকা। যে কোন যুদ্ধের মতন মহাকাশ যুদ্ধের জন্যও প্রয়োজনীয় টাকা আসবে সাধারণ মানুষকে শোষণ করে—কেবলমাত্র স্বদেশের মানুষকে নয়, পরোক্ষভাবে বিদেশের মানুষকেও। ফলে কিছু মানুষের মুনাফা বাড়লেও পৃথিবী জুড়ে অভাব-অনটন বেড়ে যাবে। মনে রাখতে হবে, এখনই পৃথিবীতে সামরিক খাতে দৈনিক ব্যয়ের পরিমাণ প্রায় 2,000 কোটি টাকা, যেখানে অন্যদিকে অনাহারে প্রতিদিন 40 হাজার শিশুর মৃত্যু হচ্ছে। পৃথিবীর 70 কোটি মানুষ অপুষ্টিতে ভুগছে, নিরক্ষরের সংখ্যা অন্তত 55 কোটি।

উপসংহারে আমরা বলতে পারি, আগামী বিশ্বযুদ্ধে মহাকাশকে একটি নতুন রণাঙ্গন রূপে ব্যবহার করবার চক্রান্ত করছে যুদ্ধবাজরা। এই চক্রান্তের ফলে স্বল্প কয়েকটি মানুষ বা গোষ্ঠীর সাময়িক স্বার্থসিদ্ধি হয় তো হবে কিন্তু সমগ্র পৃথিবীর পক্ষে এ এক মারাত্মক বিপদ ডেকে আনবে। এই চক্রান্তকে ব্যর্থ করতে হলে বিশ্বের জনগণকে সচেতন হতে হবে, সংগঠিত হতে হবে, সোচ্চার হতে হবে। একমাত্র এভাবেই মহাকাশ যুদ্ধ তথা বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ সম্ভাবনাকে প্রতিহত করা সম্ভব।

আবেদন

* নিজের পরিবেশকে দূষণ থেকে মুক্ত রাখুন।
* সকল প্রকার বন্যপ্রাণী ধ্বংস করুন।
* খরা, ভূমিক্ষয় ও পরিবেশ দূষণ রোধে বৃক্ষ রোপণ করুন।
* খাদ্য ও ঔষধে ভেজাল দেওয়ার বিরুদ্ধে দুর্বার জনমত গঠন করুন।
* সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান মানসিকতা গড়ে তুলুন।

কর্মসচিব

সৌরজগতের সৃষ্টির রহস্য

জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য*

বহু প্রাচীনকাল থেকেই জ্যোতির্বিদ্‌রা লক্ষ্য করেছিলেন যে রাতের আকাশের অসংখ্য তারাদের মধ্যে যেগুলিকে সবচেয়ে উজ্জ্বল লাগে, তাদের স্বরূপ অন্যদের থেকে বেশ আলাদা। সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে অন্যান্য তারাদের মত এরা স্থির নয়। প্রাচীন গ্রীক জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এদের নাম দিয়েছিলেন Planetis অর্থাৎ চলন্ত তারা যা থেকে ইংরাজী Planet কথাটির উৎপত্তি। ভারতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্রের ভাষায় এরা হলেন গ্রহ, যারা আকাশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে বিরাজ করেন। অন্যান্য তারাগুলির পারস্পরিক দূরত্বের প্রভেদ সাধারণ চোখে ধরা পড়ে না; কিন্তু তারা-মণ্ডলীর মধ্যে গ্রহগুলির চলা-ফেরা একটু নজর দিয়ে দেখলেই বোঝা যায়। যখন কোনও উজ্জ্বল তারার কাছাকাছি কোনও গ্রহকে দেখা যায়, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তার স্থান পরিবর্তন ধরা পড়ে। প্রাচীন জ্যোতির্বিজ্ঞান গবেষণার প্রায় সবটুকুই ছিল এই চলা-ফেরা মাপা এবং তার থেকে এদের স্বরূপ বুঝতে চেষ্টা করা।

খালি চোখে আরও একটা বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে; তারাগুলি একটু বেশী ঝিকমিক করে; গ্রহগুলি অপেক্ষাকৃত স্থির। এর কারণ আমাদের বায়ুমণ্ডলের অস্থিরতা। তারাগুলির কৌণিক মাপ এত কম যে, আমাদের চোখে যে আলোক রশ্মি কোনও একটি তারা দেখার সাড়া জাগায় সেটির সঙ্কীর্ণ গতিপথ প্রায় একটি সরলরেখায় বায়ুমণ্ডল অতিক্রম করে। এই গতিপথের যে কোন অংশে বাতাসের সামান্য আলোড়ন হলেই আলোর দিক বা মাত্রার পরিবর্তন হতে পারে। আমাদের চোখেই সেটাই তারার ঝিকিমিকি রূপে ধরা পড়ে। গ্রহগুলির কৌণিক বিস্তার বেশী হওয়ায়, এগুলির বিভিন্ন অংশ থেকে আসা রশ্মি-গুলি একই সময়ে একই ভাবে প্রভাবিত হয় না, তাই তাদের সম্মিলিত আলোতে স্পন্দনের মাত্রা অনেক কম লাগে।

লাপ্লাসের নীহারিকা কল্পনা

গ্রহগুলির আপাত কৌণিক বিস্তার যে অনেক বেশী এই সত্যটা কিন্তু প্রাচীন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ধরতে পারেন নি। এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিয়েছিলেন গ্যালিলিও তাঁর নবনির্মিত টেলিস্কোপ ব্যবহার করে। তিনি দেখিয়েছিলেন যে গ্রহগুলি চাঁদের মতনই গোল আর পার্থিব বস্তুতে গড়া। শুক্র গ্রহের

* ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব অ্যাস্ট্রোফিজিক্স, বাঙ্গালোর-560034

উজ্জ্বলতার কমাবাড়ার সঙ্গে চাঁদের কলাবিকাশের রূপের বেশ মিলটিও তাঁর টেলিস্কোপে ধরা পড়েছিল। বৃহস্পতির চারপাশে আবর্তমান উপগ্রহের সারি ও শনির বলয়ও দেখা সম্ভব হয়েছিল এই যন্ত্রের সাহায্যে। তারপর আরও বড় টেলিস্কোপ বানিয়ে আবিষ্কার হয়েছিল সৌরজগতের আরও দূরের গ্রহগুলি, আর তাদের উপগ্রহের দল।

বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক যন্ত্র এসেছে বিজ্ঞানীদের হাতে। ফোটোগ্রাফির প্রয়োগ অনেক আবিষ্কারকে সন্দেহাতীত করেছে; বর্ণালী বিশ্লেষণ অনাবৃত করেছে গ্রহগুলির অনেক গূঢ় তথ্য। রেডিও-তরঙ্গের জানালা খোলার পর অনেক অজানা প্রক্রিয়ার সন্ধান মিলেছে গ্রহগুলির আবরণ থেকে। সবশেষে সম্ভব হয়েছে মানবজাতির বহু শতাব্দীর স্বপ্ন। মহাকাশযানের যন্ত্রপাতি এনে দিয়েছে,অতি নিকট থেকে দেখা গ্রহগুলির রূপ।

কথাগুলি এক নিঃশ্বাসে বলা গেলেও এর পেছনে যে কতখানি সাধনার প্রয়োজন হয়েছে সেটা অকথিত থেকে যায়। আবিষ্কারগুলি আকস্মিকভাবে হয় নি; বিজ্ঞানের নতুন লব্ধ জ্ঞানগুলিকে প্রয়োগ করে বানাতে হয়েছে নতুন যন্ত্র, যার দ্বারা আরও সূক্ষ্ম নিরীক্ষণ সম্ভব হয়। বহু পর্যবেক্ষণ থেকে যুক্তিতর্ক বিচারে সত্যটিকে যাচাই করতে হয়েছে। বছরের পর বছর বিজ্ঞানীরা দ্বিধায় কাটিয়েছেন। যতক্ষণ না আরও স্থির নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেছে। সৌরজগৎ সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞানের জন্য আমরা সেই বহু যুগের বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠীর কাছে বিশেষভাবে ঋণী।

* * *

সৌরজগতের বস্তু পিণ্ডগুলি নিয়ে একটু বিবেচনা করা যাক। সূর্য অবশ্যই এর কেন্দ্র; 14 লক্ষ কিলোমিটার ব্যাসের এক জ্বলন্ত গোলক। আয়তনে পৃথিবীর পনের লক্ষ গুণের চেয়েও বড়; ভরে প্রায় তিন লক্ষ গুণ। এর অভ্যন্তরে অতি উচ্চ তাপমাত্রায় পারমাণবিক প্রক্রিয়া চলছে। হাইড্রোজেন পরমাণুগুলি পরিণত হচ্ছে হিলিয়াম পরমাণুতে; নির্গত হচ্ছে বিকিরণ শক্তি। সূর্য থেকে বিকীর্ণ তাপের মাত্র এক হাজার কোটি ভাগের এক ভাগ এসে পৃথিবীতে পৌঁছচ্ছে। সৃষ্টির আদিকাল থেকে মানবজাতি আজ পর্যন্ত যতখানি শক্তি কাজে লাগিয়েছে তার চেয়েও বেশী শক্তি তাপ বিকিরণের রূপে প্রতি সেকেণ্ডে সূর্য থেকে ছড়িয়ে পড়ছে।

সূর্য এত বিরাট, কিন্তু মহাবিশ্বের অন্যান্য-তারাদের তুলনায় একেবারেই নগণ্য। সূর্যের আয়তন বা তাপমাত্রা অনেক তারার তুলনায় অকিঞ্চিৎ। সূর্যের চেয়ে লক্ষগুণ বড় আয়তনের তারা অনেক দেখা যায়; পাওয়া যায় উচ্চতর তাপমাত্রা অনেক তারার আলোতে, যাদের বিকিরণ শক্তি সূর্যের শক্তির লক্ষগুণ বেশি। মহাবিশ্বের খাতায় সূর্যকে নাবালক হিসাবেই ধরা হয়; বয়স মাত্র পাঁচ-শ কোটি বছর। জীবনের সত্তর শতাংশ এখনও বাকী।

এই সূর্যই আমাদের জীবনের আরাধ্য দেবতা। যার মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সৌরজগৎকে বেঁধে রেখেছে; যার বিকিরণ শক্তি পৃথিবীতে প্রাণের সৃষ্টি ও বিকাশের অপরিহার্য সহায়। একে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে কয়েকটি বড় বস্তুপিণ্ড, যারা গ্রহ নামে পরিচিত এবং তাদের অনেকেরই বাইরে রয়েছে আবর্তমান উপগ্রহের দল। আরও আছে অসংখ্য ছোটখাট ক্ষুদ্র গ্রহ, আরও ছোট উল্কাপিণ্ডের রাশি, সূক্ষ্ম ধূলির কণা, হালকা ভাবে ছড়ানো গ্যাস ও সৌরকণিকার স্রোত। এ সমস্ত কিছু নিয়েই আমাদের সৌরজগৎ। সৌরজগতের প্রান্ত ছাড়িয়ে হয়ত রয়েছে ধূমকেতুর বেষ্টনী, যা থেকেই প্রায়ই দু-একটি ছিটকে সূর্যের কাছাকাছি এসে পড়ে।

সূর্যের বাইরে সৌরজগতের সমস্ত ভরই কিন্তু রয়েছে কয়টি গ্রহের মধ্যে। অন্যান্য বস্তুগুলি সংখ্যায় অনেক বেশী হলেও ভর সামান্যই; সব কিছু কুড়িয়ে বাড়িয়ে জড়ো করলে পৃথিবীর ভরের এক শতাংশও হবে না। তাই বলে অবশ্য এদের অবহেলাও করা যায় না। মহাকাশ যাত্রার বিস্তারিত পরিকল্পনায় এগুলি সম্বন্ধে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় এবং মহাকাশ যানগুলিতে প্রত্যক্ষ মাপজোকের যন্ত্রাবলীও থাকে। সূক্ষ্ম কণিকাগুলি উল্কাপাতের রূপে রাতের আকাশে প্রায়ই দেখা যায়; অপেক্ষাকৃত বড়গুলি মাঝে মধ্যে পৃথিবীর বুকে উল্কাপিণ্ডরূপে এসে পড়ে। ঐতিহাসিক সময়ের মধ্যেই যে বেশ বড় কয়েকটা বস্তুপিণ্ড পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিতে আকৃষ্ট হয়ে ভূস্তরকে বিধ্বস্ত করেছে তার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়।

জ্যোতির্বিদ্যায় সবকিছু মাপই বিরাট; বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মাপকাঠি আমাদের চেনা মাপকাঠিগুলির চেয়ে অনেক বড়। তাই মহাকাশের মাপগুলি কিলোমিটার বা মাইল দিয়ে গুণলে বিরাট সংখ্যায় দাঁড়ায়। সূর্যের মাপতো আগেই বলেছি: কিলোমিটার মাপে পৃথিবীর থেকে সূর্যের দূরত্ব হচ্ছে 15 কোটি, আর সবচেয়ে দূরের গ্রহ প্লুটোর দূরত্ব প্রায় ছয়-শ' কোটি। এত বড় সংখ্যার আমাদের ঠিক আন্দাজ হয় না। তাই একটা মডেল দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করা যাক।

মডেলটি গড়তে আমাদের স্কেল ছোট করতে হবে; মনে করা যাক মডেলটিতে একলক্ষ কিলোমিটারকে এক সেন্টিমিটার ধরা হয়েছে; এক কোটি কিলোমিটার তখন দাঁড়াবে এক মিটার মাত্র। তবুও মডেলটি বসাবার জন্য বিরাট ফাঁকা

জায়গার প্রয়োজন হবে। সূর্যের মাপ হবে 14 সেন্টিমিটার, একটা ফুটবলের চেয়েও ছোট, আর পৃথিবী থাকবে 15 মিটার দূরে একটা ছোট সরষের মত, ব্যাস 1·2 মিলিমিটার, চাঁদ থাকবে পৃথিবীর 4 সেন্টিমিটার দূরে, মাপ 0·3 মিলিমিটার। সবচেয়ে বড় গ্রহ বৃহস্পতি থাকবে 75 মিটার দূরে, মাপ 14 মিলিমিটার একটা ছোট মার্বেলের মত; আর প্লুটো থাকবে 600 মিটার দূরে, আধ মিলিমিটারের একটি ছোট্ট কণা। আমাদের চেনা গ্রহগুলির মাপ এই দুই সীমানার মধ্যেই নিবদ্ধ থাকবে। অন্যান্য ছোট বস্তুগুলির মাপ দেখানো সম্ভব হবে না; কিন্তু সৌরজগতের মডেলটি ছড়িয়ে থাকবে এক কিলোমিটারেরও বেশি ব্যাসের ফাঁকা মাঠের মধ্যে।

দেখা যাচ্ছে যে সৌরজগৎ একেবারেই ফাঁকা; অনেক দূরে দূরে ছড়িয়ে রয়েছে কয়েকটি গ্রহ, মাঝে বিরাট মহাশূন্য। এর মাঝে মাঝে যে ছোটখাট উল্কাপিণ্ড বা আরও বড় গ্রহাণু (Asteroids) ছড়িয়ে নেই তা নয় তবে সে সমস্তগুলো জড়ো করলে, সব মিলিয়ে একটা ছোট গ্রহের সমানও হবে না। কিন্তু সবকিছুই মাধ্যাকর্ষণের অদৃশ্য বন্ধনে বাঁধা সূর্যের সঙ্গে, যার অনির্বাণ দীপ্তি উদ্ভাসিত হয়ে রয়েছে সৌরজগতের প্রান্ত পর্যন্ত।

* * *

এই সৌরজগতের সৃষ্টি হয়েছিল কবে এবং কিভাবে তা নিয়ে বিজ্ঞানীরা বহু চিন্তা করেছেন। কিন্তু সবকিছু দেখা বৈশিষ্ট্য সুচারুরূপে ব্যাখ্যা করতে পারে এমন কোনও মতবাদ আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। পরিবেক্ষণ আর মতবাদগুলির অমিল কিরকম তার কিছু নমুনা দিচ্ছি।

সৌরজগতের বস্তুপিণ্ডগুলির চলাফেরার হিসাবগুলি যে প্রকৃতির মূল নিয়মে বাঁধা সে ব্যাপারটা ভালভাবেই প্রমাণিত। টাইকো ব্রাহের মাপজোক থেকে তাঁর ছাত্র জোহান্‌স্ কেপ্‌লার যে নিয়মাবলী তৈরি করেছিলেন, আইজ্যাক নিউটন প্রমাণ দিয়ে গেছেন সে সবগুলিই মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব থেকেই পাওয়া যায়। সৌরজগতের নয়টি গ্রহ, গোটা ত্রিশেক বড় উপগ্রহ, হাজার হাজার গ্রহাণু, সবগুলি একই দিকে ঘুরছে। পৃথিবীর উত্তর মেরুটি যে দিক নির্দেশ করে সেই দিক থেকে দেখলে সবকিছুই বামাবর্তে (Anticlockwise) ঘুরতে দেখা যায়। মাত্র দুটি গ্রহ ছাড়া সব কয়টি গ্রহেরই নিজ অক্ষের উপর ঘূর্ণন রীতিও ঐ একই দিকে। আর সবগুলির কক্ষপথ আবদ্ধ রয়েছে মহাশূন্যে এক সমতলের কাছাকাছি যার সীমারেখা তারামণ্ডলীর মধ্যে ক্রান্তিবৃত্ত (Ecliptic) নামে পরিচিত। এরকম ব্যাপার আকস্মিক ভাবে হওয়া সম্ভব নয়; মনে হয় কোনও আদিম পদার্থের স্রোত থেকে সব কিছু উদ্ভূত হয়েছে; সূর্যের নিজস্ব আবর্তনও ঐ একই রকম।

তাছাড়া গ্রহগুলির কক্ষপথের মাপ যেন কোনও মৌলিক নিয়মানুযায়ী সাজানো। নিয়মটি টিসিয়াস-বোড সম্পর্ক (Titius-Bode Relation) নামে খ্যাত। নীচের ছকটিতে সম্পর্কটিকে দেখানো হল। সৌরজগতের সৃষ্টি সম্বন্ধে কোনও মতবাদ সর্বজনগ্রাহ্য হওয়ার জন্য সম্পর্কটির একটি সন্তোষজনক ব্যাখ্যার নিতান্ত প্রয়োজন।

টিসিয়াস-বোড সম্পর্ক অনুযায়ী
গ্রহগুলির দূরত্বের তুলনা

গ্রহ	সূর্য থেকে দূরত্ব A.U.	বোড নিয়মানুযায়ী দূরত্ব A. U.	প্রভেদ
বুধ	0·39	0·40	−0·01
শুক্র	0·72	0·70	+0·02
পৃথিবী	1·00	1·00	0 00
মঙ্গল	1·52	1 60	−0·08
গ্রহাণুপুঞ্জ (কয়েকটি)	2·80	2·80	0·00
বৃহস্পতি	5·20	5 20	0·00
শনি	9·54	10·00	− 0·46
ইউরেনাস	19·20	19·60	− 0·40
নেপচুন	30·10	38·80	− 8·70
প্লুটো	39 50	77·20	−37·70

Titius-Bode Relation : $r=0{\cdot}4+0{\cdot}3\times 2^n$

n	
$-\infty$	বুধ
0	শুক্র
1	পৃথিবী
2	মঙ্গল ইত্যাদি

গ্রহগুলির মধ্যে উপাদানের বিন্যাসে বেশ সামঞ্জস্য দেখা যায়। সূর্যের কাছের গ্রহগুলি, অর্থাৎ বুধ, শুক্র, পৃথিবী ও মঙ্গল অপেক্ষাকৃত ভারী পদার্থে গড়া; বাইরে সিলিকেটের স্তর, আর ভিতরে হয়ত লৌহাদি জাতীয় কোনও ধাতুতে গড়া কেন্দ্র। এদের মাপগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট, আর উপগ্রহের সংখ্যা সীমিত। অন্যদিকে বাইরের বিরাট গ্রহগুলির মূল উপাদান বায়বীয়: হাইড্রোজেন, হিলিয়াম এবং মিথেন, অ্যামোনিয়া জাতীয় হাইড্রোজেনের কোনও যৌগ পদার্থে গড়া। প্রত্যেকটিই ঘন মেঘে ঢাকা এবং এদের সবগুলির চারপাশে রয়েছে উপগ্রহের দল আর বলয়াকৃতি বেষ্টনী।

এদের তিনটির অর্থাৎ বৃহস্পতি, শনি এবং ইউরেনাসের চার পাশে বলয়ের অস্তিত্ব ধরা পড়েছে এবং চতুর্থটিকে ঘিরে অনুরূপ বলয়ের সম্ভাবনা অনুমান করা হয়। আকার এবং আয়তনে এগুলি সূর্যের নিকটবর্তী পার্থিব গ্রহগুলি (Terrestrial Planets) থেকে বেশ বিভিন্ন; সৌরজগৎ সৃষ্টির মতবাদে এটিরও ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

অবশ্য সবই যে সাজানো তাও নয়, এর মধ্যে বহু গরমিল দেখা যায়। বৃহস্পতি ও শনি এই বড় গ্রহ দুটির আবর্তগতি প্রায় এদের কক্ষপথের সমান্তরাল থাকলেও, ইউরেনাসের অক্ষের বিন্যাস সম্পূর্ণ বিভিন্ন; পার্থিব গ্রহগুলির মধ্যে শুক্রও এইরকম দল ছাড়া। শনিগ্রহের বলয় এবং সব উপগ্রহগুলিই গ্রহটির বিষুবরেখার সমতলে আবদ্ধ, কিন্তু এর অষ্টম উপগ্রহটি ইয়াপেটাসের (Iapetus) কক্ষপথ বাঁকা। গ্রহাণুদের মধ্যে বেশ কয়েকটির কক্ষপথ ক্রান্তিবৃত্তের সমতল ছাড়া। উপগ্রহগুলি গ্রহগুলির মতই বামাবর্তে ঘুরলেও, বেশ কয়েকটি দক্ষিণাবর্তে পরিক্রমা করছে; এদের মধ্যে আছে বৃহস্পতির অষ্টম, নবম, একাদশ ও দ্বাদশ উপগ্রহগুলি, শনির নবম উপগ্রহ ফিবি (Phoebe), এবং নেপচুনের বিরাট উপগ্রহ ট্রিটন (Triton)। এছাড়া বহু ছোটখাট, কিন্তু নিশ্চিত ব্যতিক্রম অনেক গ্রহ উপগ্রহে দেখা যায়।

সৌরজগৎ সৃষ্টির নানা মতবাদগুলিকে মোটামুটি দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়: প্রথমটিতে মনে করা হয় যে, নীহারিকারূপী এক বিরাট আদিম পদার্থের মেঘ থেকে সৌরজগতের সৃষ্টি হয়েছে। এটিকে নীহারিকা কল্পন (The Nebular Hypothesis) বলা হয়। এ ধারণাটি বেশ পুরানো; অষ্টাদশ শতাব্দীর দার্শনিক ইম্যান্থয়েল কাণ্ট (Immanuel Kant) প্রথম ব্যক্ত করেছিলেন। পরে ফরাসী বিজ্ঞানী লাপ্লাস (Laplace) এটির গাণিতিক রূপ দিয়েছিলেন। আদিম নীহারিকাটি তারাজগতের সব কিছুর মতই ঘূর্ণমান ছিল এবং মাধ্যাকর্ষণজনিত সংকোচনের পথে কয়েকটি বলয়াকৃতি মেঘের সৃষ্টি করে। পরে সেই বলয়গুলি সংকুচিত হয়ে গ্রহগুলির জন্ম দেয়; মাঝের বস্তুপিণ্ডটি সূর্যে পরিণত হয়। মতবাদটি পরিবেক্ষিত তথ্যের খানিকটার মোটামুটি ব্যাখ্যা করলেও অনেক বৈশিষ্ট্যের কোনও সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারে নি। যেমন প্রকৃতির জানা নিয়মগুলি মেনে কেন বিশেষ বিশেষ দূরত্বে বলয়ের সৃষ্টি হবে এবং পরে সেই বলয়গুলি কেমন করে সংকুচিত হবে সে বিষয়ে কল্পনাটি নীরব। আর একটি বড় রহস্য সূর্যের ধীর আবর্তনের ব্যাপারটি। সূর্য নিজের অক্ষকে ঘিরে প্রায় সাতাশ দিনে একবার ঘুরছে। যদি সব কিছুই এক বিরাট আবর্তমান মেঘ থেকে উৎপত্তি হয়ে থাকে তবে এই আবর্তনের সময় লাগা উচিত ছিল একদিনেরও কম। যে অতিরিক্ত কৌণিক ভরবেগ (Angular Momentum) গ্রহগুলির মধ্যে রয়েছে, তার কারণ লাপ্লাসের হিসাবে পাওয়া যায় না।

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বর্তমান শতাব্দীর গোড়ায় চেম্বারলেন (Chamberlain) ও মোলটন (Moulton) দ্বিতীয় মতবাদটির অবতারণা করেন। এটিকে সংঘর্ষ কল্পন (Encounter Hypothesis) বলা হয়। তাঁদের মতে সব গ্রহগুলির সৃষ্টি হয়েছে সূর্যের জন্ম হওয়ার পরে। আকস্মিকভাবে আর একটি তারা খুব কাছে এসে সূর্যের খানিকটা অংশ চারপাশে ছড়িয়ে দিয়েছে। এতে কৌণিক ভরবেগের তারতম্যের সমস্যাটির খানিকটা প্রশম হয় বটে, কিন্তু গ্রহবেষ্টিত তারার সৃষ্টির সম্ভাবনা অনেক কমে যায়। এটি অনেক বিজ্ঞানীর মনঃপূত নয়; আধুনিক অবলোহিত এলাকার পর্যবেক্ষণগুলিতে দেখা যাচ্ছে যে বেশ কয়েকটি তারার চারপাশে ঠাণ্ডা পদার্থের মেঘের অস্তিত্ব রয়েছে। প্রত্যেক জায়গায় আকস্মিক সংঘর্ষের কল্পনা করা একটু শক্ত। অবশ্য সবকিছু বৈশিষ্ট্যের যে একই কারণ থাকবে এমন কিছুও বলা যায় না।

অনেক বিজ্ঞানী ঐ দুই মতবাদটির স্থানে স্থানে পরিবর্তন করে অন্য মতবাদ দিয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ অধ্যাপক ফ্রেড হয়েলের (Fred Hoyle) আন্তরিক বিবর্তনধারা কল্পন (Intrinsic Hypothesis)। তাতে চৌম্বক ক্ষেত্রের সাহায্যে সূর্য এবং গ্রহগুলির মধ্যে কৌণিক ভরবেগের বিনিময়ের ধারণা আনা হয়েছে। প্রত্যেকটি গরমিলের জন্য এক একটি আকস্মিক ঘটনার অবতারণা করে, একটা জোড়াতালি দেওয়া মতবাদ খাড়া করা যায়, কিন্তু সেগুলিকে সমর্থন করতে সৌরজগৎ সম্পর্কে আরও অনেক জ্ঞানের বিস্তারের প্রয়োজন।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের নজর এখন ঐ দিকেই। মহাকাশবিজ্ঞানের নানা প্রচেষ্টার একটি প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে সৌরজগতের আদিম ইতিহাসের খোঁজ করা। উল্কাপিণ্ডের মধ্যে মহাজাগতিক রশ্মির সঞ্চার রেখা থেকে আরম্ভ করে, চাঁদের জমি থেকে কুড়িয়ে আনা ঢেলাগুলির উপাদানের মধ্যে সৌর জগতের আদিম অবস্থার ইঙ্গিত খোঁজা হচ্ছে। এখনকার আকাশে যে ধূমকেতুটি পঁচাত্তর বছর বাদে ফিরে এসেছে, তার উপাদানের মধ্যে কিছুটা খোঁজ পাওয়া যাবে বলে বেশ কয়েকজন বিজ্ঞানীর দৃঢ় বিশ্বাস। এর সঙ্গে যোগাযোগের জন্য যে বিশেষ মহাকাশযানগুলি ছাড়া হয়েছে, তাদের যন্ত্রপাতির মধ্যে এই সম্বন্ধে খবর জোগাড় করার বিশেষ প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়।

আণবিক ছাঁকনী—জিওলাইট

বিশ্বনাথ দাস*

বিশেষ ধরণের কেলাস গঠনবিশিষ্ট অ্যালুমিনো-সিলিকেট গোত্রের অন্তর্ভুক্ত যৌগ জিওলাইটের নাম আজকাল প্রায়ই শোনা যায়। এই জিওলাইট কিন্তু কোন সুনির্দিষ্ট যৌগ নয়। বরং বলা যায়, কতকগুলি সাধারণ ধর্ম ও কেলাস গঠন-বৈশিষ্ট্য প্রকাশকারী অ্যালুমিনো সিলিকেট যৌগের শ্রেণীগত নাম জিওলাইট। 'পারমুটিট' নামে যে কৃত্রিম পদার্থটি জলের খরতা দূরীকরণের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে সেটিও এই শ্রেণীর যৌগ।

জিওলাইট পদার্থগুলির মূল গঠনে SiO_4 ও AlO_4 চতুস্তলক দ্বারা রচিত $(Si, Al)_nO_{2n}$ সংযুতির একটি জাল বোনা থাকে যার মধ্যে কিছু অতিরিক্ত ঋণাত্মক আধান থেকে যায়। এই ঋণাত্মক আধান প্রশমিত করার জন্য আবার উপযুক্ত সংখ্যক ধনাত্মক আয়ন অর্থাৎ ক্যাটায়নও বুননটির সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে থাকে। প্রায় অনুরূপ গঠনবিশিষ্ট ফেলস্পার শ্রেণীর অ্যালুমিনো-সিলিকেটের তুলনায় অবশ্য জিওলাইটের বুনন কিছুটা উন্মুক্ত প্রকৃতির হয় এবং এর ফলে কিছুটা আলগা ভাবে অন্যান্য অণুও (সাধারণ ভাবে জল) এদের কেলাস-অন্তর্বর্তী স্থানে ঢুকে পড়ে। এর ফলে মূল গঠনটির কিন্তু কোন পরিবর্তন হয় না।

গঠন ও সংযুতির দিক থেকে প্রাকৃতিক জিওলাইটগুলি প্রধানতঃ তিন ধরনের হয়ে থাকে।

(i) চারটি বা ছয়টি চতুস্তলক পরস্পর সংযুক্ত হয়ে প্রথমে এক একটি বলয় গঠন করার পর এই বলয়গুলি ত্রিমাত্রিক জালের আকারে সজ্জিত হতে পারে; যেমন—অ্যানালসাইট, $NaAlSi_2O_6 \cdot H_2O$।

(ii) চতুস্তলকগুলির ঠাসবুননে তৈরী এক একটি চাদর স্তরে স্তরে সজ্জিত হয়ে ফাটল বা ভাঁজযুক্ত প্লেটের আকার নিতে পারে; যেমন—হিউল্যানডাইট, $CaAl_4Si_{14}O_{36} \cdot 12H_2O$।

(iii) আঁশ বা তন্তু আকৃতিবিশিষ্ট হতে পারে যার মধ্যে চতুস্তলকগুলি শিকলের মত পরস্পর সংযুক্ত হয়ে থাকে; যেমন—ন্যাট্রোলাইট, $Na_2Al_2Si_3O_{10} \cdot 2H_2O$ এবং থমসোনাইট, $NaCa_2Al_5Si_5O_{20} \cdot 6H_2O$।

কৃত্রিম জিওলাইট—প্রস্তুতি

প্রকৃতিতে যে সব জিওলাইট পাওয়া গেছে সেগুলি ছাড়াও কিছুটা ভিন্ন ধরণের গঠনবিশিষ্ট জিওলাইট এখন কৃত্রিম ভাবে তৈরি করা হচ্ছে। এ বিষয়ে প্রথম সফল গবেষণা করেন অধ্যাপক ব্যারের। এই শতকের চতুর্থ দশকে, লণ্ডনে। অতঃপর 1954 খৃস্টাব্দে ইউনিয়ন কার্বাইড করপোরেশন আমেরিকার বাজারে দুই ধরণের জিওলাইট (A এবং X) বাজারে ছাড়েন। প্রধানতঃ আর্গন গ্যাসকে সম্পূর্ণরূপে অক্সিজেন মুক্ত করার কাজে এগুলি ব্যবহৃত হতে থাকে।

কৃত্রিম জিওলাইট তৈরি করা হয় সোডিয়াম সিলিকেট, সোডিয়াম অ্যালুমিনেট, ক্ষার (যেমন, কস্টিক সোডা) ও জল থেকে। মিশ্রণ থেকে প্রথমে গঠিত হয় কেলাস আকার বর্জিত, অর্থাৎ অনিয়তাকার অ্যালুমিনো-সিলিকেট হাইড্রো-জেল। উপযুক্ত তাপমাত্রায় (A এবং X শ্রেণীর জিওলাইটের জন্য 100°C) এই জেলটিকে উত্তপ্ত করলে এর থেকে OH^- আয়নের ক্রিয়ায় উৎপন্ন হয় সরলতর এবং দ্রাব্য অ্যালুমিনো-সিলিকেট। পরে এরা নতুন ভাবে পরস্পর সংযুক্ত হয়ে ধীরে ধীরে সুনির্দিষ্ট কেলাস গঠনযুক্ত জিওলাইটের দানা তৈরি করতে থাকে। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বা X রশ্মি ডিফ্র্যাকশন পদ্ধতিতে অনিয়তাকার হাইড্রো-জেল থেকে জিওলাইট কেলাসের ক্রমবিকাশ চমৎকারভাবে অনুসরণ করা যায়।

উৎপন্ন কেলাসিত পদার্থটির সাধারণ সংকেত হলো $M_{y/n}(SiO_2)_x(AlO_2)_y \cdot ZH_2O$, যেখানে M-ক্যাটায়নটির যোজ্যতা n এবং x, y ও z উপযুক্ত পূর্ণসংখ্যা। y-এর মান বিজোড় হলে এবং M একটি দ্বিযোজী আয়ন (যেমন, Ca^{2+}) হলে অন্ততঃ একটি একযোজী ক্যাটায়ন ও (যেমন, Na^+) উৎপন্ন পদার্থটির মধ্যে অন্যতম ঋণাত্মক আধান প্রশমনকারী উপাদান হিসাবে থাকবে। এই কারণেই থমসোনাইটের ক্ষেত্রে $y=5$ হওয়ায় এর মধ্যে দুটি Ca^{2+} এবং একটি Na^+ আয়ন বর্তমান থাকে।

গঠন ও ধর্ম

জিওলাইটের গঠনে SiO_4 চতুস্তলকের অন্তর্গত Si^{4+} আয়নগুলির আধান সম্পূর্ণরূপে প্রশমিত হয়ে থাকে। কিন্তু AlO_4 চতুস্তলকে Al^{3+} আয়নের আধান প্রশমিত হওয়ার পর অতিরিক্ত এক একক ঋণাত্মক আধান অর্জিত হওয়ায় প্রতিটি AlO_4-এককের জন্য একটি একযোজী ক্যাটায়ন (প্রধানতঃ Na^+) বা দুটি AlO_4-এর জন্য একটি দ্বি-যোজী ক্যাটায়ন (যেমন, Ca^{2+}) মূল জিওলাইট বুননের বহির্দেশে গৌণ গঠনে অবস্থান করে। এই আধান প্রশমনকারী ক্যাটায়নগুলি

* বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া

আবার সহজেই অন্যান্য একযোজী, দ্বিযোজী বা ত্রিযোজী ক্যাটায়ন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে থাকে। জিওলাইটের এই ধর্মকে বলা হয় ক্যাটায়ন বিনিময় ধর্ম। জলের খরতা দূরীকরণে আমরা জিওলাইটের এই ধর্মকেই কাজে লাগিয়ে থাকি।

জিওলাইটের গঠন কাঠামোর মধ্যে নির্দিষ্ট ব্যবধানে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র থেকে যায়। গঠন বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এই ছিদ্রগুলির ব্যাসার্ধ সাধারণতঃ 3 থেকে 15 Å (1 Å$=10^{-8}$ cm) সীমার মধ্যে থাকে। SiO_4 এবং AlO_4 চতুস্তলকগুলি বিভিন্ন ভাবে ও অনুপাতে যুক্ত হয়ে বিভিন্ন আকারের ছিদ্রপথযুক্ত জিওলাইট কেলাস গঠিত হয়। আবার AlO_4 চতুস্তলক সন্নিহিত অঞ্চলে আবদ্ধ ক্যাটায়নের আকার ও আধান অনুযায়ী এই ছিদ্রপথের ব্যাস কম বেশী হয়ে থাকে। জিওলাইট-A (Na A)-এর গঠনে কর্তিত অষ্টতলক আকারের অ্যালুমিনো-সিলিকেট এককগুলি বর্গক্ষেত্রীয় প্রিজ্‌মের মাধ্যমে এমন ভাবে পরস্পর সংযুক্ত হয় যে সংলগ্ন ক্যাটায়ন Na^+-এর উপস্থিতিতে ছিদ্রপথগুলির ব্যাসার্ধ 4 Å দাঁড়ায়। এই Na^+ আয়নগুলি K^+ আয়ন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হলে আমরা যে জিওলাইট পাই (KA) তার ছিদ্রপথের ব্যাসার্ধ কমে গিয়ে 3 Å হয় কিন্তু Ca^{+2} আয়ন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হলে (Ca A) ছিদ্রগুলি বড় হয়ে 5 Å ব্যাসার্ধবিশিষ্ট হয়ে থাকে। এইরূপ সছিদ্র গঠনের জন্যই ভিন্ন ভিন্ন ক্যাটায়ন সম্পৃক্ত জিওলাইটগুলি ভিন্ন ভিন্ন সূক্ষ্মতা বিশিষ্ট ছাঁকনীর ন্যায় আচরণ করে। ছিদ্র-পথের ব্যাস অপেক্ষা কম ব্যাসের কোন আণবিক পদার্থকে এরা গর্তের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখে (অধিশোষণ, adsorption) কিন্তু বড় আকারের অণুগুলিকে এভাবে আদৌ ধরে রাখে না। ব্যাপারটিকে আণবিক ছাঁকন (molecular sieving) বলা যায়। কার্বনেরও (চারকোল) এইরূপ ছাঁকন ক্ষমতা দেখা যায়। কিন্তু বর্তমানে আণবিক ছাঁকনী বলতে আমরা জিওলাইট শ্রেণীর পদার্থকেই বুঝে থাকি। Na A-কে বলা হয় 4 Å ছাঁকনী, KA হলো 3 Å এবং CaA হলো 5Å ছাঁকনী।

জিওলাইট—X-এর ছিদ্রপথগুলি অপেক্ষাকৃত বড় হয়ে থাকে। এদের গঠনে কর্তিত অষ্টতলকাকৃতি অ্যালুমিনো-সিলিকেট এককগুলি ষট্‌কৌণিক প্রিজ্‌মের মাধ্যমে পরস্পর সংযুক্ত হওয়ায় ছিদ্রগুলি আকারে বড় হয়ে পড়ে। NaX জিওলাইটের ছিদ্রগুলির ব্যাসার্ধ হয় 10Å।

সব ধরনের জিওলাইটের ছিদ্রগুলি সুষমভাবে ছড়িয়ে থাকে এবং এগুলি আবার জলনিকাশী নালার মত পরস্পর এমনভাবে সংযুক্ত হয়ে থাকে যে সমগ্র পদার্থটিকে কেলাসিত 'স্পঞ্জ' বলে মনে হয়। সম্পূর্ণ নিরুদিত জিওলাইটে আয়তনের প্রায় অর্ধেকটাই থেকে যায় ফাঁকা। আর এই ফাঁকা জায়গা-গুলোতেই ছিদ্রপথের আকার অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর নানা ধরনের গ্যাস বা তরল পদার্থের অণু ঢুকে পড়তে পারে। বড় আকারের অণুগুলি ঢুকতে পারে না। এই ভাবেই জিওলাইট নির্বাচনক্ষম (Selective) অধিশোষক এবং ছাঁকনী হিসাবে কাজ করে থাকে।

জিওলাইটের সংযুতিতে একযোজী ক্যাটায়নগুলি দ্বিযোজী (Ca^{2+}) বা ত্রিযোজী (La^{3+}) ক্যাটায়ন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হলে ছিদ্রগুলির অভ্যন্তরে অতিরিক্ত একধরনের আকর্ষণী ক্ষমতার সৃষ্টি হয়। এর ফলে আণবিক ছাঁকনী হিসাবে অসম্পৃক্ত অণু এবং দ্বি-প্রতিস্থাপিত চক্রাকৃতি জৈব যৌগের প্যারা-আইসোমারগুলির প্রতি এদের বিশেষ আসক্তি দেখা যায়।

জিওলাইট মোটামুটিভাবে তাপসহ্য পদার্থ। 1000°C তাপমাত্রাতেও এদের কেলাস গঠন অবিকৃত থাকে। জল দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ফোটালেও এদের কোন মৌলিক পরিবর্তন হয় না। তবে, বারবার 300°C-এর উপরে উত্তপ্ত করলে জিওলাইট কিছুটা দুঃস্থিত হয়ে পড়ে। এইজন্যই সাধারণতঃ 300°-এর উপরে উত্তপ্ত করে আণবিক ছাঁকনী হিসাবে এদের কাজ করার ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করা হয়।

আণবিক ছাঁকনী হিসাবে জিওলাইটের ব্যবহার

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে জিওলাইটের গঠনে বর্তমান ছিদ্র বা গর্তগুলি জলের অণুসমূহের লুকিয়ে থাকার পক্ষে অত্যন্ত সুবিধাজনক। আপেক্ষিক আর্দ্রতা যথেষ্ট কম থাকলেও জিওলাইট বায়ু থেকে জল টেনে ঐ গর্তগুলির মধ্যে আটকে রাখতে পারে। প্রচলিত বিভিন্ন শুষ্কীকারক পদার্থ যেমন অ্যালুমিনা, সিলিকাজেল ইত্যাদির তুলনায় জিওলাইট আণবিক ছাঁকনী কম চাপে অনেক বেশী কার্যকরী। এই কারণেই কোন গ্যাস বা তরল পদার্থ থেকে জল অপসারণ (1ppm অপেক্ষাও কম পর্যন্ত) করতে অর্থাৎ উত্তমরূপে শুষ্ক করার জন্য বিভিন্ন শিল্পে বর্তমানে ব্যাপকভাবে জিওলাইট ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়া, আংশিক পাতন প্রক্রিয়ায় সহজে পৃথক করা যায় না এমন তরল বা গ্যাসীয় মিশ্রণের ক্ষেত্রে এই আণবিক ছাঁকনী ব্যবহার করে দ্রুত পৃথকীকরণ করা সম্ভব হচ্ছে।

সরল শৃঙ্খল বিশিষ্ট হাইড্রোকার্বনগুলি (গড় ব্যাসার্ধ 4·9 Å) 5A—জিওলাইট সহজেই ধরে রাখে কিন্তু শাখাযুক্ত বা বলয় গঠনবিশিষ্ট যৌগগুলি (ব্যাসার্ধ 5 Å অপেক্ষা বড়)

আদৌ আবদ্ধ হয় না। পরে n-হেক্সেন চালিত করে আবদ্ধ সরল শৃঙ্খল হাইড্রোকার্বনগুলিকে বের করে আনা হয়। ডিটারজেন্ট তৈরিতে সরল শৃঙ্খল অ্যালকেনগুলির বিশেষভাবে প্রয়োজন হয়ে থাকে। কারণ, এরা 'বায়ো ডিগ্রেডেবল', অর্থাৎ ব্যবহারের পর সহজেই জীব-রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকৃতিতে ভেঙে গিয়ে নিরাপদ অন্তিম যৌগে পরিণত হতে পারে।

মেটা-জাইলিন বা অর্থো-জাইলিনের মিশ্রণ থেকে প্যারা-জাইলিনকে আংশিক পাতন প্রক্রিয়ায় পৃথক করা একরকম অসম্ভব; (স্ফুটনাংকের পার্থক্য $0.2^{\circ}C$-এর মত)। অথচ টেরিলিনের প্রধান উপাদান টেরেপথ্যালিক অ্যাসিড প্রস্তুত করতে প্যারা-জাইলিন দরকার। Ca—বা La—প্রতিস্থাপিত X এবং Y-শ্রেণীর জিওলাইটের প্যারা-আইসোমারগুলির প্রতি বিশেষ আসক্তি দেখা যায়। এই ধরণের আণবিক ছাকনী ব্যবহার করে অপর আইসোমারগুলির মিশ্রণ থেকে সহজেই প্যারা-জাইলিন বা অন্যান্য যৌগের প্যারা-আইসোমারকে বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যেতে পারে। এসব ক্ষেত্রে অবশ্য জিওলাইটের আচরণ যে পুরোপুরি আণবিক ছাকনীর মত এমন বলা চলে না।

পেট্রোলিয়াম শিল্পে 'ক্র্যাকিং' ও 'আইসোমেরাইজেশন' প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উন্নত মানের গ্যাসোলিন বা পেট্রোল উৎপাদনে X এবং Y-শ্রেণীর (Na-আকার) জিওলাইট অনুঘটক ব্যবহার করে দেখা গেছে যে অনেক কম তাপমাত্রায় ও চাপে বিক্রিয়াগুলি সংঘটিত হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে যেসব বিক্রিয়ায় অন্তর্বর্তী বিক্রিয়ক হিসাবে কার্বোনিয়াম আয়ন সৃষ্টি হয়ে থাকে সেই সব ক্ষেত্রেই জিওলাইট পদার্থ কার্যকরী অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে। (বর্তমানে জিওলাইট অনুঘটক ব্যবহার করে পেট্রোলিয়াম শিল্পসংস্থাগুলি বছরে লক্ষ লক্ষ টাকা সাশ্রয় করছে।

বায়ুর দূষণমাত্রা কমানোর কাজেও জিওলাইট আণবিক ছাকনী ব্যবহার করা যায়। এরা বায়ু থেকে নাইট্রোজেন অক্সাইড (NO, N_2O_4), সালফার ডাই-অক্সাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড, ইত্যাদি ক্ষতিকর গ্যাসগুলি দূর করে বায়ুকে বিশুদ্ধ করে তুলতে পারে। এছাড়া ধাতুনিষ্কাশনে, রাবার শিল্পে, হিমকারক তরল বা গ্যাসকে গন্ধমুক্ত করতে এবং আরও নানা কাজে আণবিক ছাকনী জিওলাইটের ব্যবহার ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

মনোবিজ্ঞানে উপেক্ষিতা

রমেশ দাশ*

1

মন বলতে মনোবিজ্ঞানীরা এক সময় শুধু চেতনা (consciousness)-কেই বুঝতেন। মনোবিজ্ঞানী James মনকে 'চৈতন্যপ্রবাহ' (Stream of consciousness) রূপে বর্ণনা করেছিলেন। তার কারণ মন কখনো শূন্য থাকে না, সব সময়ই কোন না কোন চিন্তা-ভাবনা, ধারণা (thoughts or ideas), অনুভূতি বা প্রক্ষোভ (feeling or emotion), অথবা আশা-আকাঙ্ক্ষা-সংকল্প (expectation-desire-will) উদিত হচ্ছে আমাদের মনে এবং তাদের সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করে তুলছে—এগুলি যেন এক একটি চেতনার তরঙ্গ, একটি মিলিয়ে যেতে না যেতেই আর একটির উদয় ঘটছে, কোন দুটি চেতনা-তরঙ্গ বা মানসিক অবস্থার মধ্যে কোন ছেদ বা বিরতি নেই, বহতা নদীর মতোই আমাদের মনোরাজ্যে যেন অবিরাম চেতনার স্রোতধারা বয়ে চলেছে। আমরা যদি নিজেদের মনের দিকে তাকাই, অর্থাৎ অন্তর্দর্শন (Introspection) পদ্ধতিটির প্রয়োগ করি তাহলে দেখতে পাব সব সময়ই আমরা কিছু না কিছু সম্বন্ধে সচেতন হয়ে আছি, আমাদের মন কখনোই শূন্য থাকছে না, হয় কোন চিন্তা, না হয় কোন অনুভূতি, অথবা কোন সংকল্প অথবা ইচ্ছা সেখানে বর্তমান। গভীর ঘুমের পর আমরা বলি—আঃ কী আরামে ঘুমোলাম! অর্থাৎ ঘুমন্ত অবস্থাতেও আমাদের মনে একটি আরামের অনুভূতি উপস্থিত ছিল। আমাদের চেতনার নদীতে নিত্য নূতন তরঙ্গের উদ্ভব ঘটছে, তাই Heraclitus বলেছেন, "We never descend twice into the same stream. This is still more true of the stream of thought."

চেতনার প্রবাহকে নদীর স্রোতের সঙ্গে তুলনা করা হলেও দুয়ের বৈশিষ্ট্য কিন্তু এক নয়। নদীর গতি সামনের দিকে, কিন্তু চেতনার প্রবাহ বিপরীতমুখী। এই মুহূর্তে যা চেতনায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে পর মুহূর্তে তা অচেতনতায় বিলীন হয়ে যাচ্ছে, এখন যা বর্তমান পর মুহূর্তে তাই অতীতে পর্যবসিত হচ্ছে, এই মুহূর্তে যা অভিজ্ঞতা (experience) পর মুহূর্তে তা সঞ্চিত হচ্ছে স্মৃতি (memory) ভাণ্ডারে। চৈতন্যপ্রবাহের আর একটা বৈশিষ্ট্য হলো এই যে চেতনা থেকে যেসব অভিজ্ঞতা অচেতনতায় বিলীন হয়ে যাচ্ছে তারা কিন্তু আবার চেষ্টা করছে চেতনার মধ্যে ফিরে আসতে, যদিও এই প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারটা সর্বক্ষেত্রে সহজ বা সম্ভব নয়।

সিগমুণ্ড্ ফ্রয়েড চেতনার তীব্রতা অনুসারে মনকে তিনটি অঞ্চলে ভাগ করেছেন—চেতন (conscious), প্রাক্-চেতন (pre-conscious) এবং অবচেতন (un-conscious)। আমাদের চেতন মনে যেসব ভাব-ভাবনা-ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার উদয় ঘটে তাদের সম্বন্ধে আমাদের পুরোপুরি হুঁশ (awareness) থাকে, অর্থাৎ আমরা তাদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন থাকি, কিন্তু উদিত হবার অল্পক্ষণ পরেই সেগুলি চলে যায় প্রাক্-চেতন মনের আপাত বিস্মরণের রাজ্যে অথবা অবচেতন মনের সম্পূর্ণ বিস্মরণের দেশে। আমরা যে সব অজস্র অভিজ্ঞতা লাভ করি তার সবগুলিই যদি সব সময় আমাদের চেতনায় ভিড় করে থাকত, যদি পরস্পরবিরোধী ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাগুলির প্রত্যেকটিই আমাদের চেতনায় সবসময় তার চরিতার্থতা দাবি করত তাহলে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে আমরা পাগল হয়ে যেতাম। তাই প্রাকৃতিক নিয়মেই আমাদের চেতনার বস্তুগুলি তাদের প্রকৃতি অনুসারে মনের প্রাক্-চেতন অথবা অবচেতন অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে। যেসব চিন্তাভাবনা অনুভূতি আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে আমাদের নীতিবোধের কোন বিরোধ নেই সেগুলি থাকে প্রাক্-চেতন মনে, যদিও মনে হয় আমরা তাদের ভুলে গেছি তবু আসলে কিন্তু তাদের আমরা ভুলি না, কোন না কোন সময়ে তারা ঘুরে ফিরে আবার আমাদের চেতনায় এসে হাজির হয়। আর সেই সব আশা-আকাঙ্ক্ষা চিন্তা-ভাবনা অনুভূতি যাদের সঙ্গে আমাদের নীতিবোধের সংঘাত ঘটে তারা প্রাক্-চেতন অঞ্চল ছাড়িয়ে আরও গভীরে মনের অবচেতন অঞ্চলে নির্বাসিত হয়, এবং তাদের কথা আমরা সম্পূর্ণ ভুলে যাই, স্বাভাবিকভাবে কখনোই তারা সরাসরি আমাদের চেতনায় আবার এসে হাজির হতে পারে না, আমাদের প্রচণ্ড নীতিবোধ সব সময়ই তাদের চেতনায় প্রবেশ করতে বাধা দেয়, অবশ্য প্রায়ই আমাদের অবদমিত (repressed), অবচেতন (unconscious) ইচ্ছেগুলি ছদ্মবেশে স্বপ্ন, ভুল-ভ্রান্তি ইত্যাদির ভেতর দিয়ে আমাদের চেতনায় উদিত হয়ে আমাদের অজ্ঞাতসারে পরোক্ষভাবে চরিতার্থতা লাভ করে থাকে। স্বপ্ন এবং ভুলভ্রান্তির অথবা এই ধরনের আরও অনেক কাজের (যেমন দিবাস্বপ্ন, রচনা, চিত্রাঙ্কন ইত্যাদি) উপযুক্ত বিশ্লেষণের সাহায্যে মনঃসমীক্ষক তাদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন অবদমিত ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষাগুলির সন্ধান পেয়ে থাকেন। মুক্ত অনুষঙ্গ পদ্ধতি (Method of Free Association)-এর সাহায্যে মনঃসমীক্ষক যে কোন মানুষের অবদমিত আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলিকে তার অবচেতন মন থেকে চেতন মনে তুলে আনতে পারেন, যদিও ব্যাপারটা

* ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ, 25/3, বালীগঞ্জ সারকুলার রোড, কলিকাতা-700019

ভীষণ কষ্টসাধ্য আর সময়সাপেক্ষ এবং পুরোপুরি নির্ভর করছে তাঁর সঙ্গে সেই ব্যক্তিটির সহযোগিতার মাত্রা এবং সংশ্লিষ্ট অবদমিত আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলি অবচেতন মনের কত গভীরে নির্বাসিত হয়েছে তার ওপর।

[2]

চেতন মন এবং অবচেতন মন নিয়ে ভূরি ভূরি গবেষণা করা হয়েছে এবং রাশি রাশি গ্রন্থও লেখা হয়েছে। কিন্তু রামায়ণে ঊর্মিলার মতো মনোবিজ্ঞানে প্রাক্ চেতন মনটিও অদ্যাবধি উপেক্ষিতা হয়ে আছে। প্রাক্-চেতন মন সম্বন্ধে দু-চারটি কথা ছাড়া প্রায় কিছুই বলা হয় নি। অথচ মনের এই অঞ্চলটির গুরুত্ব মনের আর দুটি অঞ্চলের তুলনায় কোন অংশেই কম নয়, বরং বিশেষ অর্থে কিছু বেশী, কারণ প্রাক্-চেতন মন চেতন মন এবং অবচেতন মনের মধ্যে একমাত্র যোগসূত্র, তাছাড়া প্রাক্-চেতন মনের একটা অংশ চেতন মনের সঙ্গে এবং আর একটা অংশ অবচেতন মনের সঙ্গে নিকট সান্নিধ্যের জন্য ওতপ্রোত ভাবে মিশে আছে। সুতরাং প্রাক্ চেতন মনের সাহায্য ছাড়া চেতন মন অথবা অবচেতন মনের পক্ষে কাজ করা একেবারেই অসম্ভব। এই বিষয়ে চিন্তাভাবনা এবং গবেষণার প্রয়োজন তাই অত্যন্ত বেশি, কিন্তু দুঃখের বিষয় মনোবিজ্ঞানীরা এ সম্বন্ধে তেমন গুরুত্ব আজও দেন নি। প্রাক্-চেতন মনে যা থাকে কম-বেশি চেষ্টা করলে সেগুলিকে চেতন মনে নিয়ে আসা যায়, অথবা সংযোগ সূত্রাবলী (Laws of Association)-র প্রভাবে তারা আপনা থেকেই চেতন মনে পুনরায় উদিত হয়—এইটুকু মাত্র মন্তব্য করেই তারা প্রাক্-চেতন মন সম্বন্ধে তাঁদের দায়িত্ব সমাপ্ত মনে করেছেন।

আমরা বলেছি চেতন এবং অবচেতন মনের ক্রিয়াকলাপ বহুলাংশে নির্ভর করছে প্রাক্-চেতন মনের ওপর। কিছু কিছু উদাহরণ দিলে আমাদের এই বক্তব্যটি পরিষ্কার হবে। প্রথমে চেতন মনের কথাই ধরা যাক।

প্রত্যক্ষণ (perception) আমাদের চেতন মনের একটি কাজ। প্রতিনিয়ত আমরা কিছু না কিছু প্রত্যক্ষ করছি। কিন্তু বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে প্রত্যেকটি প্রত্যক্ষণের মধ্যে বেশ কিছু প্রাক্-চেতন অভিজ্ঞতা প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। যেমন যখন আমরা একটি আপেল প্রত্যক্ষ করি তখন আমাদের কয়েকটি মাত্র সংবেদন (sensation) হয়—আমরা বিশেষ রঙের বিশেষ আকারে একটা কিছু দেখি, এইটুকুই হলো আমাদের চেতন মনের অভিজ্ঞতা, কিন্তু প্রত্যক্ষণ বলতে এইটুকুই বোঝায় না, আমরা বুঝতে পারি যে, যা দেখছি সেটা একটা আপেল। আপেল সম্বন্ধে আমাদের অতীতের সব অভিজ্ঞতা—যা এখন আমাদের প্রাক্-চেতন মনে আছে যেমন আপেলের স্পর্শ, গন্ধ, স্বাদ ইত্যাদি সম্বন্ধে আমাদের সমস্ত অতীত অভিজ্ঞতা বর্তমানের সংবেদনগুলির সঙ্গে একীভূত হয়ে আপেল সম্বন্ধে আমাদের বর্তমান প্রত্যক্ষণটিকে সম্ভব করেছে। অর্থাৎ প্রত্যক্ষণ—যাকে সম্পূর্ণভাবে চেতন মনের একটি ক্রিয়া বলে মনে করা হয় আসলে তার বেশ কিছু অংশ প্রাক্-চেতন, অর্থাৎ এটি চেতন ও প্রাক্-চেতন মনের একটি মিশ্র ক্রিয়া মাত্র। প্রত্যক্ষণের মতো অধ্যাস বা ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণের (illusion) মধ্যেও প্রাক্-চেতন মনের উপাদান বর্তমান থাকে। গোধূলির আবছা আলোকে পথ চলতে চলতে এক টুকরো দড়ি দেখে সাপ বলে ভয়ে আঁৎকে উঠি। দড়ির সংবেদনের সঙ্গে সাপের সম্বন্ধে আমাদের প্রাক্-চেতন অভিজ্ঞতাগুলি মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় বলেই রজ্জুতে আমাদের সর্প ভ্রম ঘটে থাকে।

চেতন মনের আর একটি কাজের নাম বিচারকরণ (reasoning)। এই কাজটির মধ্যেও প্রাক্-চেতন মনের উপাদান বহুল পরিমাণে উপস্থিত থাকে। ঈশান কোণে কালো মেঘ দেখে আসন্ন ঝড়ের কথা অনুমান করি, কারণ অতীতে একই অবস্থায় ঝড়ের যে অভিজ্ঞতা আমার প্রাক্-চেতন মনে সঞ্চিত আছে সেটি বর্তমান অভিজ্ঞতার সঙ্গে একীভূত হয়ে গেছে। তা যদি না হত তা হলে কিছুতেই আমি বর্তমানে ঈশানী মেঘ দেখে আসন্ন ঝড়ের কথা অনুমান করতে পারতাম না। সেই রকম যখন আমাদের মন কোনও দুস্থ ব্যক্তির কষ্ট দেখে সহানুভূতিতে ভরে যায় তখন সেটা সম্ভব হয় ব্যক্তিটির সম্বন্ধে আমরা যে সংবেদন লাভ করি (তার কষ্টের অভিব্যক্তি দেখে) তার সঙ্গে অতীতে আমার নিজের অনুরূপ কষ্টের যে অভিজ্ঞতা আমার প্রাক্-চেতন মনে আছে তার উদ্রেক ঘটেছে বলেই। আবার আমাদের পছন্দ অপছন্দ ভালো লাগা খারাপ লাগার মূলেও আমাদের প্রাক্-চেতন মনের ক্রিয়া বর্তমান। একজনকে প্রথম দেখা মাত্রই খুব ভালো লেগে গেল, আর একজনকে দেখা মাত্রই মেজাজটা গেল বিগড়ে। কেন এমন হয়? তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে সম্ভাব্য অন্যতম কারণ হিসেবে যাকে ভালো লাগল তার সঙ্গে হয়তো এমন কোনো ব্যক্তির চেহারাগত মিল আছে যাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্কটি মধুর, যাকে খারাপ লাগছে তার সঙ্গে এমন একজনের অদ্ভুত মিল আছে যার সঙ্গে আমার সম্পর্কটি রীতিমত তিক্ত। অর্থাৎ নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে দেখে যে সংবেদন লাভ করছি তার সঙ্গে তার মতো দেখতে ব্যক্তিটি সম্পর্কে আমার যে অভিজ্ঞতা আমার প্রাক্-চেতন মনে আছে সেই অভিজ্ঞতা মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেছে। সুতরাং পছন্দ-অপছন্দ ভালো লাগা মন্দ লাগার ব্যাপারটিও পুরোপুরি

চেতন মনের ব্যাপার নয়, চেতন এবং প্রাক্-চেতন মনের সম্মিলিত ক্রিয়ার ফলশ্রুতি মাত্র।

এবার আমরা অবচেতন মনের সঙ্গে প্রাক্-চেতন মনের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধটির কথা ভাবতে পারি। স্বপ্নকে বলা হয় অবচেতন মনের রাজ্য যাবার রাজপথ (Royal road to the unconscious)। স্বপ্নে ভেতর দিয়ে আমাদের অবদমিত ইচ্ছাগুলি পরোক্ষ পূর্তি লাভ করে। কিন্তু দেখা গেছে প্রত্যেকটি স্বপ্নের মধ্যে এমন একটি ঘটনা থাকবেই যা নাকি আগের দিনে ঘটেছিল অর্থাৎ যে ঘটনাটির কথা স্বপ্নদ্রষ্টার প্রাক্-চেতন মনের মধ্যে সঞ্চিত ছিল। হয়ত দীর্ঘকাল পরে বিমলের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল গতকাল। রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম বিমলের সঙ্গে দার্জিলিং-এর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছি, ইত্যাদি।

যে সব ইচ্ছার সঙ্গে আমাদের নীতিবোধের সংঘাত বাধে—অর্থাৎ আমাদের অসামাজিক অনৈতিক গর্হিত ইচ্ছাগুলি অবদমিত হয়ে অবচেতন মনে চলে যায়। অবদমিত হলেও তারা সব সময় চেষ্টা করে চেতন মনে উদিত হতে, কিন্তু তার আগেই অর্থাৎ চেতন মনে উদিত হবার আগেই আবার তারা অবদমিত হয়ে নির্বাসিত হয় অবচেতন মনের মধ্যে। এই অবদমনের কাজটা পুরোটাই অবচেতন মনের কাজ কিনা, অবদমনের ব্যাপারে প্রাক্-চেতন মনেরও কোন ভূমিকা আছে কিনা, থাকলে কতটা আছে সে বিষয়ে গবেষণার যথেষ্ট অবকাশ আছে।

অবদমন (repression)-এর মতো দমনও (suppression) মনের আর একটি কাজ। দমন কাজটি পুরোপুরি চেতন মনের কাজ। শুধু যে আমাদের অনৈতিক ইচ্ছাগুলিই অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপূর্ণ থাকে তাই নয়, অনেক নির্দোষ ইচ্ছাও অনেক সময় অপূর্ণ থেকে যায়। যেমন দুটি পরস্পর বিরোধী নির্দোষ ইচ্ছার একটিকে আমাদের বাতিল করতে হয়। দুই বন্ধুর বাড়ি যাবার ইচ্ছে আছে। আগে কার বাড়ি যাব তাই নিয়ে মনের মধ্যে দ্বন্দ্ব। ঠিক করলাম রামের বাড়ি আগে যাব, অর্থাৎ আগে শ্যামের বাড়ি যাবার ইচ্ছেটিকে দমন করলাম। সেটি দমিত হয়ে প্রাক্-চেতন মনে চলে গেল। আবার এমন অনেক অভিজ্ঞতা ঘটে যেগুলি দমিত হয়ে প্রায় অবচেতন মনের সীমানায় গিয়ে হাজির হয়। যেমন আমাকে যদি কেউ অপমান করে তাহলে সেটা আমার আত্মমর্যাদা বোধকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করে। আমি সে কথা মনে করে রাখতে চাই না। ইচ্ছে করেই ভুলে যেতে চাই। তাই সেই অভিজ্ঞতাটিকে দমন করে পাঠিয়ে দিই প্রাক্-চেতন মনের গভীরে, একেবারে অবচেতন মনের দোর গোড়ায়। এই ধরনের দমিত অভিজ্ঞতাগুলির সঙ্গে অবদমিত কোন কোন ইচ্ছার নিকট সম্বন্ধ গড়ে ওঠা কি নিতান্তই অসম্ভব? বরং মনে করার যথেষ্টই কারণ আছে যে এই ধরনের দমিত ইচ্ছাগুলিকে আশ্রয় করে বিশেষ বিশেষ অবদমিত ইচ্ছা স্বপ্নের আকারে বা অন্য কোন ভাবে চেতন মনে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। ফ্রয়েডের নিজের একটি স্বপ্নের কথা আমরা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে পারি। ফ্রয়েড একদিন তাঁর এক সহকর্মীকে স্বপ্নে দেখলেন। বাস্তবে এই সহকর্মীটি শ্মশ্রুহীন হলেও স্বপ্নে তিনি দেখলেন তার গালভরা হলুদ রঙের লম্বা দাড়ি আছে। আসলে এই দাড়ির প্রকৃত মালিক ছিলেন ফ্রয়েডেরই এক কাকা যাঁকে তাঁর সমস্ত আত্মীয়স্বজন মহানির্বোধ বলেই মনে করতেন। স্বপ্নের মধ্যে একাধিক ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণকে সংক্ষেপণ (condensation) বলা হয়। স্বপ্নের মধ্যে সহকর্মীকে এই মহানির্বোধ কাকার সঙ্গে একাত্ম করে ফ্রয়েড তার সম্বন্ধে তাঁর যে অবজ্ঞা তাকেই প্রকাশ করেছেন। এখানে কাকার বুদ্ধি সম্বন্ধে ফ্রয়েডের যে নিম্ন ধারণা সেটি তাঁর প্রাক্-চেতন মনেই ছিল, হয়ত বা দমিত হয়েই ছিল, কারণ কাকাকে নির্বোধ ভাবাটা সুখকর না হবারই সম্ভাবনা বেশি। এই দমিত প্রাক্-চেতন ধারণাটিকে কেন্দ্র করেই সহকর্মী সম্বন্ধে ফ্রয়েডের অবদমিত অবজ্ঞারপ্রকাশ ঘটেছে স্বপ্নের মধ্যে। অবশ্যই এধরণের স্বপ্নের মধ্যে প্রাক্-চেতন এবং অবচেতন মনের দমিত ও অবদমিত উপাদানগুলিকে ঠিক ঠিক মতো চিহ্নিত করতে গেলে নিছক অনুমানই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন মনঃসমীক্ষকের সাহায্যে বস্তুনিষ্ঠ গভীর বিশ্লেষণের। স্বপ্নে আরও একটা বিচিত্র ব্যাপার লক্ষ্য করেছেন মনঃসমীক্ষকেরা (Psycho-Analysts)। স্বপ্নের মধ্যে আমার সমস্ত আক্রোশ ধাবিত হল খ-এর দিকে ক-এর উপস্থিতিতে, যদিও আসলে ক-এর ওপরই আমার রাগ, খ-এর ওপর নয়। স্বপ্নের আবেগের এই স্থানচ্যুতি বা অভিক্রান্তির (displacement) অনেক কারণই থাকতে পারে, যার মধ্যে খ-এর প্রতি আমার দমিত বিরাগকে আশ্রয় করে ক-এর প্রতি আমার অবদমিত আক্রোশ প্রকাশ পাবার সম্ভাবনাটাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

মোটের ওপর, মন একটি অবিভাজ্য অবিচ্ছিন্ন সত্তা। তার বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে। তাই মনের কোন অঞ্চলেরই গুরুত্ব কিছু কম নয়। বিশেষ করে প্রাক্-চেতন মনটিকে আমরা কিছুতেই উপেক্ষা করতে পারি না, কারণ এই অঞ্চলটিই মনের অন্য দুটি অঞ্চলের মধ্যে একমাত্র যোগসূত্র। সুতরাং মনের অন্য দুটি অঞ্চলের ওপর এই অঞ্চলটি প্রভাবের প্রকৃতি ও পরিধি সম্পর্কে পর্যাপ্ত গবেষণা হওয়া যে নিতান্তই প্রয়োজন তাতে আর সন্দেহ কি।

বিচিত্র প্রাণী নিরম্বু মরু-মূষিক

রাধাগোবিন্দ মাইতি*

ইস্কুলে দু-এক ক্লাশ পার হতে না হতেই জেনে ফেলেছিলাম 'জলের এক নাম জীবন' : জল ছাড়া কোন প্রাণী বাঁচে না। আরও পরে জেনেছি জলের দরকারটা সবার সমান নয়। শুষ্ক, উত্তপ্ত মরুভূমিতে জল বিনা হয়ত একদিনেই মানুষের ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যাবে ; কিন্তু উট এ অবস্থায় স্বচ্ছন্দে কাটিয়ে দেবে তিন চার দিন। কারণ হিসাবে জেনেছি উটের কুঁজটাই তার জলের কুঁজো ; কুঁজের কোষকলাতে উট জল জমিয়ে রাখে। গরমের দিনে কুঁজোর জল খালি হতে না হতে আবার আমরা ভরে নেই। উটও মাঝে মাঝে ভরে নেয় তার কুঁজো মরুদ্যানে গেলে। উটের কুঁজোতে জল ভরার রাস্তাটা তার মুখের ভিতর দিয়ে পাকস্থলী হয়ে।

মানুষ বা উট কেউই শুষ্ক মরুভূমির স্থায়ী বাসিন্দা নয় ; কেবল দরকারের সময় সেখানে যায়। কিন্তু এমন অনেক জন্তু-জানোয়ার আছে মরুভূমিই যাদের বাসস্থান। বিশ-পঁচিশ মাইলের মধ্যে জল নাই ; অথচ নানারকমের জন্তু-জানোয়ারের বাস সেখানে। এরা জল পায় কোথা থেকে ? এদের শরীরে কি জলের ভাগ কম ? নাকি শরীর শুকিয়ে গেলেও এরা বেঁচে থাকতে পারে ? পরীক্ষায় দেখা গেছে—কোনটাই ঠিক নয়। জলপায়ী প্রাণীদের শরীরে আছে প্রায় 65 শতাংশ জল ; মরু-প্রাণীদের শরীরেও তাই। আর শরীর থেকে যতটা জল বেরিয়ে গেলে সাধারণ প্রাণীদের পক্ষে টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে, এদের বেলায়ও তার ব্যতিক্রম হয় না। তবে দেখা গেছে এদের মধ্যে কিছু জন্তুজানোয়ার ফণীমনসা জাতীয় গাছ খায়। এসব গাছের প্রায় 90 শতাংশই জল। সুতরাং ফণীমনসাভোজী প্রাণীদের জলের চাহিদা মেটে তাদের খাদ্যবস্তু থেকে। সুতরাং যে অঞ্চলে ফণীমনসা জাতীয় গাছ আছে সেখানে জল না থাকলেও কিছু প্রাণী বেঁচে থাকতে পারে।

এ পর্যন্ত তো সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। কিন্তু যে অঞ্চলে জল নাই, ফণীমনসা তো দূর অস্ত, কোন গাছপালাই নাই—সেখানে জন্তুজানোয়ার আছে কি ? না থাকারই কথা ; যদি না থাকত তো ল্যাঠা চুকেই যেত। কিন্তু গোল বাধিয়েছে মরু-মূষিক। পৃথিবীর সব মরুভূমিতেই এদের বাস ; সে মরুভূমি এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া বা অন্য যেখানেই হোক না কেন মরু-মূষিকের দেখা অবশ্যই পাওয়া যাবে। এই মরু মূষিকের এক প্রজাতি হল ক্যাঙারু মূষিক (*Dipodomys spectabilis*)। পৃথিবীর সবচেয়ে শুষ্কস্থান যে মৃত্যু-উপত্যকা (Death Valley) সেখানেও বাস করে এই প্রাণী।

মৃত্যু উপত্যকা অবস্থিত ক্যালিফোর্নিয়ার ইনিও কাউন্টিতে। এই উপত্যকা লম্বায় 50 মাইল এবং চওড়ায় 20 থেকে 25 মাইল। আর সমুদ্রতল থেকে 276 ফুট গভীর। কবিগুরু এক কবিতায় লিখেছেন, "......যে নদী মরু পথে হারাল ধারা..."। একথা লেখার সময় তাঁর মনে হয়ত অমরগোসা নদীর কথা উঁকি মেরেছিল। কারণ এই নদী মৃত্যু উপত্যকায় এসে তার ধারা হারিয়ে ফেলেছে। এই নদীর সব জল মৃত্যু উপত্যকায় এসে প্রখর তাপে শুকিয়ে বাষ্প হয়ে যায় ; পড়ে থাকে কেবল জলে দ্রবীভূত রাশি রাশি লবণ। এখানে কোথাও জল নাই। এক ফোঁটা শিশিরও পড়ে না রাতে। গ্রীষ্ম দিনে এই উপত্যকার তাপ মাত্রা ঘোরাফেরা করে 120° ফারেনহিট (ফা)-এর আশেপাশে। আবার বেখেয়ালে কখনো-সখনো 140° ফারেনহিট ছাড়িয়ে উপরে চলে যায়। মৃত্যু উপত্যকার এই ভয়াবহ পরিবেশ অধিকাংশ প্রাণীর পক্ষে বাসযোগ্য নয়। অথচ ক্যাঙারু মূষিক ছেলেপুলে নিয়ে স্বচ্ছন্দে ঘরসংসার পেতেছে এখানেও। এ তো তাজ্জব কী বাৎ !

ধর্মের ধ্বজাধারীরা ফতোয়া দেবেন—সবই ভগবানের খেলা, খোদার কেরামতি। কিন্তু বিজ্ঞানী বলে একদল নাছোড়বান্দা আছেন ; তাঁরা এই কেরামতির পেছনে কি আছে সেই সত্য খুঁজে বের করতে চান। তাঁরা বলেন, কারণ ছাড়া কার্য হয় না ; ভগবানও নিয়মের অধীন ; বিশ্বজগৎ খামখেয়ালীতে চলছে না। ঈশ্বর-অবিশ্বাসীর কলঙ্ক মাথায় নিয়ে প্রাচীনকালে এঁরা ঘাতকের খড়্গে বা বিষপানে প্রাণ দিয়েছেন, তবু যা সত্য বলে জেনেছেন, তার থেকে একচুল বিচ্যুত হন নি কখনও। এঁরাই অমিত বিক্রমে কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে সভ্যতার রথকে আজ ঠেলে নিয়ে এসেছেন একবিংশতি শতাব্দীর দোর গোড়ায়।

এঁদেরই একদল পড়লেন এই ক্যাঙারু মূষিক নিয়ে। তাঁরা স্ট্যানফোর্ড এবং সিনসিনাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগারে এই মূষিকের শারীরতত্ত্ব নিয়ে পরীক্ষা চালালেন। ক্যাঙারুর সঙ্গে ক্যাঙারু-মূষিকের কোন জাতিগত মিল নেই। যেটুকু মিল আছে তা উভয়ের চলাফেরার কায়দা-কসরতে। ক্যাঙারুর মত এই ইঁদুরও পেছনের লম্বা পায়ে ভর দিয়ে লাফিয়ে চলে এবং একাজে শক্তিশালী লম্বা লেজের সাহায্য নেয়। তা হলেও সীতার গণ্ডীর মত এদের চলাফেরার গণ্ডীও খুবই সীমাবদ্ধ। তাই দূরে গিয়ে কোথাও ফণী-মনসা দিয়ে ভোজ সারবে বা প্রাণভরে জল খাবে—সে সুযোগ নেই।

---

* বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া

চলতে লাগল বিজ্ঞানীদের পরীক্ষা। ভুক্ত খাদ্য পাকস্থলী থেকে বের করে দেখা গেল সবই শুকনো জিনিষ—ঘাসের বীজ বা এই ধরনের শুকনো কিছু। দেখা গেল পরীক্ষাগারে এরা দিনের পর দিন শুধু শুকনো যব খেয়েই আনন্দে আছে। অদ্ভুত প্রাণী; ক্ষুধা আছে, তৃষ্ণা নাই। বাংলা ভাষায় 'ক্ষুধা-তৃষ্ণার যুগল মিলকে নিরর্থক প্রমাণ করেছে এরা।

প্রথম প্রশ্ন হল—তবে কি এরা শরীরের ভিতর জল জমিয়ে রাখে শুকনোর দিনগুলিতে বাঁচার জন্য? পরীক্ষায় দেখা গেল কি গ্রীষ্ম, কি বর্ষা—সব সময় এদের শরীরে জলীয়াংশ শতকরা 65 ভাগ। এমন কি দিনের পর দিন শুকনো আহার্য খাইয়েও শরীরের জলীয়াংশ কোন পরিবর্তন দেখা গেল না।

পুরো আট সপ্তাহ ধরে কেবল শুকনো যব খেতে দেবার পর দেখা গেল মূষিকদের ওজন বেড়ে গেছে। কিন্তু শরীরের জলীয়াংশ আছে আগের মতই 65 শতাংশ। তাহলে এই বর্ধিত ওজনের জলীয়াংশ এল কোথা থেকে? অন্য একদল মূষিককে কিছুদিন ধরে যব ও রসাল তরমুজ মিশিয়ে খেতে দেওয়ার পর দেখা গেল এদের দেহের জলীয়াংশ শুকনো যব খাওয়া বেরাদরদের চেয়ে বেশি নয়। তার মানে এরা শুকনো খাবার খাক বা রসাল খাবার খাক, শরীরের জলীয়াংশ কোন হেরফের হয় না। এই পরীক্ষা প্রমাণ করল ক্যাঙ্গারু মূষিক শরীরের জল জমিয়ে রাখে না বা শরীরের জলীয়াংশ খরচ করে শুকনোর দিনে উটের মতন বাঁচে না।

পালামৌ পাহাড়ে এক অশ্বত্থ গাছ দেখে সঞ্জীবচন্দ্রের প্রথমে মনে হয়েছিল—গাছটি বড় রসিক; তাই নীরস পাষাণ থেকেও রস সংগ্রহ করে কেমন সতেজ ও প্রফুল্ল রয়েছে। আর একদিন ঐ একই গাছ দেখে তিনি ভেবেছিলেন—গাছটি বড় কঠোর, এর কাছে নীরস পাষানেরও নিস্তার নাই।* আমাদের মূষিকপ্রবর শুকনো যব থেকেও জল সংগ্রহ করতে পারে; নইলে তার দেহের জলীয়াংশ বজায় রাখে কি করে? তাহলে এই ক্যাঙ্গারু মূষিক রসিক না কঠোর?

কেমন করে শুকনো যব থেকেও জল আসছে তা জানতে হলে রসায়ন বিজ্ঞানের কয়েক পাতা উল্টাতে হবে। আমরা জানি জল তৈরি হয় দু' ভাগ হাইড্রোজেনের সঙ্গে এক ভাগ অক্সিজেন মিশিয়ে। তাই জলের ফরমূলা H_2O [H বোঝায় হাইড্রোজেন এবং O অক্সিজেন]। সব খাবারেই কিছু হাইড্রোজেন আছে। এই প্রাণীদের শরীরে নিশ্চয় হাই-ড্রোজেনের সঙ্গে অক্সিজেনের বিক্রিয়ায় জল তৈরি হয়। রসায়নাগারে পরীক্ষা করে দেখা গেছে এক গ্রাম শ্বেতসার থেকে এই বিক্রিয়ার ফলে জল পাওয়া যায় 0·6 গ্রাম, এক গ্রাম চর্বিজাতীয় পদার্থ থেকে 1·1 গ্রাম এবং এক গ্রাম আমিষ পদার্থ থেকে 0·3 গ্রাম।

ক্যাঙ্গারু মূষিকের উপর পরীক্ষা করে আরও দেখা গেল পরীক্ষাধীন প্রাণীদের যে যব খেতে দেওয়া হয়েছে আবহাওয়ায় জলীয় বাষ্প না থাকলে তার 100 গ্রাম থেকে এই বিক্রিয়ায় পাওয়া যেতে পারে 54 গ্রাম জল। যদি বাতাসে 50 শতাংশ জলীয় বাষ্প থাকে এবং তাপমাত্রা 75° ফা হয় তবে যব কিছুটা জলীয় বাষ্প শোষণ করবে, সেক্ষেত্রে জলের পরিমাণ বাড়বে আরও 13 গ্রাম। প্রত্যেকটা প্রাণীকে পাঁচ সপ্তাহে খাওয়ান হচ্ছিল 100 গ্রাম করে শুকনো যব। আবহাওয়া অনুসারে খাদ্য থেকে তারা পেয়েছে 54 থেকে 67 গ্রাম।

ক্যাঙ্গারু মূষিকের চেহারার অনুপাতে এত কম জলের চাহিদা খুবই আশ্চর্যজনক। যদি শরীর থেকে বেরিয়ে যাওয়া জলের পরিমাণ অত্যন্ত কম হয়, তবেই এত অল্প জলে এই প্রাণী বাঁচতে পারবে, নচেৎ নয়। সুতরাং পরবর্তী পরীক্ষা সুরু হল—কেমন করে এত অল্প জলে এই প্রাণী তাদের চাহিদা মেটায়—সে তথ্য খুঁজে বার করবার। যে কোন প্রাণীর শরীর থেকে জল বেরিয়ে যাওয়ার তিনটি পথ—1-মল, 2-মূত্র ও 3-ঘাম এবং শ্বাসপ্রশ্বাস।

আফ্রিকায় এক ধরনের কৈ মাছ আছে। এরা বহুদিন মূত্রত্যাগ না করে বেঁচে থাকতে পারে। পুকুরের জল শুকিয়ে গেলে এরা পাঁকের ভিতর চলে যায়, আর যতদিন বর্ষাকাল না আসে ততদিন সেখানে দিব্যি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেয়। এরা যেন কুম্ভকর্ণের মৎস্য অবতার।

আমিষ পদার্থ হজম করতে গিয়ে প্রাণীদেহে প্রতিনিয়ত ইউরিয়া তৈরি হয়ে রক্তে জমছে। এই ইউরিয়া শরীরের পক্ষে বিষবৎ। আমাদের কিডনী রক্ত থেকে এই ইউরিয়া ছেঁকে মূত্রের সঙ্গে শরীরের বাইরে বের করে দিয়ে রক্তকে নির্মল রাখে। পরীক্ষার ফলে জানা গেছে প্রস্রাব না হওয়ার জন্য ঘুমন্ত অবস্থায় আফ্রিকার কৈ মাছের রক্তে ইউরিয়ার মাত্রা খুবই বেড়ে যায়। তবুও এরা মরে না। অথচ মানুষের রক্তে ইউরিয়া একটু বেড়ে গেলেই ইউরেমিয়া হয়ে জান খতম।

আফ্রিকার কৈ মাছের মত ক্যাঙ্গারু মূষিকও হয়ত শুকনোর দিনে মূত্রত্যাগ না করে শরীরে ইউরিয়া জমিয়ে রাখতে পারে। কিন্তু পরীক্ষায় দেখা গেল এ অনুমান সত্য নয়। শুকনো বা রসাল যে ধরনের খাবারই দেওয়া হোক না কেন এদের রক্তে ইউরিয়া, লবণ ও অন্যান্য বর্জ্য পদার্থের মাত্রার কোন হেরফের হয় না।

মূত্র পরীক্ষা করে একটা দরকারী খবর পাওয়া গেল।

*সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পালামৌ' ভ্রমণ দ্রষ্টব্য।

জানা গেল এদের কিড্‌নীর কার্যক্ষমতা এত বেশি যে অতি অল্প পরিমাণ জল দিয়ে এরা প্রচুর পরিমাণ ইউরিয়া, লবণ ও অন্যান্য বর্জ্য পদার্থ শরীরের বাইরে পাঠিয়ে দিতে পারে। তাই আমাদের মূত্রে যেখানে মাত্র 6 ভাগ ইউরিয়া থাকে, এদের মূত্রে থাকে 24 ভাগ! এদের মূত্রে লবণের পরিমাণ সমুদ্র জলের প্রায় দ্বিগুণ।

আমরা সমুদ্রের জল খেয়ে বাঁচতে পারি না। কারণ সমুদ্রের জল আমাদের কাজে লাগা তো দূরের কথা, সেই জলে এত লবণ আছে যে তা প্রস্রাবের সঙ্গে বের করে দেওয়ার জন্য শরীর থেকে আরও জল জোগান দিতে হয়। বিজ্ঞানীরা ভাবলেন, ক্যাঙ্গারু মূষিকের মূত্রে যদি সমুদ্র জলের দ্বিগুণ লবণ থাকে, তবে তো এরা সমুদ্রের জল খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে।

যেই ভাবনা, সেই কাজ। কিন্তু গোল বাধল এক জায়গায়। ঘোড়াকে জলের ধারে হয়ত নিয়ে যাওয়া যায় টেনে হিঁচড়ে, কিন্তু জল খাওয়ান তো যায় না। ক্যাঙ্গারু মূষিকের বেলাও দেখা দিল একই সমস্যা। এরা কিছুতে সমুদ্রের লবণাক্ত জল খাবে না। বিজ্ঞানীরা ভাবতে বসলেন। কিন্তু সমাধান সোজা নয়। এরা সাধারণ প্রাণী নয় যে কিছুক্ষণ জল খেতে না দিলে তেষ্টায় যা পাবে তাই খাবে। এদের তেষ্টাই পায় না!

ভাবতে ভাবতে তাঁদের মাথায় একটা বুদ্ধি এল—দুর্বুদ্ধিই বলতে হবে। তাঁরা মূষিকদের সোয়াবীন খেতে দিলেন। সোয়াবীন প্রোটিনে ভরপুর। সেই প্রোটিন শরীরে গিয়ে তৈরি করল প্রচুর ইউরিয়া। এটা শরীরের বাইরে বের করতে হলে অনেক বেশি প্রস্রাব করতে হবে। তাই শরীরে দেখা দিল জলের চাহিদা। তীব্র পিপাসায় এরা সমুদ্রের জল খেল বাধ্য হয়ে। বিজ্ঞানীরা অবাক হয়ে দেখলেন যে সেই ঘন লবণাক্ত জল ব্যবহার করে ক্যাঙ্গারু মূষিকের কিড্‌নী যে কেবল তার থেকে লবণটাই প্রস্রাবের সঙ্গে বের করে দিল, তাই নয়, সোয়াবীন থেকে আসা ইউরিয়াও বের করে দিয়ে রক্তকে পরিষ্কার করে নিল। আর কোন স্থলচর প্রাণী এভাবে সমুদ্রের জলকে পানীয় হিসাবে ব্যবহার করতে পারে বলে জানা নেই।

পরীক্ষায় আরও দেখা গেল পাঁচ সপ্তাহ ধরে 100 গ্রাম শুকনো যব খাওয়ার ফলে যে বর্জ্য পদার্থ তৈরি হয়, তা প্রস্রাবের সঙ্গে বের করে দিতে লাগে 13 গ্রাম জল। তাছাড়া এই সময়ে মলের সঙ্গে শরীরের বাইরে যায় মাত্র তিন গ্রাম। এর থেকে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে—যে প্রাণীর মল যত শক্ত এবং যার প্রস্রাবে বর্জ্য পদার্থের মাত্রা যত বেশি, সে প্রাণীর জলের চাহিদা তত কম। তাই হয়ত ছাগল, ভেড়া, খরগোস প্রভৃতি শুকনো এলাকায় নির্ঝঞ্ঝাটে জীবন যাপন করতে পারে।

যাই হোক, মল-মূত্রের সঙ্গে কতটা জল বাইরে যায় তা তো জানা গেল। এখন বাকী রইল—কতটা জল নষ্ট হয় ঘাম ও শ্বাস-প্রশ্বাসে। ক্যাঙ্গারু মূষিকের চামড়ায় ঘর্মগ্রন্থি নাই, যেটুকু আছে—তা কেবল পায়ের পাতায়। তাও আবার স্বগোত্রীয় অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় সংখ্যায় কম। তাই ঘর্মগ্রন্থির মাধ্যমে নষ্ট হয় খুব কম জল। এবার পরীক্ষা করা হল শ্বাস-প্রশ্বাস। তাতে দেখা গেল যদি আবহাওয়ায় একেবারে কোন জলীয় বাষ্প না থাকে তবে পাঁচ সপ্তাহে শরীর থেকে বেড়িয়ে যায় 44 গ্রাম জল, আর যদি আর্দ্রতার পরিমাণ 50 শতাংশ এবং তাপমাত্রা 75° ফা. হয় তবে বেরিয়ে যায় 25 গ্রাম।

এবার হিসাব-নিকাশের পালা। আগেই দেখা গেছে বাতাবরণ জলীয় বাষ্পহীন হলে 100 গ্রাম যব থেকে ক্যাঙ্গারু মূষিক পায় 54 গ্রাম জল; অথচ এই আবহাওয়ায় তার শরীর থেকে বেরিয়ে যায় 61 গ্রাম (মূত্র 14 + মল 3 গ্রাম + শ্বাসপ্রশ্বাস ও ঘাম 44 গ্রাম)। অর্থাৎ আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি; ফলে দেহের জলীয়াংশ হ্রাস; নীট ফল মৃত্যু। আবার আর্দ্রতা যখন থাকে 50 শতাংশ এবং তাপমাত্রা 75° ফা তখন 100 গ্রাম যব থেকে এরা পায় 67 গ্রাম জল; খরচ হয় 43 গ্রাম (মূত্র 14 + মল 3 গ্রাম + শ্বাস-প্রশ্বাস ও ঘাম 25 গ্রাম); ব্যালান্স শীটে দেখা গেল জমার ঘরে 24 গ্রাম; অর্থাৎ প্রচুর জল। নীট ফল—আনন্দে বেঁচে-বর্তে থাকা। অনুসন্ধানের নৌকা এসে গেছে তীরের কাছাকাছি।

বিজ্ঞানীরা স্থির করলেন—এবার মেপে দেখতে হবে এই মূষিকদের 'দেশ-গাঁয়ের আবহাওয়াটা কেমন। লোকজন, তাঁবু ও যন্ত্রপাতি চলল এরিজোনা মরুভূমিতে এদের স্বদেশে। চরম খরার দিনে এদের গর্তের দালান-কোঠায় লাগান শীতাতপ ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রক যন্ত্রের কার্যক্ষমতা পরীক্ষা করতে লেজে বেঁধে দেওয়া হল অতি ক্ষুদ্র এক উষ্ণতা ও আর্দ্রতা পরিমাপক যন্ত্র। হনুমানের লেজে আগুন ধরিয়ে ভুল করে তাকে ছেড়ে দেওয়ার ফলে লীলঙ্কায় যে প্রলয় অগ্নিকাণ্ড হয়েছিল, সে কথা বোধ হয় আগে ভাগেই বিজ্ঞানীরা জেনে রেখেছিলেন তাঁদের স্বভাষায় অনূদিত রামায়ণের উপাখ্যান থেকে। তাই মূষিক মহোদয়রা যাতে যন্ত্রপাতিসহ হাওয়া হয়ে না যায়, সেজন্য তাদের বেঁধে রাখা হল অতি সূক্ষ্ম অথচ শক্ত সুতো দিয়ে। যন্ত্রে দেখা গেল দিনের বেলায় গর্তের ভিতরে তাপমাত্রা 75 থেকে 88° ফা. এবং আর্দ্রতা 30

থেকে 50 শতাংশ। রাতের বেলায় গর্তের বাইরে তাপমাত্রা দাঁড়ায় 60 থেকে 75° ফা. এবং আর্দ্রতা 15 থেকে 40 শতাংশ। দিনের বেলা বাইরে আর্দ্রতা নেমে যায় প্রায় শূন্যের কোঠায় আর তাপমাত্রা 120 থেকে 140° ফা.।

আগের পরীক্ষা থেকেই জানা হয়ে গেছল—তাপমাত্রা যদি 75° ফা. হয় তবে এই মূষিক বেঁচে থাকতে পারে কমপক্ষে 10 থেকে 20 শতাংশ আর্দ্রতায়। তাপমাত্রা বেশি হলে সমতা রেখে আর্দ্রতাও বাড়াবার প্রয়োজন।

আমাদের শরীরের উত্তাপ 98·6° ফা। গ্রীষ্মের দিনে পারিপার্শ্বিক উত্তাপ দেহের উত্তাপকে উপরের দিকে ঠেলে তুলতে চায়; গরমে শরীর অস্থির হয়, ঘন ঘন তেষ্টা পায়। আমরা প্রচুর জল খাই। সেই জল বাষ্প হয়ে শরীর থেকে অনেকটা উত্তাপ নিয়ে উড়ে যায়। এই ভাবে আমাদের শরীরের তাপমাত্রা একই বিন্দুতে স্থির থাকে।

জ্বরে তাপমাত্রা 102 বা 103° ফা. ছাড়িয়ে গেলে রোগীর মাথায় জল ঢালা হয়; কপালে রাখা হয় বরফ ভরা আইস-ব্যাগ। এতেও কাজ না হলে ক্রোসিন বা ক্যালপল খাইয়ে দেন ফ্যামিলী ফিজিসিয়ান অবনী বাঁড়ুজ্যে।

বেচারা ক্যাঙ্গারু মূষিকের তাপ সহ্য করার ক্ষমতা আমাদের চেয়েও কম। শরীরের তাপ কিছুক্ষণ ধরে 100° ফা. হলেই পটল তোলে। ওদের তো আর যথেষ্ট ঘর্মগ্রন্থি নাই যে ঘেমে গিয়ে তাপ কমবে; খাবার জন্য শরীর অত জলই বা পাবে কোথায়? সেখানে অবনী বাঁড়ুজ্যেও নাই যে একটা ক্যালপল খাইয়ে দেবে।

আহৃত বৈজ্ঞানিক তথ্যের সমাবেশে মরু-মূষিকের শারীর-বৃত্তীয় প্রপঞ্চের উপর থেকে এতদিনে সরে গেল কৃষ্ণ যবনিকা। রহস্যের আড়াল থেকে সত্য বেরিয়ে এল মধ্যাহ্ন মার্তণ্ডের দীপ্তি নিয়ে। বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করলেন—নিদাঘের রুক্ষ মরুভূমির নিষ্করুণ আবহাওয়ায় এই মূষিকের জীবনযাপনের মূলে নাই কোন অহৈতুকী দেবী প্রভাব, আছে তিনটি বৈশিষ্ট্য: (1) দিনমানে বিবর-বাস, (2) নিশাচর বৃত্তি, আর (3) নাম মাত্র জলে শারীরবৃত্তীয় প্রয়োজন মিটিয়ে নেওয়ার অসাধারণ ক্ষমতা। যদি কোন দিন এই তিনটি বৈশিষ্ট্যের একটিরও অভাব ঘটে, তবে সেদিন মরুভূমির বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে মরু-মূষিকের বংশ! এর থেকে আর একবার প্রমাণিত হলো—আপাতদৃষ্টিতে যা প্রকৃতিপ্রাকৃত বলে মনে হয়, তার পেছনেও আছে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সব কিছুকেবিচার করার প্রবণতাই প্রকৃত লাভের পথ।

নীলস বোর ও পরমাণুর সৌরজগৎ

সূর্যেন্দুবিকাশ করমহাপাত্র*

এ বছর 7ই অক্টোবর পরমাণুর মডেলের রূপকার নীলস বোরের জন্মের একশো বছর পূর্ণ হবে। নীলস বোরের বাবা ক্রিস্টিয়ান বোর কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরতত্ত্বের অধ্যাপক ছিলেন। কোপেনহেগেনই নীলস জন্মেছিলেন ও একই বিশ্ববিদ্যালয়ে নামকরা সসার খেলোয়াড় ও পদার্থ বিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে খ্যাতিমান হয়ে উঠেছিলেন। সেখানে 1911 খৃস্টাব্দে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। তার আগেই মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে তরল পদার্থের পৃষ্ঠটানের পরিমাপের উপর মৌলিক গবেষণা করে খ্যাতি লাভ করেন। 1912 খৃস্টাব্দে নীলস বোর ম্যাঞ্চেস্টারে রাদারফোর্ডের গবেষণাগারে যোগদান করেন। এই গবেষণাগারেই বোর তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার পরমাণুর আভ্যন্তরীণ গঠনের প্রতিরূপ আবিষ্কার করেন। 1913 খৃস্টাব্দে এই গবেষণা প্রকাশিত হয় ও এজন্য বোর 1922 খৃস্টাব্দে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

বোরের এই আবিষ্কারের পটভূমিতে তিনি পূর্ববর্তী বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল কাজে লাগিয়েছিলেন। 1907 খৃস্টাব্দে রাদারফোর্ড ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। সেখানে পাতলা ধাতুর পাতে আলফা কণার বিচ্ছুরণ পরীক্ষায় লক্ষ্য করলেন যে প্লাটিনামের পাতলা পাতে 4000 আলফা কণার ভেতর অন্তত একটি কণা সমকোণের চেয়ে বেশী কোণ নিয়ে বেঁকে ফিরে আসছে। রাদারফোর্ডের ভাষায় এ-যেন কামানের গোলা পাতলা টিস্যু কাগজে বাধা পেয়ে গোলন্দাজের উপরই ফিরে আঘাত করছে। টমসন ও অন্যান্য বিজ্ঞানীরা এতদিন ধারণা করে এসেছেন যে পরমাণুতে পজিটিভ আধান ব্যাপ্ত রয়েছে। তা হলে তো তা টিস্যু কাগজের মতই হবে। কিন্তু রাদারফোর্ডের পরীক্ষায় প্রমাণিত হল সে পরমাণুর কেন্দ্র প্রায় 10^{-13} সেমি ব্যাসের আয়তনে বেশ শক্ত ও ভারী গঠনের, আর তার পজিটিভ আধান বাইরের ইলেকট্রন মেঘের সমান আধান দিয়ে পরমাণুকে উদাসীন রাখে।

বাইরের ইলেকট্রনগুলির গঠনবিন্যাস তখনও অজানা। বোর হাইড্রোজেন পরমাণুর প্রতিরূপ খাড়া করতে গিয়ে বিজ্ঞানের দুটি আবিষ্কার কাজে লাগালেন প্রথমটি হল বামারের হাইড্রোজেন বর্ণালীর পরীক্ষা যাতে হাইড্রোজেন পরমাণু থেকে বিভিন্ন কম্পাংকের রেখা বর্ণালী পাওয়া গিয়েছিল, দ্বিতীয়টি হল প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্ব যাতে বিকিরণের কোয়ান্টাম বা কণাধর্ম আবিষ্কৃত হয়েছিল। এ থেকে বোর কিভাবে পরমাণুতে বিকিরণ শোষিত হয় ও পরে বিকিরণ হয় তা স্থির করেন। তাঁর সিদ্ধান্ত হল পরমাণুর ইলেকট্রন একটি স্তর থেকে অন্য স্তরে নেমে এলে শক্তির বিকিরণ হয়। পরমাণু শক্তি যখন শোষণ করে তা কণা অর্থাৎ কোয়ান্টাম হিসেবে করে। এই কোয়ান্টামের শক্তি $h\nu$—h প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক, ν হল ঐ কোয়ান্টামের শক্তির বিকিরণ কম্পাংক। এই শক্তি হল হাইড্রোজেনের দুটি শক্তিস্তরের পার্থক্য। ইলেকট্রন এ রকম নির্দিষ্ট স্তরে কক্ষে বিচরণ করে। দুটি স্তরের মাঝখানে তার অবস্থানের সম্ভাবনা নেই। সাবেকী তত্ত্বে গতিশীল আধানের শক্তি বিকিরণ অনিবার্য ছিল। কিন্তু বোরের সিদ্ধান্ত হল একটি কক্ষে অর্থাৎ স্তরে যখন ইলেকট্রন থাকে তখন তা গতিশীল হলেও শক্তি বিকিরণ করে না।

বোরের এই সিদ্ধান্ত সাবেকী তত্ত্বের বিরুদ্ধে গেলেও তার নির্ভুলতা প্রমাণ হল 1924 খৃঃ, ডিব্রগলী যখন ইলেক্ট্রনের তরঙ্গরূপ আবিষ্কার করেন ও শ্রোডিংগার প্রমাণ করেন যে পরমাণুর কক্ষে বাঁধা ইলেকট্রনের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এক বা একাধিক পূর্ণ সংখ্যায় থাকে, এই অবস্থায় ইলেকট্রনের শক্তির স্থির তরঙ্গ থেকে বিকিরণ সম্ভব নয়। তাই সাবেকী পদার্থ বিজ্ঞানের সঙ্গে বোরের আবিষ্কৃত পরমাণুর মডেলের বিরোধ ঘটে না।

বোর এই নূতন মডেলের হাইড্রোজেনের বিভিন্ন কক্ষের শক্তি হিসেব করে হাইড্রোজেনে পরীক্ষালব্ধ বর্ণালীর মিল প্রমাণ করেন। মোসলে ভারী পরমাণুতে রঞ্জেন রশ্মির বিকিরণে বিভিন্ন কম্পাংকের নির্দিষ্ট শক্তি রেখা বর্ণালীর আবিষ্কার করেছিলেন। এ থেকে বোর সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে ভারী পরমাণুতে ইলেকট্রন এক একটি কোষে নির্দিষ্ট সংখ্যায় থাকবে। বোরের এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ও পউলির অপবর্জন নীতির সাহায্যে মৌলিক পদার্থের পর্যায় সারণীর অর্থ সহজে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হল। বোরের আবিষ্কারে প্রমাণিত হল যে, পরমাণুকেন্দ্রের বাইরে ভিন্ন ভিন্ন কক্ষে ইলেকট্রগুলির অবস্থান সূর্যের বাইরের কক্ষের গ্রহদের মত। তাই সৌর জগতের রূপকার কেপ্‌লারের সঙ্গে কেউ কেউ নীলস্‌ বোরের তুলনা করেন।

বোরের নামের সঙ্গে অন্য যে দুটি নীতি জড়িয়ে আছে তা হল সাদৃশ্য নীতি (correspondence principle) ও অনুপূরকতা নীতি (principle of complementarity)। সাদৃশ্যনীতিতে পরমাণুর কোয়ান্টাম মডেল ও সাবেকী

* সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-9

ধারণার মধ্যে বৃহৎ পদার্থের বেলায় পার্থক্য থাকবে না। অনুপূরকনীতির সার কথা হল ইলেকট্রনের তরঙ্গ ও কণার দ্বৈতরূপের কোনটিই বাতিল নয়, এরা পরস্পরের অনুপূরক।

বোরের আর একটি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার হলো ছাত্র হুইলারের সঙ্গে পরমাণু কেন্দ্রের তরল বিন্দু মডেলের রূপ দিয়ে ইউরেনিয়াম কিসনে 235 আইসোটোপের কার্যকারিতা প্রমাণ করা।

1943 খৃস্টাব্দে বোর সপরিবারে জার্মান অধিকৃত ডেনমার্ক থেকে সুইডেন ও ইংল্যাণ্ড হয়ে আমেরিকা পালিয়ে আসেন। ম্যানহাটান প্রোজেক্ট লস অ্যালামস্ গবেষণাগারে যোগ দেন। সেখানে নিউক্লীয় বোমা তৈরির কর্মকাণ্ডের তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানের তিনি ছিলেন উপদেষ্টা। ডেনমার্ক থেকে চলে আসার সময় নীলস বোর ও তাঁর ছেলে আগী বোর (1975 খৃস্টাব্দে পরমাণু কেন্দ্রের গঠনবিন্যাস আবিষ্কারের জন্য মটলসন ও রেনওয়াটারের সঙ্গে নোবেল পুরস্কার পান) যথাক্রমে নিকোলাস বেকার ও জিম বেকার ছদ্মনাম গ্রহণ করেছিলেন।

লস অ্যালামস গবেষণাগারে তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানে তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। তরুণ বিজ্ঞানীদের প্রেরণা যোগাতে তাঁর জুড়ি ছিল না। রিচার্ড ফেইনম্যান (1965 খৃস্টাব্দে মৌলিক কণা সংক্রান্ত গবেষণার জন্য টোমোনাগা ও সুইংগারের সঙ্গে নোবেল পুরস্কার পান) তখন পঁচিশ বছর বয়সেই লস অ্যালামস গবেষণাগারে উল্লেখযোগ্য পদে ছিলেন। বিজ্ঞানের যে কোন বিষয়ে তর্ক চালিয়ে যেতে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় আর এরকম তর্কে প্রবীণ বিজ্ঞানীদেরও তিনি সমীহ করতেন না। এমন কি প্রধান বিজ্ঞানী বেথের সঙ্গেও তাঁর ঘণ্টার পর ঘণ্টা তর্ক চলত। বেথে খুব ঠাণ্ডা মাথায় এই তরুণ বিজ্ঞানীর মতামত শুনতেন। নীলস বোর কোন নতুন ধারণা মাথায় এলে বিজ্ঞানীদের মিটিং-এ আলোচনার আগে ফেইনম্যানের সঙ্গে তর্ক যুদ্ধ করে যাচাই করে নিতেন।

ফেইনম্যান একবার আগী বোরকে প্রশ্ন করেছিলেন তোমার বাবা এত বিজ্ঞানী থাকতে আলোচনার জন্য আমাকে কেন বেছে নিলেন বলতো? আগী উত্তর দিয়েছিলেন এখানে অনেকেই বাবার ছাত্র সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা করে ও বিনয়ের সঙ্গে কথা বলে। এখানে তিনি লক্ষ্য করেছেন তুমি কাউকে সমীহ করে কথা বল না তাই তোমার সঙ্গে আলোচনায় তাঁর মনে হয় তাঁর ধারণা ভুল কিনা যাচাই ভালভাবে হয়ে যায়। অই তোমাকে আলোচনার যোগ্য ব্যক্তি মনে করেন।

দৈনন্দিন জীবনে বোর ছিলেন অন্যমনস্ক মানুষ। লস অ্যালামসের মিলিটারী পরিচালক গ্রোভসের কাছে তাঁকে প্রায়ই আসতে হত। গাড়ী চালিয়ে আসার সময় থামার জায়গাটিতে হঠাৎ ব্রেক করতেন, ঘনঘন হর্ন বাজাতেন, গার্ডেরা হৈ-চৈ করে উঠত আর গ্রোভ জানালার ফাঁকে এইসব শব্দ শুনেই বুঝতে পারতেন বোর এসেছেন; তখন আলোচনার পর একজন প্রহরীকে সঙ্গে দিয়ে তাঁকে বাড়ী পাঠাতেন।

1945 খৃস্টাব্দে কোপেনহেগেনে ফিরে বোর ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের থিওরেটিক্যাল পদার্থবিজ্ঞানের পরিচালক হন। এখন এই গবেষণাগার বোর ইনস্টিট্যুট নামে খ্যাতি লাভ করেছে। বোর ডেনিস অ্যাটমিক এনার্জী কমিশনের সভাপতি। 1955 খৃস্টাব্দে জেনেভায় পরমাণু শান্তি সম্মেলনের অন্যতম নেতা ও CERN গবেগণাগার প্রতিষ্ঠার অন্যতম পুরোধা ছিলেন। বোর কোলনে জেনেটিক্স গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেছিলেন—এ সম্পর্কে তৈরি খসড়া অসমাপ্ত রেখেই 1962 খৃস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। বোর ইন্সটিট্যুট পাঁচ বছর অন্তর তাঁর স্মৃতিতে জার্নাল অব জকুলার ফিজিক্স পত্রিকা প্রকাশ করেন। তাতে বোর সম্পর্কীয় স্মৃতিচারণে মানুষ ও বিজ্ঞানী হিসেবে নীলস বোর স্ব-মহিমায় উজ্জল হয়ে ওঠেন।

এই মহিমা নিয়ে তিনি আমৃত্যু বিজ্ঞান জগতে ছিলেন একটি জনপ্রিয় শিরোনাম। তাঁর মৃত্যুতে শোকবার্তায় কক্রফ্ট বলেছিলেন মানবতার প্রতীক তরুণ বিজ্ঞানীদের বন্ধু ও প্রেরণার উৎস হিসেবে বোর স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। বোরের জীবদ্দশায় আইনস্টাইন বলেছেন "বোর এমন একজন চিন্তাবিদ বিজ্ঞানী যিনি তাঁর বোধি ও বিশ্লেষণ ক্ষমতায় লুকানো রহস্য খুঁজে পান, তাঁর এই বিস্ময়কর প্রতিভাই আমাদের আকর্ষণ করে।"

1960 খৃস্টাব্দে বোর ভারতে এসে কলিকাতায় সাহা ইনস্টিট্যুটে 'সাহা স্মৃতি বক্তৃতা' প্রদান করেন।

অস্থিরমতি বর্ষা

শিবচন্দ্র ঘোষ*

বর্ষার খামখেয়ালের বুঝি অন্ত নেই! এই তো গত বছর উত্তরপ্রদেশ থেকে আসাম পর্যন্ত উত্তর ভারতের এক বিরাট অংশ জুড়ে হল বন্যার তাণ্ডব। কলিকাতা মহানগরী সহ পশ্চিম বাংলার গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলে ঘটল অভূতপূর্ব প্লাবন ও জলোচ্ছ্বাস। পঞ্চাশ লক্ষাধিক মানুষ ক্ষয়-ক্ষতির শিকার হল। গত বছর জুন মাসের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ পূর্ব পূর্ব বছরের জুন মাসের বৃষ্টিপাতের পরিমাণকে ছাপিয়ে গেল, এমনকি গত বছরের জুন জুলাই মাসের পরিমাণ (1336 মিলিমিটার) এক নূতন দৃষ্টান্ত হয়ে রইল। কিন্তু এ বছর কি সে রকম বর্ষা হল? এ বছর শ্রাবণ মাসের শেষভাগে কি আদৌ সেরকম বৃষ্টিপাত হয়েছে যা সচরাচর শ্রাবণ মাসে হয়ে থাকে? অথচ এ বছর ভাদ্রের আঙিনায় শ্রাবণের ক্ষ্যাপা মেঘ বার বার ছুটে এসে বৃষ্টিপাত ঘটিয়ে চলেছে।

কিন্তু কেন গত বছর ভারতের এই অঞ্চলে বর্ষার এত দাপট আর কেনই বা এই বছর এই অঞ্চলে বর্ষা এত ম্রিয়মাণ? কেনই বা বছরে বছরে অতিবৃষ্টি ও স্বল্পবৃষ্টি খরার মাঝে ভারতীয় বর্ষার এই দোদুল্যমানতা?

ভারতের কৃষিনির্ভর অর্থনীতির ক্ষেত্রে এই সব প্রশ্নের উত্তর একান্ত জরুরী। আর এর সঙ্গে ভারতের শতকরা 70 ভাগ লোক যাঁরা কৃষিজীবী তাঁদের বাঁচা-মরার প্রশ্ন জড়িত। ভূগোলবিদগণ এ সব কিছুই দেখেন, কিন্তু সাধারণ মানুষের মতো ওপর ওপর চোখের দেখা দেখেই সন্তুষ্ট থাকেন না। তাঁরা সব কিছু তলিয়ে দেখেন এবং বলেন যে ভৌত পদ্ধতিতে অঞ্চল গত ভাবে এবং সারা পৃথিবী জুড়ে বায়ুপ্রবাহের ঋতু ভেদে পরিবর্তন হয় তার সঠিক বোঝাপড়ার মাধ্যমেই এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলির জবাব পাওয়া সম্ভব।

বায়ুপ্রবাহ ও বায়ু চাপবলয়গুলির উৎপত্তির প্রধান কারণ প্রতি বছর ভূপৃষ্ঠের $23\frac{1}{2}°$ ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশে সূর্যের উত্তরায়ন এবং $23\frac{1}{2}°$ ডিগ্রী দক্ষিণ অক্ষাংশে সূর্যের দক্ষিণায়ন। পৃথিবী নিজ কক্ষতলে $66\frac{1}{2}°$ ডিগ্রী কোণে হেলে আপন অক্ষের চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে সূর্যকে বছরে একবার প্রদক্ষিণ করে বলেই কর্কটক্রান্তি রেখা ও মকরক্রান্তি রেখার মধ্যবর্তী এলাকাতেই সূর্যের এই আপেক্ষিক বা আপাতগতি উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন সীমাবদ্ধ থাকে এর বাইরে নয়। এই সীমাবদ্ধ এলাকায় মধ্যাহ্ন সূর্য প্রায় লম্বভাবে কিরণ দেয়। কিন্তু এই এলাকার বাইরে ভূপৃষ্ঠের অন্যান্য স্থানে সূর্যরশ্মি বাঁকাভাবে পড়ে। সূর্যরশ্মি কি হারে পৃথিবীকে উত্তপ্ত করবে তা ভূপৃষ্ঠে আপতিত সূর্যরশ্মির আপতন কোণের উপর নির্ভর করে, দিনরাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধি, ঋতুভেদে এবং অক্ষাংশের পার্থক্যে সূর্যরশ্মির পতন কোণের তারতম্য হয়। নিম্ন অক্ষাংশে সূর্যরশ্মি অনেক বেশি খাড়া ভাবে অল্প স্থানে পড়ে বলে উষ্ণতা বেশি হয়। সমপরিমাণ সূর্য রশ্মি উচ্চ অক্ষাংশে অনেক বেশি বাঁকা ভাবে ও অনেকটা জায়গা জুড়ে পড়ে বলে উষ্ণতা কম হয়। সূর্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের ফলে ভূপৃষ্ঠে ভিন্ন ভিন্ন অক্ষাংশে সূর্য থেকে পাওয়া সৌরতাপের হেরফের হয়। ফলে পৃথিবীর প্রধান বায়ুপ্রবাহগুলি উত্তর গোলার্ধে 6° ডিগ্রী থেকে 10° ডিগ্রী উত্তরে ও দক্ষিণ গোলার্ধে 6° ডিগ্রী থেকে 10° ডিগ্রী দক্ষিণে সরে যায়। এখানে মনে রাখা দরকার পৃথিবীর বায়ুচাপ-বলয়গুলি পূর্ব পশ্চিমে অক্ষাংশ বরাবর পৃথিবীকে বেষ্টন করে রয়েছে।

দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের বৃষ্টিপাতের ব্যবস্থাটা নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত এবং এটা যেভাবে উত্তরে সরে যায় তা একটা ব্যতিক্রম। এই অঞ্চলে গ্রীষ্ম মৌসুমির উত্তরে বিস্তৃতির প্রকৃতিটাই অসাধারণ যা পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় না। দক্ষিণ এশিয়ার অবস্থান, গ্রীষ্মে এশিয়া মহাদেশের স্থল ভাগ দ্বারা সৌর তাপ গ্রহণ, বিশাল হিমালয় পর্বতমালা ও তিব্বতীয় মালভূমির উপস্থিতি, এই কারণগুলির সাহায্যেই এই প্রাকৃতিক ঘটনাকে সাধারণত ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়। ভারতে গ্রীষ্ম মৌসুমির উৎপত্তি ও তার তীব্রতার সৃষ্টিতে এসব অনড় ভৌগোলিক উপাদানগুলির ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হলেও পৃথিবীর বায়ু-প্রবাহ ব্যবস্থার ন্যায় গতিশীল ভৌগোলিক উপাদানগুলির সম্পর্কেও চিন্তাভাবনা করতে হবে। এর মাধ্যমেই ভারতে বছরে বছরে বৃষ্টিপাতের তারতম্যের কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে।

পৃথিবীর বায়ুচাপবলয় ও বায়ুপ্রবাহগুলি ভাল করে করে লক্ষ্য করিলে একটা ব্যাপার আমাদের নজর এড়াতে পারে না যে বায়ুমণ্ডলের নিম্নাংশে এলোমেলোভাবে নিম্ন-চাপ কক্ষ ও উচ্চ-চাপ কক্ষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলেও বায়ুমণ্ডলের উপরের স্তরগুলি কিন্তু সরল ধাঁচের। পৃথিবীর উত্তর-গোলার্ধে ও দক্ষিণ গোলার্ধে মধ্য অক্ষাংশ জুড়ে অক্ষরেখা বরাবর একক বিশাল বায়ুবলয় পৃথিবীকে মেখলার মতো ঘিরে রয়েছে। এই বায়ুবলয়—এরাই পৃথিবীর প্রধান বায়ুপ্রবাহ সমূহ—ভূপৃষ্ঠ থেকে 15 কি. মি. ঊর্ধ্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। এই বায়ুবলয়টি মেরু প্রদক্ষিণকারী আবর্ত (Circumpolar vortex) নামে পরিচিত এবং পৃথিবীর আবহাওয়া ও জলবায়ুকে এরা বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত করে। ভারতের বর্ষাও এর ব্যতিক্রম নয়।

* 11/2, গোয়াবাগান স্ট্রীট, কলিকাতা-700 006

পৃথিবীর ক্রান্তিয় উচ্চচাপ বলয় থেকে দুই মেরুবৃত্ত প্রদেশীয় নিম্নচাপ বলয়ের দিকেও দুটি বায়ুপ্রবাহ উভয় গোলার্ধে 35° থেকে 60° অক্ষাংশের মধ্যে সারাবছর নির্দিষ্ট পথে প্রবাহিত হয়। এদের পশ্চিমা বায়ু বলে। উত্তর গোলার্ধে পশ্চিমা বায়ু তরঙ্গের আকারে এঁকে-বেঁকে চলে এবং এই বায়ুপ্রবাহে সৃষ্ট আবহাওয়া দক্ষিণে অনেক দূর পর্যন্ত নেমে এসে ভারতের উত্তরাংশের আবহাওয়াকে প্রভাবিত করে শীতকালে বৃষ্টিপাত ঘটায়। ভারতে প্রতিবছর গ্রীষ্মমৌসুমীর উৎপত্তি তার স্থায়িত্ব ও হালচালের অনেকটাই উত্তর গোলার্ধে পশ্চিমা বায়ুপ্রবাহের ছাঁচে প্রভাবিত, বোধ হয় নির্দিষ্ট ঋতুতে পশ্চিমা বায়ুবলয় সাধারণত যতটা দক্ষিণে নেমে আসে তার চেয়ে আরও দক্ষিণে নেমে আসার ফলে বায়ুমণ্ডলে যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল, তার ফলেই ভারতে গত বছর বর্ষার অস্বাভাবিকতাটা প্রকট হয়েছিল। কিন্তু তাই বলে এটা ধরে নেওয়া ভুল হবে যে একমাত্র এই কারণটি (যদিও একটি প্রধান কারণ) গত বছরে ভারতে বর্ষার অতিবর্ষণের জন্য একমাত্র দায়ী আর পৃথিবীব্যাপী বায়ুচাপ বলয়গুলি ও নিম্ন অক্ষাংশে তাদের তারতম্যের, এ বিষয়ে কোন দায়-দায়িত্ব নেই।

গ্রীষ্মমৌসুমী মূলত নিম্ন অক্ষাংশে বায়ুচাপ বলয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ গ্রীষ্মমৌসুমী সৃষ্টিতে এক বিরাট ভূমিকা পালন করে। যন্ত্রগণকের সাহায্যে দেখা গেছে আন্তক্রান্তীয় অভিসারী অঞ্চল নামে পরিচিত নিরক্ষীয়-নিম্নচাপবলয়ের অবস্থান সমুদ্রপৃষ্ঠের সর্বোচ্চ উষ্ণতার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। গ্রীষ্মমৌসুমী বায়ুপ্রবাহের সময় ভারতের স্থলভাগে সূর্যতাপে প্রচণ্ড নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। তখন আন্ত-ক্রান্তীয় অভিসারী ঘূর্ণবাত বঙ্গোপসাগরের তীরে অপেক্ষা করে তার পর উত্তর-পূর্ব ভারতে প্রবেশ করে ধীরে ধীরে পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে ধাবিত হয়। ক্রান্তীয় অঞ্চলের এই দুর্বল ঘূর্ণবাতগুলির বৈশিষ্ট্য হল জলীয় বাষ্পপূর্ণ মেঘ বহন করে এনে বৃষ্টিপাত ঘটানো।

ভারতীয় আবহ বিভাগের অধিকর্তা স্যার গিলবার্ট ওয়াকার এই শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভারতের বর্ষা সম্পর্কে অনেক সমীক্ষা ও নিরীক্ষা করে নিরক্ষীয় অঞ্চলে বিভিন্ন অক্ষাংশে বায়ুচাপের বিস্তারে এক তীব্র দোলনের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন।

যদি কোন কোন বছরে প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর বায়ুর উচ্চ চাপ হয় তবে সাথে সাথে ভারত মহাসাগরের ওপর বায়ু চাপ নিম্ন হবার প্রবণতা দেখা যায়। আবার অন্যান্য বছরে ঠিক এর উল্টোটাই ঘটে। অর্থাৎ ভারত মহাসাগরে বায়ুর উচ্চচাপ হলে প্রশান্ত মহাসাগরে বায়ুর নিম্নচাপ হবার প্রবণতা দেখা যায়। ওয়াকার এই প্রাকৃতিক ঘটনার নাম দেন "দক্ষিণী-দোলন"। ভারতে বর্ষায় বৃষ্টিপাত সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করার বেলায় যদিও ওয়াকার তাঁর সংখ্যায়নতত্ত্বে এই "দক্ষিণী-দোলনের" সাহায্য নিয়েছেন তবুও এই সেদিন পর্যন্ত এই ঘটনার দিকে সাধারণ আবহবিদদের দৃষ্টি পড়ে নি। সমুদ্রতলের উষ্ণতার সঙ্গে "দক্ষিণীদোলনের" ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ব্যাপারটা সম্প্রতি আবিষ্কার হওয়ার সাথে সাথে বিজ্ঞানী মহলে এ সম্পর্কে এক গভীর আগ্রহের সঞ্চার হয়েছে। 1901 থেকে 1984 পর্যন্ত ভারতে গ্রীষ্ম মৌসুমী এবং "দক্ষিণীদোলন" সম্পর্কে পর্যালোচনা করে ভারতীয় আবহবিদ জে, শুক্লা দেখিয়েছেন যে এর মাধ্যমেই ভারতে বছরে বছরে গ্রীষ্ম মৌসুমীর বৃষ্টিপাতের তারতম্যের গূঢ় কারণের সন্ধান পাওয়া যাবে। "দক্ষিণীদোলনের" গতি-প্রকৃতির সাহায্যে ভবিষ্যতে ভারতে অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য ভবিষ্যৎবাণী করা সম্ভব হবে।

বৃদ্ধ বয়সে শারীরিক বিবর্তন

মনীশ প্রধান*

মাইকেল মধুসূদন দত্তের কবিতার উদ্ধৃতি দিয়েই প্রবন্ধ আরম্ভ করি—

'জন্মিলে মরিতে হবে
অমর কে কোথা কবে
চিরস্থির কবে নীর
হায় রে জীবন নদে।

জন্মের পরে মৃত্যু চিরন্তন। বাস্তব। স্বাভাবিক প্রকৃতির নিয়ম।

তবে স্বাভাবিক মৃত্যু আসে বৃদ্ধ বয়সে। কেন? বার্ধক্যে শরীরে কি কোন পরিবর্তন হয়? কত বয়স হলে মানুষকে বৃদ্ধ বলা যায়?

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আবহাওয়া ও অর্থনৈতিক মানের উপরে দেশের মানুষের স্বাস্থ্য ও আয়ু নির্ভর করে এবং দেশবাসীর বার্ধক্য দ্রুত ও বিলম্বিত হতে পারে। অবশ্য বিশেষ ক্ষেত্রে মানুষের পেশা ও নেশার জন্য বার্ধক্য দ্রুত আসতে পারে।

গত 50,000 হাজার বছরে মানুষের গড় বয়স আর বাড়ে নি। যা আগে ছিল এখনও প্রায় সেই অবস্থায় আছে। বার্ধক্য বিজ্ঞান গবেষকরা (Geriatric Research Scientist) আশা করছেন দ্রুত রোগ নির্ণয় ও উন্নত চিকিৎসায় অদূর ভবিষ্যতে মানুষের গড় আয়ু আরও বাড়বে।

অবশ্য মাঝে মাঝে খবরের কাগজের মাধ্যমে আমরা দীর্ঘজীবী মানুষের খবর পাই। যেমন মধ্য এশিয়ার ককেশাস অঞ্চলে বহু দীর্ঘজীবী মানুষের সন্ধান পাই। তাদের মধ্যে কয়েক জনের বয়স 125 থেকে 150 বছর বলে দাবী করা হয়।

কিন্তু 110 বছরের বেশি বয়সের মানুষ পৃথিবীতে খুবই কম। চিকিৎসকদের মতে আজ পর্যন্ত সব চেয়ে বেশী বয়সের যে মানুষের খবর পাওয়া যায়, তার নাম পিয়ের জোবার্ট। থাকতেন কানাডার কুইবেক রাজ্যে। তাঁর পেশা ছিল চামড়া ব্যবসা। তাঁর জন্ম 1701 খৃঃ 1 ই জুলাই, আর মৃত্যু 1814 খৃঃ 16ই নভেম্বর। অর্থাৎ তিনি বেঁচে ছিলেন 113 বছর 124 দিন।

তাহলে কি তাঁরা মিথ্যা কথা বলেন? বোধ হয় না। সম্ভবত বৃদ্ধবয়সে তাঁরা নিজেদের বয়স ভুল করেন। হয়ত তাঁদের নিজের জন্ম তারিখ মনে থাকে না। অবশ্য কেউ হয়তো নিজের বয়েস বাড়িয়ে বলে আনন্দ পেতে পারেন। অনেক সময় পরিবারের দু-জনের বয়স যোগ হওয়ায় এই ধরনের গোলমাল হয়ে থাকতে পারে।

অবশ্য আধুনিক যুগে উন্নত চিকিৎসার কল্যাণে মানুষের মৃত্যুহার আজ অনেক কমে গেছে। মানুষ বাঁচছেও বেশী দিন। তবে বয়েস বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানব শরীরের কোষ সমূহে নানা রকম পরিবর্তন হয়। এবং গঠনতন্ত্রের বিভিন্ন অঙ্গে পরিবর্তন রোধ করা এখনও সম্ভব হয় নি।

এই পরিবর্তন নিয়ে গবেষণা আজ বিশ্বের বিজ্ঞানীদের গবেষণার বিষয়। বিশ্বের নানা দেশে এখন গবেষণা হচ্ছে বার্ধক্যে কি ধরনের পরিবর্তন হয়? প্রত্যেক কোষে কি হয়? আর সমস্ত অঙ্গে কি হয়? এই পরিবর্তনে কোন বংশগত ধারা, জীন বা পরিবেশের প্রভাব আছে কিনা?

মানুষের বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে দৈহিক গঠনতন্ত্রে বিভিন্ন অঙ্গে পরিবর্তন আসে। বৃদ্ধ বয়সে যে পরিবর্তন বিভিন্ন অঙ্গে হয় তা রোধ করা এখনও সম্ভব হয় নি। এই পরিবর্তনে বিভিন্ন অঙ্গের কর্মক্ষমতা ধীরে ধীরে ব্যাহত হতে থাকে এবং তার পরিণতিতে আসে জীবের মৃত্যু।

শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে বা কোষে পরিবর্তনের প্রকৃতি এক রকম নয়। কোথাও কোষ সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, কোথাও বা কমে যায়। অস্থিতে ক্যালসিয়াম লবণ কম হয়, আবার কোথাও বা তান্তব পরিবর্তন ঘটে।

বিভিন্ন অঙ্গে পরিবর্তন প্রকৃতি নিম্নরূপ—

(ক) মস্তিষ্ক: সাধারণভাবে সমস্ত মস্তিষ্কে ক্ষয়ের চিহ্ন দেখা যায়, তবে মস্তিষ্কের সামনের দিকের ফ্রণ্টাল অংশে (frontal lobe) জাইরাই সঙ্কোচন এবং খাড়িগুলির (sulci) বিস্তৃতি দেখা যায়, সাধারণত 60 বছরের পর।

মস্তিষ্ক আচ্ছাদনীর (menings) নীচে স্বাভাবিক অবস্থায় যে সামান্য ফাঁক থাকে, বৃদ্ধ বয়সে তা বৃদ্ধি পায়। মস্তিষ্কের সাদা ও ধূসর অংশ উভয় অংশের ক্ষয় হয়, তবে ধূসর অংশ 50 বছরের আগে ক্ষয় হয় এবং সাদা অংশের ক্ষয় হয় 50 বছরের পরে। যারা স্বাভাবিক অবস্থায় দীর্ঘজীবী হয় তাদের মস্তিষ্কের ওজনের শতকরা 10-12 ভাগ কমে যায়। মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহ বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে কম হতে থাকে; যেমন 18 বছর বয়সে প্রতি 100 গ্রাম মস্তিষ্কে প্রায় 79 মিঃলিঃ রক্ত সরবরাহ হয়, সেখানে 60 বছরে একই পরিমাণ মস্তিষ্কের জন্য রক্ত সরবরাহ হয় প্রায় 48 মিঃ লিঃ।

(খ) হৃৎপিণ্ড ও ধমনী: যে পেশীকে বেশী কাজ করতে হয়, সেই পেশী পরিণামে পুরু হয়। হৃৎপিণ্ড এমনই এক পেশী থাকে জন্মের পর থেকে বিরামহীন কাজ করতে হয়।

* 53এ, জয়মিত্র স্ট্রীট, কলিকাতা-700005

এটি আজ সর্বজনস্বীকৃত তথ্য যে হৃৎপিণ্ডের পেশী বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে পুরু হয়। কতটা পুরু হবে তা বয়সের উপর নির্ভরশীল। যাদের উচ্চ রক্তচাপ থাকে, তাদের বাম নিলয় (Left ventricle)-এর পেশী পুরু হতে থাকে। এক্ষেত্রে যাদের বয়স কম তারাও রেহাই পায় না। কিন্তু যাদের রক্তের চাপ স্বাভাবিক বা কম, তাদেরও বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে বাম নিলয় পুরু হতে থাকে। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে 80 বছর বয়সে বাম নিলয়ের পেশী 30 বছর বয়সের তুলনায় শতকরা 25 ভাগ বেশী পুরু হয়।

হৃৎপিণ্ডের প্রধান ধমনী অ্যাওরটার স্থিতিস্থাপকতা কমে গিয়ে শক্ত হয় এবং ভাঁজ খুলে গিয়ে ভিতরের ব্যাস বিস্তৃত হয় (aorta looses elasticity, unfolded and dilated)। হৃৎপিণ্ডের রক্ত উৎক্ষেপণ 30-80 বছরের মধ্যে শতকরা 40 ভাগ কমে যায়।

হৃৎপিণ্ডের রক্ত উৎক্ষেপণ কমে যাওয়ায় শরীরের কর্মক্ষমতা কম হয়। অবশ্য সেই অল্প পরিমাণ রক্ত বৃদ্ধ বয়সের প্রয়োজন মেটাতে পারে; কিন্তু প্রয়োজনের তাগিদে বেশী রক্ত সরবরাহ করতে পারে না। যখন কোন জীবাণু ঘটিত রোগ, জ্বর, রক্তাল্পতা ঘটে তখন শরীরের সব অঙ্গে রক্ত কম পরিমাণে যায় এবং হৃৎপিণ্ডের রোগ সৃষ্টি হয়।

(গ) ফুসফুস: বৃদ্ধবয়সের ফুসফুস হালকা ও তুলোর আঁশের মত নরম হয়।

বুকের খাঁচার সামনে-পিছনের ব্যাস বৃদ্ধি হয়। পাঁজরার তরুণাস্থিতে (costal cattilage) বেশী মাত্রায় ক্যালসিয়াম লবণ জমে, ফলে পাঁজরার সচলতা কমে যায়। পিঠের দিকে মেরুদণ্ড ঝুঁকে যায়, ফলে বৃদ্ধ বয়সে মানুষ কিছু কুঁজো (Kyphosis) হয়ে যায়। এই ধরণের পরিবর্তন হওয়ায় বৃদ্ধ বয়সে শ্বাসকার্যের ক্ষমতা শতকরা 40 ভাগ কমে যেতে পারে।

(ঘ) বৃক্ক (Kidney): শরীরের অন্যান্য অঙ্গের (Organ) মত বৃক্কদ্বয়ের ওজন কমতে থাকে। বৃক্কের ওজন 60 বছর বয়সে সাধারণত থাকে 250 গ্রাম, 70 বছরে প্রায় 230 গ্রাম; আর 80 বছরে প্রায় 190 গ্রাম। বৃক্কের মধ্য দিয়ে রক্ত সঞ্চালন কমে যায় এবং রক্ত বিশোধন কমে যায়।

(ঙ) মেরুদণ্ড ও অস্থি: প্রতিটি খণ্ডে ক্যালসিয়াম লবণের মাত্রা কমে যায় এবং প্রতি খণ্ডের উচ্চতা কিছু কমে যায়। হিসেব করে দেখা গিয়েছে 65-75 বছর বয়সে শরীরের উচ্চতা 1·5 ইঞ্চি কমে যায়। অস্থিও ক্ষয় হয়; দেখা যায় বার্ধক্যে প্রতি দশকে পুরুষের শতকরা 3 ভাগ ও মেয়েদের শতকরা 8 ভাগ অস্থি কমে যায়।

(চ) পেশী: পেশীর তন্তু সংখ্যা কমে যায় এবং আকারেও ছোট দেখায়। হাতের আঙুলের পেশী সবচেয়ে বেশী ক্ষয় হয়। যুবা বয়সে শরীরের ওজনের শতকরা 45 ভাগ আসে পেশীর জন্য। আর 70 বছর বয়সে শরীরের শতকরা 27 ভাগ ওজন পেশীসমূহের জন্য। বৃদ্ধ বয়সে বাহু ও পায়ের পেশী থলথলে হয় এবং হাতে টিপে দেখলে পাতলা মনে হয়।

(ছ) ডিম্বাশয় (ovary); ডিম্বাশয় যুবতী বয়সে বেশ নিটোল থাকে। অপরদিকে বৃদ্ধ বয়সে আকারে ছোট ও কোঁচকান দেখা যায়। ডিম্বাশয়ের বহু ধমনীতে রক্ত চলাচল বন্ধ হয় অথবা কমে যায়। কোষের সংখ্যা কমে, তন্তুর মাত্রা বেশী হয়। যুবতী বয়সে ওজন থাকে 10 গ্রাম, বৃদ্ধ বয়সে তা 4 গ্রাম ওজনে দাঁড়াতে পারে।

বার্ধক্যে এই সব অঙ্গে যে পরিবর্তন হয়, পরিণতিতে কর্মশক্তি হ্রাস, পুষ্টি হ্রাস ইত্যাদির ফলে মানুষের রোগ প্রতিরোধ শক্তি কমে। ফলে বৃদ্ধ বয়সে সাধারণ রোগও অসামান্য হয়ে দাঁড়ায়। যাদের রোগ হয় না, পুষ্টির অভাবে কেবলমাত্র বয়সের ভারে মৃত্যু আসে এবং তা অপ্রতিরোধ্য।

বায়ুমণ্ডলের ওজোন গ্যাস

ভূ-পৃষ্ঠের 10 থেকে 50 কিলোমিটার ওপরে বায়ুমণ্ডলে ওজোন গ্যাসের স্তর জীবনধারণের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সূর্যের মারাত্মক অতিবেগুনী রশ্মি থেকে এই ওজোন গ্যাস জীবজগৎকে রক্ষা করে। কিন্তু পৃথিবীতে সৃষ্ট রাসায়নিক ক্লোরো ফ্লুরো-কারবন (সি, এফ, সি,) গ্যাস নির্গমনের ফলে বায়ুমণ্ডলের ওজোন গ্যাসের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা সন্দিহান হয়ে পড়েছেন। সি, এফ, সি, গ্যাস বায়ুমণ্ডলের ওজোনের স্তরকে নষ্ট করে দেয়। এই গ্যাস এরোসল, শীততাপনিয়ন্ত্রক যন্ত্র, কৃত্রিম ফেনা তৈরি এবং অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়। বছর পনেরো আগে অনেক বিজ্ঞানী অনুমান করেছিলেন যে, সি, এফ, সি গ্যাসের ব্যবহারের ফলে বায়ুমণ্ডলে অচিরে ওজোন গ্যাস 18 শতাংশ হ্রাস পাবে। তার ফলে বহু প্রাণীর অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হবে। ফলে যুক্তরাষ্ট্র সহ পৃথিবীর বহু দেশে সি, এফ, সি, গ্যাসের ব্যবহার কমিয়ে দেওয়া হয়। পরের গবেষণা অবশ্য আশাপ্রদ। সি, এফ, সি, গ্যাস বর্তমান হারে ব্যবহৃত হলে আগামী এক-শ বছরে বায়ুমণ্ডলে ওজোন গ্যাস 3-5 শতাংশ কমবে। তবে সি, এফ, সি, ছাড়া আরো কয়েকটি গ্যাসের প্রভাব রয়েছে ওজোন গ্যাসের ওপর।

[আজকের বিজ্ঞান, ঢাকা, বাংলাদেশ]

বৈজ্ঞানিক বিষয়ে রম্য-রচনা ও বিজ্ঞান-কল্পগল্প প্রসঙ্গে

বিমলেন্দু মিত্র*

এই প্রবন্ধটি 'বিজ্ঞান ও সাহিত্য' বিষয়ে বিশেষ সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র জন্যেই লেখা, দুর্ভাগ্য বশত আমি নিবন্ধটি সময়মত প্রকাশনা দপ্তরে হাজির করতে পারি নি। তবে এক্ষেত্রে আমার সুবিধে হয়েছে এই যে এই রচনা শেষ করবার আগেই উক্ত সংখ্যাটির দামী লেখাগুলি পড়ে ফেলা গেছে। ফলে আমি আমার এই লেখাটির প্রাথমিক চেহারায় সংযোজন ও পরিবর্জন-পরিবর্তন করতে পেরেছি।

শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের নামে উৎসর্গীকৃত সেমিনারে সত্যেন্দ্র-ভবনে সেদিনের সুধী-ব্যক্তি সমাগমের সামনে আমি 'বাংলা সাহিত্যে বিজ্ঞান' এই প্রসঙ্গে কিছু বলবার সুযোগ পেয়েছিলাম। মোটামুটি সেই খসড়াই আজ কাজে লাগান হয়েছে।

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় অবশ্য বিজ্ঞান-কল্পগল্পের জন্যে জায়গা করে দেওয়া হয় নি। আমার মাষ্টার মহাশয় যদিও বলতেন যে—'যাঁরা বলেন বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চা সম্ভব নয় তাঁরা হয় বাংলা জানেন না নয় বিজ্ঞান বোঝেন না', তবুও তাঁর মৃত্যুর এত বছর পরেও বাংলা জানা ও বিজ্ঞান জানা অনেক মানুষই বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ের রচনা খুব কষ্ট করে রচনা করেন। ইংরেজি ভাষা ব্যবহারে যে স্বাচ্ছন্দ্য, সে স্বাচ্ছন্দ্য মোটেই পান না বাংলা রচনার কালে। শ্রদ্ধেয় প্রমথ বিশী মহাশয় বলেছিলেন—বাংলা ভাষা হল ভাবের ভাষা, বিজ্ঞানের নির্দিষ্ট কড়াকড়ি বা preciseness প্রকাশ করবার উপযুক্ত ভাষা বাংলা নয়। এ বিষয়ে মতভেদ থাকতে পারে তবে আমি মোটামুটি প্রমথ বিশী মহাশয়ের মত মেনে নিই। যদিও গত 30-40 বছরে বিজ্ঞানের পাঠ নেওয়া বাংলা ভাষায় হলেও বিজ্ঞানের সঠিকতা বা নির্দিষ্ট কড়াকড়ি মেনে নেওয়াতে বাংলা ব্যবহারে ফাঁক থেকে যাচ্ছে। পরিভাষা ঠিকভাবে গড়ে ওঠে নি তো বটেই কিন্তু সেটাই একমাত্র কারণ নয়। ইংরেজি শব্দের মত বাংলা শব্দকে সামান্য টেনেটুনে 'খেলানো' যায় না। Gravitation, gravitational, gravitating, gravitated—একই বাংলা শব্দকে টেনেটুনে সবকটি প্রকাশ করা শক্ত। Observe, ovserved, observation, observational, observatory, observing, observation-post, বা precise, precision, precisely, preciseness—বাংলা একটি মাত্র প্রতিশব্দকে এদিক ওদিক করে সবকটি বোঝান কঠিন। তাই বিজ্ঞান পঠন-পাঠনের বাংলা যদি একেবারেই বর্তমানে দুর্বোধ্য নতুন কোন চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে যায় তবে ভবিষ্যতে অবাক হবার কিছু থাকবে না। তবে সে বাংলা আবার সরাসরি সাহিত্যের বাংলা, ভাবের ভাষা হয়তো রইবে না।

তবে ইদানীং দেখা যাচ্ছে বাংলা ভাষায় রম্যবিজ্ঞান বা বিজ্ঞান-কল্প-গল্প লেখকরা ভাষায় Preciseness ততটা মানার দরকার বোধ করছেন না। কারণ তাঁদের দেখছি বিজ্ঞান মানারই ততটা দরকার হচ্ছে না। বিজ্ঞানের নামে রোমাঞ্চকর আজগুবী রচনাও পাতে পড়ছে ও মহানন্দে ভুক্ত হচ্ছে।

গত বিজ্ঞান-সাহিত্য সংখ্যায় বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক নিবন্ধাদি লেখার বিগত দুশো বছরের চেষ্টার ইতিহাস আলোচনা করেছেন অনেকেই। 1822 খৃস্টাব্দে পাদ্রী লসন "পশ্বাবলী" নামে বই ছাপাতেন, প্রতি সংখ্যায় একটি করে জানোয়ারের ছবি ও তার বিষয়ে, তার আচার-ব্যবহার ইত্যাদি বর্ণনা করে লেখা হত। শ্রীদিবাকর সেন তাঁর প্রবন্ধে বিভিন্ন বাংলা পত্র-পত্রিকা ও তাদের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন বিখ্যাত লেখকের বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ রচনার মোটামুটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করেছেন। ভারতী পত্রিকা, বঙ্গদর্শন, মানসী ও মর্মবাণী সকলেই কোন না কোনও বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা প্রকাশ করতই। জগদানন্দ রায়, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, (বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তকও লিখেছেন), উপেন্দ্রকিশোর (ব্লক তৈরির কারিগরিবিদ্যা নিয়ে অতিশয় মনোজ্ঞ ও কাজের প্রবন্ধ রচনা করেছেন), সুকুমার, সুবিনয় (ফটোগ্রাফী) রাজশেখর বসু, সত্যচরণ লাহা (পক্ষীবিজ্ঞান), বিনয়কুমার সরকার (ধনবিজ্ঞান)—এঁদের নাম আমি যুক্ত করে দিতে চাই এ প্রসঙ্গে।

সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান প্রচারের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত "শিশু-ভারতী" পত্রিকার উদ্যম আর অবদানের কথা বাদ পড়ে গেছে। 1933-34 খৃস্টাব্দে ইণ্ডিয়ান প্রেসের সহায়তায় ঐ অসাধারণ বিশ্বকোষটির প্রকাশ আর এই সূত্রে বাংলায় সহজবোধ্য বিজ্ঞান রচনায় এগিয়ে এসেছিলেন নীলরতন ধর, মেঘনাদ সাহা, শিশিরকুমার মিত্র, অধ্যাপক পঞ্চানন মিত্র (নৃবিজ্ঞান), চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীসুরেশচন্দ্র দেব, শিখিভূষণ দত্ত, অধ্যাপক হেমেন্দ্রকিশোর দত্ত, অবিনাশ সাহা, জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ডঃ রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, আরও বহু বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ পণ্ডিত মানুষ। শিশুভারতী নামে শিশুপাঠ্য, কিন্তু আসলে দামী বিশ্বকোষ।

* বসু বিজ্ঞান মন্দির, কলিকাতা-700009

শিশু ভারতীর সংস্করণগুলি দুষ্প্রাপ্য হয়ে গেল—ছাপা, কাগজ ইত্যাদি এত ভাল ছিল যে ব্যবসায়িক দিক থেকে প্রকাশক বোধ হয় আর নতুন সংস্করণ বার করতে উৎসাহী ছিলেন না। তার চেয়েও বড় কথা, বিশ্বকোষ প্রতি সংস্করণে নতুন ভাবে লেখাতে হয় নতুন জ্ঞান সংযোজন করে। খুবই ব্যয়-সাপেক্ষ ব্যাপার। এর পরে বিজ্ঞানবিষয়ে সচেতনতা এল একেবারে বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠা ও 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা প্রকাশের পরে। মাঝখানে প্রবাসীর মত সম্ভ্রান্ত মাসিকপত্র বিশেষ করে ধনবিজ্ঞান, ভাষাবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞান বিষয়ে বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করে। প্রবাসীর 'পঞ্চশস্য' বিভাগে তদানীন্তন বিজ্ঞান বিষয়ের নানা উত্তেজক খবরাখবর নিয়মিত প্রকাশ করা হত। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যও নিয়মিত প্রবাসীতে ঐ বিভাগে প্রবন্ধ লিখতেন। অবশ্যই বড়দের জন্যে।

সম্পূর্ণ একক চেষ্টায় অন্তত দুটি মাসিকপত্র নিষ্ঠাভরে বিজ্ঞান প্রচারে বেশ কিছুদিন ব্রতী ছিল—অধ্যাপক বিনয় সরকারের 'আর্থিক উন্নতি' (ধনবিজ্ঞান) ও সত্যচরণ লাহার বিশেষভাবে পাখী সম্বন্ধীয় পত্রিকাটি—'প্রকৃতি'।

শিশু ভারতীতে বৈজ্ঞানিক গল্প-সল্প বা কল্পবিজ্ঞানের কোন জায়গা ছিল না। যেমন 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'ও নেই। কিন্তু গত দশ বছরের মধ্যে কিশোরদের জন্যে সম্পূর্ণ বিজ্ঞানবিষয়ের কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশিত হল। বিজ্ঞানের অন্যান্য দিকের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান-রম্য রচনা ও বিজ্ঞান কল্প-গল্পের জোয়ারও এল। কিন্তু এখানেই হচ্ছে ভাববার কথা। কেমন করে জানি না, বিজ্ঞান কল্পগল্প শুধুমাত্র শিশু ও কিশোরপাঠ্য ব্যাপারই যেন রয়ে যাচ্ছে।

বড়দের উপভোগ করবার মত বিজ্ঞান-কল্পগল্প বাংলা ভাষায় প্রায় লেখা হয় নি বললেই চলে। যদিও যিনি বাংলা-ভাষায় বিজ্ঞান কল্প-গল্পের গোড়াপত্তন করেছিলেন, সেই জগদীশচন্দ্রের বিখ্যাত লেখাটি, 'পলাতক তুফান' বা নিরুদ্দেশের কাহিনী' শিশু বা কিশোরপাঠ্য ছিল না। পরবর্তীকালে মাত্র দু-একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম চোখে পড়ে, যেমন প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'মনু দ্বাদশ'-এর মূল ভিত্তি বা রাজশেখর বসুর ছোট গল্প, 'গামানুষ জাতির কথা'; এছাড়া বিজ্ঞান কল্পগল্প আন্দোলন কিশোর সাহিত্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু এমনটি কি হবার কথা?

পাশাপাশি ইংরেজি সাহিত্যে একেবারে উলটো ব্যাপার-টাই চোখে পড়ে। ইংরেজি শুধু নয়, ইউরোপীয় ভাষায়, মধ্যযুগে প্রথম বিজ্ঞান কল্পগল্প লেখেন যোহানেস কেপ্‌লার, Somnium, বা স্বপ্ন। কেপলারের উদ্দেশ্য ছিল কল্পকাহিনীর সৃষ্টি করে আসলে কোপারনিকাসের সৌরকেন্দ্রিক-জগৎ সম্বন্ধীয় মতবাদের সমর্থন করা। কিন্তু সেই সপ্তদশ শতাব্দীতে অপূর্ব বর্ণনার-মুন্সীয়ানায় কেপ্‌লার চন্দ্রযাত্রা ও চন্দ্র ভ্রমণের রোমাঞ্চ পাঠক মনে হাজির করেছেন। শিশুপাঠ্য ব্যাপার ছিল না সেটি। ইংরেজিতে উনিশ শতকে এইচ. জি. ওয়েল্‌স যে সব বিজ্ঞানভিত্তিক রোমাঞ্চ রচনা করেন তা বড়দের উপভোগের জিনিস। স্যার আর্থার কোনান ডয়েল অবশ্য খাঁটি বিজ্ঞান-নির্ভর কাহিনী লেখেন নি, যদিও The disintegrating machine একটি সার্থক বিজ্ঞান কল্পগল্প। ফরাসী জুল্ ভের্ন এর কথা বিশেষ করে উল্লেখ না করলেও চলে। বিংশ শতকের শুরুতে ওয়েলস, সি. এস. লিউইস, হাক্‌স্‌লী, বিজ্ঞান-দর্শন মিলিয়ে অপরূপ সব কাহিনী রচনা করেছেন। এ যুগে দেখা যাচ্ছে অবিজ্ঞানী সাহিত্যকারদের হাতেই বিজ্ঞান-গল্প পুষ্টি পেয়েছে। John Wyndham সুবিখ্যাত বিজ্ঞান-ভিত্তিক গল্পকার। তাঁর The Chrysalides গল্পের কাঠামো 'মনুদ্বাদশের' কাঠামোকে স্মরণ করিয়ে দেয়। পর-বর্তীকালে সায়েন্স ফিক্‌শনের বিজয় অভিযান শুরু হল দুই বিজ্ঞানী; আর্থার ক্লার্ক ও আইজ্যাক আজিমভের বলিষ্ঠ পদক্ষেপে। তার আগে জর্জি গামো গল্পকাহিনীর মাধ্যমে কঠোর বিজ্ঞান (strict science) শিখিয়েছেন Mr. Tompkins সিরিজের গল্পগুলিতে, কিন্তু সে প্রচেষ্টা যেন কেপ্‌লারের Somnium এর আদলে।

এক কথা বলার উদ্দেশ্য মাত্র এটাই প্রমাণ করা যে ইংরেজী ভাষায় উল্লেখযোগ্য সায়েন্স ফিক্‌শন বড়দের রস গ্রহণের জন্যেই সৃষ্টি। এর সমান্তরালে বাংলা সাহিত্যে বিশেষ কিছু সৃষ্টি হয় নি। বরং 'সায়-ফি' আলোচনা করতে হলে বাঙালী সমালোচক কিশোর সাহিত্যের শঙ্কু বা ঘনাদা নিয়েই মাতামাতি করেন। দুটির কোনটির স্রষ্টাই বিজ্ঞানী নন আবার। সাহিত্যিক বিজ্ঞানী বা বিজ্ঞান-সাহিত্যিক কেউই বড়দের উপযুক্ত mature সায়েন্স ফিকশন বাংলাভাষায় রচনা করেন নি,—দু-একজন চেষ্টা করেছেন কিন্তু তা রসোত্তীর্ণ হয় নি।

গত দশকের গোড়া থেকে বাংলা সাময়িক পত্রিকাগুলির নতুন করে দৃষ্টি পড়ল বিজ্ঞানের দিকে। বড়দের সাপ্তাহিক পত্রিকায় বিজ্ঞানের পাতা খোলা হল, কিন্তু বড়দের উপযোগী 'সায়-ফি' রচিত হল না। একেবারে হল না বলা যায় না, কিন্তু তাহলে ইংরেজিতে প্রকাশিত আজগুবি ধরনের কড়া-ধাতের মহাকাশযাত্রা ও কাল্পনিক গ্রহান্তরের প্রাণীদের কাণ্ড কারখানায় বিষয়ে রচনার অক্ষম অনুকরণ বা কখনও কখনও ভাষান্তর। রসোত্তীর্ণ একটিও নয়।

এই সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকে কিশোর সাহিত্যের বিজ্ঞান-কল্পগল্পের দিকে একবার চোখ ফেরান যাক।

গত-পাঁচ-সাত বছর ধরে বাংলাভাষায় কিশোরদের জন্যে বিজ্ঞান রচনা নিয়েই সম্পূর্ণ-কলেবরের সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকা যে প্রেরণা জুগিয়েছিল, তা তো ছিলই, ছিল কিছুটা ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গীও। ব্যবসায়িক বুদ্ধিই বিজ্ঞান-সাময়িকীগুলোতে গোড়া থেকেই বিজ্ঞান-কল্প-গল্পের জায়গা করে দিয়েছিল। এ ধরনের পত্রিকার বিপুল চাহিদা ছিল। কিন্তু শুধুমাত্র বিজ্ঞানের বেসাতি নিয়ে চলবার উপযুক্ত জোগান ছিল না। ক্রমশ দেখা গেল এ ধরনের পত্রিকার প্রকাশকরা দুটি ভিন্ন গোষ্ঠিতে ভাগ হয়ে গেলেন—একটি গোষ্ঠি বৃহৎ প্রকাশক সংস্থা যাঁরা সাময়িক লোকসান আখেরে পুষিয়ে নিতে পারেন, অন্য গোষ্ঠি সৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত, খাঁটি বিজ্ঞানমনস্ক রচনার উৎসাহদাতা হলেও প্রথম থেকেই আর্থিক দুর্বলতার বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছেন।

ঐরকম পত্রিকা বেশ কয়েকটি কিছু দিন চলবার পর লোকসানের বহর বাড়িয়ে বন্ধ হয়ে গেল সত্যিকারের প্রবন্ধ, আলোচনা, বিজ্ঞান-কল্পগল্প কিছুরই কমতি না থাকা সত্ত্বেও। বাংলাভাষায় বিজ্ঞান বা সাহিত্য-পত্রিকা দুয়েরই একই হাল,—এ যেন বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠি অটোমেটিক যন্ত্রে তৈরি 'রেডিমেড'জামা-কাপড় দিয়ে বাজার ভর্তি করে দেওয়ায় পাড়ার ভাল কারিগরের ভাল দর্জির দোকান উঠে গেল। 'রেডিমেড' জিনিসপত্রের মধ্যে পড়ে গেল বিলিতি রোমাঞ্চকর তৃতীয় শ্রেণীর তথাকথিত বৈজ্ঞানিক-অ্যাডভেঞ্চারের অক্ষম অনুকরণ ও 'না বলিয়া পরদ্রব্য গ্রহণ'। আমি 'কল্পগল্পের' কথাই বলছি। অবশ্য প্রবন্ধেরও প্রায় একই হাল,—হয় টেক্সট বুকের অংশবিশেষের অনুবাদ অথবা বিলেতী New Scientist, Scientific American বা অনুরূপ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের অক্ষম রূপান্তর। এই অটোমেটিক জোগানদারদের কম অংশই বিজ্ঞানকর্মী বা বিশুদ্ধ বিজ্ঞানী এবং ঐ বেশি অংশটিরও সাহিত্য সৃজন ক্ষমতাও প্রায় অনুপস্থিত। মেকী মালে বাজার ছেয়ে গেল।

অথচ যখন বিজ্ঞান-পত্রিকাগুলি বাজারে আসে নি, তখনও শিশু ও কিশোর পত্রিকায় সত্যিকারের ভাল বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প উপন্যাস ছাপা হয়েছে, তাদের লেখকদের মধ্যে বিজ্ঞানসেবীও ছিলেন। এঁদের মধ্যে বিশেষ সম্মানীয় নাম হচ্ছে অধ্যাপক ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য। আবার নামকরা সাহিত্যসেবীদের মধ্যে যাঁরা বিজ্ঞানবিষয়টুকু যথাযোগ্য সম্মান দিয়ে, ভাল করে জেনে নিয়ে তবে লেখাতে অগ্রসর হয়েছিলেন, তাঁদের অগ্রগণ্য হচ্ছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র ও হেমেন্দ্রকুমার রায়। চল্লিশের দশকে হেমেন্দ্রকুমার রায় একটি অনবদ্য উপন্যাস লেখেন, মুখ্যত গোয়েন্দা কাহিনী—'জয়ন্তের কীর্তি'। এটিতে Alexis Carell-এর নোবেল-বিজয়ী আবিষ্কার, যথা অস্বাভাবিক নিম্নতাপমাত্রায় নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদের মধ্যে প্রাণশক্তি যে বহুদিন ঘুমিয়ে থাকে এবং পরে উপযুক্ত পরিবেশ পেলে আবার সেই আপাতমৃত জৈববস্তুতে প্রাণের অভিব্যক্তির পূর্ণ বিকাশ ঘটে,—এই তথ্যটি কাজে লাগান হয়েছিল চিত্তাকর্ষক অপরাধ কাহিনীতে। হেমেন্দ্রকুমার পরেও অপরাধ-বিজ্ঞানের বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্য ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে অবিকৃত রেখে অনেক গল্প উপন্যাসে লিখেছেন, মূলত গোয়েন্দা কাহিনীতেও মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্বকে কাজে লাগিয়েছেন যা মোটেই আজগুবি নয়। অবশ্য তিনি প্রথম যে উপন্যাস লিখেছিলেন বিজ্ঞান-নির্ভর নাম দিয়ে সেই 'মেঘদূতের মর্ত্যে আগমন' সম্পূর্ণ ফ্যাণ্টাসী-ধর্মী। যেমন ফ্যাণ্টাসী-ধর্মী প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পাতালে পাঁচ বছর'। বর্তমান কাহিনীকারদের মধ্যে সত্যজিৎ রায়, লীলা মজুমদার দুজনেই সবচেয়ে প্রিয় তথাকথিত বৈজ্ঞানিক কল্পগল্প লেখক - কিন্তু দুজনেই অবৈজ্ঞানিক এবং দুজনেই প্রকৃত-পক্ষে ফ্যাণ্টাসি লিখে থাকেন। অদ্রীশ বর্ধন অনেক লিখেছেন কিন্তু বেশিরভাগই ইংরেজি গল্পের অনুকরণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য সব ক্ষেত্রে অবিকৃত থাকে নি। তিনি অনুবাদকার হিসেবে বেশি নামজাদা। সঙ্কর্ষণ রায় বৈজ্ঞানিক কিন্তু খুব যে প্রিয় লেখক হয়ে উঠেছেন তা নয়। তবে তাঁর লেখায় বিজ্ঞান-নির্ভরতা বেশি।

বর্তমানে বিজ্ঞান-সাময়িক-পত্রিকায় যাঁরা কল্পগল্প ছাপেন তাঁদের একটু সাবধান হবার সময় এসেছে। বর্তমানে প্রকৃত সাহিত্য-সেবী, সাহিত্যিক-বিজ্ঞানী বা বিজ্ঞানী-সাহিত্যিক ছাড়াও সম্পূর্ণ অবিজ্ঞানী ও অসাহিত্যিকরাও এই সম্ভাবনাপূর্ণ ক্ষেত্রে নেমে পড়েছেন। পত্রপত্রিকাগুলির চলবার তাগিদে বাঁধা বা গোষ্ঠিভুক্ত লেখকের দরকার হয়। এর ফলে সুবিধে হয়ে যাচ্ছে ঐ শেষ দলটির। তাঁরা প্রায় যথেচ্ছাচার শুরু করেছেন। এমন লোক গল্প লিখছেন যারা বিজ্ঞানের ক-খও জানেন না। গল্পে পড়েছি, টেলিভিশনের স্ক্রীন থেকে সত্যি-কারের রক্তমাংসের বাঘ materialize করল। এটা বিজ্ঞানগল্প হতে পারে না কারণ 'কিছুই না' (তেজ ?) থেকে বস্তু materialize করতে হলে প্রতি গ্রাম matter সৃষ্টিতে যে অকল্পনীয় শক্তি লাগবে তার হিসেব নিশ্চয়ই লেখকের মাথায় ধরবে না। তা অন্তত দশের পরে আঠারোটি শূন্য বসালে যে সংখ্যা হবে প্রায় তত MeV শক্তি। পুরো বাঘ তৈরি করতে হলে কোথা থেকে আসবে সেই অসম্ভব পরিমাণ শক্তি ? অ্যাটম বোমায় হিরোশিমায় যতটা শক্তি মুক্ত হয়েছিল সেই পরিমাণ শক্তি জমাট বাঁধলে হয়তো পাওয়া যাবে কয়েক গ্রাম বস্তু।

কোন লেখক লিখেছেন,—আলোর চেয়ে দ্রুতগতিতে

তাঁর রকেট ছুটে চলেছে দূরের নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে। যতই tachyon বলি না কেন, এ ব্যাপার সম্ভব নয়। তবে জ্যোতির্বিজ্ঞানীর কাছে মহাকাশের fold বা kink বা Mobius strip এর মত মোচড় দিয়ে নিমেষে দূরস্থ নীহারিকা পুঞ্জে পৌছন, ইত্যাদি তত্ত্বীয় উত্তেজনাকে কাজে লাগিয়ে গল্প লেখা হয়েছে। তবে এ সবই এখনও ফ্যাণ্টাসির রাজ্যেরই বাসিন্দা। ফ্যাণ্টাসির ততটুকুই মূল্য আছে যতটুকু দরকার বিজ্ঞানের কোন বিশেষ rigid সত্যকে ঠিকভাবে বোঝানোর জন্যে। যেমন গামো (Gamow) সাহেবের বিখ্যাত Mr. Tompkins-গল্পগুলি। বাংলা ভাষায় এমন গল্প একটিও লেখা হয় নি।

অবিজ্ঞানী-অসাহিত্যিক লেখকরা নিজেদের ছড়িয়ে দেন প্রধানত (1) মহাকাশ যাত্রা, ও অজানা গ্রহে অজানা প্রাণীদের মধ্যে অ্যাডভেঞ্চার, (2) গাছপালা-পোকমাকড়ের অস্বাভাবিক আচরণ, (3) পৃথিবীরই অজানা অঞ্চলে (আছে কি?) ভয়ানক জীবজন্তু, (4) অন্য গ্রহ থেকে আসা অজানা যান ও প্রাণীর ব্যাপারস্যাপার, (5) পরমাণু ও কম্পিউটার বিষয়ে অদ্ভুত গালগল্প। এক এক করে বিভাগ গুলি আলোচনা করা যাক।

(1) মহাকাশ যাত্রা—শতকরা নব্বুই ভাগ কল্পগল্প লেখকই এই অঞ্চলে বাঁধা পড়ে গেছেন। এ বিষয়ে নতুনত্বের স্বাদ আনা খুব মুস্কিল। এ লাইনে truth is stranger than fiction। কিন্তু অজানা জীবজন্তুপূর্ণ গ্রহ যে সৌরজগতে কোথাও নেই এ সত্য আজ সূর্যের আলোর মতই পরিষ্কার। সৌরমণ্ডল ছাড়িয়ে যাবার পথে দুস্তর কঠোর বৈজ্ঞানিক বাধা রয়েছে। তাই মনে হয় এবিষয়ে বৈজ্ঞানিক গল্প ফ্যাণ্টাসিকেই জায়গা ছেড়ে দিয়েছে। 'শুক্রে যারা গিয়েছিল' —এখন ফ্যাণ্টাসি মাত্র।

(2) জগদীশচন্দ্রের আমল থেকেই গাছপালার মূক-জগতে মানুষের কৌতুহলের অন্ত নেই। অতি সম্প্রতি Tomkins ও Bird নামের দুই নকল-বিজ্ঞান-ব্যাপারী Secret Life of Plants নামে বিজ্ঞানের মোড়কে ঢাকা ফ্যাণ্টাসি লিখেছেন। গাছেদের নাকি extra sensory perception বা অতীন্দ্রিয় বোধশক্তি আছে,—ইত্যাদি। দেখতে পাচ্ছি বাংলাভাষায় বিজ্ঞানকল্পগল্প লেখকরা ঐ ফাঁদে পড়ে গিয়েছেন। গাছেরা সং মানুষকে বিপদ থেকে বাঁচাচ্ছে ও খুনীকে খুন করছে, ইত্যাদি লেখা হচ্ছে। কিন্তু এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি অতিশয় দুর্বল। আচার্য জগদীশচন্দ্র দেখিয়েছিলেন উত্তেজনার ফলে (পুড়িয়ে ফেললে, বিষ দিলে বা ইলেকট্রিক শক দিলে) গাছ জীবিত প্রাণীর পেশী বা তন্তুর মত একই ধরনের বৈদ্যুতিক সাড়া দেয়। কিন্তু গাছে যে central nervous system বা heart নেই, এও তো সত্যি! গাছ কোন উদ্দেশ্যমূলক কাজ করতে পারে না। John Wyndham এর লেখা The Day of Triffids অবশ্য অন্য ধরনের লেখা,—উত্তেজক, কিন্তু ফ্যাণ্টাসি মাত্র। তাই এ লাইনেও বিজ্ঞানকে হত্যা না করে উত্তেজক গল্প লেখা এখনও পর্যন্ত হয় নি। কেবলমাত্র পতঙ্গভুক গাছকে বহু গুণে রাক্ষসাকৃতি দিয়ে 'সেপ্টোপাসের খিদে' লেখা হয়েছে।

(3) অজানা ভয়ানক জীবজন্তু। সমুদ্রের গভীরের জলজন্তু বা Giant Squidsদের নিয়ে অনেক গল্প লেখা হয়েছে। ইংরেজিতেও আছে। বেশির ভাগই ফ্যাণ্টাসি। তবে অক্টো-পাসের চোখের গড়ন বা শুশুক (dolphin)-দের মস্তিষ্কের কনভল্যুশন ইত্যাদি ইঙ্গিত দিচ্ছে এদের নিয়ে বুদ্ধিমান লেখক বিজ্ঞানের সত্য বজায় রেখেও রোমহর্ষক গালগল্প লিখতে পারবেন। শুশুক নিয়ে আর্থার ক্লার্ক অসম্ভব ভাল উপন্যাস লিখেছেন। বাংলাভাষায় কোথায় তা?

(4) অন্যগ্রহ থেকে আসা প্রাণী ইত্যাদি। প্রথম নম্বরের আলোচনাতেই এর অসম্ভবতা বোঝা গেছে। তবে ফ্যাণ্টসির প্রচুর অবকাশ রয়েছে। লেখকরা এর সুযোগও নিচ্ছেন। 'লিম্বো সাহেবের পেশা' নামে লীলা মজুমদারের ফ্যাণ্টাসি গল্প ও সত্যজিতের বঙ্কুবাবুর বন্ধু' ফ্যাণ্টসির অপূর্ব নমুনা।

(5) কম্পিউটার নিয়ে মজাদার গল্প দু-একটা লেখা হয় নি তা নয়।

তবে বিজ্ঞান কল্প-গল্প কি নিয়ে লিখব?

1. কেন, বলেছি তো, Scientific truth is strange than fiction। এমন কি একটি মাত্র cell এর ভাবগতিকও জানা নেই। জানা গেলে তো malignant cell এর রকম সক বোঝা যেত। Bioengineering এর রোমাঞ্চকর ব্যাপা স্যাপার নিয়ে ভাল গল্প লেখা যায়।

2. একান্ত পরিচিত পদার্থ বা রসায়ন তত্ত্বের নিয়মটির নিয়েও মজার গল্প লেখা যায়। যা জানি হয় না, তা যা হত, তবে কেমন হত? জানি, শব্দকে লেসার রশ্মির ম সূক্ষ্ম রশ্মিগুচ্ছে পরিণত করে বহু দূরে অনবসিত ভাবে পাঠা যায় না কারণ শব্দের ঢেউ ও চৌম্বক-তাড়িৎ ঢেউ এক রকমে নয়, তাদের জন্মের কারণ এক নয়। কিন্তু ধরে নেওয়া যা এ সম্ভব হল। তবে ব্যাপার স্যাপার কেমন হত? এ নি মজার গল্প লেখা যায়। এরকমই বহু বহু পরিচিত তত্ত্ব ও তথ্যে সামান্য মোচড় দিলে কেমন হয়?

3. ভূতত্ত্ব, সাগরতত্ত্ব, হিমালয়, অ্যাণ্টর্কটিকা—কত ে রয়েছে।

4. মানুষের সম্পর্ক টম্পর্ক, নানারকম বিজ্ঞানের টুকিটা

এধার ওধার করলে কেমন মজার situation এ দাঁড় করিয়ে যেয় তা নিয়ে লেখা চলতে পারে। শুধুমাত্র বাঁকা চোরা আয়না সুবিধেমত বসান ছিল বলে ত্রেতাযুগের কুম্ভকর্ণ কেমন ভয় পেয়ে কুঁকড়ে গিয়েছিল সে গল্প. মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য আমাদের শুনিয়েছেন। খুব স্বাভাবিক বিজ্ঞানের প্রয়োগে এমন কত গল্প হতে পারে। মোট কথা যাই লিখিনা কেন, বিজ্ঞানের যথাযথকে distort করা বা মূল principle-কে অগ্রাহ্য করা চলবে না। করলে, বলে দিতে হবে যে মূল principle যদিও আলাদা, আমি তা জেনে শুনে ভাঙছি গল্পের মজা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। আমার লেখা থেকে কখনই যেন ভুলকে ঠিক বলে মনে না হয়।

ফ্যাণ্টাসি লিখলেও তার একটা সীমা নির্দিষ্ট থাকবে। বুঝিয়ে দিতে হবে, বিজ্ঞানের মৌলিক বিষয়গুলি ঠিকই আছে, কল্পনায় একটু এদিক ওদিক গিয়েছি মাত্র। জানিয়ে শুনিয়ে exaggerate করছি হয়ত। এটাই এখেলার রীতি-নীতি হওয়া উচিত। উদ্ভটত্ব নৈব নৈব চ।

শক্তি উৎপাদন ও জনস্বাস্থ্য

প্রবীরকুমার আদিত্য*

একটি বিশাল পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রের কথা চিন্তা করা যাক, যেখানে রয়েছে প্রবল নিরাপত্তা এবং প্রতিটি পদক্ষেপে সাবধানতা। আর একটি সৌর প্যানেলের কথা চিন্তা করা যাক, যা নিঃশব্দে সূর্যের আলো গিলে চলেছে। মনে হঠাৎ করে প্রশ্ন জাগতে পারে, এই দুই পদ্ধতির মধ্যে কোন্‌টি মানুষের কাছে বেশী ক্ষতিকারক?

ব্যাপারটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার আগে আর একটি উদাহরণ চিন্তা করা যাক। যানবহুল রাস্তায় দুটি গাড়ী ছুটছে, একটি খুব ভারী লরি এবং অপরটি ছোট মালবাহী গাড়ী। এবার যদি প্রশ্ন ওঠে, এ দুটি গাড়ীর মধ্যে কোন্‌টি বেশী কার্যকর, তাহলে আপেক্ষিক আকার দেখে নিশ্চয় দক্ষতার বিচার করা ঠিক হবে না। চোখ দেখে গাড়ি দুটির মধ্যে কোন্‌টি বড়ো তা সহজে বলা যেতেই পারে, কিন্তু দক্ষতার বিচার অতো সহজে করা যাবে না। তা জানতে গেলে জানতে হবে কোন্‌টিতে কতো পেট্রল লাগে, কোন্‌টি কতো দূর অতিক্রম করতে পারে, কোন্‌টি কতো মাল পরিবহন করতে পারে ইত্যাদির সামগ্রিক বিচারের উপর।

ঠিক এই একই কারণে কোন্ শক্তি মানুষের পক্ষে বেশী ক্ষতিকারক তা ঐ শক্তি উৎপাদনের যন্ত্রের আকার দেখে কখনই বলা যাবে না। তাহলে আমরা হিসাব করবো কি ভাবে? এই হিসাব সাধারণতঃ করা হয় প্রতি একক শক্তি উৎপাদন করতে গিয়ে সম্ভাব্য ক্ষতি কত। আর একটু গাণিতিক ভাবে বললে এই হিসাব হলো মোট সম্ভাব্য ক্ষতি এবং মোট উৎপাদিত শক্তির ভাগফল। কোন উৎপাদকের নির্গম (আউটপুট) শক্তি কত তার হিসাব সহজেই পাওয়া যাবে। কিন্তু সম্ভাব্য মানবিক স্বাস্থ্যের ক্ষতির হিসাব হবে কি ভাবে!

বর্তমানে যাঁরা শক্তি সমস্যা নিয়ে কাজ করেত ব্যস্ত, শক্তি-গণনা (energy accounting) তাঁদের কাছে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মোট শক্তি উৎপাদন করতে গিয়ে বিভিন্ন বিভাগে বা বিভিন্ন যন্ত্রাংশে ব্যয়িত শক্তির মোট হিসাবই হলো শক্তি-গণনা। মনে করা যাক কোনো তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য, X কিলোওয়াট-ঘণ্টা শক্তির প্রয়োজন খনি থেকে কয়লা তুলতে, Y কিলো-ওয়াট ঘণ্টা খরচ হয় কয়লা পরিবহন করতে, Z কিলো-ওয়াট ঘণ্টা লাগে প্রতিটি টারবাইন গড়তে ইত্যাদি ইত্যাদি। সুতরাং এদের মোট হিসাব আমাদের ব্যয়িত শক্তির হিসাব দেবে এবং এর সাথে মোট উৎপাদিত শক্তির তুলনা করা যেতে পারে।

মানব জীবনে এই শক্তি উৎপাদনের জন্য সম্ভাব্য ক্ষতির হিসাবও এক একই ছকে করা যাবে। এক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাপ হয় মৃত্যুর হার, আঘাত অথবা রোগাক্রান্তের হার হিসাব করে। সুতরাং একটা ব্যাপার খুব পরিষ্কার যে, শুধু মাত্র শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রে সম্ভাব্য শক্তির হিসাব করলেই হবে না, এমনকি অন্তর্বর্তী প্রতিটি পদক্ষেপে কতোটা ক্ষতি হয় তার হিসাবও রাখতে হবে।

প্রথমেই যে দুটো উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, তার কথাই চিন্তা করা যাক। প্রথমে আমরা হিসাব করবো খনি থেকে তামা, লোহা, কয়লা, ইউরেনিয়াম বালি ইত্যাদি তুলতে গিয়ে কি পরিমাণ ক্ষতি হয়, তারপর হিসাব করবো তামার পাইপ, ফুয়েল-রড, ইস্পাত ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় অংশ তৈরি করতে গিয়ে কি পরিমাণ ক্ষতি হতে পারে, তারপর এইসব বস্তু পরিবহন করতে গিয়ে কতো ক্ষতি হতে পারে এবং সবশেষে হিসাব করতে হবে পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্র বা সৌর প্যানেল গড়তে গিয়ে এবং চালনা করতে গিয়ে কি পরিমাণ ক্ষতি হতে পারে। এই ভাবে মোট সম্ভাব্য ক্ষতির হিসাব করা যেতে পারে।

শক্তি গণনা সম্বন্ধে অনেকে অনেকদিন থেকেই চিন্তাভাবনা শুরু করেছেন। যেমন C. L. Comar এবং L. A. Sagan 1976 খৃস্টাব্দে Annual Review of Energy-তে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তাতে পারমাণবিক শক্তি, কয়লা, খনিজ তেল পবং স্বাভাবিক গ্যাস ইত্যাদির সাহায্যে উৎপাদিত তড়িৎ শক্তির এবং তার জন্য সম্ভাব্য ক্ষতির পরিমাণ কতো তা হিসাব করে দেখিয়েছেন। তাঁরা দেখিয়েছেন পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনে সম্ভাব্য ক্ষতির পরিমাণ কয়লা তা খনিজ তেলের সাহায্যে শক্তির উৎপাদনের সম্ভাব্য ক্ষতির থেকে অনেক কম।

অনেকের ধারণা এইসব কয়লা বা পারমাণবিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের থেকে অপ্রচলিত পদ্ধতি-গুলি (যেমন বায়ুশক্তি, সৌরশক্তি, মিথানল-পদ্ধতি, জিও-থার্মাল পদ্ধতি, সামুদ্রিক তাপশক্তি বা Ocean Thermal ইত্যাদি) কম ক্ষতিকারক। কিন্তু দেখা গেছে এই সব অপ্রচলিত শক্তি উৎপাদন পদ্ধতির ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ক্ষতির

* 93/1ডি, বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা-700009

পরিমাণ বেশীর ভাগ প্রচলিত পদ্ধতিগুলির থেকে অনেক বেশী (চিত্র দ্রষ্টব্য)।

চিত্রে মোট এগারোটি শক্তিউৎপাদন পদ্ধতিতে সম্ভাব্য ক্ষতির হিসাব দেখানো হয়েছে। এখানে প্রতি একক শক্তি উৎপাদন করতে গিয়ে কত কর্মী ও সাধারণ মানুষ রোগগ্রস্ত, দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়েছেন এবং মারা গেছেন এবং তার জন্য কত মনুষ্যদিন (man day) নষ্ট হয়েছে তা দেখানো হয়েছে। সাধারণতঃ একজনের মৃত্যুর জন্য 6000 মনুষ্য-দিন নষ্ট হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়। চিত্রে এগারোটির মধ্যে প্রথম পাঁচটি
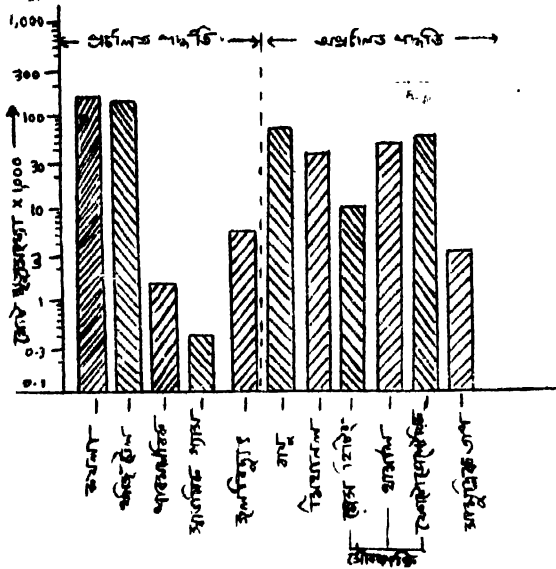
প্রচলিত পদ্ধতি। এই চিত্রে লগারিদ্‌মিক স্কেল ব্যবহার করা হয়েছে।

চিত্রে দেখা যাচ্ছে স্বাভাবিক গ্যাসের সাহায্যে উৎপন্ন বিদ্যুতে সম্ভাব্য ক্ষতির পরিমাণ সব থেকে কম, এর ওপরেই আছে পারমাণবিক পদ্ধতি। তার ওপর আছে সামুদ্রিক তাপ পদ্ধতি, যা একটি অপ্রচলিত পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে সমুদ্রের বিভিন্ন স্তরের তাপপার্থক্যকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। বেশির ভাগ অপ্রচলিত পদ্ধতিতেই ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশী। অবশ্য সব থেকে বেশী ক্ষতির পরিমাণ হল কয়লা বা তেলের সাহায্যে উৎপাদিত বিদ্যুৎশক্তির ক্ষেত্রে। স্বাভাবিক গ্যাসের প্রায় 400 গুণ বেশী।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে বেশীর ভাগ অপ্রচলিত পদ্ধতিতেই সম্ভাব্য ক্ষতির পরিমাণ বেশী। অর্থাৎ আমাদের প্রচলিত ধারণাটা যেন উল্টে যাচ্ছে। তাহলে কেন এই ভ্রান্ত ধারণা আমাদের মনে গেঁথে গেল ? ব্যাপারটা আরও একটু গভীর-ভাবে বিশ্লেষণ করা যাক।

সাধারণত দেখা গেছে এই সমস্ত অপ্রচলিত পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় বস্তু এবং শ্রম (প্রতি একক উৎপাদিত শক্তিতে) অনেক বেশী করে প্রয়োজন। যার একটা কারণ হলো এই পদ্ধতিগুলিতে, বিক্ষিপ্তভাবে পাওয়া প্রাকৃতিক শক্তিকে কাজে লাগানো হয়। সুতরাং এদের একত্রীকরণ করতে অনেক কাঠ-খড় পোড়ানোর প্রয়োজন। যেমন সৌরশক্তি বা বায়ুশক্তি থেকে বিদ্যুৎ পেতে হলে প্রচুর পরিমাণে সূর্যালোকের বা পর্যাপ্ত পরিমাণে বায়ুপ্রবাহের প্রয়োজন এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা বিপুল হবে। অপরপক্ষে খনিজ তৈল বা কয়লা যা পারমাণবিক পদ্ধতিতে শক্তি একত্রিত হয়েই আছে, একে শুধু সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ শক্তিতে পরিবর্তন করা প্রয়োজন।

আর একটা ব্যাপার পরিষ্কার যে, এই সব অপ্রচলিত পদ্ধতিতে যে সব ক্ষতি থাকতে পারে, তা কিন্তু সব প্রচলিত উৎস থেকেই আসে। যেমন খনি থেকে প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল তোলা, তাদের বিশুদ্ধ করা, তার পর পরিবহণ করা, সংগ্রহ করা, ব্যবহার করা ইত্যাদি প্রতিটি ধাপ সবক্ষেত্রেই আছে।

মোট সম্ভাব্য ক্ষতিকে সাধারণতঃ দু-ভাগে ভাগ করা যায় —পেশাগত দিক থেকে ক্ষতি এবং সাধারণভাবে জনসাধারণের ক্ষতি। যে সমস্ত ব্যক্তি শক্তি উৎপাদন এবং আনুষঙ্গিক কাজে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত, তাদের ক্ষতিকে বলা হয় পেশাগত দিক থেকে ক্ষতি। এই সব শক্তি উৎপন্ন করতে গিয়ে পরোক্ষভাবে সাধারণ মানুষের যেভাবে ক্ষতি হতে পারে তাকে বলা হয় জনসাধারণের ক্ষতি।

এবার জনস্বাস্থ্যের ক্ষতির হিসাব কিভাবে কষা হয় একটু দেখা যাক। মনে করা যাক শক্তি-উৎপাদন পদ্ধতিতে এক একক শক্তি উৎপন্ন করতে প্রথমে X-টন কয়লার প্রয়োজন এবং তার জন্য Y-মনুষ্য বৎসর (man year) দরকার। যদি Z সংখ্যক মনুষ্য-দিন প্রতি বছরে নষ্ট হয়, তাহলে প্রতি একক শক্তি উৎপাদন করতে নষ্ট-মনুষ্য দিনের হিসাব হতো YZ। এই ভাবে এই শক্তি-উৎপাদনের বিভিন্ন ধাপে, প্রতি একক শক্তি উৎপাদন করতে কত মনুষ্য দিন নষ্ট হচ্ছে তা নির্ণয় করা যাবে। এদের যোগফলই বলে দেবে কোনো শক্তি উৎপাদনে মোট নষ্ট মনুষ্য দিন কত এবং তা থেকে আমার সম্ভাব্য ক্ষতির হিসাব কষতে পারব পূর্ববর্ণিত পদ্ধতিতে।

সুতরাং হিসাব অনুযায়ী দেখা গেল অপ্রচলিত —আপাত নিরীহ শক্তি উৎপাদন পদ্ধতির কোনো সম্ভাব্য ক্ষতির পরিমাণ বেশীরভাগ প্রচলিত পদ্ধতিগুলির চেয়ে বেশী। যেমন সৌরশক্তি বা বায়ুশক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন পদ্ধতিতে ক্ষতি পারমাণবিক বা স্বাভাবিক গ্যাসের থেকে বেশী। তাহলে

আবার প্রশ্ন উঠতে পারে যে এতগুলো মানুষের মনে এরকম একটা ভ্রান্ত ধারণা জন্মাল কি করে? এই প্রশ্নের উত্তর হিসেবে অন্ততঃ দুটো কারণ দেখানো যেতে পারে, তা হলো ক) আমরা শক্তি উৎপাদনের শেষ ধাপটাই শুধু দেখি অর্থাৎ যে ধাপে শক্তি উৎপন্ন হচ্ছে, কিন্তু এর আগে যে অনেকগুলি অন্তর্বর্তী ধাপ আছে বা থাকতে পারে তা তলিয়ে চিন্তা করে দেখা হয় নি এবং খ) সম্ভাব্য ক্ষতির হিসাব যে প্রতি একক উৎপাদিত শক্তির উপর করতে হবে, এ ধারণাটা খুব একটা পরিষ্কার ছিল না।

মানবজাতি তার সৃষ্টির সেই ঊষালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত অনেক অনেক সংগ্রামী বছর পার হয়ে এসেছে। সেই তুলনায় বিজ্ঞানের বয়স তো খুবই কম। তবু বিজ্ঞান অন্বেষণের চাকাটা আজ প্রবল বেগে গড়িয়ে চলেছে অনন্তের সন্ধানে; নিজ গৃহে এবং মহাবিশ্বে। বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে বিশ্বজুড়ে মানুষ কিন্তু আজ ভীষণ চিন্তিত, ঐ বিজ্ঞানের প্রচণ্ড অগ্রগতি এবং তার ব্যবহার-অপব্যবহার নিয়ে। কেমন করে নীরবে যেন দুটি দল গঠিত হয়ে গেছে। একদল বলেন, অগ্রগতির ক্ষেত্রে ভাল-মন্দ দুই-ই থাকবে, ঐ মন্দটাকে যেভাবেই হোক বেঁধে রেখে আমরা এগিয়ে যাব সামনের দিকে। আর একদল বলেন এই ভীষণ অগ্রগতি বিশ্ববাসীকে ক্রমশ ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে চলেছে নিঃশব্দে। ঢের ভালো ছিল সেই তপোবনের সভ্যতা, সুতরাং ফিরে চল—ফিরে চল। কোন্‌টা ঠিক, তার উত্তর ভাবীকালই দেবে।

কিশোর বিজ্ঞানীর আসর
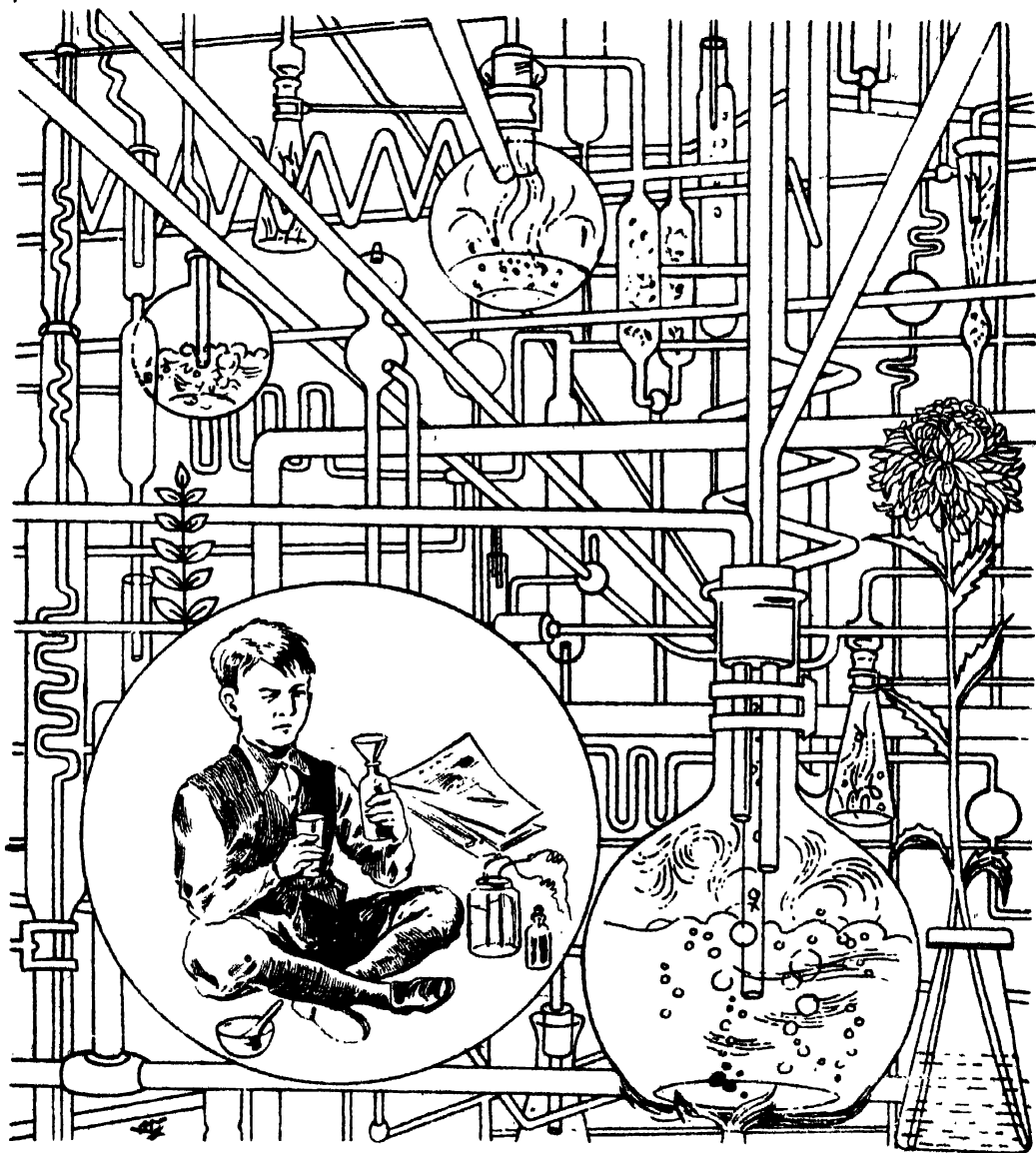
হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা

নারায়ণ ভট্টাচার্য*

বড় লোকের আদুরে ছেলে। কিন্তু তাকে নিয়ে বাবা-মার দুশ্চিন্তার শেষ নেই, কারণ ছেলেটি ঘুমোয় খুব কম। বড় বড় অনেক ডাক্তার দেখানো হ'ল, কিন্তু তাদের কেউই কোন রোগ নির্ণয় করতে পারলেন না। অবশেষে উদ্বিগ্ন পিতা-মাতা ছেলেকে নিয়ে গেলেন এক সাহেব ডাক্তারের কাছে। তিনি ছেলেটিকে তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করে রায় দিলেন যে ছেলেটি অসাধারণ মস্তিষ্ক নিয়ে জন্মেছে। এর মাথাটা স্বাভাবিকের চেয়ে বড়ো, তেমনি অতীব সক্রিয়। এই কারণেই ঘুম কম

হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা

হয়। তবে এর জন্য ছেলেটির কোন ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এর পরে বাবা-মা নিশ্চিন্ত হলেন। এই ছেলেটিই বড় হয়ে মহাজাগতিক রশ্মি সম্পর্কে নতুন তত্ত্বের আবিষ্কার করে বিশ্ববিখ্যাত হন। এবার তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ এঁর নাম হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা সংক্ষেপে হোমি ভাবা।

1909 খৃস্টাব্দে 30শে অক্টোবর বোম্বাই-এ এক বিখ্যাত পার্শী পরিবারে হোমি জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর যেমন স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল তেমনি তিনি ভালবাসতেন সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকতে।

বোম্বাইর ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স থেকে বি.-এস-সি পাশ করে বাবা-মায়ের ইচ্ছায় হোমি ভাবা কেমব্রিজে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে যান। ভাবা পরিবারের সঙ্গে টাটা পরিবারের ছিল নিকট আত্মীয়তা। তাই হোমির বাবা-মা চেয়েছিলেন হোমি ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে টাটা কোম্পানীতে একজন বড় ইঞ্জিনীয়ার হ'ন, কিন্তু হোমির ইচ্ছা ছিল তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যায় গবেষণা করা। বিলেত থেকে হোমি যখন তাঁর এই ইচ্ছার কথা বাবাকে জানালেন তখন তাঁর বাবা এর উত্তরে লিখলেন যে একটিমাত্র শর্তেই হোমি বিজ্ঞানে গবেষণা করতে পারবেন আর সেটি হলো ইঞ্জিনীয়ারিং এ ট্রাইপস্ পরীক্ষায় হোমিকে প্রথম স্থান পেতে হবে। বলাই বাহুল্য, হোমি যথাসময়ে সেই শর্ত পূরণ করলেন এবং বিশেষ কৃতিত্বের জন্য বৃত্তি পেয়ে পদার্থবিদ্যায় গবেষণার জন্য কিছুকাল জুরিখে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত উলফ গ্যাং পাউলি (নিউক্লিয়াসের স্পিন আবিষ্কারের জন্য বিখ্যাত) এবং পরে রোমে বিশ্ব-বিখ্যাত বিজ্ঞানী এনরিকো ফার্মির অধীনে গবেষণা করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য কেমব্রিজে থাকাকালীন হোমি ভাবা, পি. এম. এস ব্ল্যাকেট, জেমস্ চ্যাডউইক, জন কক্রফ্ট, পল ডিরাক, পিটার কাপিৎজা, নেভিল মট ও আর্নেস্ট রাদারফোর্ড প্রমুখ পদার্থবিজ্ঞানে পথিকৃৎ বিজ্ঞানীদের সান্নিধ্যে আসেন এবং পদার্থবিজ্ঞানে গবেষণার জন্য বিশেষ ভাবে উদ্বুদ্ধ হন। 1934 খৃস্টাব্দে তিনি নিউটন স্টুডেন্টশিপ বৃত্তি পেয়ে তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যায় গবেষণা শুরু করেন এবং 1937 খৃস্টাব্দে তাঁর গবেষণার স্বীকৃতি স্বরূপ ডক্টরেট ডিগ্রী পান। শুধু তাই নয় তাঁর গবেষণা এতই মৌলিক ছিল যে এর জন্য তিনি লোভনীয় "1851 এগজিবিশান স্টুডেন্টশিপ" পাবার দুর্লভ সৌভাগ্য অর্জন করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য হোমি ভাবার আগে বা পরে আর কোনো ভারতীয় ছাত্রই এতগুলি সম্মানসূচক বৃত্তি পান নি।

এগজিবিশান বৃত্তি নিয়ে হোমি ভাবা কোপেনহেগেনে নী[illegible] বোর ইনস্টিটিউটে অধ্যাপক হাইটলারের সঙ্গে মহা-জাগতিক রশ্মি সম্বন্ধে গবেষণা করতে থাকেন এবং মহাজাগতিক রশ্মির কাস্কেড তত্ত্ব নামে মৌলিক তত্ত্বের সূত্রপাত করে জগদ্বিখ্যাত হন। কারণ তখন সারা ইউরোপে ও আমেরিকায় বহু পদার্থবিজ্ঞানী এই ধরনের একটি সূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা করেছিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য ঐ সময় নীলস্ বোর ইন-স্টিটিউট ছিল "পদার্থবিদদের মক্কা"। 1939 খৃস্টাব্দে হোমি ভাবা দেশে ফিরে আসেন এবং 1940 খৃস্টাব্দে ব্যাঙ্গালোরে ইণ্ডিয়ান

* ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্র, কলিকাতা-700064

ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সে তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানে গবেষণার জন্য 'বিশেষ রীডার' পদে যোগদান করেন। তার মৌলিক গবেষণার স্বীকৃতি হিসেবে 1941 খৃস্টাব্দে মাত্র 31 বছর হোমি ভাবা রয়েল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন এবং 1942 খৃস্টাব্দে বাঙ্গালোরে মহাজাগতিক রশ্মির গবেষণাগারে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ঐ সময় বাঙ্গালোরের ইনস্টিটিউটের ডাইরেক্টার ছিলেন ভারতবর্ষে পদার্থবিদ্যায় একমাত্র নোবেল পুরস্কারজয়ী বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরামন এবং বলাই বাহুল্য তিনি হোমি ভাবার মধ্যে বিরাট সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছিলেন।

1944 খৃস্টাব্দে 12ই মার্চ হোমিভাবা দোরাবজী টাটা ট্রাস্টের চেয়ারম্যানের কাছে ভারতবর্ষে মৌলিক গবেষণার একটি ইনস্টিটিউট স্থাপনের প্রস্তাব করে চিঠি লেখেন। ঐ চিঠির শেষ লাইনটা ছিল অনেকটা এইরকম 'আজ থেকে দশ কি বিশ বছর পরে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের জন্য যখন পরমাণু শক্তি ব্যবহার করা হবে তখন যাতে এই কাজের জন্য বিদেশ থেকে অভিজ্ঞ বিজ্ঞানী না আনতে হয়—আমার পরিকল্পিত প্রতিষ্ঠানে আমি পদার্থবিজ্ঞানে ঠিক এই শ্রেণীর এক সুশিক্ষিত ছাত্রগোষ্ঠী তৈরি করতে চাই।' এইখানে স্মরণ করা যেতে পারে ঐ সময় পরমাণু শক্তি চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পরিকল্পনা তো দূরে থাক পরমাণু বোমার বিস্ফোরণও হয় নি। এর থেকেই ভাবার অসাধারণ দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়।

1945 খৃস্টাব্দে টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফাণ্ডামেন্টাল রিসার্চ প্রতিষ্ঠান করেন এবং আজীবন তার ডাইরেকটার ছিলেন। তাঁর নিমন্ত্রণে নীলস বোর ইনস্টিটিউট থেকে বার্নাড পিটারসের মত বিজ্ঞানী বহু বছর এখানে হোমি ভাবার সঙ্গে মহাজাগতিক রশ্মি নিয়ে গবেষণা করে গেছেন। 1948 খৃস্টাব্দের 10ই অগাস্ট পরমাণু শক্তি কমিশন এবং 1954 খৃস্টাব্দে ট্রম্বেতে পরমাণু শক্তি সংস্থা তৈরি করেন, যার প্রধান কাজ হল বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের জন্য পরমাণু শক্তি ব্যবহারের নানা বিষয়ে গবেষণা ও হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। পরমাণু শক্তি ছাড়াও মহাকাশ গবেষণার জন্য আমেদাবাদ এবং কেরালার থুম্বাতে বিশেষ গবেষণাগার তৈরি করে তরুণ বিজ্ঞানীদের গবেষণার সুযোগ করে দেন। কলকাতায় যে ভেরিয়েবল এনার্জি সাইক্লোট্রন চালু হয়েছে তার পরিকল্পনাও হোমি ভাবা করেছিলেন 1964 খৃস্টাব্দে।

1955 খৃস্টাব্দে তিনি পরমাণুশক্তির শান্তিপূর্ণ গবেষণার আন্তর্জাতিক সম্মেলনে জেনিভাতে সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতির পদে নির্বাচিত হন। একজন ভারতীয় বিজ্ঞানীর পক্ষে এটা নিশ্চয়ই অত্যন্ত গৌরবের বিষয়।

হোমি ভাবা যথার্থই বিজ্ঞান লক্ষ্মীর সেবক ছিলেন। বিদেশ থেকে যে জ্ঞান আহণ করেছিলেন তারই অর্ঘ দিয়ে তিনি দেশমাতৃকার সেবা করেছেন। তিনি বিদেশে বহু বিখ্যাত গবেষণাগারে গবেষণা করার সুযোগ পেয়েছিলেন কিন্তু দেশের সেবা করাই তাঁর কাছে সবচেয়ে বেশি মূল্যবান ছিল বলে তিনি দেশত্যাগের কথা কখনও চিন্তাও করেন নি। আজকাল বহু ভারতীয় বিজ্ঞানী যখন নিজেদের যশ, অর্থ ও প্রতিপত্তির জন্য বিদেশে পাকাপাকি থাকার জন্য বিশেষভাবে আগ্রহী, তখন দেশের জন্য হোমি ভাবার এই আত্মত্যাগ বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। মহাকাশ গবেষণা ও পরমাণু শক্তি গবেষণার ক্ষেত্রে বিশ্বে ভারতবর্ষের জন্য একটি বিশিষ্ট স্থান করে দেওয়াই ছিল হোমি-ভাবার আজীবন স্বপ্ন। ইনস্যাট-1-এ এবং 1-বি উপগ্রহ মহাকাশে উৎক্ষেপণ করে এবং 1985 খৃস্টাব্দের 8ই অগাস্ট ট্রম্বেতে 100 মেগাওয়াটের রিসার্চ রিঅ্যাক্টর 'ধ্রুব' চালু করে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা ভাবার স্বপ্ন সফল করেছেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে 'ধ্রুব' পরমাণু চুল্লীটি সম্পূর্ণ "স্বদেশী"। ভারতীয় বিজ্ঞানীদের ডিজাইনে ও ভারতীয় যন্ত্রাংশ দিয়ে তৈরি করে ট্রম্বের বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদগণ পরমাণুশক্তির বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরিতে যে ভারতবর্ষ স্বয়ংনির্ভরশীল তা সারা বিশ্বের কাছে প্রমাণ করতে পেরেছেন।

আমাদের খুবই দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষের এত বড় আনন্দ ও গৌরবের দিনে তিনি আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। 1966 খৃস্টাব্দের 24শে জানুয়ারি তিনি যখন জেনিভাতে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছিলেন তখন বিমান দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর নিরলস সাধনার সম্মানে তাঁর মৃত্যুর পর 1967 খৃস্টাব্দে জানুয়ারী মাসে ট্রম্বের পরমাণু সংস্থার নামকরণ হয় ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্র।

ডাইনোসরের রহস্য-সন্ধানে

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য*

কয়েক বছর আগে খবরের কাগজে একটা ছোট্ট খবর চোখে পড়েছিল।

খবরটা উড়িষ্যার। সেখানে কোন্ এক গ্রামে সেচের জন্য খাল কাটা হচ্ছিল। বেশ খানিকটা কাটবার পর হঠাৎ একজন মজুরের কোদাল একটা শক্ত পাথরে গিয়ে আঘাত করল। পাথরটি তুলে ফেলা হল। দেখা গেল দেখতে পাথরের মত হলেও সেটা ঠিক আসল পাথর নয়। মনে হয় যেন একটা পাথরের কঙ্কালের টুকরো। টুকরো হলেও আকারে সেটা এত বিরাট যে আমাদের পরিচিত কোনও প্রাণীর কঙ্কালের সঙ্গে তার কোনও মিল নেই। ওরা ওটা ফেলে না দিয়ে সযত্নে তুলে রাখল।

ইতিমধ্যে একদিন ওখানকার এঞ্জিনীয়ার এলেন খাল কাটার কাজ কেমন চলছে দেখবার জন্য। ভদ্রলোক বাঙালী এবং বেশ লেখাপড়া জানা। পাথুরে কঙ্কালটা তাঁকে দেখানো হল। দেখেই তিনি বললেন, 'আরে এ যে মনে হচ্ছে কোন সেকেলে জানোয়ারের ফসিল!' পাথরটা নিয়ে তিনি পাঠিয়ে দিলেন সরকারী জিওলজিক্যাল সার্ভের অফিসে। সেখানে প্যালিয়ণ্টলজিস্টরা পরীক্ষা-টরীক্ষা করে দেখে বললেন, আরে, এ যে দেখছি কোন অতিকায় ডাইনোসরের ফসিল!

মানুষ পৃথিবীতে এসেছে পাঁচ লক্ষ থেকে আড়াই লক্ষ বছর আগে—বেশির ভাগ নৃতত্ত্ববিদের (যাকে ইংরেজিতে আমরা বলি অ্যান্থ্রপলজিস্ট) এই মত। তাও তারা ঠিক সত্যিকার মানুষ কিনা সে বিষয়েও মতভেদ আছে। মানুষ না বলে কেউ কেউ তাদেরকে বলেন, উপমানুষ বা প্রায়-মানুষ। আধুনিক মানুষের তারা হয় তো কোন প্রজাতি বা স্পিসিস। খাঁটি মানুষ বলতে বিজ্ঞানীরা যাদের সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ তারা এসেছে আরও পরে।

কিন্তু ডাইনোসররা পৃথিবীতে বাস করত আজ থেকে প্রায় পনেরো কোটি বছর আগে। প্রাণিবিজ্ঞানীরা নানা হিসেবপত্র কষে বলছেন যে শেষ ডাইনোসরটিকে দেখা গেছে আজ থেকে প্রায় ছ'-কোটি চল্লিশ বছর আগে। তার পরে ওরা সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে যায় পৃথিবী থেকে। দেখা গেছে বলতে অবশ্য মানুষ দেখেছে বলাটা হাস্যকর হবে; তারা যা চিহ্ন রেখে গেছে—ফসিলের মধ্যে দিয়ে তাই পরীক্ষা করেই এইসব হিসেব কষা হয়েছে।

কোথা থেকে পাঁচ লক্ষ বা আড়াই লক্ষ, আর কোথায় পনেরো কোটি বা সাড়ে ছ' কোটি! সিনেমার "রগ্‌রগে" ছবিতে যখন আমরা বা ডাইনোসরদের সঙ্গে মানুষের লড়াই দেখি তখন বেশ মজা লাগে। "থ্রিলিং" করার জন্য সিনেমাওয়ালারা অনেক কিছুই করতে পারেন।

ডাইনোসররা যে যুগে পৃথিবীতে বাস করত সেটাকে বলা হয় সরীসৃপ যুগ বা রেপ্‌টাইল এজ। উন্নততর স্তন্যপায়ী জীবের আবির্ভাব হয়েছে আরো পরে। উড়িষ্যার যে জায়গাটার কথা একটু আগে বলেছি তার আশেপাশে বাংলা-বিহার-ছোটনাগপুর উড়িষ্যার বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে সেই আদিম যুগে ছিল এক বিরাট জঙ্গল আর জলাভূমি তার অনেক প্রমাণ পেয়েছেন ভূতত্ত্ববিদরা। একথাও তাঁরা বলেছেন যে ঐ আদ্যিকালের জলা-জঙ্গলগুলোই মাটি চাপা পড়ে লক্ষ লক্ষ—কোটি কোটি বছর ধরে ওপরকার প্রচণ্ড চাপ আর নীচেকার প্রচণ্ড উত্তাপে ধীরে ধীরে কয়লায় রূপান্তরিত হয়েছে—যার ফলে ঐ জায়গাটা হয়ে দাঁড়িয়েছে একটা কয়লার রাজ্য। রাণীগঞ্জ, ঝরিয়া, ধানবাদ প্রভৃতি বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে কয়লা-খনি গড়ে ওঠার এটাই নাকি কারণ।

কিন্তু ডাইনোসর শুধু যে ঐ একটা অঞ্চলেই বাস করত তা ভাবলে ভুল হবে আর সব ডাইনোসরই যে ঐ রকম অতিকায় হত তাও ঠিক নয়। ছোট বড় নানান জাতের ডাইনোসরের সন্ধান পাওয়া গেছে। "জাত" কথাটা আমি মোটামুটি বোঝাবার উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করছি। বৈজ্ঞানিক ভাষায় বললে বলতে হয় 'জেনাস'—যার বাংলা করা হয়েছে 'গণ'। প্যালিয়ণ্টলজিস্ট,—অর্থাৎ যে সব বিজ্ঞানীরা ফসিল নিয়ে চর্চা করেন—তাঁদের মতে আজ পর্যন্ত প্রায় তিন-শ' জেনাস্-এর ডাইনোসর আবিষ্কৃত হয়েছে।

পৃথিবীর সব মহাদেশেই ছড়িয়ে ছিল এরা। সেই সাই-বেরিয়া থেকে শুরু করে গোবি মরুভূমিতে, মঙ্গোলিয়ায়, আলাস্কায়, ক্যানাডায়, উত্তর আমেরিকায়, কোথায় না? আমাদের দেশেও, একটু আগে যে অঞ্চলটির নাম করেছি সেটা ছাড়াও, মধ্যপ্রদেশে অতিকায় ডাইনোসরের ফসিল পাওয়া গেছে। টুকরো টুকরো হাড়, কিন্তু তা জোড়া দিয়ে দিয়ে বিজ্ঞানীরা ওদের গোটা কঙ্কালটাই গড়ে তুলতে পেরেছেন? এক সমুদ্রের নীল তিমি ছাড়া অত বড় প্রাণী পৃথিবীতে আর জন্মেছে কিনা সন্দেহ। তবে ছোট আকারের ডাইনোসরও যে যথেষ্ট জন্মাতো সে কথা তো আগেই বলেছি।

এ পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি ডাইনোসরের ফসিল পাওয়া গেছে ক্যানাডার অ্যালবার্টা অঞ্চলে। সেখানে এক সময় বয়ে যেত

* 16, চাউলপেটি রোড, কলিকাতা-700025

রেড ডিয়ার নামে একটা নদী। এখন সেটার অনেকটা শুকিয়ে গেছে কিন্তু তার শুকনো খাত আজও পড়ে আছে আর ঐ শুকনো খাতের মধ্যেই ছড়িয়ে আছে অসংখ্য ডাইনোসরের ফসিল। কয়েকজন ভূবিজ্ঞানী ওখানে ঘুরে এসে ওর যে বর্ণনা দিয়েছেন তা ওঁদের ভাষাতেই বলি :

"নদীর শুকনো খাতের ওপর দিয়ে আমরা হেঁটে চলেছি, ক্বচিৎ কোথাও ক্ষীণ জলধারা তির তির করে বয়ে চলেছে, তাছাড়া গোটা এলাকাটাই শুকনো বালিতে ভরা। আর সেই বালিতে ছড়িয়ে আছে ছোটবড় অগুণতি পাথুরে হাড়। সংখ্যায় এত বেশি যে প্রতি পদে তাদের না মাড়িয়ে এক পা এগুনো কঠিন। আর, আশ্চর্য, ঐ সমস্ত হাড়গুলোই হচ্ছে ডাইনোসরের ফসিল। দেখলেই মনে হয় এক সময়ে বোধ হয় জায়গাটা ছিল ডাইনোসরদের উপনিবেশ। কিংবা কোন অজ্ঞাত কারণে একসঙ্গে ওরা এসে ভিড় করেছিল ঐ নদীর ধারে—হয়তো কোনও বিরাট বিপদের মুখে পড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের আশায়। কিন্তু কী সে বিপদ ?"

বিপদ হয়তো নিশ্চয় একটা ছিল। নইলে অতগুলি জানোয়ার অত দোর্দণ্ড ছিল যাদের প্রতাপ, তারা হঠাৎ অত অল্প সময়ের মধ্যে একেবারে নির্বংশ হয়ে গেল কি করে? আগেই বলেছি বিজ্ঞানীরা অনেক হিসেবটিসেব করে বললেন আজ থেকে আন্দাজ সাড়ে ছ' কোটি বছর আগেই ওদের শেষ বংশধরটিও বিদায় নিয়ে গেছে পৃথিবী থেকে।

সম্প্রতি একটা আমেরিকান বিজ্ঞান পত্রিকা আমার হাতে এসেছিল। ডাইনোসরদের এই হঠাৎ বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া সম্বন্ধে তাতে একটা ভারি মজার কারণ দেখানো হয়েছে এবং তাতে সায় দিয়েছেন ওদেশের বেশ কয়েকজন বিজ্ঞানী। আমার বুদ্ধিতে খানিকটা অবিশ্বাস্য হলেও আধুনিক তথাকথিত "সায়ান্স ফিক্‌শনের" প্লট হিসেবে ঘটনাটি সত্যিই রোমাঞ্চকর।

কারণটা নাকি এই : আজ থেকে প্রায় সাড়ে ছ'কোটি বছর আগে একটি গ্রহাণু—যাকে বলা হয় মাইনর প্ল্যানেট,—মহাকাশে ছুটতে ছুটতে পৃথিবীর কাছাকাছি চলে আসে এবং পৃথিবী তার প্রবল আকর্ষণী শক্তি দিয়ে তাকে টেনে আনে নিজের বায়ুমণ্ডলে। তারপর সেটা পুড়তে পুড়তে, জ্বলতে জ্বলতে শেষ পর্যন্ত আছড়ে পড়ে পৃথিবীর গায়ে আর পড়বি তো পড় পড়ে গিয়ে একেবারে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে।

এর ফলে যা হবার তাই হল। ঐ বিরাট অগ্নিগোলকের ধাক্কায় সমুদ্রের বিরাট পরিমাণ জল বাষ্প হয়ে উড়ে গেল আকাশে—সঙ্গে নিয়ে গেল অজস্র ধুলো, অজস্র মিহি পাথরের গুঁড়ো। উঠে গেল একেবারে বায়ুমণ্ডলের রাজ্য ছাড়িয়ে আরও ওপরে, তারপর সেইখানেই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় জমাট বেঁধে ভাসতে লাগল। সেই ঘন কালো জমাট বাঁধা বাষ্প এবং ধুলো ভেদ করে সূর্যের আলো আর পৃথিবীর বুকে ঠিক মত পৌঁছতে পারল না—পৃথিবী ঢেকে গেল ঘন অন্ধকারে। কত দিন লেগেছিল সেই অন্ধকার কাটতে তার কোন হিসেব পাওয়া যায় নি, তবে তা হাজার হাজার বছর হলেও কিছু বলবার নেই। আর এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ই ডাইনোসরদের বংশ তছনছ করে দিয়ে ধীরে ধীরে তাদের নির্বংশ করে দিল।

মহাকাশে এরকম ছোটখাট গ্রহের অভাব নেই। বিশেষ করে মঙ্গল আর বৃহস্পতির মাঝামাঝি যে বিরাট এলাকা খালি পড়ে রয়েছে সেখানে এরকম অসংখ্য ছোটখাট গ্রহের সন্ধানও পাওয়া গেছে। তার কোনটার ব্যাস হয়তো 3/4 শ' কিলোমিটার বা তারও কম। তাই এদের গ্রহ বা প্ল্যানেট না বলে বলা হয় মাইনর প্ল্যানেট—যার বাংলা করা হয়েছে 'গ্রহাণু'। মাঝে মাঝে এরকম ছোটখাট 2-1টি গ্রহাণু ঘুরতে ঘুরতে পৃথিবীর কাছাকাছি এসে পড়াও কিছু অসম্ভব নয়। মাঝে মাঝে এ রকম "আসছে আসছে" বলে খবরও বেরোয়, কিন্তু আমাদের জানা সময়ের মধ্যে এরকম কখনও ঘটেছে বলে শুনি নি। তবে সেই দূর অতীত প্রাগৈতিহাসিক যুগে এরকম ঘটনা ঘটে থাকলে কিছু বলার নেই। তবে যে সব বিজ্ঞানী এই রহস্যময় ঘটনার কথা বলেছেন তাঁরা এর প্রমাণস্বরূপ কি তথ্য দিয়েছেন তা ঐ আমেরিকান বিজ্ঞান-পত্রিকা উল্লেখ করা হয় নি।

অবশ্য সব বিজ্ঞানীরাই যে এ ব্যাখ্যা মেনে নিতে রাজী হন নি তাও লেখা আছে ঐ পত্রিকায়। বিশেষ করে প্যালিয়ণ্টালিস্টরা। তাঁদের বক্তব্য, এই রকমই যদি হবে তবে তো সে যুগের সব রকম সরীসৃপই পৃথিবী থেকে লোপ পেয়ে যেত! কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তা হয় নি। উদাহরণ স্বরূপ তাঁরা সে যুগের কোন কোন কুমীরের উল্লেখ করেছেন। তাদের জাতভাইরা আজ পর্যন্ত প্রায় একই ধরনের চেহারা নিয়ে দিব্যি বহাল তবিয়তে টিকে আছে। ও রকম অঘটন যদি ঘটতই তবে এদের বংশও তো নির্মূল হয়ে যেত! তাঁরা বলেন, যে কারণে প্রাগৈতিহাসিক যুগের অন্যান্য অনেক প্রাণী আজ লোপ পেয়ে গেছে অতিকায় বা হ্রস্বকায় ডাইনোসরদেরও বিলুপ্তি ঘটেছে সেই একই কারণে। পৃথিবী ক্রমাগত বদলে যাচ্ছে। বিশেষ করে যুগে যুগে বদলে যাচ্ছে তার আবহাওয়া। কখনও আসছে খরার যুগ, আবার কখনও আসছে তুষার যুগ। বারে বারে চলেছে এই পরিবর্তন। এই প্রতিকূল আবহাওয়ার সঙ্গে যে সব প্রাণী নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পেয়েছে তারাই বংশরক্ষা করতে পেরেছে, যারা তা পারে নি তাদেরই হয়েছে বংশ লোপ। ডাইনোসরদের বংশলোপেরও কারণ ঐ একই।

তবু খুব একটা অল্প সময়ের মধ্যে হঠাৎ অমন একটা প্রতাপশালী জানোয়ারের অবলুপ্তি কেন ঘটল সে প্রশ্ন থেকেই যায়।

ডাইনোসরগুলো যে সত্যি ছিল সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী এবং এ যুগের সরীসৃপদের মতই যে তারা বংশ বিস্তার করত ডিম পেড়ে—এ তথ্য বিজ্ঞানীরা কি করে হাতে-নাতে আবিষ্কার করেছিলেন সে কাহিনীও বেশ কৌতুককর। অবশ্য সে অনেক দিন আগেকার ঘটনা। তার কথা জানতে হলে আমাদের চলে যেতে হবে সেই 1922 খৃস্টাব্দে।

ঐ বছর আমেরিকার 'মিউজিয়াম অব ন্যাচারাল হিস্ট্রির' পক্ষ থেকে ডাইনোসরের খোঁজে একদল বৈজ্ঞানিক অভিযাত্রী বাহিনীকে পাঠানো হয়েছিল গোবি মরুভূমিতে। দলের নেতা ছিলেন সে যুগের নামকরা প্রত্নতাত্ত্বিক চ্যাপ্‌ম্যান অ্যানড্রুজ। দলের অন্যান্যরাও ছিলেন বিজ্ঞানের নানা শাখার এক একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি।

কখনও উটের পিঠে চেপে, কখনও টাট্টু ঘোড়ায়, কখনও বা চলেছে টানা গাড়িতে চেপে আর বেশীর ভাগই পায়ে হেঁটে। এরা পুব থেকে পশ্চিমে প্রায় 2000 মাইল আর উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রায় 1200 মাইল জায়গা চষে ফেলেছেন ডাইনোসরের সন্ধানে। অনুসন্ধান বিফল হল না। প্রচুর অতিকায় ডাইনোসরের ফসিল সংগ্রহ হল তাঁদের ঝুলিতে। শেষে তাঁরা এমন একটা জায়গায় এসে পৌছলেন যেটাকে ডাইনোসরের গ্রাম বা উপনিবেশ বললেও ভুল হবে না। চারদিকে ছড়ান শুধু ফসিল আর ফসিল আর ফসিল! আর তার সবই প্রায় ডাইনোসরের।

কিন্তু এর চেয়েও আশ্চর্য ঘটনা দেখার সৌভাগ্য যে তাঁদের কপালে লেখা ছিল তা তাঁরা ভাবতে পারেন নি। দলের মধ্যে ছিলেন জর্জ অসলেন নামে এক তরুণ প্যালিয়ণ্টলজিস্ট তাঁর উৎসাহ ছিল খুব বেশী। ইতস্ততঃ ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল একটা চিলের ছানা। ছানা যখন রয়েছে তখন নিশ্চয়ই কাছাকাছি ওদের বাসাও আছে। কিন্তু কোথায়? এখানে তো গাছপালা প্রায় নেই বললেই চলে। তবে কি কাছাকাছি কোন টিলা আছে যার গুহায় চিলেরা থাকে? না, তাও নেই; কিন্তু তার বদলে পাওয়া গেল বালির মধ্যে বড় বড় গর্ত। তবে কি এখানকার চিলেরা বালিতে গর্ত খুঁড়ে বাস করে? কৌতূহলী অসলেন গর্তগুলো খুঁড়ে খুঁড়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন। হঠাৎ চোখে পড়ল একটা বিরাট গর্ত আর তার মধ্যে এক রাশ চ্যাপ্টা চ্যাপ্টা পাথর। পাথর বটে, কিন্তু দেখতে ঠিক ডিমের মত। লম্বায় এক একটা কম করে 9 থেকে 10 ইঞ্চি, বেড়ও এক একটার 6/7 ইঞ্চির কম নয়। তবে কি এগুলি ফসিল ডিম? আর এত বড় ডিম কি কোন পাখির হতে পারে? ভাল করে গর্তটা খুঁড়ে মোট 18টা ঐ চ্যাপ্টা পাথর পাওয়া গেল।

তারপর চলল সেই পাথর নিয়ে পরীক্ষা—সত্যিই এগুলো ফসিল ডিম কিনা।

কয়েকটা পাথর ভেঙ্গে ফেলা হল। তার পরেই একটা পাথরের মধ্যে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখা গেল। পাথরের মধ্যে একটা ভ্রূণের কঙ্কাল জমে আছে। অবিকল একটা খুদে ডাইনোসরের কঙ্কালের মত দেখতে সেই ভ্রূণের কঙ্কাল। বাচ্চাটা হয়তো ডিম ফুটে বেরোবে বেরোবে করছিল, কিন্তু বেরোবার আগেই কোন দুর্ঘটনায় মারা গেছে। তারপর লক্ষ লক্ষ বছর, না, হয়তো কয়েক কোটি বছর চলে গেছে,—সে ডিম আর কেউ আর বাইরে নিয়ে আসতে পারে নি। এই দীর্ঘকাল তার ওপর ক্রমাগত ধুলো আর বালি এসে জমেছে, স্তরের পর স্তর জমে তাতে একদম ঢেকে দিয়েছে। ইতিমধ্যে কত পরিবর্তন হয়েছে পৃথিবীর বুকে। ডাইনোসরের সেই না জন্মানো শিশু তেমনি রয়ে গেছে তার ডিমের মধ্যে। আর ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হয়েছে পাথরে—ফসিল ডিমে। কে জানে, তার মা হয় তো ডিম পেড়ে তাকে শত্রুদের চোখের আড়ালে রাখবার জন্য বালি দিয়ে ঢেকে রেখে গিয়েছিল, তারপর কোন কারণে আর ফিরে আসতে পারে নি। কিংবা কে জানে, হয় তো কোন ধূলিঝড় বা বন্যা এসে ডিমগুলোকে এমন ভাবে চাপা দিয়ে গেছে যে মা-ডাইনোসর আর কোন দিনই তাদেরকে খুঁজে পায় নি। কালক্রমে জল চুঁয়ে চুঁয়ে পড়ে সে ডিমকে আরও শক্ত—আরও জমাট করে তুলেছে। ইতিমধ্যে তার ওপর ক্রমাগত ধুলোবালি বা পলির স্তর জমেছে। সেই চাপে ডিমের সমস্ত নরম অংশ নষ্ট হয়ে গেছে, আর তার জায়গায় বালি বা চুনাপাথর ঢুকে সমস্ত জিনিসটাকে পাথরে রূপান্তরিত করে ফেলেছে। ভেতরের ভ্রূণের কঙ্কাল কিন্তু এত কাণ্ডের পরেও তার চেহারা পাল্টায় নি। মায়ের সঙ্গে সেও একদিন হয়ে গেছে ফসিল।

ডাইনোসররা যে ডিম পাড়ত, ওরা যে সরীসৃপ এ তথ্য সেদিন সঠিক ভাবে প্রমাণ করে দিয়ে তরুণ প্যালিয়ণ্টলজিস্ট অসলেন সেদিন প্রাণীবিজ্ঞানের একটা নতুন দিক খুলে দিয়ে গেলেন।

পরিবেশে সীসা ধাতু

অর্ণবকুমার দে*

রোমান সভ্যতার পতনের জন্য বিজ্ঞানীরা আংশিক ভাবে দায়ী করেছেন সীসা ধাতু (Lead)কে। রোমান রাজারা মদ্য ও অন্যান্য তরল পানীয় সীসার পাত্রে রাখতেন যা পান করার ফলে শাসকশ্রেণীর দ্রুত বংশ লোপ পায় বলে মতবাদ আছে। 1970তে কানাডার মন্ট্রিলে দু বছরের এক শিশু সীসার প্রলেপ যুক্ত মাটির পাত্র থেকে আপেলের রস পান করে প্রাণ হারায়।

প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ বিষাক্ত সীসা ধাতুকে বিভিন্ন কার্যে ব্যবহার করে আসছে। প্রকৃতিতে সীসার প্রধান উৎস—এর আকরিক গ্যালেনা (Galena)। তথাকথিত বিশুদ্ধ বায়ু ও বিশুদ্ধ জলে খুব সামান্য পরিমাণে সীসা থাকে। তবে বর্তমানে বায়ু ও জল দূষণের জন্য সীসার প্রাকৃতিক পরিমাণ (natural level) নির্ধারণ করা কঠিন।

বিশ্বে সীসা ধাতুর বার্ষিক ব্যবহারের পরিমাণ 35 লক্ষ টন। বিভিন্ন শিল্পে সীসা ধাতুর ব্যাপক ব্যবহার আছে। এর মধ্যে স্টোরেজ ব্যাটারী উৎপাদনে 43·1%, ধাতু শিল্পে 29·2%, রাসায়নিক শিল্পে 20·1%, রং হিসাবে 7·5% এবং অন্যান্য কার্যে 3·1% সীসা ব্যবহৃত হয়। যানবাহনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাটারী (Lead Storage Battery) উৎপাদনে সর্বাধিক সীসা ব্যবহৃত হয়। নানাবিধ সংকর ধাতু সীসা থেকে উৎপন্ন করা হয়ে থাকে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঝালাই বা সোল্ডার (Solder) এবং টাইপ মেটাল (Type metal)। ঝালাই-এর কার্যে সোল্ডার এবং মুদ্রণ শিল্পে টাইপমেটাল ব্যবহৃত হয়। অগ্নিসংকেতক যন্ত্রে ও বৈদ্যুতিক তারে কম গলনাঙ্ক বিশিষ্ট সীসার সংকর ধাতুকে ব্যবহার করা হয়। রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদনে যে পরিমাণ সীসা ব্যবহার হয় তার 99·8% ভাগই টেট্রাইথাইল লেড (Tetraethyl lead) নামক একটি যৌগ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়—যেটি পেট্রোলিয়াম শিল্পের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়। রং হিসাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে শ্বেত সীসা (White lead) ও লাল সীসা (Red lead)—এই দুটি সীসা যৌগকে।

সীসাধাতুকে নানাবিধ কার্যে লাগিয়ে মানুষ যেমন তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে বৃদ্ধি করেছে—একই সঙ্গে এই ধাতু ব্যবহারের ফলে মানুষ তার পরিবেশকে ক্রমশই দূষিত করে তুলছে। সীসা ধাতুর দূষণ বর্তমানে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশ সমস্যা।

পরিবেশে সীসা ধাতু মিশ্রিত হবার প্রধান উৎসগুলি হল—যানবাহন থেকে নির্গত ধোঁয়া, আকরিক থেকে সীসা নিষ্কাশনের কারখানা এবং খনির খনন কার্য।

যানবাহন থেকে নির্গত ধোঁয়া পরিবেশে সীসা দূষণের প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ উৎস। গ্যাসোলিনের দহন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য টেট্রাইথাইল লেড (Tetraethyl lead) এবং টেট্রামিথাইল লেড (Tetramethyl lead) নামক সীসাযৌগকে গ্যাসোলিনে মেশানো হয়ে থাকে। সীসার এই জৈব যৌগগুলিকে অ্যান্টিনক অ্যাডিটিভ (antiknock additive) বলা হয়।

যানবাহন চলাচলের সময় এই সীসাযৌগের 22—75% সীসা নির্গত হয়ে বায়ুতে মেশে এবং পরিশেষে নিকটবর্তী মাটিতে জমা হয়। PbBrCl এবং PbBrCl. 2PbO প্রধানত এই দুটি হ্যালোজেনযুক্ত সীসাযৌগ যানবাহন থেকে নির্গত হয়। বড় বড় সড়কের পার্শ্ববর্তী শস্যক্ষেত্র ও মাটিতেও এই সীসা জমে থাকে। সড়ক থেকে 200 মিটার দূরত্ব পর্যন্ত স্থানেও যথেষ্ট পরিমাণ সীসার অস্তিত্ব পাওয়া যায়।

আকরিক থেকে নিষ্কাশনকার্য ও খনির খনন কার্যের ফলে যে পরিমাণ সীসা পরিবেশে মেশে তার পরিমাণ যানবাহন থেকে নির্গত সীসার অপেক্ষা অনেক কম।

পরিবেশ থেকে সীসা ধাতু নানা ভাবে আমাদের দেহে প্রবেশ করতে পারে। বড় বড় সড়কের পার্শ্ববর্তী জমির শস্য বা শাকসবজি—যাতে বেশি মাত্রায় সীসা জমে থাকে—তাকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করলে দেহে ঐ সীসা প্রবেশ করবে। জলসরবরাহে ব্যবহৃত সীসার পাইপ থেকে পানীয় জলে ঐ ধাতু কিছুটা দ্রবীভূত হয়ে যায়। এই জল পান করা একেবারেই নিরাপদ নয়। সীসার আবরণযুক্ত মাটির পাত্রে রাখা তরল পান করা মারাত্মক ক্ষতিকারক।

পরিবেশে সীসার উপস্থিতি আমাদের কি ভাবে ক্ষতি করে তা এখন আলোচনা করা যাক। সীসার আয়ন (Pb^{2+}) দেহের একটি প্রয়োজনীয় উৎসেচক (enzyme)-এর অ্যামাইনো অ্যাসিডে যে সালফার থাকে তার সঙ্গে বিক্রিয়া করে ঐ উৎসেচকের স্বাভাবিক কার্যে বাধা দান করে। এই উৎসেচকটি হিমোগ্লোবিন (hemoglobin) গঠনের জন্য প্রয়োজনীয়।

সীসাধাতুর একটি মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব হল, শরীরে প্রবেশ করলে হাড়ের ক্যালসিয়ামকে প্রতিস্থাপিত করে সীসা হাড়ে জমা হয়ে থাকে। দেহে শোষিত হবার দীর্ঘদিন পরেও এটি দেহের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে যেতে পারে।

অল্পমাত্রায় সীসার বিষক্রিয়ার ফলে মাথা ধরা, পেশীতে যন্ত্রণা, শারীরিক ক্লান্তি, অ্যানিমিয়া ইত্যাদি রোগ দেখা যায়। অতিরিক্ত মাত্রায় শরীরে প্রবেশ করলে কিডনি, লিভার, মস্তিষ্ক

* রসায়ন বিভাগ, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

এবং কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষতি হয়। এর ফলে অসুস্থতা বা মৃত্যু ঘটতে পারে। সীসা-বিষক্রিয়ার ফলে শিশুদের মধ্যে মানসিক অসুস্থতা দেখা গেছে।

সীসা দ্বারা কোন মানুষ কতটা আক্রান্ত হয়েছে তা নির্ধারণ করা যায় ঐ মানুষের সমগ্র রক্তে কি পরিমাণ সীসা আছে তা নির্ণয়ের মাধ্যমে। মানুষের রক্তে বিজ্ঞানীরা সীসার নিরাপদ মাত্রা ধার্য করেছেন প্রতি দশ লক্ষ ভাগে O·2—O·8 ভাগ।

সীসা দূষণ প্রতিরোধ বর্তমানে বিশ্বের পরিবেশ সমস্যার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। বিশেষ করে যানবাহনের ধোঁয়া থেকে সীসা নির্গমনকে দমন করা অত্যন্ত জরুরী সমস্যা। গ্যাসোলিনে সীসা না মেশানো হলে ইঞ্জিনের কার্যক্ষমতা হ্রাস পেতে পারে এবং অন্যান্য দূষিত পদার্থ যেমন কার্বনমনোক্সাইড অধিকতর মাত্রায় নির্গত হতে পারে। তাই ইঞ্জিন থেকে সীসা নির্গমন দমনের জন্য ব্যাপক গবেষণা চলছে।

অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন (Aromatic hydro-carbon)-কে যুক্ত করে গ্যাসোলিনের দহন ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করা যায় সীসা যুক্ত না করে। ইথাইল অ্যালকোহল বা মিথাইল অ্যালকোহলকে সীসার পরিবর্তে সঠিক পরিমাণে গ্যাসোলিনে মেশালে ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে। যেহেতু সীসা নির্গমন সমস্যার প্রধান কারণ সীসা যৌগকে গ্যাসোলিনে মেশানো—তাই যানবাহনের ইঞ্জিনকে এমনভাবে গঠন করতে হবে যা সীসাহীন গ্যাসোলিনের সাহায্যেই সমান কার্যক্ষম হবে। বর্তমানে কয়েকটি উন্নত দেশে সীসাহীন গ্যাসোলিনের ব্যবহার শুরু হয়েছে।

সীসার পাইপে পানীয় জল সরবরাহ করা অথবা সীসার আবরণযুক্ত পাত্রে পানীয় রেখে খাওয়া একেবারেই অনুচিত। এ বিষয়ে জনসাধারণকে সতর্ক হতে হবে।

আমাদের দেশের মহানগরীগুলির বায়ু ও জলে বর্তমানে যথেষ্ট মাত্রায় সীসা আছে। কিন্তু এই দূষণ দমনের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাদি আজও বিশেষ কিছুই গ্রহণ করা হয় নি।

প্যাকেজিং-এ প্লাস্টিকের ব্যবহার

প্যাকেজিং-এ এ যাবৎ ব্যবহৃত প্রচলিত বস্তুগুলি আজ বিশেষ হুমকির সম্মুখীন। এ হুমকিটি আসছে প্লাস্টিক থেকে। প্যাকেজিং বস্তু হিসেবে বহুযুগ ধরে কাচ, ধাতব বস্তু, কাগজ, কাঠ ইত্যাদি প্রাধান্য পেয়ে আসছিল। এসব বস্তুর আধিপত্য প্লাস্টিকের কাছে আর টিকছে না।

প্লাস্টিক প্রযুক্তির এত দ্রুত সম্প্রসারণ হচ্ছে যে, উন্নত বিশ্বে বিভিন্ন ধরনের প্যাকেজিং-এ প্লাস্টিকের ব্যবহার আজ প্রায় বিশ শতাংশ। বাজারের নিয়ম অনুযায়ী যদি বিভিন্ন শিল্প কারখানাকে বেড়ে উঠতে দেয়া যায়, তবে উন্নত বিশ্বের শিল্পপতিদের মতে, প্যাকেজিং-এর সর্বক্ষেত্রে প্লাস্টিক হবে দৃশ্যমান।

প্লাস্টিকের ব্যবহার ক্রমশঃ সার্বজনীন হয়ে পড়ছে। খাবার এবং পানীয় আধারজাতকরণে এ যাবৎ কাচই ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। কাচ ভঙ্গুর বলে সেখানে আজ আবির্ভূত হয়েছে পিভিসি (পলিভিনাইল ক্লোরাইড, পিইটি (পলি ইথালিন টেরেপথেলেট) এবং বহুস্তরযুক্ত প্লাস্টিক। ধাতব পাত্রের পরিবর্তে উচ্চঘনত্বের পলিইথালিন এবং পলিপ্রোপাইলিনের পাত্র ব্যবহৃত হচ্ছে মোটর-অয়েল কেনা বেচায়। হালকা খাবার, ট্যাবলেট ইত্যাদি প্যাকেজিং-এ অ্যালুমিনিয়াম ও কাগজের মোড়কের পরিবর্তে ব্যবহৃত হচ্ছে আস্তরণযুক্ত পলিপ্রোপাইলিন ফিল্ম।

সন্দেহ নেই যে, প্লাস্টিকের বহুবিধ ব্যবহারগত সুবিধা রয়েছে। কিন্তু এর অতিরিক্ত ব্যবহারের সমস্যাও একেবারে কম নয়। প্লাস্টিক বা পলিইথালিন ব্যাগ বার বার ব্যবহারের যোগ্য ঠিকই, কিন্তু পাট, কাঠ বা অন্যান্য প্যাকেজিং বস্তুর মতো এগুলো পচনশীল বা আবহিক ক্ষয়যোগ্য নয়। ফলে প্লাস্টিকের অধিক ব্যবহার পরিবেশগত সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে।

[আজকের বিজ্ঞান, ঢাকা, বাংলাদেশ]

যে পাখিরা উড়তে পারে না

নারায়ণ চক্রবর্তী*

রিয়া হল আর একটি উড়তে না পারা পাখির নাম। এদের দেখা যায় দক্ষিণ আমেরিকায়, দক্ষিণ আমেরিকার সাধারণ লোক রিয়াকে বলে দক্ষিণ-আমেরিকার অস্ট্রিচ। রিয়া-পাখিরা উড়তে পারে না বটে, কিন্তু দক্ষিণ-আমেরিকার বিশাল, [illegible] ঘাসে ভরা প্রান্তর দিয়ে বেশ দ্রুত ছুটতে পারে। রিয়াদের আকার অবশ্য আফ্রিকার অস্ট্রিচদের চেয়ে ছোটই, তবে রিয়াদের আচার-আচরণ অনেকটা অস্ট্রিচদের মতোই।

রিয়ার উচ্চতা পাঁচ ফুট, এই উচ্চতা অবশ্য পাখির মাথা থেকে পা পর্যন্ত। অস্ট্রিচদের চেয়ে রিয়াদের ওজনও কম—রিয়ার ওজন মাত্র পঞ্চাশ পাউণ্ড। তবে [illegible] এই ওজন অবশ্য দক্ষিণ-আমেরিকার অন্য যে কোন পাখির চেয়ে বেশী। তাই ঐ 60 পাউণ্ড ওজন নিয়েই গরবিনী রিয়া লম্বা দৌড়ে টেক্কা দিয়েছে দক্ষিণ আমেরিকার যাবতীয় পাখিদের ওপর।

রিয়াকে দেখলে মনে হবে যেন কত বড় পাখি সে। তার পিঠ থেকে দু-দিকে গোল হয়ে ঝুলে পড়েছে রাশি রাশি লম্বা পালক—সব মিলিয়ে বেশ একটা মহারাণী, মহারাণী ভাব যেন তার।

রিয়ার শরীরটি আফ্রিকার উষর মরুর অস্ট্রিচের মতো অত ছিমছাম নয়। রিয়ার পালক দিয়ে চমৎকার পালকের ডাস্টার তৈরি হয়। রিয়ার গলাও বেশ লম্বা, চোখ দুটো বড় বড়, চোখের ওপরের পাতা পক্ষ্ম-যুক্ত। রিয়ার লম্বা লম্বা পা দুটিতে আছে তিনটি করে আঙুল, আর সেইসব আঙুলের শেষ মাথায় আছে তীক্ষ্ণ বাঁকান নখর।

রিয়ারা দল বেঁধে থাকে। ওরা শাক-সব্জী থেকে শুরু করে পোকা-মাকড় সবকিছুই খায়। পুরুষ রিয়ার উচ্চতা 165 সেন্টিমিটার হলেও স্ত্রী-রিয়ার উচ্চতা তার চেয়ে কিছুটা কম।

রিয়ার মাথা ও লম্বা গলাতে ছাড়া ছাড়া ভাবে পালক সাজান থাকে। ওদের পায়ের আঙুল তিনটির গোড়ার দিক মধ্যচ্ছদা দ্বারা যুক্ত থাকে।

মিলন-লগ্নে প্রত্যেক পুরুষ রিয়া তিন থেকে সাতটি সঙ্গিনী নির্বাচিত করে এবং প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা হারেম তৈরি করে দেয়, তার পর পর্যায়ক্রমে প্রত্যেকের সঙ্গে মিলিত হয়। ডিম পাড়ার সময় এলে পুরুষ-রিয়াই মাটিতে আঙুল ও নখরের সাহায্যে গর্ত খুঁড়ে নীড় রচনা করে দেয়। সেই একটি মাত্র মাটির গর্তের নীড়ে ঐ পুরুষ রিয়ার হারেমের সব মেয়ে রিয়াই এক সঙ্গে ডিম পাড়ে। ডিম পাড়ার ঋতুতে এক একটি ঐ রকম নীড়ে প্রায় পঞ্চাশটি ডিম পাড়ে হারেমের সব স্ত্রী-রিয়ারা। ডিম পাড়া শেষ হলে ঐ পুরুষ-রিয়াই ঐ সব ডিমে তা দেয় [illegible] ফুটিয়ে বাচ্চা তৈরি করে। টাটকা পাড়া ডিমে [illegible] লেবুর মতো হলদে রঙের হয়।

ডিমে তা দিতে হয় 40 দিন ধরে।

রিয়া পাখির উদ্ভব হয়েছিল দুই কোটি আশি লক্ষ বছর আগে মাইয়োসিন মহাযুগে।

মূলতঃ দক্ষিণ আমেরিকায় থাকলেও এক প্রজাতির রিয়াদের দেখা যায় ডারনিয়াসে।

রিয়ার বৈজ্ঞানিক পরিচয় দিচ্ছি এবার :—

শ্রেণী : অ্যাভেস (Aves)।

বর্গ : রেইফরমেস (Rheiformes)।

দক্ষিণ আমেরিকার রিয়া-পাখি।

প্রজাতি দুটি :

1. আমেরিকার প্রজাতির নাম :
   রিয়া আমেরিকানা (Rhea americana)।
2. ডারমিয়াসের প্রজাতির নাম :
   টেরোনেমিয়া পেন্নাটা (Pteronemia pennata)

*MF/18, শিমুলগ্রাম, পোঃ কুলটি, বর্ধমান

এমু এবং ক্যাসোয়ারি পাখিরা একই বর্গের উড়তে না পারা পাখি। এদের দেখা যায় অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে। এই পাখিরাও দেখতে অনেকটা আফ্রিকার অস্ট্রিচের মতোই, তবে পার্থক্যও আছে—এদের পালকগুলি সাধারণ পাখির পালকের মতো নয়, পালকগুলি আসলে রোমশ-পালক।

প্রথমে এমুর কথা বলছি।

[illegible] প্রায় পাঁচ ফুট, এদের ঠোঁট চ্যাপটা ও চওড়া। এদের শরীর বেশ ভারী, পা দুটি খুব লম্বা এবং মজবুত ও শক্তিশালী। গলা এদের বেশ লম্বা। এমুর পা দুটিতে আছে তিনটি করে আঙুল, যার মধ্যে মাঝের আঙুলটি আত্মরক্ষার প্রয়োজনে বিশেষ আকার নেয়। মেয়ে ও পুরুষ উভ এমুর শরীরের রঙ গাঢ় বাদামি। মিলন-লগ্নে পুরুষ এমু একটি মাত্র সঙ্গিনী বেছে নিয়ে সংসার পাতে। এমুর ডিম হয় গাঢ়-সবুজ রঙের। এক একটি ডিম লম্বায় হয় প্রায় সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি। স্ত্রী-এমু দুই ভাগে ডিম পাড়ে; এক ভাগের ডিমের ওপরে বসে তা দেয় পুরুষ এমু এবং অন্য ভাগের ডিমের ওপরে বসে তা দেয় স্ত্রী-এমু। এমুর ডিমের সংখ্যা পনেরো কিংবা তার কিছু বেশী হয়। ষাট দিন ধরে ডিমে তা দিতে হয়, ষাট দিন পরে ডিম ফুটে বাচ্চা এমু বেরিয়ে আসে। নবজাত এমু-বাচ্চাদের শরীরে লম্বা লম্বা স্ট্রাইপ থাকে, যা পরে মিলিয়ে যায়। বাচ্চাদের রক্ষণাবেক্ষণ এবং বড় করে তোলার ভারও নেয় পুরুষ এমুই।

এমুদের খুব দ্রুত ঘাস খাবার ক্ষমতা আছে বলে অস্ট্রেলিয়ার মেষ-পালকদের কাছে এমুরা এক আতঙ্ক বিশেষ, কারণ ভেড়া চরাবার তৃণাচ্ছাদিত মস্ত মস্ত গোচারণ ভূমির সব ঘাস দলবদ্ধ এমুরা খেয়ে সাবাড় করে দেয়। এমুরা বেশীর ভাগ সময়েই থাকে তৃণাচ্ছাদিত বড় বড় শুষ্ক উন্মুক্ত প্রান্তরে। উড়তে না পারলেও এমুরা ছুটতে পারে বেশ, আর এই ছোটাতে এমুকে সাহায্য করে ওদের লম্বা লম্বা, সরু সরু অথচ বলিষ্ঠ পা দুটি। এমুরা ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল বেগে দৌড়াতে পারে।

এমুদের অবশ্য অস্ট্রেলিয়া ছাড়া নিউগিনী এবং পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের দেখা যায়। এই এমুর উচ্চতা হয় একশত আশি সেন্টিমিটার, অর্থাৎ প্রায় ছয় ফুট।

এমুর বৈজ্ঞানিক পরিচয় এই রকম :

শ্রেণী : অ্যাভেস (Aves)

বর্গ : ক্যাসুয়ারিফরমেস (Casuariformes)

পূর্ণ বৈজ্ঞানিক নাম : ড্রোমায়ুস নোভাই হোলানডি (Dromaeus novaehollandiae)

এবার বলছি ক্যাসোয়ারি পাখির কথা। এই উড্ডীয়ন শক্তিহীন পাখিরা অস্ট্রেলিয়ার উষ্ণমণ্ডলের গহন বনে একা একা বিচরণ করে। অস্ট্রেলিয়া ছাড়াও এদের দেখা যায় নিউগিনী ও পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের নিবিড় অরণ্যে। ক্যাসোয়ারিদের বেশ কয়েক প্রজাতির সন্ধান পাওয়া গেছে। এই অরণ্যচারী পাখিদের উচ্চতা প্রায় এক[illegible] পঁয়ত্রিশ সেন্টিমিটার অর্থাৎ সাড়ে চার ফুটের কিছু কম, তবে পাঁচ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট ক্যাসোয়ারিও দেখা যায়। ক্যাসোয়ারির পাখা দুটি ছোট ছোট, তবে শরীরে প্রচুর পালক আছে তাছাড়া মাথা ও লম্বা গলা রোম বা পালকহীন। ক্যাসোয়ারির পালকগুলি অবিকল পশু রোমের মতো। এদের পালক দেখতে অনেক[illegible]কের মতো এবং তা অনমনীয়। ঐ
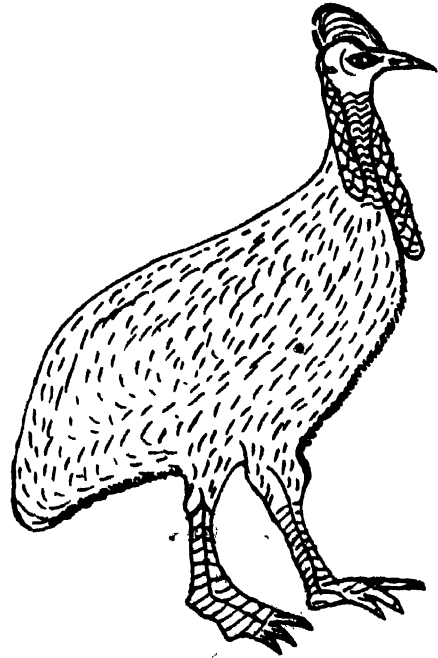
ক্যাসোয়ারি পাখি।

পালকগুলি পাখির শরীরের দুই পাশে ঝুলে থাকে এবং সেই সব পালকের রঙ খুবই উজ্জ্বল।

ক্যাসোয়ারিদের গলার উজ্জ্বল রঙের এক শ্রেণীর পালকগুলি আড়াআড়িভাবে পরস্পর বিজড়িত অবস্থায় গলার দুই দিকে ঝুলে থাকে। সব প্রজাতির ক্যাসোয়ারিরই মাথার চাঁদিতে পশুশৃঙ্গের উপাদানে নির্মিত প্রকৃতিদত্ত কঠিন শিরস্ত্রাণ থাকে। ঐ শিরস্ত্রাণের সাহায্যেই এই পাখিরা গভীর দুর্ভেদ্য জঙ্গলের গাছের ডাল, লতা-পাতা ভেদ করে স্বচ্ছন্দ বিচরণ করতে পারে। গলার দুই পাশ দিয়ে বর্ণময় পালকগুলি

লম্বালম্বি ভাবে নিচের দিকে ঝুলে থাকে। এইসব পালকও আড়াআড়ি ও লম্বালম্বিভাবে পরস্পর বিজড়িত। এই ঝুলন্ত এবং অনেকটা রজ্জু-সদৃশ পালকগুচ্ছ দুটিকে বলে ওয়াটল। ক্যাসোয়ারির ছবিতে পালকের ওয়াটল দেখা যাচ্ছে।

ক্যাসোয়ারি এক ইঞ্চিও উড়তে না পারলেও উল্লম্ফনে দক্ষ। এই পাখিরা আট ফুট উঁচু যে কোনো বাধার প্রাচীর অনায়াসে এক লাফে পার হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া ওরা দৌড়বাজও কিছু কম নয়, ঘণ্টায় পঁয়ত্রিশ মাইল বেগে ছুটতে পারে ওরা।

ক্যাসোয়ারিদের মাথা ও গলায় পালক না থাকলেও ওদের মাথা ও গলা উজ্জ্বল নীল, লাল ও সবুজ রঙে চিত্রিত থাকে, তাই এই পাখিদের দূর থেকে চমৎকার দেখায়।

ক্যাসোয়ারি নিশাচর পাখি।

ক্যাসোয়ারির ও এমুর উদ্ভব হয়েছিল প্লাইয়োসিন মহাযুগে, অর্থাৎ আজ থেকে ছয় কোটি ত্রিশ লক্ষ বছর আগে।

ক্যাসোয়ারির বৈজ্ঞানিক পরিচয় দিচ্ছি এবার :—

শ্রেণী : অ্যাভেস (Aves)

বর্গ : ক্যাসুয়ারিফরমেস (Casuariformes)

পূর্ণ বৈজ্ঞানিক নাম : ক্যাসুয়ারিয়াস ক্যাসুয়ারিয়াস (Casuarius casurius)

ভেবে উত্তর দাও

সৌমিত্র মজুমদার*

[সঠিক উত্তর চিহ্নিত করো]

1. "হিমোসিলোমিক্ ফ্লুইড" কোন্ প্রাণীর রক্তের নাম ?
(a) আরশোলা, (b) মানুষ, (c) ব্যাঙ, (d) কেঁচো।

চিত্র-1 চিত্র-2

চিত্র-3 চিত্র-4

2. 1 নম্বর ছবিতে এক বিজ্ঞানী (ফরাসী রসায়নবিদ)-র মুখের অংশ দেখা যাচ্ছে, বলতে পারো কে ইনি ?
(a) এডিসন, (b) মার্কনি, (c) জোসেফ. এ. লা. বেল, (d) বয়েল।

3. 2নং চিত্রে ওটা কোন্ পাখির ছবি ভেবে বলো ?
(a) চড়াই, (b) কাঠঠুকরো, (c) শালিখ, (d) চাতক।

4. কলিকাতা বেতার কেন্দ্র কোন্ খৃস্টাব্দে স্থাপিত হয়েছিল ?
(a) 1924, (b) 1965, (c) 1912 (d) 1927

5. 3নং চিত্রে ওটা কোন্ জীব বলতে পার ?
(a) ফ্লেমিংগো, (b) গগনবেড়, (c) মৌটুসী, (d) কোস্‌টার।

6. 4নং চিত্রে বিচিত্র প্রাণীটাকে চিনতে পারলে কি ?
(a) কুমীর, (b) তিমি, (c) হংসচঞ্চু, (d) ইঁদুর।

7. (a) 'স্যাকারিন'-র উৎস কি ?
(a) বেঞ্জিন, (b) টলুইন, (c) সোডিয়াম, (d) নাইট্রোজেন।

8. "ক্রাইসোপেলিয়া অর্নাটা" কার বৈজ্ঞানিক নাম ?
(a) চন্দ্রবোড়া, (b) অজগর, (c) গোখরো, (d) কালনাগিনী।

9. আলফ্রেড নোবেল কি আবিষ্কার করে বিখ্যাত হন ?
(a) ডিনামাইট, (b) টকিমেশিন, (c) ডায়নামো, (d) চশমা।

10. 'ওকাপি' কোন্ দেশের জন্তু ?
(a) ভারত, (b) জাপান, (c) ব্রেজিল, (d) আফ্রিকা।

---

*73নং পূর্বাচল পল্লী, পোঃ রহড়া, জেলা 24-পরগণা,

'ভেবে উত্তর দাও'-র সমাধান

1. (a) আরশোলা, 2. (c) জোসেফ. এ. লা. বেল, 3. (b) কাঠঠুকরো, 4. (d) 1927 খৃস্টাব্দে, 5. (a) ফ্লেমিংগো; 6. (c) হংসচঞ্চু, 7. (b) টলুইন, 8. (d) কালনাগিনী, 9. (a) ডিনামাইট, 10. (d) আফ্রিকা।

পরিষদ সংবাদ

হিরোশিমা দিবস উদযাপন

মানব মনীষার শ্রেষ্ঠ অবদান যে বিজ্ঞান মানুষের অগ্রগতিতে যা ক্রমাগত পথ দেখিয়ে চলেছে তার জঘন্যতম অপব্যবহার ঘটেছিল আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে 1945 খৃঃ 6ই এবং 9ই অগাস্ট জাপানে হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহর দুটিতে মার্কিন পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণে লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ লোকের মৃত্যু ও ভয়াবহ ধ্বংসলীলায়। সাথে সাথে দেশে দেশে শুরু হয়ে গেল পারমাণবিক যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণের এক ক্রমবর্ধমান উন্মত্ত প্রতিযোগিতা। প্রতি বছরই 6ই অগাস্ট হিরোশিমায় পরমাণুবোমা নিক্ষেপের ঘটনাটি স্মরণ করে পৃথিবীর দেশে দেশে উদযাপিত হয় হিরোশিমা দিবস। প্রতি বছর ঐ দিন লক্ষ লক্ষ মানুষ সভাসমিতি আর আর মিছিল করে যুদ্ধের বিরুদ্ধে ও পরমাণু অস্ত্রের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানায়। পারমাণবিক অস্ত্রনির্মাণের প্রতিযোগিতায় উন্মত্ত যুদ্ধবাজদের মানবতা বিরোধী যুদ্ধ প্রস্তুতির বিরুদ্ধে ধিক্কার জানাতে এবছরও 6ই অগাস্ট, 1985 মঙ্গলবার বেলা 2টায় বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ (সত্যেন্দ্র ভবন, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট কলিকাতা-৬, গোয়াবাগান সি. আই. টি পার্ক) থেকে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গবেষক সংস্থা, সাহা ইনষ্টিট্যুট গবেষক সংস্থা, বঙ্গবাসী সান্ধ্য কলেজ, গান্ধী শান্তি প্রতিষ্ঠান, উল্টাডাঙ্গা ইউনাইটেড হাইস্কুল, টাউন স্কুল, গণতান্ত্রিক লেখক ও শিল্পী সংঘ, মানবিক মূল্যবোধ সংরক্ষণ মঞ্চ, গণবিজ্ঞান কেন্দ্র, (গৌরীবাড়ী), নিউক্লিয় যুদ্ধ নিবারণের জন্য আন্তর্জাতিক চিকিৎসকবৃন্দ (কলিকাতা শাখা), পিস কাউন্সিল (পঃ বঃ শাখা), বাঘাযতীন স্মৃতি সংঘ, চেতনা সাংস্কৃতিক সংস্থা, সূর্যোদয় হোমিও কোচিং সেণ্টার, কলিকাতা জাতীয় সেবা প্রতিষ্ঠান, ঐকশ্রী পাঠাগার, প্রহরী, (রায়বাগান স্ট্রীট), সমাগম, দূরদর্শী, নবারুণ অ্যাথলেটিক ক্লাব, বিজ্ঞান কর্মী সংস্থা এবং অন্যান্য বিজ্ঞান ক্লাব ও প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, বিজ্ঞান কর্মী, অধ্যাপক, শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী ও সাধারণ মানুষের এক বিরাট বর্ণাঢ্য মিছিল বের হয়। পশ্চিবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর থেকে আনা অনেক বড় বড় যুদ্ধবিরোধী শ্লোগান-পোস্টার ও ব্যানার মিছিলের শোভা বর্ধন করে। মিছিলটি সুরু হবার আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বায়ত্বশাসন ও পৌর উন্নয়ন রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীশৈলেন সরকার পরমাণু অস্ত্র ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে ও শান্তির সপক্ষে এক মনোজ্ঞ বক্তব্য রাখেন এবং মিছিলের সঙ্গে পদযাত্রা শুরু করেন। কলিকাতার মেয়র শ্রীকমল বসুও পরে মিছিলের সঙ্গে পদযাত্রায় অংশ গ্রহণ করেন। মিছিল আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, শ্যামবাজার মোড়, বিধান সরণী, কলেজ স্ট্রীট, সূর্যসেন স্ট্রিট হয়ে শিয়ালদহ রেল ষ্টেশন চত্বরে এক সমাবেশে শেষ হয়। সেখানে সভায় পরমাণু অস্ত্র ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং শান্তির সপক্ষে বক্তব্য রাখেন বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে ডঃ জয়ন্ত বসু, ডঃ সুকুমার গুপ্ত, ডঃ রতন

হিরোশিমা দিবসের মিছিল

ফটো— জগবন্ধু পাত্র

মোহন খাঁ, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় হিরোশিমা কমিটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক সূর্য্যকান্ত মিশ্র, সাহা ইনস্টিট্যুট অব নিউক্লীয় ফিজিক্সের অধ্যাপক মোহনলাল চট্টোপাধ্যায় J.A.C A.RI.-এর পক্ষে দুর্দান্ত রায়, অধ্যাপক অজিত ঘোষ, গণতান্ত্রিক লেখক ও শিল্পী সংঘের পক্ষে নেপাল মজুমদার, গান্ধী শান্তি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে শ্রীচন্দন পাল, উল্টাডাঙ্গা ইউনাইটেড হাইস্কুলের শিক্ষক শ্রীকালিদাস সমাজাদার, ইনষ্টিট্যুট অব রাশিয়ান লেঙ্গুয়েজ সল্টলেক এর অধ্যাপক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়, মানবিক মূল্যবোধ সংরক্ষণ মঞ্চের শ্রীপ্রবীর সেন, ডঃ ব্রহ্মানন্দ দাশগুপ্ত, জুয়োলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার শ্রীসুধাংশুকুমার

নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের অধিকর্তা ডঃ মনোজকুমার পাল "নিউক্লিয় যুদ্ধ" শীর্ষক শিবপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-বক্তৃতা প্রদান করেন।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের 125 তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে 'ক্যুইজ' প্রতিযোগিতা

17-8-85 তারিখে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ও কিশোর কল্যাণ পরিষদের যৌথ উদ্যোগে সত্যেন্দ্র ভবনে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের 125তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ক্যুইজ প্রতিযোগিতা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। যথাক্রমে বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি ডঃ জয়ন্ত বসু ও বসু বিজ্ঞান মন্দিরের অধিকর্তা ডঃ বীরেন্দ্রবিজয়

হিরোশিমা দিবসের মিছিলের সূচনা ঘোষণা করছেন পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীশৈলেন্দ্র সরকার, পাশে পরিষদের কর্মসচিব ডঃ সুকুমার গুপ্ত, সভাপতি ডঃ জয়ন্ত বসু ও হিরোশিমা উদ্‌যাপন কমিটির আহ্বায়ক শ্রীশিবচন্দ্র ঘোষ।

ফটো—জগবন্ধু পাত্র

তালুকদার, সুখোদয় হোমিও কোচিং সেণ্টারের শ্রীসুতাংশু চক্রবর্তী, নবারুণ এ, সির সুপ্রিয় দাস এবং সভার সভাপতি হিরোশিমা দিবস উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক শ্রীশিবচন্দ্র ঘোষ। মিছিলের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সারা পথ নিজেদের সুসজ্জিত লরি থেকে যুদ্ধ বিরোধী গণ-সঙ্গীত পরিবেশন করেন গ্রন্থশ্রীপাঠাগারের গানের দল। মিছিলে সারাপথ পোষ্টারে সুসজ্জিত লরি থেকে এবং সভাশেষেও শিয়ালদা ষ্টেশন চত্বরে শ্রীমতী ইরা গুপ্ত এবং তাঁর ছাত্রীবৃন্দ পরমাণু অস্ত্র ও যুদ্ধ বিরোধী গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন।

শিবপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি বক্তৃতা

9ই অগাস্ট 1985 পরিষদ ভবন সাহা ইনস্টিটিউট অব

বিশ্বাস। বিজ্ঞান পরিষদের কর্মসচিব ডঃ সুকুমার গুপ্ত ও কিশোর কল্যাণ পরিষদের সভাপতি ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সভায় ভাষণ দেন। ডঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা 'আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়' বিষয়ে স্লাইডসহযোগে বক্তৃতা প্রদান করেন।

রাজশেখর বসু স্মৃতিবক্তৃতা

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদে 24-9-'85 তারিখে ডঃ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় রাজশেখর বসু স্মৃতি বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল—পরিবেশ সংরক্ষণ ও কৃষিকার্যে রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার। বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি ডঃ জয়ন্ত বসু সভাপতিত্ব করেন। পরিষদের কর্মসচিব ডঃ সুকুমার গুপ্ত প্রারম্ভে স্মৃতি বক্তৃতার বিষয়ে ভাষণ দেন।

প্রতিবেদক—পঞ্চানন পাল

হিরোশিমা আর নয়

আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে—1945 খৃস্টাব্দের ৬ই অগাস্ট। মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে সবচেয়ে কলঙ্কিত দিন। সভ্যতার শ্রেষ্ঠ ফসল যে বিজ্ঞান, মানুষের অগ্রগতিতে যা ক্রমাগত নতুন নতুন দিগন্ত খুলে দিচ্ছে, তার জঘন্যতম অপব্যবহার ঘটেছিল ঐ দিন। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে যে নতুন ভয়াবহ মারণাস্ত্র পারমাণবিক বোমা তৈরি হয়েছিল, মার্কিন বি-29 বোমারু বিমান সেই ধরনের একটি বোমা ঐ দিন জাপানের হিরোশিমা শহরের উপর নিক্ষেপ করেছিল। সেই বোমার বিস্ফোরণের যে প্রবল ঝঞ্ঝা, প্রচণ্ড তাপদাহ ও প্রখর তেজস্ক্রিয় বিকিরণের সৃষ্টি হল, তাতে জনবহুল হিরোশিমা শহর সম্পূর্ণ ভাবে বিধ্বস্ত হয়ে গেল, সমস্ত শহর যেন পরিণত হল এক মহাশ্মশানে। একটিমাত্র বোমার বিস্ফোরণে নিহত মানুষের সংখ্যা কমপক্ষে 60 হাজার, আহতের সংখ্যা 1 লক্ষ এবং গৃহহীনের সংখ্যা 2 লক্ষ। স্থলে-জলে-অন্তরীক্ষে যে তেজস্ক্রিয়তার উৎপত্তি হয়েছিল, তাৎক্ষণিক ক্ষতি ছাড়াও তার প্রকোপ চলেছিল কয়েক বছর ধরে। লিউকেমিয়া, ফুসফুসের ক্যান্সার ইত্যাদি রোগে বহু লোকের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠল। পঙ্গু, বিকলাঙ্গ হয়ে পারমাণবিক বোমার জীবন্ত অভিশাপ রূপে রয়ে গেলেন লক্ষাধিক মানুষ। আরো উল্লেখ্য, তেজস্ক্রিয়তার যাঁরা শিকার হয়েছিলেন তাঁদের পরবর্তী প্রজন্মের অনেকের মধ্যেও তেজস্ক্রিয়তার মারাত্মক ফল প্রকাশ পেয়েছিল।

হিরোশিমায় কলঙ্কের যে ইতিহাস, তার পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল 3 দিন পরে। ৯ই অগাস্ট আর একটি পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল জাপানের নাগাসাকি শহর তেজস্ক্রিয়তার বিষ ছড়িয়ে গেল চারদিকে। হতাহত ও ক্ষতি-গ্রস্তের সংখ্যা লক্ষাধিক।

নিউক্লীয় অস্ত্র-সম্ভার

হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে নিক্ষিপ্ত বোমার শক্তি ছিল মোটামুটি ভাবে 20 কিলোটন অর্থাৎ 20 হাজার টন টি.এন.টি (ট্রাইনাইট্রোটলুইন) বিস্ফোরকের সমতুল্য। পরবর্তী কালে এমন হাইড্রোজেন বোমা তৈরি হয়েছে, যার ধ্বংস ক্ষমতা ঐ বোমার হাজার গুণ বা তার চেয়েও বেশি। নিউক্লীয় বোমাকে লক্ষ্যস্থলে নিক্ষেপের জন্যে অত্যন্ত উন্নত মানের বোমারু বিমান ও নানারকম ক্ষেপণাস্ত্র নির্মিত হয়েছে। আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র (ICBM) নিউক্লীয় বোমাকে এক মহাদেশ থেকে বহু হাজার কিলোমিটার দূরে অন্য মহাদেশের নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দিতে পারে। আবার সমুদ্রের মধ্যে অপেক্ষাকৃত নিরাপদে অবস্থিত ডুবোজাহাজ থেকে দূরবর্তী অঞ্চলে নিক্ষেপের উপযোগী) ক্ষেপণাস্ত্র (SLBM) তৈরি হয়েছে। এমন সব ক্ষেপণাস্ত্র (MIRV) তৈরি হয়েছে, যেগুলি একাধিক নিউক্লীয় বোমাকে বহন করে নিয়ে গিয়ে সুদূর অঞ্চলে বিভিন্ন লক্ষ্যস্থলে নিক্ষেপ করতে পারে।

বর্তমানে পৃথিবীতে নিউক্লীয় অস্ত্রের সংখ্যা প্রায় 50 হাজার। যে কোনো মুহূর্তে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। এগুলির সম্মিলিত ধ্বংসক্ষমতা নিক্ষিপ্ত বোমার প্রায় 10 লক্ষ গুণ। এর 15 ভাগের মাত্র 1-ভাগই নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে সমস্ত পৃথিবীকে। তবু নিউক্লীয় অস্ত্র বানানোর মারাত্মক পাগলামি থামছে না। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, আগামী 5 বছরে আরো প্রায় 17 হাজার নিউক্লীয় অস্ত্র তৈরি করবার পরিকল্পনা রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের।

নিউক্লীয় অস্ত্র ক্রমেই পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন ছাড়াও ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং চীনও এই অস্ত্রের অধিকারী। কিছু কাল আগে ইওরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে বসানো হয়েছে 'ইওরো-মিসাইল'। সন্দেহের যথেষ্ট কারণ আছে যে, ইজরায়েল ও দক্ষিণ আফ্রিকাতেও রয়েছে বেশ কিছু নিউক্লীয় অস্ত্রের মজুদ। 1974 খৃস্টাব্দে ভারতের পোখরানে পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছিল। সম্প্রতি খবরে প্রকাশ, পাকিস্তান নিউক্লীয় বোমা বানানোর জন্য অত্যন্ত তৎপর হয়ে উঠেছে। ফলে ভারত উপমহাদেশেও নিউক্লীয় রেষারেষি শুরু হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত প্রবল। বস্তুত তৃতীয় বিশ্বেও নিউক্লীয় পাগলামির হাওয়া বইতে শুরু করেছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকাতে মোট জাতীয় উৎপাদনের প্রায় 6% এখনই ব্যয় করা হয় সামরিক খাতে, যেখানে জনস্বাস্থ্যের জন্য ব্যয় হয় মাত্র 1%, শিক্ষাখাতে 2·8%। নিউক্লীয় অস্ত্র ও যুদ্ধের অন্যান্য আয়োজনে বর্তমানে পৃথিবীতে দৈনিক ব্যয়ের পরিমাণ 2,000 কোটি টাকা। অন্য দিকে প্রতিদিন অনাহারে 40 হাজার শিশুর মৃত্যু হচ্ছে। পৃথিবীর 70 কোটি মানুষ অপুষ্টিতে ভুগছে, নিরক্ষরের সংখ্যা অন্তত 50 কোটি।

মহাকাশ যুদ্ধ

সাম্প্রতিক কালে নতুন করে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে Star War বা মহাকাশ যুদ্ধের আশংকা। বর্তমানে যত কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে আছে, সেগুলির 70 ভাগ রয়েছে সামরিক

উদ্দেশ্যে—গুপ্তচরবৃত্তি, বিপক্ষের ক্ষেপণাস্ত্র সংক্রান্ত খোঁজখবর দেওয়া ইত্যাদি কাজের জন্যে। এখন চেষ্টা চলেছে সরাসরি মহাকাশে অস্ত্র স্থাপন করে সেখান থেকে যুদ্ধে মদত দেবার। এই উদ্দেশ্যে অত্যন্ত শক্তিশালী লেসার, এক্স্-রেসার ইত্যাদি যন্ত্র বানানোর পরিকল্পনা করেছে। এই সব যন্ত্র থেকে নির্গত মারাত্মক রশ্মি ক্ষেপণাস্ত্রকে ধ্বংস করে দিতে পারে। আকাশ-পথে বিপক্ষের ক্ষেপণাস্ত্রকে ধ্বংস করবার জন্যে মহাকাশ এবং ভূপৃষ্ঠ, দু জায়গা থেকেই এই সব যন্ত্র ব্যবহার করবার কথা ভাবা হচ্ছে। আবার, বিপক্ষের ক্ষেপণাস্ত্র বা উপগ্রহকে ধ্বংস করতে পারে, এমন খুনী উপগ্রহ, শিকারী মহাকাশযান—এই সবকে বাস্তবে রূপায়িত করবার প্রচেষ্টা চলছে। কিছু কিছু লোক বলছেন, এইভাবে তাঁরা নিউক্লীয় যুদ্ধকে 'সীমিত' করবেন এবং সেই যুদ্ধ জিতে যাবেন, কারণ তাঁদের ক্ষেপণাস্ত্র বিপক্ষের দেশকে বিধ্বস্ত করবে কিন্তু বিপক্ষের ক্ষেপণাস্ত্র ও সামরিক উপগ্রহগুলিকে তাঁরা আকাশ-পথে ধ্বংস করে দেবেন। সামরিক আয়োজনকে মদত দেবার জন্যে এটি আসলে যুদ্ধবাজদের এক সর্বনাশ চক্রান্ত—বর্তমানে দুই প্রধান প্রতিপক্ষের যে ক্ষমতা, তাতে একবার নিউক্লীয় যুদ্ধ বাধলে তার দাবানল বহুলাংশে ছড়িয়ে পড়বেই। তখন ক্ষয়ক্ষতি কিরকম হবে, তার হিসেব দিয়েছেন সুইডেনের বিজ্ঞান অ্যাকাডেমী : নিহত হবে অন্তত 74 কোটি মানুষ, আহত হবে 34 কোটি; তাছাড়া কোটি কোটি মানুষ তেজস্ক্রিয়তার শিকার হবে, সমস্ত পৃথিবীর জল-স্থল-অন্তরীক্ষ পরিণত হবে তেজস্ক্রিয়তার লীলাক্ষেত্র।

নিউক্লীয় অস্ত্র বিরোধী আন্দোলন

বিজ্ঞানের অপব্যবহারে যে ফ্র্যাংকাস্টাইনের সৃষ্টি হয়েছে তা কেবল বিজ্ঞানকেই নয়, সমস্ত মনুষ্যজাতিকেই ধ্বংস করে ফেলতে পারে। নিউক্লীয় অস্ত্র উদ্ভাবনের পর বহু বিজ্ঞানী এই বিপদ সম্পর্কে সচেতন হন। 1955 খৃস্টাব্দে অ্যালবার্ট আইনস্টাইন, বার্ট্রাণ্ড রাসেল ও আরো 9 জন খ্যাতনামা বিজ্ঞানী নিউক্লীয় অস্ত্রের বিরুদ্ধে একটি ইস্তাহার প্রকাশ করেছিলেন। এর উপর ভিত্তি করে 'পাগওয়াশ' আন্দোলন গড়ে উঠে। যে 156 জন নোবেল বিজ্ঞানীর কাছে পাগওয়াশ আন্দোলনের ঘোষণা পাঠানো হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে 111 জন এতে স্বাক্ষর করেছিলেন। পরবর্তী কালে বহু বিজ্ঞানী সংঘবদ্ধ ভাবে নিউক্লীয় অস্ত্রের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন।

নিউক্লীয় যুদ্ধের ফলাফল মানুষের দেহের পক্ষে কী ভয়াবহ হতে পারে, তা উপলব্ধি করে বহু চিকিৎসক যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলেছেন; এই আন্দোলনের নাম : নিউক্লীয় যুদ্ধ নিবারণের জন্য আন্তর্জাতিক চিকিৎসকবৃন্দ'। 1982 খৃস্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের কেমব্রিজ শহরে 31টি দেশের 250 জন প্রতিনিধি নিয়ে যে সম্মেলন হয়, তাতে নিউক্লীয় অস্ত্রের বিরুদ্ধে বহু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। বিভিন্ন দেশের চিকিৎসকদের মধ্যে এই আন্দোলন ক্রমেই পরিব্যাপ্ত হচ্ছে।

তবে কেবল বিজ্ঞানী বা চিকিৎসকই নন, সমাজ-সচেতন সব মানুষই ক্রমে ক্রমে সামিল হচ্ছেন নিউক্লীয় অস্ত্রবিরোধী আন্দোলনে। এই আন্দোলনের অংশ হিসেবে গত কয়েক বছরে বিশ্বের বহু দেশে বড় বড় জমায়েত হয়েছে, হয়েছে বিশাল বিশাল মিছিল। আমাদের দেশেও এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ছে। 1982 খৃস্টাব্দ থেকে প্রত্যেক বছর বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের নেতৃত্ব 6ই অগাস্ট তারিখটিকে যুদ্ধবিরোধী দিবস রূপে পালন করা হচ্ছে মিছিল এবং সভা-সমাবেশের মধ্যে দিয়ে। এ বছরও দিনটিকে যথাযোগ্য ভাবে পালন করবার ব্যবস্থা হয়েছে। এই কর্মসূচীকে সফল করে তোলার জন্য সকলের অংশগ্রহণ শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা বিশেষ ভাবে কাম্য। মনে রাখতে হবে, বিশ্বের জনগণ যদি নিউক্লীয় অস্ত্রের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠেন, বিভিন্ন দেশের সরকারের উপর যদি জনমতের যথেষ্ট চাপ থাকে, তবেই কেবল নিউক্লীয় যুদ্ধের ভয়াবহ সম্ভাবনাকে প্রতিরোধ করা সম্ভব।

(6ই অগাস্ট '85 'হিরোশিমা দিবস' উপলক্ষে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক প্রচারিত আবেদন)

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-700 006 থেকে প্রকাশিত
এবং গুপ্তপ্রেস, 37/7, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-700 009 হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

লেখকদের প্রতি নিবেদন

1. বিজ্ঞান পরিষদের আদর্শ অনুযায়ী জনসাধারণকে আকৃষ্ট করার মত সমাজের কল্যাণমূলক বিষয়বস্তু সহজবোধ্য ভাষায় সুলিখিত হওয়া প্রয়োজন।
2. মূল প্রতিপাদ্য বিষয় এবং পূর্ণ ঠিকানাসহ লেখকের পরিচিতি পৃথক কাগজে অবশ্যই লিখে দিতে হবে।
3. চলিত ভাষা এবং চলন্তিকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট বানান ও পরিভাষা ব্যবহৃত হবে। উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে আন্তর্জাতিক শব্দটি বাংলা হরফে লিখে ব্র্যাকেটে ইংরাজী শব্দটিও দিতে হবে। আন্তর্জাতিক সংখ্যা এবং মেট্রিক পদ্ধতি ব্যবহৃত হবে।
4. মোটামুটি 2000 শব্দের মধ্যে রচনা সীমাবদ্ধ থাকা বাঞ্ছনীয়।
5. বিভিন্ন ফীচার, সমকালীন বিজ্ঞান গবেষণা ও প্রযুক্তিবিদ্যার সংবাদ এবং বিজ্ঞান বিষয়ক সুন্দর আকর্ষণীয় ফটোগ্রাফীও গ্রহণীয়।
6. রচনার সঙ্গে চিত্র থাকলে আর্ট পেপারে চাইনিজ কালিতে সুঅঙ্কিত হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন।
7. প্রত্যেক চিত্র প্রস্থে 8 সে. মি. কিংবা এর গুনিতকের (16 সে. মি. 24 সে. মি.) মাপে অঙ্কিত হওয়া প্রয়োজন।
8. অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রবন্ধের মৌলিকত্ব বজায় রেখে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জনে সম্পাদক মন্ডলীর অধিকার থাকবে।
9. প্রত্যেক প্রবন্ধ ফীচার-এর শেষে গ্রন্থপঞ্জী থাকা বাঞ্ছনীয়।
10. জ্ঞান ও বিজ্ঞানে পুস্তক সমালোচনার জন্য দুই কপি পুস্তক পাঠাতে হবে।
11. ফুলস্ক্যাপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় যথেষ্ট মার্জিন এবং প্রতি লাইনের পর বেশ কিছুটা ফাঁক রেখে পরিস্কার হস্তাক্ষরে প্রবন্ধ লিখতে হবে।
12. প্রতি প্রবন্ধের শুরুতে পৃথকভাবে প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসার দেওয়া আবশ্যিক।

সম্পাদনা সচিব

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

অক্টোবর, 1985
অষ্টাত্রিংশত্তম বর্ষ, দশম সংখ্যা

বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের অনুশীলন করে বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ ও সমাজকে বিজ্ঞান-সচেতন করা এবং সমাজের কল্যাণকল্পে বিজ্ঞানের প্রয়োগ করা পরিষদের উদ্দেশ্য।

বিষয় সূচী

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

পৃষ্ঠপোষক মণ্ডলী

অমলকুমার বসু, চিররঞ্জন ঘোষাল, প্রশান্ত শূর, বাণীপতি সান্যাল, ভাস্কর রায়চৌধরী, মণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী, শ্যামসুন্দর গুপ্ত, সন্তোষ ভট্টাচার্য, সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়

উপদেষ্টা মণ্ডলী

অচিন্ত্যকুমার মুখোপাধ্যায়, অনাদিনাথ দাঁ, অসীম চট্টোপাধ্যায়, নির্মলকান্তি চট্টোপাধ্যায়, পূর্ণেন্দুকুমার বসু, বিমলেন্দু মিত্র, বীরেন রায়; বিশ্বরঞ্জন নাগ, রমেন্দ্রকুমার পোদ্দার, শ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায়।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা : 30·00

মূল্য : 2·50

যোগাযোগের ঠিকানা :

কর্মসচিব

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট,

কলিকাতা-700006

ফোন : 55-0660

কার্যকরী সমিতি (1983—85)

সভাপতি : জয়ন্ত বসু

সহ-সভাপতি : কালিদাস সমাজদার, গুণধর বর্মন, তপেশ্বর বসু, নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রতনমোহন খাঁ।

কর্মসচিব : সুকুমার গুপ্ত

সহযোগী কর্মসচিব : উৎপলকুমার আইচ, তপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সনৎকুমার রায়।

কোষাধ্যক্ষ : শিবচন্দ্র ঘোষ

সদস্য : অনিলকৃষ্ণ রায়, অনিলবরণ দাস, অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়, অরুণকুমার চৌধুরী, অশোকনাথ মুখোপাধ্যায়, চাণক্য সেন, তপন সাহা, দয়ানন্দ সেন, বলরাম দে, বিজয়কুমার বল, ভোলানাথ দত্ত, রবীন্দ্রনাথ মিত্র, শশধর বিশ্বাস, সত্যসুন্দর বর্মন, সত্যরঞ্জন পাণ্ডা, হরিপদ বর্মন।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

অষ্টাত্রিংশত্তম বর্ষ | অক্টোবর, 1985 | দশম সংখ্যা

বিশ্ব খাদ্য দিবস, ক্ষুধা এবং মারণাস্ত্র

কালিদাস সমাজদার

পৃথিবীর এক বিরাট অংশে বুভুক্ষা মানুষের নিত্যসঙ্গী। পৃথিবীর প্রতি তিনজন মানুষের মধ্যে একজন অভুক্ত মানুষ। ভিটামিন ও প্রোটিনের অভাব নিয়ে অতি নিকৃষ্ট ধরণের খাবার খেয়ে থাকে আরও এক-তৃতীয়াংশ। ক্ষুধার এই আগ্রাসী বিস্তার কি কোনদিন রোধ করা যাবে না? কোনদিন কি এর সমাধান হবে না? সভ্যতার ইতিবৃত্তে ক্ষুধা কি অনিবার্য?

ক্ষুধা মেটাবার সমস্ত প্রচেষ্টা শুধু সেমিনার সভার আলোচনাসূচীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেন থেমে থেকেছে। 1945 খৃস্টাব্দে থেকে রাষ্ট্রসংঘের খাদ্য ও কৃষিসংস্থা পৃথিবীর সর্বত্র মানুষের ক্ষুধা ও অপুষ্টির বিরুদ্ধে বারে বারে অভিযান ঘোষণা করেছে। 1981 খৃস্টাব্দে 16ই অক্টোবর ঘোষিত হয়েছিল বিশ্ব খাদ্য দিবস হিসাবে। সে ছিল প্রথম বিশ্ব খাদ্য দিবস। খাদ্য অপচয় রোধ, খামার বনসৃজন, সামাজিক বনসৃজন প্রভৃতি ক্ষেত্র বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়েছিল। এই ক্ষেত্রগুলোতে আর্থ প্রযুক্তিগত প্রচেষ্টা নিয়োজিত হবার প্রকল্প ছিল।

1985 খৃস্টাব্দের 16ই অক্টোবর ফিরে এল 5ম খাদ্য দিবস হিসাবে। অথচ এই সম্পাদকীয় নিবন্ধটি পড়তে যে সময় লাগবে, তার মধ্যে 150 জন মানুষ অনাহারে মৃত্যুর কোলে চলে পড়বে। নিছক এই অনাহারে মৃত্যুর জন্য দায়ী কারা? দ্বিধা না করে বলা যায় আমরা সবাই দায়ী। প্রত্যক্ষভাবে এবং পরোক্ষভাবে। বিজ্ঞানীরা কতটা দায়ী এজন্য? এ প্রশ্নে বিজ্ঞানীরা সরাসরি দুই অংশে ভাগ হয়ে পড়েন। যে বিজ্ঞানীরা যুদ্ধের অস্ত্র, নূতন নূতন মারণাস্ত্র মহাকাশযুদ্ধের সরঞ্জাম, রাসায়নিক যুদ্ধ প্রভৃতির গবেষণায় লিপ্ত আছেন—তাঁরা হলেন একদল। তাঁরা অশুভ গবেষণায় ব্যস্ত। অপরদলে আছেন সেই বিজ্ঞানীরা যাঁরা কৃষিগবেষণায় ওঠা সমস্যার, খাদ্যপুষ্টির নতন নূতন খাদ্যের ক্ষেত্র বিস্তারের এবং অন্যান্য নানা জাতীয় কৃষি সমস্যার সমাধানে লিপ্ত আছেন। এঁরা বস্তুত শুভ গবেষণায় ব্যস্ত। মনে করা যাক এই সমস্যাটি—অজৈব সার দিয়ে পুষ্টি সাধনকে কাম্য অবস্থায় আনা। এ হল আজকের অন্যতম কৃষিরসায়নগত সমস্যা। এর ওপর শুভ কাজ করছেন একদল বিজ্ঞানী। সভ্যতার প্রয়োজনে অসংখ্য বিজ্ঞানী উদ্ভিদ, পুষ্টি, সমুদ্র, প্রাণী, প্রাণ, রোগ, ঔষধ প্রভৃতির ওপর গবেষণা করছেন। তাঁরা প্রকারান্তরে ক্ষুধার বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত।

অন্যদিকে বিজ্ঞানীদের অর্থহীন বিষয়ের ওপর গবেষণা বিলাস, মারণাস্ত্রের নূতন উদ্ভাবন এবং ধ্বংসের প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ বিস্তারের কাজ মানুষের অনাহারে মৃত্যুর জন্য দায়ী। অস্ত্রের সাথে মৃত্যুর এক স্বাভাবিক সম্পর্ক রয়েছেই। কিন্তু অস্ত্রের সাথে খাদ্যের কি সম্পর্ক? প্রশ্নটি অর্থনীতির কৌনিক দৃষ্টি দিয়ে দেখলে পরিষ্কার হয়ে যায়। এক্ষেত্রে কয়েকটি উদাহরণই যথেষ্ট।

(1) শুধু ভিয়েতনাম যুদ্ধেই আমেরিকা খরচ করেছিল 67600 কোটি ডলার। এই পরিমাণ টাকা ক্ষুধার বিরুদ্ধে লাগালে কি হত?

(2) 1990 খৃস্টাব্দ নাগাদ আমেরিকার সামরিক ব্যয়ভার দাঁড়াবে 75070 কোটি ডলার।

(3) 1985-86 খৃস্টাব্দের বাজেটে সামরিক ব্যয়ভার ভারত সরকার দেখিয়েছে মোট 7686 কোটি টাকা।

(4) আমেরিকা 'মহাকাশযুদ্ধ' প্রকল্পে প্রাথমিক ব্যয় করছে 2600 কোটি ডলার। পৃথিবীর জনগোষ্ঠির প্রধান অংশ যখন ক্ষুধায় কাতর, তখন তাদেরই দাবিয়ে রাখতে কত না অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে।)

পরিহাসের খবর হল এই যে এ বছর 16ই অক্টোবর বিশ্ব খাদ্য দিবসের পটভূমিকায় শুধুমাত্র মহাকাশযুদ্ধের পরিকাঠামো গড়ে তুলতে আমেরিকা যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করবে, তার সিদ্ধান্ত অক্টোবর মাসেই নিয়েছে। অক্টোবর মাসেরই অন্য খবর হল এই যে পাকিস্তান সাহায্য ও ক্রয়বাবদ অস্ত্রসংগ্রহ করবে কমবেশী 380 কোটি ডলারের।

একদিকে এই বিপুল পরিমাণ ক্ষমতার খরচ, অন্যদিকে ভারত উপমহাদেশে মানুষের মাথাপিছু দৈনিক খাদ্যের যোগান মাত্র 10 আউন্সেরও কম। মারাত্মক রকমের কম। আসলে শতকরা 50 ভাগ মানুষ এখনও 'রুটির রেখার' নিচে রয়েছে। অর্থাৎ এক কথায় অনাহারে রয়েছে। ঠিক এখানেই সমস্যাটি রাজনীতি স্পর্শ করছে। এই কারণেই রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের সিদ্ধান্তসমূহ আসলে আদত খুনী হিসাবে চিহ্নিত হয়। ক্ষুধার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবার পূর্বেই মানুষ ইচ্ছাকৃত পরাজয় স্বীকার করে নেয়।

অথচ ইতিহাস জানে একমাত্র বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদরাই পারেন ক্ষুধার বিরুদ্ধে মানুষের অভিযানের কাঠামো তৈরি করে দিতে। বিজ্ঞানীরা জানেন যে প্রচুর পরিমাণে উন্নত খাবার ও যত্ন মানুষের জীবনের সৃজনশীলতা ও উৎপাদনশীলতার উৎকর্ষ এনে দেয়। সভ্যতার অগ্রগতির এ হল এক প্রাথমিক শর্ত।

এখন যথেষ্ট দেরী হয়ে গেছে। পৃথিবী নামক গ্রহে 2000 খৃস্টাব্দের মধ্যে ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা কয়েক বিলিয়ন ছাড়িয়ে বহদূর চলে যাবে। অতএব প্রতিটি সম্ভাব্য পথের অনুসন্ধান করতে হবে। প্রতিটি বিকল্পের পাথর উলটিয়ে দেখতে হবে। ক্ষুধার বিরুদ্ধে অভিযান করতে হলে সঞ্চিত জ্ঞান ভাণ্ডার ও প্রযুক্তিবিদ্যা নিয়ে মানুষকে যেতে হবে

(1) উদ্ভিদের কাছে,

(2) খাদ্যোৎপাদনের জন্য আরও বেশী বেশী জায়গায়, যেমন, মরুভূমি এবং ধ্বংস-না-করে বনাঞ্চলে, মেরুপ্রদেশে ;

(3) বিকল্প ও পরিপূরক খাদ্যের কাছে,

(4) সমুদ্রে। সমুদ্রজলে রয়েছে নানা রকমের খাদ্য ও খাদ্যের উপকরণ। সমুদ্র থেকে মানুষ প্রতি বৎসর 50 মিলিয়ন টনেরও বেশী প্রোটিনযুক্ত খাদ্য আহরণ করে। পৃথিবীর স্থলভাগে যে খাদ্য উৎপন্ন হয়, তার তিনগুণ খাদ্য সমুদ্র মানুষকে দিতে পারে।

সমস্ত পৃথিবীতে প্রতিদিন 4300 বিলিয়ন গ্যালন বৃষ্টিপাত হয়। একে সেচকাজের জন্য ব্যবহার করলে অত্যাশ্চর্য ফল পাওয়া যাবে। শুধুমাত্র গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের অববাহিকায় যে জল অপচয়িত হচ্ছে, সে জল ও ভূমির যথাযথ ব্যবহার করলে এই অঞ্চলে খাদ্যের উৎপাদন তিনগুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব।

পৃথিবীর সব জায়গার মত ভারতেও খাদ্য ও স্বাস্থ্য ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। খাদ্যের গভীর অভাবের মধ্যে 2000 খৃস্টাব্দের অন্তেই সকলের জন্য স্বাস্থ্য কি ভাবে সম্ভব এই ভারতে? শুধু একবাটি ভাত ও বিশুদ্ধ পানীয় জল দিতে পারলেই সাধারণ রোগের শতকরা 75 ভাগ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। গড় আয়ুর বৃদ্ধি হয়। কিন্তু বিরাট প্রতিবন্ধক হল (1) উৎপাদন (2) বন্টন ব্যবস্থা যে বন্টন ব্যবস্থার রন্ধ্রে রন্ধ্রে রয়েছে লোভ।

খাদ্য উৎপাদনক্ষেত্রের সমস্যার সমাধান ভারতে কি ভাবে হবে? বিভিন্ন দেশের ইতিহাসে এর সমাধান আছে। খাদ্য সমস্যা ও ভূমি ব্যবস্থা জড়াজড়ি করে থাকে। ভূমি ব্যবস্থার ওপরই নির্ভর করে কৃষি ও কর্ষকের উৎপাদনশীলতা। সামন্ততান্ত্রিক ও আধা সামন্ততান্ত্রিক ভূমিব্যবস্থা উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যুগের চাহিদা অনুযায়ী পদক্ষেপ নিতে পারে না। সামন্ততান্ত্রিক অবশেষগুলো সমূলে উৎখাত করলেই উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতার রুদ্ধ মুখ খুলে যাবে। তখনই ভারত থেকে ক্ষুধাকে চির নির্বাসন দেওয়া যাবে।

বিজ্ঞান প্রবন্ধ

ই-ডি-টি-এ'র ব্যবহার ঃ নতুন ভাবনা-চিন্তা

তারাশঙ্কর পাল,* কৃষ্ণা চৌধুরী ও অঞ্জলি পাল*

পদার্থের মধ্যে কি এবং কতটা বস্তু আছে তা বোঝার জন্যে দরকার পদার্থের রাসায়নিক বিশ্লেষণ। পদার্থের মধ্যে কি আছে জানলে তবেই কোন পদার্থ কতটা পরিমাণে আছে তা বের করা সম্ভব। আধুনিককালে হাজারো রকমের পদার্থের পরিমাণ নির্ণয়ের ব্যবস্থা করা গেছে, তবুও আমরা আদ্যিকালের 'টাইট্রেশন' পদ্ধতিকে এখনও আঁকড়ে ধরি। কারণ ব্যুরেট, পিপেট আর যথাযোগ্য নির্দেশক হলেই কাজ সারা যায় সহজে। প্রায়শঃই টাইট্রেশন চট্ করে শেষ করা যায়। তাই টাইট্রেশন পদ্ধতির প্রয়োজন এখনও ফুরিয়ে যায় নি, হয়তো চলবে বহুদিন ধরেই। বিভিন্ন ধরণের টাইট্রেশন পদ্ধতির মধ্যে একটি বিশেষ কার্যকরী পদ্ধতি হল কম্‌প্লেক্‌সোমেট্রিক (Complexometric) টাইট্রেশন। এই পদ্ধতিতে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই EDTA (Ethylene-diamine tetra-acetic acid) ব্যবহার করা হয়। তাই কম্‌প্লেক্‌সোমেট্রিক টাইট্রেশন না বলে ব্যাপারটাকে EDTA টাইট্রেশন ও বলা যেতে পারে। EDTA জলে দ্রবীভূত হয় না বলে EDTA-র ডাই অথবা টেট্রা সোডিয়াম লবণ ব্যবহার করা যেতে পারে, যেটা সহজেই জলে দ্রবীভূত হয়। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সাধারণতঃ ডাই সোডিয়াম লবণই ব্যবহার করা হয়।

এই পদ্ধতিতে সাধারণ ভাবে জলে দ্রবীভূত অবস্থায় ধাতব পদার্থ নির্ণয় করা হয়ে থাকে আর ব্যাপক ব্যবহার করা হয় জলের সঠিক খরতা নির্ণয়ের জন্যে। যাই হোক, ধাতব পদার্থের পরিমাণ নির্ণয় করার জন্য EDTA-র ব্যবহার বহুল প্রচলিত।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে কেন কম্‌প্লেক্‌সোমেট্রিক টাইট্রেশনে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে EDTA ব্যবহার করা হয়?

উত্তর হিসাবে বলা যায় EDTA একটি হেক্সাডেনটেট লিগ্যাণ্ড।

$$\begin{matrix} HO_2C\text{-}H_2C \\ HO_2C\text{-}H_2C \end{matrix} > N\text{—}CH_2\text{—}CH_2\text{—}N < \begin{matrix} CH_2\text{-}CO_2H \\ CH_2\text{-}CO_2H \end{matrix}$$
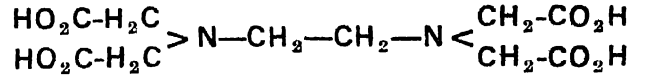
এটা ধাতব আয়নকে ছয়টি বিন্দু দিয়ে বেঁধে রাখতে পারে। অর্থাৎ এটা চিলেট যৌগ বা বলয়াকৃতি জটিল যৌগ তৈরি করে। যার ফলে জটিল যৌগের স্থায়িত্ব (Stability) অনেকটা বৃদ্ধি পায় এবং EDTA ধাতব আয়নের সঙ্গে জলে দ্রবণীয় যৌগ (1 : 1) তৈরি করে। চার যোজী ধাতব আয়ন EDTA-র সঙ্গে তড়িৎনিরপেক্ষ যৌগ তৈরি করে।

অনেক অনেক ক্ষেত্রে EDTA সম্ভাব্য সবকটি বিন্দু (donor points) ব্যবহার নাও করতে পারে। এক বা একাধিক বিন্দু সাময়িক ভাবে কাজে না লাগতে পারে। যদি 'ছ'টি বিন্দুই ব্যবহার হয় তবে (6-1) মোট 5টি বলয় তৈরি হবে।

প্রত্যেক প্রশমন ক্রিয়াই যথাযোগ্য নির্দেশকের উপস্থিতিতে করা হয়। EDTA টাইট্রেশনে এরিওক্রোম ব্ল্যাক-টি (Eriochrome Black-T) নির্দেশকের সহায়তায় ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং জিংক আয়নকে প্রশম করা যায়। ক্যালসিয়াম আয়নকে মিউরেক্সাইড (Mureoxide) নির্দেশকে ব্যবহার করেও EDTA-র সাহায্যে ওই আয়নের পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব। 'এরিওক্রোম ব্ল্যাক-টি 'মিউরেক্সাইড ইত্যাদি নির্দেশককে ধাতব আয়ন নির্দেশক (metal ion indicator) বলা হয়। প্রশমন ক্রিয়ায় নির্দেশক, ধাতব আয়নের সঙ্গে M-In রঙিন যৌগ তৈরি করে। অবশ্যই প্রশমন ক্রিয়াতে নির্দেশক খুব কম ব্যবহার করা হয়। ফলে প্রথমে কিছু M-In যৌগ এবং মুক্ত ধাতব আয়ন দ্রবণে বর্তমান থাকে। EDTA-র দ্বারা প্রশমিত করলে মুক্ত ধাতব আয়ন প্রথমে EDTA-র সঙ্গে জটিল যৌগ তৈরি করে, পরে M-In, EDTA-র সঙ্গে বিক্রিয়া করে M-EDTA

* রসায়ন বিভাগ, আই. আই. টি, খড়্গপুর-721302

যৌগে পরিণত হয়। সুতরাং M-EDTA যৌগের স্থায়িত্ব M-In যৌগের স্থায়িত্ব অপেক্ষা বেশী ($\geq 10^4$) হতেই হবে। নচেৎ প্রশমন ক্রিয়া চালানো যাবে না। বিক্রিয়া শেষে দ্রবণে নির্দেশকটি বিমুক্ত হয়। অর্থাৎ পুরো M-In, M-EDTA যৌগে পরিণত হয়। দ্রবণের রঙ মুক্ত নির্দেশকের রঙ পায়, যা কিনা M-In জটিল যৌগের রঙের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

$[Ca\ (EDTA)]^{2-}$, $[Mg\ (EDTA)]^{2-}$ যৌগগুলি বর্ণহীন, কিন্তু এরিওক্রোম ব্ল্যাকটির সাথে Ca^{+2}, Mg^{+2}, Zn^{+2} হাল্কা গোলাপী বর্ণের জন্যে দ্রবণীয় যৌগ তৈরি করে। প্রশমন বিক্রিয়ার দ্রুত বর্ণপরিবর্তনের জন্য (Wine red to Blue) EDTA দ্বারা প্রশম করলে বিন্দু নির্ণয় করতে ভীষণ সুবিধা হয়। এ ব্যাপারে মিউরেক্সাইড নির্দেশক এরিওক্রোম ব্ল্যাকটির মতো অতটা কার্যকরী নয়। ধাতব আয়ন নির্দেশকগুলি ধাতব আয়নের উপস্থিতিতে বর্ণ পরিবর্তন করে আবার সংগে সংগে দ্রবণ থেকে H^+ আয়নও গ্রহণ করে বর্ণপরিবর্তন করতে পারে। সুতরাং এই নির্দেশক শুধুমাত্র যে ধাতব আয়ন নির্দেশক তা নয় এটা pH নির্দেশকও বটে।

EDTA, Ca^{+2}, Mg^{+2}, Zn^{+2} আয়নের সাথে pH 10 এর কাছে স্থায়ী যেটা তৈরি করে। যদি দ্রবণের pH 8·5 এর কম হয়, M-EDTAর স্থায়িত্ব কমে যায় এবং প্রশম বিন্দু নির্ণয়ে প্রচণ্ড অসুবিধা হয়। আবার pH 10 এর সামান্য বেশী হলেও যেমন 10·71 এর উপরে হলে ঠিকমত প্রশম বিন্দু নির্ণয় করা যায় না বা প্রশম বিন্দু নির্ণয়ে প্রচণ্ড অসুবিধা হয়। দ্রবণের pH যাতে 10 হয় সেইজন্য pH.10 বাফার (Buffer) দ্রবণ NH_4Cl ও NH_4OH দ্বারা তৈরি করে দ্রবণে মেশানো হয়। তারপর EDTA-র সহায়তায় প্রশমন ক্রিয়াটি, নির্দেশকের উপস্থিতিতে করা যায়। EDTA টাইট্রেশনে উপরিউক্ত আয়নগুলিকে প্রশম করতে গেলে দ্রবণে যদি Fe^{+3}, Al^{+3}, Cr^{+3} আয়নগুলি থাকে তাহলে তা NH_4Cl NH_3 দিয়ে ধাতব হাইড্রক্সাইড রূপে, $Fe(OH)_3$ ও $Al(OH)_3$ ইত্যাদি অবিক্ষিপ্ত করে বাদ দিতে হবে। পরে পরিস্রুত দ্রবণে Ca^{+2}, Mg^{+2}, $Z_n{}^{+2}$ ইত্যাদির নির্ণয় সম্ভব। দেখা গেছে NH_4Cl মিশ্রিত পরিস্রুত দ্রবণে Ca^{+2}, Mg^{+2}, $Z_n{}^{+2}$ আয়নগুলি উপস্থিত থাকলে বাফার দ্রবণ যোগ করেও প্রশম বিন্দু পাওয়া যায় না, অর্থাৎ বেশী NH_4Cl এর উপস্থিতিতে উক্ত আয়নগুলির পরিমাণ নির্ণয়ে ভীষণ অসুবিধা হয়।

অনেকের ধারণা অতিরিক্ত NH_4Cl এর উপস্থিতি প্রশম বিন্দু নির্ণয়ে অসুবিধা সৃষ্টি করে। আবার অনেকে বলেন পর্যাপ্ত তড়িৎবিশ্লেষ্যের উপস্থিতিতে M-EDTA জটিল যৌগের স্থায়িত্ব কমে যায়। আমরা দেখেছি, প্রচুর পরিমাণে সাধারণ লবণ (NaCl) বা পটাশিয়াম ক্লোরাইট (KCl) ইত্যাদি প্রশমন ক্রিয়াকে মোটেই প্রভাবিত করে না।

আসল কারণটি হল দ্রবণের ক্ষারত্ব বা অম্লত্ব (pH)। আগেই বলা হয়েছে এইসব প্রশমন ক্রিয়া এবং নির্দেশকের বর্ণ পরিবর্তন ভীষণভাবে দ্রবণের ক্ষারত্ব বা অম্লত্বের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ pH কম হলে টাইট্রেশন ভালভাবে করা যাবে না আবার বেশী হলেও অসুবিধা হবে।

দ্রবণে যদি অতিরিক্ত পরিমাণে NH_4Cl থাকে তাহলে pH-10 বাফার দ্রবণ যোগ করে pH-10 ক্ষারত্ব ঠিক করা যাবে না। তাই দ্রবণে বেশী NH_4Cl থাকলে প্রশম ক্রিয়ায় অসুবিধা হবে। অবশ্য NaOH মিশ্রিত করে দ্রবণ ফুটিয়ে নিয়ে অতিরিক্ত NH_4Cl এর NH_3 দূর করা যেতে পারে। তারপর HCl মিশ্রিত করে দ্রবণটি প্রশমিত করে নিয়ম মতো EDTA টাইট্রেশন করা হয়, তখন pH-10 বাফার ভালভাবে কাজ করে।

অথবা পরিমিত অ্যামোনিয়া মিশ্রিত করে দ্রবণের pH-10 করে নিয়েও EDTA টাইট্রেশন করা হয়। মনে রাখা যেতে পারে 142 মিলি NH_3 (ঘন) দ্রবণ এবং 17·5 gm NH_4Cl মিশিয়ে দ্রবণের আয়তন 250 মিলি করলে দ্রবণের ক্ষারত্ব হয় pH-10। সেই দ্রবণ যোগ করলে Ca^{+2}, Mg^{+2}, $Z_n{}^{+2}$ দ্রবণ প্রশমন ক্রিয়ার উপযোগী হয়।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে 50 মিলি দ্রবণে যদি 1 গ্রাম পরিমাণে অতিরিক্ত NH_4Cl থাকে তাহলে EDTA টাইট্রেশনে pH-10 বাফার ভালভাবেই কাজ করে অতএব কোন অসুবিধা হয় না। কিন্তু তার বেশী NH_4Cl প্রশমন ক্রিয়াতে অসুবিধা সৃষ্টি করে।

অন্যান্য ধাতব আয়ন যেমন Fe, Al, Ni, Co, Cu, Mn, Hg, ধাতুর দ্রবণে ধাতব আয়নের পরিমাণ নির্ণয়ে EDTA ব্যবহার করা যায়। কিন্তু এই সমস্ত ধাতুর ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক নির্দেশক এবং পৃথক পৃথক ক্ষারত্ব বা অম্লত্ব ব্যবহার করতে হবে। সবক্ষেত্রে যদি যথাযোগ্য সংবেদনশীল নির্দেশক পাওয়া যেত তবে টাইট্রেশন জগতে EDTA-র ব্যবহার একটি বিশেষ মূল্যবান স্থান পেত। আরো গবেষণা আরো চেষ্টা নিশ্চয়ই EDTA-কে রসায়ন জগতে বাঁচিয়ে রাখবে বহু দিন।

জীবনের অভিব্যক্তি

সুখেন্দুবিকাশ করমহাপাত্র*

জীবনের বিচিত্র বিকাশ

কোন আদিম যুগ থেকে পৃথিবীতে জীবনের বিকাশ ঘটেছে। গাছপালা প্রাণীজগৎ হাজার হাজার প্রজাতি নিয়ে গড়ে তুলেছে আজকের পৃথিবী। প্রাচীন কৃষ্টিতে কোন কোন প্রাণী আদিবাসীদের কাছে প্রায় ঈশ্বররূপে পূজা পেয়েছে। এখনও সেই টোটেমবাদের চিহ্ন লক্ষ্য করা যাবে ঈজিপ্টের দেবমূর্তির চেহারায় যাদের মুণ্ড বন্যপ্রাণীর মত, অথবা হিন্দুদের গরু ও বানরের দেবত্বের স্বীকৃতিতে। পৌরাণিক যুগে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর পার্থক্য সৃষ্টি করেছে নতুন ধারণার। বাইবেলের মতে ঈশ্বর তাঁর নিজের আদলে সৃষ্টি করেছেন মানুষ। প্রথম মানুষ আদম সৃষ্টি করে তাকে কাজ দেওয়া হয়েছিল স্বর্গোদ্যানের পশুপাখী চিহ্নিত করার। হিন্দু শাস্ত্রের ধারণা রয়েছে একটি কবিতার পঙক্তিতে "আশী লক্ষ যোনি করিয়ে ভ্রমণ, তবে তো পেয়েছিস মানব জনম।"

প্রলয়ের দিনে নোয়ার নৌকার স্বল্প পরিসরে প্রত্যেক প্রজাতির দুটি করে প্রাণী নিয়ে নতুন সৃষ্টি হয়েছিল— তাহলে সেদিন প্রাণীর সংখ্যা কত ছিল তা অনুমান করা যায়। এতথ্য পৌরাণিক যুগের। পরবর্তীকালে অ্যারিস্টটল 5 শতাধিক প্রাণীর তালিকা করেন আর তাঁর শিষ্য থিওফ্রাসটাস করেন প্রায় 500 রকমের গাছ গাছড়ার। এরকম তালিকার ভিত্তি ছিল সব হাতীকেই হাতী অথবা সব উটকে উট বলে চিহ্নিত করা। কিন্তু এদেরও তো শ্রেণী আছে। সেই শ্রেণীভেদ এই জন্যই জরুরী যে, ভারতের হাতী ও আফ্রিকার হাতীর মিলনে প্রজনন হয় না, এক কুঁজওয়ালা আরবীয় উটের সঙ্গে দু-কুঁজওয়ালা ব্যাকট্রিয়ান উটেরও নয়। তাহলে তাদের প্রজাতিগুলি আলাদা চিহ্নিত করতে হয়। সাধারণ মাছির তো এরকম 500 প্রজাতি আছে।

শতাব্দীর পর শতাব্দী প্রকৃতি-বিজ্ঞানীরা জলে স্থলে অন্তরীক্ষে এই নতুন ভিত্তিতে প্রজাতির সংখ্যা খুঁজে চললেন। পৃথিবীর অনেক অজানা দেশ ও তার প্রাণীজগৎও এই তালিকা বাড়িয়ে দিল। ফলে 1800 খৃস্টাব্দে প্রাণীদের স্ফীত তালিকা 70000 সংখ্যা পৌঁছল। এখন তো এই সংখ্যা সাড়ে বার লক্ষতে দাঁড়িয়েছে। প্রাণীবিদ্‌রা বলেন তালিকাটি এখনও সম্পূর্ণ নয়।

তালিকা প্রণয়নের ধারা নিয়ে বহু নতুন ধারণার জন্ম হয়েছে, তবে উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের শ্রেণীবিন্যাস-বিজ্ঞান বা ট্যাক্সনমির (Taxonomy) ভিত্তি প্রথম রচনা করেন সুইডিশ বিজ্ঞানী লিনিয়াস। 1737 খৃস্টাব্দে তাঁর প্রকাশিত Systema Naturae বইতে তিনি যে প্রজাতি, ক্রম ও শ্রেণীভেদের তালিকা প্রণয়ন করেন তা বহু ত্রুটিযুক্ত হলেও জীবের শ্রেণীবিন্যাসে গণ (genus) ও প্রজাতির (species) উল্লেখ এবং ঐ দুইকে একত্রে যুক্ত করে তা দ্বিপদ (binomial) নামকরণ প্রথা সমগ্রিক বিজ্ঞান চিন্তায় এক অনবদ্য অবদান। এই বিষয়ে পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সম্মেলনে লিনিয়াসের এই অবদানকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে তাঁর দেওয়া নামগুলিকে যথাসম্ভব রাখা হয়েছে, তবে নতুনভাবে বহু সংযোজন ও সংশোধন করা হয়েছে এবং এখনও চলেছে।

গোষ্ঠী প্রজাতি ক্রম ও শ্রেণীভেদে জীবনের এই বিচিত্র বিকাশের মধ্যে মানুষ অনন্য হলেও তার নিকটতম জ্ঞাতি বানর আর বনমানুষ। গিবন, শিম্পাঞ্জী, বেবুন, গরিলা একই বনমানুষ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত আর বানরের রয়েছে তিনটি প্রজাতি—পৃথিবীর সর্বত্র বনেজঙ্গলে তাদের খুঁজে পাওয়া যাবে। জ্ঞাতি হলেও এদের সঙ্গে মানুষের মিলনে প্রজনন ঘটতে পারে না তাই বর্তমান মানুষ এক অনন্য প্রজাতি—লিনিয়াস, এর নামকরণ করেছেন Homo (man) Sapiens (the wise)—বুদ্ধিমান মানুষ।

জীবনের অভিব্যক্তি

জীবনের বর্তমান বিকাশ থেকে স্বভাবতই মনে হবে প্রকৃতি যুগ যুগ ধরে জটিল অণু থেকে বর্তমান জীবজগৎ সৃষ্টি করেছে। পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে জীবনের আবির্ভাব কখনও কীভাবে হল তা নিয়ে অনেক মতামত আছে ও সে অন্য প্রসঙ্গ। কিন্তু এই রঙ্গমঞ্চে সেই প্রথম জীবনের আবির্ভাবের পর আধুনিক মানুষের মত নায়কের আবির্ভাব কী পদ্ধতিতে হল তা নিয়ে একদা বিজ্ঞানে প্রবল আন্দোলনের ঝড় উঠেছিল। উনিশ শতকের গোড়ায়

* সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-700 009

বিখ্যাত ফরাসী প্রাণীতত্ত্ববিদ লামার্ক-ই জীববিজ্ঞানে অভিব্যক্তিবাদের প্রথম প্রবক্তা এবং বিজ্ঞানের ভাষায় 'বায়োলজি' (Biology) কথাটিও তাঁর অবদান। তাঁর আগে পৃথিবীর তাবৎ ধর্মীয় দর্শনে এবং পূর্বোক্ত লিনিয়াস-এর মত প্রখ্যাত জীববিজ্ঞানীদের মতেও জীব জগতের বিভিন্ন প্রজাতিগুলি সেই আদিকাল থেকেই স্থির নির্দিষ্ট একই রকম (fixed species) আছে, আর তাদের প্রত্যেকেরই পৃথক পৃথক উৎপত্তি (separte origin) হয়েছে—এই ধারণা ছিল। সেই অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে লামার্কই প্রথম ঘোষণা করেন যে নির্দিষ্ট স্থির প্রজাতি বলে কিছু নেই, প্রত্যেক জীবের মধ্যে পরিবেশের প্রভাবে নানারকম পরিবর্তন অবিরতই চলেছে—তাদের চেহারায়, আচরণে, ভিতরে বাইরে দেহের গঠন ভঙ্গিমায়, গায়ের রং-এ এবং বিভিন্ন কর্ম পদ্ধতিতে। এ বিষয়ে তাঁর বিখ্যাত উদাহরণ—জিরাফের লম্বা গলা ও গায়ের ছোপ ছোপ পাতাবাহারে রং। লম্বা গাছের পাতা ছিঁড়ে খাবার জন্য বংশানুক্রমিক চেষ্টাতেই গলা লম্বা হয়ে গেছে, আর জঙ্গলের আলোছায়ায় অতবড় শরীর নিয়ে পাতার আড়ালে আত্মগোপনের জন্যই গায়ে ছোপ ছোপ বাহারে রং হয়েছে। একেই বলে পরিবেশের সঙ্গে যোজ্যতা বা অভিযোজন। আর এই ক্ষমতা জীবমাত্রেরই অপরিহার্য সহজাত গুণ এবং বাইরের প্রভাবে পরিবর্তিত যে কোন ধর্মই পরবর্তী বংশধরে সরাসরি সঞ্চালিত হয়। তাঁর আর একটি স্পষ্ট মত :—অতিক্ষুদ্র সরলতম দেহ থেকেই বিবর্তনের ধারায় ক্রমে বৃহৎ জটিল জীবদেহের সৃষ্টি। সমগ্র জীবজগৎ তাই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একটি ক্রমোন্নত সিঁড়ির মতই—যার পাদদেশে রয়েছে অমেরুদণ্ডী প্রাণী ও মাছের দল—আর উচ্চতম ধাপেই মানুষ। জীবের শ্রেণীবিন্যাসে তিনি বাইরের পার্থক্য অপেক্ষা তাদের ভিতরের সামঞ্জস্যের সম্পর্ককেই বেশি জোর দিয়েছেন। ফলে লিনিয়াস-কৃত বাইরের পার্থক্য অনুযায়ী স্থির প্রজাতি বিন্যাসের ধারাকে অস্বীকার করে লামার্ক ভিতরের সম্পর্ক অনুযায়ী জীবের নতুন শ্রেণীবিন্যাস করেন—1809 খৃস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত Zoological Philosophy পুস্তকে। লামার্কের মতবাদ তখন বহু বিজ্ঞানীর সমর্থন পেলেও তাঁর স্বদেশের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ব্যারন কুভিয়ের ঐ বিষয়ে আয়োজিত French Academy of Science-এর বিশেষ আলোচনা সভায় লামার্কের তীব্র বিরোধিতা করেন। তাতে লামার্কের মতবাদ দীর্ঘকাল দমিত হয়। কারণ কুভিয়ের তখন ফ্রান্সের সবচেয়ে শক্তিশালী ও সুপ্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানী, জীবাশ্ম বিষয়ে গবেষণা ও জীবের শারীরস্থানের তুলনামূলক (Comparative anatomy) বিজ্ঞানে কুভিয়ের সুপণ্ডিত। আধুনিক প্রত্নজীববিদ্যার (Paleontology) প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে বিজ্ঞানের ইতিহাসে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত। সেইভাবে তিনি জীবের নতুন শ্রেণীবিন্যাসও করেন। প্যারিসের বিজ্ঞানীদের মধ্যে তিনি তখন অগ্রগণ্য। সেই কুভিয়ের পরিবেশের প্রভাবে জীবপ্রজাতির ক্রমিক বিবর্তন মানলেন না। তিনি নির্দিষ্ট স্থির প্রজাতি মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু লামার্কের আসল ভুলটা কুভিয়ের বা অন্য কেউ তখন ধরতেই পারেন নি। বিবর্তনবাদের সিঁড়ি তৈরি করে তাতে বিভিন্ন জীবের অংগসংস্থানের পরিবর্তন, অংগগুলির আকার ও তাদের শারীরবৃত্তীয় ধর্মের রূপান্তরকে তিনি বাইরের পরিবেশের সরাসরি প্রভাব বলেই মনে করেন। যাতে পরিবর্তিত বা পরিবর্তনশীল পরিবেশে প্রয়োজন অনুযায়ী জীবের বিভিন্ন অংগের ব্যবহার ও অব্যবহার ('use and disuse' theory) জনিত কারণে জীবের সামগ্রিক চেহারায় পরিবর্তন ঘটে—জিরাফের গলা লম্বা হয়, হাঁসের পায়ের পাতা জোড়া হয়, মাটির তলায় অন্ধকারবাসী ছুঁচোদের চোখের অবলুপ্তি ঘটে, ইত্যাদি। এতে সবচেয়ে মারাত্মক ভুল, বাইরের প্রভাবে জীবদেহে সাময়িক অর্জিত বৈশিষ্ট্যগুলি (acquired characteristics) তার বংশধরদের মধ্যে সরাসরি সঞ্চারিত হয় বলে লামার্কের মতবাদ, আর ঐ অভিযোজন ক্ষমতা জীবের সহজাত ধর্ম বলেই তাঁর ধারণা। তাছাড়া লামার্ক তাঁর মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট উদাহরণ এবং অনুরূপ পরীক্ষানিরীক্ষার বিশেষ কিছুই করেন নি, শুধু কাল্পনিক তত্ত্ব কথাই বলেছেন। তাঁর মতগুলি পরীক্ষার কোন সুযোগ ছিল না। তাই বিভিন্ন প্রজাতির উৎপত্তিতে (origin of species) দীর্ঘ অনুসন্ধানগত পরীক্ষানিরীক্ষার নির্ভরযোগ্য বহুল প্রমাণ পত্র নিয়ে চার্লস রবার্ট ডারউইন যখন বিজ্ঞানসম্মত অভিব্যক্তিবাদের বলিষ্ঠ ঘোষণা করেন 1859 খৃস্টাব্দে তখন শুধু জীব-বিজ্ঞানে নয় পৃথিবীর সমগ্র মননশীলতায় (দার্শনিক চিন্তাসহ) এক মহান বিস্ফোরণ ঘটে। চার্লস ডারউইন-ই প্রকৃতপক্ষে যথার্থ অভিব্যক্তিবাদের প্রতিষ্ঠাতা।

1831 খৃস্টাব্দে বাইশ বছর বয়সী তরুণ বিজ্ঞানী ডারউইন 'বিগল' নামক অভিযাত্রী জাহাজে প্রাণীতত্ত্ববিদ হিসেবে পাঁচ বছর ধরে সপ্ত সমুদ্রে অনুসন্ধানের সুযোগ পান আর তাঁর এই সমুদ্র অভিযান বিজ্ঞানে উল্লেখযোগ্য ইতিহাস সৃষ্টি করে—কারণ এইখানেই অভিব্যক্তিবাদের মালমসলা সংগৃহীত হয়। দক্ষিণ আমেরিকার পূর্ব থেকে পশ্চিম উপকূলে সমুদ্র যাত্রায় তিনি গাছ ও প্রাণীদের বৈচিত্র্য, আচরণ প্রভৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে অনসন্ধান করেন।

ইকুয়েডর থেকে 650 মাইল পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগরীয় গালাপোগোস দ্বীপপুঞ্জে এসে ডারউইন বুঝি তাঁর মহত্তম আবিষ্কারের মুখোমুখি দাঁড়ালেন। স্থানীয় ভাষায় কচ্ছপ থেকে দ্বীপপুঞ্জটির নাম আর সেখানে রয়েছেও সব বড় বড় কচ্ছপের আস্তানা। তবে কচ্ছপ নয় সেখানকার ছোট ছোট ফিঞ্চ পাখীই হল তাঁর গবেষণার বিষয়। অন্তত চৌদ্দ রকমের ফিঞ্চ তিনি চিহ্নিত করলেন। দক্ষিণ আমেরিকার মূলভূখণ্ডের ঐ পাখীর সংগে তাদের মিল থাকলেও, একই প্রজাতির হলেও বর্তমান দ্বীপপুঞ্জে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাদের চেহারা আচরণ সবই পাল্টে গেছে। খাদ্য সংগ্রহের বিভিন্ন পদ্ধতির একটি না একটির উপর নির্ভর করতে গিয়ে তাদের এই পরিবর্তন। এদের তিনটি শ্রেণী ফল ফুলের বীজ কুড়িয়ে খায়—দক্ষিণ আমেরিকার জ্ঞাতিদের মত। কিন্তু এ তিনটিরও খাওয়ার রুচি এক নয়, আকৃতি ও রুচিভেদে বড়, মাঝারী আর ছোট। আর দুটি শ্রেণী বনের ক্যাকটাস খেয়ে বাঁচে, অন্যরা সব পতঙ্গভুক।

আঠার শতকের শেষে ম্যালথুস তাঁর বিখ্যাত বই Essay on the principle of population লিখেছিলেন। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী ছিল জনস্ফীতির তুলনায় খাদ্যের ঘাটতিতে উনিশ শতকে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর ফলে মানবসমাজ ধ্বংসের মুখোমুখি এসে যাবে। অবশ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শ্রমবিপ্লবের মাধ্যমে তখন এই ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ করে দিয়েছে। কিন্তু এই বইয়ের একটি কথা 'অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম' (struggle for existence) ডারুইনের খুব মনঃপুত হল। 1838 খৃস্টাব্দে বইটি তাঁর হাতে আসে ও এই নীতির বাক্যটিতে তাঁর জিজ্ঞাসার উত্তর পান। ফিঞ্চ পাখীদের কথা ভেবে ডারুইন সিদ্ধান্তে এলেন খাদ্যের প্রতিযোগিতায় জয়ী জীবই দক্ষ থেকে দক্ষতর হতে থাকে। বীজভুক ফিঞ্চ থেকে পতঙ্গভুক ফিঞ্চের প্রাচুর্য বেড়েছে কারণ বীজ হয়ত ক্রমশ ঘাটতি পড়ছিল। পাতলা লম্বা ঠোঁট যে কোন কোন ফিঞ্চ পেয়েছে তার কারণ অন্যদের নাগালের বাইরে তারা সহজে খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে। কেউ কেউ পেয়েছে মোটা ভারী ঠোঁট যাতে অব্যবহার্য খাদ্য চিবাতে পারে। স্বভাবতই এদের বংশধরেরা সংখ্যায় বাড়ছে অন্যদের চেয়ে। গালাপোগোস দ্বীপপুঞ্জে ফিঞ্চরা নতুন যখন এসেছে খাদ্য সংগ্রহের সব রাস্তাই সেখানে খোলা ছিল, কারণ অন্য পশুপাখীরা ছিল না, তাই নতুন পদ্ধতি-গুলি অভ্যাস করার স্বাধীনতা পেয়েছে বলে এরকম বৈচিত্র্য। দক্ষিণ আমেরিকার মূল ভূখণ্ডে সে সম্ভাবনা ছিল না, তাই বৈচিত্র্যেরও প্রসার হয় নি। ডারুইনের মতে সব প্রজাতিই ধীরে ধীরে পরিবেশের সংগে সামঞ্জস্য রাখতে আকারে আচরণে পরিবর্তিত হয়েছে। ক্রমশ যাদের বংশ দক্ষতায় অন্যদের অতিক্রম করেছে তারা আর তাদের আদি প্রজাতির সংগে যৌনমিলনে অক্ষম হয়ে সেই প্রজাতির প্রজনন থামিয়ে দিয়েছে। ডারুইন এই পদ্ধতির নাম দেন প্রাকৃতিক নির্বাচন বা natural selection. জিরাফ খাদ্য সংগ্রহের জন্য লম্বাগলা পায় নি, বরং যারা ঐ পরিবেশে লম্বা গলা পেয়েছে তারাই বেঁচে গেছে। আর একইভাবে যাদের গায়ে ছোপ ছোপ রং হল, তারা হিংস্র শত্রুদের সহজ আক্রমণ থেকে অনেকটা রক্ষা পেল। অন্যরা ধ্বংস হল। প্রাকৃতিক নির্বাচনে তাদের এই পরিবর্তন হল তাদের বাঁচার অন্যতম হাতিয়ার।

এক প্রজাতি থেকে প্রাকৃতিক নির্বাচনে অন্য প্রজাতিতে রূপান্তর অবিরাম ও বহু সময় সাপেক্ষ পদ্ধতি। তা চলে খুব ধীর গতিতে। কিন্তু একই প্রজাতির শ্রেণীভেদ নজরে পড়ে—আর সেই ভেদই ক্রমশ প্রজাতির রূপান্তরে পর্যবসিত হতে পারে।

অনেক বছর ধরে ডারুইন তার পরীক্ষানিরীক্ষা নিয়ে একটি মতবাদ দাঁড় করান। 1858 খৃস্টাব্দে যখন ডারুইন তখনও গবেষণা করে চলেছেন, তাঁর বন্ধুরা তাঁকে তাঁর মতবাদ প্রকাশ করতে চাপ দেন পাছে তিনি আবিষ্কারের অগ্রাধিকার হারিয়ে ফেলেন। অবশ্য তাঁর অভিব্যক্তিবাদ প্রচার হওয়ার আগে ওয়ালেস নামে এক প্রকৃতি বিজ্ঞানী ঠিক ডারুইনের মত সমুদ্র যাত্রায় গিয়ে একই রকম সিদ্ধান্তে আসেন। তাঁর যাত্রা পথে ইস্ট ইণ্ডিজের পূর্ব থেকে পশ্চিম দ্বীপপুঞ্জে উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের পার্থক্য তিনি লক্ষ্য করেন। বোর্নিও-সেলিবিস এবং বালী ও লোম্বোক দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে একটি রেখা টেনে এই পৃথক দুই জীবজগৎকে স্পষ্টই চিহ্নিত করা যায়। এই রেখা এখনও ওয়ালেস রেখা নামে পরিচিত। পরবর্তী-কালে ওয়ালেস জীবজগতের বৈচিত্র্য অনুসারে পৃথিবীকে ছয়টি অঞ্চলে ভাগ করেছিলেন। ওয়ালেস লক্ষ্য করে ছিলেন যে অস্ট্রেলিয়া ও পূর্বদ্বীপপুঞ্জের স্তন্যপায়ী প্রাণীগুলি একান্তই আদিম, তুলনায় এশিয়া ও পশ্চিমদ্বীপপুঞ্জের ঐ প্রাণীরা আকারে আচরণে উন্নততর। ওয়ালেসও ডারুইনের মত ম্যালথুসের বই পড়ে তাঁর বাঁচার তাগিদে সংগ্রাম নীতিতে তাঁর প্রশ্নের মীমাংসার সূত্র খুঁজে পেয়েছিলেন। ওয়ালেস কিন্তু ডারুইনের মত চুপচাপ বসে না থেকে তাঁর রিপোর্ট ও ধারণা লিখে ফেললেন ও ডারুইনের কাছে সমালোচনার জন্য পাঠালেন। ডারুইন তো বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। এযে তাঁরই চিন্তা ভাবনা ও ধ্যানধারণার হুবহু প্রতিফলন। ডারুইন

তখনই উভয়ের কাজের রিপোর্ট একযোগে প্রকাশ করার প্রস্তাব দিলেন ওয়ালেসকে। 1858 খৃস্টাব্দে লিনিয়ান সোসাইটির জার্নালে রিপোর্টটি প্রকাশিত হল। পরের বছর ডারুইন The origin of species বইখানি প্রকাশ করেন। ডারুইনের জীবদ্দশাতেই অস্ট্রিয়াবাসী ধর্মযাজক বিজ্ঞানী মেন্ডেল (1822-34) বংশগতির ধারা সম্পর্কে মটরশুঁটির উপর দীর্ঘ পরীক্ষা করে যে সূত্র আবিষ্কার করেন 1866 খৃস্টাব্দে, সেকথা ডারুইন বা সমসাময়িক অন্য দেশের বিজ্ঞানীরা জানতেন না। বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকে এসে এই দুই তত্ত্বের মহামিলনে অভিব্যক্তিবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

তাই ডারুইনের তত্ত্বের বিপক্ষে প্রথমে প্রবল বিরোধিতার ঝড় উঠেছিল। ওয়েন, গোসে প্রমুখ বিজ্ঞানীরা ছিলেন সেই দলে, তাছাড়া ছিলেন কিছু বাইবেল প্রচারক। এমন কি ডিসরেলী, যিনি পরে গ্রেট বৃটেনের প্রধান মন্ত্রী হন, বলেছিলেন "এখন সমাজের সামনে একটাই প্রশ্ন মানুষ—বানর অথবা দেবদূত—আমি দেবদূতের সপক্ষে।" দেবদূতের সপক্ষে বাইবেল প্রচারকেরা একজোট হয়ে গেলেন। এঁদের অন্যতম নেতা হলেন বিশপ উইলবারফোর্স। শান্তিপ্রিয় মানুষ ছিলেন ডারুইন। তর্কযুদ্ধ তাঁর পছন্দ নয়। তাঁর পক্ষে তখন বড় প্রবক্তা দাঁড়িয়েছিলেন হাক্সলি। শেষ পর্যন্ত ডারুইন জিতেছিলেন। শুধু জয় নয়, অভিব্যক্তিবাদ তাঁকে বিপুল সম্মানের আসন দিয়েছিল। 1882 খৃস্টাব্দে যখন তিনি মারা যান, ইংল্যাণ্ডের বিশ্ববন্দিত মহান ব্যক্তিদের সমাধি ভূমি ওয়েস্ট মিনিস্টার এবেতে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। উত্তর অস্ট্রেলিয়ার একটি সহর তাঁর নামানুসারে 'ডারুইন' রাখা হয়।

অভিব্যক্তিবাদের আর একজন বড় প্রবক্তা ছিলেন হার্বাট স্পেন্সার। যোগ্যতমের উদ্বর্তন (survival of the fittest) কথাটি তিনি প্রচলিত করেন। তাছাড়া অভিব্যক্তি বা evolution কথাটি ডারুইন খুব বেশী ব্যবহার না করলেও স্পেন্সার ঐ কথাটি জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন।

1925 খৃস্টাব্দে অভিব্যক্তিবাদের বিরুদ্ধে আবার একটা ঢেউ উঠেছিল—কিন্তু তা বেশীদিন টেকে নি—তার কারণ প্রাকৃতিক নির্বাচনের কলাকৌশল মানুষের চোখের সামনে বাস্তবে ধরা পড়ছিল, তা আর অবিশ্বাস করার উপায় ছিল না। ডারউইনের জন্মভূমিতেই একটি ঘটনা ঘটল। সেখানে সাদা ও কালো দু-রকমের প্রজাপতি দেখা যেত।—সাদারাই তখন ছিল দলে ভারী। তখন গাছের ছাল ছিল হাল্কারংয়ের আর সেই রংয়ের সংগে মিশে গিয়ে সাদা প্রজাপতিরা গা ঢাকা দিতে পারত। কালোদের যে সুবিধা ছিল না বলে অন্য প্রাণীদের সহজ শিকার হত। ইংল্যাণ্ডে শ্রম বিপ্লবের পর কলকারখানা যখন বাড়ল, কালিঝুলও বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল। ফলে গাছের ছাল কালো হতে থাকল। তখন দেখা গেল কালো প্রজাপতিও সংখ্যায় বাড়ছে। প্রাকৃতিক নির্বাচনে জীবন সংগ্রামে জয় পরাজয়ের এরকম অজস্র উদাহরণ পাওয়া যাবে।

অভিব্যক্তির রূপরেখা

পরবর্তী বিভিন্ন সময় ভূগর্ভে প্রোথিত জীবাশ্ম থেকে জীবনের এই অভিব্যক্তিবাদ নিখুঁত বৈজ্ঞানিক সত্যে পরিণতি লাভ করেছে।

আদিম জীবন ছিল নরম ছোট অণু সমষ্টি—তাদের কোন শক্ত কাঠামো ছিল না তাই প্রায় 200 কোটি বছর আগে জীবনের অস্তিত্বের পরোক্ষ প্রমাণ থাকলেও তাদের জীবাশ্ম পাওয়ার প্রসঙ্গ ওঠে না। শুধু কল্পনা করতে পারি দুশো কোটি বছর আগে যদি আমরা এই পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াতে পারতাম তবে কোন প্রাণীই চোখে পড়ত না। পৃথিবী পৃষ্ঠ তখন ছিল উষ্ণ। তার অধিকাংশ জলই মেঘের আকারে ভাসছিল বায়ুমণ্ডলে। এ রকম আবহাওয়ায় হয়ত ছিল কিছু অণুজীব, আলো ছাড়াই যারা বাঁচতে পারত আর সমুদ্রের দ্রবীভূত জৈব অণু খেয়ে পুষ্ট হত। কিছু অণুজীবের খাদ্য ছিল অজৈব পদার্থ। খনিজ ভোজী এই সব গন্ধক ও লৌহ ব্যাক্টেরিয়া এইসব ধাতুর যৌগের অক্সিডেশন থেকে শক্তি সঞ্চয় করেছে।

পৃথিবী পৃষ্ঠ শীতল হওয়ার সঙ্গে সূর্যের আলোতে অণুজীবের ভেতর ক্লোরোফিলের বিকাশ হল। তা বাতাসের কার্বন ডাই অক্সাইড থেকে কার্বন নিয়ে গড়ে তুলল নতুন উদ্ভিদ জীবন। এককোষী থেকে বহুকোষ প্রাণী—জটিল থেকে জটিলতর গঠনের জীবজগৎ সৃষ্টি হল। যে সব অণুজীব বাতাসের কার্বন না নিয়ে উদ্ভিদ থেকে কার্বন সংগ্রহ করল—তাদের পরভোজীবৃত্তি হল সহজ। তারা বাড়তি শক্তিতে নড়তে চড়তে পারল, খাদ্য সংগ্রহে তার অবশ্য প্রয়োজন ছিল। তারা ক্রমশ নিজেদের একে অপরকেও খেতে থাকল। জেলীর মত নরম প্রাণী থেকে ক্রমশ বিকাশ ঘটল চিংড়ী, কাঁকড়া এসব প্রাণীর।

50 কোটি বছর আগে পুরাপ্রাণ বা পেলিজোয়িক যুগের গোড়ায় সমুদ্রে প্রাণের প্রভূত বিকাশ ঘটেছিল। সে যুগের উন্নততর জীব হল ট্রাই-লোবাইট—যার জীবাশ্ম প্রমাণ করে যে তা 40-50 কোটি বছর আগেকার সময়ে

অর্থাৎ সিলুরিয়াস ও অর্ডোভিসিয়ান যুগের বাসিন্দা ছিল। ক্রমবিকাশের ধারায় গঠনের নানা পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে তাদের আধুনিক উত্তরাধিকার পেয়েছে কাঁকড়া ও চিংড়ি জাতীয় জীব। এদের নিকট আত্মীয় ইউরিপ-স্টেরিডস্ সমুদ্র থেকে ক্রমশ মিঠা জলে পরে ডাঙায় বাস করার মত বিভিন্ন গঠনের শরীরের ক্রমবিকাশে শেষ পর্যন্ত বিছা, মাকড়সা ইত্যাদির রূপ পেয়েছে।

এই কালের আর এক সামুদ্রিক প্রাণীর প্রজাতি ল্যান্সলেট পরিণত হয়েছে মাছে। পুরা প্রাণযুগের শেষে জলচর থেকে উভচর প্রাণীর উত্তরণ ঘটেছে—সাড়ে বাইশ থেকে 35 কোটি বছর আগের সময়ের ব্যবধানে—পারমিয়ান ও কারবিন ফেরাসযুগের জীবাশ্মে এসব জীবের অস্তিত্ব পাওয়া যাচ্ছে। আধুনিক উভচরদের ঠিক পূর্বপুরুষ হল স্টেগোসেফালিয়ান্স্। উভচরদের মধ্যে ব্যাঙের মত কিছু ছোট প্রাণী এখনও বেঁচে বর্তে আছে তবে তাদের বড় আকৃতির বংশধরগুলির অবশেষ কার্বনিফেরাস যুগের জীবাশ্মে পাওয়া গেলেও তাদের কেউ এখন বংশ পরম্পরা রেখে যায় নি। কিছু উভচর, অনুমান করা হয়, স্থলচর সরীসৃপে পরিণত হয়ে বংশপরম্পরা বজায় রেখেছে। প্রাণীদের সমান্তরালে উদ্ভিদ ও জল থেকে স্থলভাগে বিকশিত হয়ে উঠেছে। পুরা-প্রাণযুগের শেষভাগে 285000000 থেকে 235000000 বছর আগের কার্বনিফেরাসযুগে কয়লার জন্ম। গাছপালা চাপা পড়ে অক্সিজেন ছাড়াই বিযোজিত হয়ে সে যুগে কয়লার মত অমূল্য সম্পদের সৃষ্টি হয়েছিল।

মেসোজোইক বা মধ্য-প্রাণযুগের বিস্তৃতি প্রায় 22.5 থেকে 13.5 কোটি বছর আগে। এযুগে ডাইনোসর ও আরও ভয়ংকর মাংসাশী টাইরেনোসেরাস প্রাণীর আবির্ভাব ও বিলোপ ঘটেছে। আজকের উটপাখীর পূর্বপুরুষ অর্নিথোমিমাস্ জাতীয় ক্যাঙারুর মত সরীসৃপও সেযুগে বর্তমান ছিল। ডাইনোসরের মত বৃহদাকার অথচ গিরগিটি জাতীয় সরীসৃপের আর একটি শাখা ডিপ্লোডোকাস অথবা এক-শ ফুট লম্বা 50 টন ওজনের দীর্ঘাকৃতি ব্রোন্টোসাউরাস সরীসৃপও এযুগের বাসিন্দা। খড়গবাহী স্টেগোসাউরাস, শৃঙ্গী ট্রাইসেরাটপস, প্রোটোসেরাটপস জাতীয় স্থলচর ও ইশথিওসাউরাস, প্লেসিওসাউরাস প্রভৃতি জলচর সরীসৃপ এসব মিলে মধ্যপ্রাণ যুগকে উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত করে তুলেছিল।

টেরাডেকটিল হল সরীসৃপ থেকে পাখীর প্রথম উত্তরণ। মধ্যপ্রাণযুগের অবশেষের আর্কিওটেরিক্স-এর জীবাশ্ম থেকে দেখা যায় এরা যেন সরীসৃপ ও আধুনিক পক্ষিপ্রজাতির যুক্তরূপ।

মধ্য প্রাণ যুগের সেইসব সরীসৃপের বিলোপও একটি বিস্ময়কর ঘটনা। তার কারণ ঠিক ঠিক খুঁজে পাওয়া কষ্টকর। হঠাৎ এই বিশাল প্রাণী রাজ্য যেন লুপ্ত হয়ে গেল—অবশেষ রইল কুমীর, কচ্ছপ ইত্যাদি কয়েকটি মাত্র প্রজাতি।

বিশাল সরীসৃপদের যুগে স্তনগ্রন্থি বিশিষ্ট স্তন্যপায়ী প্রাণীর আবির্ভাবের সম্ভাবনা কম ছিল। তবু 13.5 থেকে 18 কোটি বছর আগের সময়ের কিছু কিছু ছোটখাট স্তন্যপায়ী প্রায় আধুনিক কুকুরের মত প্রাণীর জীবাশ্ম পাওয়া গেছে ডাইনোসরের পাশাপাশি। মনে হয় এরা ডাইনোসরের ভাল খাদ্য ছিল। সরীসৃপ যুগের ক্রম বিলোপের সংগে স্তন্যপায়ী প্রাণীর ক্রমবিকাশ সম্ভব হয়েছে। সিনোজোইক বা নব্যপ্রাণযুগে আরম্ভ হল স্তন্যপায়ীদের রাজত্ব। সেযুগের প্রথম উট বা ঘোড়া ছিল প্রায় আজকের বিড়ালের মত। গণ্ডার ও হাতী এসবও ছিল আকারে ছোট। ক্ষুদে ক্ষুদে বানরের দল গাছে গাছে লাফিয়ে বেড়াত। সেযুগে এক শিকারী প্রাণীর আবির্ভাব, যাদের ক্রিয়োডন্টস্ নামে অভিহিত করা হয়। এর দুটি শাখা আধুনিককালে কুকুর, নেকড়ে, ভালুক ও বিড়াল, বাঘ, সিংহ ইত্যাদিতে পরিণতি লাভ করেছে।

জীবনের অভিব্যক্তি ও জৈব রাসায়নিক রূপান্তর

প্রাণী জগতের ক্রমবিকাশে অভিব্যক্তির ধারায় জৈব রসায়নের যে রূপান্তর ঘটেছে আধুনিক বিজ্ঞানে তার কিছু কিছু সূত্র ধরা পড়েছে। অভিব্যক্তির সঙ্গে এই রূপান্তরের নিবিড় যোগাযোগ থাকার ফলে ক্রমবিকাশ সম্ভব হয়েছে।

প্রথমেই জীবদেহের রুটিন মাফিক নাইট্রোজেন আবর্জনা বর্জনের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হল অ্যামোনিয়ায় রূপান্তরিত করে নাইট্রোজেন বর্জন করা—যাতে কোষের পর্দার ভেতর দিয়ে এই গ্যাস সহজে রক্তে পেঁছিতে পারে। এই গ্যাস বেশ বিষাক্ত, রক্তের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগের বেশী হলেই জীবের মৃত্যু ঘটে। সামুদ্রিক প্রাণীর পক্ষে এটা কোন সমস্যাই নয়। পাখনার সাহায্যে তারা অবিরাম অ্যামোনিয়া বের করে দেয়। কিন্তু স্থলচর প্রাণীর বেলায় সে প্রশ্ন ওঠে না। মূত্রের সঙ্গে অনবরত অ্যামোনিয়া বর্জনে জীবদেহে জলশূন্যতায় মৃত্যু অনিবার্য। তাই এসব প্রাণীর নাইট্রোজেন আবর্জনা ইউরিয়ার মত

কম বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থের আকারে রূপান্তরিত হয়। ইউরিয়া রক্তের হাজার ভাগে এক ভাগ থাকলেও জীব-দেহের পক্ষে অসহ্য নয়। তাই ব্যাঙাচি জলে অ্যামোনিয়ার আকারে নাইট্রোজেন বর্জন করে অথচ একটু বেড়ে ব্যাঙ হয়ে স্থলে এলে তার নাইট্রোজেন বর্জন ইউরিয়া দিয়ে হয়। জৈব রসায়নে জল থেকে স্থলের প্রাণীতে এই বিবর্তন একান্ত জরুরী প্রয়োজন—আর বাস্তবে জলচর প্রাণীর পাখনা এই কারণেই স্থলচর প্রাণীর ফুসফুসে রূপান্তরিত হয়ে যায়। সরীসৃপের বেলায় ইউরিয়ার পরিবর্তে নাট্রোজেন ঘটিত আবর্জনা বর্জনের প্রয়োজন দেখা দিল ইউরিক অ্যাসিডের মাধ্যমে। কারণ সরীসৃপের ডিমের ভ্রূণ থেকে ইউরিয়া বেরোলে ডিমের সীমিত জলের সঞ্চয় বিষাক্ত হতে পারে। ইউরিক অ্যাসিড হল পিউরিন অণু যা জলে দ্রবণীয় নয়, তাই তা কণা আকারে এক পাশে থিতিয়ে গিয়ে কোষে প্রবেশাধিকার পায় না। তিন কক্ষের হৃৎপিণ্ড থেকে সরীসৃপের বেলায় চার কক্ষবিশিষ্ট হৃৎপিণ্ড প্রাণীজগতের চোখে পড়ার মত পরিবর্তন। ইউরিক অ্যাসিড আধা কঠিন ও কঠিন মলের সঙ্গে সরীসৃপের একমাত্র বহির্দ্বার দিয়ে বেরিয়ে যায়—এই বহির্দ্বারকে বলা হয় ক্লোয়াকা। পাখী ও অণ্ডজ স্তন্য-পায়ীদেরও একক বহির্দ্বার দিয়ে ইউরিক অ্যাসিডের সাহায্যে আবর্জনা ত্যাগ করতে হয়।

উন্নততর স্তন্যপায়ীদের গর্ভের ভ্রূণ মায়ের রক্ত-সঞ্চালনের সঙ্গে ইউরিয়া ত্যাগ করতে পারে। বয়স্ক স্তন্যপায়ীর যথেষ্ট ইউরিয়া ত্যাগ করতে হয় বলে আলাদা মূত্রনালী থাকে, তা ছাড়া থাকে কঠিন আবর্জনা ত্যাগের জন্য আলাদা মলদ্বার।

এই উদাহরণ থেকে বোঝা যাবে প্রাণীদের জীবনচর্যা এক সুরে বাঁধা থাকলেও তার বৈচিত্র্য ও পরিবর্তন দেখা যাবে এক প্রজাতি থেকে অন্য প্রজাতিতে। অভিব্যক্তির ধারায় দুটি দূরবর্তী প্রজাতির এই পরিবর্তন যথেষ্ট বেশী মনে হবে।

বাইরের প্রোটিনে প্রাণীর রক্তে যে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়—তাকে অ্যান্টিসেরা বলা হয়। মানুষের রক্তের এরকম অ্যান্টিসেরা আলাদা করে নিলে তা মানুষের রক্তে যা বিক্রিয়া ঘটাবে অন্য প্রজাতির রক্তে তা নয়। শিম্পাঞ্জীর রক্তে বিক্রিয়া খুব ক্ষীণ। যে অ্যান্টিসেরা মুরগীর রক্তে তীব্র বিক্রিয়া করে তা হাঁসের রক্তে মৃদু। অ্যান্টিবডির বিশেষত্ব ও তার বিক্রিয়া থেকে প্রজাতিদের সম্পর্কের ঘনিষ্টতা অভিব্যক্তির ধারায় নিরূপন করা যায়। এরকম পরীক্ষায় প্রাণীদেহের জটিল প্রোটিন অণুর গঠন প্রজাতি থেকে প্রজাতিতে কীভাবে অল্পবিস্তর পরি-বর্তিত হয় তার পরিচয় যেমন পাওয়া যায়—নিকট সম্পর্কীয় প্রজাতির বেলায় গঠনের সূক্ষ্মতর পরিবর্তনও ধরা পড়ে।

1965 খৃস্টাব্দে মানুষও ঐ গোত্রের আদিম প্রজাতি যথা বানর ইত্যাদির হিমোগ্লোবিন পরমাণুর গঠন ইত্যাদি নিয়ে বিশদ গবেষণা হয়। গবেষণার ফল এই দাঁড়ায় যে আদিম প্রজাতির বিভিন্ন শ্রেণীতে হিমোগ্লোবিনের যে পেপটাইড শৃঙ্খল আছে তার আলফা অংশটি তেমন নয় কিন্তু বিটা অংশটি শ্রেণীভেদে বেশ পরিবর্তিত হয়। মানুষ ও একটি বিশেষ আদিম এরকম প্রজাতির বেলায় অ্যামিনো অ্যাসিড ও আলফা শৃঙ্খলের ছয়টি অথচ বিটা শৃঙ্খলের তেইশটি তারতম্য ধরা পড়ে। হিমোগ্লোবিন অণুতে তারতম্যের পরিমাণ দেখে অনুমান করা হয় বানর থেকে মানুষের ক্রমবিকাশ প্রায় সাড়ে সাত কোটি বছরে সম্ভব হয়েছে।

সব অক্সিজেনজীবী প্রাণীর কোষে লৌহযুক্ত প্রোটিন সাইটোক্রোম সি রয়েছে—যা 105টি অ্যামিনো অ্যাসিড শৃঙ্খলের সমষ্টি। বিভিন্ন প্রজাতির কোষের এই অণু বিশ্লেষণ ধরা পড়েছে যে রিসাস বানর ও মানুষের দেহে এই অণুতে একটি অ্যামিনো অ্যাসিডে তারতম্য আছে। মানুষের সঙ্গে ক্যাঙারু, টুনামাছ, ঈস্ট কোষ সব জীবকোষের সাইটোক্রোম সিতে অ্যামিনো অ্যাসিডের শৃঙ্খলে যথাক্রমে প্রায় 10, 21 এবং 40 রকমের পার্থক্য দেখা যায়।

কম্প্যুটার দিয়ে বিশ্লেষণ এখন বিজ্ঞানের একটি উল্লেখযোগ্য শাখা। এর সাহায্যে দেখা গেছে গড়ে 70 লক্ষ বছরে একটি অ্যামিনো অ্যাসিড শৃঙ্খলের পরিবর্তন সম্ভব। এথেকে সিদ্ধান্তে আসা যায় কখন কোন প্রজাতির প্রাণী অন্য প্রজাতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। এই গবেষণার ফলে বলা যায় 250 কোটি বছর আগেই ব্যাক্টেরিয়া থেকে উন্নত জীবকোষের সৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। দেড়শো কোটি বছর আগে মনে হয় উদ্ভিদ ও প্রাণীদের পূর্বপুরুষ ছিল অভিন্ন, আর 100 কোটি বছর আগে মেরুদণ্ডহীন ও মেরুদণ্ডীপ্রাণী একই প্রজাতি থেকে ভিন্নতর হয়ে পড়েছে।

জীবাশ্মের দলিলগুলি মাটির তলা থেকে যতই আমাদের হাতে এসেছে—অভিব্যক্তির জটিল প্রক্রিয়াও ততই রহস্যময় হয়ে উঠেছে। হঠাৎ ডাইনোসর প্রাণীরা কেন লুপ্ত হল, অভিব্যক্তি কখনও মন্থর কখনও দ্রুতগতিতে চলেছে অথবা অভিব্যক্তি ছাড়াই কখনো কি নতুন প্রজাতি সৃষ্টিতে প্রকৃতি ভুল শোধরাতে নানা চেষ্টার মধ্যে (trial

and error) আকস্মিক কিছু প্রজাতির জন্ম দিয়েছে এসব প্রশ্নও মাঝে মাঝে উঠে। মহাজাগতিক রশ্মি কি কখনও ক্রমবিকাশের ধারায় প্রভাব বিস্তার করেছে? অথবা সৌরজগতের কাছাকাছি কোন সুপার নোভার বিস্ফোরণ? কেউ কেউ অন্ততঃ ডাইনোসরের বিলোপের পিছনে এরকম কারণ থাকতে পারে অনুমান করেন।

মানুষের আবির্ভাব ও ক্রমবিকাশ

পার্থিব জীবন রঙ্গমঞ্চে বর্তমান অবিসংবাদী নায়ক হল মানুষ—তার প্রবেশ কবে ঘটেছে সঠিক তারিখ বলা যাবে না। তবে স্তন্যপায়ীদের দেহের সঙ্গে মস্তিষ্কের আকারের অনুপাত যে সব প্রাণীতে বেড়েছে তারা ক্রমশ উন্নততর হয়েছে। স্তন্যপায়ীদের একটি শাখা বানর ইত্যাদি এরকম উন্নত প্রজাতির স্তন্যপায়ী যাদের সাধারণ ভাবে প্রাইমেট বলা হয়। মনে হয় কুড়ি লক্ষ বছর আগে মানুষের ক্রমবিকাশ ঘটেছিল। তখনকার জিনজানথ্রোপাস অর্থাৎ পূর্ব আফ্রিকার মানুষ পাথরের অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করতে পারত। বৃটিশ প্রত্নতাত্ত্বিক লুই এই মানুষের জীবাশ্ম আবিষ্কার করেন এবং তা 17·5 লক্ষ বছরের প্রাচীন। ডার্ট দক্ষিণ আফ্রিকার অস্ট্রালোপিথেকাস মানবের যে জীবাশ্ম আবিষ্কার করেন তার সংগে জীব-জন্তুর হাড়ের অস্ত্রশস্ত্র ও তাদের জীবাশ্মও পাওয়া গেছে। কাল নিরূপণে তা 20 লক্ষ বছর আগেকার। 5 লক্ষ বছর আগেকার জাভার পিথেকানথ্রোপাস ও পিকিং এর সিনানথ্রোপাস মানুষের জীবাশ্ম থেকে তাদের খুলির আয়তন দেখা যায় 1000 ঘন সেন্টিমিটার, যেখানে আধুনিক মানুষের 1500 ও বানর বা গরিলার মাত্র 500।

পিথেকানথ্রোপাস মানুষ মনে হয় পরিবার নিয়ে বাস করত—বনে জঙ্গলে গুহায় আশ্রয় নিত। জানত আগুনের ব্যবহার। তৈরি করতে পারত কাঠের ও পাথরের অস্ত্রশস্ত্র।

এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপে আরও উন্নত মানুষের জীবাশ্ম পাওয়া গেছে—এদের বলা হয় হোমো নিআণ্ডার থালেনসিস। এদের খুলির আকারও যেমন পিথেকাথ্রোপাসদের চেয়ে বড়, নৈপুণ্য ও ছিল বেশী। ক্রোম্যাগনন নামে ফ্রান্সে প্রাপ্ত মানুষের জীবাশ্ম থেকে দেখা যায় এদের শাখা যেন আলাদাভাবে তৈরি হয়েছে। এরা গুহায় জীবজন্তু ও শিকারের ছবি এঁকে রেখে গেছে। শিকারে, অস্ত্র তৈরিতে এরা ছিল অত্যন্ত দক্ষ। সম্ভবত ক্রোম্যাগননদের কাছে নিআণ্ডারথাল মানুষ প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়ে বিলুপ্ত হয়েছে।

তারপরেই একটি প্রজাতি বুদ্ধিমান মানুষ জীবনের রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়েছে। আধুনিক মানুষ তাদেরই বংশধর। সাদা কালো ইথিওপিয়ান, মোংগোলীয়ান ইত্যাদি যে কোন ভেদ রেখায় বর্তমান মানুষ প্রজাতিকে যতই ভিন্ন ভিন্ন দেখা হোক না কেন অভিব্যক্তির নিরিখে বর্তমান বিশ্বে সব মানুষই এক প্রজাতিভুক্ত। তার শ্রেণীভেদ প্রাকৃতিক কারণে কৃত্রিম। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সূর্যরশ্মির প্রখরতা এড়াতে মানুষের চামড়া কালো হয়। ইউরোপের সূর্যের ক্ষীণ আলো থেকে অতিবেগুনি অংশ টেনে নেওয়ার সুবিধার জন্য সেখানকার মানুষের চামড়া সাদা। এই চামড়ার স্টেরল থেকে অতিবেগুনি রশ্মি ভিটামিন ডি তৈরি করতে পারে। মোঙ্গোল ও এস্কিমোদের চোখ সরু কারণ বরফ বা মরুর বিকীর্ণ তীব্র আলো থেকে এরকম চোখ সহজেই রক্ষা পায়। উঁচু নাক ও সরু নাসারন্ধ্র আছে বলে ইয়োরোপের মানুষ উত্তুরে ঠাণ্ডা হাওয়া একটু উষ্ণ করে নিতে পারে।

বুদ্ধিমান মানুষ পৃথিবীকে ঐক্যের ভিত্তিতে এক-পৃথিবী হিসেবে গড়ে তুলতে চায়। জাতিতে জাতিতে বিবাহ এখন কোন ঘটনা নয়—ফলে বর্ণসঙ্করের আধিক্যে শ্রেণীভেদ একদা মুছে যাওয়াও বিচিত্র নয়।

তবু রক্ত পরীক্ষার ফল থেকেই মানুষের শ্রেণী ও তার উত্তরাধিকার প্রশ্নের কিছু উত্তর পাওয়া যায়। যেমন আমেরিকার আদিম ভারতীয়দের রক্ত O গ্রুপের, কারুরও B অথবা AB group নেই। যাদের থাকে তাদের পিতৃত্ব ইউরোপের মানুষে বর্তায়। অস্ট্রেলীয় আদি-বাসীদের প্রায়ই O ও A গ্রুপের রক্ত, B নেই বললেই চলে। কিন্তু অধুনা আবিষ্কৃত M ও N গ্রুপের মধ্যে M ওদের মধ্যে প্রবল, N অনেক কম কিন্তু আমেরিকার আদিম ভারতীয়দের M গ্রুপ কম ও N যথেষ্ট বেশী।

লণ্ডনে শতকরা 70 জন মানুষের রক্ত O গ্রুপের, 26 জনের A ও মাত্র 5 জনের B গ্রুপের। খারখোভের জনসংখ্যার শতকরায় এই হিসাব যথাক্রমে 60, 25 ও 15 জনের। সাধারণত B গ্রুপের শতকরা ভাগ ইয়োরোপের পূবদিক থেকে বাড়তে বাড়তে মধ্য এশিয়ায় 40 ভাগে দাঁড়ায়। রক্তের গ্রুপ থেকে জাতির পূর্বপুরুষের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। পঞ্চম শতকে হুন ও ত্রয়োদশ শতকে মোঙ্গলদের ইয়োরোপ অভিযানের ফলে মনে হয় সেখানে B গ্রুপের রক্ত আদিম রক্তের সংগে মিশে গেছে। তেমনি উত্তরাঞ্চল থেকে B গ্রুপের রক্ত অস্ট্রেলিয়াতে দক্ষিণ পশ্চিম থেকে A গ্রুপের রক্ত জাপানে সেখানকার আদিম মানুষের রক্তে ঢুকে পড়েছে।

অভিব্যক্তির ভবিষ্যৎ

আদিম মানুষ যে প্রাকৃতিক নির্বাচনে জিতে গিয়ে

সংখ্যায় বেড়েছে ও চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে তাতে সন্দেহ নাই। দশ হাজার বছর আগে জনসংখ্যা হয়ত এককোটিও ছিল না—এরকম হিসাব হয়ত নির্ভরযোগ্য নয়। তবে খ্রীস্ট জন্মের সময় জন সংখ্যা যে প্রায় 35 কোটিতে পৌঁছেছিল তা কিছুটা নিঃসন্দেহে বলা যায়। আঠার শতকের গোড়ায় এই সংখ্যা 50 কোটিতে আর গত দুশো বছরে প্রায় 300 কোটিতে পৌঁচেছে। এখন তো দৈনিক গড়ে এক লক্ষ মানুষ বেড়ে চলেছে। তাহলে অভিব্যক্তির ভবিষ্যৎ কী হবে তা নিশ্চয়ই চিন্তার কারণ। 1799 খৃস্টাব্দে ম্যালথুসের ভবিষ্যদ্বাণী বিলম্বিত হলেও এখন কি মানব সমাজ অবলুপ্তির মুখে? 1947 থেকে 1953 এই কয় বছরে খাদ্য উৎপাদন শতকরা আট ভাগ বাড়লেও পৃথিবীর জনসংখ্যা শতকরা 11 ভাগ বেড়েছে। এই সমস্যা নিয়ে অভিব্যক্তিবাদের মুখ্য প্রবক্তা ডারুইনের পৌত্র স্যার চার্লস ডারুইন 1958 খৃস্টাব্দে The problem of world population বইতে বলেছেন "জনস্ফীতির হার অদূর ভবিষ্যতে কমতে বাধ্য নতুবা হাজার বছরের পর মানুষের দাঁড়াবার জায়গা থাকলেও প্রত্যেকের শোবার স্থান থাকবে না।" তার আগেই খাদ্যাভাব প্রকট হয়ে উঠবে। তখন সামুদ্রিক প্রাণী খাদ্যের প্রধান অবলম্বন হয়ে দাঁড়াবে। কয়লা ও তেল ততদিনে নিঃশেষ হয়ে যাবে। ইউরেনিয়াম থোরিয়াম জাত নিউক্লীয় শক্তিও একদিন ফুরিয়ে যাবে, কারণ এদের ভাণ্ডারও অফুরন্ত নয়। তখন কি আমাদের বনজঙ্গলের জ্বালানী কাঠের উপর নির্ভর করতে হবে? তখন কি বর্তমান সভ্যতা ও সমাজ ব্যবস্থা এরকম অটুট থাকবে?

বিজ্ঞানীরা অবশ্য এই ভয়াবহ ভবিষ্যতের কথা ভেবে শক্তির নূতন উৎসের সন্ধানে চলেছেন। সবচেয়ে আশা ব্যঞ্জক যে উৎসের সন্ধান পাওয়া গেছে তা হল নিউক্লীয় সংযোজনজনিত শক্তি। পৃথিবীর জলের ভারী হাইড্রোজেন অংশ এই প্রক্রিয়ায় আমাদের অন্তত কয়েকশো কোটি বছর ধরে শক্তি যোগাতে পারে। আমাদের সৌর জগৎ প্রায় 500 কোটি বছর আগে সৃষ্টি হয়েছে—পৃথিবীতে বুদ্ধিমান মানুষের আবির্ভাব খুব বেশী হলেও এক লক্ষ বছর আগে নয়। তাই বিজ্ঞান শক্তি সমস্যার সমাধান করতে পারে, সেই শক্তি দিয়ে কৃত্রিম খাদ্য তৈরি করে ক্রমবর্ধমান জনস্ফীতিকে বাঁচিয়ে রাখতেও পারে। কিন্তু ক্রমবিকাশের ধারায় বুদ্ধিমান মানুষ পৃথিবীতে আর কতদিন নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারবে? অভিব্যক্তিবাদের শিক্ষা হল ক্রমবিকাশের ধারায় অণুজীব থেকে জীবনের বর্তমান পর্যায়ের বিবর্তন। তা হলে আর ও বুদ্ধিমান উন্নত জীব কি ভবিষ্যতে মানুষের বিলুপ্তি ঘটিয়ে তার জায়গায় জুড়ে বসবে? হয়ত কীট-পতঙ্গ থেকে সেই বিবর্তনের নূতন ধারা কখন আরম্ভ হয়ে যাবে তা কেউ বলতে পারে না।

কীট-পতঙ্গের আত্মরক্ষা

মনোজ ঘোষ*

প্রত্যেক জীবেরই প্রাথমিক জৈব প্রেরণা হলো স্বীয় প্রজাতির প্রবাহমানতা বজায় রাখা। এই প্রেরণারই আদি কর্তব্য হিসাবে আহার ও আবাসের ব্যবস্থা সব জীবই করে থাকে। প্রাকৃতিক নিয়মে বোধহয় সব জীবই ভোক্তা ও ভোজ্যের জটিল শৃংখলে আবদ্ধ। তাই প্রাণী হিসাবে কীট-পতঙ্গও সম্পর্কহীন অনেক জীব এবং এমন কি কীট শ্রেণীভুক্ত বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যেও খাদ্য-শৃংখলে আবদ্ধ। কিন্তু ভোজ্য হিসাবে কেবল আত্মদান করতে থাকলে প্রজাতির নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া ব্যতীত আর কোনও গতি থাকে না। সেই কারণেই জীবনধারণের ও প্রজাতি সংরক্ষণের অন্যতম উপায় হলো আত্মরক্ষা। প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যই প্রজাতিগত আত্মরক্ষা প্রাকৃতিক নিয়মেই অপরিহার্য—কারণ কোনও প্রজাতির নির্মূল হয়ে যাওয়ার পরিণাম হলো খাদ্য-শৃংখল ছিন্ন হওয়া ও সাময়িক হলেও জীবজগতে বিপর্যয় ঘটা।

প্রাণী জগতে এ যাবৎকাল জ্ঞাত প্রজাতি সংখ্যায় শতকরা সত্তর ভাগেরও বেশী প্রজাতির প্রতিনিধিত্ব করে কীট-পতঙ্গ। পুরাজীবতাত্ত্বিককালে (Paleozoic era) উদ্ভূত এই কীটশ্রেণী প্রকৃতির নানা পরিবর্তনে নিজেকে টিকিয়ে রেখেছে আঙ্গিক ও শারীরবৃত্তীয় নানা অভিযোজন বিবর্তনের মাধ্যমে পৃথিবীপৃষ্ঠে প্রায় সব রকমের বাস্তুতেই নিজেকে পরিব্যাপ্ত করে দিয়ে। এই অভিযোজনেরই একটি আচরণগত দিক হলো আত্মরক্ষা। কীট-পতঙ্গের

* বি-3/161, কল্যাণী, নদীয়া

বহিরাঙ্গিক বৈচিত্র্যের ন্যায় এই আত্মরক্ষা পদ্ধতিও বহু বিচিত্র ও প্রজাতিগতভাবে বিশিষ্ট। তথাপি কীট-পতঙ্গের আত্মরক্ষা পদ্ধতিগুলিকে কয়েকটি সাধারণ বিভাগে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

এক ঃ ব্যবহার বা আচরণগত আত্মরক্ষা

বিপদ থেকে নিজেকে রক্ষা করার সহজতম উপায় হলো পলায়ন প্রবৃত্তি। গঙ্গা ফড়িং বা ঘেসো ফড়িং ধরতে গেলে হঠাৎ লাফিয়ে দূরে চলে যায়। প্রজাপতি ধরা তো প্রায় অসম্ভবই। আর, আম বাগানে একটু ভালভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে আম গাছের শ্যামা পোকা জাতীয় শোষক কীট দ্রুত পাশাপাশি হেঁটে ডালের উল্টো দিকে পালিয়ে গিয়ে লুকোবার চেষ্টা করছে।

আচরণগত আরও কয়েক উপায়ে বেশ চমকপ্রদভাবে কীট আত্মরক্ষা করে। লাউ বা কুমড়ো গাছের লাল পোকা (Red pumpkin beetle), বেশ কয়েক জাতের লেদা পোকা, এবং কিছু কিছু মথও (Moth) কোনও ভাবে বিঘ্নিত হলে মরার ভান করে মাটিতে পড়ে যায়। আলুর কাটুই পোকা (Potato cut worm) মাটিতে বাস করলেও বিপদের আশংকা মাত্রই শরীর গুটিয়ে মৃতাবস্থার ভান করে (Thanatosis) নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকে বিপদ উত্তরণের জন্য।

অনেক সময় আবার বিসদৃশ ও আক্রমণাত্মক ভঙ্গীর দ্বারা কীট বিপদমুক্ত হবার চেষ্টা করে। তিল ক্ষেতে বর্ষাকালে একধরনের বিরাটকায় লেদা পোকা প্রায়ই শস্যের বেশ ক্ষতি করে। এর নাম স্ফিংক্স ক্যাটারপিলার (Sphinx caterpillar)। গাছের পাতার রংয়ের সাথে নিজের শরীরের রং মিলিয়ে রাখলেও বিপদের আশংকা অনুভূত হলেই এরা উদরীয় উপপদে ভর করে শরীরের অগ্রাংশ উঁচু করে মিশরের স্ফিংক্সের মত ভয়াল রূপ গ্রহণ করে।

সুরক্ষিত আবাস, খোলক এবং এমনকি শরীরের উপর আবর্জনা আটকে রাখাও কীটের আত্মরক্ষার একটি আচরণগত পদ্ধতি। বেশ কিছু কীট গাছের কাণ্ডের ভিতরে সুড়ঙ্গ করে যেমন তাদের পুষ্টি আহরণ করে তেমনই এই সুড়ঙ্গই তাদের সুরক্ষিত আবাসের কাজও করে। অনুরূপ পদ্ধতি দেখা যায় পাতা মোড়ানো পোকার ক্ষেত্রে। পেয়ারা বা আমড়া গাছে আমরা প্রায়ই দেখতে পাই কাণ্ডের গা জড়িয়ে কাঠের গুঁড়োর মালা। এই মালা আসলে বাকল খাওয়া লেদা পোকার লালা মল ও বাকলের অভোজ্য অংশ দিয়ে তৈরী খাদ্য (বাকল) আহরণের যাতায়াতের পথ। এই পথের এক প্রান্তে থাকে বাকল আহরণ ক্ষেত্র আর অন্য প্রান্তটি গিয়ে শেষ হয় ঐ লেদা পোকারই তৈরী কাণ্ডের গায়ে একটি ছোট আশ্রয় ছিদ্রে (Retreat hole)। বাকল কুরে খাওয়ার সময়ে কোনও বিপদের আভাস পাওয়া মাত্রই লেদা পোকা দ্রুত পিছু হটে ঐ আশ্রয় ছিদ্রের নিরাপদ স্থানে প্রবেশ করে। এছাড়া মাটিতে সুড়ঙ্গ করে বাস করা ঘুরঘুরে পোকার (Mole cricket) কথা আমরা সকলেই জানি।

বিচিত্র একপ্রকার নিরাপদ আশ্রয় তৈরি করা আমরা দেখতে পাই প্রজাপতি বর্গের সাইকিডী (Psychidae) গোষ্ঠীর কীড়ায়। এই কীড়া প্রজাতিগত ভাবে গাছের পাতার অংশ। পাতার বোঁটা বা ছোট ছোট শাখার প্রয়োজনমত অংশ কেটে নিয়ে মুখের লালা দিয়ে তা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে জুড়ে নিয়ে একটি খোলক (Case) তৈরি করে এবং তার ভিতরে শরীরের মস্তকাংশটুকু বাদে প্রায় সবটাই ঢুকিয়ে রাখে। এইভাবে খোলকটি নিয়েই এরা চলা-ফেরা, খাওয়া—সব কাজই করে থাকে। বুঝবার উপায় থাকে না এদের কীট বলে, বিশেষ করে যদি গাছের কাণ্ড এদের বিচরণ ক্ষেত্র হয়।

দুই : আত্মরক্ষার আঙ্গিক গঠন

বর্ষাকালে সন্ধ্যায় ঘরের আলোয় আকৃষ্ট হয়ে আসা গোবরে পোকাকে বেশ কিছুক্ষণ ওড়ার পর মেঝেতে সশব্দে পড়তে দেখা যায় প্রায়ই। কিছুক্ষণ পরে আবার ঐ পোকা আগের মতই আওয়াজ করে উড়তে থাকে। অর্থাৎ এত জোর পতনেও তাদের যে কোনও ক্ষতি হয় নি তা বোঝা যায়। এটা সম্ভব হয়েছে এদের আঙ্গিক গঠনের দৃঢ়তার জন্য। আঙ্গিক গঠনের বা শরীরের বহিরাবরণের এই দৃঢ়তা প্রদান করে এক ধরণের সুগঠিত ও পরিপক্ক কৃত্তিক বা ত্বকাবরক (Sclerite)। এই কৃত্তিকীয় দৃঢ়তার সুন্দর ব্যবহার দেখা যায় পিপীলিকা গোষ্ঠীর কিছু প্রজাতির কর্মীদের মধ্যে। তারা মাথার চ্যাপ্টা গড়ন ও শক্ত কৃত্তিক দিয়ে সংঘাবাসের ছিদ্রপথ সাময়িক ভাবে বন্ধ করে রাখে আবাসের নিরাপত্তার জন্য। তেমনই পিপীলিকার সুগঠিত ও শক্ত দাঁত শত্রুকে দংশনের কাজে লাগিয়ে কেমন ভাবে তাদের আত্মরক্ষার সাহায্য করে তা বিবরণের অপেক্ষা রাখে না। সাঁড়াশী কীটের (Order Dermaptera) শরীর সাংগঠনিক বৈশিষ্ট হলো শরীরের শেষ খণ্ডে সাঁড়াশীর মত অংশটি। এর সাহায্যে এই কীট আক্রমণকারীকে ধরে পাশের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নিরাপদ হয়।

সজনে ও শিউলী গাছের কাণ্ডে দিনের বেলায়

ঝাঁক বেঁধে থাকা শুঁয়োপোকা প্রায় সকলেরই দেখা। এদের শরীরের রং যেমন বাকলের রংয়ের সঙ্গে মিলে গিয়ে আক্রমণকারীর নজর এড়াতে পারে, তেমনই এদের শরীরের দীর্ঘ ও বিষাক্ত রোমের ঘন আচ্ছাদন আত্মরক্ষায় সহকারী হিসাবে কাজ করে। কীট-পতংগ বিশেষ করে এদের কীড়াপর্যায়টি পাখীর বেশ প্রিয় খাদ্য। কিন্তু এমন সুবিধাজনক ও লোভনীয় ভোজ্যের কাছে পাখীর মেলা দেখতে পাওয়া যায় না এই শারীররোমের কণ্টকর প্রতিক্রিয়ার জন্যই।

তিন: রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার

মশার কামড়ের অভিজ্ঞতা সকলেরই আছে। মৌমাছি ও বোলতার হুল ফোটানোর জ্বালার অভিজ্ঞতাও হয়তো অনেকেরই থাকতে পারে। সাধারণভাবে এইগুলিই হলো কীট-পতংগের রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে আত্মরক্ষার নিদর্শন। অর্থাৎ মনে হতে পারে এবং সংজ্ঞা অনুযায়ীও বটে, প্রতিপক্ষের শরীরে অনুপ্রবিষ্ট রসায়নিক পদার্থ হলো "বিষ" (Venom)। কিন্তু কিছু কীট-বিষ আছে যা' শরীরের সংস্পর্শে এলেও জ্বালা, ফোস্‌কা বা ঘা-এর সৃষ্টি করে শত্রুর শরীরে স্থানীয় বিষক্রিয়া ঘটাতে পারে।

কীটের শরীরের নির্দিষ্ট গ্রন্থিতে এই বিষ সঞ্চিত থাকে। এই বিষ কীটের শারীরবৃত্তীয় পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট কোষের মধ্যে তৈরি হতে পারে (Endogenous) অথবা খাদ্য বা পরিবেশ থেকে গ্রহণ করে তা কেবল পৃথকীকরণ (Sequestration) পদ্ধতিতে গ্রন্থিতে সঞ্চিত হতে পারে (Exogenous)

আরও এক ধরণের রাসায়নিক পদার্থ আত্মরক্ষার কাজে ব্যবহৃত হয়। এই পদার্থগুলিও নির্দিষ্ট গ্রন্থির ক্ষরণ, তবে তা শত্রুর শরীরে বিষক্রিয়া না করে শত্রু বিতাড়নের কাজে ব্যবহৃত হয়। এদেরকে বলা যেতে পারে বিকর্ষ পদার্থ (Repallants)। এছাড়া প্রজাতির অন্যান্য সদস্যদের সাবধান করে দেবার জন্যও রাসায়নিক পদার্থের নিঃসরণ দেখা যায়। এগুলি সাধারণভাবে সতর্কীকরণ উদ্দীপক (Alarm pheromone) নামে পরিচিত।

আত্মরক্ষায় বিষের ব্যবহারেরও প্রকারভেদ দেখা যায় মৌমাছি এবং পিপীলিকা বর্গভুক্ত (Order Hymenoptera) বিভিন্ন প্রজাতি বা গোষ্ঠীতে। এই বর্গের পরজীবী কীটের স্ত্রী পূর্ণাঙ্গ স্ত্রী তাদের পোষকের শরীরে ডিম্বস্থাপনের জন্য প্রথমে ডিম্বস্থাপক (Ovipositor) দিয়ে পোষকের শরীরে বিষ প্রবেশ করিয়ে স্থায়ী বা সাময়িক-ভাবে তাকে অবশ করে দেয়। কিন্তু মৌমাছি বা বোলতার ক্ষেত্রে এই ডিম্বস্থাপক কেবল শত্রু শরীরে বিষ প্রয়োগের জন্যই ব্যবহৃত হয়। পিপীলিকার বিষ প্রয়োগে সহকারী হিসাবে কাজ করে তাদের সুগঠিত দাঁত। এই দাঁতের সাহায্যে শত্রুর শরীরে ক্ষত সৃষ্টি করে এই ক্ষতে বিষ ঢেলে দেয় শরীরের শেষ প্রান্তে অবস্থিত বিষ গ্রন্থি থেকে। শুঁয়োপোকার বিষক্রিয়ায় অনেক সময়ে ঐ শুঁয়ো বা রোমের বিশেষ গঠন প্রকৃতির জন্য হয়ে থাকে যেমন, চা গাছের শত্রুকীট (Pest) "লাল কাঁটা পোকা"র (Eterusia Spp.) রোমগুলি ভিতরে ফাঁপা কাঁটার মত। এর অগ্রভাগে থাকে সূক্ষ্ম ছিদ্র আর মূল থাকে শরীরের বিষ কোষে। বিপদের আভাসমাত্র কোষনিঃসৃত বিষ রোমের প্রান্তে শিশির বিন্দুর মত জমা হয়। শত্রুর শরীরে এই বিষসহ রোম প্রবেশ করে ভেঙে যায় ও বিষক্রিয়া প্রকাশ করে।

আরশুলা বা গন্ধীপোকার বিকর্ষ গন্ধ আমাদের খুবই পরিচিত। অনেক কীটে এই বিকর্ষ গন্ধ সততই নিঃসৃত হতে থাকে বহিঃত্বক কলা গ্রন্থি থেকে অথবা তা অনুরূপ নির্দিষ্ট গ্রন্থি থেকে প্রয়োজনবোধে নির্গত হয়। লেবু গাছের সবুজ লেদা পোকাকে (Citrus dog) ভালভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে বিপদাশংকায় তাদের মাথা ও ধড়ের সংযোগস্থল থেকে ঈষৎ গোলাপী রংয়ের Y-এর মত অংশ বেরিয়ে এসে কাঁপতে থাকে এবং তা থেকে মৃদু বিকর্ষ গন্ধ নির্গত হতে থাকে। দেহ-লসিকার (Hoemolymph) চাপে বা পেশী সংকোচনের সাহায্যে শরীরের ভিতর থেকে বিকর্ষ গ্রন্থির (Repugnatorial gland) উল্টিয়ে বেরিয়ে এসে বাতাসে বিকর্ষ পদার্থ মোচনের দৃষ্টান্ত অন্যান্য কীটেও দেখা যায়। উই ঢিবির কোনও জায়গায় ছিদ্র করে দিলে দেখা যাবে দলে দলে সৈনিক উই বেরিয়ে এসে ঐ ছিদ্রের চারিদিকে বাইরের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে পড়ে আর যেন তাদের প্রহরাধীনে কর্মী উইয়ের দল ছিদ্র মেরামতে কাজে তৎপর। এই সৈনিক উই পোকাগুলি কেবল প্রহরারতই থাকে না শত্রু বিতাড়নের উদ্দেশ্য তাদের কপাল গ্রন্থি (Fontanellar gland) থেকে গ্রন্থি-ছিদ্র পথে বাতাসে বিকর্ষ রস ছড়িয়ে দেয়। অনেক প্রজাতিতে বাতাসের সংস্পর্শে এসে এই রস ঘনীভূত হয়ে কপালে সুচের মত থেকে সুরক্ষার কাজে লাগে। বোমারু কীটের (Bombardier beetle) বিকর্ষ রস নিঃসরণ পদ্ধতিটি আরও আকর্ষণীয়। এই কীট (Brachinus Sp., Carabidae Coleoptera) আকারে ক্ষুদ্র হলেও পশ্চাদংশ ঘুরিয়ে

লক্ষ্যের দিকে বেশ সশব্দে বিকর্ষ রস নিক্ষেপ করে। গ্রন্থি নিঃসৃত এই রস (প্রধানতঃ হাইড্রোকুইনোন্ ও হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড) সঞ্চয় আধারে মিশ্রিত হবার পরবর্তী কৃত্তিকাস্তরণযুক্ত প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে ও সেখানে জারক রসের ক্রিয়ায় হঠাৎ অক্সিজেন, কুইনোন এবং জলে পরিণত হয়ে গ্রন্থিছিদ্র পথে সবেগে নির্গত হয়। এর ফলে এমন ধোঁয়ার সৃষ্টি হয় যা শত্রুকে বিতাড়িত করে।

উদ্দীপক বা ফেরোমোনের (Pheromone) ব্যবহারে আত্মরক্ষা মোটামটি সংঘীয় আত্মরক্ষার পর্যায়ে পড়ে। মৌমাছি বা বোলতা জাতীয় সামাজিক কীটের আবাসে বিপদের আভাস কোনও একটি কীটে অনুভূত হলে সে তৎক্ষণাৎ সতর্কীকরণ উদ্দীপক ক্ষরণ করে এবং এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে সংঘভুক্ত অন্যান্য কীট ঝাঁকে ঝাঁকে অগ্রগামীর অনুসরণ করে শত্রুর দিকে ধাবিত হয়। অনুরূপ ঘটনা জাবপোকার সংঘেও ঘটে তবে সেখানে উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়ায় সংঘের অন্য কীটগুলি গাছ থেকে ঝরে পড়ে বিপদ এড়ায়। পিপীলিকার আবাসে সংকেত-বাহী কীটের শরীর থেকে নিঃসৃত এইরূপ সংঘীকরণ উদ্দীপকের (Aggregating pheromone) প্রভাবে কীটগুলি বিপদের সময় সংঘবন্ধ হয়ে থাকে।

চার : আত্মরক্ষায় গাত্রবর্ণ

কীটের শরীরের বর্ণবৈচিত্র্য এবং তৎসহ আচরণগত অভিযোজন আত্মরক্ষার কাজে তাদের বিস্ময়করভাবে সাহায্য করে। পরিবেশ বা পটভূমির সাথে শরীরের রং মিলিয়ে রেখে বহু কীটই শত্রুর নজর বেশ কিছুটা এড়াতে সক্ষম হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গাছের কাণ্ডে আশ্রয় গ্রহণকারী মথকে খুঁজে পাওয়া বেশ কঠিন হয়, কারণ মথের শরীরের বা পাতার রংয়ের বৈচিত্র্য এমন হয় যে তা শুষ্ক বাকলের প্রায় অনুরূপ হয়ে থাকে। পাতাপোকা (Leaf insect) নামটি হয়েছে কীটটির পাখার সংগে গাছের পাতার রং ও শিরাবিন্যাসের মিলের জন্য। তেমনই হল কাঠি পোকা (Stick insect)। এদের শীর্ণ, লম্বাটে শরীর, পাতার শিরার মত পায়ের গড়ন ও শরীরের রং এমনই যে গাছে বসে থাকা এই কীটকে গাছের শুষ্ক শাখা বলে ভ্রম হয়। এমনই আর একটি উদাহরণ হলো চা-গাছের বিধ্বংসী কীট, লুপার ক্যাটারপিলার (Looper Caterpillar)। বিপদের আভাসে এই কীট শরীরের শেষ দু-জোড়া উপপদে নির্ভর করে গাছের ডালে আড়াআড়ি-ভাবে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মনে হয় যেন পাতা তোলার পর গাছের শাখার অংশ। পটভূমির সাথে নিজেদের মিলিয়ে রেখে আত্মগোপন করার ব্যাপারে অনেক কীটের ক্ষেত্রে বিস্ময়কর বিবর্তনীয় নিদর্শন দেখা যায়। ব্যাপারটি হলো পটভূমির পরিবর্তনে কীটের আকৃতি ও বর্ণগত রূপান্তর। অবশ্যই এই আত্মগোপন পদ্ধতি, তা আকৃতিগত সাদৃশ্য (Homomorphism), বর্ণসাদৃশ্য (Homochromism) বা বর্ণ ও আকৃতির উভয়বিধ সাদৃশ্য (Homotypism) যাই হোক না কেন আত্মরক্ষার পক্ষে কোনটিই সর্বার্থসাধক উপায় নয়। কারণ কীটভুকও প্রয়োজনের তাগিদে নিজের ইন্দ্রিয় যথেষ্ট তীক্ষ্ণ করে নেয়।

পটভূমির সাথে সাদৃশ্যকে আত্মরক্ষায় আরও ফলপ্রসূ পদ্ধতি করে তোলার জন্য আচরণগত পন্থাকে অনেক সময়ে সহযোগী হিসাবে ব্যবহার করতে দেখা যায়। সহসা বর্ণচ্ছটা প্রদর্শন এমনই একটি উপায়। শত্রু আক্রমণোদ্যত হলে কিছু মথ (Moth) 'চোখ দাগ' (Eye spot) চিত্রিত দ্বিতীয় ডানা জোড়া হঠাৎ উন্মোচিত করে। ফলে আক্রমণকারী ঐ দ্বিতীয় জোড়া ডানায় আকৃষ্ট হয়ে সেটিকে ধরে আর সেই সুযোগে ঐ ডানার ক্ষতি স্বীকার করে রক্ষা পাওয়া প্রধান অঙ্গ মাথা ও শরীর নিয়ে প্রথম জোড়া পাখার সাহায্যে মথটি উড়ে পালায়। অনেক সময়ে আবার 'চোখ দাগের' হঠাৎ আবির্ভাবে আক্রমণকারী হতভম্ব হয়ে বা ভীত হয়ে পালিয়ে যায়।

স্বীয় শ্রেণীর অন্য প্রজাতির অনকৃতি (Mimicry) কীট-পতঙ্গের আত্মরক্ষার অন্যতম উপায়। এই অনুকৃতি বর্ণগত, আকৃতিগত বা উভয়বিধ হতে পারে। একই বাস্তুতে বসবাসকারী দুই বা ততোধিক প্রজাতির মধ্যে অনুকৃত লক্ষ্য করা যায়। কীটভুকের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য অনুকৃতিকারী (Mimic) একই বাস্তুতে বসবাসকারী এমন একটি প্রজাতির (Model) অবয়ব ও বর্ণের অনুকরণ করে যা ঐ কীটভুকের নিকট খাদ্য হিসাবে অনভিপ্রেত। উই বা পিপীলিকার সংঘাবাসে (Colony) এমন অনেক কীটকে নির্বিঘ্নে বসবাস করতে দেখা যায় যারা একেবারে অন্য কীটবর্গভুক্ত এবং এদের অনুকৃতি এমনই সার্থক যে বিশেষভাবে নিরীক্ষণ ছাড়া তাদের চেনাই মুস্কিল হয়।

পাঁচ : সংঘ সুরক্ষা

সমাজবন্ধ কীটে এই সুরক্ষা ব্যবস্থা বেশ সংগঠিত। উই পোকার বিনষ্ট সংঘবাস শাবক ও রাণীর সুরক্ষায় সহায়তা করে তেমনই সৈনিক জাতির বিকটাকৃতির দন্তব্যাদন বা কপাল গ্রন্থি থেকে বিকর্ষ পদার্থ নিঃসরণ শত্রু বিতাড়নে ও নিরাপত্তা রক্ষায় ব্যবহৃত হয়।

পিপীলিকা, মৌমাছি ইত্যাদি সামাজিক কীটেও অনুরূপ আরক্ষা ব্যবস্থা দেখা যায়।

এইরূপ সংঘবদ্ধ সুরক্ষা ব্যবস্থা কিছু এককবাসী কীটেও দেখা যায়। কীড়া পর্যায়ের প্রাথমিক অবস্থায় হাইমেনপটেরা বর্গভুক্ত নিওডিপ্রিয়ন (Neodiprion Sp.) গণের কিছু প্রজাতি দলবদ্ধভাবে থাকে। এই সময়ে বিপদ বা আক্রমণের আভাস পাওয়া মাত্র দলভুক্ত সব কীটই বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি দ্বারা শত্রুকে বিতাড়নের চেষ্টা করে এবং লালা নিক্ষেপ করে তাকে পর্যুদস্ত করে ফেলে।

কীটের আত্মরক্ষার উপরিউক্ত বিবিধ ও বিচিত্র উপায়-গুলি জীবতত্ত্ব অধ্যয়নে একটি আকর্ষণীয় দিকই কেবল নয়। এদের অন্বেষণে যে তথ্যের উদ্ঘাটন হয় তার ব্যবহারিক প্রয়োগও মানুষের জীবনে অনেক। আত্মরক্ষার প্রয়োজনে ব্যবহৃত মৌমাছির বিষ সুস্থ মানুষের বেদনার কারণ বটে কিন্তু এরই নির্দিষ্ট মাত্রায় ব্যবহার ব্যথা-বেদনা উপশমেরও উপায়। অন্যদিকে ফসলের শত্রু কীটের আক্রমণ প্রতিরোধে তাদের আচরণগত দিকটির সম্যক জ্ঞান থাকা অপরিহার্য। বর্তমানকালের সমন্বিত কীট প্রতিরোধ ব্যবস্থায় (Integrated insect pest management) এর উপযোগিতা আরও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

যুগের ব্যবধান ও মূল্যবোধ

মায়া দেব*

আজকের অস্থিরতার যুগে অনেক সমস্যার কারণ স্বরূপ 'জেনারেশন গ্যাপ' কথাটি বারে বারে উচ্চারিত হতে শোনা যায়। দুটি যুগের নরনারীর ভাবধারা, চিন্তাধারা, পরস্পরের ভাবের আদান প্রদান, বোঝাপড়ার মধ্যে যে সমতার অভাব দেখা যায়—তাকেই 'জেনারেশন গ্যাপ নামে অভিহিত করা হয়। দুই যুগের মানুষের মধ্যে এই সমঝোতার অভাবের মূল কারণ তাদের চার-পাশের ব্যক্তি, বস্তু, সমাজ সংস্কার এবং পরিবেশ বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গির বা মূল্যবোধের ব্যবধান।

চলমান জগতের পরিবর্তনশীল পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে সুষ্ঠু জীবন-যাপনের বাঁচার তাগিদে (Survival) প্রতিটি জীবনের মধ্যেই তার জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে পরিবেশ অনুযায়ী আচার-আচরণের পরিবর্তন ঘটে চলে। মানব জীবনের ক্ষেত্রে একই ধারা প্রবহমান। বাইরের আচার আচরণের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কালের প্রবাহে ব্যক্তিমানসেও পরিবর্তন ঘটে সর্বদেশে-সর্বকালে।

ভারতে ক্রমবর্ধমান শিল্পের প্রসারে, রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনে, ভারত বিভাগের ফলে ছিন্নমূল জাতির জীবন-ধারায়, অর্থনীতিতে যে পালাবদল হয়েছে তার জন্য এবং অন্যান্য নানাকারণে। পুরানো যুগের ভাবধারা-সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে মূল্যবোধ ক্রমশঃ লয় পাচ্ছে। নতুন মূল্যবোধের সুচনা হচ্ছে।

যুগের ব্যবধানে মূল্যবোধের পরিবর্তন নিয়ে পাশ্চাত্যের পণ্ডিতগণ অনেক গবেষণা করেছেন। তাঁদের মতে, বিশেষভাবে বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী Allport ও Nunnally-র মতে মূল্যবোধ প্রতিন্যাসের (attitude) সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। প্রতিন্যাসের পার্থক্যের জন্যই দুই ব্যক্তি একই বিষয়, বস্তু বা একই ব্যক্তি সম্পর্কে বিভিন্ন মত পোষণ করেন। প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজ প্রতিন্যাস অনুযায়ী সমাজ, অর্থনীতি, নীতি, ধর্ম ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে নিজ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন। এবং ধীরে ধীরে প্রতিটি বিষয়ে মূল্যায়নের জন্যে তার মনে নিজস্ব মাপকাঠি গড়ে ওঠে। এই মাপকাঠির নিরিখেই সে তার নিজের সম্পর্কে বা চারপাশের লোকজন, ঘটনা ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে মূল্যায়ন করে। তার ভবিষ্যত কর্মপদ্ধতি নির্ভর করে ঐ মূল্যায়নের উপর। মূল্যবোধ নিয়ে গবেষণা করে এবং নানাবিজ্ঞানীর অভিমত বিচার-বিশ্লেষণ করে বিশিষ্ট সমাজ বিজ্ঞানী Rokeach উপরের তথ্যই সমর্থন করেছেন। কোনো ব্যক্তির প্রতিটি আচার-আচরণের মধ্য দিয়েই তার মূল্যবোধের পরিচয় মেলে।

মূল্যবোধ বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠী, সমাজ ও সংস্কৃতি ভেদে বিভিন্ন হয়। কিন্তু একই সমাজ বা গোষ্ঠীতে লালিত পালিত একই সংস্কৃতির অংশীদার সকল নর-নারীর মূল্যবোধ একই রকম নাও হতে পারে—যুগের ব্যবধানও পার্থক্যের কারণ হিসাবে গণ্য হয়।

* মনস্তত্ত্ব বিভাগ, বিজ্ঞান কলেজ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

যুগের ব্যবধান মূল্যবোধের কতখানি ব্যবধান রচনা করে এবং তার প্রকৃতিই বা কী সে সম্বন্ধে বিজ্ঞানভিত্তিক মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন। এই তথ্য নিরূপণের জন্য বর্তমান লেখিকা দুটি সমীক্ষা করেন। ঐ দুটি সমীক্ষার ফল বিশ্লেষণ ও তা থেকে উপনীত সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা করলে আজকের যুগের বাঙালী ছেলে-মেয়েদের মূল্যবোধের পরিবর্তন সম্বন্ধে কিছুটা আলোক-পাত করা যাবে।

মূল্যবোধকে তার গতিপ্রকৃতি ও বিষয়বস্তু অনুসারে কতকগুলি ভাগে (dimension) ভাগ করা হয়—যেমন, সামাজিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, ঐতিহ্যিক, নৈতিক, বিজ্ঞানভিত্তিক মূল্যবোধ ইত্যাদি। মূল্যবোধের পরিমাপ সম্ভব এবং এই পরিমাপ বিশেষভাবে তৈরি করা অভীক্ষার সাহায্যে করা হয়। ঐ রকম অভীক্ষার সাহায্যে বাঙালী মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজের মূল্যবোধের কতখানি বদল হয়েছে এবং এই পরিবর্তনের প্রকৃতি নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রথম সমীক্ষায় পঞ্চাশটি পরিবারের দু-শ'জন মধ্যবিত্ত বাঙালী প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়ে ও প্রৌঢ়প্রৌঢ়া অংশ নিয়েছিলেন। ঐ প্রতিটি পরিবারের 20 থেকে 25 বৎসর বয়সের একটি ছেলে ও একটি মেয়ে এবং তাদের পিতা মাতাকে পৃথক পৃথক ভাবে অভীক্ষা দেওয়া হয়। তাঁরা প্রত্যেকেই নির্দেশ অনুযায়ী অভীক্ষার প্রশ্নগুলির উত্তরনির্দেশ করেন। এঁদের প্রত্যেকেরই শিক্ষাগত মান ন্যূনতম স্নাতক পর্যায়ের। এরপর প্রত্যেকের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর বিচার করে দেখা হয়।

ফলাফলে দুটি কালের নরনারীর মূল্যবোধের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন উত্তরপত্র বিশ্লেষণে দেখা যায় যে আজকের যুগের ছেলেমেয়েরা পুরানো যুগের নরনারীর তুলনায় উদার প্রগতিশীল, অদৃষ্টের তুলনার বৈজ্ঞানিক যুক্তির দিকেই এদের ঝোঁক বেশি। এরা এদের পিতামাতার তুলনায় কম প্রভুত্বপরায়ণ (authoritarian)। তবে এই পার্থক্যগুলির মধ্যে কেবলমাত্র উদারতা ও প্রগতি-শীলতার ক্ষেত্রের পার্থক্যকেই রাশিবিজ্ঞানের বিচারে তাৎপর্যপূর্ণ (significant) বলা যায়।

এই ফলাফল কতটা গ্রহণযোগ্য সেটি সম্বন্ধে স্থির নিশ্চিত হওয়ার জন্য নতুন একটি নমুনা সমীক্ষা করা হয়। এবারে দুটি মূল্যবোধ সম্পর্কিত অভীক্ষা এক-শ' পরিবারের চার-শ' জনের উপর প্রয়োগ করা হয়। অভীক্ষা দুটির মধ্যে প্রথমটি পূর্বসমীক্ষায় ব্যবহৃত অভীক্ষা এবং অপরটি নীতিবোধ, ধর্ম, বিজ্ঞান ও ঐতিহ্য সংক্রান্ত পরিমাপ করবার জন্য বিশেষভাবে তৈরি করা হয়।

এবারও চার-শ' জনের মধ্যে 20 থেকে 25 বৎসর বয়সের প্রতি পরিবারের একটি প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে ও একটি মেয়ে এবং তাদের পিতামাতার (যাঁদের বয়স 45 বছর থেকে 60 বছরের মধ্যে) উপর সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। এঁরাও প্রত্যেকেই স্নাতক।

চার-শ' জনের প্রত্যেককে আলাদা ভাবে দুটি অভীক্ষা দেওয়া হয়। তারপর তাদের উত্তরগুলো পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করে দেখা গেল যে অভীক্ষার ফলাফলের অনুরূপ। অর্থাৎ ছেলেমেয়েরা তাদের পিতামাতার তুলনায় উদারপন্থী, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন ও কম প্রভুত্বপরায়ণ। এই ফলাফলের মধ্যে কেবলমাত্র উদারতার ক্ষেত্রেই দুই যুগের নরনারীর ব্যবধান তাৎপর্যপূর্ণ (significant)।

দ্বিতীয় অভীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনায় দেখা যায় যে বর্তমান যুগের ছেলেমেয়েদের তুলনায় তাদের মাতাপিতার ধর্মে বিশ্বাস, পুরানো দিনের রীতিনীতি (ঐতিহ্য) ও সামাজিক প্রথায় আস্থা অনেক বেশি। এবং এর প্রতিটি ক্ষেত্রের ফলাফলই তাৎপর্যপূর্ণ (significant)।

দুটি সমীক্ষার ফলাফল বিচারে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে বাঙালী মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজের মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটছে। আজকের যুগের প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়েরা চিরাচরিত সামাজিক রীতিনীতি, সামাজিক প্রথা, ধর্ম বিশ্বাস, ও গোড়ামির বিরোধী। তবে এই সমীক্ষার ফল আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের ইঙ্গিত বহন করে। নীতিবোধ সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তরগুলি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একই পরিবারের সদস্যরা প্রশ্নগুলির একই ধরণের উত্তর দিয়েছেন। তা থেকে বলা যায় নীতিবোধ সম্বন্ধে তাদের ধারণা মোটামুটি একই রকম। দুর্নীতি বা অর্থলোলুপতা কোনো যুগের বৈশিষ্ট্য নয়। যুগের প্রভাবের চাইতে নৈতিক মূল্যবোধে পারিবারিক প্রভাবই বেশি কার্যকরী। নৈতিকবোধ পরিবারের শিক্ষাদীক্ষা ও কৃষ্টি নির্ভর। আজকের যুগের ছেলেমেয়েদের নৈতিক অধঃপতনের পক্ষে কোনো তথ্য সমীক্ষা দুটি থেকে প্রমাণিত হয় নি, বরং মূল্যবোধের যে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছে তা থেকে বলা যায় যে ঐ পরিবর্তন প্রগতি ও সামাজিক অগ্রগতির সঙ্গে সামঞ্জস্য-পূর্ণ।

ভিটামিন—ভিটামিন

হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়*

"ডাক্তারবাবু বড় দুর্বল মনে হচ্ছে একটা ভাল ভিটামিন লিখে দিন ত।" কিম্বা "আমি রোজ একটা ক'রে "বিকোসেউল" (ভিটা = বি ও সি) খাই।" কিম্বা "যখন শরীরটা দুর্বল বোধ করি তখন 2/3 দিন একটা ক'রে বিকোসিউল খাই, ব্যস, শরীর ঠিক হয়ে যায়।" এ রকম আলাপ-আলোচনা যে কোন ডাক্তারের চেম্বারে বা পরস্পর আলোচনায় শোনা যায়।

এই আলোচনায় দেখা যাচ্ছে যে অনেক মানুষের ধারণা (শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে) যে ভিটামিনগুলি শক্তি বর্ধক এবং যাবতীয় রোগ প্রতিরোধক। এমন কি সুস্বাস্থ্যের আশায় চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়াই মুঠো মুঠো ভিটামিন খাওয়া হয়। ভাবখানা ভিটামিনের মত অমন উপকারী এবং নিরাপদ ওষুধ (এই হিসাবেই ব্যবহার করা হয়) আর বুঝি হয় না।

এখন বিবেচনা করা যাক ভিটামিন কি পদার্থ। প্রথমেই বলে রাখি ভিটামিন কোন ওষুধ নয়। এটা আমাদের খাদ্যের অন্যতম উপাদান মাত্র। অন্যান্য উপাদানের মত এটা আলাদা করে পাওয়া যায় না। অন্যান্য খাদ্যের মাধ্যমেই আমরা ভিটামিন সংগ্রহ করি। আমরা আবহমান কাল ধরে অন্যান্য খাদ্যের মাধ্যমে ভিটামিন খেয়ে আসছি। এর অস্তিত্ব কিন্তু জানা ছিল না। মাত্র এক-শ' বছর পুর্বে ওলন্দাজ অধ্যাপক আইকম্যান এই উপাদানের অস্তিত্বের বিষয় দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং 1912 খৃস্টাব্দে কেমব্রিজের অধ্যাপক স্যার এফ্ গাওল্যাণ্ড হপকিন্স এর প্রয়োজনীয়তা এবং উপকারিতা প্রমাণিত করেন। এর জন্য ঐ দুই বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কারও পান। অন্যান্য উপাদানের তুলনায় এর প্রয়োজনীয় পরিমাণ নিতান্ত নগণ্য। খাদ্যের অন্যান্য উপাদান যথা প্রোটিন, মেদ, শর্করার দৈনিক প্রয়োজন যথাক্রমে কমবেশী 100,100,400 গ্রা এবং ভিটা-এ 0·01 মি গ্রা. বি গোষ্ঠীর ভিটামিনগুলি 10 মাইক্রোগ্রাম থেকে 150 মিঃ গ্রা, সি 10-50 মিঃ গ্রা ডি ·05 মিঃ গ্রা ইত্যাদি। প্রোটিন, মেদ, শর্করা শরীরের বৃদ্ধি, কলার ক্ষয় পুরণ করাও বিপাক ক্রিয়ার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। ভিটামিনগুলি ঐ সব উপাদান আত্তীকরণ ও তাদের বিশেষ বিশেষ কাজে সহায়তা করে মাত্র। অন্যান্য উপাদানগুলি স্থূলভাবে শরীরের পুষ্টি রক্ষা করে ভিটামিনগুলি সুক্ষ্মভাবে নানা দিক দিয়ে স্বাস্থ্য ও সামাঞ্জস্য বিধান করে। শরীরের পুষ্টি ও শক্তির জন্য প্রথম উপাদানগুলি পর্যাপ্ত পরিমাণে না থাকলে অপর্যাপ্ত ভিটামিন সেবনের কোন সার্থকতা নেই। একটি উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটি বোঝান যেতে পারে। আমরা নানা রকম সব্জী, মাছ, মাংস ইত্যাদি দিয়ে ঝোল রাঁধি তখন ঐগুলি মশলা ফোড়ন দিয়ে সাঁতলে নিই। তবে ঝোল উপাদেয় হয়। ঐ ঝোল স্বাদ করতে ফোড়নের যতটুকু উপকারিতা শরীর সুস্থ রাখতে ভিটামিনের ততটুকু উপকারিতা। অপর পক্ষে পরিমাণের অতিরিক্ত যেমন ব্যঞ্জন বৃথা হয়ে যায় তেমনি মাত্রাতিরিক্ত ভিটামিন খেলে অপকার হবার সম্ভাবনা।

ভিটামিনের মাহাত্ম্যের কথা সকলেই জানেন। কোন্ কোন্ ভিটামিনের অভাবে কি কি রোগ বা উপসর্গ দেখা দেয় তাও অনেকেই জানেন এবং এ বিষয়ে বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়ে থাকে। কিন্তু ঐ যে বলা হল মাত্রাতিরিক্ত ভিটামিন খেলে সুস্বাস্থ্য ব্যাহত হয়, বর্তমানে সেই বিষয়েই আলোচনা করা হবে।

ভিটামিনের সংখ্যা অনেক। ইংরাজি বর্ণমালার নাম দিয়ে সেগুলির বেশীর ভাগকে সনাক্ত করা হয়।

ভি-এ অতি প্রয়োজনীয়। এটি বিশেষ করে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি, ত্বকের উপরিভাগের কোষ, চক্ষু প্রভৃতির সুস্থতার পক্ষে অপরিহার্য। চক্ষুগোলকের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির ক্ষতি, রাত্রীঅন্ধতা, ব্রন প্রভৃতি রোগে 'এ' প্রচুর ব্যবহার করা হয়। এইরূপ চিকিৎসার সময় অসতর্কতা বা অনবধানতা বশতঃ বহুদিন ধরে ভি-এ ব্যবহার করা হয়েছে এই রকম ক্ষেত্রে রোগীর বেশ কয়েকটি উপসর্গ দেখা দেয় যথা —মস্তিষ্কের আভ্যন্তরিক চাপ বৃদ্ধি হওয়া, মাথার যন্ত্রণা বমি। বিশুদ্ধ, কৃত্রিম 'এ' সেবনেই এ উপসর্গ হতে দেখা যায়। প্রাকৃতিক উৎস যেমন হ্যালিবটে লিভার অয়েল থেকে এ উপসর্গ হওয়ার সম্ভাবনা কম। কয়েকটি চর্মরোগে কৃত্রিম ভি-এ কয়েক বছর পর্যন্ত ক্রমাগত ব্যবহার হয়ে থাকে, সেসব রোগীর দেখা গেছে মাথার যন্ত্রণা, দৃষ্টিক্ষীণতা দৃষ্ট বস্তু দ্বিত্ব দেখা, যকৃতের স্ফীতি ইত্যাদি দেখা যায়। অন্তঃসত্তা মায়েরা 'এ' বেশী

* 25A, নিমতলা ঘাট স্ট্রীট, কলিকাতা-700006

মাত্রায় খেলে সন্তানে স্নায়ুতন্ত্রের এবং অন্যান্য জন্মগত ত্রুটি দেখা দিতে পারে।

ভি-বি গোষ্ঠী। কয়েকটি সমগোত্রীয় ভিটামিন এক সংগে ভি-বি গোষ্ঠী বলা হয়। এই গোষ্ঠীর বিভিন্ন ভটামিনের বিভিন্ন নাম আছে। প্রত্যেকটিরই শরীরে আলাদা উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা আছে। এদের অপকারিতা সম্বন্ধে আপাততঃ খুব বেশী তথ্য নাই। তবে রিবোফ্লেভিন সুপরারিনল অন্তঃস্রাবী গ্রন্থির কিছু ক্ষতি করে বলে অনুমান হয়। এ গোষ্ঠীর আর একটি ভিটামিন—ফোলিক এ্যাসিড—যা রক্তাল্পতা দূর করতে বিশেষ করে অন্তঃস্বত্তা নারীর, অত্যাবশ্যক। কিন্তু অত্যাধিক ফোলিক এ্যাসিড খেলে ক্যান্সার হবার সম্ভাবনা থাকে, বিশেষ বরে বয়স্কদের, এ রকম একটা ধারণা গড়ে উঠছে। সুতরাং সতর্ক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ভি-সি=শরীর ভি-সির অভাব হলে দাঁতের মাড়ির উপসর্গ দেখা দেয় এবং স্কাভি রোগের উৎপত্তি হয়। কিছুকাল পুর্বে একটি মত প্রচলিত হয়েছিল যে ভি-সি সেবন করলে সর্দির ও ইনফ্লুয়েঞ্জার মত রোগে বিশেষ উপকার হয় এবং এই ভিটামিন ঐ সব রেগের প্রতিষেধক হিসাবে ব্যবহার করা হত। খুব ব্যাপকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রমাণিত হয়েছে যে সর্দি জ্বরে ভিটা-সি-র উপকারিতা সন্দেহজনক অথবা হলেও তা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। প্রাপ্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে দৈনিক প্রয়োজনের 50 থেকে 100 গুণ বেশী সি খাওয়া হত। স্বভাবতই ধারণা ভিটামিন নিরাপদ এবং যত খাওয়া যায় ততই ভাল। এখন দেখা যাচ্ছে অত বেশী পরিমাণে সি-ভিটা খেলে প্রস্রাবে অকজ্যালিক লবণের আধিক্য হয় ফলে মূত্রাশয়ে পাথর হবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। এছাড়া অন্যান্য ধাতব লবণের বিপাকক্রিয়াও ব্যাহত হয়। কারো মতে গর্ভপাতও হতে পারে। আবার অত্যধিক পরিমাণে ভি-সি খেতে খেতে যদি হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে স্কাভির মত উপসর্গ দেখা দেয়। পুনরায় ভি-সি খেলে অবশ্য ঐ উপসর্গের উপশম হয়। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী লিনাস পলিং এর মতে ভি-সি মানুষের বুদ্ধিমত্তাও বাড়ায়। খুব উৎসাহজনক তথ্য নয় কী? তারপরেই তিনি বলছেন 5 থেকে 100 মিঃ গ্রাঃ পর্যন্ত খাওয়া যেতে পারে।

ভি-ডি—সুষম খাদ্য থেকে শরীরের প্রয়োজনে যথেষ্ট ভি-ডি পাওয়া যায়। আপাতঃ পর্যবেক্ষনে এর কোন অপকার ধরা পড়ে না। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে কৃত্রিম ভি বেশী পরিমাণে এবং দীর্ঘদিন ব্যবহার করলে (রিকেট প্রভৃতি রোগ) রক্তবাহী নলে ক্যালসিয়ামের স্তর পড়তে থাকে এবং শরীরে ক্যালসিয়াম ও ফসরাসের ভারসাম্য নষ্ট হয় তার ফলে ক্যালসিয়ামের অভাবজনিত রোগের প্রাদুর্ভাব হয়।

আজকাল আর একটি রীতির প্রচলন হয়েছে। শিশু জন্মাবার পর থেকেই তাকে ভিটামিন খাওয়ান শুরু হয়। ধারণা করা হয় শিশুকে ভিটামিন খাওয়ালে তার বাড়বাড়ন্ত হবে। কিন্তু শিশু বিশেষজ্ঞরা ধৈর্য সহকারে তথ্য সংগ্রহ করে দেখেছেন যে ভিটামিন খাওয়ান এবং না খাওয়ান শিশুদের মধ্যে পুষ্টির কোন তারতম্য দেখা যায় না। ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার পরিসংখানে অল্প তফাত দেখা যায়।

সুস্থ থাকতে হলে সুষম খাদ্যের প্রয়োজন। অতি উৎসাহে শরীরকে আরো সুস্থ করবার জন্য খাদ্যের উপাদানগুলি যদি অধিক মাত্রায় খাওয়া যায় তাহলে অবশ্যই বিপদ হবার সম্ভাবনা তা সে যে উপাদানই হোক। শর্করা, মেদ, প্রোটিন প্রভৃতি উপাদানের বিরূপ ফল প্রত্যক্ষ ভাবে অনুভূত হয়। কিন্তু ভিটামিনের মত উপাদান যার প্রয়োজন এত কম মাত্রায় এবং যার স্থূল ভাবে কোন ক্রিয়া থাকে না সে ক্ষেত্রে তার মাত্রাধিক্যের অপকার সহজে অনুভূত হয় না। কিন্তু এতৎ সত্ত্বেও অত্যধিক মাত্রা এবং দীর্ঘদিন যাবৎ ভিটামিন খেলে অপকার হতে পারে এটা বোঝা যাচ্ছে।

যতদিন যাচ্ছে ততই ভিটামিনের অপকারিতা সম্বন্ধে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। আমরা খাদ্য থেকে যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন সংগ্রহ করতে পারি। কিন্তু ভিটামিনের উপকারিতা ও গুণাগুণ শুনে অনেকেই ভিটামিন খাওয়ার জন্য প্রলুব্ধ হন। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই আছে কিন্তু অযথা নয়। ওষুধ প্রস্তুত কারকরা ঐ মনস্তত্ত্বের সুযোগ নিয়ে অধিক পরিমাণে ভিটামিনযুক্ত টেবলেট-ক্যাপসুল-সিরাপ ইত্যাদি বিক্রী করেন এবং আকর্ষক বিজ্ঞাপন দেন। এই সব অপকীর্তি রোধ করবার জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং তথ্য সংগ্রহের পর ওষুধ হিসাবে ব্যবহৃত ভিটামিনগুলির পরিমাণ ধার্য করে দিয়েছেন, এবং ঐ নির্দেশ অনুযায়ী ওষুধ তৈরি করতে নির্দেশ দিয়েছেন। ভারত সরকারও ঐ নির্দেশ মানতে বলেছেন।

La infano kuŝas. Ĝi ridas.

La domo staras. Ĝi estas alta.

kato বেড়াল
kontenta খুশী
sed কিন্তু

Du katoj ludas. Ili estas kontentj. Unu kato estas juna kaj forta. Ankaŭ la alia kato estas juna ; sed ĝi estas malforta.

kun সঙ্গে

La juna sed malforta kato ludas kun infano.

La infano estas kontenta ; ĝi ridas.

al কাছে, সঙ্গে,-কে

Broĝo venas al Ila. Li parolas al ŝi. (ইলার কাছে এসে ব্রজ ইলাকে কিছু বলে, ইলার সঙ্গে কথা বলে।) Ŝi iras al Ŝudip.

al-এ,-তে

La ĉambro estas granda , kvin katoj venas al la ĉambro (ঘরে, ঘরটাতে) kaj ludas en ĝi.

5-9। vilaĝo গ্রাম
urbo শহর
loĝas থাকে, বাস করে
kampo মাঠ, খেত
multa, multaj অনেক
arbo গাছ

Nimpur estas vilaĝo. En tiu vilaĝo loĝas malmultaj homoj. Ili laboras sur kampoj. En vilaĝoj estas multaj arboj. Infanoj ludas sur arboj kaj estas kontentaj.

Kalkato কলকাতা

Kalkato estas granda urbo. Multmultaj (অনেক অনেক) homoj loĝas tie. Eu Kaikato multaj homoj estas malkontentaj. Malmultaj homoj en Kalkatto (কলকাতার অল্প লোকই, কলকাতায় থাকেন এমন অল্প লোকই) estas kontenta. homoj

খুব ছেলেমানুষী ধরনের রাজনীতি হয়ে যাচ্ছে কি এর চেয়ে আরো সতর্ক আলোচনা করতে চাইলে ভাষাটা রপ্ত করা দরকার।

5-10। যা শিখেছেন তাতে আর কী বলতে পারেন দেখুন। কয়েকটা সংখ্যা শিখুন আরও—

dudek unu একুশ
dudek du বাইশ
dudek tri তেইশ
dudek kvar চব্বিশ
dudek kvin পঁচিশ
dudek ses ছাব্বিশ
dudek sep সাতাশ
dudek ok আঠাশ
dudek naŭ উনিশ
tridek তিরিশ

জীববিজ্ঞানের বাণিজিক প্রয়োগ

সমীরণ মহাপাত্র*

বিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যায়ে মানুষের জীবনে বিজ্ঞান এত বেশী সম্পৃক্ত ও অপরিহার্য যে ইনস্যাটের সাহায্যে যোগাযোগ, ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির দ্বারা যন্ত্রের কার্যক্ষমতা পরিমাপ, নক্ষত্রের ভবিষ্যত, গ্র্যাণ্ড ইউনিফায়েড ফিল্ড থিওরি, কণা বিজ্ঞান কিংবা পলিমার যৌগ উৎপাদন-এর মত জীববিদ্যায় আধুনিক গবেষণা ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে জেনেটিক ইঞ্জিনীয়ারিং যা বায়ো-টেকনোলজির শাখা এবং রোগ নিরাময়, সার উৎপাদন, ওষুধ উৎপাদন, খাদ্য উৎপাদন ইত্যাদি বিষয়ে জীববিদ্যার জ্ঞান প্রয়োগ করা হচ্ছে।

জীববিজ্ঞানের বাণিজ্যিক প্রয়োগ কোন নির্দিষ্ট বিষয় নয়। অ্যাকাডেমিক নীতি অনুযায়ী এই ধরণের বিজ্ঞান নেই। কিন্তু আমরা ব্যবহারিক জীববিজ্ঞান ও প্রায়োগিক জীববিজ্ঞানের কতকগুলি বিষয়কে এই ধরণের একটি বিষয় বলে গণ্য করতে পারি।

বস্তুতঃ বাণিজ্যিক ভূগোলের মত এই ধরণের একটি বিষয় সরাসরি শিক্ষাক্ষেত্রে গৃহীত না হলেও কম্যুনিটি সায়েন্সের মত এটিও ধারণায় ও চিন্তাজগতে গ্রহণীয়। অর্থাৎ অ্যাকাডেমিক বিষয় হিসাবে না হলেও সমাজে ও বিজ্ঞান জগতে এটি একটি চর্চা ও চিন্তার বিষয়।

জীববিজ্ঞানের বাণিজ্যিক বিষয়গুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো বায়োটেকনোলজি। এর মধ্যে আছে জেনেটিক ইঞ্জিনীয়ারিং। জেনেটিক ইঞ্জিনীয়ারিং-এর মধ্যে আছে জীন কোড পরিবর্তন করে রি-কম্বিন্যান্ট ডি.এন.এ তৈরি। এই রি-কম্বিন্যান্ট ডি.এন এ-র কাজ হলো বিভিন্ন এনজাইম তৈরি যা দিয়ে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য উৎপাদন যেমন, গ্লুকোজ, ল্যাক্টোজ, বিশেষ শর্করা ইত্যাদি তৈরি হয়। এছাড়া ফার্মেন্টেশন প্রক্রিয়ার হার বাড়ায় বিশেষ উৎসেচক উৎপাদনের মাধ্যমে অর্থাৎ বিভিন্ন ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া জেনেটিক গঠন পরিবর্তনের ফলে যে-সব উৎসেচক উৎপাদন করে তা বেশী ও দ্রুত ফার্মেন্টেশন ঘটায়। ফলে অ্যালকোহল উৎপাদন বাড়ে। প্রোটোপ্লাজমে ক্রোমোজমের মধ্যে জীন ছাড়াও প্লাসমিড নামক এক প্রকার কণা থাকে। এই প্লাসমিড কণাগুলির পরিবর্তন ঘটে যখন নতুন ডি.এন.এ স্থাপন করা হয় কোনো ক্রোমোজমে। অর্থাৎ নতুন 'জীন' তৈরি হয়। এগুলিই তখন নতুন এনজাইম উৎপাদনে, নতুন হরমোন উৎপাদনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। ওয়াটশন ও ক্রীক ডি.এন.এ-এর গঠন আবিষ্কার করেন 1953। এরপর 1966 খৃস্টাব্দে জিন কোড আবিস্কৃত হলো। 1973 এ প্রসমিড অ্যান্টিজেনিক প্রোটিন তৈরি করে রোগ প্রতিরোধক অ্যান্টিবডি তৈরি করিতে পারে অর্থাৎ এটি ভ্যাকসিনের মত কাজ করে জানা যায়। মৃত ভাইরাস প্রবেশ করিয়ে অ্যান্টিবডি উৎপাদনের তুলনায়, অনেক খরচে যে কোন ভাইরাসের ডি.এন.এ'র পরিবর্তন জিন-প্রযুক্তির মাধ্যমে ঘটিয়ে বিশেষ অ্যান্টিজেনিক প্রোটিন তৈরি করে দেহে প্রবেশ করালে সংশ্লিষ্ট রোগ প্রতিরোধক অ্যান্টিবডি তৈরি হবে। যা ভবিষ্যতে রোগ প্রতিরোধে সহায়ক হবে। বিভিন্ন হরমোন উৎপাদনেও জীন-প্রযুক্তি প্রয়োগ করা হয়েছে। যেমন আগে ইনসুলিনের বাণিজ্যিক উৎপাদন হতো প্রত্যক্ষভাবে জীবের অগ্নাশয় থেকে। বর্তমানে জেনেটিক পরিবর্তন করিয়ে অধিক পরিমাণ ইনসুলিন উৎপাদন করা হচ্ছে গবেষণাগারে।

জীন প্রযুক্তিতে অধিক উৎপাদনশীল শস্য ছাড়াও বাতাসের নাইট্রোজেন স্থিতিকরণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে বিভিন্ন শস্যের মধ্যে। এছাড়া জীবাণু জীন প্রযুক্তি ঘটিয়ে জীবাণুর দ্বারা অ্যামাইনো অ্যাসিড. ভিটামিন বি, সাধারণ চিনির চেয়ে 1·6 গুণ মিষ্টি সিরাপ, অ্যাসপারটাম মিষ্টি পদার্থ যা কেবল বিশেষ বিশেষ এনজাইমের দ্বারা সংশ্লেষণ সম্ভব এই এনজাইমগুলির উৎপাদন নির্ভর করে জীনের উপর।

জীববিজ্ঞানের বাণিজ্যিক অন্য একটি বিষয় হলো রোগ নিরাময়, বিশেষ করে ক্যানসার নিরাময়ের জন্য হাইব্রিডোমা কোষ উৎপাদন, সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ টিসু প্লাজমিনোজেন অ্যাকটিভেটর যা রক্তের জমাট বাঁধা অবস্থা থেকে রক্তকে তরল করে।

জঞ্জাল ও পয়ঃপ্রণালীর আবর্জনা থেকে তাপবিদ্যুৎ, তেল, প্রোটিন খাদ্য তৈরির পদ্ধতিগুলিও বায়োটেকনোলজির বিষয় হয়েছে। এছাড়া প্রোটিন খাদ্য তৈরিতে বায়োটেকনো-লজির গুরুত্ব বেড়েছে। আর আছে কচুরিপানা থেকে সার

* নিমতলা রঙ্গেশ্বর উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, পোঃ নিমতলা বাজার, নদীয়া

তৈরি, আখের ছিবড়ে থেকে ইথানল উৎপাদন প্রভৃতি।

জীববিজ্ঞানের বিষয় হিসাবে উদ্ভিদ ও প্রাণীর স্বাভাবিক রেচন পদার্থের ব্যবহারও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। উদ্ভিদের রেচন পদার্থগুলি হলো গাছের বাকল, মৃত পাতা, ট্যানিন বান তৈল, রজন প্রভৃতি। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো উপক্ষারগুলি যথা কুইনাইন, মরফিন এ দাতুরিন, পিক্রোটিন, স্ট্রিকনিন, অ্যাট্রোপিন ক্যাফিন প্রভৃতি ঔষধ।

অন্য ভেষজ উদ্ভিদগুলিও গুরুত্বপূর্ণ যেমন বাসক, কালমেঘ, তুলসী, সর্প-গন্ধা, অর্জুন অশোক, নিম প্রভৃতি গাছ গুল্ম উদ্ভিদ। এগুলি থেকে বেশী কার্যকরী ওষুধ উৎপাদন পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা চলছে।

হরমোন প্রয়োগে কৃষিকাজে আগাছা দমন, গাছের বৃদ্ধি, শাখা ও ফুল উৎপাদন, অঙ্কুরোদ্গম, একসঙ্গে ফলের পুষ্টি ঘটানো প্রভৃতি। এখন কৃত্রিম উপায়ে এইসব হরমোনের উৎপাদন চলছে।

এছাড়া পিসিকালচার, সেরিকালচার, পোলট্রি প্রভৃতিতে বাণিজ্যিক জীববিদ্যার প্রয়োগ চলছে।

ভবিষ্যতে এদেশে গবেষণায় ও অ্যাকাডেমিক বিষয় হিসাবে মেরিন বায়োলজির মত বাণিজ্যিক জীববিজ্ঞান একান্ত প্রয়োজন।

আবেদন

★ নিজের পরিবেশকে দূষণ থেকে মুক্ত রাখুন।

★ সকল প্রকার বন্যপ্রাণী ধ্বংস রোধ করুণ।

★ খরা, ভূমিক্ষয় ও পরিবেশ দূষণ রোধে বৃক্ষ রোপণ করুণ।

★ খাদ্য ও ঔষধে ভেজাল দেওয়ার বিরুদ্ধে দুর্বার জনমত গঠন করুণ।

★ সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান মানসিকতা গড়ে তুলুন।

কর্মসচিব

ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞানী-প্রযুক্তিবিদ্ সমাজের প্রতি প্রশ্ন

মিহির সিংহ

পণ্ডিত মানুষদের পত্রিকা এটা। বিশেষজ্ঞ হিসেবে যাঁরা অধ্যয়নরত, তাঁদের পত্রিকা এটা। যুগলকান্তি রায় ম'শায়ের আমন্ত্রণ পাবার পর থেকেই খুব ইচ্ছে করেছে এখানে লিখি। কিন্তু আমার মতন অর্ধশিক্ষিত লোকের পক্ষে কি সেটা একটা সোজা কাজ? আবার এক অন্য চিন্তাও আছে। ভাবি যে, বিভিন্ন ব্যাপারে স্বভাবসিদ্ধ অনধিকার চর্চা করতে গিয়ে নানা বিষয়ে পড়ি। কিছুটা বুঝি, অনেকটাই বুঝি না। যথাসাধ্য যদি আলোচনা করি তেমন কোনো একটা বিষয়ে, তাহলে হয়ত একটা উপরি লাভও হয়ে যেতে পারে। আমার অসম্পূর্ণ কিংবা কিছু কিছু ভুল ভ্রান্তি সম্পন্ন লেখাটা যদি কোনো যথার্থ বিশেষজ্ঞের চোখে পড়ে, এবং তিনি যদি তখন কষ্ট করে ব্যাপারটাকে পুরোপুরি বুঝিয়ে দেন তাহলে আমারই লাভ। হয়ত বা আরো অনেক পাঠকেরও লাভ।

প্রথম উদাহরণ হিসেবে, এযাত্রা আমার সংক্ষিপ্ত বিচার্য বা প্রশ্নটা হল : আমরা ভারতবাসীরা কি সাধারণ-ভাবে সত্যিই বিশ্বাস করি যে উন্নততর প্রযুক্তির মধ্যে দিয়ে আমাদের সমাজ ও আমাদের জীবনযাপনের মান উন্নত হবে? যদি তা করি তো, কোন্ কোন্ বিশেষ প্রযুক্তির উপরে আমাদের সমাজ আলাদা করে গুরুত্ব দিচ্ছে?

প্রশ্নটাকে কি বোঝাতে পারলাম? ইউ.এস.এ. টুডে-র জানুয়ারী 1983 সংখ্যায় একটা প্রবন্ধ বেরিয়েছিল, ডক্টর জর্জ এফ. মেখ্‌লিন্-এর লেখা। তিনি একেবারে সোজাসুজি বলে দিয়েছিলেন তিনটে কথা। প্রথমত, সেই অসামান্য পরিমাণে বিজ্ঞানের প্রসাদপুষ্ট সমাজেও বহুজনে মনে করেন যে বিজ্ঞান বা প্রযুক্তি তেমন কোনো আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ নয় যার দ্বারা সমাজের সুখ সমৃদ্ধি অবধারিত; কিন্তু তা হলেও সাধারণ ধারণা এইটা যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সত্যিই অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে।

দ্বিতীয়ত একটা হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। সাধারণের যে সব আশা, বাস্তববাদী বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ্‌রা জানেন যে সেই সব উজ্জ্বল আশা সব পূরণ করা খুব মুশকিল, রাতারাতি পূরণ করা তো কঠিন বটেই।

তৃতীয়ত যেটা করেছিলেন, সেটাও আমার কাছে খুব চমকপ্রদ লেগেছিল। বিনা দ্বিধায় সাতটা বিশেষ ক্ষেত্রের এক তালিকা দিয়েছিলেন, যে ক্ষেত্র কয়েকটাতে, বর্তমান দশকে ওদেশে দারুণ চর্চা হবে, অগ্রগতি হবে, এবং তার প্রভাবও সেই মাত্রায় বিস্তৃত হবে সর্বসাধারণের জীবনে।

আমার মূল প্রশ্নটাকে এইভাবে ভেঙ্গে ভেঙ্গে বলতে গেলে আমরা 'মধ্যবর্তী' তথা মধ্যবিত্তরা এবং আমাদেরও চাইতে 'নিম্নবর্তী' তথা দরিদ্রতররা কী ভাবে বা কী ভাবেন? তৃতীয়ত, ডক্টর মেখ্‌লিন (বা মেশ্‌লিন, সঠিক উচ্চারণ জানি না)-এর মতন সাতটা কি দশটা বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রের তালিকা কি ভারতবর্ষের বেলায় করা যায়, যে কয়টা ক্ষেত্র আমাদের সমাজ জীবনে অগ্রণী স্বরূপ হবে?

এই তৃতীয় উপ-প্রশ্নটার একটা অনুপূরক প্রশ্নও আমার মনে এই মুহূর্তে খোঁচা দিল। মার্কিন দেশের যে সংগঠন ও মানসিকতা, তার ফলে, সেখানে এমন বহু গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ আসে ব্যক্তিগত বা বেসরকারি কি আধা সরকারি নেতৃত্বে। আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতার আগে, এদেশেও অনেকটা সেই রকমই অবস্থা ছিল। স্বাধীনতার পর থেকে কিন্তু সেই ধারাটা পাল্টিয়ে গিয়েছে।

ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত নেতৃত্ব (ও পৃষ্ঠ-পোষকতা) এখন অনেকটাই সরকারি হাতে। প্রত্যক্ষ-ভাবেও, পরোক্ষভাবেও। এমন কি, শিক্ষা ও গবেষণা কিংবা উৎপাদন ও ব্যবসার ক্ষেত্রেও কথাটা খাটে। বিদেশ থেকে সহযোগিতা বা প্রযুক্তিগত 'ঋণ' করতে গেলেও সরকারি ভূমিকা খুব বড়।

সুতরাং, মার্কিন সমাজ কি তার সঙ্গে তুলনীয় অন্যান্য সমাজের চাইতে আমাদের পরিস্থিতিটা অনেকটা অন্য রকম। আমাদের দেশে, আমাদের সরকারি চিন্তাভাবনা

খুব স্পষ্ট খুব দৃঢ় না হলে, কোন্ দিকে জোর দেওয়া হবে—তা নিয়ে নানান গোঁজামিল, নানান রকম অফলপ্রসূ ব্যাপারের ভয় থাকতে বাধ্য বটেই। অফলপ্রসূতার চরম নিদর্শন যেমন দেখেছিলাম সেই বিরাট পরিধির সায়েন্স অ্যাণ্ড টেকনলজি প্ল্যান-এর বেলায়! বিশেষজ্ঞরা কী মনে করেন জানি না, কিন্তু আমার তখনই মনে হয়েছিল যে ও দিয়ে ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কোনো সুনির্দিষ্ট অর্থবহ দিকে ঠেলে দেওয়া যাবে না।

তার পরে, গত দেড় দশকে, এমন কতকগুলো দিকে আমরা এগিয়েছি যেগুলো আমাদের প্রতিরক্ষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। এটা ধরে নিলাম যে এগুলো খুব জরুরী। এর কিছু কিছু সুফল আনুষঙ্গিক হিসেবে ফলেছে সাধারণ জনজীবনেও। কাজেই, এই সরকারি নীতি নিয়ে বিতর্কের মধ্যে যেতে চাইছি না আপাতত। কেবল জানতে চাইছি যে, প্রথমত, প্রতিরক্ষামুখী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দিকেই এমন আপেক্ষিক ঝোঁক বর্জন করে কি জাপানের মতন দেশের গত তিন-চার দশকে সামাজিক মঙ্গল হল? না, অমঙ্গল হল?

দ্বিতীয়ত, আমাদের এমন আপেক্ষিক ঝোঁক ও আপেক্ষিক সফলতা সত্ত্বেও কি চীন দূরে থাকুক, পাকিস্তানের মতন দেশের সঙ্গেও নিরন্তর প্রতিযোগিতার চক্র থেকে নিস্কৃতি পেলাম?

তৃতীয়ত, প্রতিরক্ষামুখী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যাসাধনার নিতান্ত,*আনুষঙ্গিক ফললাভ গুলো ছাড়াও, প্রধানত সমাজ কল্যাণমুখী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চর্চার দরকারও কি অত্যন্ত জরুরী নয়?

চতুর্থত, এবং সর্বোপরি, বছর বিশ-পঁচিশ আগে, মোটামুটি জন কেনেডির আমলে যেমন মার্কিন দেশে জনচিত্তে রঙীন আশার উদ্বেলতা দেখা গিয়েছিল যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মধ্যে দিয়েই সেই বড়লোক সমাজটা বিরাট এক ধাপ উপরে উঠে যাবে, সেই গোছেরই এক রামধনু কি এই 1985 খৃস্টাব্দের ভারতবর্ষীয় মধ্যবর্তী সমাজে হঠাৎ জাগছে না? বা জাগানো হচ্ছে না?

মার্কিন সমাজের মত অতি সমৃদ্ধ সমাজেও সেই আশায় দ্রুত ভাটা পড়েছিল। তারা হয়ত সেটাকে সামলে নিতে পেরেছে যদিও অনেক দাম দিতে হয়েছে তার জন্যে। আমাদের মতন গরীব এবং মারাত্মক অবিচারগ্রস্ত সমাজে যদি এক কঠোর বাস্তবমুখী ও ফলপ্রসূ বৈজ্ঞানিক তথা প্রযুক্তিগত কর্মসূচী ও সরকারি দৃষ্টিভঙ্গি এই বেলা না তৈরি করতে পারা যায়, যার জোরে সার্বত্রিক মঙ্গল সত্যিই সম্ভব, তা হলে, ভয়ঙ্কর এক আশাভঙ্গের সঙ্কটে কি আমরা পড়ব না?

আমাদের বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ্ সমাজ কি ডক্টর মেথ্লিনের মতন সাতটা কি দশটা জরুরী উন্নতির ক্ষেত্র নির্দেশ করতে পারেন?—মৌল গবেষণার অপরিহার্য ক্ষেত্রগুলো ছাড়া?

ভূমিকম্প ঃ কোথায় হবে?

[একটি নতুন বিরাট বৈজ্ঞানিক সাফল্যকে সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় নথিতে আবিষ্কার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান আকাদেমির পত্র-সদস্য ইগর গুবিন আবিষ্কার করেছেন ভূমিকম্প হওয়ার সময়ানুবর্তিতা, যা এতকাল অজানা ছিল। তাঁর এই আবিষ্কারকে বলা হয় 'গুবিনের সাইস্মোটেক্টনিক্স সূত্র'। এই সূত্র থেকে প্রায় নিশ্চিতভাবেই বলা চলে, ভবিষ্যতে কোন্ স্থানে ভূমিকম্প হবে, তার আকার কতখানি, কম্পনের বল কতখানি, পুনরায় হওয়ার সম্ভাবনা কতখানি।]

ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দিতে পারাটা আধুনিক বিজ্ঞানের একটি মূল সমস্যা। পৃথিবীর যে-সব অংশে প্রায়শই ভূত্বকের নড়াচড়া ঘটে সেখানে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বাস করে। আর এইসব স্থানেও নির্মাণকারীরা গড়ে তুলছেন উঁচু থেকে আরো উঁচু নগর, উচ্চবেগসম্পন্ন যানবাহনের উপযোগী রাজপথ, বৃহৎ বৃহৎ কল-কারখানা ও পাওয়ার-স্টেশন। ভূমিকম্প সম্পর্কে যদি সময়োচিত ও সঠিক পূর্বাভাস দেওয়া হয় তাহলে সংগে সংগে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা চলে, মানুষের প্রাণনাশ বন্ধ হয়, আগুন ও অন্যান্য বিপর্যয়কর পরিণতি এড়ানো চলে। নির্মাণকারীদের পক্ষে এটা খুবই প্রয়োজনীয় বিষয়। ভূকম্পপ্রবণ এলাকায় যে-সব অট্টালিকা তৈরি হচ্ছে সেগুলো খুবই শক্তসমর্থ, তাদের কাঠামো অতি-জোরালো ভূ-কম্পন সহ্য করার উপযোগী।

কিন্তু এ-ধরনের নির্মাণকার্যের জন্য প্রচুর অতিরিক্ত ব্যয় করতে হয়। তাই, কোনো নির্মাণকার্য—ধরা যাক একটি হাইড্রো-পাওয়ার স্টেশন—শুরু করার আগে নির্মাণকার্যের ভারপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়াররা সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের একটি বিশেষ মানচিত্র পেতে চেষ্টা করেন, যাতে দেখানো থাকবে ভূমিকম্প হওয়ার সম্ভাব্য এলাকাগুলি শুধু নয়, তদুপরি ভূমিকম্পের প্রকৃতিও—অর্থাৎ, কম্পনের বল, কম্পন ছড়িয়ে পড়ার ব্যাপ্তি, কম্পন ঘটার সম্ভাবনা। এই সমস্ত তথ্য হাতে পাওয়ার পরে ইঞ্জিনিয়াররা স্থির করতে পারেন কী-ধরনের নির্মাণকার্য করতে হবে।

ভূ-কম্পনপ্রবণ অঞ্চলের মানচিত্রে ভৌগোলিক এলাকাগুলো ভূমিকম্পঘটিত বিপর্যয়ের মাত্রা অনুযায়ী আলাদা আলাদা ভাগে ভাগ করে দেখানো হয়। এ-ধরনের মানচিত্র বেশ কিছুকাল হল ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কিন্তু ভূ-কম্পনতত্ত্বে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা রয়েছে এবং তদনুযায়ী মানচিত্র রচনায় বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি। মোটামুটিভাবে সমস্ত মানচিত্রই রচনা করা হয় ভূ-কম্পনগত ভূতত্ত্বগত ও পরিসংখ্যানগত তথ্য এবং তৎসহ ইতিহাসে ও সাহিত্যে ছড়ানো উপকরণ বিশ্লেষণ করে। কিন্তু যে-ভাবেই মানচিত্র রচনা করা হোক, এ-ধরনের মানচিত্রে কিছু ভ্রান্তি থেকেই যায়। যেমন, ভূমিকম্প হওয়ার এলাকাকে অনেক বড়ো করে দেখানো হয় (কয়েক শত বর্গ-কিলোমিটার) এবং প্রায়শই ভূমিকম্পের তীব্রতাকে দেখানো হয় লঘু করে বা অনেকটা বাড়িয়ে।

সারা বিশ্বে সবচেয়ে বেশি ভমিকম্প হয়ে থাকে মধ্য-এশিয়ায়। এই এলাকায় গত কয়েক দশক ধরে যতো ভমিকম্প হয়েছে সেগুলো অনুশীলন করেছেন সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান আকাদেমির পত্র-সদস্য ইগর গুবিন এবং তার পরে সংখ্যার ভাষায় একটি নিয়মানুবর্তিতা সূত্রবদ্ধ করেছেন, যে নিয়মানুবর্তিতার কথা আগে জানা ছিল না। অনুরূপ ও অভিন্ন সক্রিয় ভূ-তাত্ত্বিক কাঠামোয় ঘটে থাকে একই ধরনের ভূমিকম্প। অনুরূপ হয়ে থাকে তাদের কেন্দ্র, তাদের শক্তি, তাদের ভূকম্পের বল, ও পুনরায় ঘটার সম্ভাবনা। এই আবিষ্কারের ফলে আরো সঠিকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে ভূমিকম্পের এলাকার আকার ও সীমানা এবং আরো সঠিকভাবে পূর্বাভাস দেওয়া গিয়েছে ভূকম্পনের বলের এবং আসন্ন বিপর্যয় সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়ের।

সম্প্রতিক কালে যে-তেইশটি বড়ো রকমের ভূমিকম্প ঘটে গিয়েছে সেগুলি সম্পর্কে গুবিন ও তাঁর সহকারীরা অত্যন্ত সঠিকভাবে পূর্বাভাস দিতে পেরেছেন। এই পূর্বাভাসে এমন সব স্থানেরও উল্লেখ ছিল যেখানে আগে কখনো এ-ধরনের বিপর্যয় ঘটেনি। অর্থাৎ, প্রকৃতি নিজেই বিজ্ঞানীর অনুমানের সপক্ষে প্রমাণ উপস্থিত করেছেন। এই অনুমান বিজ্ঞানী প্রথম করতে পেরেছিলেন 1940-এর দশকে যখন তিনি তুর্কমেনিয়া ও কিরগিজের পর্বতে আগেকার ভূমিকম্প দ্বারা সৃষ্ট ভত্বকের ফাটল অনুসন্ধান করেছিলেন, সংশ্লিষ্ট শিলার গড়ন পরীক্ষা করছিলেন এবং আগেকার কালের ভূমিকম্প সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করছিলেন।

গুবিনের সাইস্‌মোটেক্‌টনিক্‌স সূত্র যে কতখানি সঠিক তা ইতিমধ্যেই বহু দৃষ্টান্ত থেকে জানা গিয়েছে। ভারতে যখন বোম্বাইয়ের অদূরে একটি জল-বিদ্যুৎ উৎপাদনের কেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয় তখন পরামর্শদাতা হিসেবে গুবিন আমন্ত্রিত হন। প্রশ্নটি ছিল, নির্বাচিত স্থানে নির্মাণকার্যটি কিভাবে শুরু করা হবে—সাধারণত যে-ভাবে করা হয় সেইভাবে, না, ভূ-কম্পপ্রবণ এলাকায় যে-ভাবে করা হয় সেইভাবে ? স্থানটি ও তার পরিবেশ ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে বিজ্ঞানী বলেন, নির্দিষ্ট এলাকায় জোরালো একটি ভূমিকম্প ঘটার সম্ভাবনা আছে (যদিও এলাকায় আগে কখনো ভূমিকম্প হয়নি)। সোভিয়েত ভূ-পদার্থবিজ্ঞানীর মতামতকে যথোচিত মর্যাদা দেওয়া হয় এবং অপ্রত্যাশিতভাবে অতি শীঘ্রই তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত হয়। ভূতত্ত্বের ক্ষেত্রে দেখা যায়, যে-কোনো প্রক্রিয়া সংঘটিত হতে হাজার-হাজার বছর সময় লাগে। এক্ষেত্রে স্বীকার করতে হয়, বিজ্ঞানীর ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যুৎ-গতিতে সত্য প্রমাণিত হল। ভমিকম্পটি প্রকৃতই হয়েছিল কিন্তু আগে থেকে ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলে কোনো ক্ষতি হয়নি।

গুবিনের ভবিষ্যদ্বাণীর বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য হচ্ছে এই যে এর ফলে ভূকম্পবিদ্যার চিন্তা আমূল পরিবর্তিত হয়েছে এবং এই বিজ্ঞানে একটি নতুন ধারা শুরু হয়েছে। এবং এই বিজ্ঞানের মূল যে সমস্যা—ভূমিকম্প সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা—তার সমাধানের দিকে নির্ভরযোগ্য পথ পাওয়া গিয়েছে।

বাস্তব ক্ষেত্রে আরো একটি বিরাট ব্যাপার এই যে গুবিনের সাইস্‌মোটেক্‌টনিক্‌স সূত্র অনুযায়ী রচিত মানচিত্রের সাহায্যে নির্মাণ কার্যের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করা সম্ভব হচ্ছে।

[কলিকাতাস্থ সোভিয়েত দূতস্থানের বার্তাবিভাগ কর্তৃক প্রচারিত]

বিজ্ঞপ্তি

অমুল্যধন দেব স্মৃতি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

বিষয় : ভারতীয় কম্পিউটার

প্রবন্ধ পাঠাবার শেষ তারিখ : 31শে জানুয়ারী, 1986।

পুরস্কার : প্রথম—150 00 টাকা, দ্বিতীয় : 100·00 টাকা

বিঃ দ্রঃ (ক) প্রবন্ধ অনধিক 2000 শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

(খ) প্রবন্ধ ফুলস্ক্যাপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে লিখতে হবে।

(গ) প্রতযোগিতায় যোগদানকারীদের বয়স ঐ তারিখের মধ্যে অনধিক একুশ বছর হতে হবে।

(ঘ) প্রবন্ধ নির্বাচন বিষয়ে পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

(ঙ) প্রয়োজনবোধে প্রবন্ধগুলি পরিষদ কর্তৃক প্রকাশের অধিকার থাকবে।

প্রবন্ধ প্রেরণের ঠিকান : কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ,

পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-700006

(ফোন : 55-0660)

কর্মসচিব

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

টি. ভি. সার্ভিসিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিগণের আবেদন জমা নেওয়া হচ্ছে।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য পরিষদ কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট

কলিকাতা-700006

ফোন : 55-0660

কিশোর বিজ্ঞানীর আসর
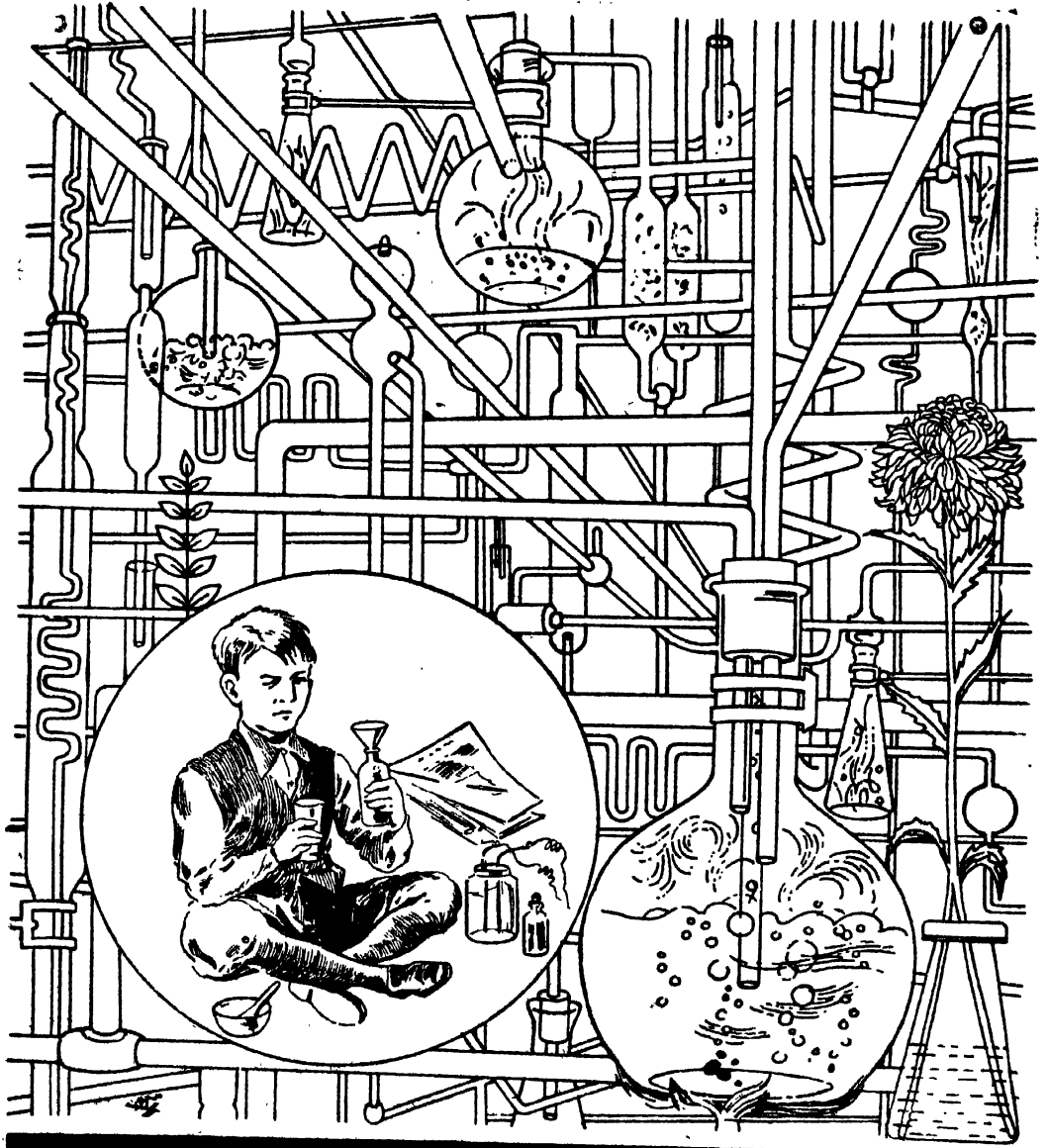
রেনে দেকার্তে

নন্দলাল মাইতি*

দর্শন-বিজ্ঞান-গণিতের ইতিহাস আলোচনায় দেকার্তেকে এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। প্রায় সাড়ে তিন শ' বছর আগে এই তিনটি বিষয়ে তাঁর যে অবদান, আজ অবশ্য সে-সবের সে-মূল্য ও গুরুত্ব নেই। কিন্তু মনন ও চিন্তার ক্ষেত্রে তাঁর দার্শনিক মতবাদ ও বিজ্ঞান-গণিতে তাঁর ধ্যান-ধারণা সভ্যতার অগ্রগতিতে যে নব নব অধ্যায়ের সূচনা করেছিল, তার মূল্য এ বিশিষ্টতা অস্বীকার করা যায় না। অবশ্য এ রকমই হয়। সমসাময়িক দেশ ও কালের গণ্ডী অতিক্রম করে ব্যাপকতা লাভ করতে পারে, এমন চিন্তা-ভাবনা, প্রত্যয়-প্রতীতি খুবই কম। অনেক সময় যা অভিনব বলে মনে হয় গভীর বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে দেখলে তা "নতুন বোতলে পুরোনো মদ" পরিবেশন ছাড়া আর কিছু নয় দেকার্তের অনেক মতের গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে, কিন্তু সত্য অন্বেষণে তাঁর পদ্ধতি ও গণিতে অবদান এখনো স্মরণযোগ্য। দেকার্তের প্রতিভার সার্বিক মূল্যায়ন এখানে সম্ভব নয়। তাঁর জীবনী আলোচনায় ঐ প্রসঙ্গ কিছু কিছু উল্লেখিত হবে মাত্র।

1596 খৃস্টাব্দে 31শে মার্চ দেকার্তে তুর‍্যাঁর (Touraine) লা আয়ে-তে (La-Haye) জন্মগ্রহণ করেন। বাবা ছিলেন আইনজীবী, পারিবারিক স্বচ্ছলতা ছিল। দেকার্তের বাবা দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করলেও পুত্রদের ওপর তাঁর সতর্ক দৃষ্টি ছিল। রেনে দেকার্তের ছেলেবেলায় শরীর-স্বাস্থ্য মোটেই ভাল ছিল না। সেজন্য বাড়ীতেই তাঁর লেখাপড়া শুরু হয়। আট বছর বয়সে তিনি লা ফ্লেশে-তে (La Fliche) জেস্যুইট স্কুলে ভর্তি হন। শারীরিক অসুস্থতার জন্য সকালবেলাটা বিছানাতে কাটাতেন, এবং খুশী মত সময়ে ক্লাসে যোগদান করতেন। বড় হয়েও তাঁর এই অভ্যাস কাটেনি, প্রায় সারা জীবন বজায় ছিল। ষোলো বছর বয়সে স্কুলের পড়া শেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন, এবং কুড়ি বছর বয়সে আইনে স্নাতক হয়ে প্যারিস গমন করেন। এখানে Mydorge ও Mersene-এর সঙ্গে পরিচিত হন এবং এক বছর ধরে গণিত অধ্যয়ন করেন।

বিচিত্র ও অদ্ভুত জীবন দেকার্তের। কখনো মদ্য পানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন, কখনো আবার জুয়া খেলার মত্ত হয়ে উঠেছেন, কখনো সৈন্যবিভাগে উচ্চপদ লাভ করে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনা করেছেন। এক এক সময় দুঃসাহসিকতা বশে জীবন সঙ্কটে পড়েছেন। আবার কখনো বা শান্ত ও নির্জন জীবন যাপনের জন্য ব্যগ্র হয়ে হয়েছেন। 1617 খৃস্টাব্দে সৈন্য বিভাগে যোগদান করে ন বছর ধরে সাফল্যের নানা নজির রেখেছেন। কিন্তু তাঁর এই বৈচিত্র্যময় জীবনে গণিতের প্রতি আসক্ত কমেনি, বরং বেড়েছে। সৈন্যবিভাগে যোগদান করার পর একটি গাণিতিক সমস্যা সমাধান করে গণিতে তাঁর ক্ষমতা ও সামর্থ সম্বন্ধে সচেতন হন।

সৈনিক জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে প্যারিসে ফিরে এসে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের কার্যকর ভূমিকায় অভিভূত হয়ে পড়েন, এবং আলোক সম্পর্কিত যন্ত্রপাতির তাত্ত্বিকতায় ও নির্মাণে নিযুক্ত থাকেন। মানসিক শান্তি ও মননশীল চিন্তাভাবনার অবসর ও সুযোগ লাভের জন্য দেকার্তে 1628 খৃস্টাব্দে হল্যাণ্ড গমন করেন। এখানে কাটে তাঁর দীর্ঘ কুড়ি বছর, আর তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থগুলি ওই সময় রচিত হয়। 1649 খৃস্টাব্দে সুইডেনের রানী ক্রিস্টিনার শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। সেখানেই 1650 খৃস্টাব্দে নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। সারা জীবন দেকার্তে সূর্যোদয়ের অনেক পরে শয্যা ত্যাগ করতেন, কিন্তু রাণী ক্রিস্টিনা পাঠ গ্রহণ করতেন সূর্যোদয়ের পূর্ব থেকেই কনকনে শীতের ঠাণ্ডা ঘরে। খুব সম্ভব দেকার্তে এই শীত ও ঠাণ্ডা সহ্য করতে না পেরে রোগাক্রান্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করেন।

পাস্কাল ও গ্যালেলিও দেকার্তের সমসাময়িক হলেও সপ্তদশ শতাব্দীতে তাঁর বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণ ও বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীতে তাঁর বাণী ও রচনা সমাদৃত হয়েছিল। কারণ, তাঁর রচনা ছিল স্পষ্ট, স্বচ্ছ, আর ভঙ্গীমাও ছিল আকর্ষণীয়। তা হলেও গীর্জা তাঁকে গ্রহণ করেনি। দেকার্তে বিশ্বাস করতেন তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কিন্তু বাইবেল বিজ্ঞানের উৎস নয় বলে দৃঢ় মত পোষণ করতেন তিনি বলতেন, মানুষ যা বুঝতে পারবে তা-ই গ্রহণ করবে। আর যুক্তির সাহায্যেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়, তার জন্য বাইবেলের প্রামাণিকতা বা সাক্ষ্যের প্রয়োজন নেই। এজন্য তাঁর গ্রন্থ গীর্জার নিষিদ্ধ তালিকায়

* ঠাকুরাণীচক, হুগলী 712613

(Index of Prohibited Books) অন্তর্ভুক্ত হয়। তাঁর লেখা প্রথম গ্রন্থ Rules for the Direction of the Mind 1628 খৃস্টাব্দে লেখা হলেও মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় গ্রন্থ System of the World 1634 খৃস্টাব্দে লেখা হলেও প্রকাশ করেন নি। কারণ, এতে গ্রহদের গতি কিভাবে বজায় থাকে এবং সূর্যের চারদিকে তাদের কক্ষপথ নির্ণীত হয় তার ব্যাখ্যা ছিল। খুব সম্ভব গ্যালেলিওর শাস্তির কথা ভেবে বইটি প্রকাশ করতে সাহস পাননি। 1637 খৃস্টাব্দে তাঁর বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থ The Method of Discourse প্রকাশিত হয়। সাহিত্য ও দর্শনের ক্লাসিক এই গ্রন্থে তিনটি বিখ্যাত পরিশিষ্ট বর্তমান ছিল,—La Giometrie, La Dioptrique ও Les Metiores গাণিতিক চিন্তা-ভাবনা, গবেষণার একমাত্র ফসল La Giometrie-তেই দেখা যায়। এখানেই রয়েছে বীজগণিত ও স্থানাঙ্ক জ্যামিতির ধারণা। অবশ্য চিঠিপত্রের মাধ্যমে তিনি অজস্র গাণিতিক ভাবনা ব্যক্ত করেছেন। দেকার্তের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি The Method of Discourse-কে কেন্দ্র করে। এই গ্রন্থটিই ক্রমে ক্রমে সুধী ও সাধারণ পাঠকের হৃদয় জয় করে চলল। 1644 খৃস্টাব্দে Principia Philosophiae প্রকাশিত। এতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান—বিশেষত গতিসূত্র এবং ঘূর্ণীবার্তা তত্ত্ব* (Theory of Vortex) আলোচিত হয়েছে। দেকার্তে সঙ্গীত বিষয়েও গ্রন্থ রচনা করেন।

এতক্ষণ আমরা দেকার্তের জীবন ও তাঁর লিখিত বইগুলি সম্বন্ধে দু-চার কথা বললাম। এবার তাঁর চিন্তাভাবনার বিবর্তন রেখাটি অনুসরণ করে গণিতে তাঁর কীর্তির কটিমাত্র উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করব।

দেকার্তে গণিতিক চিন্তায় দার্শনিক, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ছাত্র ও প্রয়োগবিদ—এই তিন ধরনের চিন্তাধারায় এমনিই একাত্মতা যে এদের পৃথক করে বিচ্ছিন্নভাবে আলোচনা করা যায় না। চিন্তাবিদদের মনে সমাজ জীবনের প্রতিফলন সাধারণের চেয়ে অধিক পরিমাণে দেখা যায়। দেকার্তের সময় প্রোটেসটাণ্ট-ক্যাথলিক দণ্ডের চরম মুহূর্ত বলা যায়, এবং এ সময় বিজ্ঞানের এমন সব সূত্রাদি আবিষ্কৃত হচ্ছিল যাতে চিরাচরিত ধর্মীয় ভাবনার মূলে কুঠারাঘাত করছিল। একদিকে ধর্মীয় আন্দোলন ও অপর দিকে বিজ্ঞানের সুতীক্ষ্ণ যুক্তি ও পরীক্ষায় শাস্ত্রীয় বচনের অসারতা প্রতিপন্ন হতে থাকায় দেকার্তের মনে প্রচলিত জ্ঞান ও সত্যের প্রতি সন্দেহ ও অবিশ্বাস দেখা দেয়। স্কুলের শিক্ষা থেকে তাঁর লাভ হলো যে, তিনি আরো সংশয়ান্বিত হয়ে উঠলেন। সর্বজনবিদিত, কেবল সংশয় থেকে লাভ হয় না—প্রত্যাখ্যান থেকেও সত্য জানা যায় না,—জটিলতার সমাধান হয় না। সুতরাং তাঁর শুরু প্রশ্ন : আমরা কিভাবে কোন কিছু জানি ?

তার মনে হলো ন্যায় (Logic) নিজে বন্ধ্যা। আমরা যেটুকু জানি তা জানাতে প্রচার করতে ন্যায় নিঃসন্দেহে কার্যকর কিন্তু তা মৌল সত্য উদঘাটনে অক্ষম। তা হলে কিভাবে কোথায় তা পাওয়া যাবে ? তাঁর মতে দর্শন সব বিষয়ের সত্যের প্রতিভাষ নিয়ে আলোচনা করে মাত্র। সুতরাং অন্বেষণ—সর্বক্ষেত্রে সত্য প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি নিরূপণে অন্বেষণ চলতে লাগল তাঁর মনোজগতে। দেকার্তের কথায় তিনি এর সাক্ষাৎ পান স্বপ্নে, 1619 খৃস্টাব্দের 10ই নভেম্বর। এই পদ্ধতি গাণিতিক পদ্ধতি গণিতের প্রমাণ স্বতঃসিদ্ধভিত্তিক, তার প্রমাণের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই বলে দেকার্তের কাছে গণিতের আবেদন। তা ছাড়া গণিতে আছে যথার্থ নির্ণয়ের উপায়, এবং ফলপ্রসূভাবে প্রতিষ্ঠিতও করা যায় এবং আরো বড় কথা এই যে, গণিত তার বিষয়বস্তু অতিক্রম করতে পারে। যে-সব বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ক্রম এবং পরিমাপ বিবেচিত হয়, তার সঙ্গে গণিতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। বিস্ময়ের কথা, এই পরিমাপ সংখ্যা, আকার নক্ষত্র, শব্দ বা অন্য যে কোন বস্তু সম্পর্কিত হোক না কেন, তাতে কিছু আসে যায় না। সত্য নির্ণয়ের পদ্ধতি পাওয়া গেল বটে, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানার্জন কিভাবে সম্ভব ?

সব সংশয় নিরসন করে মনের কাছে স্পষ্ট ও অবধারিত বলে যা মনে হয় না তাকে সত্য বলে গ্রহণ করা যায় না। বৃহৎ জটিলতাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমস্যায় বিভাজিত করে সহজ ও সরল থেকে জটিলতার দিকে অগ্রসর হতে হবে। শেষে যৌক্তিক সোপানসমূহ এমনভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে যাতে কোন কিছু উপেক্ষিত বা বর্জিত না হয়। দেকার্তের ধারণা, এই পদ্ধতির মধ্য দিয়ে দর্শন-পদার্থবিদ্যা-শরীরবিদ্যা-জ্যোতির্বিদ্যা-গণিত ও অন্যান্যক্ষেত্রে সমস্যা সমাধান সম্ভব হবে। তাঁর এই ধারণা ও আকাঙ্খা ফলপ্রসূ না হলেও দর্শন-বিজ্ঞান-গণিতে তার অবদান উল্লেখযোগ্য। দেকার্তে আধুনিক দর্শনের উদ্বোধন ঘটান। তাঁর জ্ঞানতত্ত্বের মূল কথা হচ্ছে মন মূল, স্পষ্ট ও অবধারিত সত্য গ্রহণ করে এবং তা থেকে অবরোহী পদ্ধতিতে পারম্পর্য নির্ণয় করা যায়। দর্শনে স্বতঃসিদ্ধ গ্রহণ করেননি তিনি। তাঁর চারটি সিদ্ধান্ত সবিশেষ লক্ষণীয় আমি চিন্তা করি, সুতরাং আমি আছি ; প্রত্যেক

* এই মতবাদ অনুসারে 'মহাকালে ঘূর্ণমান এক ঈথার কুণ্ডলী থেকে ধীরে ধীরে সূর্য, গ্রহ, উপগ্রহ প্রভৃতি জন্ম হয়েছে'।

ঘটনার কারণ আছে ; কার্য কারণের চেয়ে বড় হতে পারে না এবং পরিপূর্ণতা (perfection), দেশ (space), কাল (time) এবং গতি (motion) মনের অন্তঃধর্ম।

প্রকৃতি বিষয়ে দেকার্তের ধারণা ও চিন্তাভাবনা সমসাময়িক চিন্তাবিদদের থেকে পৃথক নয়, বরং পরিপূরক। তিনি বহু বছর ধরে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন—বলবিদ্যা, উদস্থিতিবিদ্যা, আলোকবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞানের ওপর গবেষণাও করেছিলেন। তিনি Philosophy of Mechanics-এর প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ধারণা করতেন, এক আত্মা ছাড়া সব প্রাকৃতিক ঘটনা এমন কি মানুষের শরীর পর্যন্ত বলবিদ্যার নিয়ম মেনে চলে। প্রতিসরণের সূত্র আবিষ্কারেও তাঁর বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল বলে মনে করা হয়—অবশ্য বিতর্কিত। দর্শনের ক্ষেত্রে তাঁর চিন্তাভাবনা ও সিদ্ধান্ত বিপ্লবাত্মক, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এর অনুসরণ দেখা যায়।

প্রযুক্তিবিজ্ঞানের প্রতি দেকার্তের গভীর আকর্ষণ। যে-বিজ্ঞান ফলপ্রসূ নয়—যাতে মানুষের মঙ্গল ও কল্যাণ নেই তার প্রতি দেকার্তে আগ্রহী নন। গ্রীকদের সঙ্গে এখানেই তাঁর বড় রকমের প্রভেদ। নিজে সৃজনশীল দার্শনিক হয়ে তাত্ত্বিক বিজ্ঞানে কেন আকর্ষণ বোধ করেননি—এটা বিস্ময়কর বলতে হবে। এমন কি, গণিত তাঁর কাছে কেবলমাত্র মননশীল বিষয় নয়। এর গঠনমূলক ও উপযোগিতামলক দিকটির প্রতি তাঁর অধিক আগ্রহ ছিল। তিনি গানিতিক সৌন্দর্যের তেমন মূল্য দিতেন না। বিশুদ্ধ গণিতও তাঁর কাছে মূল্যবান বলে বিবেচিত হতো না। তিনি বলতেন, যে গাণিতিক পদ্ধতি কেবল গণিতেই প্রযোজ্য তা মূল্যহীন। কারণ, এতে প্রকৃতি-পাঠ হয় না। বিশুদ্ধ গণিতজ্ঞদের প্রতি তাঁর উক্তি : "Those who cultivate mathematics for its own sake are idle searchers given to a vain play of Spirt".*

পদ্ধতির (The Method) গুরুত্ব বিষয় অবহিত হয়ে এবং বিজ্ঞানে গণিতের ফলপ্রসূ প্রয়োগ করা যেতে পারে, এরূপ ধারণার বশবর্তী হয়ে দেকার্তে জ্যামিতিতে পদ্ধতি প্রয়োগে অগ্রসর হলেন। কিন্তু সমস্যায় পড়লেন, এবং ইউক্লিডীয় জ্যামিতির তীব্র সমালোচনা করলেন। তিনি বললেন, ইউক্লিডীয় জ্যামিতির প্রত্যেকটি প্রমাণ নূতন ও বুদ্ধি কৌশলে পূর্ণ। এই জ্যামিতি চিত্রে আবদ্ধ, বিমূর্ত আর বুঝতে হলে কল্পনাশক্তি অবসাদগ্রস্ত হয়। তাঁর সময়ে প্রচলিত বীজগণিতের প্রতি সমালোচনা করে বললেন, বিষয়টি নিয়ম সূত্র কবলিত ; এতে মানসিক উন্নতি হওয়া দূরের কথা রহস্যময়তা ও বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পায়। দেকার্তে তাঁর পদ্ধতিতে উভয়কে বর্জন করলেন না, উভয়ে মধ্যে যা শ্রেষ্ঠ বলে তাঁর মনে হলো তা-ই গ্রহণ করলেন এবং একের সাহায্যে অপরের ত্রুটি সংশোধন করতে লাগলেন। বাস্তবিকপক্ষে, দেকার্তের জ্যামিতিতে বীজগণিতের প্রয়োগ সংগঠন করলেন। আমরা আগেই বলছি দেকার্তের সামগ্রিক জীবন ও তাঁর কীর্তি-গাথার সম্পূর্ণ বিবরণ আমাদের এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে দেওয়া সম্ভব নয়। এখানে তাঁর কীর্তির একটিমাত্র উদাহরণ তুলে ধরা হলো।

ধরা যাক, কোন জ্যামিতিক সমস্যায় অজ্ঞাত x দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে হবে, এবং দেখা গেল, x বীজগাণিতিকভাবে $x^2 = ax + b^2$ এই সমীকরণকে সিদ্ধ করে, যেখানে a ও b জ্ঞাত দৈর্ঘ্য।

এখন, বীজগণিত থেকে আমরা জানি,

$$x = \frac{a}{2} + \sqrt{\frac{a^2}{4} + b^2}$$

দেকার্তে x অঙ্কন-প্রণালী নিম্নরূপ দিয়েছেন :
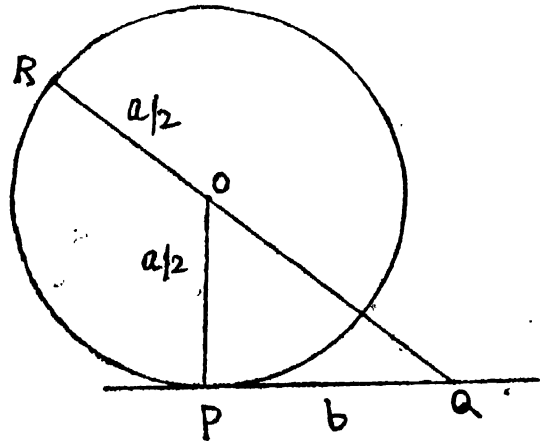
OPQ সমকোণী ত্রিভুজ যার PQ = b এবং OP = a/2 ; OQ-কে R পর্যন্ত বর্ধিত করা হলো। তা হলে, OR = a/2 ; অতএব, X-এর সমাধান QR-দৈর্ঘ্য।

QR যে সঠিক দৈর্ঘ্য তার প্রমাণ দেকার্তে দেননি। অবশ্য বহু ক্ষেত্রেই তিনি অঙ্কন ও প্রমাণ ইঙ্গিত করেছেন মাত্র, কিন্তু সম্পূর্ণ প্রমাণ বুদ্ধিমানদের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। যাই হোক, সমস্যাটির প্রমাণ অতি সহজেই করা যায়।

$$x = QR = RO + OQ = a/2 + \sqrt{\frac{a^2}{4} + b^2}$$

* Kline, M-Mathematical Thought from Ancient to Modern Times. p-308

সর্বজনবিদিত দেকার্তে স্থানাঙ্ক জ্যামিতির উদ্ভাবক। কিন্তু এই জ্যামিতির মূল ধারণা যে সমীকরণের সাহায্যে নানা ধরণের রেখার ধর্মাবলী আলোচনা, তা গ্রহণ করতে গণিতজ্ঞদের অনেক বিলম্ব হয়েছে। অবশ্য সে-জন্য দেকার্তেও কম দায়ী নন। কারণ, সমীকরণের সাহায্যে জ্যামিতিক অঙ্কনের সমস্যার প্রতিই তিনি অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তা ছাড়া ফের্মার Ad Locos তখনো প্রকাশিত হয়নি। লাইবনিৎস ভিয়েতা, এমন কি নিউটন পর্যন্ত এ-বিষয়ে অনুকূল মত প্রকাশ করেননি। তবে বিষয়টির গুরুত্ব সম্পর্কে দেকার্তের দূরদর্শিতার অভাব ছিল না। তিনি La Geometrie-র ভূমিকায় বলেছেন ঃ ....What I have given in the second book on the nature and properties of curved lines, and the method of examining them, is, it seems to me, as far beyond the treatment of ordininary geometry.....".

ব্ল্যাক বক্স

সত্যরঞ্জন পাণ্ডা*

বিমান যখন আকাশে ওড়ে তখন কোন কোন চলন্ত বিমানের যন্ত্রপাতী, বিভিন্ন নির্দেশক যন্ত্র, এদের গতিবেগ ইত্যাদিতে বিভিন্ন রকম গণ্ডগোল দেখা দিতে পারে। অনেক সময় চালকের সতর্ক দৃষ্টি এবং দক্ষতার ফলে বিমান রক্ষা পায় দুর্ঘটনার হাত থেকে। কোন কোন ক্ষেত্রে বিমান চালকের শত চেষ্টা সত্ত্বেও বিমানকে দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয় না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন স্থানে বিমান দুর্ঘটনার খবরাখবর অনেকের জানা আছে। আমাদের দেশে এই দুর্ঘটনার সংখ্যাও খুব কম নয়। কিন্তু ভারতে গত 19/20 বছরে যে তিনটি বিমান দুর্ঘটনার কথা উল্লেখ করা হচ্ছে তার কারণ যাই হোক না কেন তাতে আমাদের দু'এক জন বিজ্ঞানীর মৃত্যু ঘটে। এইগুলি হল ঃ

(1) 1966 খৃস্টাব্দে 24শে জানুয়ারী আমাদের এয়ার ইণ্ডিয়ার—"বোয়িং 707" বিমান কাঞ্চনজঙ্ঘা ফ্রান্সের মঁ ব্লাঁ পাহাড়ে ভেঙ্গে পড়ে এবং তাতে মোট 117 জন যাত্রীর মৃত্যু হয়। এই মৃত যাত্রীদের মধ্যে ছিলেন ভারতের বিশিষ্ট পরমাণুবিজ্ঞানী ডঃ হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা।

(2) 1982 খৃস্টাব্দের 22শে জুন প্রবল বৃষ্টি ঝড়ের জন্য এয়ার ইণ্ডিয়ার বোয়িং 707 বিমান 'গৌরিশঙ্কর" বোম্বাই বিমান বন্দরে নামবার পরেই পাশের দেয়ালে লেগে ভেঙ্গে যায়, এতে 111 জন যাত্রীর মধ্যে 17 জনের মৃত্যু ঘটে। এতে যাত্রীদের মধ্যে তখন ছিলেন ভাবা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রের অধিকর্তা ডঃ রাজা রামান্না। তিনি কিন্তু প্রাণে বেঁচে যান।

(3) এই বছর অর্থাৎ 1985 খৃস্টাব্দের 23শে জুন টরেন্টো থেকে বোম্বাই আসার পথে এয়ার ইণ্ডিয়ার যাত্রীবাহী "747 জাম্বো জেট" বিমান কণিষ্ক আয়ারল্যাণ্ডের দক্ষিণ পশ্চিম উপকূল থেকে প্রায় 155-56 মাইল দূরে উত্তর আতলান্তিক মহাসাগরে ভেঙ্গে পড়ে। এতে মোট 22 জন বিমান কর্মীসহ মোট 329 জনের মৃত্যু ঘটে। এর মধ্যে ছিলেন প্রখ্যাত ভারতীয় বিজ্ঞানী এন নায়ুদামা।

কিন্তু যে সব দুর্ঘটনার কোন বিমানের কর্মী বা যাত্রী বেঁচে থাকে না তাদের ক্ষেত্রে বিমান দুর্ঘটনার কারণ কি, বা দায়ী কে, না কি এর যান্ত্রিক ত্রুটি, না কোন অন্তর্ঘাত ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন এসে যায়। এ সব বিষয়ের সব সঠিক উত্তর দিতে পারে একটি বিশেষ ধরণের যন্ত্র। তাকে বলা হয় "ব্ল্যাক বক্স"। এটা সব বিমানে থাকেনা। বিভিন্ন দেশের অসামরিক বিমান পরিবহণ সংস্থাগুলি এক্ষেত্রে যে আন্তর্জাতিক বিমান পরিবহণ সংগঠন গড়েছেন তাদের নিয়ম অনুসারে নিজ ওজনের যে সমস্ত বিমান 5700 কেজির বেশি ওজন বহন করবে তাতে এই যন্ত্রটি রাখতে হবে। সেই নিয়ম অনুসারে জাম্বো জেট বিমান "কণিষ্কের" মধ্যেও এই ব্ল্যাকে বক্স বসান ছিল। এখানে ব্ল্যাক বক্স নিয়ে কিছু আলোচনা করা হল।

ব্ল্যাক বক্স বিমানের কোথায় থাকে

সমীক্ষায় দেখা গেছে যে প্রায়ই অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুর্ঘটনার ফলে বিমানের পিছনদিকের অংশ কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দুর্ঘটনা যত বড় হোক না কেন এতে বিমানের লেজের দিকে কোন বেশী চোট সহজে লাগে না বলে ব্যাক বক্স যন্ত্রটি বিমানের লেজের দিকে বিশেষ

* 1, ভোলা ময়রা লেন, কলিকাতা-700004

ভাবে বসান থাকে।

ব্ল্যাক বক্সের বিভিন্ন অংশ :

ককপিট ভয়েস রেকর্ডার, ডিজিটাল ফ্লাইট ডাটা রেকর্ডার এবং ফ্লাইট ডাটা রেকর্ডার নামে তিনটি যন্ত্রকে পৃথক ভাবে ব্ল্যাক বক্স হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। বিমান দুর্ঘটনায় যে ক্ষয় ক্ষতি হয় তার তুলনা করা যায় না। সেই ক্ষতি কি ভাবে হয় বা কেন হয় তার সন্ধান পাওয়া যায় এই ব্ল্যাক বক্স থেকে। এই সব বিষয় নির্ণয়ই এই যন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

(1) ককপিট ভয়েস রেকর্ডার ঃ এটি একটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র। শুধু তাই নয় এর অপর দুটি ধর্ম হল —অত্যন্তগ্রহণ ক্ষম এবং সংবেদনশীল টেপ রেকর্ডার। খুব জোরালো শব্দ ছাড়াও খুব লঘু শব্দকেও এই টেপ রেকর্ডার খুব সহজেই টেপ করে নিতে পারে। ভয়েস রেকর্ডার কেবলমাত্র ককপিটের সব কথাবার্তাই শ্রুতিধৃত হয়ে থাকে না, ককপিটের মধ্যে সব কথাবার্তাই ধরা থাকে। বিমানের যন্ত্রে বিভিন্ন রকম গণ্ডগোলের দিকে চালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য সতর্কতাসূচক যে সব স্বয়ংক্রিয় শব্দের ব্যবস্থা করা আছে সেই শব্দগুলিও এতে ধরা হয়ে যায়।

এই যন্ত্রে মোট চারটি চ্যানেল আছে। যন্ত্রটি চালু হওয়ার পর এটা অনবরত টেপ করতে পারে, শুধু তাই নয় এই টেপটি আধঘণ্টা অন্তর মুছে দিতে পারে সব টেপ করা শব্দ। এই পদ্ধতিতে টেপ করার বৈশিষ্ট্য হল বিমান যখন কোন দুর্ঘটনায় পড়ে তখন বিমানের মধ্যে কি কি ঘটেছিল, চালকদের মধ্যে বিভিন্ন সাঙ্কেতিক কথাবার্তা, যাত্রীসমূহের কথাবার্তা ও আর্তনাদ ইত্যাদি সব বিষয়ের শেষ আধঘণ্টায় টেপ মজুত রাখে। যতক্ষণ বিমান চলতে থাকে এবং রেকর্ডারে যতক্ষণ বিদ্যুৎ ব্যবস্থা বজায় থাকে ততক্ষণ তা টেপ করতে পারে বিদ্যুৎ বন্ধের সাথে সাথে এর টেপ করাও বন্ধ হয়ে যায়। বিদ্যুৎ ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যাওয়ার শেষ আধঘণ্টা যে সব শব্দ এতে টেপ হয়ে যায় তা প্রায় এক বছরের মত অক্ষত থাকে। তার পর আস্তে আস্তে ম্লান হয়ে যায়।

(2) ফ্লাইট ডাটা রেকডার ঃ এই যন্ত্রের গুরুত্ব খুব বেশি। বিমানের যন্ত্রপাতি চালু হলে কোন্ যন্ত্রটি কেমন চলছে, বিমানের গতিবেগ, বিমন চালকের সামনে বিভিন্ন নির্দেশক যন্ত্রে কখন কি তথ্য দেখা যাচ্ছে ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ হয় কম্পিউটারের সাহায্যে সাধারণ ভাবে এই যন্ত্রের সাহায্যে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিশেষ ভাবে রেকর্ড করা থাকে। সেই গুলি হল ঃ

(ক) বিমানের তাৎক্ষণিক গতিবেগ

(খ) বিমানটি ওড়ার সময় কত উচ্চতা দিয়ে উড়ে যায় তার রেকর্ড

(গ) বিমানটির দিক নির্দেশক বিষয়,

(ঘ) অভিকর্ষজ লোডিং বিষয় এবং

(ঙ) টেক অফের পর কত সময় অতিবাহিত হয় তার বিষয়।

যে কোন বিমানে এই রেকর্ডার যুক্ত করা হয় না। সাধারণভাবে পাঁচ প্রকার বিমানে এই রেকর্ডারগুলি যুক্ত করা হয়ে থাকে। সেগুলি হল ঃ Fo-27 বিমান, অ্যাভ্রো বোয়িং এবং 707 ও 737 বিমান।

(3) ডিজিটাল ফ্লাইট রেকর্ডার ঃ এটা এই পর্বের সর্বশেষ ফ্লাইট রেকর্ডার। এটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই যন্ত্রটি কম্পিউটার চালিত, এতে অসংখ্য রকমের তথ্য ধরা থাকে। তবে এটা নির্ভর করে কি ধরনের বিমানে এই যন্ত্রটি ব্যবহার করা হচ্ছে তার উপর। এয়ার বাসের ক্ষেত্রে এই ডাটার সংখ্যা 82টি। কিন্তু জাম্বো বিমানের ক্ষেত্রে সংখ্যাটি 100 এর বেশি হতে পারে।

এতে বিভিন্ন বিষয় ছাড়াও বিভিন্ন তথ্য রেকর্ড করা থাকে। এই মজুত তথ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ চলমান বিমানের ইঞ্জিন সমূহের অবস্থা, ইঞ্জিনে কত পরিমাণ পাওয়ার দেওয়া হয়েছে তার হিসাব, কন্ট্রোল পজিশন, বিমানটি কত উঁচু দিয়ে যাচ্ছে, বাতাসের চাপ ও তাপ, জ্বালানির পরিমাণ ও তার চাপ ইত্যাদি।

এই কম্পিউটার চালিত রেকর্ডারগুলির টেপ ইস্পাতের তৈরী এবং বাক্স দুটি লাল রং করা থাকাতে সহজে দেখা যায়। এটা এমন মজবুত যে প্রচন্ড ধাক্কা সইতে পারে জলে পড়ে থাকলেও, জল এর মধ্যে ঢুকতে পারে না। হাজার ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপেও এর কোন ক্ষতি হয় না। এটি ধ্বংস নিরোধক, তাপ নিরোধক জল নিরোধক এবং বায়ু নিরোধক। সাধারণ দুর্ঘটনায় এই রেকর্ডার সমূহের ধ্বংস হবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। 30-32 হাজার ফুট উঁচু থেকে পড়ে গেলেও এর কোন ক্ষতি হয় না। এটির বাইরের আবরণ এক বিশেষ ধরণের পুরু ইস্পাতের চাদর দ্বারা তৈরী।

ব্ল্যাক বক্সের ককপিট ভয়েস রেকর্ডার, ডিজিটাল ফ্লাইট রেকর্ডার এবং ফ্লাইট ডাটা রেকডার প্রত্যেকটি বিদ্যুৎ চালিত। বিদ্যুৎ সরবরাহ সবসময় বজায় রাখার জন্য সাধারণ বিদ্যুৎ ছাড়াও জরুরী অবস্থার সময় বিদ্যুৎ সরবরাহের বিশেষ ব্যবস্থা করা থাকে। এদের প্রত্যেকের আকার বিভিন্ন এবং আয়তন খুব কম স্থান দখল করতে

পারে। এদের প্রত্যেকের আকার আয়তন ও ওজনগত পার্থক্য যথেষ্ট। ককপিট ভয়েস রেকর্ডারের ওজন প্রায় 21·5 পাউণ্ড অপর দুটির ওজন প্রায় 40 পাউণ্ডের মত। ব্ল্যাক বক্সের আয়তন প্রায় 12·5×7·5×6 ঘন ইঞ্চির মত।

ব্ল্যাক বক্সের অনুসন্ধান

বিমান যখন আকাশে ওড়ে তখন তার সমস্ত যন্ত্রপাতি চালু থাকে। যখন এই অবস্থায় কোন দুর্ঘটনা ঘটে তখন বিমানের বিভিন্ন অংশ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে জলে, স্থলে, দুর্গম পথে পড়ে যায়। তখন এই অবস্থায় রেকার্ডারটি কোথায় কি অবস্থায় পড়ে থাকে তা খুঁজে পাবার ব্যবস্থাও আছে। স্থলভূমিতে পড়লে একে সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু কোন দুর্গম অঞ্চলে বা গভীর সমুদ্রে পড়লে খোঁজার অসুবিধা হলেও খুঁজে পাবার ব্যবস্থা আছে। এই সব ক্ষেত্রে প্রত্যেক যন্ত্রাংশের যে সব বেকন ইউনিট যুক্ত থাকে তার দ্বারা অবস্থান নির্ণয় করা যায়।

এই বেকন ইউনিট একটি ছোট চোঙাকৃতি আকারের আধারের মধ্যে থাকে এবং এগুলি চলে ব্যাটারির মাধ্যমে। এগুলি বিদ্যুৎ চালিত নয়। জলের মধ্যে পড়ে গেলে এই ব্যাটারি চালিত যন্ত্রটি এক বিশেষ ধরনের বেতার তরঙ্গের সৃষ্টি করে এবং এটি পরে পাঠাতে শুরু করে। এই বেতার সঙ্কেত প্রায় এক মাস অব্যাহত থাকে। এই তরংগ সঙ্কেত যখন কোন গ্রাহক যন্ত্রে ধরা পড়ে তখন তার অবস্থান সহজেই জানা যায়। গ্রাহক যন্ত্রের মধ্যেও বিশেষ ব্যবস্থা থাকে। এর মধ্যে এক ধরনের চুম্বক কম্পাস আছে যার সাহায্যে এই বেতার সঙ্কেত ঠিক কোন স্থান থেকে আসছে বা আসতে পারে তার খুঁটি নাটি বিচার করে খতিয়ে দেখে। এই ভাবে জলের মধ্যে পড়ে গেলে তার অবস্থান নির্ণয় করা হয়। তখন একে যান্ত্রিক উপায়ে জল থেকে তোলার ব্যবস্থা করে স্থলভূমিতে আনা হয়।

ব্ল্যাক বক্সের সাহায্যে দুর্ঘটনার কারণ নির্ণয়

কোন বিমান যখন দুর্ঘটনার মুখে পড়ে তখন বিমান চালক অনেক ক্ষেত্রে আপ্রাণ চেষ্টা করেন বিমানকে রক্ষা করতে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সফল হন, কিছু কিছু ক্ষেত্রে সফল হন না। দর্ঘটনার প্রাক মুহূর্তে পাইলটদের কথা যাত্রীদের আর্তনাদ, কোন বিস্ফোরণের শব্দ ইত্যাদি টেপ হয়ে থাকে ব্ল্যাক বক্সে। এই সব বিষয়গুলি উক্ত রেকর্ডারের সাহায্যে ধরা থাকে এবং বিশ্লেষণ দ্বারা আসল কারণ নির্ণয় করা যায়। এই বিষয়ে যে সমস্ত টেপ থাকে তাদের বিশেষ উপায়ে বিশ্লেষণ করতে হয়। ব্ল্যাক বক্সের তথ্য উদ্ধার খুবই জটিল ব্যাপার। পৃথিবীতে খুব কম স্থানে এই বিশ্লেষণের সুযোগ আছে। সমীক্ষায় দেখা গেছে যে লন্ডনের কাছে ফ্রানবরোর রয়্যাল এয়ার ক্র্যাফট এস্টাবিলিশমেন্ট এবং ওয়াশিংটনের অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সম্বলিত একটি কেন্দ্র আছে। যেখানে এই সব ব্ল্যাক বক্সের তথ্য উদ্ধারের কাজ খুবই দক্ষতার সাথে সম্পন্ন হয়। ব্ল্যাক বক্সের রেকর্ডারে কোন রকম গণ্ডগোল থাকলে অত্যাধুনিক স্পেকট্রাম বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়। দুর্ঘটনার স্থান থেকে ব্ল্যাক বক্সকে বিশেষ ভাবে উদ্ধার করে এই সব কেন্দ্রে তার তথ্য বিশ্লেষণ করে যে বিমানে এটি ছিল তার দুর্ঘটনার কারণ নির্ণয় করা যায়।

এই সব বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজন বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রযুক্তিবিদের। বিমানের ইঞ্জিন যখন বিকল হয় তখন ডিজিটাল ফ্লাইট রেকর্ডারে ঐ ইঞ্জিনের সুইচ বন্ধ হয়ে যায় তখন আর কোন তথ্য সংশ্লিষ্ট রেকর্ডারে রেকর্ড করা সম্ভব হয় না। তার আগের পর্যন্ত সব তথ্য শুধুমাত্র ধরা থাকে। ককপিট ভয়েস রেকর্ডারে যে সব শব্দ ধরা থাকে যেমন কোন উচ্চ শব্দ, বিস্ফোরণ পাইলটের মধ্যে কথাবার্তা ইত্যাদি, তাদের বিভিন্ন দিকে খুঁটিনাটি বিচার করে একটা বিশেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায়।

কণিষ্কের ব্ল্যাক বক্স উদ্ধার

প্রসংগত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গত 23শে জুন টরেন্টো থেকে বোম্বাই আসার পথে এয়ার ইন্ডিয়ার যাত্রীবাহী "747 জাম্বো জেট বিমান" 'কণিষ্ক' আয়ার-ল্যান্ডের দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলবর্তী উত্তর আতলান্তিকে ভেঙ্গে পড়ে। দুর্ঘটনার 18 দিন বাদে আয়ারল্যান্ডের উপকূল থেকে 155-56 কিমি দূরে 6700 ফুট গভীর থেকে বিভিন্ন আবহাওয়া, জল, কাদা, মাটি ইত্যাদির ধারা সরিয়ে বিশেষ যান্ত্রিক উপায়ে কণিষ্কের দুটি ব্ল্যাক বক্স—ককপিট ভয়েস রেকডার এবং ফ্লাইট ডাটা রেকর্ডার উদ্ধার করে সিলকরা দুটি বক্সের মধ্যে খুবই যত্নের সাহায্যে রাখা হয়। এদের ওজন ছিল যথাক্রমে 21 পাউন্ড এবং 40 পাউন্ড।

কণিষ্কের ব্ল্যাক বক্স উদ্ধার পর্ব বিমান দুর্ঘটনার ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। এর উদ্ধার পর্বে সমুদ্রের এত গভীরে কাজ করা মানুষের সাধ্যের বাইরে ছিল। তার জন্য প্রয়োজন হয়েছিল স্বয়ংক্রিয় ডুবোজাহাজ এবং যান্ত্রিক হাত। অপূর্ব যন্ত্রমানব স্ক্যাবার সমুদ্রের এত গভীর থেকে কি

করে উদ্ধার করে এনেছিল তার দৃশ্য অনেকে টেলিভিশনে দেখেছেন। জলের উপর থেকে কি ভাবে এই যান্ত্রিক ডুবরীকে মাদার শিপ বা যন্ত্র নিয়ন্ত্রণকারী জাহাজ থেকে কিভাবে চালানো হয়েছে তার দৃশ্যও অনেকের পরিচিত।

সমীক্ষায় জানা গেছে ব্ল্যাক বক্স দুটি উদ্ধারের জন্য খরচ হয়েছে প্রায় 50 লক্ষ পাউন্ড। ফরাসী জাহাজ "লেও তেভর্ন্যা" থেকে প্রথমে আইরিশ নৌবাহিনীকে ব্ল্যাক বক্স দুটি দেওয়া হয় পরে তাঁরা অবশ্য অতিরিক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থার সাহায্যে ভারতীয় অনুসন্ধানকারী দলের হাতে সমর্পণ করেন।

যন্ত্রমানবের সাহায্যে 6700 ফুট সমুদ্রের গভীরতা থেকে এই রহস্যের চাবিকাটি ব্ল্যাক বক্স ও রেকর্ডার উদ্ধার হলেও দুর্ঘটনার কারণ ঠিক মত নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। রেকর্ডারের ক্ষীণকণ্ঠ থেকে সিদ্ধান্তে আসা কঠিন ব্যাপার এবং ব্ল্যাক বক্স দুটি এতদিন জলের তলায় থেকে তার কর্ম ক্ষমতা হারিয়েছে। তা হলেও কৃপাল কমিশন ইংলন্ড, আয়ার ল্যান্ড ও আমেরিকা ঘুরে এসে এর বিষয়ে যথাসাধ্য তথ্য সংগ্রহ করে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছান তা এই দুর্ঘটনার কারণ নির্ণয়ে খুব সাহায্য না করলেও এটা ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার যে দিশারী হয়ে থাকবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

দুঃস্বপ্নের গণিত

কনককান্তি দাশ*

রাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখছেন কখনও? তার ফলে আতঙ্ক, ভয়! এমন কথা কি কখনও শুনেছ স্রষ্টা তার সৃষ্টিকে নিয়ে আতঙ্কে পড়েছ, হ্যাঁ, পৃথিবীতে এমন ঘটনাও ঘটেছে; এবং তা ঘটেছে এ কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও গণিতবিদ স্যার বার্ট্রান্ড রাসেলের ক্ষেত্রে। তাঁর আতঙ্ক তাঁর বিখ্যাত সৃষ্টি "প্রিন্সিপিয়া ম্যাথমেথিকা" (Principia Mathematica)-কে নিয়ে।

তখনকার দিনে বিলেতে বিখ্যাত গবেষণা পত্রিকা (Journal) বলতে "প্রিন্সিপিয়া ম্যাথমেথিকা"-কে বোঝাত। স্যার রাসেল 1903 খৃস্টাব্দে গণিতের তত্ত্ব বা Principles of Mathematics নামে একটি বই লেখেন। সেই বইতে তিনি গণিতের একটি ছক তৈরি করেন। তাতে তিনি দেখান যে, গণিত আনুষ্ঠানিক তর্কশাস্ত্রের একটি উপকরণ। তর্কশাস্ত্র ও তত্ত্বীয় গণিতের মধ্যে প্রভেদ অতি সামান্য। বিশুদ্ধ গণিত প্রায় পুরোটাই এই তর্কশাস্ত্রের কিছু স্বতঃসিদ্ধ থেকে উদ্ভূত।

তিনি এ নিয়ে প্রভূত গবেষণা করেন। ফলে গাণিতিক তর্কশাস্ত্র বা Mathematical Logic নামে এক নূতন বিষয়ের অবতারণা করেন। অধ্যাপক A. N. Whitehead সাথে তিনি তাঁর এই গবেষণা পত্র "প্রিন্সিপিয়া ম্যাথমেথিকা"তে প্রকাশ করেন।

1910, 1912 এবং 1913 খৃস্টাব্দে তাঁদের এই গবেষণা পত্র "প্রিন্সিপিয়া ম্যাথমেথিকা"'র তিনখণ্ডে প্রকাশ করা হয়।

রাসেল তাঁর এই বৃহৎ প্রকাশনায় গণিতের বাস্তব সংখ্যার ধারণা এবং তাদের গঠন বিন্যাসের তত্ত্ব পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত করেন। তখন অনেকের ধারণা ছিল, এই পৃথিবীর এমনকি বিশজন লোকও আদৌ এই বইটি পড়ে দেখেন নি।

বিশিষ্ট তত্ত্বীয় পদার্থ বিজ্ঞানী স্রেডিঞ্জার আরো এক-ধাপ এগিয়ে প্রশ্ন রাখেন, "রাসেল বা তাঁর সহলেখক হোয়াইট-হেড নিজেরাই কি এটা পড়েছেন একবারও"? রাসেলের নিজেরও তার এই বৃহৎ খণ্ডটি নিয়ে আক্ষেপ করতে শোনা গেছে। তিনি এত কষ্ট ও পরিশ্রম করে এই বই রচনা সম্পূর্ণ করলেন; কিন্তু কি আশ্চর্য! কেউ তাঁর এই গ্রন্থে বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখালেন না। একরাতে রাসেল স্বপ্ন দেখলেন; একদিন উনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে বসে পড়াশুনা করছেন। ক্যালেণ্ডারের পাতার দিকে তাকিয়ে আতকে উঠলেন; একি! এ ত একবিংশ শতাব্দী 2110 খৃস্টাব্দ, অর্থাৎ প্রায় এক শতাব্দী অতিক্রান্ত।

কিছুক্ষণ পর দেখলেন, ঐ গ্রন্থাগারের তাঁর একজন সহকর্মী এক ঝুড়ি বই নিয়ে কোথায় যাচ্ছেন। রাসেল তাকে অনুসরণ করলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁকে ধরতে

*গণিত বিভাগ, জলপাইগুড়ি সরকারী ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, জলপাইগুড়ি

পারছিলেন না।

অবশেষে লোকটি একটি বিরাট ঘরে ঢুকলেন। সেই ঘরের কোণায় ঘর গরম করার জন্য একটি উনান জ্বলছিল।

আর লোকটি ঐ জ্বলন্ত উনানে ঝুড়ির মধ্য থেকে একের পর এক বই ছুড়ে দিচ্ছিলেন। মহূর্তের মধ্যে জ্বলন্ত আগুন অনেক জ্ঞানী ও বিজ্ঞানীর সারা জীবনের কর্মলব্ধ ফলকে গ্রাস করছিল, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অনেক রত্ন চিরতরে বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছিল।

পরিশেষে লোকটি একটি বৃহৎ বই হাতে তুলে নিলেন। সবিস্ময়ে রাসেল দেখলেন বইটি তারই রচিত "প্রিন্সিপিয়া ম্যাথমেথিকা"। এটাই যে এই বইএর শেষ লব্ধ খন্ড। এছাড়া এর আর কোন কপি অবশিষ্ট নেই। বিশ্বের কোথাও তা পাওয়া যাচ্ছে না। সব কপি বিনষ্ট করা হয়ে গেছে।

এই অবস্থায় রাসেল চিৎকার করে উঠলেন, "এই থামো, কি সর্বনাশ করছো।" তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। তিনি জেগে গেলেন; দেখলেন, ভোর হয়ে গেছে; তার সারা শরীর ঘেমে ভিজে গেছে। গলা ধরে গেছে।

কেন এই দুঃস্বপ্ন। রাসেলের ভাষায় তাঁর বদ্ধমূল ধারণা ছিল, প্রিন্সিপিয়াতে তিনি যে জটিল গাণিতিক বিশ্লেষণ করেছেন তা দু'চারজন লোক ছাড়া কেউ বুঝবেন না। তাঁর অবর্তমানে তাঁর এই মহৎ গবেষণা অবলুপ্ত হয়ে যাবে। এই বোধ তাঁর অবচেতনে মনে সদা-সর্বদা কাজ করে তাঁকে আতঙ্কিত করে তুলছিল। যাহোক রাসেল বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক ও গণিতজ্ঞ। তাঁর অবদান "প্রিন্সিপিয়া ম্যাথমেথিকা"তে চিরকাল বেঁচে থাকবে। তাঁর এই অবদানের কথা সমগ্র বিশ্বের গণিতজ্ঞরা সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করেন। এ নিয়ে উত্তরোত্তর গবেষণা চলছে। ফলে রাসেল এবং প্রিন্সিপিয়া দুই-ই অমর হয়ে রয়েছে এবং থাকবে বিংশ শতাব্দীর পরেও অনেক অনেক কাল ধরে।

কাগজে ছবি তোলা

অজিত চৌধুরী*

কোন ছবির নেগেটিভ থেকে বিশেষ ধরণের কাগজে ছবি তোলার কাজটি বাড়ীতে বসেই করা যেতে পারে। মাঝে মাঝে রাস্তার পাশে এ ধরণের জিনিস দেখা যায়। এটি করতে গেলে পটাসিয়াম ফেরিসায়ানাইড আর কোন ফেরিক লবণ (যেমন—ফেরিক নাইট্রেট) প্রয়োজন। ঐ দুটি যৌগ সমান অনুপাতে একটি পরীক্ষা-নলে নিয়ে তার সাথে জল মিশিয়ে একটি দ্রবণ তৈরি করতে হবে। দ্রবণটি খুব গাঢ় নয়, একটু লঘু হলে ভাল হবে। এবার একটি তুলি (একটি কাঠির মাথায় তুলা জড়িয়ে নিলেও হবে) দিয়ে ঐ দ্রবণ একটি সাধারণ সাদা কাগজে মাখাতে হবে। সাধারণ সাদা কাগজের পরিবর্তে আর্ট পেপার নিলে ছবি আরও স্পষ্ট হবে। কাগজটি ছায়াতে শুকাতে হবে। ছায়াতে কিছুক্ষণ রেখে দিলে শুকিয়ে যাবে। কাগজটির রঙ নীলাভ সবুজ হয়। এই নীলাভ সবুজ কাগজটি নেগেটিভের মাপে সমান করে কেটে নিতে হবে। এবার এই কাগজটির উপর নেগেটিভ রেখে তার উপর একটি স্বচ্ছ কাঁচের প্লেট দিয়ে চেপে সব সমেত সূর্যালোকে রাখতে হবে। সূর্যালোক প্রখর হলে মিনিট পাঁচেক রাখার পর ছায়াতে এনে কাগটি জল দিয়ে ধুতে হবে। দেখা যাবে, ঐ কাগজে ছবিটি ফুটে উঠেছে। প্রখর সূর্যালোকে নেগেটিভ সহ কাগজের টুকরাটি বেশিক্ষণ (পনের মিনিট বা তার বেশি) রাখলে ছবিটি ঝল্‌সে যায়। প্রখর সূর্যালোকে দশ মিনিটের বেশি না রাখাই ভাল। আবার দু-এক মিনিট রোদে রাখলে ছবি অস্পষ্ট আসে।

নেগেটিভের পরিবর্তে ট্রেসিং-পেপারে (এক ধরণের খুব পাতলা সাদা কাগজ যা চিত্রাঙ্কনে প্রয়োজন হয়) কালো কালি দিয়ে অঙ্কিত ছবিরও প্রতিচ্ছবি ঐ নীলাভ সবুজ কাগজে একই ভাবে তোলা যায়। সূর্যালোকের পরিবর্তে উজ্জ্বল আলোতেও ছবি তোলা যায়। আসলে উপরের কাগজে যেখানে কালির দাগ থাকে ঠিক তার নীচে (নীলাভ সবুজ কাগজে) কোন বিক্রিয়া হয় না। সেখানে কিন্তু যেখনে কালির দাগ থাকে না, সেখানে তার নীচে কাগজটির যে অংশ থাকে তা সূর্যালোকের জন্য টার্নবুলের নীলে পরিণত হয়, তৈরি হয় ফেরাস ফেরি-সায়ানাইড। কাগজটি জলে ধুলে কালির দাগের স্থানে সাদা রেখা দেখা যাবে। এ পদ্ধতিতে ছবি তোলার নাম ফেরো প্রিন্টিং। বাস্তুশিল্পে নক্সাদি নকল করার জন্য এ পদ্ধতি কাজে লাগানো হয়।

*কৃষ্ণা ব্লক, রূপশ্রী পল্লী, পোঃ রাণাঘাট, নদীয়া।

রোবট-শৃঙ্খল

সৌমিত্র মজুমদার*

সূত্র ঃ

উপর-নীচ ঃ—1. স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র-মানব, 2. যে বিশেষ গাছ নিয়ে সুপ্রজনন-বিদ্যার (Genetics) জনক বিজ্ঞানী "গ্রেগর যোহান মেণ্ডল" (Gregor Johann Mendel) অজস্র গবেষণা করেছিলেন, 3. "ফাইকাস্" গণের অন্যতম প্রজাতি বিশেষ, যে গাছের বৈজ্ঞানিক নাম হল "Ficus bengalensis", 4. আয়োডিন বর্তমান এই

*73, পূর্বাচল পল্লী. পোঃ রহড়া খড়দহ, 24 পরগনা।
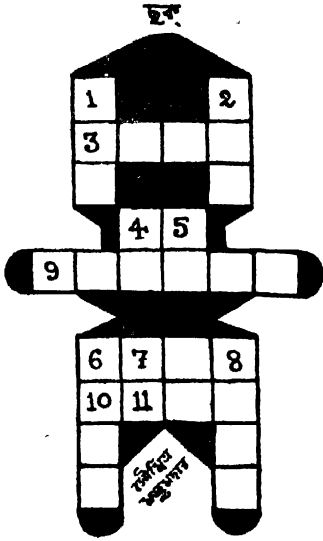
সবজীতে, 5. অলাবু'র আরেক নাম, 6. যে নদের ধারে কায়রো শহরের ও মাইল দক্ষিণপশ্চিমে গির্জা বা গিজেতে তিনটি প্রসিদ্ধ পিরামিড আছে, 7. যে জন্তুর বৈজ্ঞানিক নাম "এলিফ্যাস্ ইণ্ডিয়া" (Elephas India) বলেই সকলে জানি, 8. পাতিহাঁসের প্রজাতি (Species) বিশেষ।

পাশা-পাশি ঃ—3. অ্যালুমিনিয়ামের আকরিক, 4. ফল বিশেষ, 9. বিংশ শতাব্দীর এক যুগান্তকারী আবিষ্কার, 10. কানের পর্দা বিশেষ (প্রথম দুই অক্ষরে), 11. এই যাযাবর পাখি আলিপুর চিড়িয়াখানায় শীতকাল কাটাবে বলে বৈকাল হ্রদ, মানস সরোবর, সাইবেরিয়া থেকে আসে, 6. মহাকাশে কালপুরুষের কোমরের বেল্ট বা কোমরবন্ধনী থেকে তিন—তারার যে তলোয়ারটি ঝুলছে তার মাঝামাঝি তারাটির পিছনে একটি "—" দেখা যায়।

রোবট-শৃঙ্খলের জবাব

উপর-নীচ ঃ—1. রোবট, 2. মটর, 3. বট, 4. কপি, 5. লাউ, 6. নীলনদ, 7. হাতি, 8. কারন্ডব।
পাশা-পাশি ঃ—3. বক্সাইট, 4. কলা, 9. কমপিউটর, 10. লতি, 11. তিতির, 6. নীহারিকা।

ভ্রম সংশোধন ঃ—অগাস্ট-সেপ্টেম্বর '85 (শারদীয়) সংখ্যা জ্ঞান ও বিজ্ঞানের 294 পৃষ্ঠায় 'আবেদন'-এ "বন্যপ্রাণী ধ্বংস করুন"-এর স্থলে হবে "বন্যপ্রাণী ধ্বংস রোধ করুন",—সম্পাদনা সচিব, জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-700 006 থেকে প্রকাশিত এবং গুপ্ত প্রেস 37/7, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-700 009 থেকে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

JNAN-O-BIJNAN
MONTHLY JOURNAL   Regd. No. WB/NC-210   OCTOBER 1985

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—শৈলী, কলিকাতা—54   মুল্য—2·50

৩৮তম বর্ষ

★

একাদশ-দ্বাদশ সংখ্যা

★

নভেম্বর-ডিসেম্বর

1985

প্রতিষ্ঠাতা: আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু

লেখকদের প্রতি নিবেদন

1. বিজ্ঞান পরিষদের আদর্শ অনুযায়ী জনসাধারণকে আকৃষ্ট করার মত সমাজের কল্যাণমূলক বিষয়বস্তু সহজবোধ্য ভাষায় সুলিখিত হওয়া প্রয়োজন।
2. মূল প্রতিপাদ্য বিষয় এবং পূর্ণ ঠিকানাসহ লেখকের পরিচিতি পৃথক কাগজে অবশ্যই লিখে দিতে হবে।
3. চলিত ভাষা এবং চলন্তিকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট বানান ও পরিভাষা ব্যবহৃত হবে। উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে আন্তর্জাতিক শব্দটি বাংলা হরফে লিখে ব্র্যাকেটে ইংরাজী শব্দটিও দিতে হবে। আন্তর্জাতিক সংখ্যা এবং মেট্রিক পদ্ধতি ব্যবহৃত হবে।
4. মোটামুটি 2000 শব্দের মধ্যে রচনা সীমাবদ্ধ থাকা বাঞ্ছনীয়।
5. বিভিন্ন ফীচার, সমকালীন বিজ্ঞান গবেষণা ও প্রযুক্তিবিদ্যার সংবাদ এবং বিজ্ঞান বিষয়ক সুন্দর আকর্ষণীয় ফটোগ্রাফীও গ্রহণীয়।
6. রচনার সঙ্গে চিত্র থাকলে আর্ট পেপারে চাইনিজ কালিতে সুঅঙ্কিত হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন।
7. প্রত্যেক চিত্র প্রস্থে 8 সে. মি. কিংবা এর গুণিতকের (16 সে মি 24 সে. মি) মাপে অঙ্কিত হওয়া প্রয়োজন।
8. অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রবন্ধের মৌলিকত্ব বজায় রেখে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জনে সম্পাদক মন্ডলীর অধিকার থাকবে।
9. প্রত্যেক প্রবন্ধ ফীচার-এর শেষে গ্রন্থপঞ্জী থাকা বাঞ্ছনীয়।
10. জ্ঞান ও বিজ্ঞানে পুস্তক সমালোচনার জন্য দুই কপি পুস্তক পাঠাতে হবে।
11. ফুলস্ক্যাপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় যথেষ্ট মার্জিন এবং প্রতি লাইনের পর বেশ কিছুটা ফাঁক রেখে পরিস্কার হস্তাক্ষরে প্রবন্ধ লিখতে হবে।
12. প্রতি প্রবন্ধের শুরুতে পৃথকভাবে প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসার দেওয়া আবশ্যিক।

সম্পাদনা সচিব

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

নভেম্বর-ডিসেম্বর, 1985
38তম বর্ষ, একাদশ-দ্বাদশ সংখ্যা

বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের অনুশীলন করে বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ ও সমাজকে বিজ্ঞান-সচেতন করা এবং সমাজের কল্যাণকল্পে বিজ্ঞানের প্রয়োগ করা পরিষদের উদ্দেশ্য।

বিভিন্ন লেখকদের স্বাধীন মতামত বা মৌলিক সিদ্ধান্তসমূহ পরিষদের বা সম্পাদকমণ্ডলীর চিন্তার প্রতিফলন হিসাবে সাধারণত: বিবেচ্য নয়।

বিষয় সূচী

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

মূল্য : 5·00

(পাঁচ টাকা)

যোগাযোগের ঠিকানা :

কর্মসচিব

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট

কলিকাতা-700006

ফোন : 55-0660

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

অষ্টাত্রিংশত্তম বর্ষ | নভেম্বর-ডিসেম্বর, 1985 | একাদশ-দ্বাদশ সংখ্যা

সার্ধ শতবর্ষের আলোকে অ্যালফ্রেড নোবেল

সূর্যেন্দুবিকাশ করমহাপাত্র

দেড় শত বছর আগে 1833 খৃস্টাব্দে সুইডেনে আলফ্রেড বার্নহার্ড নোবেলের আবির্ভাব ঘটেছিল। নিজে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী না হলেও বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির জগতে তিনি আজ এক বিশিষ্ট শিরোনাম। বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে তিনি তাঁর পুরস্কারের মাধ্যমে গণমানসে বিশিষ্ট করে তুলে ধরেছেন।

নোবেল মানুষটি কেমন ছিলেন তা অনেকেরই অজানা নয়। ছেলেবেলায় চিররুগ্ন অ্যালফ্রেডকে গৃহশিক্ষক পড়াতেন—কারণ স্কুলে যাওয়া তাঁর ধাতে সহ্য হত না। পরে অবশ্য সেন্ট পিটার্সবার্গে তিনি এঞ্জিনীয়ারিং পড়েন এবং আমেরিকায় পড়ার জন্য জন এরিকসনের অধীনেও বছর খানেক ছিলেন। বাবার কারখানায় নানারকম্ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা ছিল তাঁর সখ। এখানেই নাইট্রোগ্লিসারিন নিয়ে তাঁর নানা পরীক্ষায় সাফল্য এসেছিল। ডিনামাইট প্রভৃতি বিস্ফোরকের সফল পরীক্ষার ফলগুলিকে পেটেন্ট নিয়ে তিনি যথেষ্ট সম্পদ সঞ্চয় করেছিলেন, তাছাড়া বাকু তৈল খনি থেকেও তাঁর আয় ছিল যথেষ্ট। আজীবন অকৃতদার এই মানুষটি তাঁর আবিষ্কৃত বিস্ফোরকের ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলেই অপরাধ বোধে ভুগতেন। শেষ জীবনে নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে করতেন। মানুষ সম্পর্কে তাঁর ছিল আন্তরিক শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস, মানব জাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর অপরিমেয় আশা ও আকাঙ্ক্ষা।

1896 খৃস্টাব্দে নোবেলের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর আগে তিনি উইল করে যান যে তাঁর সঞ্চিত 90 লক্ষ ডলার সম্পদের সুদ থেকে প্রতি বছর কয়েকটি পুরস্কার দেওয়া হবে। পূর্ববর্তী বছরে মানব কল্যাণে যাঁরা উল্লেখ্য অবদান রেখেছেন তাঁরাই এই পুরস্কার পাবেন। সুদ থেকে যে অর্থ পাওয়া যাবে তা সমান পাঁচ ভাগে ভাগ করে এক ভাগ দেওয়া হবে পদার্থ বিজ্ঞানে উল্লেখযোগ্য আবিষ্কারের জন্য। দ্বিতীয়টি রসায়নে। তৃতীয় পুরস্কার দেওয়া হবে শারীরতত্ত্ব অথবা চিকিৎসা বিজ্ঞানে বিশিষ্ট অবদানের জন্য। চতুর্থ পুরস্কার পাবেন একজন সাহিত্যিক তাঁর আদর্শবাদী কোন সাহিত্যকর্মের জন্য। পঞ্চম পুরস্কার চিহ্নিত থাকবে শান্তির জন্য। যিনি জাতিতে জাতিতে সম্প্রীতি এনে যুদ্ধোন্মাদনা হ্রাস করতে পারবেন, পীস কংগ্রেসকে সফল করবেন তাঁকে এই পুরস্কার দেওয়া হবে।

পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নে পুরস্কার দানের কর্তৃত্ব থাকল সুইডেনের বিজ্ঞান একাডেমীর উপর। স্টকহোমের কারলিনস্কা ইনস্টিটুট ঠিক করবেন শারীরতত্ত্ব বা চিকিৎসাবিজ্ঞানে কাকে পুরস্কার দেওয়া হবে। স্টকহোমের একাডেমী সাহিত্যের জন্য পুরস্কার প্রাপক মনোনীত করবেন। নরওয়ের পার্লামেন্ট মনোনীত পাঁচজন সদস্য শান্তির জন্য পুরস্কার প্রাপক নির্বাচিত করবেন।

নোবেল যে ফাউণ্ডেসনের হাতে তাঁর সম্পদের ভার দিয়ে গেলেন তখন তার কোন অস্তিত্বই ছিল না। 1897 খৃস্টাব্দে নোবেলের উইল যখন প্রকাশ পেল তখন তাঁর কিছু নিকট আত্মীয় দাবীদার দাঁড়িয়ে উইল প্রোবেটে বাধা দিলেন। তাছাড়া উইল করার আগে, নোবেল যে সব প্রতিষ্ঠান পুরস্কার প্রাপক মনোনয়ন করবেন, তাঁদের কোন সম্মতি নেন নি। এখন সেই প্রতিষ্ঠানগুলি এত বড় কাজের ভার নিতে ইতস্তত করলেন। প্রায় তিন বছর পরে সমস্যার সমাধান হল। 1900 খৃস্টাব্দের জুনে নোবেল ফাউণ্ডেসন আইনগত স্বীকৃতি

পেল ও 1901 খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর থেকে নোবেল পুরস্কারগুলি দেওয়া সুরু হল।

উইলের শর্ত ছিল পূর্ববর্তী বছরের কাজের জন্য পুরস্কার দেওয়া হবে। কিন্তু নির্বাচকমণ্ডলী এই শর্তটি মেনে নিতে পারেন নি। তার কারণ হল বিজ্ঞানের কোন বড় আবিষ্কার প্রতিষ্ঠা লাভ করতেই অনেক বছর কেটে যায়। নোবেল পুরস্কার তাই প্রতিষ্ঠিত একটি বিশেষ অবদানের জন্য দেওয়া হয়, আজীবন সামগ্রিক কাজের জন্য নয়। নোবেল রসায়ন কমিটির একদা প্রধান আর্নে টিসেলিয়াসের ভাষায় "ভাল বিজ্ঞানী হলেই নোবেল পুরস্কার দেওয়া যায় না। এমন অনেক বিশিষ্ট বিজ্ঞানী আছেন যাঁরা শিক্ষক ও সংগঠক হিসেবে মহান কিন্তু তাঁর যদি কোন মহৎ আবিষ্কার না থাকে তবে নোবেল কমিটি তাঁকে পুরস্কারের জন্য মনোনীত করতে পারেন না।"

নোবেল পুরস্কার শুধু জীবিতদেরই দেওয়া হয়। একই বিষয়ে এক বছরে আজ পর্যন্ত একসঙ্গে তিনজনের বেশী কেউ এই পুরস্কার পান নি। প্রতি বছর শরৎ কালে নোবেল পুরস্কারের মনোনয়নের জন্য 650টি চিঠি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিকে দেওয়া হয়। তার মধ্যে আছেন বিজ্ঞানের রয়্যাল সুইডিস একাডেমির সব সদস্য, পদার্থ ও রসায়নবিজ্ঞান নোবেল কমিটির সদস্য মণ্ডলী, প্রাক্তন সমস্ত পদার্থ ও রসায়ন বিজ্ঞানের পুরস্কার প্রাপক, আটটি সুইডিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত অধ্যাপক এবং একাডেমী মনোনীত 40-50টি বিশ্ববিদ্যালয় অথবা প্রতিষ্ঠান। বিদেশের বিভিন্ন একাডেমী ও বড় গবেষণা কেন্দ্র থেকেও মনোনয়ন চাওয়া হয়। ফলে প্রায় 50—100 নাম কমিটির কাছে আসে প্রতিটি পুরস্কারের জন্য। তা থেকে বাছাই অবশ্যই সহজ ব্যাপার নয়। কোন্ জন সর্বোত্তম তা বেছে নেওয়া সব সময় সম্ভব হয় না। তবে একজন যোগ্য ব্যক্তিকে নিশ্চয়ই নির্বাচন করা সম্ভব হয়।

এই বাছাইর ব্যাপার নিয়ে নানা রকম ব্যতিক্রম ঘটেছে—যেমন নিউক্লীয় পদার্থবিজ্ঞানের জনক রাদারফোর্ড নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন ঠিকই, তবে তা রসায়ন বিজ্ঞানে। এরকম বিশিষ্ট কিছু পদার্থবিজ্ঞানী রসায়নে এই পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁদের মধ্যে আছেন মেরী কুরী, নার্নষ্ট, সোডি অ্যাস্টন, ল্যাংমুইর, ইউরে, ফ্রেডরিক জোলিও ও ইরিন জোলিও কুরী, ডিবাই, হেভেসী, হান, গিয়াক, সিবর্গ ও ম্যাকমিলান, মুলিকেন, অনসাগের, হার্জবার্গ প্রমুখ।

পুরস্কার ঘোষণার সঙ্গে যে কাজের বিবরণ থাকে তাতে উল্লিখিত পুরস্কার প্রাপকদের পদার্থবিজ্ঞানের কাজের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে ক্রমশ বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়গুলির নির্দিষ্ট সীমারেখা হ্রাস পাচ্ছে। তাই এইসব ব্যতিক্রম উল্লেখযোগ্য বলা যায় না।

1921 খৃস্টাব্দে আইনস্টাইন পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান গাণিতিক পদার্থবিদ্যা ও আলোক তড়িৎক্রিয়ার নিয়ম আবিষ্কারের জন্য। অথচ আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব এই শতাব্দীর বিজ্ঞানে যে যুগান্তর এনেছে নোবেল কমিটি তার স্বীকৃতি দেন নি।

1901 থেকে 1985 বছরগুলির মধ্যে 1916, 1931, 1940-42 এই বছরগুলি কোন পুরস্কার দেওয়া সম্ভব হয় নি. তাছাড়া বেশ কিছুদিন হল একটি ষষ্ঠ পুরস্কার অর্থনীতিতে বিশিষ্ট অবদানের জন্য দেওয়া হচ্ছে।

শান্তির পুরস্কার নির্বাচনে কেউ কেউ বিশ্ব রাজনীতির গন্ধ পেয়ে থাকেন। তাছাড়া সাহিত্যে বিভিন্ন ভাষা ও বিভিন্ন জাতির লেখক গোষ্ঠী থেকে পুরস্কারের জন্য যোগ্য ব্যক্তিকে বাছাই করা নিঃসন্দেহে দুরূহ। তবু যোগ্য সাহিত্যই পুরস্কৃত হয়ে এসেছে। ভারতে সাহিত্যের জন্য অনন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। পদার্থবিজ্ঞানে এশিয়ার প্রথম নোবেল জয়ী বিজ্ঞানী ভারতীয় সি ভি. রামন। অবশ্য জন্মসূত্রে ভারতীয় অথচ আমেরিকার নাগরিক এমন দু-জন নোবেল জয়ী বিজ্ঞানী হলেন পদার্থবিজ্ঞানে সুব্রহ্মণ্যম চন্দ্রশেখর ও রসায়নে হরগোবিন্দ খোরানা। অবিভক্ত ভারতে জন্ম হলেও নোবেল জয়ী বিজ্ঞানী আবদুস সালাম এখন পাকিস্তানের নাগরিক।

নোবেল পুরস্কার পাওয়ার মত আরও অনেক যোগ্য সাহিত্যিক ও বিজ্ঞানী পৃথিবীতে জন্মেছেন। তাঁদের সবাইকে পুরস্কৃত করা সম্ভব হয় নি বলেই তাঁরা যোগ্যতায় কিছু কম নন।

তবু এই শতাব্দীর বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির ইতিহাস পাওয়া যাবে নোবেল বিজ্ঞানীদের কর্মকাণ্ড থেকে। বিশেষত বিজ্ঞানে নোবেল জয়ী বিজ্ঞানীদের আবিষ্কারগুলি কালানুক্রমিক সাজিয়ে আমরা এ যুগের বিজ্ঞানের ইতিহাস পেতে পারি। তাছাড়া বিজ্ঞানী ও সাধারণ মানুষের মাঝখানে যোগাযোগের যে দুস্তর ব্যবধান থাকে নোবেল পুরস্কারের বিস্তৃত বিবরণ জানতে আগ্রহ সেই ব্যবধান অনেকাংশে কমিয়ে দেয়। নোবেল পুরস্কারের অর্থমূল্য এখন অনেক বেড়েছে। কিন্তু এই মূল্যই বড় কথা নয়। আসলে নোবেল পুরস্কারের গৌরবময় ঐতিহ্য পৃথিবীর মানবজাতিকে সভ্যতার আলোকে মহিমান্বিত করেছে।

সার্ধ শতবর্ষের আলোকে এই মহিমার স্রষ্টা মানববন্ধু, অ্যালফ্রেড নোবেল পৃথিবীতে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

[26শে নভেম্বর, 1985 বসুবিজ্ঞান মন্দিরের প্রাক্তন ডিরেক্টর ও বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের অন্যতম প্রাক্তন সহ-সভাপতি বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ দেবেন্দ্রমোহন বসুর জন্মশতবার্ষিকী। এতদুপলক্ষে এই রচনাটি পুনর্মুদ্রিত হলো।]

ডক্টর দেবেন্দ্রমোহন বোস

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

1921 খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম দিকে আমি বসু বিজ্ঞান মন্দিরে যোগদান করি। তখন সেখানকার অনেককেই আমি চিনতাম না। ডক্টর ডি. এম. বোসের নাম শুনেছি, কিন্তু তাঁকে চাক্ষুষ দেখি নি। একদিন আমি আর একজন পুরাতন কর্মী বাইরে থেকে একসঙ্গে আসছিলাম।

ডঃ দেবেন্দ্রমোহন বসু

জন্ম : 26.11.1885 মৃত্যু : 2.6.1975

গেটের মধ্যে ঢোকবার কিছু আগেই ফাইলের মত কিছু একটা হাতে নিয়ে সুদর্শন এক ভদ্রলোক ঠিক সেই সময়েই গেটে ঢুকছিলেন। আমরা একটু দাঁড়িয়ে গেলাম। আমার সঙ্গী একটু নিম্নকণ্ঠে আমাকে বললেন—ইনি হচ্ছেন ডক্টর ডি. এম. বোস, স্যার জগদীশের ভাগিনেয়—সায়েন্স কলেজের অধ্যাপক। যতক্ষণ তিনি বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন ততক্ষণ তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম—কি সুন্দর চেহারা! চোখে মুখে যেন উজ্জ্বল অথচ স্নিগ্ধ দীপ্তি। এই একদিন মাত্র দেখেছিলাম। তারপর বহুদিন আর দেখি নি।

বিজ্ঞান মন্দিরের মধ্যস্থলে সবুজ ঘাসে ঢাকা একটি বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ, প্রাঙ্গণের পূর্বদিকে প্রকাণ্ড একটা নিমগাছ ছিল। গাছটার মোটা গুঁড়িটা ঘিরে চেয়ারের মত হেলান দিয়ে বসবার মত একটা আসন তৈরি করা হয়েছিল। পড়ন্ত বেলায় কর্তাব্যক্তিদের কেউ কেউ ওখানে বসে বিশ্রাম করতেন। তখন আমি উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ নিয়ে মাইক্রোস্কোপের কাজ করছি। বাকী সময়টা পোকা-মাকড় সংগ্রহ এবং সেগুলিকে যথাযথ ভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থায় ব্যাপৃত থাকতাম। একদিন সন্ধ্যার কিছু আগে নিমগাছটার কাছাকাছি আগাছার ঝোপের মধ্যে একমনে পোকা-মাকড় সংগ্রহ করছিলাম। অলক্ষিতে কখন ডক্টর বোস এসে নিমগাছের আসনটাতে বসেছিলেন, মোটেই টের পাই নি। হঠাৎ তিনি আমাকে ডেকে বললেন—আপনি ফ্যাবারের বই পড়েছেন? অসম্মতি-সূচক জবাব দিতেই তিনি বললেন—বইখানা পড়ে দেখবেন—নিজের চোখে দেখে কতরকম কীট-পতঙ্গের ক্রিয়াকৌশল, আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে কত অদ্ভুত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। আমি অবাক হয়ে গেলাম—ফিজিক্সের লোক হয়েও কীট-পতঙ্গ সম্বন্ধে তাঁর এত উৎসাহের সৃষ্টি হলো কেমন করে!

এর পরে অনেক দিন পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে আমার আর যোগাযোগ ঘটে নি। ঘনিষ্ঠভাবে যোগাযোগ ঘটলো 1938 খৃস্টাব্দে, যখন তিনি বসুবিজ্ঞান মন্দিরের ডিরেকটরের পদে যোগদান করেন। ইতিমধ্যে কীট-পতঙ্গ সম্বন্ধে আমার কিছু কিছু লেখা দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি ডিরেক্টর হয়ে আসবার আগেই আমার সম্বন্ধে আচার্য জগদীশচন্দ্রের কাছে কিছু শুনে থাকবেন। এখানে আসবার পর একদিন তিনি আমাকে বসুবিজ্ঞান মন্দিরের ট্রানজাকশনস্-এর বাইরে প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক নিবন্ধগুলি দেবার অনুরোধ করলেন। তাঁর কথামত লেখাগুলির রিপ্রিন্ট তাঁকে পড়তে দিলাম। অল্প কিছুদিন বাদেই—

তিনি ঐসব গবেষণা নিয়ে আলোচনা করলেন। কয়েকটি কাজ সম্বন্ধে তিনি আগ্রহ দেখালেন। ফ্যাবারের বই-এর নাম করে যে দিন তিনি আমাকে অযাচিত ভাবে উপদেশ দিয়েছিলেন—সেদিনের মতই বিস্মিত হলাম। কীট-পতঙ্গ সম্বন্ধে তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান এবং উৎসাহের পরিচয়—তারপর বহুবার পেয়েছি। শুধু কীট-পতঙ্গ নয়, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ছিল তাঁর অবাধ গতায়াত। যার প্রমাণ—বসুবিজ্ঞান মন্দিরের গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি বার বারে দিয়েছিলেন। যাই হোক, আচার্য জগদীশচন্দ্রের মৃত্যুর পর ডঃ বোসের কাছে পেলাম গবেষণার প্রেরণা এবং শিক্ষা। তিনি ছিলেন আদর্শ শিক্ষক। বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁরা তাঁর কাছে শিক্ষা নিয়েছিলেন, তাঁদের কাছে শুনতাম তাঁর প্রশংসা। গবেষণাগারে তাঁর কাছে নির্দেশ ও শিক্ষা পাবার পর বুঝেছিলাম—তাঁর ছাত্ররা কেন তাঁকে শ্রদ্ধা করে। আমার সৌভাগ্য তাঁর কাছে 33 বছর কাজ করেছি, শিক্ষা পেয়েছি। আচার্য জগদীশচন্দ্রের পর তাঁর মত শিক্ষক পেয়েছিলাম বলেই হয়তো কিছু সামান্য কাজ করতে পেরেছি। বসুবিজ্ঞান মন্দিরের গবেষক হিসাবে দেশ-বিদেশের বহু খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকের সান্নিধ্য পেয়েছিলাম। কিন্তু ডঃ বোসের মতো শিক্ষক পাই নি। তিনি আমাদের ডিরেক্টর মাত্র ছিলেন না। তাঁর সঙ্গে বৈজ্ঞানিক বিষয় নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করতে পারতাম, প্রশ্ন করতে পারতাম, তর্ক করতে পারতাম। নিজের পছন্দসই কাজ করবার স্বাধীনতাও পেতাম। তুলনার জন্য নয়, নিছক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলতে গেলে বার বার মনে হয় আচার্য জগদীশচন্দ্রের কাছে যেখানে আড়ষ্ট বোধ করতাম, সেক্ষেত্রে ডঃ বোসের কাছে বোধ করতাম স্বাচ্ছন্দ। আভিজাত্যমণ্ডিত এক প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন রাশভারি মানুষ ছিলেন ডঃ বোস। নিয়মানুবর্তিতায় কঠোর মানুষটি চলতেন ঘড়ির কাঁটা ধরে।

একবার ডঃ বোস আমাকে ডেকে বললেন, লজ্জাবতী, নেপচুনিয়া, স্প্যাগাজিনি, কামরাঙা প্রভৃতি স্পর্শকাতর উদ্ভিদ সম্বন্ধে আচার্য জগদীশচন্দ্রের সিদ্ধান্তগুলিকে আরো দৃঢ়তর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করবার তিনি পরিকল্পনা করেছেন। আর এই কাজে তিনি আমাকেও উৎসাহিত করলেন। প্রসঙ্গতঃ মনে পড়ে—এক সময়ে উদ্ভিদের উপর যখন কাজকর্ম চালাচ্ছিলাম তখন লক্ষ্য করেছিলাম লজ্জাবতী-লতার পালভাইনাসে যে দানাদার বস্তুগুলি আছে সেগুলি বিদ্যুৎস্পর্শে সংকুচিত হয়। পালভাইনাসের ফোলা অংশের নীচের দিকটি কেটে বাদ দিলে লজ্জাবতী পাতা নীচে হেলে পড়ে। আবার ফোলা অংশের উপরের দিকটা কেটে বাদ দিলে পাতাগুলি উঠে পড়ে, হেলে পড়ে না। একই সময় কলমিলতা নিয়েও পরীক্ষা চালাচ্ছিলাম। কলমিলতার কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদ করবার পর লক্ষ্য করলাম কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ওর ভিতরে নতুন ধরনের কোষ উৎপন্ন হয়েছে। প্রস্থচ্ছেদের পর এ ধরণের কলাবিন্যাসের অভিজ্ঞতা ছিল না। আচার্য জগদীশচন্দ্রকে সমস্ত পর্যবেক্ষণের ফলাফল জানালাম। তিনি উৎসাহিত হয়ে একটি লেখা তৈরি করে দিতে বললেন। যথাসময়ে তাঁকে লেখা দিলাম। লেখাটা পড়বার পর তাঁকে কিছুটা চিন্তিত দেখলাম। পরে তিনি জানালেন যে, লেখাটা প্রকাশ করা হবে না। খুবই ক্ষুণ্ণ হয়েছিলাম। ক্ষোভ থেকে ঠিক করেছিলাম উদ্ভিদ নিয়ে কোনও কাজ করবো না। তাই হঠাৎ দীর্ঘদিন বাদে ডঃ বোসের আহ্বান পেয়ে মনে মনে খুশি হয়েছিলাম। প্রচণ্ড উৎসাহে কাজ আরম্ভ করলাম। নানা রকম পরীক্ষার ফল হল আমরা যা চাইছিলাম তার বিপরীত। ডঃ বোসকে বললাম। তিনি আরো কয়েকজনকে দিয়ে আমার পরীক্ষাটা করালেন। প্রতিবারই ফল হল একই। 33/34 বৎসরের মধ্যে তাঁকে এতটা বিচলিত হতে আর কোনদিনই আমি অন্তত দেখি নি। গবেষণার কাজ হয়ে গেল। লজ্জাবতীলতা দিয়ে এই পরীক্ষা বিজ্ঞান মন্দিরে তারপর আর হয় নি। অন্তত আমার জানা নেই। কিন্তু ডঃ বোস এই পরীক্ষার ফল লিখিতভাবে প্রকাশের অনুমতি দিলেন। কিছু অংশ প্রকাশিত হল বসুবিজ্ঞান মন্দিরের ট্রানজ্যাকশন্‌স্ এ। (উৎসাহী পাঠকের জন্য গবেষণাপত্রটির নাম দেওয়া হল 'অন দি কেমিক্যাল নেচার অব সাবস্ট্যানসেস্ হুইচ আর (1) এফেকটিভ ইন দি ট্রানস্মিশন অব একসাইটেস্ ইন মাইমোসা পাডুকা, অ্যাণ্ড (2) 'একটিভ' ইন দি কনট্র্যাকশন অব ইটস পালভাইনাস'—বি. ব্যানার্জি, জি. ভট্টাচার্য, ডি. এম. বোস, 1946, ট্রাকজ্যাকশন্‌স্, 1944-46, পৃঃ 155-176)।

উদ্ভিদের উপর তারপর আর কাজকর্ম করবার সুযোগ না হলেও, ডঃ বোসের প্রচেষ্টায় কীট-পতঙ্গ সম্পর্কিত গবেষণার অধিকতর সুযোগ পেয়েছিলাম। তখন পিঁপড়ের 'পলিমরফিজম' সম্পর্কে কাজ করছিলাম। প্রায়ই তিনি নানাভাবে উৎসাহ দিতেন। একদিন তিনি আমাকে বললেন, আমেরিকায় একটা নতুন জিনিষ দেখা গেছে। ওখানকার পেনিসিলিন স্ট্রেপটোমাইসিন কারখানায় অ্যান্টিবায়োটিক উপাদানের পরিত্যক্ত অংশ খেয়ে মুরগী আর শূকররা বেশ মোটা হয়ে যাচ্ছে। তিনি এই পরীক্ষাটা পিঁপড়ের উপর করবার জন্য বললেন। লিটারেচারের নামও এনে দিলেন। ডঃ বোসের কথামত পিঁপড়েদের পেনিসিলিন খাওয়াতে শুরু করলাম। দেখা গেল পেনিসিলিন খাওয়া পিঁপড়েদের ডিম থেকে যেমন

কর্মী পিঁপড়ে জন্মাচ্ছে তারা আকৃতিতে সাধারণ কর্মী পিঁপড়ের চেয়ে ছোট হয়ে পড়ছে। শতকরা প্রায় 60 ভাগ ছোট। ঐ একই সময়ে পরিবেশ অনুযায়ী দৈহিক রঙের পরিবর্তনের উপর কাজ করছিলাম। সেই জন্যে বিভিন্ন কাচের ট্যাঙ্কে অনেকগুলি ব্যাঙাচি (রানা টাইগ্রিনা) রেখেছিলাম। পিঁপড়ের উপর পেনিসিলিন প্রয়োগের পরীক্ষায় মনোমত ফল না পাওয়াতেই ব্যাঙাচির উপর পরীক্ষা করার বাসনা হয়। একদিন একটি ট্যাঙ্কে পেনিসিলিন মিশিয়ে দিলাম। দিন দশেক বাদে দেখলাম যে ট্যাঙ্কে পেনিসিলিন দেওয়া হয়েছিল তার ভিতরকার ব্যাঙাচিরা একই রকম আছে, হ্রাস বৃদ্ধি কিছুই ঘটে নি। অথচ অন্যান্য ট্যাঙ্কের ব্যাঙাচিরা ব্যাঙাচিত্ব ঘুচিয়ে ব্যাঙ হয়ে জলে সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে।

ডঃ বোসকে জানাতেই তিনি এলেন। দেখলেন, সব শুনলেন। গবেষণা চালাবার জন্য উৎসাহ দিলেন। নানা-ভাবে লিটারেচার সংগ্রহ করে, মূল্যবান সময় থেকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই গবেষণার জন্যে তিনি ব্যয় করলেন। ডঃ বোসের নির্দেশ মতই গবেষণার প্রাথমিক ফলাফল পাঠালাম সায়েন্স অ্যাণ্ড কালচার-এ। (দ্রঃ রিটার্ডেশন অব মেটা-মর্ফোসিস ইন ট্যাডপোলেস্ বাই অ্যান্টিবায়োটিক টিটমেণ্ট, সায়েন্স অ্যাণ্ড কালচার, মে, 1954)।

গবেষণার প্রাথমিক সাফল্যের পর তিনি এই গবেষণাকে পুরোদমে চালাবার জন্য পরিকল্পনা করলেন। ডঃ প্রমথনাথ নন্দী এলেন, পরে এলেন তরুণ গবেষক ডঃ অজিতকুমার মেদ্দা। এই গবেষণা চালাবার সময় দেখলাম ডঃ বোসের তরুণের উৎসাহ। প্রতিদিন বিকালে আসতেন। আলাপ-আলোচনা করতেন। এই গবেষণার সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য এই প্রাচীন বৈজ্ঞানিকের কাছে খুবই পরিষ্কার ছিল। তাঁরই অপরিসীম উৎসাহে এই গবেষণা বিদেশী বৈজ্ঞানিক মহলেও আলোচিত হতে থাকলো। বিদেশী বৈজ্ঞানিকেরা এলে তিনি এই গবেষণার বিষয়টি তাঁদের বলতেন, তাঁদের দেখাতেন এবং আমাদের নিয়ে আলোচনায় বসতেন। ডঃ হুমে, ডঃ চেন প্রমুখের কাছ থেকে এই কাজটি প্রশংসা পেয়েছে। দুঃখের বিষয়, এই গবেষণার মধ্যপথে আইনকানুন অনুসারে আমাকে অবসর গ্রহণ করতে হয়েছিল। কিন্তু ডঃ বোসের আরেকটি পরিচয় পেলাম এই সময়ে। তিনি জানতেন বিজ্ঞানীর ছুটি নেই, অবসর নেই। যতদিন তাঁর শারীরিক ক্ষমতা থাকবে ততদিন তার ছুটি নেই। অবসর গ্রহণের পর তিনি প্রায় অবৈতনিক গবেষক হিসাবে কাজ চালাবার ব্যবস্থা করে দিলেন। কঠোরভাবে যিনি নিয়ম-কানুন মেনে চলেন, তিনিই নিয়মভঙ্গ করে দেখালেন, তার যাবতীয় প্রয়াস-চিন্তা হচ্ছে গবেষণার স্বার্থে, গবেষণাগারের স্বার্থে। বিজ্ঞানের স্বার্থে তিনি কঠোর-কঠিন আবার বিজ্ঞানের স্বার্থেই তিনি ব্যতিক্রম ঘটাতে দ্বিধাগ্রস্ত নন।

ডঃ বোস বসু বিজ্ঞান মন্দিরে গবেষণার নতুন ধারা প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন। তিনি তৈরি করেছিলেন উন্নত মানের একদল বিজ্ঞানী। কাজের অবসরে তিনি ডুবে যেতেন অধ্যয়নে। বসুবিজ্ঞান মন্দিরে যত পত্র-পত্রিকা আসতো সব যেতো আগে তাঁর কাছে। তিনি পড়তেন। নোট নিতেন। তারপর পত্র-পত্রিকাগুলি বা তার অংশবিশেষ পাঠিয়ে দিতেন বিভিন্ন গবেষকদের কাছে। তারপর চলতো আলাপ-আলোচনা। আমরা যখন-তখন তাঁর কাছে যেতাম, আলোচনা করতাম, এমন কি তর্কও করতাম ডঃ বোসের সঙ্গে। অথচ দূর থেকে বোস ছিলেন মধ্যাহ্নের সূর্য।

33।34 বছরের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে বহু স্মৃতি জমে আছে, বহু কথা বলার আছে। তাঁর বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বের দিকটি এক বিরাট অধ্যায়। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রেও ডঃ বোসের অবদানের কথা অনেকেই জানেন না।

[সমকাল, কার্তিক (1382 বঙ্গাব্দ) সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত]

মহর্ষি কণাদ ঃ পরমাণুবাদ

প্রভাসচন্দ্র কর*

"জড়, শক্তি (energy) এবং প্রাণ—এই ত্রিগুণ দ্বারা দেখানো যেতে পারে—প্রাচীন হিন্দু দর্শনের তমঃ, রজঃ এবং সত্ব। এই তিন প্রাথমিক এককের সারমর্মময় প্রকৃতির ব্যাখ্যার দিকে মানব প্রচেষ্টা ও বুদ্ধি পরিচালিত হয়েছে সভ্যতার ঊষাকাল থেকে।

পদার্থের বিচ্ছিন্নতা (discontinuity) সম্বন্ধে সর্বপ্রথম প্রতিপাদ্য বিষয়টি কল্পিত হয়েছিল তিন হাজার খৃস্ট পূর্বাব্দে; বিষয়টি হিন্দু ও গ্রীক দার্শনিকগণের দ্বারা হয়েছিল প্রবর্তিত। পদার্থ যা প্রথম নজরে, বোধ হয়—অবিচ্ছিন্ন তাকে অসীম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত হতে পারে। তাই দার্শনিকগণ মনে মনে ধরে নিয়েছিলেন যে, সূক্ষ্ম বিশদ কণিকানিচয় (particles) দ্বারা গঠিত হয় জড় পদার্থ, কণিকাগুলি আর বিভক্ত করা চলে না এবং এগুলি পৃথক করা রয়েছে শূন্যস্থান দ্বারা। এই অনুমান মাফিকই ঐ প্রতিপাদ্য বিষয়"। একথা লিখেছেন প্রিয়দারঞ্জন রায়।[1]

এই যে 'হিন্দু দার্শনিকগণের' কথা বলা হয়েছে তাঁদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রয়েছে কার বিষয়ে? 'পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ করিলে প্রতীয়মান হইবে আণবিক পরিবর্তন জাগতিক পার্থক্যের অবধারিত কারণ। প্রাকৃতিক দৃশ্যমান জগতে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান লাভ করিয়াছেন দার্শনিক, তাই তাঁহার জ্ঞান সুনিবিড় অভ্রান্ত। তিনি তত্ত্বদর্শী সুমহান, সাধক-চিন্তাশীল, ঋষিপদবাচ্য। বহুর মধ্যে তিনি এক দেখিয়েছেন, তিনি সত্যদর্শন করিয়াছেন। তিনি শ্রবণ করিয়াছেন বিদ্যমানতার ঘোষণা, নিরন্তর পরিবর্তনের সরব ইঙ্গিত। নিত্য-চঞ্চল প্রকৃতির বুকে তিনি পাইয়াছেন মহান্ ঐক্য... জলপ্রপাতে, নদী-মোহনায়, প্রকৃতির কুঞ্জবনে তাঁহার নিকট প্রতিভাত এক আদি, অকৃত্রিম পরমাণু তত্ত্বের অপরিবর্তনীয় রূপমধুর বাণী, জীবন রহস্যের সুকোমল সমাধান।[2] এবার আমরা সম্মুখীন হলাম হিন্দু দার্শনিক-প্রবরের অন্তশ্চৈতন্য, সাধনার প্রতি- সেটি আর কিছু নয়—পরমাণু তত্ত্ব।' এই সুমহান্ তত্ত্বটি কি?

সে কথা বিশদভাবে বলবার আগে প্রাচীন দার্শনিক মতবাদ সম্বন্ধে কিছু ধারণা থাকা দরকার। কোন কোন পরিদৃশ্যমান জাগতিক ব্যাপার পড়ে থাকে দর্শন ও বিজ্ঞানের প্রান্ত সীমায়। রবিবাবুর[3] কথায় বলতে হয় 'রাত্রির আরম্ভে ও শেষে যে আলো-অন্ধকারের সঙ্গম'। সেই প্রান্তরটা যে দার্শনিকগণই তাঁদের প্রজ্ঞার আলোয় আরও ভালোভাবে দেখতে পান সাধারণ বিজ্ঞানীদের চেয়ে! হয় তো এ রাজ্যের হদিশ দেন দার্শনিক, আর বিজ্ঞানীকে প্রবুদ্ধ করেন সেই অনুমানলব্ধ জ্ঞানকে সপ্রমাণ করতে! বিজ্ঞানের দর্শনে তারই নামইতো হাইপোথিসিস। এ রকম ক্ষেত্রে দার্শনিকের আপাত বা বাহ্যত তমসার অর্থাৎ অমীমাংসিত সমস্যার প্রতি বিজ্ঞানীর আলোর উদ্ভাস যেন 'the night so quickly glides into the day, that twilight scarcely makes a bridge between them. And beautiful is the moonlight of the south'![4]

তখন দার্শনিকের প্রজ্ঞা-বিজ্ঞান চন্দ্রমার আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে পূর্ণত্ব লাভ করে! এখানেই তার পরিণতি, পূর্ণ বিকাশ। এ যেন কবিস্মৃত নরওয়ে দেশ—যাকে চিহ্নিত করা যায় ওখানকার ভাষায়—mitternacht sonne im hohen norden অর্থাৎ নিদাঘ যেখানে জানে না শর্বরী। দিবা ও রাত্র যেমন সেখানে প্রভেদ করা চলে না, দর্শন ও বিজ্ঞানের ভূমিকাও এসব ক্ষেত্রে অনুরূপ নয় কি?

এত ভণিতার পিছনে রয়েছেন আলোচ্যমান মহর্ষি কণাদ। প্রকৃত নাম উলূক এবং তৎপ্রণীত দর্শনশাস্ত্র ঔলূক্য নামে খ্যাত। 'কণান্ অত্তি ইতি বা কণ্‌ভুক্'—এ ভাবে ব্যক্ত করেছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, Bengal Technical Institute-এর ভাবণে।[5] সচরাচর প্রাচীন ভারতবর্ষে যেমন হয়ে থাকে এ ক্ষেত্রেও তেমনি হয়ে রয়েছে। কারণ মহর্ষির বিষয়ে আমরা অপরিজ্ঞাত। এঁর বংশগত নাম কশ্যপ। পরে কণাদ নামে পরিচিত। এ ধরনের নামকরণের কারণ তাঁর ধুঘুবৃত্তি:

'Kanada is only a nickname since the sage led the mode of life of a dove and lived on rice particles collected from the streets.

Isvara who appeared before him in the form of an owl (uluka) instructed him. This "Darsana" is therefore called Aulukya'[6]

বলা হয়ে থাকে যে কণাদ ছিলেন মৈথিলী[7] (ত্রিহুত জেলার সমবিস্তৃত ছিল প্রাচীন মিথিলা প্রদেশ—গঙ্গা ও মধ্যবর্তী প্রদেশটুকু—যার পশ্চিমে গণ্ডক নদ এবং পূর্বে ছিল পুরাতন কুশী নদী পূর্ণিয়ায়)।

*182/2, গোপাল লাল ঠাকুর রোড, বনহুগলী, কলিকাতা-700 035

ষড়্‌দর্শন

মহর্ষি কণাদ বৈশেষিক দর্শনের উদ্গাতা। এখন ষড়্‌দর্শন কি? 'জৈন দার্শনিক প্রাচীন হরিভদ্র স্বরি—বিরচিত "ষড়দর্শন সমুচ্চয় প্রভৃতি কোন কোন গ্রন্থে ষড়দর্শনের ভিন্ন ভিন্ন নামের উল্লেখ থাকিলেও কপিল প্রভৃতি মহর্ষিগণের প্রকাশিত (1) সাংখ্য দর্শন, (2) বৈশেষিক দর্শন, (3) ন্যায় দর্শন, (4) পাতঞ্জল দর্শন, (5) পূর্ব মীমাংসা দর্শন এবং উত্তর মীমাংসা বা (৬) বেদান্তই ষড়্‌ বলিয়া এতদ্দেশে পণ্ডিত সমাজে প্রসিদ্ধ আছে। এ বিষয়ে একটি প্রাচীন শ্লোকও পাওয়া যায়। যথা—

কপিলস্য কণাদস্য গৌতমস্য পতঞ্জলে:।
জৈমিনের্ব্যাসদেবস্য দর্শনানি ষড়েব হি ॥[৪]

এগুলির মধ্যে "বেদান্ত বলিয়াছেন ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা বা মায়া বা অবিদ্যা। সাংখ্য জগৎকে মিথ্যা বলেন নাই কিন্তু সাংখ্যের মতও এই যে ব্যবহারিক জগৎ-ই খাঁটি সত্য নয়। বস্তুগুলি পঞ্চভূতের সমাবেশ মাত্র। ......গোতম ও কণাদ ব্যবহারিক জগৎকে এরূপভাবে অসত্য বলেন নাই, কিন্তু তাঁহারাও ব্যবহারিক জগৎকেই চরম সত্য বলিয়া নির্ধারণ করেন নাই'।[৭]

কণাদের পরমাণুবাদ ও গ্রীক এপিকুরিয়ান

কণাদের পরমাণুবাদে গ্রীক উৎস-মূল আরোপ করা নি:সন্দেহে প্রলোভনময়। কিন্তু গ্রীক-প্রভব থেকে সত্যই যদি পরমাণুবাদ ধার করা হয়ে থাকে, তবে এ বিষয়টা কি আশ্চর্য ঠেকবে না যে, কণাদে পরমাণুগুলিকে কখনই মনে করা হতো না যে সেগুলি দৃশ্যমান পরিমাপ পরিগ্রহ করে থাকে যতক্ষণ তিন দ্ব্যণুকে* (দ্বি+অণুকে) সম্মিলন না ঘটে ('Kanada's atoms are supposed never to assume visible dimensions till there is a combination of three double atoms')...Epicurean লেখকগণের মধ্যে এ ধরণের কিছু ছিল তা আমি মনে করতে পারি না। পরমাণু আখ্যায়িত কণাদ-দৃষ্টিভঙ্গিকে একেবারে স্বাধীন সত্তা দেওয়ায় আমার মন লাগে—লিখলেন Max Muller[১০]

কণাদ ঃ সূত্রমঞ্জরি

এবার মহর্ষি প্রোক্ত বিভিন্নমুখী বিজ্ঞান প্রতিভামূলক সূত্রাদি বিষয়ে যৎসামান্য বর্ণনা দেওয়া যাক :

পৃথিব্যোপস্তেজো বায়ুরাকাশং কালো দিগাত্মামন ইতি দ্রব্যাণি॥ কণাদসূত্র 1।1।5॥ পৃথিবী জল অগ্নি বাতাস আকাশ (ইথার) কাল মহাকাশ নিজে স্বয়ং ও মন—এগুলি দ্রব্য। (শব্দ—পদার্থ নয়, কারণ তা বিরাজ করে অন্য দ্রব্যের উপর—এক দ্রব্যত্বাদদ্রব্যম্ ॥2।2।23॥)

সূত্রটি আমাদের চিন্তাধারায় অনেকদূর নিয়ে যায়। লিখছেন শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় :

'ব্রহ্মস্বরূপ প্রণবের ব্যাহৃতির দ্বারা অপরা জড় প্রকৃতির বাহ্য অধিষ্ঠান সম্পাদন হইলে পরে ব্রহ্মের 'বীক্ষণ' দ্বারা প্রকৃতি ক্ষোভিত হইলে 'মহত্তত্ত্ব' এবং ক্রমে ক্রমে সেই স্পন্দনেই 'অহঙ্কার তত্ত্বে'র সৃষ্টি হইয়া থাকে। তাহা হইতেই অর্থাৎ অহঙ্কার তত্ত্ব হইতে আকাশ প্রভৃতি পঞ্চ মহাভূতের সৃষ্টি হয়।

আবার এই আকাশ বা অম্বরের (ইথর) স্পন্দনে একদিকে তেজের উত্তাপ, আলোক-তাড়িৎ ও চুম্বক প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়া থাকে, অপরদিকে এই আকাশের বা অম্বরের কম্পন কৌশলে ক্রমে ঘনীভূত হইয়া hydrogen এবং তাহা হইতেই ক্রমে লৌহ, পারদ প্রভৃতি স্থূল মৌলিক পদার্থের সৃষ্টি হয় এবং ক্রমে তাহাদেরই পরস্পর সমবায়ে জল, বায়ু, মাটি অতি স্থূল মৌলিক পদার্থের সৃষ্টি হয় এবং তাহা হইতেই সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, তারকাদি সর্বত্র বিশ্বজগৎ সৃষ্টি হইয়াছে।'

রূপরসস্পর্শবতী পৃথিবী ॥ 2।1।1 ॥—পৃথিবীর রয়েছে রং, স্বাদ, গন্ধ ও স্পর্শ।

রূপরসস্পর্শবত্য অপো দ্রবাঃ স্নিগ্ধাঃ ॥ 2।1।2॥ জলের রয়েছে বর্ণ, স্বাদ, স্পর্শ এবং জল তরল ও স্নিগ্ধ (fluid and viscid)।

ত্রপুসীসলোহরজত সুবর্ণানামগ্নি সংযোগাদ দ্রবত্বমদ্ভি সামান্যম্ ॥ 2।1।7 ॥—টিন, লোহা, রূপা ও সোনা; তামা, পিতল, কাঁসা ইত্যাদির আভাস রয়েছে। (এখানে উল্লেখ করা যায় যে, শুক্ল যজুর্বেদে (আনুমানিক খৃস্টপূর্ব 1000) রূপা, তামা, সোনা, লৌহ, সীসা ও টিন—এই ছটি ধাতুর কথা আছে)।

বায়ু সম্বন্ধে—স্পর্শশ্চ বায়োঃ ॥ 2।1।9 ॥

বস্ত্রে গন্ধের অনস্তিত্ব বিষয়ে রয়েছে—পুষ্প বস্ত্রয়োঃ সতি সন্নিকর্ষে গুণান্তরা—প্রাদুর্ভাবো বস্ত্রে গন্ধ ভাবলিঙ্গম্ ॥ 2।2।1 ॥

জলের বৈশিষ্ট্য শীতলতা—অপ্‌ সু শীততা ॥ 2।2।5 ॥

অতঃপর অণু—পরমাণু সংক্রান্ত কয়েকটি সূত্র রয়েছে—

---

* মহদ্দীর্ঘবদ্ বা হ্রস্ব পরিমণ্ডলভ্যাস্ (2-2-11) মহৎ ও দীর্ঘ বস্তু যে ভাবে হ্রস্ব ও পরিমণ্ডল বস্তু থেকে উৎপন্ন হয়। শঙ্কর বৈশেষিক দর্শনের মত এই যে দুটি পরমাণু মিলিত হওয়ায় দ্ব্যণুক হয়, তিনটি পরমাণুর মিলনে ত্র্যণুক। পরমাণুর পরিমাণ অর্থে পরিমণ্ডল।—ব্রহ্মসূত্র : মাসিক বসুমতী, আশ্বিন, 1342।

অণুসংযোগত্বপ্রতিষিদ্ধ ॥ 4।2।4 ॥ পরমাণুদের সংযোগ (conjunctions) অস্বীকার করা যায় না।

বহুতর কারণাদি থেকে উৎপন্ন হয় বহুত্ব বা পরিমাপ—কারণবহুতাচ্চ ॥ 7।1।9 ॥

অতো বিপরীতমণু ॥ 7।1।10 ॥

অণুত্বমহত্ত্বয়োরণত্বমহত্ত্বাভব ॥ 7।1।14 ॥ সূক্ষ্মতা ও পরিমাপ বিষয়ক।

নিত্যম্ পরিমণ্ডলম্ ॥ 7।1।20 ॥—পরিমণ্ডল চিরন্তন।

তদ্‌ভাবাদণু মনঃ ॥ 7।1।23 ॥—মন অসীম মাত্রায় ক্ষুদ্র।

সংযোগ বিভাগয়োঃ সংযোগবিভাগাভাবোঽণুত্বমহত্ত্বাভ্যাং ব্যাখ্যাত ॥ 7।2।11 ॥ পরমাণুর সূক্ষ্মতা এবং পরিমাপ দ্বারা ব্যাখ্যাত হয় সংযোগ ও অসংযোগের (disjunction) অনস্তিত্ব।

'গুরুত্ব প্রযত্ন সংযোগানাম্ উৎক্ষেপণম্ ॥ 1।1।29 ॥—এটির মধ্যে নিহিতার্থ gravity, volition এবং conjunction।

পরমাণুবাদ এবং তারপর……

অণু পরমাণুর কল্পনা খুব পুরাতন। সাংখ্য দর্শন অণু-পরমাণুবাদ সত্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। ন্যায় দর্শনও পরমাণুবাদ মেনে নিয়েছিলেন। বৈশেষিক দর্শনে এই পরমাণুবাদ মহর্ষি কণাদের দ্বারা খুব পরিস্ফুট। মনে হয়, বৈশেষিক পরমাণুবাদই অন্যান্য সভ্য দেশের পরমাণুবাদ অপেক্ষা অনেক বেশি পুরানো। আর সে সময়ের তুলনায় অধিকতর পূর্ণতাপ্রাপ্ত।

জড় পদার্থ বিরাম বিচ্ছেদহীন একটানা দ্রব্য নয়। সব জড় পদার্থ পরমাণু-গঠিত। পরমাণুদের পরস্পরের মধ্যে রয়েছে শূন্যস্থান। পরস্পর পরমাণুদের মধ্যে একের প্রতি অন্যের স্বাভাবিক এক আকর্ষণ বা আসক্তি রয়েছে। মোটামুটি এই হলো মহর্ষি কণাদের মত।

এখন, জড় পদার্থের স্বরূপ নিয়ে অণু-পরমাণুর কল্পনা। সহজাত সংস্কার বা অন্তশ্চৈতন্য বা intuition যাই বলা যাক্ না কেন, 'অণু-পরমাণু কথা' সত্য হিসেবে দাঁড়িয়েছে অনেকের বিবেচনায়। কিন্তু যুক্তি তর্কের খাতিরে দেখলেও অণু পরমাণুবৎ এক এক সত্তার কল্পনার দ্বারে আমরা উপনীত হই না, কি?

এক খণ্ড মাটি। খণ্ড খণ্ড করলে ছোট ছোট মাটির টুকরায় দাঁড়ায়। এই ছোট ছোট টুকরাগুলি ভেঙে ভেঙে অপেক্ষাকৃত ছোট এবং ক্রমে, সংক্ষেপে বলা যায়, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতর মৃৎপিণ্ড পাওয়া চলে। কিন্তু এর নিবৃত্তি কোথায়? এবং কি ভাবে?

প্রথম প্রথম জড় পিণ্ডগুলি আমাদের দৃষ্টিগোচর থাকবে। আরও আরও ছোট পিণ্ড হয়তো আর অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দেখা যাবে না। তারপর? অণুবীক্ষণের দৃষ্টি-সীমা ছাড়িয়ে আর দেখা যাবে না। কিন্তু তাই এটা বলা উচিত হবে না যে, সে অবস্থায় জড় পদার্থ-অস্তিত্বহীন। অস্তিত্ব ঠিক থাকবে। তা আমরা দেখতে পাই আর নাই পাই!

এই রকম দফায় দফায় বিভাগের ফলে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর এবং অন্তিমে ক্ষুদ্রতম মৃৎপিণ্ডে পৌঁছানো সম্ভব। এই ক্ষুদ্রতম (যেহেতু এর পর ঐ মৃৎপিণ্ডের বিভাগ করা চলবে না) সত্তাকে যদি বলপূর্বক ভাগ করবার চেষ্টা হয়, তবে কি হয়? এ অবস্থায় মাটির স্বধর্ম বা প্রকৃতি এ সত্তার মধ্যে কোথায়? স্বধর্ম লোপ পেয়ে গেল?

তা তো হবেই। মৃত্তিকা—যৌগিক পদার্থ (chemical compound)। এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রতম সত্তাটি মৃত্তিকার অণু (molecule)। আবার, এই অণুকে ভাগ করা যায়—তখন তার পরিণতি পরমাণুতে (atom)—মৃত্তিকা যে সব মৌলিক পদার্থ (element) দ্বারা গঠিত সেগুলি এসে পৌঁছানো যাবে!

পরমাণু—পরম অণু

পরমাণুবাদ বৈদিক যুগের পরে উদ্ভূত। অতি সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম অবিভাজ্য অংশ পরমাণু। এখন, আমরা জানি যে, যৌগিক পদার্থের এক একটি অণু আর কিছুই নয়—বিবিধ ধর্ম বা গুণসমন্বিত ও সংখ্যাবিশিষ্ট মৌলিক পদার্থসমূহের সমষ্টি বা সমাহার মাত্র—পরস্পর বিযুক্ত নয়—কোনো অজ্ঞাত আকর্ষণ-বলের দরুণ সুদৃঢ়ভাবে গ্রথিত!

মৌলিক পদার্থেরও অণু রয়েছে। এ ধরনের এক একটি অণু ঐ মৌলের বা মৌলিক পদার্থের এক বা একাধিক পরমাণুর সমবায়ে গঠিত হয়। একই মৌলিক পদার্থের এই সব অণু ও পরমাণুর মধ্যে প্রকৃতিগত বিশেষ কিছু পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু আসল প্রভেদটুকু কোথায়? প্রভেদ দাঁড়াচ্ছে সংখ্যায়।

বিজ্ঞানে আধখানা জিনিষের কোনো গুরুত্ব নেই! জনৈক বিজ্ঞানীর ভাষা এ বিষয়ে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ: রসায়নী মুদ্রা লেনদেনে পরমাণু হচ্ছে ক্ষুদ্রতম মুদ্রা ('atom i.e. the smallest coin in a chemical currency')। পাই (pie) যেমন সবচেয়ে ছোট মুদ্রা, ঠিক সেই রকম পরমাণু, তদর্থে atom, অপেক্ষা ক্ষুদ্র সত্তা (entity) নেই যা দিয়ে রসায়ন-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে লেনদেন অর্থাৎ ক্রিয়া-বিক্রিয়া বা reaction চলতে পারে।

আবার, মেরু পর্বতকে বিভাগ করা যাক। বিভাগ করা যাক একটি সর্ষপকে। উভয়ের বিভাগ-করণে যদি শেষ না থাকে তাহলে অনন্ত বিভাজ্যত্বহেতু

উভয়ের তুল্যতা এসে পড়ে। আমরা তখন একটা সূক্ষ্ম বিভাগে এসে পৌঁছাব—যা নিরবয়ব—এই সত্তাই 'পরমাণু'। (নিঃ+অবয়ব=নিরবয়ব)।

মহৎ বস্তু অনেক অবয়ব সমন্বিত দ্রব্যে গঠিত হলে এবং তাতে রূপ থাকলে তবে প্রত্যক্ষ হয়। রূপ সংস্কারের এই অভাবের দরুণ বায়ু প্রত্যক্ষ হয় না। উদ্ভূতত্ব—রূপাদিগত বিশেষ ধর্ম, সকল রূপে তা থাকছে না। পুষ্পের ক্ষুদ্র কণিকা আহরণ করায় বায়ু বিতরণ করছে সৌরভ, সে কণিকার অবশ্যই রূপ আছে—তবে সে রূপ উদ্ভূত নয়।

এই ভাবে আমরা উপনীত হচ্ছি পদার্থের গভীর থেকে গভীরতরে এবং বুঝিবা গভীরতম অবস্থায়। এখানে আমরা এসে পড়লাম শরৎচন্দ্রের দর্শনে: 'এই ব্রহ্মাণ্ডে যাহা যত গভীর,—যত সীমাহীন—তাহা ততই অন্ধকার। অগাধ বারিধি মসীকৃষ্ণ, অগম্য গহন অরণ্যানী আঁধার; ...যাহাকে বুঝি না, জানি না,—যাহার অন্তরে প্রবেশের পথ দেখি না—তাহাই তত অন্ধকার।'

যা হোক এই পরমাণুতত্ত্বের কল্যাণে আজ আমরা আমাদের বিচারধারা অনেক দূর অগ্রণী করতে সমর্থ। তাই নয় কি? আমাদের ব্যক্ত করার ভাষাতেও এসে যাচ্ছে কণাদোক্ত পরিভাষা—'দ্ব্যণুক' ..ইত্যাদি। স্বামী বিবেকানন্দের[১২] বিবরণ এ ধরনের একটি প্রতীকী দৃষ্টান্ত হিসেবে গৃহীত হতে পারে। তিনি লিখেছেন—

"দ্ব্যণুক ত্রসরেণু হইতে আরম্ভ করিয়া মহা আধ্যাত্মিক বলসম্পন্ন মনুষ্যের সহিত এই দৃশ্যমান জগৎ প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তিত হইতেছে। এই মুহূর্তে যেথায় আছি, পর মুহূর্তে সেই স্থান হইতে অন্যত্র নীত হইতেছে।

এই নিরন্তর পরিবর্তন অন্তর্জগৎ ও বাহ্যজগৎ উভয়েই হইতেছে।"

'অরূপ প্রকৃতি থেকে কি ভাবে সত্ত্ব, রজঃ ও তমগুণের বৈষম্যের ফলে সারা বিশ্বের প্রকাশ হলো! পঞ্চভূতের তন্মাত্র থেকে কিভাবে স্থূলকণায় এসে ঠেকলো সৃষ্টি! আবার স্থূল কণা সংযোগ ও বিশ্লেষণের ফলে কিভাবে আপাত-দৃশ্যত বস্তুর মধ্যে রূপ, রস, গন্ধ প্রকাশ পেয়েছে—হিন্দু বৌদ্ধ দার্শনিকেরা কি ভাবে দৃশ্য জগতের আকাশ বাতাস জল-স্থলের অবস্থান ও ব্যবহার বুঝতে চেষ্টা করেছেন'[১] মানুষ যুগান্তরে।

সমাদৃত পরমাণুবাদ ঃ বিশ্বব্যাপী শ্রদ্ধাঞ্জলি

তবে মূল বিষয়টি বলার আগে একটি সাবধান বাণী পাঠকবর্গকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া উচিত: 'ভারতীয় ঋষিদিগের নির্দেশানুসারে জ্ঞান লাভ করিবার পদ্ধতি মূলত চারিটি—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান এবং শব্দ। ...বস্তুর পরিমাপ করিবার বিধি প্রসঙ্গে বৈশেষিক দর্শনে 'অণু' ও 'মহৎ' সম্বন্ধে কয়েকটি সূত্র আছে। বৃহৎ বৃহৎ অবয়বসম্পন্ন বস্তু সম্যক ভাবে বুঝিতে হইলে তাহা কত ক্ষুদ্রাংশে বিশ্লিষ্ট করিতে হয় এবং তাহা করিতে পারা যায়, ইহাই বুঝান এই সূত্রগুলির উদ্দেশ্য। অথচ এই সূত্রগুলিতে একটা অর্থহীন পরমাণুবাদ আরোপ করা হয়; সেই পরমাণুবাদের সার্থকতা যে অতি সামান্য...'[১৪]

'As early as 1200 B.C. the Hindoos had considered that matter was discontinuous ... The Greeks either borrowed this view or independently arrived at similar conclusions'—J. NEWTON FRIEND DSC PHD FIC (ed. by): A Text Book of Inorganic Chemistry vol I Chap II p. 24 London: Charles Griffin & Co. Ltd. 1919. All Rights Reserved.

'An early philosopher Kanada developed an atomic theory rivalling that of Lucretius (60 B C.) —J. W. MELLOR D. SC. FRS: A comprehensive Treatise on Inorganic and Theoretical Chemistry vol I.

'...One (guess) appears to have been promulgated by Kanada...long prior to the rise of the Grecian philosophy...a similar guess was profounded by Leucippus about 450 B.C. and advocated as doctrine...(420 B.C.)—by his disciple Democritus About 300 B.C. the same guess was elaborated by Epicurus...' —ibid p. 106.

'বৈশেষিক দর্শন ন্যায় দর্শনের সমান তন্ত্র। বৈশেষিক দর্শনের মূল কণাদের বৈশেষিক সূত্র এবং তাহার ভাষ্য-স্থানীয় প্রশস্তপাদের 'পদার্থ ধর্ম সংগ্রহ।'...(পঞ্চম শতাব্দীর শেষার্ধে প্রশস্তপাদের 'পদার্থ ধর্ম সংগ্রহ'কে ভিত্তি করে 'দশ পদার্থ শাস্ত্র' রচনা করেন চন্দ্র।...ব্যোম শিবাচার্যের ব্যোমবতী, পদ্মনাভ মিশ্রের সেতু, শ্রীবৎসাচার্যের লীলাবতীরও অবলম্বন প্রশস্তপাদের ঐ 'পদার্থ ধর্ম সংগ্রহ'। অতএব কণাদের বৈশেষিক সূত্র যদিচ বৈশেষিক দর্শনের গঙ্গোত্রী হয়, তবে প্রশস্তপাদের ঐ 'পদার্থ ধর্ম সংগ্রহ' উহার গোমুখী।'—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত: ন্যায় পরিচয় উত্তরা চৈত্র 1340 পৃঃ 628-630। (নিম্নরেখা মৎকৃত)।*

---

* সম্ভবত ন্যায় দর্শনের চেয়ে আরও পুরানো বৈশেষিক।' —(1) কর্তৃক উদ্ধৃত (EDOU and HUBER কর্তৃক সূত্রালঙ্কারের ফ্রেঞ্চ অনুবাদ থেকে)

'...'কণাদের মধ্যে আকর্ষণ ও বিকর্ষণের যে ভাবে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে বর্তমানের রাসায়নিক আসক্তির প্রথম রূপ দেখতে পাওয়া যায়।'—অধ্যাপক সত্যেন বোস: প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানে অগ্রগতি।

মহর্ষি কণাদ মতবাদ: পরবর্তী সংযোজন

মহর্ষি কণাদ প্রবর্তিত মতবাদ জ্ঞানরাজ্যে আমাদের অনেক দূর নিয়ে চলে। মাত্র কয়েকটি উল্লেখ এখানে প্রাসঙ্গিক বোধ হতে পারে। অক্ষপাদ বলছেন—অণুর্দ্বৌ পরমাণু স্যাৎ ত্রসরেণুস্ত্র ত্রৎত্রিভিঃ দুটি পরমাণুতে এক দ্ব্যণুক, এবং তিন দ্ব্যণুকে ত্রসরেণু। সুতরাং ত্রসরেণু $\frac{1}{6}$ অংশ পর্যন্ত গেলে অবিভাজ্য হয়—প্রাচীন দার্শনিকগণের ধারণা।

এরপর আরও রয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত রয়েছে—পরমাণুঃ স বিজ্ঞেয়ঃ। পতঞ্জলি (—1/40) স্বীকার করেছেন 'পরমাণু পরমমহত্ত্বা—'। মনু, টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র, গৌতম, নব্য নৈয়ায়িক চূড়ামণি রঘুনাথ শিরোমণি, বৌদ্ধ দার্শনিক কমলশীল, আচার্য বসুবন্ধু (খৃস্টীয় পঞ্চম শতাব্দী) প্রমুখের রয়েছে নিজ নিজ মতবাদ। সঙ্গত কারণে এগুলি থেকে এখানে নিবৃত্ত থাকা হয়েছে।

'চারিটি ত্র্যণুক মিলিত হইয়া অপর একটি চতুরণুক নামক বস্তু উৎপন্ন হয়। নৈয়ায়িকগণ ত্র্যণুককে সাবয়ব (স+অবয়ব) এবং প্রত্যক্ষ গ্রাহ্য বলিয়া স্বীকার করেন। এইভাবে ক্রমশ স্থূলবস্তু উৎপন্ন হইবে। এইরূপ কয়েকটি বস্তু মিলিত হইয়া একটি মহদ্ বস্তুকে উৎপাদন করিবে।

সূত্রসমূহ পুঞ্জীভূত থাকিলেও যেমন বস্ত্র হয় না তেমনই বস্তুর আরম্ভক অংশ সমূহ যে কোন প্রকারে একত্রিত হইলেই কোন বস্তু নির্মিত হইতে পারে না। পরমাণুসমূহ কোন কারণে পুঞ্জীভূত হইলেও উক্ত পুঞ্জীভূত পরমাণুও নিরবয়ব অবস্থাই হইবে—উহা কখনও সাবয়ব হইতে পারিবে না। এজন্যই পরমাণুর পুঞ্জীভাব অর্থাৎ একত্র অবস্থিতি মাত্রই বস্তুর আরম্ভক নহে। পরমাণু দ্বারা গঠিত বস্তু অবয়বী। অবয়বী নামক বস্তু স্থূল, প্রত্যক্ষ গ্রাহ্য।[15]

'পরমাণুবাদিগণও Empedocles-এর মতো Eleatic ও Heraclitic তত্ত্বের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সমন্বয় প্রণালী এম্পিডক্লিজ প্রণালী হইতে ভিন্ন প্রকারের।[16]

এইভাবে আমরা পর্যায়ক্রমে এসে পড়ছি এবং পরিচিত হচ্ছি Leukippus ও DEMOCRITUS এর-নামের সঙ্গে। পাশ্চাত্যে পরমাণু-তত্ত্বের আবিষ্কর্তা বা উদ্ভাবক এঁরাই। (Demokritos এ রকম বানানও পাওয়া যায়)।

The Vision of Dante-তে রয়েছে—

"Democritus,
Who sets the world at chance."

('Democritus who maintained the world to have been formed by the fortuitous concourse of atoms).

পরমাণু তত্ত্বের (atomic theory) সূত্রায়ণে বলতে পারা যায়, কণাদ ও সেই সঙ্গে ডিমোক্রিতাস দিয়েছিলেন Dalton-এর পূর্বাভাস, বেশ কয়েক শতাব্দী আগে। কণাদের মতবাদ আধুনিক বিজ্ঞানের মতবাদের সঙ্গে আশ্চর্যজনক রূপে অনুরূপ।' এমনি ভাবে বিষয়টির পরিসমাপ্তি আমরা ঘটাচ্ছি আচার্য প্রিয়দারঞ্জনের সুচিন্তিত মন্তব্যের সঙ্গে[17]।

নির্দেশ পঞ্জী

1. Acharyya Roy Commemoration Volume Calcutta 1932 pp. 139-40 (অনূদিত)।
2. শ্রীসুশীল কুমার ঘোষ B. L., বিদ্যাবিনোদ: বৈশেষিক দর্শন, বিশ্ববাণী আশ্বিন 1364 পৃ: 357।
3. মাসিক "বিচিত্রা"র পরিচালক অধ্যাপক শ্রীসুশীল চন্দ্র মিত্রকে লিখিত পত্র, বিচিত্রা 1339 পৃ: 161।
4. The Rt.—Hon. Lord Lytton: The Last Days of Pompeii Book IV.
5. বঙ্গবাণী, অগ্রহায়ণ 1330 পৃ: 422 দ্রষ্টব্য।
6. Tarkarnava Panditratna: Kanada's Vaiseshika Darsana with Rasayana—commentary Sri Uttamur T. Viraragha—Vacharya. First Edition 1958
7. R. L. Thakur: The Statesman (letter to) March 14, 1977.
8. মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, কাশী: বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের সিউড়ী অধিবেশনে দর্শন শাখা সভাপতির অভিভাষণ (উত্তরা 1ম বর্ষ, 8ম সংখ্যা, বৈশাখ, 1333 পৃ: 313)।
9. শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত: চিন্তা জগতের বর্তমান গতি উত্তরা, অগ্রহায়ণ, 1337 পৃ: 61।
10. Indian Philosophy p. 83 (অনূদিত)।
11. সৃষ্টি-সমস্যা, পঞ্চপুষ্প চৈত্র 1339, পৃ: 473।
12. স্বামী বিবেকানন্দ: ধর্ম=মীমাংসা ও রামকৃষ্ণ-দর্শন, ভারত, ফাল্গুন 14 (বৃহস্পতিবার); 1342 2য় বর্ষ, 2য় খণ্ড, 35শ সংখ্যা (শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব সংখ্যা) সম্পাদক—স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দ

Printed and published by Swami Chandreswarananda, 1 Chitpore Bridge Approach, Baghbazar, Calcutta at the M. I. Press, 292-8, Upper Chitpore Road, Caltutta

13. অধ্যাপক সত্যেন বোস : প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানে অগ্রগতি।
14. বঙ্গশ্রী (সম্পাদকীয়) শ্রাবণ 1342, পৃঃ 134, 139।
15. অধ্যাপক শ্রীবিধুভূষণ ন্যায়-তর্ক-বেদান্ততীর্থ ; অজাতিবাদ, বিশ্ববাণী, ভাদ্র 1376, পৃঃ 356-359।
16. শ্রীতারকচন্দ্র রায় : পরমাণুবাদ
বঙ্গশ্রী, মাঘ, 1355, পৃঃ 168 171।
17. প্রিয়দারঞ্জন রায় : 32তম আচার্য জগদীশচন্দ্র স্মৃতি বক্তৃতা 1970 (অনূদিত)।

অতিরিক্ত বিবরণ পঞ্জী—
নব্য ভারত পৌষ 1330, পৃঃ 481-2 একচত্বারিংশ খণ্ড নবম সংখ্যা

কণাদ সূত্র বিষয়ক চারখানি প্রামাণ্য পুস্তক :

(1) Major B D. BASU I.M.S. (retired) (Ed. by) ; The Vaisesika Sutras of Kanada, translated by Nandalal Sinha MABL. second edition, revised and enlarged.

(2) The sacred Books af the Hindoos. Published by Sudhindra Nath Basu MB ; The Panini Office Bhuwaneswari Asrama Bahadurganj Allahabad 1923.

(3) HERMAN JACOBI, Prof. Univ. of Bonn, Germany : The Vaisesika Sutras of Kanada, Translated by Naadalal Sinha, Panini Office Allahabad 1911,

(4) Sri Jambuvijayaji (critically ed, by) : Vaisesika Sutra of Kanada. [Gaekwad's Oriental Series no. 136]. Oriental Institute. Baroda 1961.

হাল্কা উপাদানের কংক্রীট

শঙ্করীপ্রসাদ রায়*

ইমারতি-শিল্পে (Civil Construction) যে সব উপাদান ব্যবহৃত হয় তার মধ্যে অন্যতম হল কংক্রীট বা সাধারণ কথায় যা বালি, সিমেণ্ট, জল ও পাথরকুচি ইত্যাদির মিশ্রণ। কংক্রীট প্রধানত দু-রকমের উপাদান থেকে তৈরি করা হয়—(1) ভারী উপাদান—পাথরকুচি, লোহার টুকরা ইত্যাদি ; (2) হাল্কা উপাদান—কাদা, ছাই ও শিল্পের বর্জ্য পদার্থ। সাধারণভাবে ভারী উপাদানযুক্ত কংক্রীটের ব্যবহার বেশী দেখা যায় তবে হাল্কা উপাদানযুক্ত কংক্রীটের ব্যবহার অর্থনীতির দিক থেকে লাভজনক।

হাল্কা উপাদানযুক্ত কংক্রীটের ব্যবহারের প্রধান ছুটি সুবিধা হল এর ওজন ও তাপপরিবাহিতা ভারী ওজনযুক্ত কংক্রীট অপেক্ষা যথেষ্ট কম। তাপ কুপরিবাহী নির্মাণ শিল্পে হাল্কা উপাদান যুক্ত কংক্রীটের ব্যবহার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যে কংক্রীটের ক্ষেত্রে তাপের পরিবাহিতা ও ওজন দুটিকেই বিবেচনা করা হয় 'মাঝারি শক্তি সম্পন্ন কংক্রীট' (Moderate Strength Concrete), আঠাশ দিনের কংক্রীটের সংনমন ক্ষমতা (Compressive Strength) 17·25 Mpa অপেক্ষা বেশী তাকে গঠনগত দিক থেকে হাল্কা উপাদানযুক্ত কংক্রীট (structural light weight concrete) বলা হয়।

খৃস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে রোম, ইটালি প্রভৃতি জায়গায় বিভিন্ন স্থাপত্যে (যেমন রোমের প্যানথন) ও বিশেষ করে গম্বুজাকৃতি (Dome Shaped) ছাদ নির্মাণে হাল্কা উপাদানের কংক্রীটের ব্যবহার আজও সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শুধু রোম কেন, এই ধরনের স্থাপত্য পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বিজ্ঞানীমহলে রীতিমত আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। হাল্কা উপাদানযুক্ত কংক্রীটের গুণাগুণ প্রকাশে সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য হল এর উপাদানের আকৃতিগত ও গঠনগত পরিচিতি। যখন উপাদানগুলি মিহি (Fine) হয় তখন এর আপেক্ষিক গুরুত্ব, দানাদার (Coarse) উপাদানের আপেক্ষিক গুরুত্ব অপেক্ষা বেশী এবং সেইজন্য মিহি উপাদানযুক্ত কংক্রীট অনেক বেশী সহনশীল। যখন কংক্রীটে দানাদার উপাদান ব্যবহার করা হয় তখন এর মধ্যে বায়ু আটকে যায় (Air hole) ফলে এর আপেক্ষিক গুরুত্ব কম হয় এবং ঐ কারণে কংক্রীটের শক্তি কম হয়। সেক্ষেত্রে মিহি উপাদানযুক্ত কংক্রীটের আপেক্ষিক গুরুত্ব বেশী, সঙ্গে সঙ্গে সহনশীলতা অপেক্ষাকৃত ভাল। যে হাল্কা কংক্রীটের শক্তি ও এর উপাদানের অনুপাত (Ratio) বেশী হয় তা সামগ্রিক ভাবে উচ্চমানের। কংক্রীট রাস্তা তৈরির জন্য পূর্বে যে ভারী উপাদানযুক্ত কংক্রীট ব্যবহার করা হত তার তুলনায় হাল্কা উপাদানযুক্ত কংক্রীট ব্যবহারে এর স্কিড রেজিস্ট্যান্স (Skid Resistance) যথেষ্ট বৃদ্ধি করা হয়।

নানারকম প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম পদার্থ কংক্রীটের হাল্কা উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা হয়। নীচে তাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেওয়া হল—

(1) ঝামাপাথর (Pumice Stone) :—এটি হাল্কা, ছিদ্রযুক্ত পাথর বা বিশেষ ইঁটের টুকরা যা সিমেণ্ট কংক্রীটের সঙ্গে হাল্কা উপাদান হিসাবে সার্থকভাবে ব্যবহৃত হয়। এটি বাড়ী তৈরির বিভিন্ন কাজে যেমন ঢালাই ছাদ করতে বা মেঝে এবং তাক (Shelf) বা দেয়ালের অংশ বিশেষ তৈরি করতে, বড় শহরের ফুটপাথ তৈরি করতে এবং বিভিন্ন শিল্পে এর ব্যবহার আছে।

(2) ব্লাস্টফারনেস স্ল্যাগ (Blastfurnace slag)—লৌহ ও ইস্পাত তৈরির সময় গলিত লৌহের উপর সিলিকা অ্যালুমিনাযুক্ত যে হাল্কা অংশটি ভেসে থাকে তাই ব্লাস্টফারনেস স্ল্যাগ রূপে পরিচিত। যখন এই স্ল্যাগগুলিকে বাতাসে ঠাণ্ডা করা হয় তা কেলাসিত পাথরের মত রূপ নেয়। এই ধরনের স্ল্যাগগুলি air cooled slag নামে পরিচিত। যখন স্ল্যাগগুলিকে অতিরিক্ত জলে ঠাণ্ডা করা হয় তাহা দানাদার আকার নেয় একে granulated slag বলে কিন্তু যখন স্ল্যাগগুলিকে সীমিত পরিমাণ জলে ঠাণ্ডা করা হয় তখন এর মধ্যে জলীয় বাষ্প থেকে যায় এবং ফলে ছিদ্রাকার হয়ে যায়। এটি চলতি কথায় foamed slag নামে পরিচিত।

উপরিউক্ত এই তিন প্রকার স্ল্যাগগুলিকে প্রয়োজনীয় সাইজে বা আকারে নিয়ে আসার পরে কংক্রীটের উপাদান হিসাবে যথার্থ ভাবে ব্যবহার করা হয়। এইগুলির মধ্যে যা অপেক্ষাকৃত হাল্কা তা তাপকুপরিবাহী কংক্রীট ও কংক্রীট ব্লক, জলছাদ ইত্যাদির জন্য ব্যবহার করা হয় এবং অপেক্ষাকৃত ভারী স্ল্যাগগুলি ভারী ঢালাইয়ের (Reinforced concrete) কাজে ব্যবহার করা হয়।

(3) এক্সপাণ্ড পারলাইট (Expand Perlite) :—এটি Piolite শ্রেণীভুক্ত অতি হাল্কা অজৈব পাথুরে পদার্থ (Stone like)। এর মধ্যে স্থায়ী জলের পরিমাণ শতকরা 2 থেকে 6 শতাংশ হয়ে থাকে। এর ভিতরের গঠন পেঁয়াজের মত সমকেন্দ্রিক ধরনের (Concentric)। যখন পারলাইটকে এর গলনাঙ্কের চেয়ে উচ্চতাপে নিয়ে যাওয়া যায়—এটি

* সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপার্টমেণ্ট, রিজিওন্যাল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, জামসেদপুর-4

প্লাসটিক পর্যায়ে পৌছায় তখন এর সর্বত্র প্রসারণ হতে থাকে। এর মধ্যে কিছুটা বায়ু সঞ্চিত হয়ে যায় এবং তারপর যে কঠিন আকারের পদার্থটি তৈরি হয় তাই Expanded Perlite নামে পরিচিত। পারলাইটকে ছোট-বড় বিভিন্ন আকারের তৈরি করে ব্যবহারের উপযোগী করা হয়।

and Slates) :—হাল্কা এগ্রিগেট তৈরির কতকগুলি প্রাকৃতিক উপাদানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কাদা, সামুদ্রিক প্রাণীর খোলস, স্লেটপাথর ইত্যাদি। এই উপাদানগুলিকে মিশ্রিত করে উচ্চ তাপমাত্রায় সেমিপ্লাসটিক স্টেজে নিয়ে এলে এর প্রসারণ হয় এবং এইসব উপাদান থেকে উদ্ভূত গ্যাস একে

নীচের সারণীতে হাল্কা ওজনের কংক্রীটের গুণাগুণ উল্লেখ করা হল :—

এগ্রিগেট (Aggregate)	বাল্ক স্পেসিফিক্ গ্রাভিটি (Bulk Spceific Gravity)	ইউনিট ওয়েট (Unit Weight kg/m³)	ওয়াটার এবসরবেশন% (Water Absorption % by weight)
পিউমিস স্টোন্ (Pumice Stone)	1·25—1·65	480--880	20—30
ফোম্‌ড ব্ল্যাস্টফারনেস স্ল্যাগ Foamed Blastfurnace Slag)	1·15—2·20	400—1200	8—15
এক্সপানডেড পারলাইট (Expanded Perlite)	0·90—1·05	~160	10—30
ভারমিকুলাইট (Vermiculite)	0·85—1·05	~160	10—30
ক্লে, শেল, স্লেট (Clay, Shale, Slate	1·1—2·1	560—960	2–15
সিনটারড ফ্লাইঅ্যাস্ (Sintered Flyash	~1·7	590—770	14—24
স-ডাস্ট (Saw-dust)	0·35—0·6	128—320	10—35
পলিস্টিরিন ফোম্ (Polystyrene foam)	0 05	10—20	~50

Ref : Popóvics, Sandor, Concrete-Making Materials, Hemisphere Publishing Corporation Washington, 1979

4. ভারমিকুলাইট (Vermiculite) :—এর ধর্ম পূর্বোক্ত Expanded Perlite-র মতো। তবে এর কেবল রৈখিক প্রসারণই হয়ে থাকে। একে তাপরোধক কংক্রীটের উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

5. কাদা, শক্ত খোলস ও স্লেটপাথর (Clays, Shales

ছোট ছোট কক্ষযুক্ত ফাঁপা (Spongy Cellular Str.) এগ্রিগেট পরিণত করে। সেইজন্য এই ধরনের Aggregate তৈরির সময় এর উপাদানগুলি এমন ভাবে নির্ধারণ করতে হবে যাতে প্রয়োজনীয় গ্যাস উৎপাদন করতে পারে। প্রয়োজন অনুযায়ী এই এগ্রিগেটের উপাদানের আকৃতি ও

গঠন নির্ধারণ করা হয়। শক্ত উপাদানযুক্ত স্লেটপাথর এগ্রিগেটকে ঢালাইয়ের বা কংক্রীটের দেয়াল, ছাদ, পূর্বপীড়ন (Prestressed) সম্পন্ন কংক্রীট তৈরি করতে ব্যবহার করা হয় এবং অপেক্ষাকৃত হাল্কা এগ্রিগেটগুলিকে কংক্রীটের ব্লক বা অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

6. ভাসমান ছাই (Fly Ash) :—শিল্পপ্রধান অঞ্চলে, কলকারখানার চিমনী থেকে অনবরত ধোঁয়া সেই সঙ্গে ভাসমান ছাই ও কয়লার গুঁড়ো বেরিয়ে এসে বাতাসকে দূষিত করছে। কিন্তু যদি এই ভাসমান ধূলিকণা বা ছাই-গুলোকে হাল্কা ওজনের এগ্রিগেটের উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা যায় তা প্রথমতঃ পরিবেশকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করতে ও সঙ্গে সঙ্গে সস্তায় এগ্রিগেট তৈরির উপাদান হিসাবে ব্যবহারে সুবিধা করবে। কলকারখানা, চিমনী ও বায়ুমণ্ডল থেকে এইসব ভাসমান-কণাগুলোকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা যেতে পারে। এই হাল্কা এগ্রিগেটগুলি বিভিন্ন আকারের হয়ে থাকে তবে প্রত্যেক ক্ষেত্রে এটি কালো (Black) বা ধূসর (Grey) রঙের হয়। এই জাতীয় এগ্রিগেটগুলিকে বিভিন্ন ঢালাইয়ের কাজে ব্যবহার করা হয় বিশেষতঃ এইসব ভাসমান ধূলিকণার তাপ অপরিবাহিতা আছে বলে এটি তাপের অপরিবাহী (Insulator) কংক্রীটের উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

7. জৈব পদার্থ (Organic material) :—বিভিন্ন অজৈব পদার্থের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন প্রকারের জৈব পদার্থ যেমন খড়, ধানের কুঁড়ো, কাঠের গুঁড়ো, আখের ছিবড়া, কলমূলের খোসা—এইগুলি হাল্কা ওজনযুক্ত কংক্রীটের উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এইসব উপাদানগুলির মধ্যে উপস্থিত সেলুলোজ ও অন্যান্য জৈব পদার্থ (যেমন রেজিন) পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্টকে শক্ত ও জমাট বাঁধতে সহায়তা করে।

পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্টের সঙ্গে শক্ত কাঠের পরিবর্তে হাল্কা কাঠের গুঁড়ো ব্যবহার করলে এর কার্যকরী ক্ষমতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। এই ধরনের হাল্কা ওজনসম্পন্ন এগ্রিগেট মেঝে (Floor finish), দেয়াল, ঘরের ভিতরের ছাদ (Ceiling) তৈরি করতে বহুদিন ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এইসব আবিষ্কারে অনেক ক্ষেত্রে কংক্রীটে ব্যবহৃত বালির পরিমাণকে কম করতে সমর্থ হয়েছে। শুধু তাই নয় এটি প্লাস্টারের শুষ্কতা ও সংকোচনশীলতাকে (Shrinkage) কমিয়ে দেয়। এই প্রাকৃতিক জৈব পদার্থ ছাড়াও রাসায়নিক পদ্ধতিতে তৈরি জৈব পদার্থ যেমন Foamed Polystyrene, Resin ইত্যাদি হাল্কা ওজনের এগ্রিগেটের উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এইসব পদার্থ খুবই হাল্কাও তাপ কুপরিবাহী। এইগুলিকে এগ্রিগেটের উপাদান হিসাবে ব্যবহারের অসুবিধা হল—তা যথেষ্ট ব্যয়সাপেক্ষ (Uneconomical)। বিশেষ ক্ষেত্রে ছাদ, দেয়াল ও মেঝের মসৃণতা ও অন্যান্য গুণাবলীর জন্য ব্যয়সাপেক্ষ হলেও এই এগ্রিগেটগুলিকে ব্যবহার করা হয়।

[প্রবন্ধটি রচনায় সাহায্য করেছেন শ্রীনরেন্দ্রনাথ মল্লিক ও শ্রীচিরন্তন দেবনাথ]

মাতৃস্নেহ সৃজনে হরমোন

হারভার্ড মেডিক্যাল স্কুলে ইঁদুরের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে শাবককে খাওয়ানো এবং শত্রুর আক্রমণ থেকে তাদেরকে রক্ষা করার জন্য মা ইঁদুরের প্রবৃত্তি হরমোনের ওপর নির্ভর করে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে গর্ভাবস্থায় স্ত্রী ইঁদুরের দেহে এস্ট্রাডিওল এবং প্রোজেস্টারোনের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। শাবকহীন ইঁদুর এমন কি পুরুষ ইঁদুরের দেহেও এই হরমোন প্রয়োগ করে মাতৃস্নেহ জাগানো সম্ভবপর হয়েছে। গবেষক রবার্ট ব্রীজের মতে হরমোন প্রয়োগ মানুষের মধ্যেও অনুরূপ ভাবে মাতৃস্নেহ জাগ্রত করা সম্ভব।

[আজকের বিজ্ঞান, ঢাকা, বাংলাদেশ]

ভূমিকম্পের পূর্বাভাস কি ও কেন ?

শিবনাথ খা।*

উত্তর চীনের পিকিং (বর্তমানে বেইজিং)-এর পূর্বদিকে একটি শিল্পোন্নত শহর হেই-চেং (Hai-cheng। এই শহরের লোকবসতি প্রায় নব্বুই হাজারের মত। 1975 খৃস্টাব্দে 4ঠা ফেব্রুয়ারী, চীনে তখন শীতকাল—অত্যধিক ঠাণ্ডা পড়েছে তা সত্ত্বেও ঐ শীতকে উপেক্ষা করে হেই-চেং শহরের প্রায় সমস্ত লোকজন সন্ধ্যেবেলা বাড়ীর বাইরে খোলা জায়গায় এসে জড়ো হলেন। প্রত্যেকেরই মুখে একটা অজানা আতঙ্কের চিহ্ন। কিন্তু, কেন সেদিন ঐ শহরের লোকজন প্রচণ্ড ঠাণ্ডাকে উপেক্ষা করে বাইরে জড়ো হয়েছিলেন ? এর কারণ হল যে, চীনের ভূ-বিজ্ঞানিগণ দু-একদিন পূর্বে ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দিয়ে শহরের জনগণকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, ঐ দিন অর্থাৎ ফেব্রুয়ারীর চার তারিখ সন্ধ্যের দিকে ঐ শহরের আশেপাশে প্রবল ভূমিকম্প হতে পারে।

বিজ্ঞানীদের পূর্বাভাস অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়ে ঐ দিন অর্থাৎ 4-ঠা ফেব্রুয়ারীর সন্ধ্যেবেলায় সত্য-সত্যই হেই-চিং শহরে এক বিরাট ভূমিকম্প হয়। তখন সন্ধ্যা 7টা বেজে 36 মিনিট। কিন্তু, পূর্ব থেকেই সতর্ক করে দেওয়ার ফলে কোনো লোক আহতই হয় নি নিহত তো দূরের কথা। তবে সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি অবশ্য হয়েছিল। প্রতি দশটির মধ্যে প্রায় নয়টি বাড়ী হয় বিরাট ক্ষতিগ্রস্ত নতুবা ধ্বংস হয়ে যায়। তবে ঐ দিনটি নিঃসন্দেহে চীনের ভূ-বিজ্ঞানী এবং ভূমিকম্প-বিশেষজ্ঞদের কাছে একটি আনন্দের দিন।

1978 খৃস্টাব্দে পামীর মালভূমিতে যে বড় আকারের ভূমিকম্প হয় তা ঘটার ঠিক ছয় ঘণ্টা পূর্বে সোভিয়েত রাশিয়ার ভূ-বিজ্ঞানিগণ জানতে পারেন।

উপরে যে দুটি ঘটনার কথা উল্লেখ করলাম তা নিঃসন্দেহে ভূ-বিজ্ঞানী ও ভূমিকম্প-বিশারদদের বহু নিরলস গবেষণার ফল। এর ফলে এক নতুন দিগন্তের সূচনা হলো। মানুষকে অসহায়ের মত ভাগ্যের হাতে সঁপে দিয়ে মরতে হবে না, প্রয়োজনীয় দলিল-দস্তাবেজ মাটির নীচে চাপা পড়ে নষ্ট হবে না, প্রচুর পরিমাণ সম্পত্তির ক্ষতি হবে না। কয়েক বছর পূর্বেও ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দেওয়া যে সম্ভব এ ব্যাপারটা চিন্তাতেই আনা যেত না। কিন্তু, বর্তমানে এটি এমন একটি বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনা যে, বর্তমানে বেশ কিছুর তো বটেই, ভবিষ্যতে আরো ব্যাপকভাবে ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভবপর হবে।

ভূমিকম্প কি ? ভূ-স্তরে সঞ্চিত শক্তির হঠাৎ মুক্তিলাভের ফলে ভূ-ত্বকের উপরে যে কম্পন অনুভূত হয় তাই হল ভূমিকম্প। 'Plate Tectonics" বা "প্লেটের কাঠামো" নামে যে নতুন ভূ-তত্ত্বের সূত্রপাত হয় তার সাহায্যে বর্তমানে খুব ভালোভাবে ভূমিকম্পের ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব। এতে বলা হয় যে, আমরা যে ভূমির উপর বসবাস করি, তা আসলে 70 মাইল পুরু বারোটি ভূ-স্তরের দ্বারা গঠিত। এগুলি ঠিক ইঁটের মতো পরপর একটার উপর একটা তার উপরে আর একটা এইভাবে সাজানো থাকে। ভূ-বিজ্ঞানীদের মতে এইগুলি সবদাই গতিশীল। এই স্তর বা প্লেটগুলি যে সব স্থানে পরস্পরের গায়ে এসে লাগে সেখানে তারা ঘর্ষণবলের জন্যে সাময়িকভাবে একে অন্যের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। এই সংযুক্ত থাকার ফলে, স্তরের কিনারাগুলিতে প্রচুর চাপের সৃষ্টি হয়। এই চাপের ফলেই ভূ স্তরের পাথরে ফাটলের বা ফল্টের সৃষ্টি হয়। এই স্তরগুলির যে কোনো নীচের একটি স্তরে ফাটল ধরলে তার প্রভাব উপরের স্তরেও দেখা যায়। এর ফলে মুক্তি ঘটে এক বিশাল পরিমাণ শক্তির যার শেষ হয় সবচেয়ে উপরের স্তরে এসে ভূমিকম্পের আকারে।

আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ার মধ্যে দিয়ে এইরকম নয়-শ মাইল দীর্ঘ একটি ফাটল সান অ্যাণ্ড্রিজ (San Andreas) চলে গেছে। এই ফাটল ক্যালিফোর্নিয়া অঞ্চলে ঘন ঘন ভূমিকম্পের সৃষ্টি করে। প্যাসিফিক প্লেট ও আমেরিকান প্লেটের আপেক্ষিক গতির ফলেই এই ফাটলটির সৃষ্টি হয়েছে। 1905 খৃস্টাব্দে সান ফ্রান্সিসকোয় যে বিরাট ভূমিকম্প হয় তার কারণ হিসাবে বিজ্ঞানীরা বলেন যে, সান অ্যাণ্ড্রিজের একটি অংশ বহুকাল ধরে স্থিতাবস্থায় থাকার পর হঠাৎ গতিশীল হয় এবং এই হঠাৎ গতিশীলতাই হল ঐ ভূমিকম্পের কারণ। এই জাতীয় ফাটল পৃথিবীর যে সব এলাকায় আছে সে সব এলাকাগুলিই ভূমিকম্প-প্রবণ এলাকা বলে চিহ্নিত। প্যাসিফিক প্লেট ও ইউরেশিয়ান প্লেটের আপেক্ষিক গতির ফলে যে বিশাল চাপের সৃষ্টি হয় তার ফলে জাপানে ঘন ঘন ভূমিকম্প হয়।

ভূ-বিজ্ঞানিগণ ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করেন। একটি হল দি মেডিটেরিয়ানিয়ান অ্যাণ্ড ট্রান্স-এসিয়াটিক জোন (The Mediterrianian and Trans Asiatic Zone) এবং অপরটি হল সারকাম-প্যাসিফিক জোন (Circum-Pacific Rone)। প্রথম এলাকাটির মধ্যে ইউরোপের কিছু অংশ, উত্তর আমেরিকা, ককাসাস, পামীর মালভূমি, হিমালয় পর্বতমালা সন্নিহিত অঞ্চল, মঙ্গোলিয়া, চীন, তিব্বত, বালুচিস্তান, উত্তর ভারত, আসাম, ইরান, পাকিস্তান,

* 39, বারুইপাড়া লেন, পোঃ চাতড়া, হুগলী—712204

তুরস্ক, গ্রীস, বুলগেরিয়া, ইতালী, আলজিরিয়া ইত্যাদি দেশ পড়ে। দ্বিতীয় এলাকা অর্থাৎ সারকাম-প্যাসিফিক জোনের মধ্যে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম সমুদ্রোপকূলবর্তী অঞ্চল, কামচাটকা, জাপান, ফিলিপাইন, নিউজিল্যাণ্ড ইত্যাদি পড়ে।

সারা বিশ্বে, প্রতি বছরে ভূমিকম্পের ফলে গড়ে প্রায় 10,000—15 000 লোকের মৃত্যু হয় এবং প্রায় 7000 মিলিয়ন ডলারের মতো সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হয়। সুতরাং, ভূমিকম্প কি বিশাল পরিমাণ ক্ষতি করে তা সহজেই অনুমেয়। বিশেষজ্ঞগণের মতে, প্রায় প্রতি বছর একটি করে বড় বা ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প এবং কমপক্ষে গড়ে প্রতি মিনিটে দুটি করে যে কোনো ধরনের ভূমিকম্প ঘটে।

চার্লস. এফ. রিশটার (Chaales. F. Richter) সর্বপ্রথম ভূমিকম্পের পরিমাপ এবং এর দ্বারা মুক্তিপ্রাপ্ত শক্তির পরিমাপের স্কেল তৈরি করেন। এই ভূকম্পমাপন পরিমাপের স্কেলটি "রিশটার স্কেল" নামে পরিচিত। এই স্কেলের প্রতি একমাত্রা বৃদ্ধি দশগুণ বেশী ভূ-কম্পন এবং ত্রিশগুণ বেশী নির্গত শক্তির সমান। এই স্কেলে 2 মাত্রার ভূ-কম্পন অত্যন্ত কম এবং এটি প্রায় অনুভব করা যায় না। 5-মাত্রার ভূমিকম্প সামান্য ক্ষতি করতে পারে কিন্তু 7 মাত্রার ভূমিকম্প বেশ বড় ধরনের ভূমিকম্প এবং ক্ষয়ক্ষতি বেশ ভালই হয়। 8-মাত্রার ভূমিকম্প অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং বিধ্বংসী।

ভূমিকম্পের সঠিক পরিমাপ জানার জন্যে আর একটি ভূ-কম্প মাপন স্কেল প্রচলিত আছে। এর নাম "মডিফায়েড মারসেলী ইনটেনসিটি স্কেল" (Modified Mercalli Intensity Scale)। এর দ্বারা ভূ-কম্পনের পরিমাপ আরো সহজে বুঝা যায়। ভূ-পৃষ্ঠে ভূমিকম্পের ফলে কি প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তার সঠিক পরিমান এই স্কেলটির দ্বারা জানা। ভূমির যত বেশী কম্পন হবে তত বেশী ক্ষতি হবে এবং এই স্কেলের মাত্রাও তত বেশী হবে। 2 মাত্রায় এটি প্রায় অনুভব করা যায় না। 6-মাত্রায় ঘরের মধ্যেকার বড় বড় আসবাবপত্রের নড়াচড়া হয় এবং দেয়ালের প্লাস্টার খসে পড়ে। 12-মাত্রায় ক্ষতির পরিমান অত্যন্ত বেশী হয়, মাটিতে ভূমিকম্পের তরঙ্গ তরঙ্গায়িত হতে দেখা যায় এবং সকল বস্তু বায়ুতে উৎক্ষিপ্ত হয়।

ভূমিকম্পের শক্তি তরঙ্গ শক্তির আকারে ভূ-পৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড়ে। এই তরঙ্গগতির দুটি উপাংশ বা কম্পোনেণ্ট আছে। একটি হল Primary Compressional Wave বা প্রাথমিক তরঙ্গ একে "P" দিয়ে সূচিত করা হয়। এই তরঙ্গ গতিপথের সামনে মাটির উপর ভূমির সঙ্গে অনুভূমিকভাবে চাপ দেয় এবং এগিয়ে যায়। অপর উপাংশটি হল S বা Shear Wave বা মধ্যবর্তী তরঙ্গ এবং একে "S" দিয়ে সূচিত করা হয়। এই তরঙ্গ গতিপথের সামনে মাটির উপর লম্বভাবে চাপ দেয়। 'P' বা প্রাথমিক তরঙ্গ 'S' বা মধ্যবর্তী তরঙ্গের চেয়ে দ্রুত হওয়ায় সিস্‌মোগ্রাফ যন্ত্রে আগে পৌছায়. অর্থাৎ সিস্‌মোগ্রাফ যন্ত্রে আগে P-তরঙ্গকে ধরা যায়।

1969 খৃস্টাব্দে এই তরঙ্গ-সংক্রান্ত একটা আশ্চর্য ঘটনা লক্ষ্য করেছিলেন দু-জন সোভিয়েট ভূ-বিজ্ঞানী নারসেসভ এবং সেমেনভ্। ভূ-বিজ্ঞানীরা জানতেন যে, P ও S তরঙ্গের গতির অনুপাত প্রায় অপরিবর্তিত থাকে এবং এই অনুপাতের মান হল 1·75। কিন্তু, ঐ দুজন বিজ্ঞানী মধ্য এশিয়ার একটি ভূমিকম্পের কিছুদিন আগে লক্ষ্য করেন যে, ঐ P ও S তরঙ্গের গতির অনুপাত 1·75-এর থেকে কিছুটা কম। কিন্তু, আবার কয়েক দিনের মধ্যে স্বাভাবিক মাত্রাতেই ফিরে আসে অর্থাৎ 1·75 হয়। সবচেয়ে বড় আশ্চর্য হল যে, এই ঘটনা ঘটার ঠিক পরেই মধ্য এশিয়ায় ঐ ভূমিকম্পটি হয়। 1971 খৃস্টাব্দে ক্যালিফোর্নিয়ার সান ফার্নাণ্ডোতে প্রবল ভূমিকম্পের পরেই ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেক্‌নোলজির দুজন ভূ-বিজ্ঞানী জানালেন যে, P ও S তরঙ্গ গতির অনুপাতের পরিবর্তন ঐ ভূমিকম্প ঘটার পূর্বে তাঁরাও লক্ষ্য করেছেন। কিছু পরে জাপানও অনুরূপ ঘটনা পর্যবেক্ষণ করেছে বলে জানায়।

ভূমিকম্প ঘটার পূর্বে সেই অঞ্চলের ভূত্বকে একটা পরিবর্তন ঘটবেই। এইসব পরিবর্তনগুলি জানার জন্যে আমেরিকা, রাশিয়া, জাপান, চীন প্রভৃতি দেশে ব্যাপক গবেষণা হচ্ছে। ভূ-পৃষ্ঠের তল পরিবর্তন পর্যবেক্ষণের জন্যে টিল্টমিটার (Tiltmetre) এবং লেসার (LASER) রশ্মি ব্যবহৃত হচ্ছে। টিল্টমিটারের সাহায্যে ভূ-ত্বকের স্তরের সামান্যতম বিচ্যুতিও ধরা যায়। গ্র্যাভিমিটারের (Gravimetre) সাহায্যে ত্বকের অতি সামান্য পরিমাণ গতিও পরিমাপ করা যায়। স্থানীয় চুম্বকীয় ক্ষেত্রের সামান্য পার্থক্য এবং পাথরের বিদ্যুৎ-পরিবাহিতার পরিবর্তন নানা বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে পরিমাপ করা যায়। ভূ-পদার্থবিদগণ বলেন যে, ভূমিকম্প হবার পূর্বে মাটির নীচের জলে দ্রবীভূত র‍্যাডনের পরিমাণ স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী হয়। এর কারণ প্রসঙ্গে তাঁরা বলেন যে, পাথরের উপর চাপের ফলে যে ফাটল ধরে তার মধ্যে দিয়ে জল ঢুকে যায় এবং ভূ-পাথরের রেডিয়াম থেকে তেজস্ক্রিয় র‍্যাডন গ্যাস বিমোচন হয়। এই র‍্যাডন গ্যাসই ঐ ফাটলের মধ্যস্থিত জলে দ্রবীভূত হয় এবং জলে র‍্যাডনের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। এছাড়া কূপের জলেরও তল ভূমিকম্পের পূর্বে বেড়ে যায়।

সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা 1979 খৃস্টাব্দে জানান যে, সূর্যের

সক্রিয় অবস্থার সময় ভূমিকম্প ঘটতে দেখা যায়। এছাড়া সৌর-কলঙ্ক যখন বৃদ্ধি পায় তখনও ভূমিকম্পের সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশী এটাও লক্ষ্য করা গেছে। 1982 খৃস্টাব্দে চীনের বিজ্ঞান অ্যাকাডেমীর একজন বিজ্ঞানী Lu Dajiong আকাশে মেঘের নানা পরিবর্তন ও আকার দেখে ভূমিকম্পের পূর্বাভাস করে বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেন। 1982 খৃস্টাব্দের 10ই ডিসেম্বর চীনে যে ভূমিকম্প হয় তার পূর্বাভাস Lu Dajiong একমাস পূর্বে বেইজিংয়ে এক ধরনের মেঘ দেখে করেন।

1983 খৃস্টাব্দে সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা ম্যাগনেটো-হাইড্রো-ডাইনামিক (সংক্ষেপ MHD) জেনারেটর ব্যবহার করে ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দেওয়ার চেষ্টা করেন। এই MHD জেনারেটরগুলি তীব্র বিদ্যুৎ-চৌম্বকীয় শব্দের দ্বারা ভূ-স্তরের কোথাও বৈদ্যুতিক ধর্মের কোন পরিবর্তন হচ্ছে কিনা তা নির্ণয়ে সাহায্য করে। এর ফলে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প ঘটার পূর্বেই এর পূর্বাভাস MHD এর দ্বারা করা সম্ভব।

ভূমিকম্প হবার পূর্বে কিছু পশু-পক্ষীর অস্বাভাবিক আচরণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ভূমিকম্প ঘটার পূর্বে গবাদিপশু এবং ঘোড়া তাদের আশ্রয়ে প্রবেশ করতে চায় না। ইঁদুর ও সাপ গর্তের বাইরে বেরিয়ে আসে। এমন কি শীতকালেও অত্যধিক ঠাণ্ডা থাকা সত্ত্বেও সাপ গর্তের বাইরে বেরিয়ে আসে এবং ঠাণ্ডায় মরে যায়। মাছেরা জল থেকে লাফিয়ে পড়ে।

1855 খৃস্টাব্দে জাপানের টোকিওর পূর্বদিকে একটি ভূমিকম্প ঘটার প্রায় এক-সপ্তাহ পূর্বে ঐ অঞ্চলের মুরগীদের মধ্যে এক অস্বাভাবিক আচরণ লক্ষ্য করা যায়। তারা হঠাৎ ডিম দেওয়া বন্ধ করে এবং তাদের ঘরে প্রবেশ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। ভূমিকম্প ঘটার ঠিক পূর্ব-মুহূর্তে খোঁটায় বাঁধা গরু খোঁটা উপড়ে নিয়ে ফাঁকা মাঠের দিকে দৌড়ায়। ভেড়া ও ছাগলের মধ্যেও এক অস্বাভাবিক ও চঞ্চল ভাবে দেখা যায়। এইসব আচরণ লক্ষ্য করেও অনেক সময় ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব। 1975 খৃস্টাব্দে হেই-চেংয়ে যে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয় তার পূর্বাভাস কিছুটা পশুপক্ষীর অস্বাভাবিক আচরণ লক্ষ্য করেই হয়েছিল।

পশু-পক্ষীর এই অস্বাভাবিক আচরণ পর্যবেক্ষণ করার জন্যে চীন, জাপান, আমেরিকা ইত্যাদি দেশ বহু অর্থ নিয়মিত ব্যয় করে থাকেন।

চীন অত্যধিক ভূ-কম্পপ্রবণ দেশ। এখানে ঘন ঘন ভূমিকম্প হয়। এই দেশে ভূমিকম্পের পূর্বাভাস যাতে সঠিক ভাবে দেওয়া সম্ভব হয় সেই জন্যে এই দেশটি পশু-পক্ষীর আচরণ পর্যবেক্ষণের ব্যাপারে যথেষ্ট উদ্যোগী। চীনের বেশীর ভাগ গবেষণাই এই পশুপক্ষীর আচরণ ও ব্যবহার পর্যবেক্ষণের জন্যে নিয়োজিত। আমেরিকাও এই ব্যাপারে পিছিয়ে নেই। তারাও পশুপক্ষীর আচরণ নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করেন। আমেরিকার জিওলজিক্যাল সার্ভে (USGS) 1976 খৃস্টাব্দের পর থেকে শুধু এই কারণেই প্রায় 600,000 ডলার ব্যয় করেন।

টেক্সাস মেরিন সায়ান্স ইনস্টিটিউটের তিনভাগ গবেষক Ruth Buskirk; Cliff Froalick এবং Gray Latham পশুপক্ষীর ঐ ধরনের আচরণের তিনটি উল্লেখযোগ্য উৎসের কথা জানতে পেরেছেন। এইগুলি হল—কম কম্পাঙ্কবিশিষ্ট শব্দ তরঙ্গ (50 থেকে 70 হার্ট্‌জ), গন্ধ এবং মাটির তড়িতাধান। কম কম্পাঙ্কবিশিষ্ট শব্দের উদ্ভব হয় মাটির গভীরে ভূ-ত্বকের বিচ্যুতি এবং সরণের ফলে এবং কিছু প্রাণী এই শব্দ-তরঙ্গ নির্ণয় করতে পারে। ভূত্বকের বিচ্যুতির ফলে যে তেজস্ক্রিয় র‍্যাডন গ্যাসের উদ্ভব হয় তা কিছু প্রাণী—বিশেষতঃ কুকুর নির্ণয় করতে পারে। ভূ স্তরের পরিবর্তনের ফলে মাটির চৌম্বক ক্ষেত্র ও তড়িতাধানে যে পরিবর্তন হয় তা কিছু পাখী নির্ণয় করতে পারে। এইভাবে পশু-পক্ষীর দ্বারা ভূমিকম্পের পূর্বাভাস পাওয়া সম্ভব।

যে চিন্তাটা বেশ কয়েক বছর আগেও করা যেত না সেটা বর্তমানে প্রায় সম্ভবপর। তবে এটা ঠিকই যে ভূমিকম্পের পূর্বাভাসের এটা শৈশবাবস্থা হলেও এর মধ্যে কিছু বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি ও সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে বা আরো কয়েক বছরের মধ্যে ব্যাপকভাবে আয়ত্ত করা সম্ভব হবে। আগামী দিনে হয়তো দেখা যাবে যে, যেমন আবহাওয়ার পূর্বাভাস করা হয় ঠিক সেইভাবেই ভূমিকম্পের পূর্বাভাসও দেওয়া হচ্ছে।

জীবজগতে ভাববিনিময়

অতসি সেন*

জীবজন্তুরা সকলেই পারস্পরিক ভাববিনিময় করে। পঞ্চতন্ত্রের কাহিনীর মত ঠিক মুখের ভাষায় না হলেও অঙ্গ ভঙ্গী ডাক-গান এমনকি গায়ের গন্ধও এর মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হয়। প্রেম সংকেত, যৌবন-আগমন বার্তা, লিঙ্গ ঘোষণা আর অবস্থান নির্দেশ প্রধানতঃ এই কটি কার্যেই এগুলি ব্যবহৃত হলেও, সামাজিক প্রতিপত্তি, খাদ্যের অবস্থান, বিপদ সংকেত বা শিকারীশত্রুর অবস্থান প্রভৃতিও এর মাধ্যমে প্রকাশ করে। সমাজ ব্যবস্থার জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই ভাববিনিময়ের প্রয়োজনীয়তাটিও বৃদ্ধি পায়।

অধিকাংশ ভাষাই নির্ভর করে প্রেরক প্রাণীটির শারীরবৃত্তিক অবস্থার উপর। জননেন্দ্রিয়ের পরিণতি এবং হরমোন নিঃসরণ ঘটলেই তবে পাখিরা গান গায়। অপর দিকে রক্তস্রোতে অ্যাড্রেনালিন রস নিঃসারিত হলেই কেবল স্তন্যপায়ীরা আক্রমণোদ্যত হয়।

সংকেতগুলির অধিকাংশই প্রজাতি নির্ভর। অর্থাৎ একমাত্র বিশেষ একটি প্রজাতির ক্ষেত্রেই সেটি অর্থবহ। শুধু তাই নয় অল্প সংকেত মাধ্যমে অধিক সংবাদ আদান-প্রদানটিও এক্ষেত্রে লক্ষণীয়। কিছু কিছু সঙ্কেত অবশ্য সর্বজনীনও হয়ে থাকে, যেমন পাখিদের বিপদ সঙ্কেত কিম্বা মাছেদের (মিনো) বিপদরস মোক্ষণটি শুধু তাদের ক্ষেত্রেই নয় অন্যান্যদের ক্ষেত্রেও সমান প্রযোজ্য।

দৃষ্টিবাহিত

নর বানর, পাখি, সরীসৃপ, কিছু কিছু মাছ, দিবাচর পতঙ্গ প্রভৃতি চক্ষুষ্মান সকল প্রাণীদের ক্ষেত্রেই দৃষ্টিবাহিত ভাব বিনিময়ের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। সঙ্কেতগুলি অধিকাংশই আক্রমণাত্মক হয়—কুকুরদের জঙ্গী ভাবটি প্রকাশ হয় তাদের দাঁত সিঁচানো আর নাক কুঁচকানোয়। বেবুন, জলহস্তি প্রভৃতি অন্যান্য স্তন্যপায়ীদের শ্বাদন্ত প্রদর্শনে। লেজ নাড়াটাও এর অন্যতম প্রকাশ (সজারুর ভীতি প্রদর্শন)। অন্য দিকে 'বেহালাবাদক কাঁকড়া'রা ভয় দেখায় তাদের দাড়া নেড়ে।

দৃষ্টিবাহিত বার্তা বিনিময়টি পাখিদের ক্ষেত্রেই সর্বাধিক প্রচলিত। সঙ্গিনী নির্বাচন পর্বে ময়ূরদের পাখনা মেলাটিতো সর্বজনবিদিত। স্টোনফ্লাই, ড্যাম্‌সেলফ্লাইরাও সঙ্গিনীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে নৃত্যকলা প্রদর্শন করে। নেকড়ে মাকড়সারাও তাই। অস্থিময় মাছেদেরও অনেকেই রঙবেরঙের হয়। যেটি সঙ্গিনী নির্বাচন ও ভীতিপ্রদর্শন উভয় কার্যেই ব্যবহৃত হয়। পুরুষ 'শ্যামদেশীয় যোদ্ধা'রা প্রতিদ্বন্দ্বীর দেখা পেলেই নীলচে রঙ ধারণ করে আর লেজ ও মধ্য-পাখনা ছড়িয়ে দেহের আকারটিকে বর্ধিত করে তোলে।

আলো জ্বলা-নেভাজনিত একজাতীয় সঙ্কেত মাধ্যমে মানুষেরা বার্তা বিনিময় করে। জোনাকিরাও নিজেদের দেহজ আলোটিকে একই কাজে লাগায়। পুরুষদের একটানা ক্ষণস্থায়ী আলো জ্বালানো শেষ হবার ঠিক দু-সেকেণ্ড পরেই মেয়েরা তাদের আলোগুলি জ্বালে—সাড়া দিতে।

যৌন সম্বন্ধীয় এবং আক্রমণাত্মক কার্য কারণ ছাড়াও দৃষ্টি মাধ্যমটি আরও অনেক কাজেই লাগে। যেমন মৌমাছিদের নাচ দেখেই তাদের সঙ্গীসাথীরা 'মধু'র সন্ধান জানতে পারে। বার্তা বিনিময়ের ক্ষেত্রে দৃষ্টিশক্তিটিই সর্বাধিক ব্যবহৃত হলেও, এটির ক্ষেত্রে প্রাণী দুটির একে অন্যকে দেখা দরকার, শুধু তাই নয় সেইসঙ্গে শত্রুদের নজর এড়ানোটাও বিশেষ প্রয়োজন।

শ্রুতিবাহিত

কুকুরের ঘেউ ঘেউ, বিড়ালের মিউ মিউতো আমরা সর্বদাই শুনছি। পাখিদের গানের কথাটাও সর্বজনবিদিত। সুরগুলি সাধারণতঃ প্রজাতি নির্ভর হয়। অনেকটা আমাদের 'ঘরাণা'র মত। অবশ্য গানের মূল উপাদানটি পরিবারের নিজস্ব হলেও, পারিপার্শ্বিক শব্দ ভাণ্ডারের কিছু কিছুও এর অঙ্গাঙ্গীভূত হয়ে যায়। যার ফলে চাটগাঁই কি শান্তিপুরী 'দেশীয় টান' এর মত বিশেষত্ব ফুটে ওঠে বিভিন্ন অঞ্চলবাসী একই প্রজাতির প্রাণীদের গানে (চ্যাফিনশ)। পাখিদের গানটি সীমানা নির্ধারণ, ভীতিপ্রদর্শন, পুরুষ পাখির উপস্থিতি, তার প্রজাতি আর যৌবনোদ্গম ঘোষণা করে। সঙ্গীসাথীদের একত্রীকরণ, বিপদ সঙ্কেত ও সাহায্যের আবেদন হিসাবেও এটি ব্যবহৃত হয়। মা হাঁসেদের বিপদ সঙ্কেতটি ব্যোমচারী শিকারীর ক্ষেত্রে একরকম হয় আর স্থলচারীদের ক্ষেত্রে অন্যরকম। কালিফোর্নিয়ার মেঠো কাঠবেড়ালীদের ডাকটাও রাজপাখি দেখলে একরকম আর সাপ দেখলে অন্যরকম। শব্দ মাধ্যমেই সন্তান-সন্ততিদের সঙ্গে পিতামাতাদের যোগসূত্রটি সুদৃঢ় হয়।

আমাদের মতন জিভ আর ঠোঁট দিয়ে পাখিরা কণ্ঠস্বরে বৈচিত্র্য আনতে না পারলেও তাদের বিভিন্ন কম্পাঙ্কের

*সেন্ট্রাল ফুড লেবরেটরী, 3, কীড স্ট্রীট, কলিকাতা-700016

(frequency) সংকেতবিন্যাসটি সুরসমষ্টি মাধ্যমে সম্পূর্ণতা পায়। স্ত্রীপুরুষের দ্বৈত সঙ্গীতটি অনেকটা আমাদের কবিগানের মত—উত্তর—প্রত্যুত্তর। কাঠঠোকরারা আবার ঠোঁট দিয়ে গাছের গায়ে তবলার বোল তোলে। যে সব পাখিদের পালক বর্ণবৈচিত্র্যহীন কিম্বা যারা বাস করে গভীর অরণ্যে (একে অন্যের দৃষ্টি বহির্ভূত হয়ে) তারাই বড় দরের গাইয়ে হয়। পাখিদের নয় হাজার প্রজাতির মধ্যে প্রায় অর্ধেকই সঙ্গীতজ্ঞ।

কীটপতঙ্গদেরও শব্দ উৎপাদনের বহুবিধ উপায় আছে—(1) বিভিন্ন অঙ্গের একটি অন্যের গায়ে ঘসে (অনেকটা আমাদের বেহালায় ছড় টানার মত) যেমন গঙ্গাফড়িংরা তাদের পেছনের পা দুটিকে ডানায় ঘষে আর ঝিঁঝিঁপোকারা সামনের পা-দুটোকে ঘষে একে অন্যের সঙ্গে, (2) পদার কম্পনজনিত যেমন নয়াজংলী সিকাডারা (cicada) তাদের ডানাজোড়ার তলাকার ঢাকের পদা কাঁপিয়ে শব্দোত্তর উচ্চতীক্ষ্ণতার (pitch) তরঙ্গ তোলে; (3) গ্যাস বা তরল নিক্ষেপ করে যেমন ডেথস্ হেড হক্ মথেরা (Acherontia atropos) তাদের শুঙ্গভিত্তির ছিদ্র দিয়ে বাতাস বের করে (যেমন আমরা শিষ দিই); (4) তলদেশে আঘাতজনিত যথা ডেথ ওয়াচ বীটল (Xestobium rufovillosum) মাটিতে মাথা ঠুকে আওয়াজ করে আর (5) অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কম্পনজনিত যেমন মশাদের ডানা ঝাপটাকে মৌমাছিরা তো তাদের ডানানাড়ার আওয়াজ দিয়েই সঙ্গীসাথী আর অনাহুতদের পার্থক্য বিচার করে।

পাখিদের গান আর মানুষের কণ্ঠস্বরের মত কীটপতঙ্গের ডাকটি কিন্তু বায়ুস্রোতের সঞ্চালনজনিত নয়। কম্পাঙ্কের বৈচিত্র্য নয়, ঘর্ষণের গতিটিই এক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতের শব্দ বিচিত্রার জনক। এইভাবেই তারা তরঙ্গ বিস্তারের (amplitude) বিভিন্নতা ফুটিয়ে তোলে। আর তার উপরেই নির্ভর করে সংকেতের বৈচিত্র্য। গঙ্গাফড়িংরা পাঁচ রকমের শব্দ করে (1) নিঃসঙ্গ সঙ্গীত; (2) প্রেম সঙ্গীত (সঙ্গিনীর সঙ্গে দেখা পেলে); (3) সঙ্গমপূর্ব সঙ্গীত; (4) বিবাদ সঙ্গীত (প্রেমে বাধা সৃষ্টি হলে) আর (৫) সঙ্গম সঙ্গীত। খাদ্যের অবস্থানটি মৌমাছিরা শুধু যে নৃত্যের মাধ্যমেই প্রকাশ করে তা কিন্তু নয়, তার সঙ্গে 280 C.P.S. কম্পাঙ্কের নিম্ন তীক্ষ্ণতার শব্দও করে।

খুব অল্প সংখ্যক কীটপতঙ্গদেরই শ্রবণযন্ত্র আছে। ঝিঁঝিঁপোকা, গঙ্গাফড়িংদের মধ্যে একমাত্র পুরুষেরাই শব্দ উৎপাদনে সক্ষম হলেও শ্রবণযন্ত্রটি স্ত্রী-পুরুষ উভয়দেরই থাকে। ঝিঁঝিঁপোকাদের সামনের পায়ে আর গঙ্গাফড়িংদের পেটের পাশে। পাখিদের গানের মতই কীটপতঙ্গদের ডাকগুলিও একই প্রজাতি নির্ভর যে গান শুনেই তাদের প্রজাতি নির্ধারণ করা যায়।

শ্রুতি-সংকেতের প্রধান সুবিধা এটি বাঁকা পথেও পাড়ি দিতে পারে আর প্রেরক ও গ্রাহক একে অন্যের দৃষ্টির আড়ালে থাকলেও বার্তাবিনিময়ে কোন বিঘ্ন ঘটে না।

জলের পরিবেশটি শব্দের মাধ্যম হিসাবে অত্যুৎকৃষ্ট হওয়ায় (বাতাসের চেয়ে পাঁচগুণ দ্রুতগতিসম্পন্ন) সামান্য শব্দও বহুদূর বিস্তার লাভ করে। অস্থিময় আর পটকা সম্বলিত অধিকাংশ মাছেদেরই শব্দ উৎপাদন ও গ্রহণ ক্ষমতা আছে। তারা তাদের সমগ্র দেহ দিয়েই শব্দগ্রহণ করে। পটকাটি গ্যাসে পরিপূর্ণ থাকায় অনুনাদকের (Sound Box) কাজও করে। পরিপূর্ণ পটকাটি কখনও কখনও পেশীদ্বারা কম্পিত হয় (জন ডোরী) কখনও বা পরিবর্তিত চতুর্থ কশেরুকার (Vertebra) পেশী কম্পন মাধ্যমে (বিড়ালমাছ)। পটকার গায়ে পাখনা ঠোকা (কাঠবেড়ালীমাছ) কিম্বা উরশ্চক্রের (pectoral girdle) কম্পনও (ট্রিগার ফিস) এর কারণ হতে পারে।

পটকাবিহীন মাছেরা শব্দ উৎপাদন করে কীটপতঙ্গের মতন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরস্পরের গায়ে ঘষে। এক্ষেত্রে শব্দটি উচ্চ তীক্ষ্ণতার হয়ে থাকে আর পটকা মাধ্যমে হলে সেটি হয় নিম্ন তীক্ষ্ণতার কাঁপা আওয়াজ, অনেকটা কাঠের দেয়ালে হাতুড়ী ঠোকার মত। সঙ্গিনী সন্ধান, আক্রমণাত্মক, বিপদ সংকেত আর দলবদ্ধতার কারণেই প্রধানতঃ এগুলি ব্যবহৃত হলেও কাঠবেড়ালীমাছেরা এলাকা নির্দেশনার কাজেও এটিকে ব্যবহার করে। এলাকা সংরক্ষণের জন্য করে ক্ষণস্থায়ী ঘোঁৎ ঘোঁৎ আর চিরশত্রু মোরে ঈলদের দেখা পেলে দীর্ঘস্থায়ী কিচমিচ।

ডলফিন, তিমি আর তাদের জাতভাইরা যে শাব্দিক ভাষা বিনিময় করে এটা তো সর্বজনবিদিত। শ্বেততিমিরা তো এতই বাচাল হয় যে তাদের বলা হয় 'সামুদ্রিক ক্যানারী'। ডলফিন আর শুশুকেরা এর সাহায্যে ভাব বিনিময় ছাড়াও প্রতিফলিত শব্দ শুনে দিকনির্ণয় আর দূরত্ব পরিমাপ করতেও পারে। নিম্নকম্পাঙ্কের শুলি আধ মাইল বিস্তৃত হয় যার মাধ্যমে তারা মাছেদের আকার পর্যন্ত নির্ধারণ করতে পারে। উত্তরদেশীয় হস্তিসীলেরা তিন রকমের শব্দ আর লোমশ সীলেরা চার রকমের শব্দ করলেও। সমুদ্র সিংহরা তাদের এক রকমের শব্দ দিয়েই উচ্চস্বরগ্রাম, ছন্দোহিল্লোল (rhythem) আর লক্ষ্য মাত্রার পরিবর্তন ঘটিয়ে ওদের চেয়ে অনেক বেশী সংবাদ আদানপ্রদান করে।

তেজ, অধ্যবসায় আর সমস্বরের দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে একমাত্র কীটপতঙ্গের ডাকের সঙ্গেই ব্যাঙের ডাকটার তুলনা করা চলে। সঙ্গিনী সন্ধান, সীমানা নির্দেশ, বিপদ-সংকেত আর আক্রান্তের আর্তনাদ বুল ফ্রগদের এই চারটি সুরই আছে। কিছু কিছু প্রজাতির সাপেরাও মুখের হিসহিস,

লেজের ঝাপটানি (র‍্যাটল) আর অঙ্গ-ঘর্ষণজনিত শব্দ করে থাকে। কচ্ছপ, কুমীরেরাও শব্দ মাধ্যমেই সঙ্গিনীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

নাকওলা বাদুড়েরা নাক দিয়ে আর নাকবিহীনেরা মুখ দিয়ে শব্দোত্তর তরঙ্গ (ultrasonic) নিক্ষেপ করে প্রতিধ্বনি দর্শন (echolocation) মাধ্যমে পথ চেনে। ইঁদুর, হ্যামস্টার, লেমিং প্রভৃতি কিছু কিছু প্রজাতির তীক্ষ্ণদন্তিরাও (rodent) শব্দোত্তর তরঙ্গ ব্যবহার করে। বাচ্চারা পথভ্রান্ত হলে মায়েরা এর সাহায্যেই তাদের খুঁজে বের করে। ক্ষণস্থায়ী ডাকগুলি আক্রমণাত্মক আর দীর্ঘস্থায়ীগুলি আত্মসমর্পণ বোঝায়।

সত্যি কথা বলতে কি, যে যে ক্ষেত্রে আমরা জীবজন্তুদের ডাকের কোন অর্থ বুঝে উঠতে পারি না, সেই সেই ক্ষেত্রে সংকেতটি অর্থহীন হওয়ার চেয়ে আমাদের জ্ঞানের অভাব হওয়াটাই বেশী সম্ভব।

ঘ্রাণ মাধ্যম

সৌরভ বা গন্ধ বলতে বাতাসে ভাসমান কিম্বা জলে দ্রবীভূত উদ্বায়ী পদার্থের অণুদেরই বোঝায়। এই রাসায়নিকদের মাধ্যমেই আমরা গন্ধ শুঁকি। মানুষদের গন্ধ শোঁকার পর্দাটির আয়তনটিকে একজোড়া ডাকটিকিটের সঙ্গে তুলনা করলে, কুকুরদের এটি একটি রুমালের মত। হাঙ্গর আর শজারু যারা গন্ধ শুঁকেই শিকার ধরে তাদের ক্ষেত্রেও এটি বড়সড়ই হয়, অন্যদিকে পাখি, নরবানর যারা প্রধানতঃ দৃষ্টিশক্তির মাধ্যমেই শিকার ধরে তাদের ক্ষেত্রে এগুলি হয় ছোট ছোট।

গন্ধ উৎপাদক রাসায়নিকগুলিকে বলা হয় 'ফেরোমন'। গ্রীক ভাষায় যার অর্থ 'উত্তেজনা বাহক'। এরা অনেকটা হরমোনের মত। আভ্যন্তরীণ গ্রন্থি নিঃসারিত রাসায়নিক দূতগুলি রক্তবাহিত হয়েই দেহের প্রত্যন্ত প্রান্তে বিতরিত হয়।

ফেরোমনটি প্রস্রাব মাধ্যমে নিঃসারিত হতে পারে যেমন হয় জংলী কুকুরদের বেলা, কিম্বা বিষ্ঠা—যেমন জলহস্তি। যারা আবার লেজ দিয়ে সেটিকে গাছে গাছে ছিটিয়ে বেড়ায় যাতে অন্যদের নাকে তার গন্ধটা পৌঁছায়। মুখের লালা থেকেও এটি হতে পারে। শজারুরা তো তাদের লালাগুলোকে সাবানের ফেনার মত দেহের চারপাশে ছিটিয়ে রাখে। নিঃসারিত হতে পারে কোন বিশেষ গ্রন্থি থেকেও—যেমন বিলিতী ইঁদুরদের চিবুকগ্রন্থি, কৃষ্ণসার মৃগদের অক্ষিকোটর সন্নিহিত গ্রন্থি (যেটিকে তারা মাটিতে ঘষে) কিম্বা খেঁকশিয়ালদের লাঙ্গুল গ্রন্থি।

ফেরোমন সাধারণতঃ দু-জাতের হয়। একটিকে বলা হয় সংকেতদাতা (releaser) ফেরোমন—যেমন 'মিনো' মাছেরা আহত হলেই এমন একটি ফেরোমন নিঃসারণ করতে থাকে, যার গন্ধে অন্যান্য মিনোরা অকুস্থল থেকে পালিয়ে আত্মরক্ষা করে। ঠিক একই কারণে কাঠপিঁপড়েদের বাসা আক্রান্ত হলেই তারা ফরমিক অ্যাসিড নিঃসরিত করতে থাকে যার ফলে চারিদিক থেকে সঙ্গীসাথীরা ছুটে আসে তাদের সাহায্যার্থে। ঘনীভূত অবস্থায় এটি বিপদ সংকেত হিসাবে ব্যবহৃত হলেও অল্প মাত্রায় (এক দশমাংস) এটি আকর্ষক হিসাবেও কাজ করে। প্রতিহারী মৌমাছিরা শুধু যে অনধিকার প্রবেশকারীদের হুল ফুটিয়েই ক্ষান্ত হয় তা নয়, সেই সঙ্গে আইসো অ্যামাইল অ্যাসিটেট-এর গন্ধ ছড়িয়ে অন্যান্য প্রহরীদের সতর্কও করে দেয়।

দ্বিতীয় জাতের, প্রাইমার (Primer) ফেরোমনগুলি তাৎক্ষণিক কোন পরিবর্তন সাধিত না করলেও, এটি দেহে প্রবিষ্ট হয়ে কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র মাধ্যমে অন্তঃগ্রন্থিগুলিকে প্রভাবান্বিত করে শারীরবৃত্তিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়। স্ত্রী-ইঁদুরের খাঁচায় পুরুষ ফেরোমন সম্বলিত প্রস্রাব ছিটিয়ে দিলে তাদের যৌবন উন্মেষ ঘটে। অপরদিকে, মক্ষিরাণীর ম্যাণ্ডিবল গ্রন্থি রসটি (queen substance -9 hydroxy-trans enoic acid) যেটিকে সে তার গায়ে মাখিয়ে রাখে আর দেহ পরিমার্জনা কালে সবাই ভাগ করে খায়, সেটি মৌচাকে প্রতিদ্বন্দ্বী কোন রাণী মৌমাছির ক্রমবিকাশ নিবারণ করে।

স্পষ্টতা, নির্দিষ্টতা এবং ব্যাপ্তি এই তিনটিই গন্ধ বিস্তারের প্রধান গুণ। গন্ধের বার্তা অতি সাধারণ। একটিমাত্র রাসায়নিক থেকে উৎপন্ন হলেও তারা একাই একশো। ইঁদুরের প্রস্রাব তার ভীতি প্রকাশ, লিঙ্গ ঘোষণা এবং সামাজিক প্রতিপত্তি সবগুলোই ব্যক্ত করে। স্ত্রীজিপসী মথেদের ফেরোমন (জিপটল) পুং-মথেদের যৌন আচরণের সূচনা ঘটায়। যেটি কেবল সেই বিশেষ মথেদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এবং এক মিলিলিটার দ্রাবকে দ্রবীভূত এর মাত্র 10^{-18} গ্রামই যে কোন পুং মথকে উত্তেজিত করতে যথেষ্ট।

দৃষ্টিবাহিত বার্তার সীমাবদ্ধতার কারণ আলো সর্বদাই সরলরেখায় চলে এবং গ্রাহকটি প্রেরক প্রাণীটির দিকে তাকিয়ে থাকলে তবেই বার্তা বিনিময়টি সম্ভব। শ্রুতিবাহিত বার্তাটি বাঁকা পথে চলতে পারলেও আর লুকিয়ে থাকা গ্রাহকের কানে পৌঁছাতে পারলেও, শব্দ প্রেরণ বন্ধ হওয়া মাত্রই বার্তা বিনিময়ের সমাপ্তি ঘটে। ঘ্রাণবাহিত বার্তাটি যে শুধু চোখের আড়াল থেকেই প্রেরণ করা সম্ভব তাই নয়। এর অস্তিত্বটি প্রেরণ বন্ধ হওয়ার পরও বজায় থাকে। অর্থাৎ গন্ধবার্তাটি প্রেরণ করার পর প্রাণীটি অন্য কাজেও নিয়োজিত হতে পারে।

শিকার অন্বেষণ (হাঙর) আর শিকারী শত্রু পরিহার কার্যেই গন্ধবার্তার প্রয়োজন সর্বাধিক হলেও, বিপদ সংকেত

(মিনো) এবং পথনির্দেশক হিসাবেও এগুলি ব্যবহৃত হয়। স্যামন মাছেদের গন্ধ বিচার শক্তিটিই তাদের নদী অববাহিকার জন্মস্থানটিতে ফিরিয়ে আনে। পিঁপড়েরাও সহযাত্রীদের গন্ধচিহ্ন অনুসরণ করেই পথ চলে। সমাজবদ্ধ জীবেদের ক্ষেত্রে এটি আলাপ পরিচয়ের উপায়ও। গন্ধবৈশিষ্ট্যটি খাদ্য পরিবর্তনহেতু মিলিটারী 'পাস ওয়ার্ড'-এর মতই ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হতে থাকে বলে খুব বেশি দেরী করে ফিরলে বাসার বাসিন্দারাও অনেক সময় ঘরে ঢুকতে অনুমতি পায় না। পিতা-মাতার সঙ্গে সন্তানসন্ততিদের বন্ধন সূত্র হিসাবেও এটি ব্যবহৃত হয়।

দৃষ্টি শ্রুতি আর গন্ধবাহিত ভাববিনিময়ের এই তিন প্রকার প্রধান উপায় ছাড়াও কীটপতঙ্গদের জীবনে স্পর্শের ব্যবহারটাও কম প্রয়োজনীয় নয়। শুঙ্গের মাধ্যমে স্পর্শ দ্বারাই তারা বস্তুসামগ্রীর সনাক্তকরণ করে। মৌচাক নির্মাণকালে পরিমাপ মাধ্যম হিসাবেও তো এটি অপরিহার্য। পুংমাকড়সারা স্ত্রীদের গায়ে টোকা মেরেই জানিয়ে দেয় যে তার শিকার নয় সাথী। পিঁপড়েরা শুঙ্গে শুঙ্গে স্পর্শজনিত যে বার্তা বিনিময় করে তার অনেকগুলিই গন্ধবাহিত হলেও, স্পর্শের প্রয়োজনটিও সেখানে কম নয়। মৌমাছিরা নৃত্য মাধ্যমে খাদ্যসংস্থান নির্দেশনা দিলেও। মৌচাকের অন্ধকারে সঙ্গীদের সেটিকে শুধু মাধ্যমেই উপলব্ধ করতে হয়। বানরদের লোম আঁচড়ানোটিও এক জাতের স্পর্শীয় উন্মাদনা। কিছু কিছু প্রজাতির মাছেরা আবার নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বা সাময়িক তড়িৎ তরঙ্গ ক্ষরিত করে। এলাকা নির্ধারণ, আক্রমণাত্মক বা আনুগত্য সবকিছুই তারা এর মাধ্যমে ব্যক্ত করে আর সেই সঙ্গেই প্রকাশ করে নিজস্ব আর যৌন পরিচিতিটিও। কম্পাঙ্কগুলি প্রজাতি ভেদে ভিন্নতর হয়ে থাকে এমনকি সক্রিয়তা ভেদেও হয়।

ওজোন সমস্যা

উদয়ন ভট্টাচার্য*

পৃথিবীর ওপরে আছে বায়ু। বস্তুতঃ আমরা বায়ুর সমুদ্রে ডুবে রয়েছি। পৃথিবীর একটু ওপরের বায়ুমণ্ডল বেশ ঘন। পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে ক্রমশ ওপরে উঠলে বায়ুমণ্ডল হাল্কা হয়ে পড়ে। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ছ-শ' কিমি. ওপরে বাতাস নেই বললেই চলে। ঘনমণ্ডল (ট্রপোস্ফিয়ার)-এ বায়ুস্তর ভারী। এই ঘনমণ্ডল ভূ-পৃষ্ঠ থেকে 10 কিমি. ওপর পর্যন্ত বিস্তৃত। সমগ্র বায়ুমণ্ডলের দুই তৃতীয়াংশ এই স্তরে আবদ্ধ। পৃথিবীর আবহাওয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে ঘনমণ্ডল। বিষুব অঞ্চলে এই স্তরের উচ্চতা উনিশ কিমি.। মেরু অঞ্চলে ঐ উচ্চতা প্রায় 9 কিমি। শতকরা 80 ভাগ বায়ুমণ্ডলীয় গ্যাস এই অঞ্চলে অবস্থিত। ঘনমণ্ডলের পর সূক্ষ্মমণ্ডল (স্ট্রাটোস্ফিয়ার)। সমুদ্রতল হতে 11 থেকে 30 কিমি. পর্যন্ত বিস্তৃত সূক্ষ্মমণ্ডল। এর গড় উষ্ণতা মাইনাস ষাট ডিগ্রী সেলসিয়াস। এই বায়ুর স্তর শান্ত। এর পরের স্তর অন্তর্মণ্ডল (মেসোস্ফিয়ার)। 31 থেকে 100 কিমি. পর্যন্ত এর বিস্তৃতি। তারপর থার্মোস্ফিয়ার। 100 থেকে 400 কিমি পর্যন্ত থার্মোস্ফিয়ারের বিস্তৃতি। থার্মোস্ফিয়রের পর আয়ন মণ্ডল (আয়নোস্ফিয়ার)। 400 কি.মি. এর ওপরে এর অবস্থিতি। সর্বশেষ বহির্মণ্ডল (এক্সোস্ফিয়ার)। 550 কি.মি-র ওপরে এর অবস্থান। এই স্তরে বাতাস নেই বললেই চলে।

বায়ুমণ্ডলে প্রধানত নাইট্রোজেন অক্সিজেন রয়েছে। এছাড়া কার্বন ডাই-অক্সাইড, হিলিয়াম, নিয়ন প্রভৃতি নিষ্ক্রিয় গ্যাস ও অন্যান্য গ্যাস সামান্য পরিমাণে আছে। বায়ুমণ্ডলের স্বাভাবিক রাসায়নিক গঠন 1নং সারণীতে দেওয়া হলো।

সারণী—1

বায়ুমণ্ডলের স্বাভাবিক রাসায়নিক গঠন

	উপাদান	পরিমাণ
1.	অক্সিজেন	20·946% ± 0·002
2.	নাইট্রোজেন	78·084% ± 0·004
3.	কার্বন ডাই অক্সাইড	0·033% ± 0·001
4.	আরগন	0·934% ± 0·001
5.	নিয়ন	18·18 পিপিএম ± 0·04
6.	হিলিয়াম	5·24 পিপিএম ± 0·04
7.	ক্রিপটন	1·44 পিপিএম ± 0·01

*পলাশবাড়ী পোঃ—আলিপুর, জেলা—জলপাইগুড়ি—736121

	উপাদান	পরিমাণ
8.	জিনন	0·087 পিপিএম ± 0·001
9.	হাইড্রোজেন	0·5 পিপিএম
10.	মিথেন	2 0 পিপিএম
11.	নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড	0·5 পিপিএম ± 0·1
12.	সালফার ডাই অক্সাইড	0·1 পিপিএম
13.	নাইট্রিক অক্সাইড	0·02 পিপিএম
14.	অ্যামোনিয়া	অতি সামান্য
15.	ওজোন	0 07 - 0·02 পিপিএম
16.	অক্সিজেনের আয়ন	300 কিমি ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ওপরে
17.	হিলিয়ামের আয়ন	1200—3500 কিমি ওপরে
18.	হাইড্রোজেনের আয়ন	3500 কিমি ওপরে

(পিপিএম বলতে প্রতি মিলিয়নে অংশ)

[সূত্র : জ্ঞান ও বিজ্ঞান, মে-জুন '84]

স্ট্র্যাটোমণ্ডলে ওজোন রয়েছে। সূর্য ও অন্যান্য নক্ষত্রজগৎ থেকে বিভিন্ন রশ্মি নির্গত হয় যার অধিকাংশ অদৃশ্য। সাধারণতঃ 8000Å এর ওপরে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট রশ্মি চোখে দেখা যায় না। সূর্য থেকে বিকিরিত 2900Å-এর নীচে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের রশ্মি এই স্তরে শোষিত হয়।

(1Å = 10^{-8} সেমি) ক্ষুদ্রতম তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট রশ্মির ফোটন কণার আধিক্য বেশি। ফোটন সংখ্যা যে রশ্মিতে যত বেশী, সেই রশ্মি উদ্ভিদ ও জীবজগতের ক্ষেত্রে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—যথা—UV-A, UV-B এবং UV-C। এর মধ্যে UV-B এর ক্ষতি করার ক্ষমতা বেশী। অন্তর্মণ্ডল বা মেসোস্ফিয়ারে অতিবেগুনী ও এক্স-রশ্মি শোষণের জন্য উষ্ণতা বাড়ে। তারপর ওজোন গঠনে তাপমাত্রা কমে যায়। ওজোন স্তর আমাদের পৃথিবীকে বর্মের মত রক্ষা করছে সূর্য থেকে বেরিয়ে আসা অনেক অনিষ্টকর রশ্মির হাত থেকে। অন্তর্মণ্ডলে অক্সিজেন ভেঙ্গে যায় এবং সুক্ষ্ম-মণ্ডল বা স্ট্রাটোস্ফিয়ার-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে ওজোন তৈরি করে। বিক্রিয়া নিম্নরূপ :

$$O_2 + h\nu \longrightarrow O + O$$
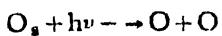
তারপর, একটি অক্সিজেনের পরমাণু ও একটি অক্সিজেনের অণু কোন তৃতীয় বস্তুর উপস্থিতিতে ওজোন অণুতে রূপান্তরিত হয়। যথা—

$$O_2 + O + M \longrightarrow O_3 + M$$
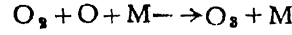
এই তৃতীয় বস্তুটি প্রায় অনুঘটকের মতো ক্রিয়াশীল।

ওজোন মূলত উৎপন্ন হয় দশ কিলোমিটার থেকে আশি কিলোমিটারের মধ্যে। পঁচিশ কিলোমিটারে এর ঘনীভবন বেশি। বায়ুমণ্ডলের এই অংশকে ওজোনস্ফিয়ার বলা হয়। বায়ুমণ্ডলে ওজোনস্ফিয়ারের গুরুত্ব কম নয়। সূর্য ও অন্যান্য নক্ষত্র থেকে আগত সমস্ত রকমের বিপজ্জনক রশ্মি যা কিনা যে কোন প্রাণী কোষ—কি উদ্ভিদ কি জীবের পক্ষে মারাত্মক, এই স্তরে শোষিত হয়।

আজকাল নানা দিক থেকে এই ওজোনস্তর বিপদগ্রস্ত। শব্দের চেয়ে দ্রুতগামী বিমানের বর্জিত গ্যাস ওজোনস্ফিয়ারের ওজোনের পরিমাণ কমিয়ে দিচ্ছে। বিমান থেকে বর্জিত গ্যাস হিসেবে বেরিয়ে আসছে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রিক অক্সাইড। এই গ্যাস ওজোনস্তরকে ক্ষয়প্রাপ্ত করে।

$$NO + O_3 \longrightarrow NO_2 + O_2$$
$$NO_2 + O \longrightarrow NO + O_2$$
$$\overline{O + O_3 \;\; \rightarrow 2O_2}$$
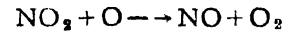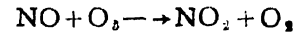
এইভাবে NO গ্যাস ওজোনকে ধ্বংস করে।

শব্দের চেয়ে দ্রুতগামী বিমান ভূ-পৃষ্ঠ থেকে কুড়ি কিলো-মিটার উচ্চতায় সাত থেকে আট ঘণ্টা দৈনিক উড়লে বছরে ওজোনের পরিমাণ শতকরা দশ থেকে কুড়ি ভাগ কমে যাবে। আজকাল শব্দের চেয়ে দ্রুতগামী বিমানের কদর বেশি। সুতরাং ওজোন স্তর ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেই।

এছাড়া পারমাণবিক শক্তিতে বলীয়ান দেশগুলো অনবরত পরীক্ষার নিরীক্ষার জন্য বায়ুমণ্ডলে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে চলেছে। ফলে বায়ুতে নাইট্রোজেনের অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে চলেছে। এই নাইট্রোজেনের অক্সাইড ওজোন স্তরকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। আধুনিক শিল্পে ফ্লুয়োরো ক্লোরো মিথেন অর্থাৎ ডাই ফ্লুয়োরো ডাই ক্লোরো মিথেন (CF_2Cl_2) এবং ফ্লুয়োরো ক্লোরোফর্ম ($CFCl_3$)-এর প্রচুর ব্যবহার। রেফ্রিজারেটার, বিভিন্ন শীততাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং বিশেষ ধরণের রবার প্রভৃতি তৈরি করতে ফ্লুয়োরো কার্বন-এর ব্যবহার বেশি। CF_2Cl_2 এবং $CFCl_3$ নিম্নবায়ু মণ্ডলে কোন ক্ষতি করতে পারে না কিন্তু ওজোনস্ফিয়ারে এই যৌগগুলি বেগুনী রশ্মির সংস্পর্শে ভেঙ্গে গিয়ে এই ক্লোরিন উৎপন্ন করে। ক্লোরিন খুবই সক্রিয় গ্যাস। তাই ক্লোরিন সরাসরি ওজোন স্তরকে আক্রমণ করে পাতলা করে দেয়। পাতলা ওজোনস্তর কিছুতেই অতি বেগুনী রশ্মিকে প্রতিহত করার ক্ষমতা রাখে না, ফলতঃ

প্রাণী ও উদ্ভিদকুল অতি বেগুনী রশ্মির প্রভাব থেকে নিজেকে বাঁচাতে অক্ষম হয়ে পড়ে।

$$CF_2Cl_2 + h\nu \rightarrow CF_2Cl + Cl$$
$$CFCl_3 + h\nu \rightarrow CFCl_2 + Cl$$
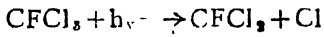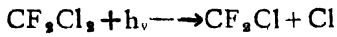
আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে বায়ুমণ্ডলে প্রচুর পরিমাণে ক্লোরিন স্থান পায় এবং এর কিছু অংশ ওজোনস্ফিয়ারে স্থান পেয়ে ওজোন স্তরকে পাতলা করে দেয়।

$$Cl + O_3 \rightarrow ClO + O_2$$
$$ClO + O \rightarrow Cl + O_2$$
$$O_3 + O \rightarrow 2O_2$$
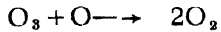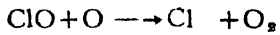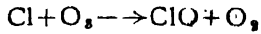
এ ধরণের বিক্রিয়া সম্পন্ন হতে অনেক বছর সময় লাগে। বিক্রিয়া সম্পূর্ণ হতে কম করে চল্লিশ বছর সময়ের প্রয়োজন। এইভাবে শতকরা প্রায় সাতভাগ ওজোন হ্রাস পায়।

অনুমান করা হয় যে, ওজোনের শতকরা এক ভাগ কমলে অতিবেগুনী রশ্মি শতকরা দু'ভাগ বেড়ে যায়। ফলে প্রতি বছরে দশ হাজার লোক ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হয়—বিশেষ করে চামড়ার ক্যানসার।

প্রকৃতির নিজস্ব নিয়মে অন্যান্য গ্যাস বিক্রিয়া ঘটিয়ে ওজোনের ভারসাম্য কিছুটা বজায় রাখে। গাছপালা ও জৈবিক পচন থেকে উদ্ভূত মিথেনের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। মিথেন গ্যাস ওজোন সৃষ্টিতে সাহায্য করে। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতি বছরে শতকরা দু'ভাগ ওজোন এই প্রক্রিয়ায় তৈরি হচ্ছে।

ওজোনের মাত্রা হ্রাস পেলে যে ক্ষতি হতে পারে বা মানব জাতি যে ধরনের সংকটে পড়তে পারে—সে সম্পর্কে পরিবেশ বিজ্ঞানীরা সচেতন। আজকের পৃথিবীতে রাসায়নিক পদার্থের অতিমাত্রায় ব্যবহারের ফলে পরিবেশ যেভাবে বিষাক্ত হচ্ছে এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে—তার কুফল ইতিমধ্যেই আত্মপ্রকাশ করেছে। এটি বন্ধ না হলে, ভবিষ্যতের বংশধরদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠবে। আজকের পৃথিবীর মানুষ ও নানা দুরারোগ্য ব্যাধির শিকার হবে।

এস্পেরান্তো

পাঠ-6

প্রবাল দাশগুপ্ত*

6-1. 'একটা সংখ্যা' জানি: nombro; 'লিখছি' জানি, skribas; 'আমি' জানি, mi; কিন্তু 'আমি একটা সংখ্যা লিখছি' জানিনা—Mi skribas nombron 'আমি একটা সংখ্যা লিখছি'—এই বার জানলাম। আমি লিখছি, তাই mi শব্দের গায়ে n-বিভক্তি নেই। সংখ্যাটা লিখছে না, তাই nombron শব্দে একটা n বিভক্তি আছে o-র পর। সংখ্যা যদি আমাকে লিখতে পারতো তাহলে বলা যেত—Min skribas nombro 'আমাকে লিখছে একটা সংখ্যা'। কিন্তু সংখ্যারা লিখতে জানে না, কাজেই mi এখানে mi থাকতে বাধ্য, nombron-ও nombron থাকতে বাধ্য। জায়গা বদলালেও ক্ষতি নেই; ঝোঁক পালটাবে, আসল মানে পাল্টাবে না—Nombron skribas mi 'একটা সংখ্যা লিখছি আমি'।

তত্ত্বকথা পরে হবে। আগে অভ্যেস।

6-2. konas চিনি, চেনে

Mi konas la vilaĝon

Mi konas la urbon

libro বই

letero চিঠি

Mi legas libron

Mi skribas leteron

lernas শিখছেন

Vi lernas Esperanton

6-3. প্রতিফলন আর সর্বনাম—

Mi konas tiun vilaĝon

Tiuj vilaĝoj estas riĉaj

Mi konas multajn malriĉajn urbojn

Vi konas kvar belajn knabinojn

Ŝi konas belan kaj fortan knabojn

La bela kaj la forta knaboj konas Ŝin

Esperanto estas facila, ili lernas ĝin

*ডেকান কলেজ, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট অ্যাণ্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট ডিপার্টমেন্ট অব লিঙ্গুইস্টিক, পুনে—411006

Vi konas min

Mi konas la ruĝan (la-তে প্রতিফলন নেই)

Vi konas la du ruĝajn domojn

6-4. কোথায় হয় না—

Infano estas homo ('homon' নয়)

Broĝo estas knabo ('knabion' নয়)

Ila estas knabino ('knabinon' নয়)

Tridek estas granda nombro ('grandan ('nombron' নয়)

6-5. এইবার তত্ত্বকথা আরম্ভ।

যাঁরা ইস্কুলের বাঙলা ব্যাকরণ অল্পবিস্তর মনে রেখেছেন তাঁরা আশা করে আছেন যে আমি কারক নিয়ে, বিশেষ করে কর্মকারক নিয়ে কথা বলব। তা কিন্তু নয়। আমি বলব, 'কারক' আর 'কর্ম' এই দুটো শব্দের যে অপব্যবহার বিদ্যালয়-পাঠ্য বইয়ে চালু আছে তার কথা একেবারে ভুলে গিয়ে, কেঁচে গণ্ডূষ করে, গোটা ব্যাপারটা নতুন করে শিখি আসুন, নতুন পরিভাষায়। 'কারক আর কর্ম' কাকে বলে সে আলোচনা করব অনেক পরে কর্মবাচ্যের সূত্রে। আপাতত স্রেফ ভুলে যান 'কারক' আর 'কর্ম' শব্দ দুটো।

বাক্যের প্রধান দুটো ভাগকে বলে উদ্দেশ্য আর বিধেয় ;

উদ্দেশ্য	বিধেয়
Vi	lernas Esperanton
Si	konas la vilaĝon
Brogo	estas knabo
Ila	-sidas-en ĉambro

বিধেয়র কেন্দ্র হলো ক্রিয়া—lernas, konas, estas, sidas-এর মতো পদ। একরকম ক্রিয়া আছে যা উদ্দেশ্যের সঙ্গে বিশেষণের দেখা করিয়ে দেয়, অথবা বিশেষণের মতো বিশেষ্যের :

Broĝo estas : forta

Broĝo kaj Ila estas : fortaj

Broĝo estas : knabo

Broĝo kaj Ila estas : geknaboj

এ রকম বাক্যে forta বা fortaj যে কাজ করে knabo বা geknaboj-ও সেই একই কাজ করে, উদ্দেশ্যের সঙ্গে ; estas এখানে মধ্যস্থ মাত্র। Estas-এর মতো আরও কিছু মধ্যস্থ ক্রিয়া আছে, পরে তাদের সাক্ষাৎ পাবো। মধ্যস্থ ক্রিয়া থাকলে n বিভক্তি হয় না। N-র সঙ্গে (মনে আছে তো, N-কে 'নো' বলে এস্পেরান্তো বর্ণমালায় ?) খানিকটা তুলনা চলে বাঙলা-কে বিভক্তির (Mi konas vin, আমি আপনাকে চিনি) ; বাঙলাতেও দেখুন, আমরা বলি 'ব্রজ ইলার ভাই হয়'। আমরা তো 'ব্রজ ইলার ভাইকে হয়' বলি না। তার কারণ 'হয়' একটা মধ্যস্থ ক্রিয়া।

'কোথায় n হয় না', অর্থাৎ 6-4, বুঝতে পারলেন। এবার 'কোথায় হয়'-এর পালা।

6-6। Brogo nombras knabojn—unu, du, tri 'ব্রজ ছেলে গুনছে—এক, দুই, তিন'। একটা ছোট পরীক্ষা করুন—এই বাক্যে কি 'ছেলে'র মতো বিশেষ্যের বদলে কোনো বিশেষণ বসতে পারত, যেমন 'সহজ'—'ব্রজ সহজ গুনছে' ? না, পারত না ('সহজে' বসতে পারত, কিন্তু ওটা বিশেষণ নয়, ক্রিয়াবিশেষণ)। অতএব 'গুনছে' ক্রিয়াটা মধ্যস্থ নয়। 'ব্রজ কী গুনছে ?' এই প্রশ্নের উত্তর যে বিশেষ্য, 'ছেলে', সেটা তাহলে উদ্দেশ্য 'ব্রজ'-র বিশেষণ স্থানীয় নয়, 'গুনছে'-ক্রিয়ার পূরক। 'গুনছে' নিছক মধ্যস্থ নয়, তার মানে আছে নিজস্ব। সেই মানেটাকে পূর্ণতা দেয় তার পূরক 'ছেলে'। ব্রজ গুনছে। ব্রজ কী গুনছে ? না, ছেলে গুনছে।

তুলনা করে দেখুন 'ব্রজ ইলার ভাই হয়'-এর সঙ্গে। বলতে পারবেন কি 'ব্রজ হয় ; ব্রজ কী হয় ? না ইলার ভাই ?' পারবেন না ; 'হয়' ক্রিয়াটা মধ্যস্থ ; তার নিজস্ব অর্থ এত কম যে ব্রজ হয়' এই কথাটার একা একা কোনো মানে হয় না। অর্থাৎ 'ব্রজ ইলার ভাই হয়' এই বাক্যে 'ইলার ভাই' যদি পূরক হয় তাহলে সে 'হয়'-এর পূরক নয়, স্বয়ং 'ব্রজ'-রই পূরক। 'হয়' খালি যোগাযোগটুকু করিয়ে দেয়। 'গুনছে'-র সঙ্গে অনেক তফাৎ। 'ব্রজ ছেলে গুনছে' এই বাক্যের 'গুনছে' নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে। বলা চলে 'ব্রজ' গুনছে। তার পর যদি জিগেস করি 'ব্রজ' কী গুনছে ? তার উত্তর পাই 'ছেলে' সেই 'ছেলে' তাহলে 'গুনছে' ক্রিয়ার পূরক।

ক্রিয়ার পূরক যে বিশেষ্য (খাস 0-ওয়ালা বিশেষ্যই হোক আর সর্বনামই (হোক) তাকে এস্পেরান্তো ভাষা n বিভক্তি দিয়ে চিহ্নিত করে। এ পর্যন্ত n বিভক্তির যে প্রয়োগ শিখেছেন তার তত্ত্বের মোদ্দা কথাটা এই।

লোকের বা জায়গার নামের উপর এস্পেরান্তো যদি আদৌ কোনো ছাপ না মারে—Aŝa, Pradip—তাহলে স্বভাবতই n-ও আসে না। তখন উদ্দেশ্য বসে বাঁ দিকে ক্রিয়ার পূরক ডান দিকে। Aŝa konas Prodip আশা চেনে প্রদীপকে। Prodip konas Aŝa প্রদীপ চেনে আশাকে। ('প্রদীপকে, আশাকে'-র মতো 'কে' বিভক্তির সাহায্য না পেলে বাঙলাতেও এটা করার দরকার হয়। বেড়াল মাছ খায় মানে বেড়ালই ভক্ষক। মাছ বেড়াল খায় বললে এই দাঁড়ায় যে মাছই ভক্ষক।)

কিন্তু যে নাম এস্পেরান্তোর 0 বিভক্তি স্বীকার করে নিয়েছে যেমন কলকাতার এস্পেরান্তো নাম Kalkato তার গায়ে দরকার মতো n বিভক্তিও বসবে—Ŝubir konas kaj komprenas kalkaton সুবীর কলকাতাকে চেনে এবং বোঝে।

6-7। এবার আসুন Ila sidas en ĉambro-তে। এই বাক্যে ĉambro হলো en-এর···কী? en এর পূরক? বাঙলা দেখলে তা মনে হতেও পারে। ইলা ঘরের ভিতরে বসে আছে; এই বাক্যে 'ভিতরে' অনুসর্গের পূরক 'ঘরের'। ইলা ভেতরে বসে আছে। কীসের ভিতরে? না, ঘরের ভিতরে। কিন্তু এই বিশ্লেষণ এস্পেরান্তোয় অচল। বাঙলায় 'ভিতরে' একা দাঁড়ায়; বলতে পারি 'ইলা ভিতরে বসে আছে'; কিন্তু en একা দাঁড়ায় না; বলতে পারি না Ila sidas en (এস্পেরান্তোয় অন্যভাবে 'ইলা ভিতরে বসে আছে' অবশ্যই বলা যায়, পরে শিখবেন, কিন্তু Ila sidas en হয় না)। অর্থাৎ বাঙলা অনুসর্গ 'ভিতরে' আর এস্পেরান্তো পূর্বসর্গ en একেবারে সমান ওজনের জিনিস নয়। En-এর বরং তুলনা চলে হয়তো বাঙলা 'ভিতর' শব্দের সঙ্গে। 'ইলা ঘরের ভিতর বসে আছে' বলি, 'ইলা ভিতর বসে আছে' বলি না; 'ঘরের'-কে তাই বলতে পারি না 'ভিতর' অনুসর্গের পূরক। তেমনি এস্পেরান্তোতেও, কখনেই কোনো বিশেষ্যকে বলতে পারি না কোনো পূর্বসর্গের পূরক। এস্পেরান্তোর সব পূর্বসর্গই বাঙলা 'ভিতর' অনুসর্গের মতো ('ভিতরে' অনুসর্গের মতো নয় একটাও)।

Brogo nombras ĉambrojn, ব্রজ ঘর গুনছে। এখানে n আছে। Ila sidas en ĉambro, এখানে n নেই। কেন? কারণ ĉambrojn-টা nombras ক্রিয়ার পূরক, আর ĉambro-টা কারুর পূরক নয় (en-এর পূরক হওয়া যায় না)। এটুকু বুঝলেই পূরক বিশেষ্যের চিহ্ন হিসেবে n বিভক্তির যে কাজ সেটা বোঝা হয়ে যায়। তবে n-বিভক্তির অন্য কাজও আছে, সে কথা পরে হবে।

6-8. একটা-দুটো শব্দ লাগবে এবার—

	n নেই	n আছে
একবচন	ĉambro	ĉambron
বহুবচন	ĉambroj	ĉambrojn

"N নেই, n আছে" বলাটা তো "j নেই, j আছে" বলার মতো। J-র বেলায় ভদ্রভাবে বলতে পারি "একবচন, বহুবচন"। N থাকা না থাকার ভদ্র নাম কী রাখা যায়? আগেই বলেছি 'কর্ম' বা 'কারক'-এর মতো শব্দ থেকে শত হস্ত দূরে থাকা দরকার (পরে বোঝাবো কেন)। ভাষাবিজ্ঞানের বাঙলা পরিভাষায় এই অর্থে "প্রপাত" কথাটা চালানোর চেষ্টা চলছে; বলা যাক, n না থাকলে প্রথম প্রপাত, n থাকলে দ্বিতীয়—

	প্রপাত: প্রথম	দ্বিতীয়
বচন: এক	ĉambro	ĉambron
বহু	ĉambroj	ĉambrojn

বিশেষণ (দস্তুরমতো a-কারান্ত বিশেষণ অথবা tiu-র মতো (জিনিস) তার বিশেষ্যের বচন আর প্রপাত প্রতিফলন করে—granda ĉambro, tiu ĉambro; grandajn, ĉamrbojn, tiujn ĉambrojn; ইত্যাদি।

6-9. lavas ধোয়, কাচে
vesto কাপড়
laca ক্লান্ত

Ŝudip lavas multajn vestojn. Li estas laca. Li konas riĉajn homojn. Ili estas amikoj de Ŝudip (সুদীপের বন্ধু). La riĉaj homoj loĝas en granda domo. En tiu domo estas maŝino (যন্ত্র). La maŝion lavas vestojn. Ŝudip kaj la riĉaj amikoj lavas vestojn en tiu maŝino. La maŝino estas mallaca. La vestoj estas puraj.

6-10 hodiaŭ আজ
ne না
ne lavas ধুচ্ছে না
dormas ঘুমোয়

Hodiaŭ la maŝino ne lavas vestojn. Ĝi estas laca. Ankaŭ maŝinoj dormas! Tiu maŝino dormas hodiaŭ. Ĝi ne lavas

Venas Broĝo kaj Ila. Ili estas ordinaraj (সাধারণ) geknaboj, ne riĉaj. Geknaboj ne estas maŝinoj! Ili ludas; ili ne dormas. Tie estas malpurajn vestoj. Broĝo kaj Ila ludas kaj lavas la vestonjn. Ili ne estas lacaj.

নোবেল পুরস্কার—1985

শুভংকর

পদার্থবিজ্ঞান

এ বছর পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন পশ্চিম জার্মানীর বিজ্ঞানী ক্লাউস ফন ক্লিট জিঙে-তাঁর আবিষ্কারের বিষয় হচ্ছে হল এফেক্টের (Hall effect)। কণাতত্ত্ব। উরৎসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি দ্বিমাত্রিক ইলেকট্রন গ্যাসের বিস্ময়কর জগৎ নিয়ে যে কাজ করেছিলেন—বর্তমান পুরস্কার তারই ফলপ্রাপ্তি। দ্বিমাত্রিক ইলেকট্রন গ্যাস কেবল কঠিন পদার্থে বিদ্যমান থাকতে পারে—সাধারণ কঠিন পদার্থ নয় MOSFET বা metal oxide semiconductor field effect transistor এর মত কঠিন পদার্থে দ্বিমাত্রিক ইলেকট্রন গ্যাস গঠিত হতে পারে। অপরিবাহী মেটাল অক্সাইডের পাতলা টুকরো একদিকে মেটাল ও উল্টোদিকে সেমিকণ্ডাক্টর টুকরো দিয়ে স্যাণ্ডউইচ অবস্থায় থাকলে ঐ অপরিবাহী পদার্থের স্তরে উপযুক্ত ব্যবস্থায় ইলেকট্রন চলাচল করতে পারে। এই স্তরটি এক মিলিমিটারের 10 কোটি ভাগের একভাগের মত পুরু হলে আর সেমিকণ্ডাক্টর স্তরটি যদি খুব শীতল অর্থাৎ প্রায় 1·5 k হয় তবে ইলেকট্রন স্রোত দ্বিমাত্রিক হতে পারে—আর তা সেমিকণ্ডাক্টরের পৃষ্ঠতলের সমান্তরাল হবে।

ক্লিটজিঙ MOSFET এর দ্বিমাত্রিক ইলেকট্রন স্তরে হল এফেক্ট নিয়ে গবেষণা সুরু করেন। কোন পদার্থের পাতলা স্তরে যদি বিদ্যুৎ প্রবাহ একদিকে চলে ও তার লম্বদিকে চুম্বক ক্ষেত্র প্রযুক্ত হয়, তাহলে বিদ্যুৎ প্রবাহ ও চুম্বক ক্ষেত্রের সমকোণে যে ভোল্টেজ উৎপন্ন হবে তা হল্ ভোল্টেজ নামে অভিহিত হয়।

খুব শক্তিশালী চুম্বক ক্ষেত্রে MOSFET স্তরে বিদ্যুৎপ্রবাহ পরিবর্তন করলে হল্ ভোল্টেজ সরলভাবে পরিবর্তিত হয় না। বরং তা কোয়ান্টাম সংখ্যায় ধাপে ধাপে পরিবর্তিত হয়। ক্লিটজিঙ এর চেয়ে আরও যে উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার করেছেন তা হল, হল্ ভোল্টেজ ও হল্ রোধ (Hall resistance) ওমসের নিয়ম মেনে চলে না—হল্ রোধ কয়েকটি মানে আবদ্ধ থাকে। বর্তনীর বিদ্যুৎপ্রবাহ ইত্যাদি পরিবর্তন যে পরিমানেই হোক না কেন কয়েকটি মৌল ধ্রুবকের উপর হল্ রোধ নির্ভরশীল। MOSFET ব্যবহার করে বিভিন্ন বিজ্ঞানী এই রোধের খুব সূক্ষ্ম পরিমাপ করেছেন। এই পদ্ধতিতে হল্ রোধ 1 থেকে 10 কোটির 1 অংশ সূক্ষ্মভাবে মাপা যায়। ফলে হল্ এফেক্টের কণাতত্ত্ব এইরূপকে রোধের মানক হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। ক্লিটজিঙের পরীক্ষা থেকে দ্বিমাত্রিক ইলেকট্রন গ্যাসের অনেক মৌলিক তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। আমেরিকার বিজ্ঞানী সুই, স্টর্মার, ও গোসার্ড এমনকি ভগ্নাংশ কোয়ান্টাম হল এফেক্টের সন্ধান পেয়েছেন যাতে পূর্ণ সংখ্যক কোয়ান্টাম সংখ্যার পরিবর্তে ভগ্নাংশ কোয়ান্টাম সংখ্যার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। কোয়ান্টাম তত্ত্বেও ক্লিটজিঙের পরীক্ষার ফল সুদূর প্রসারী। তাই নোবেল কমিটি পদার্থবিজ্ঞানে এই পুরস্কার দিয়ে ক্লিটজিঙের আবিষ্কারকে যথার্থই স্বীকৃতি দিয়েছেন।

রসায়ন

রসায়নবিজ্ঞানে এ বছর নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন যুক্তভাবে গণিতজ্ঞ হার্ব হাউপ্টম্যান ও পদার্থবিজ্ঞানী জেরাম-কার্লে। অতীতে কোন কোন পদার্থবিজ্ঞানী রসায়নে নোবেল পুরস্কার পেলেও এই প্রথম একজন গণিতবিদ রসায়নে পুরস্কার পেলেন। এঁদের কৃতিত্ব হল অণুর গঠন বিন্যাস নিরূপণে এক্সরে ক্রস্ট্যালোগ্রাফিক প্রযুক্তির পরিসংখ্যান পদ্ধতির উন্নয়ন। এই পদ্ধতির উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব কোথায় তা খুঁজতে ক্রিস্টালোগ্রাফিক প্রযুক্তি দিয়ে ক্রস্টালের গঠনবিন্যাস কিভাবে নিরূপণ করা যায় তা জানা প্রয়োজন। আলোর তরঙ্গ পদার্থে বিকীর্ণ হয়ে লেন্সে ফোকাসিত হলে পদার্থের বর্ধিত প্রতিবিম্ব পাওয়া যায়। ক্রস্ট্যাল ল্যাটিসের গঠন বিন্যাস জানতে সাধারণ আলো নয়, ভেদক এক্সরশ্মি ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু বিকীর্ণ এক্সরশ্মির ফোকাস সম্ভব নয় বলে অণুর আভ্যন্তরীণ প্রতিবিম্ব পাওয়া যায় না। তবে অববর্তনজনিত বিন্দুর কিছু বিন্যাস পাওয়া যায় যা থেকে ক্রস্ট্যালের গঠন বিন্যাস নিরূপণ করতে হয়। স্যার উইলিয়াম ও সার লরেন্স ব্র্যাগ ক্রস্ট্যালে প্রথম এক্সরশ্মির অববর্তন নিয়ে পরীক্ষা করেন। ল্যাটিসে পরমাণুগুলির দূরত্ব এক্সরশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সঙ্গে তুলনীয় তাই এক্সরশ্মি ব্যবহৃত হয়। এক্সরশ্মি ক্রস্ট্যালের একটি দিকে আপতিত হলে ক্রস্টালের ক্রমিক সমতলগুলিতে

বিকীর্ণ হয়। সমান্তরাল সমতলগুলিতে পরস্পর এক্সরশ্মির তরঙ্গ মুখের অংশ বিভিন্ন দূরত্ব অতিক্রম করে একই ফেজে (Phase) থাকে না। বিকীর্ণ এক্সরে পুনর্মিলিত হয়ে ক্রুস্ট্যাল গঠনের কোন চিহ্নই বয়ে আনে না। তবে বিশেষ কয়েকটি কোণে প্রতিফলিত এক্সরশ্মির কিছু অংশ ফোটোগ্রাফিক প্লেটে বিন্দু বিন্যাসে ক্রুস্ট্যালে সমতলগুলির সমান্তরাল অবস্থার দূরত্ব প্রকাশ করতে পারে। এই অববর্তন বিন্দুবিন্যাস থেকে ক্রুস্ট্যাল এককগুলি ক্রুস্ট্যালে কিভাবে সাজানো আছে তা ধরা পড়ে। কিন্তু পরমাণুগুলি অথবা অণুগুলি ক্রুস্ট্যালে কিভাবে বিন্যস্ত আছে তা সহজ কোন ক্রুস্ট্যালে ধরা গেলেও জটিল গঠনের ক্রুস্ট্যালে বিভিন্ন পারমাণবিক সমতলে এক্সরশ্মির অসম অববর্তনের জন্য সহজে ধরা পড়ে না। তখন অববর্তিত বিন্দুবিন্যাসে বিন্দুগুলির ঔজ্জ্বল্য কম বেশী হয়—কারণ অববর্তিত এক্সরশ্মির ফেজবিভেদের জন্য ব্যতিচার ঘটে। বিন্দুর ঔজ্জ্বল্য থেকে ফেজবিভেদের পরিমাপ করা যায় না, অনুমান করতে হয়। ক্রুস্ট্যালোগ্রাফির এ হল চিরন্তন সমস্যা—ফেজ সমস্যা।

এই সমস্যার একটি সমাধান হল পদার্থটির প্রতিরূপ অনুমান করে বিন্দুবিন্যাসের কি স্বরূপ হবে তা স্থির করা ও পরে ক্রুস্ট্যাল থেকে যে বিন্দুবিন্যাস পাওয়া যাচ্ছে তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা। গরমিল হলে অনুমিত প্রতিরূপকে বার বার বদলাতে হয়। হাউপ্টম্যান ও কার্লের মহান অবদান হল, তাঁরা এমন একটি পরিসংখ্যান পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন যাতে ক্রুস্ট্যাল থেকে প্রতিফলিত এক্সরশ্মির ফেজ বিভেদ অনুমান-নির্ভর হলেও তা কোন অনুমিত প্রতিরূপের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার প্রয়োজন হয় না—অববর্তন বিন্দু-বিন্যাস তা যতই জটিল হোক এই পদ্ধতিতে ক্রুস্ট্যালের প্রতিবিম্ব হুবহু নির্দেশ করে। অবশ্য অধ্যাপক লন্সডেল এই পদ্ধতির সূচনা করেছিলেন, হাউপ্টম্যান ও কার্লে এই পদ্ধতির উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন করে ক্রুস্ট্যাল গঠন বিন্যাস নির্ধারণে স্বয়ংক্রিয় রুটিন প্রযুক্তির প্রচলন করেছেন।

এখন এই পদ্ধতিতে বড় বড় জৈব অণুর গঠন বিশ্লেষণ করা যায় ও তা খুব সহজ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই দুই বিজ্ঞানীই আমেরিকার নেভাল রিসার্চ লেবরেটরীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ও অন্যতম কার্লে এখনও আছেন। হাউপ্টম্যান বর্তমান বাফেলোর মেডিক্যাল ফাউণ্ডেশন-এর সঙ্গে যুক্ত। কার্লে মনে হয় একমাত্র বিজ্ঞানী যিনি আমেরিকার প্রতিরক্ষা বিভাগে যুক্ত থেকে প্রথম নোবেল-জয়ী হলেন।

চিকিৎসা ও শারীরবিজ্ঞান

চিকিৎসা ও শারীরবিজ্ঞানে এবছর নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন জোসেফ গোল্ডস্টিন ও মাইকেল ব্রাউন। গত বিশ বছর ধরে তাঁরা হৃৎপিণ্ডে রক্তচলাচলে ধমনীর রোধ সম্পর্কে গবেষণা করছেন। 1966 খৃস্টাব্দে তাঁরা রক্তের কোলেস্টেরল-এর সঙ্গে হৃৎপিণ্ডের ধমনীর রোধ নির্ণয়ের সম্পর্ক আবিষ্কারে ব্রতী হয়েছেন। শরীরের শতকরা 95 ভাগ কোলেস্টেরল থাকে জীবকোষে। বিশেষত কোষের আবরণী পর্দায় এরা জৈবরাসায়নিক বিক্রিয়ায় সাহায্য করে এবং কোষের গঠনকে অক্ষুন্ন রাখতে সাহায্য করে। বাকী শতকরা 7 ভাগ থাকে রক্তে এবং এই অংশটুকুই এথেরোস্ক্লেরোসিস রোগের প্রধান কারণ।

রক্তের কোলেস্টেরল সাধারণত কম ঘনত্বের লিপো-প্রোটিন (LDL), কোলেস্টেরল কণা ও অন্যান্য লিপিড ও প্রোটিন আকারে বাহিত হয়। কোষপৃষ্ঠের বিশেষ গ্রাহক লিপোপ্রোটিন চিনে নিয়ে কোষ গ্রহণ করে। ব্রাউন ও গোল্ডস্টিন প্রথম প্রমাণ করেন এই গ্রাহকের অস্তিত্ব এবং দেখান যে, যে সব ব্যক্তির কোষে এই গ্রাহকের মাত্রা অল্প তাদের রক্তে উঁচুমাত্রার কোলেস্টেরল থেকে যায় ফলে তাদের এথেরোস্ক্লেরেসিস, স্ট্রোক, হৃৎযন্ত্রে ক্রিয়াবন্ধ প্রভৃতি হওয়ার প্রবণতা বেশী থাকে।

ব্রাউন ও গোল্ডস্টিন দেখিয়েছেন যে চর্মকোষের পৃষ্ঠে যে বিশেষ গ্রাহক থাকে তা লিপোপ্রোটিনের সঙ্গে সহজে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হতে পারে ও তাকে সঙ্গে নিয়ে কোষ আবরণে ঢুকে পড়ে। পরে এই গ্রাহকই লিপোপ্রোটিন (LDL)কে কোষে ঢুকিয়ে বিপাকক্রিয়ায় অংশ নিতে সাহায্য করে। হৃদযন্ত্র বৈকল্যের একটি সামান্য অংশ বিশদভাবে ধরা পড়েছে ব্রাউন ও গোল্ডস্টিনের কাজে। অন্য সব মারাত্মক হৃদযন্ত্র জনিত ব্যাধি নিয়ে এখনও অনেক গবেষণার প্রয়োজন।

তবে ব্রাউন ও গোল্ডস্টিনের কাজে rectepterology বা গ্রাহকতত্ত্ব নামে একটি নূতন গবেষণার ক্ষেত্র সূচিত হয়েছে। LDL-এর বিশদ তথ্য জানা গেছে। বিশেষত গ্রাহক কিভাবে লিপোপ্রোটিন বা LDL-এর সঙ্গে যুক্ত হয়, কিভাবে কোষে ঢুকে পড়ে সঞ্চিত থাকে, আবার বেরিয়ে এসে আর একটি LDL ধরে নিয়ে যায় এসব তথ্য ধরা পড়েছে। কোষপৃষ্ঠ ও গ্রাহকের বিভিন্ন সমন্বয়ে শারীরতত্ত্বের অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্রাউন ও গোল্ডস্টিনের কাজের প্রয়োগের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে।

আমেরিকার টেক্সাসের অধিবাসিনী আট বছর বয়সী

মেয়ে স্টর্মী জোন্স ব্রাউন ও গোল্ডস্টিনের আবিষ্কারের দৌলতে মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচেছে। 6 বছর থেকে তার অসুখ দেখা দেয়—পারিবারিক রোগ হাইপার কোলেস্টোরেলেমিয়া। অসুখটি বিরল হলেও মারাত্মক। যে রোগী বাবা ও মা একজনের বিকৃত LDL গ্রাহক চিহ্নিত জিন নিয়ে জন্মায় তাদের এই অসুখ প্রায়ই মৃত্যু হয়। কিন্তু স্টর্মী বাবা ও মা দুজনের এই বিকৃত জিন উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে বলে তার অসুখ মারাত্মক। এত মারাত্মক যে ছয় থেকে সাত বছর বয়সের মধ্যেই তার দুবার বাইপাস অপারেশন করতে হয়েছে। হৃৎপিণ্ডের একটি ভালভ পালটাতে হয়েছে। পিটসবার্গ হাসপাতালে পৃথিবীর প্রথম হৃৎপিণ্ড ও যকৃৎ একসঙ্গে পরিবর্তন করার মত অপারেশনেরও সম্মুখীন হতে হয়েছে। এসব সম্ভব হয়েছে। ডঃ বিলহিমারের সফল প্রচেষ্টায়। ডঃ বিলহিমার ব্রাউনও গোল্ডস্টিনের একদা সহযোগী ছিলেন। তাঁদের পদ্ধতি প্রয়োগ করে স্টর্মীর রোগ দ্রুত নির্ণয় করা সম্ভব হয়। রোগীর দেহে যখন কোলেস্টেরল কাজ করে না—তখন চামড়ায় ফুস্কুড়ি দেখা দেয়। তা ধরতে পারলে হৃৎপিণ্ড অসুস্থ হওয়ার আগেই রোগীকে সুস্থ করা যায়। কুড়ি মাস পরে স্টর্মী এখন সুস্থ হয়ে পড়াশুনা খেলাধুলো সবই করতে পারছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানে এই অবদান ভবিষ্যতে হৃদরোগীদের আশ্বস্ত করবে।

উভচর প্রাণীর বংশরক্ষা

অজিতকুমার মেদ্দা*

জীবজগতে অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য বংশবৃদ্ধি করাই প্রত্যেক জীবের এক সহজাত প্রেরণা। জীবের কার্যকলাপ যাই হোক না কেন, এর প্রধান উদ্দেশ্য খাদ্যগ্রহণ ও সন্তান-সন্ততি উৎপাদন। যে যত বেশী সন্তান-সন্ততি উৎপাদনে সক্ষম, সে জীবজগতে তত বেশী সফল জীব হিসাবে পরিগণিত হবে। প্রাণিরাজ্যে বংশবিস্তার পদ্ধতি বিচিত্র। যৌন-জনন, অযৌন-জনন এবং অপুংজনি বা পার্থেনোজেনেসিস—সব পদ্ধতিই প্রাণিরাজ্যে দেখা যায়। যৌন-জননের ক্ষেত্রে দেখা যায় কোন প্রাণী ডিম পাড়ে, ডিম ফুটে লার্ভা, লার্ভা থেকে পিউপা তারপর পূর্ণাঙ্গ প্রাণী। আবার কোন প্রাণীর ক্ষেত্রে ডিম ফুটে লার্ভা দশা এবং লার্ভা কিছুদিন পরে একেবারে পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে পরিণত হয়। ডিমের পর লার্ভা দশা কেন হয়? নিশ্চয়ই এর একটা প্রয়োজনীয়তা আছে। সম্ভবতঃ ডিমের মধ্যে যে পরিমাণ খাদ্য সঞ্চিত থাকে সেটা ভ্রূণের সম্পূর্ণ বৃদ্ধি ও পরিস্ফুরণ ঘটিয়ে পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে রূপান্তরের জন্য যথেষ্ট নয়। তাই লার্ভা প্রচুর পরিমাণে খায় এবং তার আরও বৃদ্ধি ঘটে, ফলে লার্ভা পিউপাতে কিংবা একেবারে পূর্ণাঙ্গ দশায় পৌঁছায়। বহু প্রাণীর ক্ষেত্রে মাতৃদেহে ভ্রূণের

1নং চিত্র। বর্ষাকালে ব্যাঙের আলিঙ্গন। ডিম পাড়বার সময় এরা এই অবস্থায় থাকে।

*বসু বিজ্ঞান মন্দির, কলিকাতা

বৃদ্ধি ও পরিস্ফুরণ সম্পূর্ণ হওয়ায় সোজাসুজি পূর্ণাঙ্গ আকারের বাচ্চার জন্ম হয়। নিশ্চয়ই এরা মাতৃদেহে প্রয়োজনমত খাদ্য পেয়ে থাকে। ডিম পাড়া কিংবা বাচ্চা প্রসব করার জন্য একটা উপযুক্ত পরিবেশ দরকার। কোন কোন লোনা জলের মাছ হাজার হাজার মাইল সাঁতার কেটে মিঠা জলে পৌঁছায় এবং সেখানে ডিম পাড়ে, ডিম পাড়ার পর ওদের মৃত্যু হয়। ডিম ফুটে বাচ্চারা বেরিয়ে আসে এবং এরা এই দীর্ঘ পথ সাঁতার কেটে আবার লোনা জলে ফিরে আসে। এই বাচ্চারা বড় হয়ে ডিম পাড়ার সময় হলে পুনরায় তাদের মিঠা জলে যেতে হয়।

ছোট ছোট ব্যাঙাচি বের হয়ে আসে। ব্যাঙাচি ব্যাঙের লার্ভা দশা। মস্তিষ্কের মধ্যে যে পিটুইটারি গ্রন্থি আছে তার অগ্র বা সম্মুখ অংশ বা অ্যান্টিরিঅর পিটুইটারী (anterior pituitary) থেকে যে যৌনাঙ্গ-উদ্দীপক হর্মোন (gonadotropic hormon) ক্ষরিত হয় ডিম পাড়ার উপর তার এক বিরাট প্রভাব আছে। এই উদ্দীপক হর্মোনের অভাবে ডিমের বৃদ্ধি এবং ডিম পাড়া সম্ভব হয় না। স্ত্রী-ব্যাঙকে পিটুইটারী নির্যাস (extract) ইনজেকশন দিয়ে কৃত্রিম উপায়ে ডিম পাড়ান সম্ভব হয়েছে। আবার মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস (hypothalamus) অংশে যে ক্ষরণশীল স্নায়ুকোষ (neurosecretory
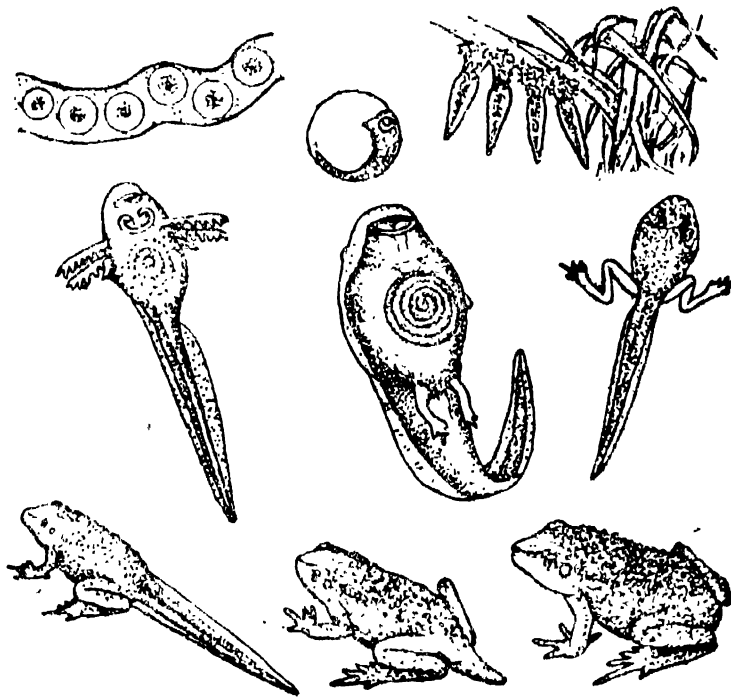
2নং চিত্র। ব্যাঙের জীবনচক্র

ব্যাঙ উভচর প্রাণী, এরা জলে ও স্থলে বাস করতে পারে। যদিও কোন জাতের ব্যাঙ জীবনের অধিকাংশ সময় ডাঙায় কাটায়, ডিম পাড়ার সময় অবশ্যই এদের সকলকে জলে আসতে হবে। সাধারণত বর্ষাকালই ব্যাঙের জনন ঋতু। এই সময় এক অদ্ভুত শব্দ করে পুরুষ ব্যাঙ স্ত্রী ব্যাঙকে ডাকে। পুরুষ ও স্ত্রী-ব্যাঙের দৃঢ় আলিঙ্গনের সময় (1নং চিত্র) স্ত্রী-ব্যাঙ হাজার হাজার ডিম পাড়ে। ডিমগুলি জেলিজাতীয় পদার্থে প্রস্তুত ফিতার মধ্যে থাকে। এই সময় পুরুষ ব্যাঙ ঠিক ঐস্থানে হাজার শুক্রাণু ত্যাগ করে। জলের মধ্যে ডিম্বাণুগুলি শুক্রাণুর দ্বারা নিষিক্ত হবার কয়েক দিন পরেই ডিম ফুটে

cells) আছে সেখান থেকে কতকগুলি প্রোটিনজাতীয় রিলিজিং বা মুক্তকারী হর্মোন নিঃসৃত হয়ে অগ্রপিটুইটারির বিভিন্ন হর্মোনের ক্ষরণ নিয়ন্ত্রিত করে। সুতরাং ব্যাঙের ডিম পাড়ার উপর পিটুইটারির যৌনাঙ্গ উদ্দীপক হর্মোনের প্রত্যক্ষ প্রভাব এবং হাইপোথ্যালামাসের নির্দিষ্ট রিলিজিং হর্মোনের পরোক্ষ প্রভাব আছে। ডিম ফুটে ব্যাঙাচি এবং ব্যাঙ হওয়ার উপরই ব্যাঙের বংশ রক্ষা নির্ভর করে।

ব্যাঙাচির রূপান্তর পদ্ধতি খুবই জটিল। এদের দেহে বহু প্রকার অঙ্গসংস্থানীয় ও প্রাণরাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে। এই রূপান্তরের জন্যে থাইরয়েড হর্মোন অপরিহার্য। ডিম থেকে

ব্যাঙাচি বের হয়ে এসে জলে সাঁতার কাটে এবং জলজ উদ্ভিদের পাতা, শেওলা ইত্যাদি খায়। লার্ভা অবস্থায় এরা প্রচুর পরিমাণে খায়। কার্বোহাইড্রেটই এদের প্রধান খাদ্য, অবশ্য কিছু প্রোটিনও পাতা, শেওলার মধ্যে অবশ্যই থাকবে। যখন এদের খাদ্যের প্রধান উপাদান কার্বোহাইড্রেট ও, তখন এই উপাদানকে পরিপাক করার জন্য ব্যাঙাচির কুণ্ডলাকৃত পরিপাকনালীর মধ্যে কার্বোহাইড্রেট বিশ্লেষণকারী এনজাইম বেশী পরিমাণে থাকে। পরিপাকের পর সহজ সরল খাদ্য রক্তে বিশোষিত হয়। ধীরে ধীরে ব্যাঙাচি বাড়তে থাকে, কিছুদিনের মধ্যে পিছনের পা বের হয়, পা-দুটি ক্রমশ বড় হতে থাকে, কয়েক সপ্তাহ পরে সামনের পা-দুটি বের হয়, ঠিক সেই সময় থেকেই লেজটি ক্রমশ ছোট হয়ে দেহের সঙ্গে মিশে যায় (2নং চিত্র)। এই সময় চোখের ও মুখের আকৃতিরও পরিবর্তন ঘটে। লেজের ক্ষয়ের কারণ হচ্ছে আর্দ্র বিশ্লেষণকারী এনজাইমগুলি কোষের লাইসোজোম যন্ত্রাণু থেকে মুক্ত হয়ে লেজের কলার ক্ষয় বা আর্দ্রবিশ্লেষণ ঘটায়। রূপান্তরের সময় ব্যাঙাচি খায় না। বলা যেতে পারে, লেজের কলার প্রোটিন প্রভৃতি জটিল বস্তুগুলি আর্দ্রবিশ্লেষিত হয়ে কিছুটা খাদ্যের চাহিদা মেটায়। লেজের কোলাজেন নামে যে প্রোটিন আছে তা বিশ্লেষিত হয়ে পিঠের ও ঘাড়ের চামড়ায় জমা হতে থাকে, এর ফলে চামড়া মোটা ও শক্ত হয়। ব্যাঙাচি জলে ফুল্‌কোর দ্বারা শ্বাসকার্য করে। রূপান্তরের সময় ফুল্‌কার ক্ষয় হয় এবং ফুসফুসের বৃদ্ধি ও পরিস্ফুরণ ঘটে। ফুসফুসের দ্বারাই বায়ু থেকে সরাসরি অক্সিজেন গ্রহণ করে ব্যাঙ শ্বাসকার্য করে থাকে।

রূপান্তরের সময় ব্যাঙাচির দেহের পরিবর্তনগুলির একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙকে ডাঙায় বাস করার উপযোগী করে তোলা। ব্যাঙের খাদ্য অভ্যাস পৃথক। এরা পোকা-মাকড় ধরে খায়। সুতরাং, খাদ্যে বেশীর ভাগ প্রোটিন থাকে এবং এই প্রোটিনকে পরিপাক করার জন্য পরিপাকনালীর মধ্যে প্রোটিন বিশ্লেষণকারী এনজাইমও বেশী পরিমাণে থাকে, যেটা ব্যাঙাচির ক্ষেত্রে তত বেশী থাকে না। ব্যাঙাচির পরিপাকনালীকে পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদন্ত্রে ভাগ করা যায় না; কিন্তু রূপান্তরের ফলে ব্যাঙের পরিপাকনালী যখন পূর্ণাঙ্গ আকার ধারণ করে, তখন পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদন্ত্র সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। রূপান্তরের সময় যকৃতের পরিবর্তন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর গঠনের পরিবর্তন তো হয়ই, তাছাড়া এর প্রাণরাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে ব্যাঙের ডাঙায় বাস করা সম্ভব হয়ে উঠে। ব্যাঙাচি প্রধানত নাইট্রোজেনঘটিত রেচন পদার্থ অ্যামোনিয়া হিসাবে জলে সরাসরি ত্যাগ করে, যার ফলে অ্যামোনিয়ার বিষক্রিয়া ব্যাঙাচির মধ্যে দেখা যায় না। কিন্তু ডাঙার প্রাণী জলের ন্যায় সুবিধা পায় না। সুতরাং তাকে অ্যামোনিয়ার বিষক্রিয়া থেকে বাঁচতে হবে। যকৃত এই বিষক্রিয়া দূর করার কার্য গ্রহণ করে। ব্যাঙের যকৃতে অ্যামোনিয়া থেকে ইউরিয়া তৈরি হয়, এটি শরীরের পক্ষে অপেক্ষাকৃত কম বিষাক্ত। এই ইউরিয়া মূত্রের সঙ্গে দেহ থেকে বেরিয়ে যায়। যকৃতে ইউরিয়া সংশ্লেষণের জন্য ইউরিয়া চক্রের সব এনজাইমগুলিকে নতুন করে তৈরি করতে হবে। রূপান্তরের সময় যকৃত থাইরয়েড হর্মোনের সাহায্যে সে কাজ সুসম্পন্ন করে।

বায়ুজীবী স্থলজ প্রাণীর ও জলজ প্রাণীর লোহিত কণিকা, হিমোগ্লোবিন এবং রক্তরসের (plasma) প্রোটিনের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। ব্যাঙাচির লোহিত কণিকা অপেক্ষাকৃত বড়, কিন্তু ব্যাঙের লোহিত কণিকা ছোট এবং প্রতি কিউবিক মিলিলিটার রক্তে এদের সংখ্যাও ব্যাঙাচির চেয়ে বেশী। ব্যাঙ অপেক্ষা ব্যাঙাচির রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কম। এই কম শুধু যে প্রতি 100 মিলিলিটার রক্তেই নয়, প্রতি লোহিত কণিকার মধ্যেও হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কম থাকে। ব্যাঙাচির রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে হিমোগ্লোবিনের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম এবং গঠনের পরিবর্তন হয়। জলে অক্সিজেন সরবরাহ সীমিত, সেই কারণে ব্যাঙাচির হিমোগ্লোবিনের অক্সিজেন ধরে রাখার ক্ষমতা বেশী। বায়ুজীবী ব্যাঙ সহজেই বাতাস থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করতে পারে এবং হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে যে অক্সিজেন যুক্ত হয় সেটা সহজেই মুক্ত হয়ে কোষের মধ্যে প্রবেশ করে। এছাড়া ব্যাঙাচির রক্তে অ্যালবিউমিন (albumin) নামে প্রোটিন প্রায় থাকে না, কিন্তু ব্যাঙের রক্তে প্রচুর পরিমাণে অ্যালবিউমিন থাকে। রক্তের আস্রবণ চাপ (osmotic pressure) বজায় রাখাতে এই প্রোটিন সাহায্য করে। জল ও স্থল পরিবেশের এই পার্থক্যের জন্যই ব্যাঙাচি ও ব্যাঙের রক্তের এই সব পার্থক্য থাকে। জলে ব্যাঙাচিকে সাঁতার দিতে হয়, ব্যাঙ ডাঙায় লাফিয়ে লাফিয়ে চলে। দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নাড়াচাড়ার জন্য স্নায়ুতন্ত্র দায়ী। সুতরাং, ব্যাঙাচির রূপান্তরের সময় স্নায়ুতন্ত্রের গঠনে এবং কার্যেও বহু রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী। আরও জানা গেছে, চোখের গঠনের পরিবর্তন হয়, রেটিনার মধ্যে যে পিগমেন্ট বা রঞ্জক পদার্থ আছে সেটারও পরিবর্তন ঘটে, যেমন ব্যাঙাচির চোখে পরফাইরপসিন (porphyropsin) থাকে, কিন্তু রূপান্তরের সময় এই পরফাইরপসিন পরিবর্তিত হয়ে রডপসিন (rhodopsin) হয়।

ব্যাঙাচির রূপান্তরের সময় উপরিউক্ত পরিবর্তনগুলি ছাড়া আরও বহু প্রকার পরিবর্তন ঘটে। সবগুলি পরিবর্তনই থাইরয়েড হর্মোনের প্রভাবে হয়, এই হর্মোন ছাড়া ব্যাঙাচির

রূপান্তর একেবারেই বন্ধ হয়ে যাবে। ছোট ব্যাঙ ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। দেহের অন্যান্য যন্ত্রের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যৌনাঙ্গেরও বৃদ্ধি হয়। খাদ্যের উপরই দেহের সর্বাঙ্গীন বৃদ্ধি নির্ভর করে। একজোড়া শুক্রাশয়, একজোড়া রেচন-জনন-নালী বা উলফিয়ান নালী, অবসারণী এবং অবসারণী ছিদ্র বা রেচন-জনন-ছিদ্র নিয়ে পুরুষ ব্যাঙের জননতন্ত্র গঠিত। দুটি ডিম্বাশয়, দুটি ডিম্বনালী, অবসারণী এবং অবসারণী-ছিদ্র স্ত্রী-ব্যাঙের জননতন্ত্রের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। পুরুষ ব্যাঙের মূত্র ও শুক্রাণু একই নালীর মধ্য দিয়ে বাহিত হয়। এই জন্য একে রেচন-জনন-নালী বলে। স্ত্রী-ব্যাঙের ডিম্বাশয় জনন ঋতুতে খুব বড় হয় এবং দেহগহ্বর প্রায় পূর্ণ করে ফেলে। ডিম্বাশয় থেকে পরিণত ডিম্বাণু দেহগহ্বরের মধ্যে আসে, সেখান থেকে ডিম্বনালীর মধ্যে প্রবেশ করে এবং পরে জরায়ুতে আসে। ডিম্বাণুগুলি স্ত্রী-জনন ছিদ্র দিয়ে অবসারণী বা ক্লোয়েকায় আসে এবং সেখান থেকে অবসারণী ছিদ্র দিয়ে দেহের বাইরে যায়। পুরুষ ও স্ত্রী-ব্যাঙের আলিঙ্গনের সময়ই স্ত্রী-ব্যাঙ ডিম পাড়ে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যৌনাঙ্গের বৃদ্ধির জন্য পিটুইটারি থেকে নিঃসৃত যৌনাঙ্গ উদ্দীপক হর্মোন বা গোনাডোট্রপিক হর্মোন অপরিহার্য। এই হর্মোন ছাড়া পুরুষ ও স্ত্রী-ব্যাঙের যৌনাঙ্গের মধ্যে যথাক্রমে শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর বৃদ্ধি ও পূর্ণতা-প্রাপ্তি হবে না। যৌনাঙ্গ উদ্দীপক হর্মোন দুই প্রকার, যেমন—ফলিকল্ স্টিমুলেটিং হর্মোন (follicle stimulating hormone or FSH) ও ইন্টারস্টিসিয়াল কোষ উদ্দীপক হর্মোন (interstitical cell stimulating hormone or ICSH) যেটা স্ত্রী-প্রাণীদের মধ্যে লিউটিনাইজিং হর্মোন (luteinizing hormone or LH)-এর সঙ্গে সদৃশ। পুরুষ প্রাণীদের মধ্যে এফ. এস. এইচ. (FSH) শুক্রাণু উৎপাদনে এবং স্ত্রী-প্রাণীর মধ্যে এই যৌনাঙ্গ উদ্দীপক হর্মোন ডিম্বাণু উৎপাদনে সাহায্য করে। দ্বিতীয় হর্মোনটি অর্থাৎ আই. সি. এস. এইচ. (ICSH) পুরুষ প্রাণীর শুক্রাশয়ে পুং-যৌন হর্মোন (টেস্টোস্টেরন) তৈরি করতে সাহায্য করে। পিটুইটারির গোনাডোট্রপিক অভাবে হর্মোনের শুক্রাশয়ে এই দুটি কার্য অর্থাৎ শুক্রাণু উৎপাদন ও পুং যৌন হর্মোন তৈরি সম্পন্ন হবে না। স্ত্রী-প্রাণীদের মধ্যে এল. এইচ. (LH) স্ত্রী-যৌন হর্মোনের, যেমন—ইস্ট্রোজেন ও প্রজেস্টেরনের, ক্ষরণ ঘটায়।

পুং-যৌন হর্মোন বা টেস্টোস্টেরন জননেন্দ্রিয়ের নালীপথের পরিস্ফুরণ এবং আনুষঙ্গিক যৌনাঙ্গের পরিস্ফূরণ ও পরিপোষণ এবং গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যে বিকাশ উদ্দীপিত করে। এর প্রভাব শুধু যৌনযন্ত্রের মধ্যেই সীমিত নয়, দেহের মধ্যে বহু বিস্তৃত। স্ত্রী-যৌন হর্মোন বা ইস্ট্রোজেন আনুষঙ্গিক যৌন যন্ত্রের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে। এছাড়া যে সব প্রাণী ডিম পাড়ে তাদের ডিমের কুসুম প্রোটিন বা ভাইটেলোজেনিন (yolk proteins precursor or vitellogenin) ইস্ট্রোজেনের প্রভাবেই যকৃতের মধ্যে সংশ্লেষিত হয়। যকৃত থেকে এই কুসুম প্রোটিন ক্ষরিত হয়ে ডিম্বাশয়ে যায়, সেখানে এর কিছু রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে এবং ডিম্বাণুর বৃদ্ধি ও পূর্ণতাপ্রাপ্তি ঘটায়। ইস্ট্রোজেনের অভাব হলে ডিমের কুসুম প্রোটিন যকৃতে তৈরি হবে না, ফলে ডিমের পূর্ণতাপ্রাপ্তিও ঘটবে না। যাই হোক্, এইসব যৌন উদ্দীপক হর্মোন এবং যৌন হর্মোনের যৌথ প্রভাবে পুরুষ ও স্ত্রী-ব্যাঙের যৌনাঙ্গের বৃদ্ধি ও পূর্ণতাপ্রাপ্তির ফলে এক বিশেষ ঋতুতে এদের জনন প্রক্রিয়া আরম্ভ হয় এবং হাজার হাজর নতুন সন্তান-সন্ততির জন্ম হয়। জনন ঋতুতে এইসব হর্মোনের ক্ষরণও বেড়ে যায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, জনন হচ্ছে বৃদ্ধির ও পূর্ণতাপ্রাপ্তিরই এক প্রত্যক্ষ ফল। প্রাণীদের মধ্যে যার যে ভাবেই জনন প্রক্রিয়া সাধিত হোক্ না কেন, এটা নিশ্চিত যে পিতামাতার দেহের বৃদ্ধি ও পূর্ণতাপ্রাপ্তির ফলেই জনন প্রক্রিয়া সম্ভব হয়, এবং নতুন প্রজন্মের সৃষ্টি হয় আর জীবনযুদ্ধে পরিবেশে প্রতিদ্বন্দ্বিতার শক্তি গড়ে ওঠে। প্রাণের আদিম উৎপত্তি জলে। কয়েক শত কোটি বছর সেই গভীর জলতলে ভীতসন্ত্রস্ত জীবন কাটিয়ে জল ছেড়ে স্থলে প্রাণের সঞ্চরণে প্রাণীদেহে যে সব শারীর-স্থানিক ও শারীরবৃত্তীয় কর্মধারার ধারাবাহিক পরিবর্তন ও বিবর্তন ঘটেছে উভচর প্রাণী ব্যাঙের জীবনচক্রে তার ক্রমিক নিদর্শন আজও পরিস্ফুট। তবে আদিম সেই বিবর্তন সমূহ ঘটতে সময় লেগেছে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বছর, প্রকৃতির সঙ্গে জীবনের অবিরাম অভিযোজন যুদ্ধ। সেই সংগ্রামে জয়ী নির্বাচিত গোষ্ঠীই নতুন প্রজাতি হিসাবে টিকে আছে এবং এখন একটি জীবনকালেই সেই লক্ষ কোটি বছরের বিবর্তন ধারার ক্রমিক প্রতিফলন সংক্ষিপ্ত আকারে প্রতিভাত হচ্ছে বংশধারাবাহী অভিজ্ঞ জনি (জিন) সমূহের কর্মকুশলতার মাধ্যমে। ব্যাঙের স্বল্পস্থায়ী জীবনে জলে ও স্থলে উভয় পরিবেশেই তার সেই অভিযোজন কৌশল যথানিয়মে দেখিয়ে চলেছে। তাদের বংশরক্ষার বাহ্য পরিস্থিতিতেও তা পরিস্ফুট।

হ্যালির ধূমকেতু

রামকৃষ্ণ মৈত্র*

ধূমকেতুর ইংরাজী প্রতিশব্দ এসেছে কমেট (Comet) তথা ল্যাটিন শব্দ Comete থেকে যার অর্থ হলো 'লম্বা চুলগুচ্ছ'। 1543 খৃস্টাব্দে জ্যোতিষ্কের আবর্তন নামক পুস্তকে সর্বপ্রথম ডেনমার্কের কোপার্নিকাস আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের একটি রূপরেখা প্রদান করেন। এই পুস্তকে তিনি উল্লেখ করেন যে সৌর জগতের কেন্দ্র হল সূর্য এবং এর চারপাশে গ্রহসমূহ অবিরত আবর্তন করছে। পরে উপগ্রহ ধূমকেতু, উল্কা ইত্যাদি অনেক কিছুই সৌরজগতের অন্তর্ভুক্ত

এডমণ্ড হ্যালি

হয়েছে। সাধারণত খালি চোখে খুব উজ্জল ধূমকেতুগুলিই দেখা যায়। এইগুলি থেকে ধূমকেতুগুলির বৈশিষ্ট্য বিজ্ঞানীরা ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। 1786 খৃস্টাব্দে Piere Mechain একটি ধূমকেতু আবিষ্কার করেন। এই ঘটনার 30 বৎসর পরে আমেরিকান পদার্থবিদ Johang Franz Encke অঙ্কের মাধ্যমে দেখান এই ধূমকেতুর চলন নিউটনের অভিকর্ষ সূত্রানুসারে পরিচালিত হয় না। এই ধূমকেতুটি তাঁর নামানুসারে দেওয়া হয়েছিল Encke ধূমকেতু। ধূমকেতুকে টেলিস্কোপে দেখলে মনে হয় যেন ঝাপসা বেশ কিছু অস্পষ্ট বিন্দুগুচ্ছ। এটিই হল ধূমকেতুর মাথা যেটিকে জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভাষায় কথা হয় Coma. আমেরিকান দু-জন সুপরিচিত পদার্থ-জ্যোতির্বিজ্ঞানবিদ Fred L. Whipple ও Zdenek Sekanine ধূমকেতু Encke এর Coma-এর ঘূর্ণনকে একটি তারার ঘূর্ণনের সঙ্গে তুলনা করে, তার নামকরণ করেছেন নিউক্লিয়াস। বর্তমানে অনেক ধূমকেতুতেই এই নিউক্লিয়াসের ঘূর্ণনকে পর্যবেক্ষণ করা যাচ্ছে। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে ধারণা করা হয় যে এর মাথা বৃহৎ জড়পিণ্ড এবং লক্ষ লক্ষ মাইল দীর্ঘ লেজ বায়বীয় পদার্থ পূর্ণ। এগুলি আকাশে হঠাৎ দেখা যায় আবার অদৃশ্য হয়ে যায়। জ্যোতির্বিজ্ঞানী Fred L. Whipple ই প্রথম ধূমকেতুর একটি বাস্তবভিত্তিক রূপরেখা প্রদান করেন। তিনি ধূমকেতুকে একটি প্রকাণ্ড নোংরা বরফযুক্ত চাঁই বলে অভিহিত করেছেন। যেগুলিতে বরফ ও তৎসহ বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ ও ধূলিকণা আছে। এই বরফযুক্ত চাঁই যখন সূর্যের নিকটবর্তী হয়, তখন সৌর তাপে বরফ সরাসরি গ্যাসীয় পদার্থে পরিণত হয়ে মাথাটি থেকে লেজের সৃষ্টি হয়। এই আয়নিত অবস্থার উপর সূর্যের করণ; বিকিরণ করে এটাকে একটি উজ্জল বস্তুতে পরিণত করে। লেজটি পূর্ণাঙ্গ ও অত্যন্ত উজ্জল অবস্থায় আসে যখন ধূমকেতু কক্ষপথে সবচাইতে সূর্যের নিকটবর্তী হয়। ঠিক যে অবস্থায় এটি সূর্যের নিকটবর্তী স্থান থেকে বেঁকে পথ পরিক্রমণ করে তখন বলা হয় অনুসূর (perihelion)। যতই এটি perihelion থেকে দূরে সরে যাবে ততই এর লেজটি ছোট হতে থাকবে। সাধারণতঃ ধূমকেতু সৌরজগতের যে কোন বস্তুর চাইতে আয়তনে অনেক বড়। আর এর ঘনত্ব হিসার করে দেখা গেছে মোটামুটি পৃথিবীর ঘনত্বের একের দশহাজার মিলিয়নাংশ। তবে মনে করা হয় যে ধূমকেতুগুলি সৌরজগতে বাইরে থেকে এসেছে। গঠনপ্রণালী প্রায় সব ধূমকেতুর একই রকম। কতকগুলি ধূমকেতু উপবৃত্তাকার পথে, সূর্যকে একটি নির্দিষ্ট সময় পরে পরে অতিক্রম করে। এদের পর্যাবৃত্ত ধূমকেতু বলে। উদাহরণস্বরূপ Encke-এর ধূমকেতুর পর্যাবৃত্ত সময় হল 3·3 বৎসর, Kohautak-এর 7,5000 বৎসর, হ্যালির 76 বৎসর, ইত্যাদি। আর কতকগুলি ধূমকেতু চলে অধিবৃত্তাকার বা পরাবৃত্তাকার পথে। এগুলি স্বভাবতই সৌরজগতে আর ফিরে আসে না। একারণেই এগুলিকে বলা হয় অপর্যাবৃত্ত ধূমকেতু।

* 1048/1, অশোকনগর, পোঃ অশোকনগর, 24 পরগণা

যেহেতু Eneke ধূমকেতুটির পর্যায়কাল 3·3 বৎসর, সেইজন্য পর্যবেক্ষণ করা বিজ্ঞানীদের পক্ষে সুবিধাজনক। তবে হ্যালির ধূমকেতুটি আয়তনে বড় এবং খালি চোখে দেখা যায়। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে খৃস্টের জন্মের 240 বৎসর পূর্বে নাকি এটি দেখা গিয়েছিল।

হ্যালির ধূমকেতুটি নামকরণ করা হয়েছে, আবিষ্কারক Edmond Hally-র নামানুসারে। এডমণ্ড হ্যালি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যামিতির অধ্যাপক ছিলেন। তিনি ছিলেন নিউটনের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তিনি অনেকগুলি ধূমকেতুর কক্ষপথ নির্ণয় করেছেন। তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে উজ্জ্বল ধূমকেতুর 1531, 1607, 1683 অর্থাৎ প্রায় 75/76 বৎসর অন্তর অন্তর প্রায় একই কক্ষে অবস্থান করবে। তাঁর মৃত্যুর 16 বৎসর পরে অর্থাৎ 1759 খৃস্টাব্দে এটি আবার দেখা যায়। 1986 খৃস্টাব্দের এপ্রিল মাসে। 40 মিলিয়ন মাইল দূরে খালি চোখে দেখা যাবে হ্যালির ধূমকেতু তথাপিও মাউন্ট প্যালোমার পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র থেকে এটিকে 1982 খৃস্টাব্দের আবছাভাবে দেখা গেছে। হ্যালির ধূমকেতুটি সর্বশেষ খালি চোখে দেখা গিয়েছিল 1910 খৃস্টাব্দে। তামিলনাড়ুর কাভালুর পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র থেকে। কে. কে. স্কারিয়া ও এম. ডি. রোজারিও Indian Institute of Astrophysics কেন্দ্রে রাতের পর রাত কম্পিউটার, ব্যাটারী টেলিস্কোপ ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম নিয়ে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর গত 27শে অগাস্ট এটিকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। এটিকে পর্যবেক্ষণ করবার জন্য কয়েকটি উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতিসহ পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র বিশেষ দৃষ্টি রাখছে। এগুলির মধ্যে নৈনিতাল, কাভালুর, রাঙ্গাপুর ইত্যাদি কেন্দ্র উল্লেখযোগ্য। পশ্চিমবঙ্গেও বেশ কয়েকটি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে।

এ পর্যন্ত 27টি সূর্যের নিকটবর্তী কক্ষপথের সংলগ্ন বিন্দু আবিষ্কৃত হয়েছে। এ ছাড়াও পর্যাবৃত্ত সময় কিছু কমছে বলে মনে করা হচ্ছে। কারণস্বরূপ বলা যায় যে পূর্বে উল্লেখিত নিউক্লিয়াসে অবিরাম ঘূর্ণনের ফলে বিপরীত দিকে অবিরত জেট ফোর্স (zet force) বের হচ্ছে। সূর্যের তাপে যে হারে বরফ গলে ঠিক বিপরীত দিকে সেই হারে নিউটনের তৃতীয় সূত্রানুযায়ী ধূলিকণা বা বরফের কোন বস্তুর বহির্গত যে ধরণের বলে রূপান্তরিত হয় তাকে বলা হয় জেট ফোর্স। অবশ্য দুই একটি ধূমকেতুর ক্ষেত্রে কিন্তু পর্যায়বৃত্ত সময় কম-বেশী দেখা গেছে। Fred L. Whipple ও Zdenek Sekania মন্তব্য করেছেন এই অসামঞ্জস্য অর্থাৎ পর্যায়বৃত্তের কম বা বেশী সময়ের জন্য দায়ী হ'ল এই জেট ফোর্সের কার্যকলাপ। ধূমকেতুর নিউক্লিয়াসটি একটি মধ্য অক্ষরেখাকে কেন্দ্র করে লাট্টুর মতন ঘুরতে ঘুরতে এগিয়ে যায়। কিন্তু যে সময়ে এর ঘূর্ণনের বেগের বিপরীতমুখী হয় তখনই ধূমকেতুর গতি হ্রাস পায়। সেইজন্য কক্ষীয় পথও ছোট হয়ে আসে। তখন ধূমকেতুর কক্ষপথের যে বিন্দু সূর্যের নিকটতম হয় সেটির সময়ও এগিয়ে আসে। কাজেই দেখা যাচ্ছে উপস্থিতির সময়টির ব্যতিক্রম নিউক্লিয়াসটির ঘূর্ণনের সঙ্গে অঙ্কের হিসাবে যুক্ত। এইভাবে এটি সূর্যকে প্রত্যেকবার প্রদক্ষিণ করবার সময়ও এর ওজন ক্রমশ হারাচ্ছে। তার জন্য এর ঘূর্ণনও কমছে। এক্ষণে কিন্তু একটি বিষয় দেখা যেতে পারে যে একটি ধূমকেতু থেকে দূরে কোন প্রক্রিয়া আবার জমে নূতন বরফের চাঁই তৈরি হচ্ছে কিনা। এর পর্যবেক্ষণ করতে হলে মহাশূন্য রকেট পরীক্ষাই একমাত্র বাস্তবসম্মত পদ্ধতি। পৃথিবীর অনেক দেশই এই প্রকার রকেট পরীক্ষা চালাচ্ছে। জাপানের MS—T5 রকেটটি এই বৎসরের 7ই জানুয়ারী নিক্ষেপ করা হয়েছে হ্যালির ধূমকেতুটিকে পরীক্ষা করবার জন্য। হ্যালির নিকটবর্তী সম্ভাব্যন্তরে পৌঁছাবে সম্ভবত 11ই মার্চ 1986 খৃস্টাব্দে। অপর আর একটি উপগ্রহ 8ই মার্চ নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে হ্যালির গতিবিধি ও আচরণ পর্যবেক্ষণ করবে। ইউরোপিয়ান স্পেশ এজেন্সি হ্যালির ধূমকেতুর নিউক্লিয়াস থেকে 500 কিলোমিটার দূরবর্তী স্থানে থেকে একটি মহাশূন্যযানের মাধ্যমে পরিসংখ্যান সংগ্রহ করবে। আর একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান হলো Soviet Project Vega-র দুটি মহাশূন্যযান যেটি 15ই ও 21শে ডিসেম্বর উৎক্ষিপ্ত হয়ে 175 দিন মহাশূন্য ছিল, উভয়েই শুক্রগ্রহের ছায়াপথ অতিক্রম করছে এই বৎসরের জুন মাসে। মনে করা হচ্ছে যে এটি মার্চের মধ্যে হ্যালির ধূমকেতুটিকে পর্যবেক্ষণ করতে সমর্থ হবে। এই মহাশূন্য-যানটিতে থাকবে France, Hungary ও রাশিয়ার নির্মিত বৈজ্ঞানিক সরমঞ্জাম। সোভিয়েট গবেষক V. Darydov মন্তব্য করেছেন যে শনিগ্রহের চতুর্দিকে যে বলয় আছে, এর সঙ্গে ধূমকেতুর বরফ বিশাল টুকরার বাইরে ধূমকেতু সদৃশ বাষ্পের ঘটনাটি যুক্ত থাকতে পারে। এছাড়াও বাইরের বলয়টি যে মূলগ্রহের থেকে বহির্ভূত বাষ্প, ধূমা, ধূলিকণা বা কোন ক্ষতি কারক পদার্থ নিয়ে গঠিত হয়েছে, সেই ব্যাপারটি যে ধূমকেতুর ব্যাপারেও ঘটতে পারে তার আর অসম্ভব কি? সেইজন্য Darydov এর প্রকল্প শনিগ্রহের বাইরের বলয়কে বিভিন্ন আলোকগুচ্ছের বিচ্ছুনী তৈরি, সেই রহস্যর উন্মোচনও এইবার হ্যালির ধূমকেতুর পর্যবেক্ষণে আবিষ্কৃত Ariani-2 পৃথিবীর উপগ্রহের কক্ষপথে প্রেরণ করা হয়েছে, তারপর এটি নির্দিষ্ট শক্তিদ্বারা চালিত হয়ে হ্যালির কক্ষপথের অনুসরণ করবে এবং বেশ কয়েক হাজার কিলোমিটার দূর থেকে লেজ পর্যবেক্ষণ

করবে। এই সময় এটি নিউক্লিয়াসের ফটো তুলবে এবং অপরপক্ষে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নিউক্লিয়াস থেকে বহির্গত ধূলিকণা আহিতকণা, পরমাণু, অণুদ্বারা গঠিত লেজটির গঠনের রহস্যকেও উন্মোচিত করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এছাড়াও NASA মানুষ বাহিত মহাশূন্যযান থেকে আলট্রাভায়োলেট ক্যামেরা দিয়ে পৃথিবীর কক্ষপথ থেকে তিনটি পরীক্ষা করার কর্মসূচি নিয়েছে। প্রতিটি কর্মসূচি এক সপ্তাহকালীন করে চলবে। প্রথম পরীক্ষা চলবে 1985-এর শেষদিকে যখন ধূমকেতুটি পৃথিবী থেকে 80 মিলিয়ন কিলোমিটার দূরে থাকবে। দ্বিতীয়টি চলবে 1986 খৃস্টাব্দের মার্চে যে অবস্থায় ধূমকেতুটিকে পরীক্ষার যন্ত্রপাতির সব চাইতে কাছে পাওয়া যাবে। আর শেষ পরীক্ষাটি চলবে 1986 খৃস্টাব্দের গ্রীষ্মকালে যে অবস্থায় ধূমকেতুর লেজটি যন্ত্রপাতির নিকটবর্তী হবে। রাশিয়ার Venera নামক মহাশূন্যযানটি শুক্রগ্রহের কক্ষপথে প্রায় 6 মাস থেকে, এটি বৃহস্পতি গ্রহের কক্ষপথের দিকে এগিয়ে যাবে। এরপর প্রায় 9 মাস পরে 1000 কিলোমিটার দূর থেকে 1986 এর মে মাসে এটি ধূমকেতুর নিউক্লিয়াসকে পর্যবেক্ষণ করবে। আশা করা যাচ্ছে যে মানুষ নির্মিত ও প্রাকৃতিক ধূমকেতুর মধ্যে এক সেকেণ্ডের জন্য আপেক্ষিক বেগ হিসাবে দূরত্ব হবে 70 কিলোমিটার / সেইরূপ ক্ষেত্রে কি কোন সংঘর্ষ ঘটতে পারে না? সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা শুধু নিউক্লিয়াসের ছাপই পাঠালেন না, তাঁরা ইনফ্রারেড ও আলট্রাভায়োলেট তরঙ্গ রশ্মি দিয়ে এর বিভিন্ন জটিল বিষয়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবেন। সোভিয়েত পরীক্ষা নিরীক্ষার গবেষণার সুবিধার্থে টোকিও বিশ্ববিত্থালয়ের Space Research ও Aeronautics উক্ত বিষয়ের পরিসংখ্যান সরবরাহ করবে। টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফাণ্ডামেন্টাল রিসার্চ Ballon borne telescope থেকে 30 থেকে 40 km উর্ধ্বে অবলোহিত পর্যবেক্ষণ চালাবে। এছাড়াও কলকাতাতে Positional Astronomy Centre দুটি Protable Reflector Telescope কলকাতার 100 কিলোমিটার উর্ধ্বের থেকে হ্যালির ধূমকেতুর নিউক্লিয়াস ও পর্যবেক্ষণ করবে। এই পরীক্ষাটির সঙ্গে অবশ্য আন্তর্জাতিক ভাবে NASA-র সহযোগিতা আছে।

1910 খৃস্টাব্দে Kodaikonal পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র থেকে আমরা জানতে পারি যে এর লেজ হল 25 মিলিয়ন কিলোমিটার লম্বা কিন্তু মাথা বা নিউক্লিয়াসের ব্যাসার্ধ মাত্র 15 কিলো-মিটার। এই ধূমকেতুর ওজন 19 মিলিয়ন টন। আর সূর্যের নিকটবর্তী স্থানটি হবে 9ই ফেব্রুয়ারী। কাজেই বোঝা যাচ্ছে যে সমগ্র আয়তনের তুলনায় এর নিউক্লিয়াস অত্যন্ত ছোট। তবুও মহাশূন্যযান থেকে অতি শক্তিশালী টেলিস্কোপ দিয়ে বিজ্ঞানীরা এর ধূলিকণা, বিভিন্ন গ্যাসের সংমিশ্রণ বা অন্য কোন অদ্ভুত ধরনের রহস্য বের করবেনই বলে আশা করা যায়।

ইতিমধ্যে অবশ্য International Halley Watch নামে একটি বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এটির বিশেষ গবেষণাগারগুলি হলো ক্যালিফোর্নিয়ার জেট প্রোপালশন ল্যাবরেটরি ও অপরটি হল, পশ্চিম জার্মানীর আর্লানজেন-নুরেনবার্গ বিশ্ববিত্থালয়। এখানেও আকাশপথে ও মহাকাশ শূন্যযানে হ্যালির ধূমকেতুর কার্যকলাপ, গঠন প্রণালী, রাসায়নিক সংপ্রকৃতি, কোন ভৌত পরিবর্তন অথবা সৌরজগতের উপর কোন প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করা হবে। এই পরীক্ষা পরবর্তী শতাব্দীতে পুনরায় হ্যালির আগমন বা আর্বিভাব পর্যন্ত চালিয়ে যাওয়া হবে। এই প্রথম অত্যন্ত জাঁকজমকের সঙ্গে হ্যালি ধূমকেতুর পর্যবেক্ষণ চালানো হচ্ছে এবং এর দ্বারা হয়তো বিজ্ঞানীরা অন্য গ্রহের ব্যাপারেও তথ্য সংগ্রহ করতে কৃতকার্য হবে।

জীববিদ্যাবিষয়ক রসায়নবিদ C. Ponnemperuma মন্তব্য করেছেন হয়তো ধূমকেতু থেকে কোন বিষাক্ত সৌরজগত বহির্ভূত গ্যাসের রশ্মি পৃথিবীতে আসছে যার ফলে পৃথিবীর আবহাওয়া দূষিত হচ্ছে। এই উদ্দেশ্যে তিনি Maryland বিশ্ববিত্থালয়ে আসন্ন হ্যালি ধূমকেতু বিষয়ে গবেষণার জন্য একটি সভা আহ্বান করেছেন। শুধু তাই নয়, বিজ্ঞানীরা মনে করেছেন যে এই জলমিশ্রিত হিমশৈলীতে আছে মিথেন, হাইড্রোজেন, কার্বানাইড অ্যাসেটিক অ্যাসিড ইত্যাদি। সোভিয়েট রাশিয়ার লেনিন-গ্রাড ফিজিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট এইং ইউ. এস আর. অ্যাকাডেমি প্রভৃতিতে বিভিন্ন ধূমকেতুর মডেলের উপরে পরীক্ষা চালানো হচ্ছে। বিশেষ একটি গ্যাস কক্ষের মধ্যে রেফ্রিজারেটর সিস্টেমে বরফ তৈরি করে তাতে বিভিন্ন বর্ণের ও তাপের আলো প্রতিফলিত করে কৃত্রিমভাবে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হচ্ছে। এই সমস্ত পরীক্ষায় বিশেষ করে মঙ্গল গ্রহের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের সামঞ্জস্য ধারণা করা যাচ্ছে। এই পরীক্ষায় বিজ্ঞানীরা প্রথমেই জোর দিয়েছেন যে ধূমকেতুতে মিথাইল সায়ানাইড আছে। অবশ্য কয়েকমাস পূর্বে Kohoutek ধূমকেতুর বর্ণালীতে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মিথাইল সায়ানাইড সনাক্ত করেছেন। ধূমকেতু থেকে বরফের সরাসরি বাষ্প আবার কিছু অংশ বরফে পরিণত হওয়ার সময় এইগুলির কতকগুলি সুন্দর কুণ্ডলাকৃতি হয়ে বরফ বাষ্পের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে চলতে থাকে। এই রাসায়নিক বন্ধনই যে জীবজগতের মৌলিক বিষয় DNA-এর সঙ্গে সংযুক্ত নয়, একথা কে বলতে পারে?

মানুষের তৈরী ধূমকেতুতে যে অ্যামিনো অ্যাসিডের সন্ধান পাওয়া গেছে তারও মূলে আছে প্রোটিন যা সমগ্র জীবজগতের জন্য অবশ্যই প্রয়োজন

1881 খৃস্টাব্দে ব্রিস্টল জ্যোতির্বিজ্ঞানী ডেনিং হঠাৎ একটি ধূমকেতু আবিষ্কার করেন যার লেজ ছিল না, এর কারণ এটি সূর্য থেকে অনেক দূরে ছিল। এটি পৃথিবী থেকে মাত্র 6 মিলিয়ন কিলোমিটার দূরে ছিল।

আর একটি মঙ্গলগ্রহ থেকে 9 মিলিয়ন কিলোমিটার দূর দিয়ে চলে যায়। এটি আবছা মেঘ বলয় দিয়ে ঘেরা, যার মধ্যবিন্দুতে তীব্র আলোকবিন্দু। এগুলি সবই চিত্তাকর্ষক। এছাড়া Arend-Rolend ধূমকেতুটির কৌণিক নাকযুক্ত আকৃতির কোন ব্যাখ্যা বিজ্ঞানীরা দিতে পারেন নাই অর্থাৎ আমরা এখনও ধূম কতুর বিশেষ করে লেজের গঠন সম্পর্কে অনেক তিমিরেই আছি। সেইজন্যই বিভিন্ন দেশ এবার বাস্তবভিত্তিক গবেষণার জন্য direct flow space engine এর দ্বারা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে। যে অবস্থাতে হয়তো লেজকে পর্যবেক্ষণ করা যাবে তখন নিউক্লিয়াসকে দেখা সম্ভব হবে না কারণ সেই অবস্থায় গ্যাসীয় পদার্থ চারিদিকে ঘিরে ধরবে। প্রকৃতপক্ষে সৌর বিকিরণ ও কসমিক রশ্মিগুলি নিউক্লিয়াসের অণুগুলিকে সরিয়ে দেয় এবং সেইগুলি সম্পূর্ণ একটি পদার্থে রূপান্তরিত হয়। কাজেই ধূমকেতুর মাথাটি হয়তো বাষ্পীভবন অথবা গৌণ সিনথিসিসের দ্বারাও ·ঠিত হতে পারে কিন্তু এর নিউক্লিয়াসেব চতুর্দিকে লক্ষ লক্ষ কিলোমিটার গ্যাসীয় ও ধূলিকণা ইত্যাদির স্তর ছড়িয়ে থাকার জন্য এর আসল রহস্য উদ্ঘাটন করা সত্যি অসুবিধাজনক। এর বাস্তব পরীক্ষার ব্যাপারে হ্যালির ধূমকেতুর চিত্তাকর্ষক দিকটি হল এটি সূর্যকে যে দিকে প্রদক্ষিণ করছে, পৃথিবী ঠিক এর অপর দিকে ঘুরছে কাজেই কিছুক্ষণের জন্য নিউক্লিয়াসটি পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হবে। এছাড়াও হ্যালির ধূমকেতু বা অপরাপর ধূমকেতুর কক্ষপথের বাঁক (নতি) যখন পৃথিবীর কক্ষপথের বাঁকের সঙ্গে মিলবে বা অতিক্রম করবে, সেই পর্যায়েই এর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে।

বিজ্ঞানীরা তো ইতিমধ্যে বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে শক্তিশালী দূরবীক্ষণ কম্পিউটারের ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি দিয়ে পর্যবেক্ষণ করছেন। কিন্তু সাধারণ লোক খালিচোখে একে দেখবার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে। তবে খালি চোখে একে ততটা চিত্তাকর্ষক মনে হবে না। এইজন্য বিভিন্ন উন্নত দেশে এই হ্যালির ধূমকেতুকে পর্যবেক্ষণ করবার জন্য বিশেষভাবে নির্মিত টেলিস্কোপ যার নাম 'Gadget Halleyscope' কিনবার হিড়িক পড়ে গেছে। ভারতেও Indian Space Research Organisation এর জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সাধারণের মধ্যে হ্যালির ধূমকেতু সম্বন্ধে নানা তথ্য পরিবেশন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। প্রচারে যে বস্তুগুলি থাকবে সেগুলি হলো হ্যালি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের Launching, ধূমকেতু জিনিসটা কি, এর পর্যবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা, এর নিউক্লিয়াস স্বরূপ, এর 76 বৎসর পরে আগমনের ভিতর দিয়ে কি চিত্তাকর্ষক জিনিষগুলি ঘটছে, ধূমকেতু তৈরির জন্য কি কি সাংগঠনিক বস্তু আছে। এছাড়াও একে পর্যবেক্ষণ করবার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান, সর্বশেষে জনসাধারণ একে কিভাবে দেখতে পারে ইত্যাদি। এর চিত্তাকর্ষক দিকটি হল যে এটা সৌর জগতের একটি মেঘপুঞ্জ বিশেষ কিন্তু যাকে আমরা স্পর্শ করতে পারছি না। আমরা বিজ্ঞানীদের হ্যালির ধূমকেতুর উপর পর্যবেক্ষণলব্ধ ফলগুলি জানার প্রতীক্ষায় রইলাম।

সবচেয়ে কাছের তারা

আমাদের সবচেয়ে কাছের তারাটির (সূর্য ছাড়া, কেননা সূর্যও আসলে একটি তারা) নাম হল প্রক্সিমা সেণ্টরি। এটিকে উত্তর গোলার্ধ থেকে দেখা যায় না, দেখা যায় দক্ষিণ গোলার্ধ থেকে। এটি আমাদের কাছ থেকে প্রায় 4 200 কোটি কিলোমিটার দূরে রয়েছে। এই তারাটি থেকে আলো (যা সবচেয়ে দ্রুতগামী, চলে সেকেণ্ডে প্রায় 2 99,000 কিলোমিটার বেগে) পৃথিবীতে এসে পৌঁছায় 4·25 বছর পর। তাই বিজ্ঞানীরা বলেন সবচেয়ে কাছের তারাটির দূরত্ব হলে 4·25 আলোক-বর্ষ; অর্থাৎ 4·25 বছর আগে ঐ তারাটি যে কিরণ ছড়িয়েছিল মহাশূন্যের বুকে সেটিকেই আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি আকাশে। ইতিমধ্যে সে তারাটি হয়তো ধ্বংস হয়ে গেছে কিন্তু তবু আমরা সেটিকে দিব্যি দেখছি আকাশের বুকে। আর সত্যি যদি তারাটি আজ ধ্বংস হয়ে যায়, তবে সে খবর আমরা জানতে পারব 4·25 বছর পর।

উত্তর গোলার্ধ থেকে সবচেয়ে যে কাছের তারাটি দেখা যায়, তার নাম সিরিয়াস বা লুব্ধক, এথেকে আলো পৃথিবীতে এসে পৌঁছয় 8 বছর পর। অথচ আমাদের সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে লাগে মাত্র 8 মিনিট।

[আজকের বিজ্ঞান, ঢাকা, বাংলাদেশ]

বিজ্ঞপ্তি

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের 'সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞান সংগ্রহশালা ও হাতে-কলমে কেন্দ্রে" মডেল তৈরি প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। নূতন ক্লাশ শুরু হবে আগামী মার্চ '86 মাসে। আগ্রহী স্কুলের ছাত্র ছাত্রী এবং বিজ্ঞান ক্লাবের সভ্য-সভ্যাগণ এই প্রশিক্ষণ লাভের জন্য আগামী 28শে ফেব্রুয়ারী '86 মধ্যে পরিষদ কার্যালয়ে দরখাস্ত পাঠাতে পারেন।

ঠিকানা :—

পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট

কলিকাতা-700006

ফোন : 55-0660

কর্মসচিব

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

কিশোর বিজ্ঞানীর আসর
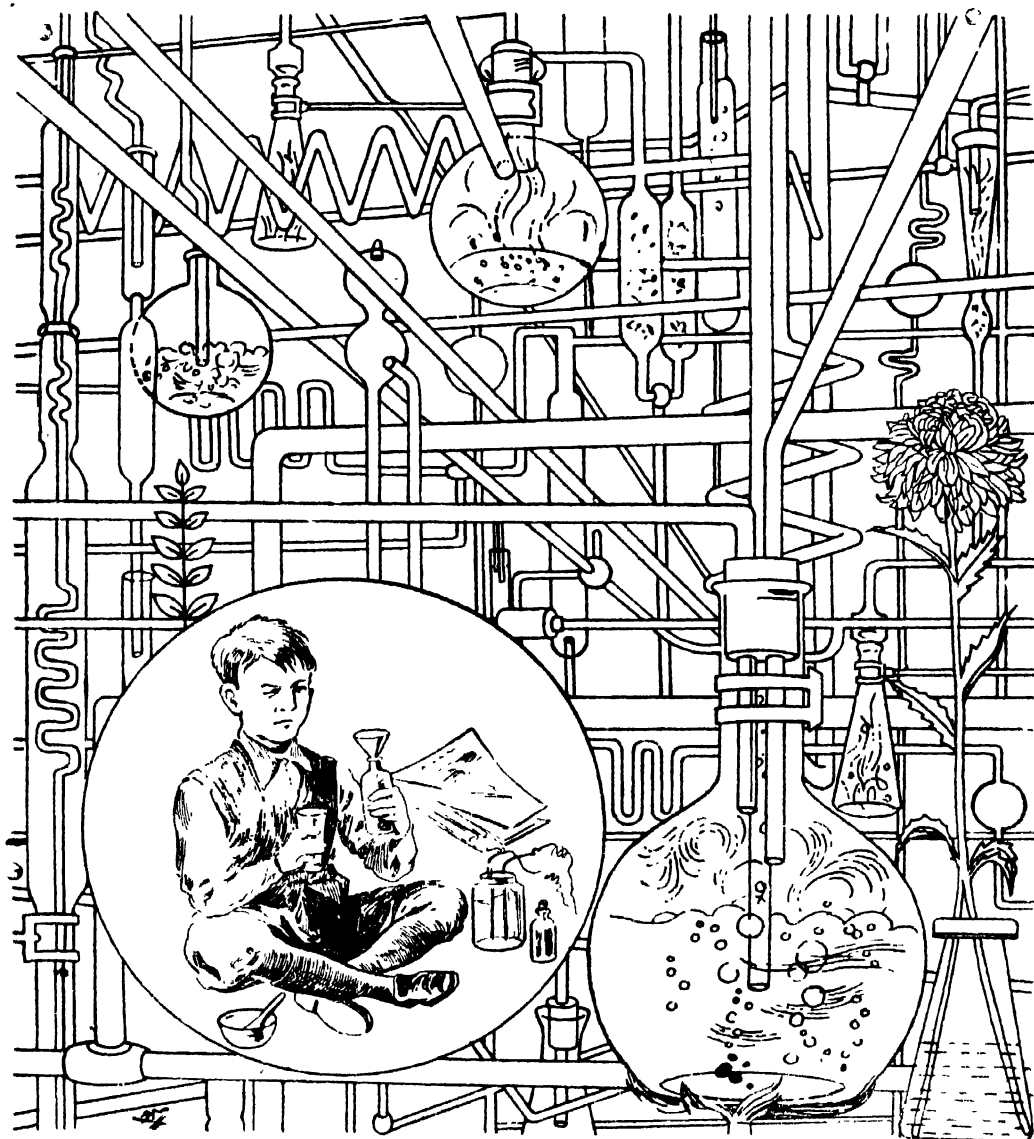
ডক্টর দেবেন্দ্রমোহন বসু : শতবর্ষ স্মরণে

কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়*

প্রাচীন যুগে ভারত জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি সর্ববিষয়ে প্রভূত উন্নতিসাধন করলেও পরবর্তীকালে বহিঃশক্তির আক্রমণেও জ্ঞানের প্রসার অনেক পরিমাণেই স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কয়েকজন ইংরেজ ও ভারতীয় মহান ব্যক্তির প্রচেষ্টায় এদেশে আধুনিক শিক্ষার প্রচলন হলে ভারত আবার সর্ববিষয়ে উন্নত হতে থাকে। বর্তমান যুগে আমাদের দেশে প্রতিভাধর বহু বিজ্ঞানীর আবির্ভাবে ভারত আজ বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যায় উন্নত দেশগুলির সমকক্ষ। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ডঃ দেবেন্দ্রমোহন বসু ভারতবর্ষে বহু সংখ্যক আন্তর্জাতিক মানের গবেষণার জন্মদাতা।

ডঃ দেবেন্দ্রমোহন বসু 1885 খৃস্টাব্দে 26শে নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মোহিনীমোহন বসু যুক্তরাষ্ট্র থেকে হোমিওপ্যাথিতে শিক্ষালাভ করে এসে দেশে ঐ বিষয়ে চিকিৎসা ও শিক্ষকতা করতেন। কিন্তু মোহিনীমোহন বসুর অকাল মৃত্যুতে দেবেন্দ্রমোহন শৈশবেই পিতার স্নেহ-মমতা থেকে বঞ্চিত হন। তবে তিনি ছিলেন খ্যাতনামা বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশচন্দ্রের ভাগিনেয় ও গণিতজ্ঞ আনন্দমোহন বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র। আনন্দ মোহন বসু ছিলেন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতশাস্ত্রের প্রথম ভারতীয় র‍্যাংলার। সুতরাং মাতা ও পিতার দিক থেকে তিনি ছিলেন দুই মহান জ্ঞানীর বংশধর। তিনি পড়াশুনা আরম্ভ করেন ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ে। 1902 খৃস্টাব্দে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় পাশ করেন। দেবেন্দ্রমোহন প্রথমে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হন। পরে ম্যালেরিয়ার আক্রমণে বহুদিন ভুগে শিবপুরে হোস্টেলে যাওয়া অসম্ভব বিবেচনা করে বি ই. কলেজ ছেড়ে দেন। ঐ বছরই আচার্য বসু জড় ও জীবনে সাড়ার সাদৃশ্য নিয়ে তাঁর আবিষ্কার প্যারিস ও লণ্ডনে প্রমাণ করে দেশে ফিরে আসেন। একদিন রবীন্দ্রনাথ আচার্য বসুকে অভিনন্দন জানাতে এসে তাঁর পড়ার ঘরে বসেছিলেন, সেই সময় কিশোর দেবেন্দ্রমোহনকে তাঁর কাছে নিয়ে এসে আশীর্বাদ করতে বলা হয়। এই ঘটনা দেবেন্দ্রমোহনের মনে রেখাপাত করেছিল। কবিগুরুর আশীর্বাদ নিয়ে তিনি বিশুদ্ধ বিজ্ঞানে পড়াশুনা আরম্ভ করেন, এবং 1906 খৃস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ইতিমধ্যে জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদের মধ্যে উত্তেজনায় সাড়া বিষয়ে গবেষণা করে পৃথিবীর বিজ্ঞানী মহলে আলোড়ন তুলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ দেবেন্দ্রমোহনকে বলেন, 'জগদীশের গবেষণায় সাহায্য করতে'। পরীক্ষায় সাফল্যের পর মামার অধীনে গবেষণা শুরু করেন। এক বছর পরই উন্নততর শিক্ষালাভের আশায় তিনি বিদেশে যান, এবং সেই বছরই কেম্ব্রিজের ক্রাইস্ট কলেজে ভর্তি হন। সেখানে তখন প্রধান ছিলেন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী স্যার জে. জে. টমসন। কেম্ব্রিজে ছাত্রাবস্থায় তাঁদের পদার্থবিদ্যার প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে ডিমনস্ট্রেটর ছিলেন। পরবর্তী কালের নোবেল বিজয়ী স্বনামখ্যাত CTR Wilson যিনি ক্লাউড 'চেম্বার নির্মাণ করে 'আহিত কণার' গতিপথকে চাক্ষুষ করার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। 1912 খৃস্টাব্দে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্সসহ পদার্থবিজ্ঞানে দেবেন্দ্রমোহন স্নাতক ডিগ্রি পান। এরপর দেশে ফিরে কলকাতায় সিটি কলেজে অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন। মাত্র এক বছর পরই আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁকে বিজ্ঞান কলেজের পদার্থবিজ্ঞানের স্যার রাসবিহারী ঘোষ অধ্যাপকের পদ গ্রহণের জন্য আহ্বান করেন। এই পদে যোগ দেওয়ার পর 1914 খৃস্টাব্দে বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য তিনি ঘোষ ট্রাভেলিং ফেলোশিপ পান। তিনি জার্মানীতে গিয়ে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক Ragener-এর ল্যাবরেটরিতে Advanced Research Student হিসাবে যোগ দেন। বার্লিনে থাকার সময় তিনি প্লাঙ্ক, আইনস্টাইন প্রমুখ বিজ্ঞানীদের সান্নিধ্যে এসেছিলেন। কিন্তু এই সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বেধে যাওয়ায় তাঁকে কিছুকাল জার্মানীতে অন্তরীণ থাকতে হয়। পূর্বের শিক্ষা থেকে এই সময়ে তিনি নতুন ধরণের ক্লাউড চেম্বারের নক্সা রচনা করেন। বুমস্টিডের আবিষ্কৃত ডেল্টা কণিকা নিয়ে গবেষণা করেন এবং ডারউইন-এর উদ্ভাবিত একটি তত্ত্বের সত্যতা প্রমাণ করেন। এই সময়ে দেবেন্দ্রমোহন গঠনমূলক গাণিতিক পদার্থবিদ্যা ও গবেষণামূলক পদার্থবিদ্যার বিষয়ে যে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন, তা তাঁর পরবর্তী কালের গবেষণাকে অনেক সহজ সরল করে দিয়েছিল। মহাযুদ্ধ শেষ হলে তবে দেবেন্দ্রমোহন থিসিস দেবার অনুমতি পান। 1919 খৃস্টাব্দে পি. এইচ ডি ডিগ্রি লাভ করে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়ন সমাপ্ত করে কলকাতায় ফিরে আসেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাউড চেম্বার তৈরি করে তেজস্ক্রিয় পদার্থ নিঃসৃত আহিত কণার গতিপথ পরীক্ষা বিষয়ে গবেষণার সূত্রপাত করেন। এস কে. ঘোষের সহযোগিতায় হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামপূর্ণ ক্লাউড চেম্বারে দ্রুতগতি আলফা কণিকার আঘাতে অণু ও পরমাণুর

* 1, মনোমোহন বসু স্ট্রীট, কলিকাতা-700 006

অবস্থা বিষয়ে গবেষণাকালে এমন কতকগুলি ট্র্যাক বা আহিত কণার গতিপথের সন্ধান পান যা পরবর্তী কালে আলফা কণার আঘাতে (স্বল্পমাত্রায় থাকা) নাইট্রোজেনের নিউক্লিয়াসমুক্ত প্রোটন কণার ট্র্যাক হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। সুতরাং দেবেন্দ্র মোহন প্রথম মানুষ যিনি ক্লাউড চেম্বারের সাহায্যে অপ্রকৃত (artificial) তেজস্ক্রিয়তার সন্ধান পান এবং নাইট্রোজেন পরমাণুর এক আলোকচিত্র গ্রহণ করেন এবং 1923 খৃস্টাব্দে 'নেচার' পত্রিকায় প্রকাশ করেন। লর্ড রাদারফোর্ড এর জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। 1927 খৃস্টাব্দে ইতালীর কমোতে ভোল্টার (Volta) মৃত্যুদিবসের শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন বসে, তাতেও তিনি অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার সঙ্গে ভারতীয় প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দেন।

1935 খৃস্টাব্দে দেবেন্দ্রমোহন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘোষ অধ্যাপক পদ থেকে সি. ভি. রামনের স্থলে পালিত অধ্যাপক পদে বৃত হন। এই সময় তিনি বিশেষ গবেষকদের সঙ্গে সমষ্টিগতভাবে গবেষণা পরিচালনার এক নতুন পদ্ধতি প্রচলন করেন। তিনি চৌম্বক রসায়নশাস্ত্রে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। ওয়েলো-বসুরীতি ও বসু-স্টোনার তত্ত্ব তাঁরই উদ্ভাবিত। রঞ্জনরশ্মি, বর্ণালীবীক্ষণ তত্ত্ব, চৌম্বক তত্ত্বে নতুন কোয়াণ্টম বলবিদ্যার প্রয়োগ বিষয়ে কাজ করেছিলেন।

1937 খৃস্টাব্দে আচার্য জগদীশচন্দ্রের মৃত্যু হয়। তিনি অনেক আশা নিয়ে বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা করে বহুবিধ গবেষণার প্রচলন করেছিলেন। তাঁর উত্তরসুরী সুযোগ্য দেবেন্দ্রমোহন বসু বিজ্ঞান মন্দিরের ডিরেক্টরের পদে নিযুক্ত হন। 1938 খৃস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে। এই খবর পেয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লিখেছিলেন : "বসু বিজ্ঞান মন্দিরের পৌরোহিত্য ভার তুমি গ্রহণ করেছ, এই শুভ সংবাদে আমার মন একান্ত আশ্বস্ত হয়েছে। সাধনার প্রদীপে তুমি নূতন শিখা জ্বালিয়ে তুলবে সন্দেহমাত্র নেই। দেশের কল্যাণে সার্থক হোক তোমার মহৎ অধ্যবসায়—এই আমার সর্বান্তঃকরণের কামনা। রবীন্দ্রনাথের এই শুভকামনা সার্থক হয়। দেবেন্দ্রমোহন বসু বিজ্ঞান মন্দিরের নব নব গবেষণা পরিচালনা করে বহু গবেষণাকে সাফল্যমণ্ডিত করেছিলেন।

তাঁর পরিচালনায় বিভিন্ন ছাত্রছাত্রীর সহযোগিতায় বসু বিজ্ঞান মন্দিরের গবেষণাগুলির মধ্যে ছিল ফটোগ্রাফিক প্লেটের ওপরে মাখানো ক্রিয়াশীল রাসায়নিকের সাহায্যে মহাজাগতিক রশ্মিতে পাই-মেসনের আবিষ্কার, ইউরেনিয়ামের স্বতঃস্ফূর্ত বিভাজন, কোবাল্ট-60-এর রাসায়নিক প্রক্রিয়ার পৃথকীকরণ, ভারতে মহাজাগতিক রশ্মির ধর্ম অনুধাবনের জন্য ক্লাউড চেম্বার গঠন 14 মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তিসম্পন্ন নিউট্রন রশ্মির সৃষ্টিকারী যন্ত্রনির্মাণ। আলট্রাসনিক্স, পাট ও তুলার বীজের ওপরে বিভিন্ন তেজ (radiation) প্রয়োগ করে তাদের মধ্যে মিউটেশন ঘটান ইত্যাদি। জগদীশচন্দ্র প্রবর্তিত বিভিন্ন সংবেদনশীল যন্ত্র ব্যবহার করে উত্তেজনীয় উদ্ভিদের (লজ্জাবতী ও বনচাঁড়াল) উত্তেজনার মাত্রা মেপে এদের বিশেষ ধরণের চঞ্চলতার উপযুক্ত শক্তির জোগানদার কোনও রাসায়নিক বস্তুর অনুসন্ধানের কাজ ইত্যাদিও করতে থাকেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে—বিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র তখন বিজ্ঞান মন্দিরে কীটপতঙ্গ নিয়ে গবেষণা করতেন। গবেষণায় তাঁর নিষ্ঠা দেখে ডঃ বসু তাঁকে বহু পরীক্ষার ভার দেন। যেমন—পিঁপড়েদের ওপর পেনি-সিলিনের প্রভাব, লজ্জাবতী জাতীয় স্পর্শকাতর উদ্ভিদ সম্বন্ধে আচার্য জগদীশচন্দ্রের সিদ্ধান্তগুলিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য পরীক্ষা ইত্যাদি। পেনিসিলিনের প্রভাবে শ্রমিক পিঁপড়েদের আকৃতি অতি ক্ষুদ্রতম হয়ে যায় দেখে (প্রায় 60 ভাগ ছোট হয়ে যায়) গোপালচন্দ্র ব্যাঙাচির উপর পেনিসিলিয়ামের প্রভাবে কী হয় দেখতে ইচ্ছা করলেন আর এই ইচ্ছা থেকেই আবিষ্কার করলেন ব্যাঙাচি থেকে ব্যাঙে রূপান্তরের রহস্য। এটি আন্তর্জাতিক স্তরের গবেষণা। গোপালচন্দ্র স্পর্শকাতর উদ্ভিদদের নিয়ে তাঁর বিভিন্ন পরীক্ষা সম্বন্ধে লিখেছেন, "নানারকম পরীক্ষার ফল হল, আমরা যা চাইছিলাম তার বিপরীত। ডঃ বোসকে বললাম, তিনি আরও কয়েকজনকে দিয়ে আমার পরীক্ষাটা করালেন। প্রতিবারই ফল হল একই। এই পরীক্ষার ফলাফল লিখিতভাবে প্রকাশিত হয়েছিল : On the chemical nature of substances which are (1) effective in the transmission of excitation in Mimosa Pudica and (II) Active' in the contraction of its pulvinus: Bose Research Intsitute Transactions Vol, XVI 1944-46. গবেষকদের নাম ছিল বি. ব্যানার্জি, জি. ভট্টাচার্য, ডি এম. বোস।

গোপালচন্দ্র দেবেন্দ্রমোহন সম্বন্ধে লিখেছেন, "তিনি আমাদের ডিরেক্টর মাত্র ছিলেন না। তাঁর সঙ্গে বৈজ্ঞানিক বিষয় নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করতে পারতাম, নিজের পছন্দসই কাজ করবার স্বাধীনতাও পেতাম। তুলনার জন্য নিছক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলতে গেলে বার বার মনে হয় আচার্য জগদীশচন্দ্রের কাছে, যেখানে আড়ষ্ট বোধ করতাম, সেক্ষেত্রে ডঃ বোসের কাছে বোধ করতাম স্বাচ্ছন্দ্য'। তিনি চেয়েছিলেন সকলে স্বাধীনভাবে গবেষণা করলে তবেই গবেষণার ক্ষেত্রে প্রসার ঘটবে। তাঁর আশা সফল হয়েছে।

বৈজ্ঞানিক গবেষণাতেই যে তিনি শুধু অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছিলেন তাই নয়। সবরকম প্রতিষ্ঠানের তিনি উন্নতির চেষ্টা করতেন। ব্রাহ্ম সমাজের উন্নতির জন্যও তিনি অনেক চেষ্টা করেছিলেন। 1932 থেকে 1950 খৃস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বিশ্বভারতীর কর্মসচিব ছিলেন। এই সময় বিশ্বভারতীর আর্থিক সঙ্কট চরম ছিল। তিনি যথাসাধ্য অর্থের সঙ্কট সমাধানের চেষ্টা করতেন। পরে কেন্দ্রীয় সরকারের সুদৃষ্টিতে পড়ায় বিশ্বভারতীর অর্থ সঙ্কট দূর হয়। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর সম্বন্ধে লিখেছিলেন, এই প্রাচুর্য কালে (কেন্দ্রীয় সরকার অধিগ্রহণের পর) অন্যেরা এসে অর্থের কর্ণধার হন। কিন্তু এ সংস্থার দারিদ্র কালে দেবেন্দ্রমোহন ছিলেন বিশ্বভারতীর অর্থের নিয়ামক।'

ইণ্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশনের তিনি ছিলেন সভাপতি এবং এই সংস্থার মুখপত্র সায়েন্স এণ্ড কালচারের সম্পাদনাও করেছিলেন কয়েক বছর। এশিয়াটিক সোসাইটিরও তিনি ছিলেন সভাপতি। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের তিনি অন্যতম সহ-সভাপতি ছিলেন।

'A Concise History of Science in India' Vol.-I নামক পুস্তকটি তাঁরই প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ। দেশ-বিদেশ থেকে তিনি বহু সম্মান লাভ করেছিলেন। যাদবপুর ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডক্টর অব সায়েন্স ডিগ্রী দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন এবং বিশ্বভারতী দেশিকোত্তম উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। তবে তিনি শ্রেষ্ঠ পুরস্কার হিসাবে পেয়েছেন দেশবাসীর শ্রদ্ধা।

1975 সালের 2রা জুন সকালে দেবেন্দ্রমোহন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আজ তিনি নাই কিন্তু ভারতের গবেষকদের মনে তাঁর প্রেরণা চিরদিন সঞ্চারিত হবে।

থ্রী-ডি ছবি প্রসঙ্গে

স্বরূপ মুখোপাধ্যায়*

সাম্প্রতিক কালের মধ্যে 3-D ছবি দেখার অভিজ্ঞতা আমাদের মধ্যে অনেকেরই হয়েছে। সাধারণ ছবি বা সিনেমার সঙ্গে এর পার্থক্যটাও আমরা অনুভব করতে পেরেছি। সিনেমা হলের মধ্যে বসে মনে হয় না আমরা পর্দার ওপর দৃশ্য দেখছি। মনে হয় সমস্ত ঘটনা বুঝি বাস্তবে আমাদের চোখের সামনেই ঘটছে। যেমন—পাথর গড়িয়ে এলে মনে হয় পাথরটা বুঝি আমাদের গায়ে এসেই পড়ল!

3-D কথার অর্থ হলো থ্রি ডাইমেনশনাল বা ত্রিমাত্রিক। সাধারণ ছবির সঙ্গে এর পার্থক্য কোথায় এবং কেনই বা 3-D ছবি দরকার হলো সে বিষয়ে একটু আলোচনা করা যাক্। আমরা খালি চোখে যেসব দৃশ্য চোখের সামনে দেখি সেক্ষেত্রে দুই চোখের সম্মিলিত ক্রিয়ায় আমরা বস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ তিনটি সম্পর্কেই সঠিক ধারণা করতে পারি। অথচ সাধারণ সিনেমার ক্ষেত্রে পর্দায় কেবলমাত্র বস্তুর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ধরা পড়ে যে কারণে বাস্তব দৃশ্যের সঙ্গে একটা পার্থক্য আমরা বুঝতে পারি। এই পার্থক্যটা দূর করার জন্যেই কলাকুশলী ও বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় 3 D ছবি তৈরি হয়। এক্ষেত্রে ফটোগ্রাফীর কায়দায় সিনেমার পর্দায় ধরা পড়ে বস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ। তাই সমস্ত ছবিটা আমাদের কাছে বাস্তব বলে মনে হয়।

চলচ্চিত্রে শব্দের প্রয়োগের পর তার আরও উন্নতিসাধনের জন্য আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স 1900 খৃস্টাব্দ থেকেই 3-D ছবির জন্য ব্যাপক পরীক্ষা চালায়। তখন একই বস্তুর ছবি দুই ভিন্ন কোণ থেকে তুলে পর্দার ওপর একই সঙ্গে মিলিয়ে ফেলে ত্রিমাত্রিক এফেক্ট আনার চেষ্টা করা হত। মোটামুটিভাবে এই পদ্ধতি অনেকটাই সফল হয় তবে কোনও ছবি নির্মাণ তখনও করা হয় নি। 1939 খৃস্টাব্দে নিউইয়র্কের ওয়ারলড্ স্কোয়ারে সর্বপ্রথম রঙিন ত্রিমাত্রিক ছবি দেখানো হয়। প্রথমে, তিনটে ক্যামেরা ব্যবহার করে বস্তুর ছবি তিনটে বিভিন্ন কোণ (Angle) থেকে তোলা হয়। এরপর প্রজেক্টরের সাহায্যে পর্দায় মিলিয়ে ফেলে 3-D এফেক্ট আনা হয়। ছবি দেখানোর সময় প্রজেক্টরের সামনে ব্যবহার করা হয় পোলারাইজ্‌ড্ ফিলটার। ছবি দেখার জন্য দর্শককে দেওয়া হয় পোলারয়েডের চশমা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে 3-D ছবি কিভাবে তোলা হয়? আমরা যেসব দৃশ্য বা চারপাশের জিনিষপত্র দেখি সেক্ষেত্রে দুটো চোখের প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা ভাবে ছবির ইমেজ

* 33, আহিরীমহল লেন, বর্ধমান-713102

তৈরি করে। যে সংবেদন মস্তিষ্কে যায় তা এই দু-এর সম্মিলিত ফল। ত্রিমাত্রিক ছবি তোলার জন্য ক্যামেরাকে ঠিক মানুষের দুটো চোখের মতো ব্যবহার করা হয়। একটা ক্যামেরার লেন্সের সঙ্গে অপর ক্যামেরার লেন্সের মধ্যে দূরত্ব 2½ ইঞ্চি রাখা হয়। অর্থাৎ আমাদের দু'চোখের মধ্যে দূরত্ব যতটা ঠিক ততটা। কিন্তু ক্যামেরার লেন্স তো মানুষের মত রঙ বোঝার ক্ষমতার অধিকারী নয়—তাই রঙের এফেক্ট আনায় জন্য বাঁ দিকের ক্যামেরার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় লাল ফিলটার এবং ডানদিকের ক্যামেরার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় সবুজ রঙ বা ফিলটার। এরপর ছবি ডেভেলপ করে ফিল্ম দুটো একত্রিত করে আলোর সামনে ধরলে একই বস্তুর সামান্য পার্থক্যযুক্ত দুটো ছবি দেখা যাবে। এবার এই ছবি প্রজেক্টরের সাহায্যে (প্রক্ষেপণ যন্ত্রের সাহায্যে) যখন একই সঙ্গে পর্দায় ফেলা হয় তখন সেই ছবি দেখতে বিশেষ চশমার দরকার হয়। খালি চোখে ঝাপ্‌সা দেখায়। যে চশমা ব্যবহার করা হয় তার বাঁ দিকের লেন্সটি সবুজ এবং ডানদিকের লেন্সটি লাল। বাঁ চোখের সবুজ লেন্স পর্দার সবুজ ফিল্মকে পরিশ্রুত বা ফিলটার করে এবং ডান চোখের লাল লেন্স পর্দার লাল ফিল্মকে পরিশ্রুত করে। এর ফলে বাঁ চোখ লাল ফিল্ম এবং ডান চোখ সবুজ ফিল্ম দেখতে পায়। এরপর দুচোখের সম্মিলিত ক্রিয়ায় যে সংবেদন মস্তিষ্কে যায় তার ফলে আমরা ত্রিমাত্রিক ছবি দেখতে পাই।

এই 3-D ছবির অনেক সমস্যা এখনও রয়েছে। আমেরিকাতে চলচ্চিত্র নির্মাতারা টি-ভির জনপ্রিয়তা ঠেকাতে 3-D ছবি নির্মাণ করেছিলেন। প্রথম প্রথম 3-D ছবি সবার মন জয় করেছিল ঠিকই তবে চশমা পড়ে ছবি দেখার বাড়তি ঝামেলার জন্য ক্রমে ক্রমে এর আকর্ষণ বিদেশে কমে আসে। বিশেষ করে যাদের এমনিতেই চশমা আছে তাদের দুটো চশমা পড়া খুব অসুবিধের সৃষ্টি করে। এছাড়া 3-D ছবি এখনও নিখুঁত নয়, তার ফলে কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া (side effect) দেখা দেয় যেমন চোখের যন্ত্রণা, মাথাধরা ইত্যাদি। এর কতকগুলো কারণ আছে :—

(1) ব্যবহৃত দুটো ক্যামেরার লেন্স দুটো যদি একদম সমগোত্রীয় (Identical) না হয় তাহলে দুটো ইমেজ বা প্রতিবিম্ব এক আকারের হবে না। যে কারণে চোখে কষ্ট অনুভব হবে।

(2) পর্দার ওপর ফেলার সময় দুটো ছবি যদি একের অন্যের ওপর সম্পূর্ণ সমাপতিত (Coincident) না হয় তাহলে ছবি দেখতে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ হবে—চোখের ওপর স্ট্রেস্ (চাপ) পড়ার জন্য মাথা ধরবে। এর ফলে চোখের দোষ দেখা দিতে পারে। সেজন্যে নিখুঁত 3-D ছবি তৈরি না হলে সে ছবি বেশি না দেখাই ভাল। নির্মাতারা আশা রাখছেন নিখুঁত 3-D ছবি তৈরি করা সম্ভব হবে যা চশমা ছাড়াই দেখা যাবে।

ভেষজ উদ্ভিদ—উলটকম্বল

ভেষজ উদ্ভিদ হিসেবে উলটকম্বলের নাম অনেকের কাছে পরিচিত। বাংলা দেশের বহু জায়গায় বনে-জঙ্গলে, ঝোপে-ঝাড়ে এটা পাওয়া যায়। Sterculiacease পরিবারের এই উদ্ভিদ প্রজাতিটির সুন্দর ফুল ও পাতার আকারের জন্য অনেক সময় বাগানে লাগানো হয়। আড়াই থেকে তিন মিটার লম্বা মাঝারি ধরনের এই গাছটির ছাল থেকে রেশমের ন্যায় আঠা বের হয়। পাতাগুলি লম্বায় প্রায় পনের সেন্টিমিটার গোলাকৃতির এবং প্রায় চার পাঁচ সেন্টিমিটার লম্বা বোঁটার ওপর থাকে। পাতার নিচের দিক দেখতে অনেকটা হৃৎপিণ্ডের মতো এবং ওপরের দিক ক্রমশ সরু হয়। ছোট কোমল ফুল খুব সুন্দর লালচে-বেগুনি রঙের এবং পাঁচ পাপড়ি বিশিষ্ট। ফলটি দেখতে অদ্ভুত ধরনের। পাঁচকোণা আকৃতির এবং বড় বড় লোমে পরিপূর্ণ ফল লম্বা বোঁটায় ও কাণ্ডের ওপরে সোজা অবস্থায় থাকে। বীজ ছোট ছোট কালো রঙের এবং অনেক হয়। সাধারণত জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত এর ফুল ও ফল হয়ে থাকে।

ওষুধ হিসেবে এই গাছের ব্যবহৃত অংশ হচ্ছে ছাল, শিকড় ও বোঁটা-থেকে গাঢ় আঠালো এক প্রকার রস নির্গত হয়। গর্ভাশয়ের ওপর এর শিকড়ের রসের বিশেষ ক্রিয়া আছে। বড়ি বা গুঁড়ো অপেক্ষা টাটকা রস বিশেষ উপকারী। উলটকম্বল ঋতুর সঠিক অবস্থা আনে এবং ঋতুরোগ বা বার্ধক্যের ক্ষেত্রে আরাম দেয়, অবশ্য বিশেষ পরিমাণের ওপর এটা নির্ভর করে। পাতার টাটকা রস বা কাণ্ডের রস বেশ স্নিগ্ধকর। অনেক সময় গোলমরিচ ও জলের সঙ্গে মিশিয়ে গাছের টাটকা রস ব্যবহার করা হয়। কোথাও কোথাও বড়ি আকারে এটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

এই উদ্ভিদের উপকারিতা বহু প্রাচীন কাল থেকেই মানুষের জানা ছিল। 1872 খৃস্টাব্দে শ্রীভুবনমোহন সরকার প্রথম এই উদ্ভিদের শিকড়ের রসের উপকারিতা সম্বন্ধে জনসাধারণকে অবহিত করেন। এরপর 1889 খৃস্টাব্দে ওয়াট তাঁর বইয়েও এর ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেন।

(আজকের বিজ্ঞান, ঢাকা, বাংলাদেশ)

পুস্তক পরিচয়

বিবর্তনের কথা—অলোক মুখোপাধ্যায়, প্রকাশক—ইন্দ্রনাথ মজুমদার, সুবর্ণ রেখা, 73 মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-91 মূল্য-25·00 টাকা, পৃষ্ঠা-163।

বইটিতে 13টি অধ্যায় আছে। প্রাণী বিবর্তনের কারণ নিয়ে গ্রন্থটিতে সহজ সরল ভাষায় আলোচনা করা হয়েছে। বইয়ের শুরুতে আছে ভূমিকা বা পূর্বভাষণ। প্রাণসৃষ্টি ও জীববিবর্তন সম্পর্কে দেশের মানুষের মনে আগ্রহ জাগাবার আন্তরিক প্রচেষ্টা বইখানিতে প্রকাশ পেয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে সৃষ্টি ও বিবর্তন সম্পর্কে বেশ কিছু নতুন কথা আছে 12 13 এবং 14 পৃষ্ঠায়। পৃথিবীর স্থলভাগ ও জলভাগ তথা মহাদেশ ও মহাসাগরগুলির ভৌগোলিক বিবর্তনের কথা 18, 19 এবং 20 পৃষ্ঠায় সংক্ষেপে সহজ ভাষায় আলোচনা করা হয়েছে। এই ধরনের আলোচনা এ জাতীয় বইতে সচরাচর দেখা যায় না। গ্রন্থের 20 পৃষ্ঠায় কার্ল সাগন রচিত মহাজাগতিক পঞ্জিকাটি ও 22 পৃষ্ঠার পর সংযোজিত কালপঞ্জীটি বেশ চিত্তাকর্ষক যা অনুসন্ধিৎসু পাঠক সাধারণের মনের বিস্তার খোরাক যোগাবে। গ্রন্থের 20 পৃষ্ঠায় এক বিশাল বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে আজ থেকে 1500 কোটি বছর আগে মহাবিশ্বের জন্মের বিষয়টি মাত্র চারটি পংক্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। পুস্তকে বিশ্ব-সৃষ্টি, সৌরজগৎ ও পৃথিবীর উৎপত্তি সম্পর্কে সহজভাবে আরো বিশদ আলোচনা থাকলে ভাল হত। এতে সাধারণ পাঠকের মনে জগৎ ও জীবনের বিবর্তন সম্পর্কে একটা সার্বিক ধারণা সৃষ্টিতে সাহায্য হত। 22 পৃষ্ঠায় শব্দ পরিচিতিতে ভূতাত্ত্বিক কালের নামগুলির ব্যুৎপত্তি দেওয়া আছে। এতে সাধারণ পাঠকের সুবিধা হবে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে জীবের শ্রেণী বিভাগের কথা বলা আছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাদের উৎপত্তিকালের উল্লেখ থাকলে ভাল হত। তৃতীয় থেকে চতুর্দশ অধ্যায়ে জীবের বিবর্তনের কালক্রমে বিভিন্ন যুগের নাম ও পরিচয় দেওয়া আছে। প্রাকৃতিক পরিবেশের ভৌগোলিক বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জীবের বিবর্তনের কথা আলোচনা করা হয়েছে। দ্বাদশ অধ্যায়ে নবজীবীয় অধিকল্পে বিভিন্ন কালবিভাগ ও জীব বিবর্তনের বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এতে পাঠকের কৌতূহল মিটবে। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে মানুষের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা আছে। বইটিতে পাশাপাশি একাধিক পরস্পর বিপরীত বিশ্লেষণকে সমান গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কোন তথ্য ও মতবাদকে চূড়ান্ত ও শেষ কথা বলে তুলে ধরা হয় নি। সমস্ত ব্যাপারই খোলা মনে আলোচনা করা হয়েছে। "তবে মানুষের বিবর্তনে শ্রম ও হাতের ভূমিকা" সম্পর্কে এঙ্গেলসের তত্ত্বটি আলোচিত হলে ভাল হত। তবে মোটামুটি দৈহিক বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির কতকগুলি মূল প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা আছে এই বইতে। পুস্তকের 22, 26, 35, 64, 79, 98 পৃষ্ঠায় উল্লেখপঞ্জি এবং 153 পৃষ্ঠায় গ্রন্থপঞ্জি দেওয়া আছে। 155—162 এই 8 পৃষ্ঠায় দেওয়া শব্দসূচি জ্ঞাতব্য বিষয় চট করে জেনে নেওয়ার ব্যাপারে পাঠকের কাজে লাগবে। বইটির বিভিন্ন অধ্যায়ে পাতায় পাতায় বহু চিত্তাকর্ষক ছবি দেওয়া আছে যা পাঠকমনে গভীর আগ্রহের সৃষ্টি করবে। একজন পেশায় চার্টার্ড একাউন্টেট-এর পক্ষে পরিশ্রম করে এত খুঁটিনাটি তথ্য একত্রে লিপিবদ্ধ করা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। জগৎ ও জীবের বিবর্তনের কথা আজকের জীবনবেদ। "পৃথিবীর বুকে জীবনের আবির্ভাব হয়েছিল জড়পদার্থ থেকে" লেখকের এই প্রত্যয়সিদ্ধ ঘোষণা মানুষের মনের মধ্যযুগীয় কুসংস্কার ও অন্ধ গোঁড়ামির মূলোৎপাটনে সাহায্য করবে। সাধারণ মানুষের মনে বিজ্ঞান মানসিকতা সৃষ্টি করা ও বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগের বিরুদ্ধে গণ-চেতনা গড়ে তোলার জন্য বাংলা ভাষায় এই জাতীয় বই লেখা ও বেশী বেশী প্রচার হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

—শিবচন্দ্র ঘোষ

বিজ্ঞপ্তি

আলোকচিত্র প্রদর্শনী

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের আলোকচিত্র প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে 'সত্যেন্দ্র ভবনে' (পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রিট, কলিকাতা-700006) 22শে ফেব্রুয়ারী থেকে 28শে ফেব্রুয়ারী (1986) বেলা 2টা থেকে রাত্রি 8টা পর্যন্ত আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। সকলকে প্রদর্শনীতে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

কর্মসচিব

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

সম্ভাবনা ও জুয়া

বিভাস চৌধুরী*

দুজন লোক জুয়া খেলছিল। খেলা অনুযায়ী প্রত্যেকে প্রতিটি খেলায় কিছু করে পয়েন্ট (point) পাচ্ছে। এরকম বেশ কয়েকটি খেলা নিয়ে বাজি হচ্ছে। যার সমস্ত পয়েন্ট প্রথম একটা পূর্বনির্দিষ্ট সংখ্যার সমান হবে সে-ই বাজিটা জিতবে। তা এখন খেলাটা যদি আগেই শেষ করে দেওয়া হয়, তবে যতগুলি খেলা হয়েছে ততগুলি খেলার পয়েন্টের ভিত্তিতে বাজিটা কীভাবে দু-জনের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে? —সমস্যাটা ছিল সেটাই।

সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি দুজন ফরাসী গণিতজ্ঞ বি. পাস্কাল (B. Pascal) ও পি. ফারমাট (P. Fermat) এই সমস্যাটির সমাধান করতে আগ্রহী হন। তাদের ঐ প্রচেষ্টা থেকেই সেই সম্ভাবনা তত্ত্বের অঙ্কুর দেখা দেয়। এর আগে অবশ্য গ্যালিলিও (1564-1642) 'সম্ভাবনা' কে মাপার চেষ্টা করেছিল। 'সম্ভাবনা'-কে যেই না মাপা গেল, অমনি জুয়া খেলা আরও আধুনিক হতে থাকলো এবং খেলাটিকে এমনভাবে করা হত যাতে যে কারুর জেতার সম্ভাবনা কমে যায়।

'সম্ভাবনা' যেহেতু মাপা যাচ্ছিল তাই অঙ্ক করে খেলার ধরন পালটে ফেলা হল এবং যে খেলায় প্রত্যেকের জেতার সম্ভাবনা যত কম সেই খেলা তত জনপ্রিয় হতে থাকলো। বেশ কিছু খেলা উঠেও গেল। কিছু নিয়মকানুন বেঁধে দেওরা হল। সেগুলি কিন্তু 'সম্ভাবনা'-কে মাপায় স্বার্থে। সংক্ষেপে কিছুটা বলা যাক। ধরা যাক কোন এক খেলায় কেউ x পয়েন্ট পেলে জিতবে। তার জেতার সম্ভাবনা

$$= \frac{\text{x পয়েন্টটা যতবার আসতে পারে}}{\text{মোট যতগুলি পয়েন্ট আসতে পারে}}$$

এটাই সম্ভাবনার সংজ্ঞা। কিন্তু এর সঙ্গে এক শর্ত আছে। খেলায় কোন ছল চাতুরী চলবে না, তাহলেই মাপটা ভুল হবে।

বোঝাই যাচ্ছে যে, উপরের সম্ভাবনাটি (ধরি $P(x)$) কখনও শূন্যের কম বা একের বেশি হতে পারে না। $P(x)=0$ মানে জেতার সম্ভাবনা নেই এবং $P(x)=1$ মানে সে জিতবেই —এটা বেশ জোর দিয়ে বলা যায়। কিন্তু এগুলি অর্থবহ হবে যদি কিনা ঐ শর্তটি মানা হয়। তার জন্যে খেলার নিয়ম করা হল। যেমন তাসের ক্ষেত্রে হয়েছে। প্রতিটি তাসের উলটো দিকে এক রকম আলাদা করে চেনা যায় না। তারপর খেলার আগে তাসগুলি ভাল করে বেঁটে নেওয়া হয় বা শাফল করা হয়। শাফল করারও নিয়ম আছে। ফলে তাস খেলোয়াড়দের মধ্যে ভাগ করার সময় যে কোন তাস পাওয়ার সম্ভাবনা সমান থাকে। এজন্যে খেলাটিও আকর্ষণীয় হয়। যেমন ব্রিজ, ব্রে ইত্যাদি।

ব্রিজ খেলায় নিয়মানুযায়ী চারজনের হাতে চারটি টেক্কা যাওয়া উচিত। কিন্তু একেবারে আদর্শ 'শাফল' হয় না। তবু সেটাই ঠিক ধরা হয়। তবে যদি কারুর হাতে চারটি টেক্কাই আসে, তবে বুঝতে হবে যে শাফ্‌লে গণ্ডগোল আছে। 'ব্রে'-তেও 'ইস্কাবনের বিবি' যে কোন চার জনের হাতে যাওয়ার সম্ভাবনা সমান থাকে। অন্যদিকে '29' খেলায় ইচ্ছে করে bias আনা হয়, যাতে যে কোন একজনের হাতে পরপর একই রঙের কিছু তাস আসে। তাই '29' খেলায় কম শাফ্‌ল করা হয়। সাধারণতঃ ফ্লিশ্ ও ফ্ল্যাশ দিয়ে জুয়া খেলা হয়। এসব খেলায় এমন কিছু শর্ত করে দেওয়া হয় যাতে যে কোন একজনের জেতার সম্ভাবনা খুব কম থাকে। যেমন ফ্লিশ্ খেলায় একটি 'জোকার' পাওয়ার সম্ভাবনা $\frac{4}{13}$ = ·3077, অর্থাৎ বেশ কম, তার উপর মিল বা match হওয়ার প্রশ্ন তো আছেই।

লুডো বা পাশা খেলাও সম্ভাবনার খেলা। কিন্তু এই ফাঁকে একটা কথা বলে রাখি। একটা অপরাধের কথা। কোন জুয়া খেলা ততক্ষণই ভাল যতক্ষণ সম্ভাবনা তত্ত্বের আদি শর্তটি অর্থাৎ ছলচাতুরী না করার কথাটি মানা হয়। নইলেই ওটা হয় জুয়াচুরি। সেই মহাভারতের পাশা থেকে কালকালের তিন পাত্তি পর্যন্ত কেবল জুয়াচুরিই চলছে। একটু লক্ষ্য করে দেখ জুয়াচুরিটাও অঙ্কের হিসেব এবং অঙ্কটা জটিল। তাই বোধ হয় জুয়াচুরির সংখ্যা বাড়ছে। কারণ জটিল মানে আকর্ষণীয় এবং লাভজনকও।

সম্ভাবনার অঙ্কটা অনেক জুয়াখেলার মালিককে বাঁচিয়েছে। কারণ কিছু খেলা আছে যাতে যে খেলছে সে জিতবেই। এমন যদি খেলা হয় যে প্রথমবার যতটাকা দিয়ে খেলবে যদি হারে তবে তার দ্বিগুণ টাকা দিয়ে পরের বাজী খেলবে, সেরকম ক্ষেত্রে অঙ্ক করে দেখা গেছে যে এক সময় পরে সেই খেলোয়াড় জিতবেই এবং তার লাভ হবে তত টাকা যত নিয়ে সে আরম্ভ করেছিল। ফলে এই খেলা উঠে গেছে। এখন এমন ব্যবস্থা করা হয় যাতে জুয়া খেলা যারা পরিচালনা করেন, সে সিঙ্গাপুরের ক্যাসিনো'র মালিক থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লটারী পর্যন্ত তারা লাভ রেখেই করেন।

একটি লটারীতে (সরকারী) যদি N সংখ্যক টিকিট

(পরের অংশ 420 পৃষ্ঠায় দেখুন)

* 46এ, লকগেট রোড, কলিকাতা-700 002

ডিমের পুষ্টি-মূল্য ও নিরামিষ ডিম

নিমাই দে*

আমাদের দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে খাদ্যের চাহিদাও প্রচণ্ড রকমভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। খাদ্য সংগ্রহের ব্যাপারে প্রায় সকলকেই কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। স্বাভাবিক ভাবে খাদ্যদ্রব্যের মূল্যও উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। সাধারণের পক্ষে দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় সুষম খাদ্যের চাহিদা মেটানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

খাদ্য উৎপাদনের কোন রকম নতুন প্রচেষ্টা চলছে না—এমন নয়। সরকারও জনসাধারণকে অনেক রকমের সুযোগ সুবিধা দিয়ে খাদ্য উৎপাদনে উৎসাহিত করার চেষ্টা করছেন। উদাহরণ হিসাবে পোলট্রি ও ডেয়ারি জাত জিনিসের উল্লেখ করা যায়। গ্রামাঞ্চলে অনেকেই এখন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির আর্থিক আনুকূল্যে মুরগী পালন, গো-পালন ইত্যাদিতে মনোযোগী হয়েছেন। তাতে ডিম, দুধ, মাংসের যোগানও নিশ্চয় বেড়েছে আর সঙ্গে সঙ্গে কিছু লোকের কর্মসংস্থানও হয়েছে।

আমাদের দেশে কেবল খাদ্যের পরিমাণের স্বল্পতাই সমস্যা নয়, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব আরও বড় সমস্যা। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব আরও বড় সমস্যা। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে শারীরিক ও মানসিক উন্নতি প্রচণ্ডভাবে ব্যাহত হয়। শরীর গঠনে, রোগ প্রতিরোধে অথবা নিরাময়ে সুষম খাদ্যের প্রয়োজন।

আমরা জানি, ডিম বেশ পুষ্টিকর আহার্য। ভেজালমুক্ত এই খাদ্য মানুষের পুষ্টি যোগাতে ও রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে যথেষ্ট সাহায্য করে।

ডিমের উপাদান—আমরা সাধারণতঃ হাঁস ও মুরগীর (দেশী ও পোলট্রিজাত) ডিমই আহার্য হিসাবে গ্রহণ করি। বর্তমান নিবন্ধে মুরগীর ডিম, বিশেষতঃ পোলট্রিজাত ডিমই আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয়। একটা পোলট্রির ডিমে প্রায় 12% (7 গ্রাম প্রোটিন থাকে। ডিমজ প্রোটিন মানুষের আহার্য দ্রব্যের মধ্যে একটি উচ্চগুণসম্পন্ন প্রোটিন। এই প্রোটিনে সমস্ত প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিড আছে। ডিমে স্নেহপদার্থের পরিমাণ প্রায় 11% (6 গ্রাম)। এই স্নেহপদার্থ খুবই সহজপাচ্য এবং এর মধ্যে ফ্যাটি অ্যাসিড (সম্পৃক্ত ও অসম্পৃক্ত) আছে। ডিমে কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ 1% (0·8 গ্রাম) এবং অজৈব লবণের পরিমাণ 1·5%। অজৈব লবণের মধ্যে থাকে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, লৌহ প্রভৃতি।

ভিটামিন C ছাড়া ডিমে প্রায় সমস্ত প্রয়োজনীয় ভিটামিনই উল্লেখযোগ্য পরিমাণেই থাকে। এছাড়া স্নেহপদার্থে দ্রাব্য (Fat Soluble) ভিটামিন যেমন, ভিটামিন A, D, E ও K এবং জলে দ্রাব্য (Water soluble) ভিটামিন যেমন, থায়ামিন (Thiamine), রাইবোফ্লেভিন (Riboflavin), প্যানটোথেনিক (Pantothenic) অ্যাসিড, নিয়াসিন (Niacin), ফোলিক অ্যাসিড (Folic Acid) এবং ভিটামিন B_{12} প্রভৃতিও থাকে। মানুষের পুষ্টিসাধনে এসব ভিটামিন অত্যন্ত সাহায্য করে। যথেষ্ট পুষ্টিকর আহার্য হলেও ডিমের ক্যালরি মূল্য (Caloric value) সে তুলনায় কম। যাঁরা স্বাস্থ্যের কারণে কম ক্যালরি অথচ বেশি পুষ্টিগুণসম্পন্ন খাদ্য গ্রহণ করতে চান, তাঁদের ক্ষেত্রে ডিম একটি আদর্শ আহার্য।

নিরামিষ ডিম—সবাই জানে মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি আমিষ খাদ্য। তাই ডিমকে নিরামিষ খাদ্য বলতে অনেকেরই আপত্তি থাকবে। ডিমের সঙ্গে আমিষ কথাটি এমনভাবে মিশে গেছে, 'নিরামিষ ডিম' বললে যেন 'সোনার পাথরবাটি' ধরনের অসম্ভব জিনিস বোঝায়। তবু একটু বিশ্লেষণ করে দেখা যাক ডিমকে নিরামিষ আখ্যা দেওয়া কতটা যুক্তিসঙ্গত।

(419 পৃষ্ঠার পরের অংশ)

থাকে তবে যে কোন একটিতে প্রথম পুরস্কার পাওয়ার সম্ভাবনা $\frac{1}{N}$ এখন N-কে এত বড় করা হয় যে সম্ভাবনা প্রায় শূন্য হয়ে যায়। লটারীতে পুরস্কারের জন্য সংখ্যাটির অঙ্কগুলি এমন ভাবে নেওয়া হয় যাতে নির্বাচিত সংখ্যাটিতে প্রত্যেক নির্বাচিত অঙ্কের আসার সম্ভাবনা সমান থাকে। এগুলি মোটামুটি ভাবে র‍্যানডম (random) সংখ্যা। ফলে পাঠককে একটা সূত্র দেওয়া যেতে পারে। লটারীর টিকিট যখন কাটবে, দেখে নিও সংখ্যাটির অঙ্কগুলি যেন 0 থেকে 9-এর মধ্যে বেশ ছড়ান থাকে এবং একই অঙ্ক যেন দু-বারের বেশি না আসে। যদিও এরকম সূত্র দেওয়া অগাণিতিক। তবু দেখ না যদি মিলে যায়। অনেক সংখ্যা বিশ্লেষণ করে আমার এরকম ধারণা হয়েছে। তবে লটারীর ফল তৈরির নিয়ম অনুযায়ী টিকিট কাটার পদ্ধতি যাই হোক তাতে সম্ভাবনা সেই $\frac{1}{N}$। এই কথা মনে রেখেই কাটবে, আর সম্ভাবনা তত্ত্বের ছাত্ররা এটা নিয়ে কিছু ভাবতেও পার।

---

*পি-12 গিরিশ অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-700003

হাঁস, মুরগী বা যে কোন পাখীর ডিম থেকেই বাচ্চা হয়। কিন্তু পোল্ট্রির ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয় না। এসব ডিমে প্রাণের কোন অস্তিত্বই থাকে না। মুরগীর দেহাভ্যন্তরে একপ্রকার রস ক্ষরণের ফলে এই ডিম জন্মায়। এসব ডিমকে বলা হয় 'বন্ধ্যা'। মোরগ ও মুরগীর মিলনের ফলে যে ডিম জন্মায় তাকে বলা হয় 'নিষিক্ত'। এই নিষিক্ত ডিম থেকেই বাচ্চা হয়।

প্রাণীর দেহাভ্যন্তরের ক্ষরিত রস থেকে 'উৎপন্ন দুধ যদি নিরামিষ আহার্য হিসাবে বিবেচিত হয়, পোলট্রির ডিমকেই বা নিরামিষ আহার্য বলতে বাধা কোথায়? দুধ পানে যাদের আপত্তি নেই, বন্ধ্যা ডিম খেতেও তাদের আপত্তি থাকা উচিত নয়। আপাতদৃষ্টিতে এ-ধরনের মন্তব্য অদ্ভুত শোনালেও, মন্তব্যটি যে যুক্তিপূর্ণ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ডিম সম্বন্ধে ভুল ধারণা (Misconception) : আহার্য হিসাবে ডিম ব্যবহারে অনেকে অনেক রকম বিধি-নিষেধের কথা বলেন। অবশ্য সপক্ষে তেমন কোন যুক্তি দেখাতে পারেন বলে মনে হয় না। কিছু লোকের ধারণা—দেশী মুরগীর ডিম পোলট্রির ডিমের চেয়ে বেশি পুষ্টিকর। এ ধরনের মন্তব্যের কোন যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা নেই। বাস্তবিক পক্ষে, পোলট্রির ডিমই অধিকতর পুষ্টিকর। কারণ পোলট্রির মুরগীকে উপযুক্ত তদারকিতে রেখে নির্দিষ্ট খাদ্য তালিকা অনুযায়ী সুষম খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। তাছাড়া পোলট্রির ডিমের ওজনও বেশি। তাই খাদ্যমূল্য বেশি হওয়ায় স্বাভাবিক। দেশী ডিমের ওজন প্রায় 30 গ্রাম; পোলট্রির ডিম প্রায় 45 গ্রাম থেকে 60 গ্রাম পর্যন্ত হয়।

গরমকালে নিয়মিত ডিম খাওয়া ভাল নয়—এরকম আমাদের একটা ধারণা প্রচলিত আছে। মত গরম দেশেও সব ঋতুতেই শিশু ও বয়স্কদের ডিম খাওয়ার ব্যাপারে কোন বাধ্যবাধকতা থাকার যুক্তি নেই।

ডিমের খোসার রঙ দেখে অনেকে ডিমের গুণাগুণ বিচার করেন। খোসার রঙ নির্ভর করে মুরগীর জাতের উপর। যেমন, রোড্ আইল্যাণ্ড রেড (Rhode Island Red) জাতের মুরগী ঈষৎ বাদামী রঙের ও হোয়াইট লেগ্‌হর্ন (White Leghorn) মুরগী সাদা রঙের ডিম দেয়।

গাঢ় হলুদ রঙের ডিমের কুসুমে (Yolk) নাকি ভিটামিন-A বেশি থাকে! এরকম বক্তব্যেরও কোন বিজ্ঞান ভিত্তিক যুক্তি নেই। মুরগীর আহার্যে ক্যারোটিনের Carotene- একপ্রকার ভিটামিন) মাত্রার উপর ডিমে ভিটামিন-A-এর পরিমাণ নির্ভর করে। কুসুমে যত বেশি রঙিন জিনিস জ্যান্থোফিল (Xanthophyll) থাকে, কুসুমের রঙ তত গাঢ় হয়। গ্রীক শব্দ 'জ্যান্থাস' (Xanthos)-এর অর্থ হলুদ। জ্যান্থোফিলের কোন পুষ্টিকর গুণই নেই। কাজেই গাঢ় রঙের কুসুমযুক্ত ডিম বেশি পুষ্টিকর, এমন ধারণা ভুল।

খাদ্য হিসাবে ডিম অনেক রকম ভাবেই পরিবেশিত হয়। ডিম, রান্নার জন্য খুব বেশি উত্তাপের প্রয়োজন হয় না বলে রান্না ডিমের পুষ্টিমূল্য তেমন কিছু কমে না। তবে রান্নার পদ্ধতির উপর আমাদের পরিপাকের সময় নির্ভর করে। সিদ্ধ ডিম, ডিমের ওমলেটের চেয়ে কম সময়ে পরিপাক হয়। কিন্তু সবক্ষেত্রেই ডিম শতকরা এক-শ' ভাগই পরিপাক হয়। দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় একটি করে ডিমের সংস্থান করতে পারলে আমরা অনেক রকম শারীরিক অসুস্থতা থেকে মুক্তি পেতে পারি।

আবেদন

* নিজের পরিবেশকে দূষণ থেকে মুক্ত রাখুন।
* সকল প্রকার বন্যপ্রাণী ধ্বংস রোধ করুন।
* খরা, ভূমিক্ষয় ও পরিবেশ দূষণ রোধে বৃক্ষ রোপণ করুন।
* খাদ্য ও ঔষধে ভেজাল দেওয়ার বিরুদ্ধে দুর্বার জনমত গঠন করুন।
* সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান মানসিকতা গড়ে তুলুন।

কর্মসচিব

পরিবেশ-দূষণরোধে বৃক্ষের ভূমিকা

প্রসেনজিৎ সরকার*

পরিবেশ দূষণ বা Pollution সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলার নেই। দূষণের ভয়াবহতা এবং ব্যাপকতার শিকার আমরা সকলেই। তাই আজ দূষণরোধে গঠিত হয়েছে বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী সংস্থা। চেষ্টা চলেছে সাধারণ মানুষকে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করাবার। এছাড়া বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী হাতে নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন প্রকল্প। এরই মধ্যে একটি হল বৃক্ষরোপণ প্রকল্প। বিশেষজ্ঞদের মতে ব্যাপক হারে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে এই পরিবেশ দূষণের ভয়াবহতাকে অনেকাংশে কমান যেতে পারে। এখানে এই প্রবন্ধে বৃক্ষরা কিভাবে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে সাহায্য করে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে বৃক্ষের ভূমিকাকে আমরা নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করে দেখতে পারি।

1. অক্সিজেন উৎপাদন ও কার্বন-ডাই অক্সাইড শোষণ

সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় বায়ুমণ্ডল থেকে ছয় অণু CO_2 শোষণ করে এক অণু গ্লুকোজ সংশ্লেষের সময় সবুজ উদ্ভিদরা ছয় অণু অক্সিজেনও উৎপন্ন করে। এই উৎপন্ন O_2-এর সামান্য কিছুটা ব্যয় হয় নিজস্ব শ্বসনকার্য পরিচালনের জন্য। আর বাকিটা যুক্ত হয় বাতাসে। হিসাব করে দেখা গিয়েছে যে একটি 50 টন ওজনের বৃক্ষ প্রতি বৎসর প্রায় এক টনের মত O_2 বায়ুমণ্ডলে যোগ করে।

2. বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ

বৃক্ষের পাতা থেকে প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে জল বাষ্পাকারে নির্গত হয়ে বায়ুমণ্ডলে যুক্ত হয়। এই জল একদিকে যেমন বায়ুমণ্ডলের আর্দ্রতাকে বাড়িয়ে তাপমাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করে, অপরদিকে তেমনি মেঘ ও বৃষ্টি ঘটাতে সাহায্য করে।

3. ভূমিক্ষয় নিবারণ

এছাড়া মাটির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করতে এবং ব্যাপক হারে ভূমিক্ষয় রোধ করতেও বৃক্ষরাজি বিশেষ ভাবে পারদর্শী। পরিবেশ-বিজ্ঞানীদের মতে প্রতি বৎসর প্রায় 6000 টন ভবে মাটি সমুদ্রে বা নদীতে ক্ষয় হয়ে চলে যাচ্ছে। ফলে গত দশ বছরে বন্যার প্লাবন প্রায় দুই গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই ভূমিক্ষয় রোধ করার একমাত্র উপায় হল ব্যাপক হারে বৃক্ষ-রোপণ। কেননা দেখা গিয়েছে যে, একটি মাঝারি আকারের বৃক্ষ মাটির মধ্যে তার শাখা-প্রশাখাকে বিস্তৃত করে প্রায় $30' \times 30' = 900$ বর্গফুট এলাকার মাটির সূক্ষ্ম কণাগুলিকে ধরে রেখে ভূমিক্ষয় রোধ করতে পারে।

4. বায়ু বিশুদ্ধিকরণ

বায়ু বিশুদ্ধিকরণের দুটি উপায় রয়েছে। প্রথমতঃ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট বসান এবং দ্বিতীয়তঃ বৃক্ষরোপণ। কিন্তু ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট বসানোর এবং তাকে চালানোর খরচ এতই বেশি যে তার দ্বারা ব্যাপক হারে বাতাস বিশুদ্ধকরণ করা সম্ভব নয়। কেবলমাত্র কোন নির্দিষ্ট ছোট অঞ্চলের ক্ষেত্রেই তা সম্ভব।

যেমন কলকাতার কথাই ধরা যাক। CMDA-এর উদ্যোগে গত কয়েক বৎসর ধরে NEERI (National Environmental Engineering Research Institute) সমীক্ষা চালিয়ে লক্ষ্য করেছেন যে প্রতিদিন প্রায় 1350 টনের মতো দূষিত পদার্থ কলকাতা ও হাওড়া শহরের বাতাসে এসে জমা হচ্ছে। এই বিপুল পরিমাণ দূষিত পদার্থের মধ্যে রয়েছে 560 টনের মতো সূক্ষ্ম ভাসমান কণা বা Solid Particulate, 450 টনের মতো কার্বন-মনোঅক্সাইড, 123 টনের মতো সালফার ডাই অক্সাইড, 102 টনের মতো হাইড্রো-কার্বন এবং 70 টনের মতো নাইট্রোজেনের বিভিন্ন অক্সাইড।

এই 560 টনের মতো ভাসমান কণা থেকে প্রতিদিন প্রায় 370 টনের মতো ভাসমান কণা নেমে আসছে এই শহরের বুকে। স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, এই বিশাল পরিমাণ ভাসমান কণাকে কোন ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট বসিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। এই ভাসমান কণার হাত থেকে শহরকে বাঁচানোর উপায় হল ব্যাপক হারে বৃক্ষরোপণ করা। কেন না দেখা গিয়েছে যে, গাছের পাতা বাতাস থেকে প্রচণ্ড পরিমাণে ধুলাবালি সংগ্রহ করে আটকে রাখতে পারে। যেমন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সমীক্ষা থেকে দেখা যায় যে অশ্বত্থ, দেবদারু, বট, আম প্রভৃতি গাছ তাদের পাতার উপর ও নিচের দিকের পিঠে প্রচুর পরিমাণে ধুলাবালি ও বিভিন্ন ধরণের ভাসমান কণা সংগ্রহ করে বাতাসকে যথেষ্ট পরিশুদ্ধ করে থাকে (সারণী-1)। এছাড়া লণ্ডনের একটি সমীক্ষায় প্রকাশ যে লণ্ডনের অন্যান্য অঞ্চল থেকে কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বৃক্ষরাজিপূর্ণ হাইড পার্কে দূষিত পদার্থের পরিমাণ অনেকাংশে কম।

শব্দদূষণ রোধ

বিভিন্ন কলকারখানা, যানবাহন প্রভৃতি হল শব্দদূষণের

* আর. কে. হল, রুম নং D/326, আই. আই. টি. খড়্গপুর-721302

উৎস। বিভিন্ন অবাঞ্ছিত শব্দের ফলে একদিকে যেমন আমাদের কর্মক্ষমতা নষ্ট হয়, অন্যদিকে তেমনি বধিরতার হারও ব্যাপক ভাবে বেড়ে চলেছে। ইণ্ডিয়ান কাউনসিল অব মেডিকেল রিসার্চ-এর সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা যায় যে, মাদ্রাজ কলকাতা এবং দিল্লীতে বধিরতার হার যথাক্রমে 10·5%, 10% ও 9·5%। এছাড়া পথ দুর্ঘটনার বৃদ্ধিও শব্দদূষণের প্রত্যক্ষ ফল।

বড় বড় শহরে বর্তমানে শব্দ দূষণের মাত্রা যে হারে বেড়ে চলেছে তাতে করে এ থেকে বাঁচার অন্যতম উপায় হল ব্যাপক হারে বৃক্ষরোপণ। সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, বিভিন্ন গাছ প্রচুর পরিমাণে (5-10 dB) শব্দ শোষণ করতে পারে। এ প্রসঙ্গে পরিচিত কয়েকটি বৃক্ষের শব্দ শোষণের পরিমাণ 2নং সারণীতে দেওয়া হল।

বিশেষজ্ঞদের মতে বড় বড় রাস্তার দু-ধারে ব্যাপক হারে বৃক্ষরোপণ করে পথ দুর্ঘটনার পরিমাণ বহুলাংশে কমান যেতে পারে। এছাড়া কারখানার চারধারেও বৃক্ষরোপণ করে কারখানার আশেপাশের অঞ্চলের শব্দদূষণের মাত্রা অনেকাংশে কমান সম্ভব।

বর্তমান আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট যে, শুধুমাত্র বৃক্ষরোপণের মাধ্যমেই আমরা পরিবেশের দূষণের মাত্রা অনেকাংশে কমাতে পারি। আর এ প্রসঙ্গে একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, দূষণরোধের যতগুলি উপায় আছে তার মধ্যে বৃক্ষরোপণই হল সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য এবং স্বল্পব্যয়সাপেক্ষ। তাই আজ সরকারি-বেসরকারী বহু সংস্থা একাজে এগিয়ে এসেছেন। শুরু হয়েছে সপ্তাহব্যাপী বৃক্ষ-রোপণ উৎসব। তবে বৃক্ষরোপণের আগে একটা কথা সকলকে মনে রাখতে হবে যে, শুধুমাত্র বৃক্ষরোপণ করলেই চলবে না, তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও আমাদের নিতে হবে। না হলে এই বৃক্ষরোপণ উৎসবের কোন সার্থকতাই নেই।

সারণী—1

বৃক্ষের নাম	পাতার ওপর পিঠে ধূলিকণার পরিমাণ gm/cm²	পাতার নিচের পিঠে ধূলিকণার পরিমাণ gm/cm²
অশ্বত্থ	6·5	3·4
বট	6 2	3·0
আম	3 4	3·3
কৃষ্ণচূড়া	2 8	1·6
দেবদারু	2·2	0·9
গন্ধরাজ	1·1	0·4

[সূত্র—"পৃথিবী কি শুধু মানুষের জন্য"—তারকমোহন দাস।]

সারণী—2

গাছের নাম	শব্দ শোষণের পরিমাণ (dB)
নিম	10
ক্যাসুরিনা (বিলাতী ঝাউ)	10
নারকেল গাছ	8
কাজুবাদাম গাছ	8
পাম গাছ	9
আম গাছ	9
তেঁতুল গাছ	9

[সূত্র : সায়েন্স টুডে, অগাস্ট, '82]

নাইট্রোজেন সারের বিকল্প সবুজ সার

হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানিগণ কিছুকাল আগে শিম জাতীয় গাছের চাষ করে মাটিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ কিভাবে বাড়ান যায় তা আবিষ্কার করেছেন। মাটিতে রাসায়নিক সার ব্যবহারের অসুবিধাগুলি আজ আর কারো অজানা নয়। বাংলা দেশেও আগে প্রধান ফসল চাষের আগে জমিতে ধঞ্চে গাছ লাগিয়ে মাটি তৈরি করার সময় হাল দিয়ে মাটিতে মিশিয়ে জমির উর্বরতা বাড়ানো হতো। আজ জীব বিজ্ঞানীরা পরীক্ষার মাধ্যমে জানতে পেরেছেন যে, বিশেষ করে লেগুম বা শিম জাতীয় গাছ রাইজোবিয়াম নামক ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে প্রকৃতি থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। তাই রাসায়নিক সারের পাশাপাশি শিম জাতীয় গাছ পচিয়ে তৈরী সবুজসার ব্যবহার করে রাসায়নিক সারের ক্ষতিকারক দিকগুলি অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব। [আজকের বিজ্ঞান, ঢাকা, বাংলাদেশ]

মডেল তৈরি

ইন্টারকাম

মৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায়*

আজকের আলোচনার মাধ্যমে আমার প্রিয় পাঠক বন্ধুদের কাছে একটা খুব সুন্দর এবং ইন্টারেস্টিং মডেল তৈরি করা শেখাবো। মডেলটির নাম ইন্টারকাম।

ইন্টারকামের সম্পূর্ণ কথাটি হল ইন্টারকমুনিকেসান বা আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ স্থাপন। যে যন্ত্রের দ্বারা এই যোগাযোগ স্থাপন করা হয় তাকে ইন্টারকাম যন্ত্র বলে। এই যন্ত্রটিকে দুটি বিশেষ ভাবে ব্যবহৃত মাইক্রোফোন সমেত অ্যামপ্লিফায়ারও বলা চলে। এটিকে প্রধান দুটি অংশে ভাগ করা হয়েছে। একটি হল মাস্টার (Master) অপরটি রিমোট (Remote)। এছাড়া এই যন্ত্রের মারফত কথা বলতে হলে যে ব্যক্তি কথা বলবে তাকে একটু বিশেষ নিয়মে কথা বলতে হবে। যেমন তার কথার শেষে ওভার (Over) বলবে এবং সঙ্গে সঙ্গে যে ব্যক্তির কাছে যন্ত্রের মাস্টার অংশটি থাকবে সে Push—to talk সুইচটি ব্যবহার করে মাইক্রোফোন কানেকসানের পোল (Pole) দুটোকে বদল করে দেবে। ফলে অপর পক্ষের কথাবার্তা এইবার সেই ব্যক্তি শুনতে পাবে। যন্ত্রটির মাস্টার এবং রিমোট এই দুটি অংশ তিনটি তার দ্বারা সংযোগ করা থাকবে।

যন্ত্রাংশের তালিকা নিচে দুটি এবং সার্কিট ডায়গ্রাম দেওয়া হল।
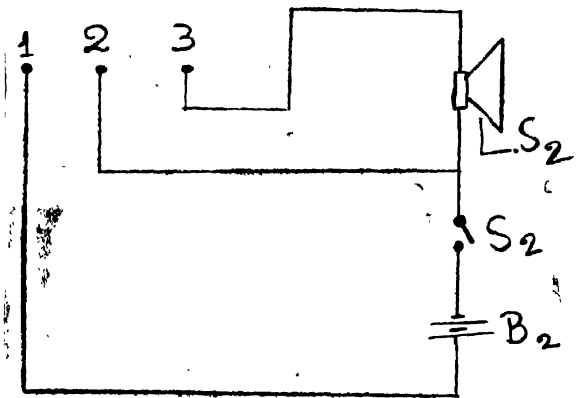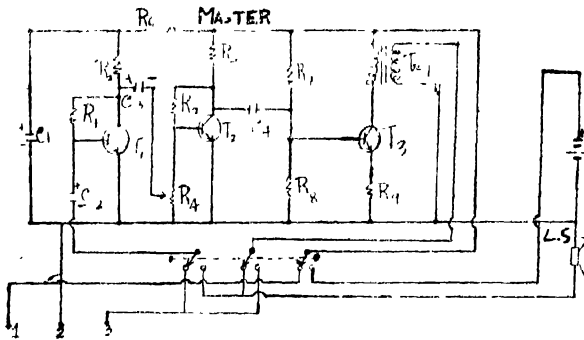
মাস্টার (Master) এবং রিমোট (Remote)—এই দুই অংশেরই যথাক্রমে 1, 2, এবং 3নং পয়েন্টে উভয়কে সংযুক্ত করা হবে।

তালিকা

B_1, B_2	Battery 6 V	R_7	100 K, ¼ w
C_1	100 uf 6 V	R_8	18 K, ¼ w
C_2, C_3, C_4	10 uf 6 V	R_9	22 Ω, ¼ w
C_5	100 uf 3 V	S_1	Three pole puse-to talk Switch
LS_1, LS_2	Loudspeakers 8 Ω		
R_1	1 M, ¼ w		
R_2, R_5	10 K, ¼ w	S_2	On/Off Swltch
R_3	330 K, ¼ w	Tr_1	Output transformer 6 V
R_4	100 K log		
R_6	3·3 K, ¼ w	T_1, T_2, T_3	BC 108 or BC 148

* 64, হিদারাম ব্যানার্জী লেন, কলিকাতা-700012

উভচরদের বাৎসল্য

উৎপলকুমার দাশগুপ্ত*

উভচরেরা অর্থাৎ যে সমস্ত প্রাণীদের বিচরণ ক্ষেত্র যেমন—জলভাগ তেমনি স্থলভাগও বটে—তাদের সংখ্যা এবং প্রকার পৃথিবীতে কিন্তু কম নয়। তবে, উভচরদের কথা ভাবতে বসলে প্রথমেই যে প্রাণীর ছবিটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে তারা হল ব্যাঙ। হ্যাঁ, ব্যাঙ তো উভচর নিশ্চয়ই। কিন্তু ব্যাঙ ছাড়াও পৃথিবীতে আরও হরেক রকমের উভচর প্রাণী আছে। আশ্চর্য তাদের চেহারা, অদ্ভুত তাদের জীবনযাত্রার ঢং। আরও অবাক-করা-ওদের সন্তান প্রতিপালন করার ঘটনা—ওদের বাৎসল্য রস। স্তন্যপায়ীদের মত উন্নত ও সুসংবদ্ধ প্রতিপালন প্রক্রিয়া এদের মধ্যে দেখা না গেলেও জীববিজ্ঞানীদের নজর কাড়ার মত বাৎসল্য-প্রীতি এদের যে আছে তা বোঝা যায়।

উভচরদের সন্তানপ্রীতির সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে এইভাবে—যে বিশেষ ধরণের প্রযত্ন-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে উভচরেরা, ডিম ফোটা থেকে শুরু করে তাদের অপত্যরা স্বাবলম্বী না হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করে চলে তাকেই বলে বাৎসল্যপ্রীতি বা 'পেরেন্টাল কেয়ার' (Parental Care)। এই অপত্য প্রতিপালনের বৈচিত্র্যপূর্ণ পদ্ধতি দেখা যায় বিভিন্ন উভচরদের মধ্যে। যে সব উভচরের ডিমের বহির্নিষেক ঘটে সেখানে এক ধরণের এবং অন্তর্নিষেকের ক্ষেত্রে আরেক ধরণের অপত্য পালন পদ্ধতি দেখা যায়।

প্রথমে বহির্নিষেক নিয়েই বলা যাক। এই পদ্ধতিতে উভচররা বাসা তৈরি করে নির্বিঘ্নে সন্তান প্রতিপালনের উপযোগী জায়গা দেখে।

কাদা দিয়ে তৈরী বাসা—ব্রাজিলের হাইলা ফেবার নামক ব্যাঙেরা পুকুরের ধারে কাদা সরিয়ে ছোট্ট গর্ত তৈরি করে। গর্তের চু-পাশটা কাদা দিয়েই করে দেয় দেয়ালের মত। তারপর ঐ গর্তের মধ্যেই রাখে নিষিক্ত ডিম। ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোনো অবধি চলে প্রতিপালন।

ফেনায়িত বস্তুর বাসা—জাপানের র‍্যাকোফোরাস স্নিজলি নামক ব্যাঙেরা ডিম পাড়ে আর লালনপালন করে পুকুরের ভেজা পাড়ে কিছু পরিমাণ ফেনায়িত বস্তুর মধ্যে।

পাতা দিয়ে তৈরী বাসা—দক্ষিণ আমেরিকার গেছো ব্যাঙ ফাইলোমেডুসা হাইপোকনড্রিয়ালিস গাছের পাতা মুড়ে কী সুন্দর বাসাই না তৈরি করে! ওরা পাতার ধারগুলো জুড়ে দেয় তাদের জনন-পায়ুছিদ্র নিঃসৃত এক ধরণের আঠালো পদার্থ দিয়ে। পাতার ভেতরে থাকে ডিম আর সেগুলো ঝোলে জলা জায়গার গাছ থেকে।

গাছের ডালপালা দিয়ে ঘর—ট্রাইটনেরা গাছের ছোট ছোট ডালপালা জুড়ে জুড়েই বাসা বেঁধে ফেলে। আর সেখানেই থাকে নিরাপদে ডিম আর বাচ্চারা।

এতো গেল বাসা বাঁধার কথা। কিন্তু প্রজাতি তথা অপত্য রক্ষার তাগিদে আরও অনেক পদ্ধতি ওরা আবিষ্কার করে ফেলেছে।

দেহের উপরিভাগেই ডিম বহন করে হাইলা গোয়েল্ডিরা, স্ত্রীব্যাঙের পিঠের ওপরের চামড়াটা একটু কুঁচকে গিয়ে তৈরি হয় অল্প থলির মত জায়গা। সেখানেই থাকে নিষিক্ত ডিমগুলো আর পরে ব্যাঙাচিরা যতক্ষণ না তারা পুরোপুরি বেড়ে উঠছে। নোটোট্রিমা পিগমিয়ামেও কিন্তু এই একই পদ্ধতি দেখা যায়।

উত্তর আমেরিকার পাইপা ডরসিজেরার (স্ত্রী) পিঠের বহির্চামড়াটা প্রজনন ঋতুতে নরম, চটচটে আর স্পঞ্জের মত সছিদ্র হয়ে যায়। এদের পুরুষেরাও কিন্তু কম যায় না! নিষিক্ত ডিমগুলো সযত্নে তুলে দেয় স্ত্রীব্যাঙের নরম পিঠে। প্রত্যেকটা ডিম ডুব দেয় ছোট্ট ছোট্ট গর্তের মধ্যে। আর সমস্তটা অঞ্চল ঢাকা হয়ে যায় একটা সছিদ্র পর্দা দিয়ে।

আরও মজার কথা। রাইনোডার্মা ডারউইনি নামক উভচরের পুরুষেরা তাদের স্বরপর্দার ভেতরে বহন করে নিষিক্ত ডিমগুলো। এই ঘটনাটা প্রথম লক্ষ্য করেন প্রখ্যাত প্রকৃতি-বিজ্ঞানী ডারউইন নিজে। যদিও এ ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য অজানা। আর এক ধরণের উভচর ইকথায়োফিস গ্লুটিনোসা কিন্তু অত ঝামেলার মধ্যে নেই। ওরা স্রেফ একটা কুণ্ডলী পাকিয়ে তার অভ্যন্তরে ডিমগুলোকে আগলে রাখে—যতক্ষণ না ডিম ফুটে বেরোয় বাচ্চা। র‍্যাকোফোরাস ম্যাকুলেটাস আবার জলাশয়ে ডিম পাড়ার পর, চারধারের জলকে পেছনের পা দুটো দিয়ে আলোড়িত করে তোলে। উদ্দেশ্য হচ্ছে—ডিমগুলো যাতে শুকিয়ে অনার্দ্র না হয়ে পড়ে আর সেই সঙ্গে সঙ্গে শত্রুর দৃষ্টিও এড়ানো। লেপ্টোড্যাকটাইলাস, টাইট্রন এসব উভচরের আবার উপযুক্ত আর পছন্দসই স্থান না পেলে চলবেই না। তাই তারা জলাশয়ের ধার খুঁজে বার করে এবং তারপর লুকিয়েচুরিয়ে সেখানকার কোন গাছের পাতার তলায় ডিম পাড়ে। কিছু উভচর যেমন গাইরিনোফাইলাস আবার স্রোতস্বিনী নদীর মধ্যে শিলাখণ্ডের

* 156, বসুনগর, মধ্যমনগর, 24-পরগণা (উত্তর)

আড়ালেই ডিম রাখে। এতেও তারা নিশ্চিন্ত নয়। কিছু পরে নিজদেহের যে কোন অংশে আঠালো রস দিয়ে ডিমগুলোকে আটকে নিয়ে তবে শান্তি।

এতসব তো গেল বহির্নিষেকের কথা। এবার আলোচনা করা যাক অন্তর্নিষেক নিয়ে। সাধারণতঃ উভচরদের দু-ধরণের অন্তর্নিষেক দেখা যায়, এগুলো হল—

ওভোভিভিপ্যারিটি (Ovoviviparity) : এক্ষেত্রে ব্যাঙাচিরা মাতৃজঠরে জন্মায় এবং সেখান থেকেই প্রয়োজনীয় খাদ্যরস আহরণ করে। তবে পরিবর্তনের (metamorphosis) সবগুলো ধাপই মাতৃজঠরে শেষ হয় না। যখন নিষিক্ত ডিমের অন্তর্গত কুসুম নামক খাদ্যভাণ্ডারটি নিঃশেষ হয়ে যায়, তখন ব্যাঙাচিরা মাতৃজঠরের বাইরে নীত হয়। উদাহরণ হিসাবে রাখা যেতে পারে—জিওট্রাইপিস এবং জিমনোফিস জাতীয় উভচরের নাম।

ভিভিপ্যারিটি (Viviparity)—এক্ষেত্রে কিন্তু মাতৃজঠরে (জরায়ুতে) নিষিক্ত ডিমগুলো সংস্থাপিত হয়। ব্যাঙাচি দশাও সেখানেই অতিবাহিত হয়। একসঙ্গে দুটো ডিম কিন্তু জরায়ুতে থাকতে পারে। সদ্যোজাত ব্যাঙাচি দুটোর জরায়ু গাত্রের সঙ্গে যোগাযোগ থাকে একটি বিশেষ মেমব্রেনের (পর্দার) মাধ্যমে। এই মেমব্রেনটিকে বলা যেতে পারে 'অমরার আদি রূপ'। ব্যাঙাচির চওড়া, শিরা-ধমনী সমৃদ্ধ লেজটি কিন্তু বিপাকীয়কার্য এবং বিপাকজাত পদার্থের আদান-প্রদানে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে। এদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে সালামাণ্ড্রা আট্রা ও মাসকিউলোসা।

এইসব আলোচনার শেষে একটা প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই মনের মধ্যে উঁকি মারতে পারে। আর তা হল—উভচরদের ক্ষেত্রে এই বাৎসল্য প্রীতি ও সন্তান প্রতিপালনের বিবর্তনগত কোন তাৎপর্য আছে কী? আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষা জীবনের তথা সমগ্র জীবজগতের আদিম বা সহজাত ধর্ম। তারই জন্য একদিকে বিভিন্ন ধরণের অভিযোজন প্রক্রিয়া অন্যদিকে নানা ভাবে অঙ্গসংস্থানিক ও শারীরবৃত্তীয় বিবর্তনের ধারা—যার ফলে নব নব প্রজাতির সৃষ্টি। আর এইখানেই আসল জীবনসংগ্রাম ও যোগ্যতমের উদ্বর্তন। এই কথা দুটির মধ্যে গায়ের জোরের কোন গুরুত্ব নেই। এইখানেই ডারউইনের বৈপ্লবিক অবদান 'প্রাকৃতিক নির্বাচন'—প্রসঙ্গ, অর্থাৎ কি ধরণের বিবর্তন স্থায়িত্বলাভ করবে তারই পরীক্ষা। বংশরক্ষার সুপরিকল্পিত পদ্ধতি স্তন্যপায়ীদের মধ্যেই উৎকর্ষতা লাভ করেছে এবং সেটাই আসল বাৎসল্য রস বা সন্তানপ্রীতির বিবর্তনগত প্রবৃত্তি। আর এই অত্যাবশ্যক প্রবৃত্তির অভাবেই (এবং যথাযথ অভিযোজনের অক্ষমতায়) অতিকায় ডাইনোসর দল বিলুপ্ত।

বিজ্ঞপ্তি

অমূল্যধন দেব স্মৃতি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

বিষয় : ভারতীয় কম্পিউটার

প্রবন্ধ পাঠাবার শেষ তারিখ : 28শে ফেব্রুয়ারী, 1986

পুরস্কার : প্রথম—150·00 টাকা, দ্বিতীয় : 100·00 টাকা

বিঃ দ্রঃ (ক) প্রবন্ধ অনধিক 2000 শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

(খ) প্রবন্ধ ফুলস্ক্যাপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে লিখতে হবে।

(গ) প্রতিযোগিতার যোগদানকারীদের বয়স ঐ তারিখের মধ্যে অনধিক একুশ বছর হতে হবে।

(ঘ) প্রবন্ধ নির্বাচন বিষয়ে পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

(ঙ) প্রয়োজনবোধে প্রবন্ধগুলি পরিষদ কর্তৃক প্রকাশের অধিকার থাকবে।

প্রবন্ধ প্রেরণের ঠিকানা : কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ,
পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-700006
(ফোন : 55-0660)

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

মাছের প্রণোদিত প্রজননের আবশ্যকতা

মৃদুল সাউ*

প্রণোদিত প্রজনন বলতে আমরা বুঝি বিশেষ উপায়ে মাছকে উত্তেজিত করে প্রজননে রত করা। আমাদের দেশে রুই, কাতলা, মৃগেল মাছ ও চীন দেশে ঘেসো রুই, রুপোলী রুই পুকুরে বা আবদ্ধ জলে ডিম ছাড়ে না। আমাদের দেশে ঐসব মাছের নদীতে স্বাভাবিক প্রজনন ঘটে পারিপার্শ্বিক বহু কারণের উপর নির্ভর করে। তার মধ্যে বিশেষ তাপমাত্রা ও হঠাৎ জলে স্রোতের বেগ এবং জলের গভীরতার বৃদ্ধি ইত্যাদি। চীন দেশে দেখা গেছে যদি জলের তাপমাত্রা 20°C-এর উপরে না থাকে, দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ 2 পি. পি.-এম (Per per million) এর কম থাকে এবং পি.-এইচ-এর মান 7·5—8 এর মধ্যে না থাকে তবে মাছের প্রজননে সফলতা আসে না।

পারিপার্শ্বিক পরিবেশ মাছের স্পর্শরেখা, ত্বক, দর্শনেন্দ্রিয়, শ্রবণেন্দ্রিয় ইত্যাদিকে উত্তেজিত করে। এই উদ্দীপনা ঐসব ইন্দ্রিয়ের স্নায়ুতে যে বিভব প্রবাহের সৃষ্টি করে তা সঙ্গে সঙ্গেই "কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে" সংবাহিত হয়। তাতেই "হাইপো-থ্যালামাস" থেকে এল. আর. এইচ. (Luteinising Release Hormone)-এর ক্ষরণ ঘটে। এই নিঃসৃত হরমোন পিট্যুই-টারীর সামনের অংশে পৌঁছে তার গোনাডোট্রপিন অর্থাৎ (1) এফ. এস. এইচ. (Follicle Stimulating Hormone) ও এল. এইচ. (Luteinising)-এর ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে। এই হরমোন দুটির প্রথমটি গোনাডে পৌঁছে ডিম্বাশয়ে ফলিকল কোষের বৃদ্ধি ও সুপরিণতি এবং শুক্রাশয়ে শুক্রাণুর উৎপাদন উদ্দীপিত করে, আর দ্বিতীয় হরমোনটি ডিম্বাণুর উৎক্ষেপণ ও শুক্রাণুর ক্ষরণ ঘটায়। এছাড়া গোনাডে এক বিশেষ ধরনের যৌন হরমোন নিঃসৃত হয়, সব মিলিয়ে এই ভাবেই মাছের যৌন আচরণ, ডিম্বাণুর উৎক্ষেপণ ও শুক্রাণুর ক্ষরণ প্রবাহিত হয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে স্বাভাবিক প্রজনন সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হতে হলে বাহ্যিক এমন কতকগুলি শর্ত বা অবস্থার প্রয়োজন যাতে মাছের শারীরিক উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। প্রবহমান নদীতে ঐ বাহ্যিক শর্তগুলোর পূরণ ঘটে বলেই মাছ স্বাভাবিক ভাবে প্রজননে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু কোন বদ্ধ জলাশয়ে বা পুকুরে ঐ বাহ্যিক পরিবেশ বা অবস্থার সৃষ্টি হয় না। ফলে মাছও স্বাভাবিকভাবে উত্তেজিত হয়ে যৌন ক্রিয়াকলাপে অংশ নেয় না। সেজন্যই কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে।

এই কৃত্রিম প্রজনন সংগঠিত করতে হলে সর্বপ্রথম পিট্যুই-টারীর নির্যাস দরকার যা বাইরে থেকে মাছের শরীরে প্রয়োজন মত প্রবেশ করান হয় এবং এর ফলে পিট্যুইটারী গ্রন্থির ক্ষরণ সম্ভব হয়, তাতে উপযুক্ত আবহাওয়ায় প্রজনন ক্রিয়া শুরু হয়, উত্তেজিত স্ত্রীমাছ ডিম ছাড়ে ও পুরুষ মাছ সেই ডিমের উপর শুক্রকীট নিঃসরণ করে।

প্রবহমান নদীতে বা বাঁধে যে বাহ্যিক বা পারিপার্শ্বিক পরিবেশ স্বাভাবিক প্রজননে নিয়ামক শক্তিরূপে কাজ করে তা বদ্ধ পুকুরে অনুপস্থিত। তাই ইনজেকশনের মাধ্যমে সংগৃহীত পিট্যুইটারীতে অবস্থিত F. S. H. ও L. H. মাছের শরীরে প্রবেশ করিয়ে কৃত্রিম প্রজনন সম্পন্ন করা হয়। সুতরাং এই প্রণোদিত প্রজননে পিট্যুইটারী গ্রন্থি একান্ত প্রয়োজন।

পিট্যুইটারী গ্রন্থির অবস্থান—এটি এমন একটি গ্রন্থি যা থেকে নিঃসৃত রস কোন নালী দিয়ে যায় না। আবার শারীরবৃত্তীয় অনেক কাজে এই রস (হরমোন) অংশগ্রহণ করে বলে একে মাস্টার গ্ল্যাণ্ড বলে, প্রত্যেক মাছের মস্তিষ্কের 1/4″ নীচে এই গ্রন্থি রয়েছে। যে কোন জীবন্ত মাছের এই গ্রন্থি মোটামুটি ভাবে যে কোন মাছে ব্যবহার করা যেতে পারে। +2 বৎসরের মাছের দুটি চোখকে যদি একটি সরলরেখা দিয়ে যোগ করা যায় এবং এই সরলরেখা দিয়ে লেজের দিকে সমবাহু ত্রিভুজ অঙ্কন করলে তা যে বিন্দুতে পড়বে সেই স্থানে এই শ্বেতগ্রন্থি থাকে।
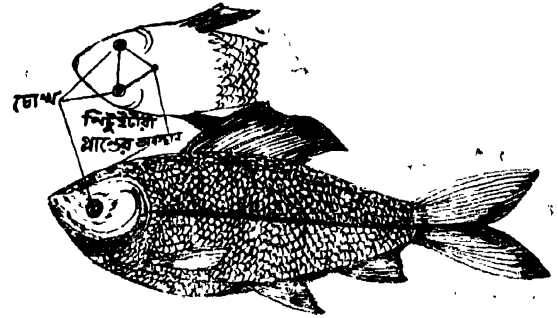
মাছের পিট্যুইটারী গ্রন্থির অবস্থান

সংগ্রহ—(1) মাথার উপরিভাগের খুলি ধারাল ছুরি দিয়ে সাবধানে খুলতে বা কাটতে হয়, তার নীচে মস্তিষ্ক। এই মস্তিষ্ক একটি আবরণ বা মেনিনজেস দিয়ে ঢাকা থাকে। তা শরীরে মস্তিষ্ককে ধড়ের দিক থেকে উলটিয়ে মুখের দিকে নিয়ে গেলে দেখা যায় দুটি অপটিক নার্ভ 'X' চিহ্নের মত ডান থেকে

[বাকী অংশ পরের পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

* গ্রাম—পদ্মবাড়, পোঃ—মোরগোদা, মেদিনীপুর

ভেবে উত্তর দাও

সৌমিত্র মজুমদার*

[নির্ভুল উত্তর খুঁজে বের কর]

1. "সেফ্‌টিরেজার" 1895 খৃস্টাব্দে কে আবিষ্কার করেন ?
 a) গিলেট, b) বার্লিনার, c) গ্যাট্‌লিং।

2. 1 নং ছবিতে যে পাখিটি দেখছো, বলতো তার নাম কি ?
 a) খৈরি, b) হরিয়াল, c) কাকাতুয়া।

1

2

3. বিজ্ঞানী পল মুলার যা আবিষ্কার করেন তার নাম হল—
 a) গীটার, b) কমপিউটর, c) ডি. ডি. টি।

4. কোন্ যন্ত্রের সাহায্যে রক্ত কণিকার সংখ্যা গণনা করা হয় ?
 a) পিউরিস্কোপ, b) হিমোসাইটোমিটার, c) ক্যামেরা।

5. 2নং ছবিটি কার চিন্তা করে বল দেখি
 a) ক্যাল্‌কুলেটর, b) স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র মানব, c) পেণ্ডুলাম ঘড়ি।
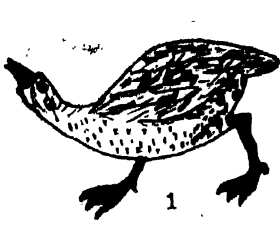
6. যে সব জন্তুর গায়ের রং সাদা হয়, তাদের কি বলে ?
 a) অ্যাল্‌বিনো, b) উচ্চিংড়ে, c) ইলেকট্রাম।

7. 3নং ছবিতে পাখীটার নাম ভেবে বল।
 a) বাচ্‌কা, b) তিতির, c) মাণিকজোড়।

3 4

8. আলোর চেয়ে বেশী গতিবেগ সম্পন্ন কণার নাম কি ?
 a) ট্যাকিয়েন, b) আল্‌ফা, c) মেসন।

9. 4 নং ছবিতে যাকে দেখতে পাচ্ছো, চেন কি তাঁকে ?
 a) বিজ্ঞানী টেমিটেফিন, b) মহামল্ল গামা, c) 'নীলদর্পণ'-এর নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র।

10. মহাকাশে প্রথম কৃষ্ণকায় নভশ্চর কে ?
 a) দিব্যেন্দু বড়ুয়া, b) গিয়ন ব্লুফোর্ড, c) বুলা চৌধুরী।

*73, পূর্বাচল পল্লী, পোঃ—রহড়া (743186) 24-পরগণা

ভেবে উত্তর দাও-এর উত্তর

1. a) গিলেট, 2. a) খৈরি, 3. c) ডি. ডি. টি.। 4. b) হিমোসাইটোমিটার, 5 b) স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রমানব, 6. a) আল্‌বিনো, 7. c) মাণিকজোড়, 8. a) ট্যাকিয়েন, 9. c) 'নীলদর্পণ'-এর নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র, 10. b) গিয়ন ব্লুফোর্ড।

[427 পৃষ্ঠার পরের অংশ]

বামে এবং বাম থেকে ডানে গিয়েছে। যেখানে কাটাকাটি হয়েছে তার ঠিক নীচেই রয়েছে ছোট দানার মত নরম ঘোলাটে সাদা রং-এর পিট্যুইটারী গ্রন্থি পাতলা পর্দা সরিয়ে চিমটা অথবা সুচ দিয়ে সংগ্রহ করা হয়।

(2) মাথা ছিদ্র করে—সুন্দর ভাবে মাছকে ধড় থেকে মাংস বাদ দিয়ে মাথাটা কাটতে হবে। একটি কর্ক ছিদ্র করার যন্ত্র দিয়ে ঠিক মেরুদণ্ডের উপর দিকে ধীরে ধীরে মুখের দিকে ছিদ্র করে এটি সংগ্রহ করা হয় এবং নির্দিষ্ট পাত্রে রাখা হয়। আর প্রয়োজনমত ব্যবহার করা হয়।

দেবেন্দ্রমোহন বসুর বৈজ্ঞানিক কর্মকৃতি

যুগলকান্তি রায়

বাংলা সাহিত্যে উপেক্ষিতার কথা আমরা জানি। কিন্তু ভারতবর্ষে বিজ্ঞান চর্চার ইতিহাস লেখকদের কাছে, এমন কি ভারতীয় বিজ্ঞানীদের কাছে উপেক্ষিত কে তাঁর নাম কি আমরা জানি? জগদীশচন্দ্র-প্রফুল্লচন্দ্রের কর্মকৃতির সূত্রে ভারতবর্ষে নতুন করে যে বিজ্ঞান চর্চা শুরু হয় তার কথা বলতে গেলে আমরা এক বাক্যে সি. ভি রামন, সত্যেন বসু, মেঘনাদ সাহা, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, হোমি ভাবা, ভাটনগর, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্র মুখার্জি প্রমুখের নাম উচ্চারণ করি। বসুবিজ্ঞান মন্দিরের প্রাক্তন অধিকর্তা অধ্যাপক দেবেন্দ্রমোহন বসুর নাম ভুলেও বলি না। ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল সায়েন্স অ্যাকাদমির মত প্রতিষ্ঠানও তাঁদের প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য ডি. এম. বোসের নাম মনে রাখেন নি। 1985 খৃস্টাব্দে এই প্রতিষ্ঠানের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব পালিত হয়েছে। এই উপলক্ষে তাঁরা 'সায়েন্স ইন ইণ্ডিয়া' নামে একটি বই প্রকাশ করেছেন। সেই বইয়ে ভারতে বিজ্ঞান চর্চার ইতিহাসের কথা বলতে গিয়ে অনেকের নামই করা হয়েছে, কিন্তু কোথাও ডি. এম. বোসের নাম একটিবারও করা হয় নি।

দেবেন্দ্রমোহন বসুর প্রতি ভারতের শীর্ষস্থানীয় বৈজ্ঞানিক সংস্থার এই উপেক্ষা বা ঔদাসীন্য 'আত্মপ্রবঞ্চনার' নামান্তর কিনা না সংশ্লিষ্ট পক্ষরা ভাবুন। আমরা তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ভারতীয় বিজ্ঞান তথা বিশ্ব-বিজ্ঞানে তাঁর ভূমিকাটুকু একবার তলিয়ে দেখতে পারি।

অধ্যাপক বসুর ছাত্র তথা সহকর্মী অধ্যাপক শ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায় অধ্যাপক বসুর গবেষণার মধ্যে রয়েছে "....মহাজাগতিক রশ্মিতে মিউ মেসনের সন্ধান, ইউরেনিয়ামের স্বতঃস্ফূর্ত বিভাজন, সর্বপ্রথম কোবাল্ট-60-এর রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পৃথকীকরণ, ভারতে মহাজাগতিক রশ্মির ধর্ম অনুধাবনের জন্য প্রথম প্রতি-নিয়ন্ত্রক ক্লাউড চেম্বার, কম্পটন-বেনেট শ্রেণীর প্রেসার আইওনাইজেশন চেম্বার, এক কোটি চল্লিশ লক্ষ বৈদ্যুতিক ভোল্ট-এর নিউট্রন জেনারেটার, আলট্রা-সনিকস্ পাট ও তুলার মিউটেসন জেনেটিকস, বনচণ্ডালের পত্রাণুর কম্পনে শক্তির উৎস সন্ধান, প্রাণীর প্রজনন শক্তির অপসারণের উপযোগী রাসায়নিক বস্তুর পৃথকীকরণ, ব্যাঙাচির রূপান্তর ইত্যাদি।" এই তালিকা থেকে এটা স্পষ্ট যে, অধ্যাপক বসুর পরিচিতি মূলত পদার্থবিদ হিসেবে হলেও তিনি নিজেকে কোন একটি বিশেষ গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন নি। তিনি ভারতের প্রেক্ষাপট এই সমস্ত গবেষণার অনেকগুলির পুরোধা তো বটেই, তবেই তার চেয়েও বড় কথা হল সেই যুগে তাঁকে কেন্দ্র করে গবেষণার যে পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল (বিদেশী কায়দায় যাকে আমরা 'স্কুল' বলি) তা তো এখনও আমাদের দেশে বিরল। এখনকার দিনে বৈজ্ঞানিক গবেষণা সমষ্টিগত প্রয়াস ছাড়া ভাবাই যায় না। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগেই দেবেন্দ্রমোহন ভারতে এই রীতি প্রবর্তন করেছিলেন। সেই পরিমণ্ডলের এক একটি তারকা হলেন: আর. সি. মজুমদার, বিভা চৌধুরী, এস. কে. ঘোষ, এস. এন. দত্ত, এইচ. পি. দে, আর. এন. মুখার্জি, ডি. পি. রায়চৌধুরী, এইচ. জি, ভড়, এস. দত্ত, কে. পি. ঘোষ, এম. দেব, পি. সি. মুখার্জি, এস. ডি. চ্যাটার্জি, এম. এস. সিংহ প্রমুখ।

প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে নানারকম প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও তিনি যে প্রয়োজনমত ব্যবস্থা করে গবেষণায় উন্নত দেশের সঙ্গে পাল্লা দিতেন এবং 'বিজ্ঞানী' ঘরানা গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন তার পিছনে তাঁর মামা জগদীশচন্দ্রের প্রভাব ছাড়াও অল্প বয়সেই দু-দুবার বিদেশ ভ্রমণ তাঁকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। তিনি 1906 খৃস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যায় এম-এস-সি (প্রথম শ্রেণীতে প্রথম) পাশ করার পর 1907 খৃস্টাব্দে বিলেত যান। সেখানে তিনি প্রায় সাড়ে তিন বছর ক্যাভেণ্ডিশ ল্যাবরেটরীতে কাটিয়েছেন। ওখানে যেমন তিনি ইলেকট্রনের আবিষ্কর্তা অধ্যাপক জে. জে. টমসনের কাছে গবেষণা করেছেন, তেমনি সি. টি. আর উইলসনকে ক্লাউড চেম্বার পরীক্ষার উদ্ভাবন করতে দেখেছেন এবং সে ব্যাপারে তাঁর কাছে প্রাথমিক শিক্ষণও নিয়েছেন। 1913 খৃস্টাব্দে তিনি দেশে ফিরে কলকাতার সিটি কলেজে এক বছর অধ্যাপনা করেন। 1914 খৃস্টাব্দে আশুতোষ মুখার্জি তাঁকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার ঘোষ অধ্যাপক পদে নিয়োগ করেন। ঐ বছরই তাঁকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘোষ ট্রাভেলিং ফেলোশিপ দিয়ে পাঠান হয়। ঐ সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ায় তাঁকে দীর্ঘদিন জার্মানিতে অন্তরীণ অবস্থায় কাটাতে হয়। সেখানে প্লাঙ্ক, আইনস্টাইন, বোন প্রমুখ পৃথিবীর বাঘা বাঘা বিজ্ঞানীদের আলোচনা সভায় সভায় তিনি উপস্থিত হতেন।

বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রয়োজনে যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনে গবেষণায় টিম-ওয়ার্কের প্রয়োজনীয়তার অনুধাবনে এঁদের

সান্নিধ্য তাঁর মনে যে কী রকম গভীর দাগ কেটেছিল তা তার নিজের কথায় শোনা যাক "প্রায় সাড়ে তিন বছর গবেষক হিসেবে আমি ক্যাভেণ্ডিশ ল্যাবরেটরীতে ছিলাম। এই সময়ে টমসন বিরাট সংখ্যক গবেষকদের নিয়ে গ্যাসে বিদ্যুৎ মোক্ষণের গবেষণা করছিলেন। পজিটিভ রে-র উপর গবেষণা সেইমাত্র শুরু হয়েছে। জে. জে. টমসন নিয়ম গ্যাসে দুটি সমস্থানিকের (আইসোটোপ) সন্ধান পেয়েছেন। সি.-টি.-আর উইলসন তাঁর ক্লাউড চেম্বারে আলফা কণার পথের আলোকচিত্র নিয়েছেন। রাদারফোর্ড তখন পরমাণুর নতুন মডেল দিয়েছেন।....' (এ রিভিউ অফ সোর্সেস ফর হিস্ট্রি অফ কোয়াণ্টাম ফিজিক্স অ্যান ইনভেন্টরি অ্যাণ্ড রিপোর্ট—ইণ্ডিয়ান জার্নাল অফ হিস্ট্রি অফ সায়েন্স, খণ্ড-2, সংখ্যা-1, 1967)

বার্লিনের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তিনি বলছেন, ''দেশে ফেরার এক বছর পরেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমাকে আরও পড়াশুনার জন্য বার্লিনে পাঠান হয়।...1914 খৃস্টাব্দের এপ্রিলে আমি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেওয়ার মনস্থ করি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ায় যুদ্ধ না মেটা পর্যন্ত আমাকে সেখানে থাকতে হয়। বার্লিন তখন শুধু জার্মানীর নয়, সম্ভবত সারা পৃথিবীতে পদার্থবিদ্যার একটা গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। একদিকে তখন তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক, অপরদিকে প্রুশিয়ান আকাদমি অফ সায়েন্সে অধ্যাপক হিসেবে যুক্ত আছে অ্যালবার্ট আইনস্টাইন, নার্নস্ট, ভাববার্গ তখনকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অধিকর্তা। রুবেন্স তখন বিভিন্ন আলোচনা সভার আয়োজন করতেন। এঁরা সে সমস্ত সভায় নিয়মিত যেতেন। সেখানে তাঁরা শুধু নিজেদের গবেষণা নিয়েই আলোচনা করতেন না, পদার্থবিদ্যার কোন জার্নালে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা-নিবন্ধ প্রকাশিত হলে তা নিয়েও নিজেদের মধ্যে মতবিনিময় করতেন। ঐ সময় সনাতনী কোয়াণ্টাম তত্ত্ব এবং আপেক্ষিকতাবাদের নানা ধরনের গবেষণা, তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা সব কিছুরই কেন্দ্রবিন্দু ছিল বার্লিন" (ইউ.জি.সি-র উদ্যোগে আয়োজিত 'প্রসিডিংস অফ দি ফিজিক্স সেমিনার, কলকাতা, সেপ্টেম্বর-9, 10, 11, 1957)।

কাজে কাজেই দেবেন্দ্রমোহন বৃটেন ও জার্মানি দুই ঘরানার বিজ্ঞানীদের একেবারে কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। একপক্ষের নিয়মনিষ্ঠার সঙ্গে অপরপক্ষের কর্মতৎপরতা যুক্ত হলে কী হয় তার নিদর্শন পাই আমরা দেবেন্দ্রমোহনের জীবনে। তিনি বৃটেন ও জার্মানিতে শুধু তখনকার দিনের নয় সর্বকালের অন্যতম সেরা পদার্থ-বিজ্ঞানীদের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসেছিলেন। তাছাড়া, তখন কোয়াণ্টাম তত্ত্ব ও আপেক্ষিকতাবাদের মধ্য দিয়ে নব্যপদার্থ-বিজ্ঞানের যুগ শুরু হয়েছে। সমগ্র বিজ্ঞানীসমাজ তখন আলোড়িত। পদার্থ বিজ্ঞানের সেই ভাঙা-গড়াকে যিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, রোমাঞ্চিত হয়েছেন তিনি যে পরবর্তীকালে বিশ্ব-বিজ্ঞানে কোন পথের দিশারী হবেন তাতে অবশ্য অবাক হওয়ার কিছু নেই। বিস্ময়ের ব্যাপারটা এখানেই যে, উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি, ল্যাবরেটরি এবং অর্থের অভাব সত্ত্বেও তিনি পরাধীন ভারতে এখানে নতুন নতুন গবেষণার প্রবর্তন করেছিলেন, কয়েকটি ক্ষেত্রে অতি উচ্চমানের গবেষণা করে-ছিলেন এবং একদল গবেষক কর্মী তৈরি করেছিলেন। জগদীশ চন্দ্রের মত ব্যক্তিত্বের প্রেরণা এবং বৃটেন ও জার্মানিতে কাজ করার অভিজ্ঞতা ছাড়া এ ধরনের প্রয়াস সম্ভব হত কিনা জানি না, তবে তাঁর মধ্যে যে এসবের প্রভাব গভীরভাবে পড়েছিল তা তো লেখার মধ্যেই দেখতে পেয়েছি।

জার্মানিতে যে বৈজ্ঞানিক আলোচনাসভার কথা আমরা বলেছি (যাকে পরিশীলিত ভাষায় 'কলোকিয়াম' বলা হয়) তার যে কি ফল হতে পারে তা তিনি নিজে দেখে এসেছেন। ভারতে এসে যে তিনি 'সায়েন্টিফিক কমিউনিটি' গড়ে তোলার কথা বলেছিলেন তার অন্যতম উদ্দেশ্য হল, বিজ্ঞানীরা এর মাধ্যমে গবেষণা ও দেশের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে নিয়মিত আলোচনায় বসবেন এবং সরকারের উপর তার প্রভাব ফেলতে চেষ্টা করবেন। কিন্তু, দুঃখের বিষয়, ভারতীয় জাতীয় বিজ্ঞান আকাদমি, ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস প্রভৃতির মত বড় বড় বৈজ্ঞানিক সংস্থা হয়েছে ঠিকই, 'লাঞ্চ ও টি'-এর ভারী ভারী মেনুসহ সেমিনার হয় তাও ঠিক, কিন্তু 'কলোকিয়াম' বলতে যা বোঝায় তা এখনও স্বপ্নের মধ্যেই আছে। ভারতীয় বিজ্ঞানীদের মধ্যে এখনও সে ধরনের 'কো অর্ডিনেশন' গড়ে ওঠে নি যা এই শতকের প্রথম দিকে দেবেন্দ্রমোহন বার্লিনে দেখে এসেছিলেন।

'সায়েন্টিফিক কমিউনিটি' গড়ার অন্যান্য প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে তিনি বলেছেন (দ্রঃ দি সায়েন্টিফিক কমিউনিটি অ্যাণ্ড রিসার্চ পলিসি—সায়েন্স অ্যাণ্ড কালচার, খণ্ড-29, পৃঃ 53-56, ফেব্রুয়ারী, 1957), "...বিজ্ঞানের কোন প্ল্যান ও পলিসি ছাড়া দেশের অর্থনৈতিক বিকাশে বিজ্ঞান-প্রযুক্তিকে ঠিকমত কাজে লাগান যায় না। অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে দরকারটা আরও জরুরী। কিন্তু সায়েন্টিফিক কমিউনিটি ছাড়া এটা সম্ভব নয়।...' তিনি বলেছেন, উন্নয়নশীল দেশে সায়েন্টিস্টস আছেন, কিন্তু সায়েন্টিফিক কমিউনিটি নেই। উন্নত দেশগুলিতে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের জন্য বিভিন্ন এজেন্সি মারফৎ অর্থসাহায্য দেওয়া হয়। দেশের সরকার সেরকম একটি

এজেন্সি মাত্র। অর্থদাতাদের মধ্যে থাকে কোন শিল্প, নয়ত কোন ধনী ব্যক্তি, বা ট্রাস্ট-ফাউণ্ডেশন। এতে বিজ্ঞানীরা অনেকটা স্বাধীনতা পান, অন্ততঃ সরকার ও ব্যুরোক্রাসির উপর নির্ভরতা কিছুটা কমে। অধ্যাপক বসু বলেছেন, ভারতে কিন্তু বৈজ্ঞানিক সংস্থাগুলিকে সরকারই প্রধানত অর্থসাহায্য করে থাকেন। এর ফলে বৈজ্ঞানিক সংস্থাগুলিকে সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয় এবং সরকারি অফিসারদের কথা মেনে চলতে হয়। তিনি বলেছেন উন্নত দেশগুলি তাঁদের অভিজ্ঞতায় যে সমস্ত আধাসরকারি, বেসরকারি সংস্থা বৈজ্ঞানিক গবেষণাতেও অর্থ ব্যয় করে থাকেন সেই সমস্ত সংস্থার পরিচালক মণ্ডলীতে বিজ্ঞানীদের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন। অধ্যাপক বসু ইণ্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশনের 'সায়েন্স অ্যাণ্ড কালচার'-এর সম্পাদনার সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন। তিনি এর অন্যতম উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন, "···সায়েন্স অ্যাণ্ড কালচারের অন্যতম দায়িত্ব হল প্রকৃত সায়েন্টিফিক কমিটি গঠনে সাহায্য করা। সায়েন্স অ্যাণ্ড কালচার-এর মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা যাতে সায়েন্স পলিসি সম্পর্কে নিয়মিত গঠনমূলক আলোচনা করতে পারেন সেই চেষ্টাও করতে হবে···। সি সায়েন্টিফিক কমিউনিটি অ্যাণ্ড রিসার্চ পলিসি, 'সায়েন্স অ্যাণ্ড কালচার', খণ্ড 29, পৃষ্ঠা 53-58, ফেব্রুয়ারি, 1963)।

অধ্যাপক বসু নিজে বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যত্র বৈজ্ঞানিক গবেষণা কী রকম হবে সে সম্পর্কে 'সায়েন্স অ্যাণ্ড কালচার'-এ প্রবন্ধ লিখেছেন (সায়েন্টিফিক রিসার্চ ইন ইউনিভার্সিটিজ অ্যাণ্ড এলসহোয়্যার', খণ্ড-27, পৃঃ-155-160, এপ্রিল 1961)। এছাড়া পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার আমাদের খনিজ দ্রব্য, শিক্ষা সমস্যা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তিনি বহু প্রবন্ধ এই পত্রিকায় লিখেছেন। আরও অনেকের এ ধরনের নিবন্ধ ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। অধ্যাপক বসুর বক্তব্য অনুযায়ী 'সায়েন্স অ্যাণ্ড কালচার' 'সায়েন্স পলিসি' দেশের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনার ধারা বজায় রেখে গেলেও তাঁর 'সায়েন্টিফিক কমিউনিটি'-র ধারণা যে আজও বাস্তবায়িত হয় নি এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ আছে কি?

দেবেন্দ্রমোহন বসুর বৈজ্ঞানিক গবেষণা যে কোন একটি বিশেষ বিষয়ে নিবদ্ধ ছিল না তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণাগুলির বিষয়গত ও প্রকৃতিগত দিক বিচার করে বিজ্ঞানীরা সেগুলিকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। যেমন—(1) উইলসন ক্লাউড চেম্বার এবং ফটোগ্রাফিক ইমালসান পদ্ধতিতে নিউক্লিয় সংঘাত ও বিভাজনের পরীক্ষা। (2) চৌম্বকধর্মী পদার্থ নিয়ে নানারকম পরীক্ষা। (3) বিজ্ঞানের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে জগদীশচন্দ্রের উদ্ভিদ-শারীরবৃত্ত গবেষণার বিশ্লেষণমূলক পরীক্ষা। উপরিউক্ত বিষয়গুলির উপর অধ্যাপক বসুর গবেষণার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া এখানে অসম্ভব। কোন একজনের পক্ষে তা দুরূহও বটে।

অধ্যাপক বসুই আমাদের দেশে পারমাণবিক গবেষণার প্রবর্তন করেন এবং শিল্পে পারমাণবিক শক্তির প্রয়োগ, পূর্বাঞ্চলে রিসার্চ রিঅ্যাক্টরের প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বিষয়ে বহু প্রবন্ধ 'সায়েন্স অ্যাণ্ড কালচার'-এ লিখেন। নিউক্লিয় সংঘাত ও বিভাজন সম্পর্কে 'নেচার' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর ও এস. কে. ঘোষের গবেষণাটির ভূয়সী প্রশংসা করে রাদারফোর্ড অধ্যাপক বসুকে একটি চিঠি দিয়েছিলেন।

1938 খৃস্টাব্দে বসু বিজ্ঞান মন্দিরে অধিকর্তা হিসেবে যোগদানের পর অধ্যাপক বসু মহাজাগতিক রশ্মির (কসমিক রে) উপর গবেষণার সূত্রপাত করেন। তিনি ক্লাউড চেম্বারের পরিবর্তে ফটোগ্রাফিক প্লেটের ইমালসান বা প্রলেপকে আয়নের গতিপথ চিহ্নিত করার কাজে লাগান। অবশ্য এর প্রাথমিক ধারণাটি তাঁর নিজস্ব নয়। 1938 খৃস্টাব্দে কলকাতায় ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনে এইচ. জে. টেলর অতি উচ্চতায় মহাজাগতিক রশ্মির সম্পর্কে নানা তথ্য জানার ক্ষেত্রে ফটোগ্রাফিক ইমালসান পদ্ধতি সম্পর্কে একটি গবেষণাপত্র পড়েন। অধ্যাপক বসু এতে আকৃষ্ট হয়ে বিজ্ঞানী ওয়াল্টার বোথের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করেন।

এরপর 1940 থেকে 1944-এর মধ্যে তিনি ডঃ বিভা চৌধুরীকে নিয়ে দার্জিলিং, সন্দকফু এবং ফারিজংয়ে সাত হাজার থেকে চৌদ্দ হাজার ফুট উচ্চতায় ইলফোর্ডের হাফটোন প্লেটে মহাজাগতিক রশ্মির কি প্রতিক্রিয়া হয় জানতে চেষ্টা করলেন। সেই প্লেটে এমন কিছু ছাপ তাঁরা দেখেন যা তাঁরা পরিচিত কোন কণিকার অস্তিত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারছিলেন না। যাই হোক, নিজস্ব পদ্ধতিতে সেগুলির বিচার বিশ্লেষণ করে তাঁরা জানান যে, সেই অদ্ভুত ছাপগুলি মেসন কণার জন্য হয়েছে এবং ভরও বের করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, মহাজাগতিক রশ্মির মধ্যে এই নতুন কণা (মেসন)-এর অস্তিত্বের কথা বিজ্ঞানীরা এর আগে অবশ্য নানা ভাবেই জানতে পেরেছিলেন। কিন্তু তার ভরটা সঠিক ভাবে না জানা পর্যন্ত তার অস্তিত্বকে মেনে নেওয়া যাচ্ছিল না। অধ্যাপক বসু ও চৌধুরী সেই কাজটি করে নিঃসন্দেহে মহাজাগতিক রশ্মিতে মেসন কণার অস্তিত্বকে প্রমাণ করেন। এই কণা ইলেকট্রনের চেয়ে ভারী কিন্তু প্রোটনের চেয়ে হাল্কা। তাঁদের হিসেবে

এই ভরের গড় পরিমাণ $(216 \pm 40)\, m_e$ —অর্থাৎ ইলেকট্রনের চেয়ে প্রায় 200 গুণ ভারী (m_e = ইলেকট্রনের ভর)। তাঁদের এই কাজটি 'নেচার' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এ ব্যাপারে আরও পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য আরও ভাল প্লেটের দরকার ছিল। যুদ্ধের দরুণ তা সম্ভব হয় নি এবং বিভা চৌধুরীও ইংলণ্ডে চলে যান। ফলে অধ্যাপক বসু এ ব্যাপারে আর এগোতে পারেন নি।

পরে ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সি. এফ. পাওয়েল ঐ একই পদ্ধতিতে আরও উন্নত ধরণের প্লেট নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেন যে, ভারী পাই মেসন ক্ষয় হয়ে হাল্কা মিউ মেসনে রূপান্তরিত হয়। তাঁর হিসেবে মিউ-মেসনের ভরের পরিমাণ $(213 \pm 15) m_e$। অধ্যাপক পাওয়েলকে এই কাজের জন্য 1950 খৃস্টাব্দে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। অধ্যাপক বসু ও চৌধুরী পাই-মেসন ও মিউ-মেসনের কথা বলেন নি ঠিকই। কিন্তু ফটোগ্রাফিক প্লেটের সাহায্যে তাঁরাই সর্বপ্রথম মেসনের ভর মোটামুটি সঠিকভাবে নির্ণয় করেছিলেন এতে কোন সন্দেহ নেই। অধ্যাপক পাওয়েলও একথা তাঁর বইয়ে স্বীকার করেছেন। তাই অনেকের মতে, পাওয়েলের সঙ্গে অধ্যাপক বসু ও চৌধুরীকেও যুগ্মভাবে নোবেল পুরস্কার দেওয়া উচিত ছিল।

এ ব্যাপারে তিনি 1951 খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে ইণ্ডিয়ান রেডিওলজিক্যাল কংগ্রেসের উদ্বোধনী ভাষণে বলেছিলেন, '...পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিতে আমরা যে কত ধীর পদক্ষেপে এগোচ্ছি তা আমি আমার এই অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝতে পারি। পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানে মৌল গবেষণা করতে আমরা সকলেই আগ্রহী। কিন্তু নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন করতে যে কষ্ট দরকার তা স্বীকার করতে আমরা প্রস্তুত নই। যাঁরা কষ্ট করে সেই প্রযুক্তির উদ্ভাবন করবে আমরা তাঁদেরও মূল্য দিই না। আমরা চাই আমাদের গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বিদেশ থেকে আমদানি হয়ে আমাদের হাতে যেন 'রেডিমেড' অবস্থায় তুলে দেওয়া হয়। পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির অগ্রগতি পাশাপাশি চলে। একেকে বাদ দিয়ে অপরের অগ্রগতি হতে পারে না।"

আমরা এবার অধ্যাপক বসুর ক্লাউড চেম্বারের একটি পরীক্ষার কথা বলব। সময়ের বিচারে এটি অবশ্য তাঁর অনেক আগের কাজ। আমরা আগেই বলেছি যে, অধ্যাপক বসু ক্যাভেণ্ডিশ ল্যাবরেটরিতে উইলসনকে ক্লাউড চেম্বার তৈরি করতে দেখেছেন। পরে তিনি বার্লিনে রেগেনারের তত্ত্বাবধানে বিশেষ ধরণের ক্লাউড চেম্বার তৈরি করে তাতে বিভিন্ন আয়নিত কণার গতিপথ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। এ ব্যাপারে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল পশ্চিম জার্মানির রিজেনধার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের টি. জে. ট্রেন ক্লাউড চেম্বারের ইতিহাস লিখতে গিয়ে 1916 ও 923 খৃস্টাব্দে প্রকাশিত দুটি গবেষণা পত্র পড়ে দেখেন যে অধ্যাপক বসুই প্রথম আলফা কণার সংঘাতে নাইট্রোজেন নিউক্লিয়াসকে ভাঙতে সমর্থ হন! এতদিন এ ধরণের কাজ ব্ল্যাকেটই শুরু করেছেন এরকম একটা ধারণা বিজ্ঞানীদের ছিল। বিজ্ঞান ট্রেন নিজে এ ব্যাপারে একটি মজার চিঠি (7 নভেম্বর, 1973) অধ্যাপক বসুকে লিখেছিলেন।

অধ্যাপক বসুর তত্ত্বাবধানে হরপ্রসাদ দে, শ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায়, নলিনীকান্ত সাহা প্রমুখ বসুবিজ্ঞান মন্দিরে ক্লাউড চেম্বার নিয়ে পরীক্ষা শুরু করেন। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় ও সাহা সেই যুগে বসুবিজ্ঞান মন্দিরেই কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তার উপর গবেষণা শুরু করেন। কথিত আছে, অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ই প্রথম ইউরেনিয়ামের স্বতঃস্ফূর্ত বিভাজন প্রথম লক্ষ্য করেন! কিন্তু অধ্যাপক বসু এ ব্যাপারে নিশ্চিত না হওয়ায় অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের গবেষণা প্রকাশিত হয় নি। পরে দুই রাশিয়ান বিজ্ঞানী Petrzhak ও Florov এই কাজের গৌরব পান।

চৌম্বকধর্মী পদার্থ ও তাদের ধর্ম নিরূপণে অধ্যাপক বসুর গবেষণাগুলির মধ্যে 'বোস-স্টোনার সূত্র' খুবই বিখ্যাত। তাঁরই গবেষণার ফলে প্যারাম্যাগনেটিক ও বিরল-মৃত্তিকা আয়ন সমৃদ্ধ সরল ও জটিল যৌগগুলির চৌম্বকত্ব পরিমাপ করা সম্ভব হয়েছে।

উদ্ভিদ শারীরবৃত্ত সম্পর্কে দেবেন্দ্রমোহন বসুর গবেষণার মধ্যে একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী কাজ করত। জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদের বৃদ্ধি, বাইরের উত্তেজনায় সাড়া দেওয়া, উদ্ভিদের 'স্নায়ু' প্রভৃতি নিয়ে যে সব পরীক্ষা করেছেন দেবেন্দ্রমোহন চেয়েছিলেন জীব রসায়ন (বায়োকেমিস্ট্রি) ও জীবপদার্থবিদ্যার (বায়োফিজিক্স) দৃষ্টিভঙ্গিতে সেগুলিকে ব্যাখ্যা করতে এবং তাঁর গবেষণাকে সম্প্রসারিত করতে। এ ব্যাপারেও তিনি প্রভূত গবেষণা করে গেছেন।

যাই হোক, দেবেন্দ্রমোহনের গবেষণার কথা বলতে গেলে লেখা দীর্ঘ হয়ে যায় এবং তা সাধ্যেরও বাইরে একথা বলেছি। এখন দুটি কথা বলে শেষ করছি। তিনি তাঁর সপ্তত্তিতম জন্মদিনে বসুবিজ্ঞান মন্দিরে বলেছিলেন, '......বিজ্ঞান ঠিক শিল্পকলার মত নয়। এর ক্রমোন্নতির একটা ধারাবাহিকতা আছে। এমন কি, বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় একটি বৈপ্লবিক অবদানের দাবিদার হতে হলে বর্তমান জ্ঞানধারার সঙ্গে তার কিছুটা সাযুজ্য রাখতেই হবে আর তাতেই উপ্ত হবে ক্রমবিকাশের বীজ।' ভারতে বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাস রচয়িতারা দেবেন্দ্রমোহনকে উপেক্ষা করার আগে এ কথাগুলি মনে রাখলে ইতিহাসকেই সম্মান দেবেন।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বর্ণানুক্রমিক দ্বিতীয় ষাণ্মাসিক বিষয়সূচী

জুলাই থেকে ডিসেম্বর—1985

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বর্ণানুক্রমিক দ্বিতীয় ষান্মাসিক লেখকসূচী

জুলাই থেকে ডিসেম্বর—1985

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-700 006 থেকে প্রকাশিত
এবং গুপ্তপ্রেশ, 37/7, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-700 009 হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু রচনা সঙ্কলন

এই গ্রন্থে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রায় সব রচনাই সঙ্কলিত হয়েছে।

মূল্য ঃ— 30 টাকা

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন

(পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ)

লেখক—দ্বিজেশচন্দ্র রায়

[মহাবিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের জীবনী ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা সহজ ভাষায় পরিবেশিত হয়েছে]

মূল্য :— 25 টাকা

প্রকাশক—বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
P-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট,
কলিকাতা-700006
ফোন ঃ 55-0660

JNAN-O-BIJNAN
MONTHLY JOURNAL Regd. No. WB/NC-210 November-December 1985

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—শৈলী-কলিকাতা—54 মূল্য—5·00